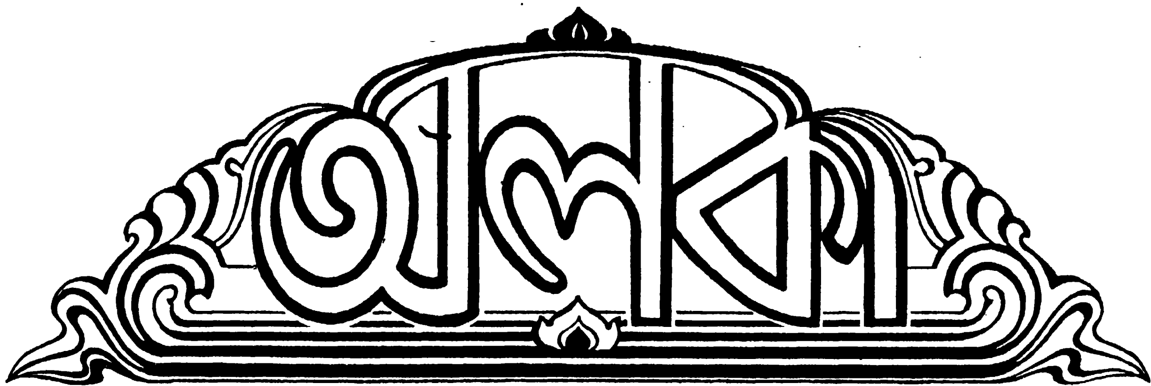


সচিত্র মাসিকপত্র

দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩৪৬—ফাল্গুন, ১৩৪৬

সম্পাদক ঃ

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

হিমালয় হাউস

১৫ নং চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ, কলিকাতা

বার্ষিক মূল্য চারি টাকা চৌদ্দ আনা

৩৮০

অলকা

(আশ্বিন, ১৩৪৬—ফাল্গুন, ১৩৪৬)

ষাণ্মাসিক সূচী

বিষয়-সূচী

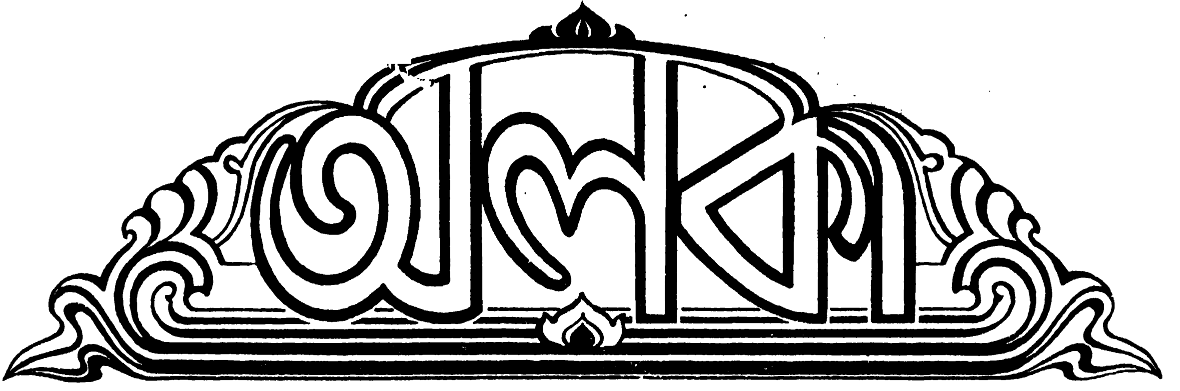
লেখক-সূচী

(বর্ণানুক্রমিক)

চিত্র-সূচী



[illegible]



দ্বিতীয় বর্ষ | আশ্বিন, ১৩৪৬ | প্রথম সংখ্যা

পাপীয় দিবস

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

সংস্কৃত ভাষায় মধ্যে মধ্যে এমন কতকগুলি শ্লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যাদের শক্তি ও সৌন্দর্য্য যুগে যুগে মানুষের মর্ম্ম স্পর্শ করে। ইংরাজিতে যে এ ধরণের শ্লোক পাওয়া যায় না, তার কারণ অল্প কথায় অনেক কথা বলবার কৌশল classical সাহিত্যের যেমন ছিল, বর্ত্তমান সাহিত্যের তেমন নেই। ভাষা সম্বন্ধে মিতব্যয়িতা classical সাহিত্যের প্রধান গুণ। বাচালতা হচ্ছে একালের লেখকদের ধর্ম্ম, বিশেষতঃ বেশির ভাগ বিলেতী লেখকদের।

এই জাতীয় একটি শ্লোক প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক গ্রন্থ ধ্বন্যালোকে উদ্ধৃত আছে। আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য বলেন—শ্লোকটি "মহর্ষের্ব্যাসস্য।" এ শ্লোকটির সাক্ষাৎ আমি সম্প্রতি মহাভারতের আদিপর্ব্বে পেয়েছি; এবং এ স্থলে সেটি উদ্ধৃত করে দিচ্ছি:—

"অতিক্রান্তসুখাঃ কালাঃ প্রত্যুপস্থিতা দারুণাঃ।
শ্ব শ্ব পাপীয়দিবসাঃ পৃথিবী গতযৌবনা॥"

অস্যার্থ,—সুখের কাল অতিক্রান্ত হয়েছে, দারুণ কাল উপস্থিত। দিনের পর দিনগুলি সব পাপীয় দিবস। এক কথায়, পৃথিবী এখন গতযৌবনা।

এই কি আজকের দিনের প্রকৃত অবস্থা নয়? আর বর্ত্তমানের যথার্থ অবস্থার এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর বর্ণনা আর কি হ'তে পারে? পৃথিবী "গতযৌবনা,"—ঐ একটি বিশেষণেই আমাদের কালের বিশ্রী রূপকে প্রকাশ করেছে।

(২)

আমাদের, এমন কি সমগ্র মানবজাতির যে দারুণ কাল উপস্থিত, এ জ্ঞান আমার অনেক দিন থেকেই হয়েছে। গত যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই যে মানুষের সুখের কাল অতিক্রান্ত হয়েছে, তার প্রমাণ

জগৎজোড়া economic depression এবং বঙ্গোপসাগরের depressionকে যেমন আমরা ধমকে দূর করতে পারি নে, এ ইকনমিক depression দূর করাও প্রায় তাদৃশ দুঃসাধ্য। দুঃসাধ্য বল্‌ছি এই জন্যে যে, ইউরোপে ইতিমধ্যে অসংখ্য economics-এর বই লেখা হয়েছে, কিন্তু তার ফলে বিশ্বমানবের গোলা ধানে ভরে ওঠে নি। প্যাটরাও বস্ত্রপূর্ণ হয় নি। মানুষের বর্ত্তমান দারিদ্র্যের কারণ নাকি অন্নবস্ত্রের হ্রাস নয়,—অতিবৃদ্ধি। ইংরাজীতে যাকে বলে Poverty amongst Plenty—এর কোন প্রতিকার আছে কি?—ধনী সম্প্রদায় বলেন,—ফসলের জন্মনিরোধ কর। এ বিষয়ে আমার কোন কথা বলা শোভা পায় না, কেন না আমি কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Economics-এর M. A. নই। আর যদি হতুম, তাহলেও নীরব থাকতুম। কারণ এ বিষয়ে উচ্চবাচ্য করতে সুরু করলে সাহেবলোকে বলত,—মোগল পাঠান হদ্দ হল, ফারসি পড়ে তাঁতি! তবে এ দারিদ্র্য যে গত যুদ্ধের কুফল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

(৩)

বোধ হয় এ দারিদ্র্য থেকে উদ্ধার পাবার এক মাত্র উপায় হচ্ছে যুদ্ধ। গত যুদ্ধে যে ক্ষতি করেছে, আগামী যুদ্ধে তা' পূরণ করবে। বিষস্য বিষমৌষধং, এ কথা তো সেকেলে চিকিৎসাশাস্ত্রের মহাবাক্য, একালেরও তাই। Auto-vaccine-এর অর্থ কি?

সে যাই হোক, আগামী যুদ্ধের মূলে যে ধনলিপ্সা আছে, তা বলা বাহুল্য। যদি ধরে' নাও যে তা' নয়, নিষ্কাম ধর্ম্ম হিসাবেই জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ করতে ব্রতী হয়েছে,—তাহলে তো ব্যাপার আরও ভীষণ হয়ে ওঠে। সুতরাং এই আসন্ন যুদ্ধের ফলে যে মানবজাতির সর্ব্বনাশ হবে, এ ভয় আমি পাই। যুদ্ধকালে ভয় সকলেই পায়,—বিশেষতঃ এই বোমাবৃষ্টির যুগে। এমন কি, যোদ্ধারাও বোধ হয় পায়।

গত যুদ্ধ হয়েছিল বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত। এবার কিন্তু অনেক দিন থেকেই পৃথিবীর পলিটিকাল আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আছে, সুতরাং যে কোন দিন বজ্রপাত হতে পারে, এ ভয় পাবার জন্য কোনরূপ দিব্য দৃষ্টি থাকবার প্রয়োজন নেই। অনেকের যেমন ব্যক্তিগত অমরতায় বিশ্বাস নেই, আমি তেমনি জাতীয় অমরতায় বিশ্বাসহীন। আমি অদম্য optimist নই।

(৪)

আগামী যুদ্ধের মূল দুর্ব্বার ধনলিপ্সাই হোক, আর রণলিপ্সাই হোক, এ যুদ্ধ দু'চারদিন মুলতবি থাকতে পারে, কিন্তু বন্ধ কিছুতেই হবে না। ইউরোপীয় সভ্যতা যখন আত্মহত্যার জন্য লালায়িত হয়েছে, তখন সে সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য্য। লোকের মন যখন অধঃপাতের দিকে ঝোঁকে, তখন তার মুখের কথা কেতাদুরস্ত হলেও, তার মতিগতি উজান বয় না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধও কেউ স্থগিত করতে পারেন নি, যদিও কুরুবৃদ্ধদের এ যুদ্ধে অমত ছিল। ঋষিদের ধর্ম্মোপদেশ, এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের দৌত্যও ব্যর্থ হয়েছিল; শান্তির স্বপক্ষে আজ যে-সব কথা বলা হচ্ছে, সেকালেও সে-সব কথা বলা

হয়েছিল ; কিন্তু কোনও ফল হয় নি। আজও হবে না। ভালমন্দের জ্ঞান দুদিন আগে জন্মায় নি ; আজ শুধু সে জ্ঞান নষ্ট হতে বসেছে।

আজ ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের পয়লা সেপ্টেম্বর। আজও বজ্রপাত হয় নি, কিন্তু পৃথিবীর আকাশ বাতাস electricity-তে পরিপূর্ণ। এ অবস্থায় শুনতে পাই চতুষ্পদ পশুরা অস্বস্তি বোধ করে। আর আজকাল দ্বিপদ ও চতুষ্পদে তফাৎ তো দু' পা মাত্র। তাই আকাশ যে আমাদের মাথায় ভেঙ্গে পড়বে না, এ ভরসা আমি পাচ্ছি নে।

(৫)

মিউনিকের আপোষ-মীমাংসার পিঠপিঠ আমি "শান্তি না শাস্তি" নামক একটি প্রবন্ধ লিখি, সেটি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। তার পরেই আমি আর একটি প্রবন্ধ লিখি, যাতে ইংলণ্ডের সঙ্গে রাসিয়ার সন্ধির প্রস্তাব করি। আমার ধারণা ছিল যে, Bolshevism-এর গতি হচ্ছে ভবিষ্যৎ ডিমোক্রাসির দিকে। অবশ্য ইংলণ্ডে আজ যে ডিমোক্রাসি আছে, তার সংশোধিত সংস্করণ। সে প্রবন্ধটি আমি প্রকাশ করিনি, কারণ বই পড়ে রাসিয়ার বর্ত্তমান হালচাল ঠিক বোঝা যায় না। অতএব সে বিষয় নীরব থাকাই শ্রেয়।

সম্প্রতি Chamberlain কিছুকাল ধরে রাসিয়ার সঙ্গে গুফ্‌তগু করেছিলেন, সে কথোপকথনের ফলে দেখলুম যে Stalin-এর সঙ্গে Hitler-এর সন্ধি হয়ে গিয়েছে।

এ সংবাদ পেয়ে আমি অবাক হয়ে যাই। যদিও Bolshevism-এর সঙ্গে Nazism-এর অনেক মিল আছে, তাহলেও Communism-এর মারাত্মক শত্রু হচ্ছে Fascism। ইতালি, জার্ম্মানি ও জাপান, এই তিন শক্তি হাতে মিলিয়ে Communism-কে ধ্বংস করে' পৃথিবীময় অধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। তাই জার্ম্মানির সঙ্গে রাসিয়ার সখ্যের কথা শুনে মনে হয়েছিল—কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্।

(৬)

আজ আবার শুনছি Soviet-এর মন্ত্রীসভা এ চুক্তিতে রাজি হন নি। আর যে যে কারণে রাজি হন নি, তার অন্তরে moral কারণও আছে। Art for Art কথাটি গ্রাহ্য হ'তে পারে, কিন্তু politics for politics একটা সর্ব্বনেশে কথা। সে politics-এর অন্তরে morality-র সংস্রব নেই, সে পলিটিক্স তির্য্যকসামান্য।

এর থেকে অনুমান করছি যে, রাসিয়ার সঙ্গে জার্ম্মানির যদি কোনও মিটমাট না হয়, তাহলে 'যুদ্ধ বন্ধ' হলেও হতে পারে। কারণ রাসিয়ায় দেহও প্রকাণ্ড, শক্তিও বিপুল।

কিন্তু রাসিয়া যে এ সময় শান্তিরক্ষা করতে পারবে, এ আশা করা যায় না, কারণ আজকের দিন পাপীয় দিবস। তা ছাড়া রাসিয়ানরাও ইউরোপীয়, অতএব অবিশ্বাস্য।

সকালে যা অনুমান করেছি, বিকেলে শুনছি তা ঘটেছে।

আমি এ প্রবন্ধ ব্যাসদেবের একটি কথা দিয়ে আরম্ভ করেছি, এখন ব্যাসদেবের আর একটি কথা দিয়ে তা' শেষ করি। যখন কুরুপাণ্ডবেরা কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন ব্যাস ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন :—

সামদানের দ্বারা বিজয় শ্রেষ্ঠ, ভেদের দ্বারা বিজয় মধ্যম, আর যুদ্ধের দ্বারা বিজয় জঘন্য।

সুতরাং এ যুদ্ধে কে হারে কি জেতে তাতে কিছু আসে যায় না, ব্যাপারটাই জঘন্য। এর পরে কি আসবে?—পাপীয় দিবস।

অশোকাবদান

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

[সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যে 'দিব্যাবদান' নামক একখানি গ্রন্থ আছে। এ গ্রন্থের পুঁথি নেপাল হতে আবিষ্কৃত হয় এবং Cowell ও Neil নামক দুজন পণ্ডিতের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। 'দিব্যাবদান' মুলতঃ বিনয় গ্রন্থ, 'মূল সর্বাস্তিবাদ' নামক এক প্রাচীন কাশ্মীরী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিনয়পিটকের অংশ বিশেষ। কিন্তু 'দিব্যাবদানে'র শেষভাগে এমন কয়েকটি অবদান সন্নিবিষ্ট হয়েছে, যার সঙ্গে মূল গ্রন্থের ঘনিষ্ট যোগসূত্র নেই। এ অবদানগুলি মৌর্য্যবংশীয় রাজা অশোক সম্বন্ধে প্রচলিত গল্প নিয়ে গঠিত হয়েছিল, এ সব গল্পের মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক তথ্যও আছে, একথা মনে করা অসঙ্গত নয়। অশোকাবদান এই অবদানমালার শেষ ভাগ। এ অবদানের যথাযথ অনুবাদ করেছি, এই কারণে যে, তার মধ্যে রাজা অশোক সম্বন্ধে ঐতিহাসিক উপাদান থাক্ বা না থাক্, অন্ততঃ মানুষ অশোকের কিছু খোঁজ পাওয়া যায়। মূল অবদান অশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হলেও তার কাব্যরস ক্ষুণ্ণ হয় নি, তবে অনুবাদে তা কতটা রাখা সম্ভব হয়েছে, তা বলতে পারি না।]

মহারাজ অশোক ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, কে বুদ্ধশাসনে বেশী দান করেছে?

ভিক্ষুরা বললেন, অনাথপিণ্ড নামক গৃহপতি।

অশোক জিজ্ঞাসা করলেন, বুদ্ধশাসনে তিনি কত দান করেছিলেন?

ভিক্ষুরা বললেন, তিনি বুদ্ধশাসনে শতকোটি সুবর্ণ মুদ্রা দান করেছিলেন।

একথা শুনে রাজা অশোক চিন্তাকুল হয়ে ভাবতে লাগলেন, সে গৃহপতি হয়েও বুদ্ধশাসনে শতকোটি সুবর্ণ দিয়েছে!

তখন অশোক ভিক্ষুদের ডেকে বললেন, আমিও বুদ্ধশাসনে শতকোটি দান করব।

এর পর অশোক চতুরশীতি সহস্র ধর্ম্মরাজিকা প্রতিষ্ঠা করলেন, নানা স্থানে শত-সহস্র সুবর্ণ দান করলেন, জাতি-বোধি-ধর্ম্মচক্র ও পরিনির্ধানের উদ্দেশ্যে সর্বত্র শত সহস্র দান করলেন ও পঞ্চবার্ষিক অনুষ্ঠান করলেন। এই পঞ্চবার্ষিকেও চার শত সহস্র সুবর্ণ দান করলেন, তিন শত সহস্র সুবর্ণ ভিক্ষুদের ভোজন করাবার জন্য, এক শত সহস্র অর্হৎদের এবং দ্বিশত সহস্র শিক্ষার্থী এবং পৃথক্ জনদের কল্যাণের জন্য দান করলেন, এই রূপে তিনি ৯৬ কোটি সুবর্ণ বুদ্ধশাসনে দান করলেন। শতকোটি পূর্ণ হতে তখনও চার কোটি বাকী আছে, অথচ তিনি আর দীর্ঘকাল রাজা থাকবেন না বুঝতে পেরে চিন্তান্বিত হলেন।

তাঁকে এই ভাবে বিষণ্ণ দেখে মন্ত্রী রাধগুপ্ত এসে অশোকের পদবন্দনা করে কৃতাঞ্জলি হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—

প্রবল শত্রুসংঘের দ্বারা পরিবৃত হলেও প্রচণ্ড দিবাকরের আভাযুক্ত যে মুখে উদ্বেগের চিহ্ন দেখা যেত না পদ্মাননের শত শ্রীর দ্বারা উদ্ভাসিত সে মুখে আজ উদ্বেগের চিহ্ন কেন?

রাজা বললেন, রাধগুপ্ত, ঐশ্বর্য্যনাশ কিংবা রাজ্যনাশের জন্য যে আমি শোক করছি তা নয়, আমার অনুশোচনার কারণ, আমি আর্য্যদের সঙ্গসুখ থেকে বঞ্চিত হতে চলেছি। মানুষ ও

দেবতাদের দ্বারা পূজিত, সর্বগুণোপপন্ন সংঘকে আমি আর যে উত্তম অন্নপানের দ্বারা পূজা করতে পারব না, সেই চিন্তাতেই আমি অভিভূত হয়ে পড়েছি।

রাধগুপ্ত, আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে বুদ্ধশাসনে শতকোটি মুদ্রা দান করব, কিন্তু সে অভিপ্রায় আমার পূর্ণ হয় নি।

অতঃপর অশোক "চারকোটি পূর্ণ করব" বলে কুক্কুটারামে সুবর্ণ মুদ্রা পাঠাতে আরম্ভ করলেন। সেই সময়ে কুণালের পুত্র সম্পদি যুবরাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁকে তাঁর অমাত্যেরা বললেন, অশোক রাজা অল্পকালই বাঁচবেন, অথচ তিনি সমস্ত সম্পত্তি কুক্কুটারামে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, কোষাধ্যক্ষকে নিবৃত্ত করা কর্ত্তব্য। এ কথা শুনে যুবরাজ ভাণ্ডাগারিককে নিষেধাজ্ঞা পাঠিয়ে দিলেন।

এই নিষেধাজ্ঞার পর কোষাধ্যক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা পাঠান বন্ধ করে দিলেন। তখন যে সুবর্ণপাত্রে অশোককে খেতে দেওয়া হ'ত তিনি সেই সুবর্ণপাত্রই কুক্কুটারামে পাঠিয়ে দিতে লাগলেন, তারপর সুবর্ণপাত্র বন্ধ করে রৌপ্যপাত্রে খেতে দেওয়া হ'ল, অশোক সে রৌপ্যপাত্রও কুক্কুটারামে পাঠিয়ে দিলেন, যখন রৌপ্যপাত্র বন্ধ করে লৌহপাত্রে খেতে দেওয়া হল, অশোক সে লৌহপাত্রও কুক্কুটারামে পাঠালেন, তারপর অশোককে সমস্ত বন্ধ করে মৃৎপাত্রে অর্দ্ধ-আমলক ফল খেতে দেওয়া হ'ল। তখন অশোক উদ্বিগ্ন হয়ে সমস্ত অমাত্য ও পৌরজনদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন পৃথিবীর অধীশ্বর কে?

অমাত্যগণ আসন ত্যাগ করে উঠে রাজা অশোকের নিকটে গেলেন এবং কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রণাম করে বললেন, দেব, আপনিই পৃথিবীর অধীশ্বর।

তখন অশোক সাশ্রুনয়নে শোকাতুরভাবে অমাত্যদের বললেন—

দাক্ষিণ্যবশবর্ত্তী হয়ে আপনারা মিথ্যা কথা কেন বলছেন? আমি এখন ভ্রষ্টরাজ্য। পরিশেষে এই অর্দ্ধ আমলকে আমার প্রভুত্ব পর্য্যবসিত হয়েছে। ধিক ঐশ্বর্য্য, আমার ন্যায় পৃথিবীর অধীশ্বরকেও বন্যার উদ্ধত নদীস্রোতের ন্যায় দারিদ্র্য অভিভূত করতে পারে!

অথবা ভগবান বুদ্ধের 'বাক্যকে লঙ্ঘন করে যে সমস্ত সম্পত্তি, তা' বিপত্তি ও বিনাশের কারণ। সত্যবাদী গৌতম যা বলেছেন তা অবিসংবাদী। এক সময়ে আমার আজ্ঞায় কেউ প্রতিরোধ পারত না, কিন্তু এখন মহান্ পর্বতশিলাতলের দ্বারা প্রতিনিবৃত্ত নদীর মত সে আজ্ঞা বাধা প্রাপ্ত হয়েছে।

তখন আমি একাতপত্র পৃথিবীতে ছিলাম সকলের রক্ষক, গর্বোদ্ধত অরিগণের উচ্ছেদ করে দীনাতুরকে আশ্বস্ত করতে পারতাম, আর আমি এখন ভগ্নরথের ন্যায় আয়ত্তনহীন। [শুনুন] কৃপণ অশোক নৃপতি এখন শোভাহীন, ছিন্ন, ম্লান এবং বিশীর্ণ পত্রকুসুমবিশিষ্ট অশোকবৃক্ষের মতই শুষ্ক হয়ে গেছেন।

তারপর রাজা অশোক নিকটবর্ত্তী ব্যক্তিকে ডেকে বললেন, ভদ্রমুখ, আমি ভ্রষ্টৈশ্বর্য্য বটি, কিন্তু পূর্বানুরাগবশতঃ আমার এই শেষ কার্য্য তোমাকে করতে হবে। এই অর্দ্ধামলক নিয়ে কুক্কুটারামে বৌদ্ধসংঘের নিকটে যাও, আমার পক্ষ হতে সংঘকে বন্দনা করে বলবে, জম্বুদ্বীপের সমস্ত ঐশ্বর্য্যের যিনি ছিলেন রাজা, বর্ত্তমানে তাঁর এই হচ্ছে একমাত্র সম্পত্তি, এই শেষ দান তাঁরা যেন এমনভাবে ভোজন করেন, যাতে আমার এই সংঘদক্ষিণা বিস্তৃতি লাভ করে। তাঁদের বলবে—

আজ আমার এই দান শেষ দান, রাজ্য নাই, আরোগ্য, বৈদ্য, ঔষধ প্রভৃতি হতে বঞ্চিত আমার এখন আর আর্য্যসংঘ ব্যতীত আর কোন ত্রাতা নাই। সুতরাং এই শেষ দান তাঁরা এমনভাবে গ্রহণ করুন যাতে বিস্তীর্ণ সংঘ সে দক্ষিণার ভাগী হতে পারে।

'দেব, তাই হবে' বলে রাজা অশোককে প্রতিশ্রুতি দিয়ে অর্দ্ধামলক নিয়ে সেই ব্যক্তি কুক্কুটারামে গেল। সেখানে সংঘবৃদ্ধদের নিকট কৃতাঞ্জলি হয়ে সংঘকে সেই অর্দ্ধামলক দান করে বললে—

যিনি এক সময়ে একচ্ছত্রধারী হয়ে সমস্ত বসুমতীকে আজ্ঞাধীন করেছিলেন এবং মধ্যাহ্নের ভাস্করের মত সমস্ত মনুষ্যলোকের উপর তাপ বিকিরণ করবেন সেই নৃপতি আজ ভাগ্যচ্ছিদ্রের বশে নিজ কর্ম্মফলে ঐশ্বর্য্য হতে বঞ্চিত হয়েছেন, দিবাবসানে সূর্য্যের মত তিনি আজ বিগতপ্রভ। তিনি ভক্তিভরে সংঘকে নমস্কার করে লক্ষ্মীকাপণ্যচিহ্নিত এই অর্দ্ধামলক পাঠিয়েছেন।

তখন সংঘস্থবির ভিক্ষুদের ডেকে বললেন, ভদন্ত, আপনাদের মনে এখন সহানুভূতির উদ্রেক হ'তে পারে। কেননা ভগবান বুদ্ধই বলেছেন, পরবিপত্তি সহানুভূতিযোগ্য, আর কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির এতে সহানুভূতি না হবে, কারণ—

মৌর্য্যকুঞ্জর নরেন্দ্র অশোক ছিলেন ত্যাগবীর, জম্বুদ্বীপেশ্বর হয়েও তাঁর ঐশ্বর্য্য এখন অর্দ্ধামলকে পর্য্যবসিত। ভৃত্যেরা তাঁর অধিকার হতে তাঁকে আজ বঞ্চিত করেছে। সেই কারণে তিনি যেন ঐশ্বর্য্যমদগর্বিত পৃথকজনের মনে ভীতি-উৎপাদনের জন্যই এই আমলকার্দ্ধ পাঠিয়েছেন, আপনারা এখন এই অর্দ্ধামলক চূর্ণ করে যূষে নিক্ষেপ করুন, যাতে সমস্ত সংঘই এর ভাগ পায়।

এর পর রাজা অশোক রাধগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাধগুপ্ত বল ত এখন পৃথিবীর ঈশ্বর কে? রাধগুপ্ত অশোকের পদবন্দনা করে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, দেব, আপনিই পৃথিবীর ঈশ্বর।

অনন্তর রাজা অশোক কোন রকমে দাঁড়িয়ে উঠে চতুর্দিকে অবলোকন করে সংঘের উদ্দেশ্যে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, তা হলে এখন আসমুদ্র মহাপৃথিবী বুদ্ধশাসনে দান করছি।

সমুদ্রের উত্তমনীলকঞ্চুকধারী বহুরত্নাকরভূষিত মহাপৃথিবী সংঘকে দান করলাম—যাতে সংঘভিক্ষুরা তার ফলভোগ করতে পারেন।

দ্রুতবারিবেগচপল রাজ্যশ্রী দান করে, আমি ইন্দ্রভবন বা ব্রহ্মলোকের ফল কিছুই চাই না। মহৎ ভক্তিপূর্ণ এই দানের ফলের দ্বারা যেন চিত্তৈশ্বর্য্য লাভ করি, যার পরিণাম আর্য্যসম্মত হয়।

অতঃপর রাজা অশোক দানপত্র লিখে তা মুদ্রাঙ্কিত করলেন এবং এইভাবে মহাপৃথিবী সংঘকে দান করে কালগত হলেন।



প্রতীক্ষমানা

শ্রীকানাই সামন্ত

তোমারে দেখেছি আমি সন্ধ্যার আঁধারে
নিরানন্দ দেহলীর ধারে
আছ প্রতীক্ষিয়া।
চিনি নাই, চিনি নাই, প্রিয়া।

পূতিগন্ধি বক্র শীর্ণ গলি।
দূরে দূরে উঠিল উজ্জ্বলি'
নগরের বৈদ্যুত আলোক।
আবর্তিত ঘূর্ণস্রোতে চলিয়াছে লোক
দূরে ও নিকটে
কোন্ মহাশূন্যে কোন্ ব্যর্থতার তটে
মৃত্যুকামনায়।
হায়,
তোমার কি মোহ নাই, মায়া নাই, নারী!
দাঁড়াইলে প্রান্তে এসে তারি ?
নিরুৎসুক নিরানন্দ চোখে
কপট কজ্জললেখা ; রক্ত অলক্তকে
রঞ্জিত অধর-ওষ্ঠ ; ব্যর্থ বিভূষণ
অঙ্গে অঙ্গে করে উদ্‌ঘোষণ :
নিরুদ্দেশ প্রতীক্ষায়
দাঁড়ায়েছ হায়!
বিধাতার দান এ জগতে—
কানায় কানায় পূর্ণ, হায় কত বসন্তে শরতে
পুষ্পগন্ধে কুহুস্বরে নদীকলস্রোতে
পূর্ণেন্দু-আলোকে।
সে মোহিনীমূর্তি শুধু পড়েছিল চোখে
অন্য মনে যেতে যেতে।...
আমারে কি ছিলে প্রতীক্ষিয়া ?
হায় কেন, চিনি নাই, চিনি নাই, প্রিয়া।

আমি শুধু কবি নই কল্পনাবিলাসী ;
নির্বাণউৎসুক নহি—বিরক্ত উদাসী
অমলিন নহি গো কুমার।
বঞ্চিত এ যৌবন আমার
হাহাকার করে
সংগীত উৎসারি' জীর্ণ পঞ্জরে পঞ্জরে ;
দীর্ঘ উপবাসী
চায় দেহ, চায় প্রাণ, আত্মা অবিনাশী ;
একাধারে দ্যুলোক ভূলোক
মূর্তিময় প্রাণময় প্রেমময় হোক—
সুচিরবাঞ্ছিতা নারী, অনন্যপ্রেয়সী
হায়, সে কোথায় আছে বসি'
জন্মবিরহিণী—চিররাহুগ্রস্ত শশী—
কারাকক্ষতলে ?—
অথবা পথের প্রান্তে ?—নিশি নিশি তপ্ত অশ্রুজলে
হেথা শুধু তিতিল শিথান
স্বপ্নে স্বপ্নান্তরে শুধু নিষ্ফল সন্ধান।

কে তুমি ?—তুমি কি বালা,
যৌবনলাবণ্যপণ্যা, প্রাণঘাতী মরীচিকামালা
ব্যর্থ কামকামনার অনির্বাণ চিতা
বারবধূ ?—হে অপরিচিতা,
নহ মাতা, নহ কন্যা, বধূ নহ তুমি ;
নরকের বিষবাষ্পে উঠেছ কুসুমি'
দিশাবিস্মরণী বুঝি আলেয়ার আলো ?
তুলসীর মূলে নাহি জ্বালো
সন্ধ্যাদীপ ; আপনারে কভু নাহি ঢালো
ধন্য করি' কোনো ভাগ্যবানে
সেবায় সোহাগে সুখে প্রণয়ে কল্যাণে।

কেই-বা না জানে ।—
তব প্রণয়ের ভাণ,
হাসি, গান,
আত্ম-অপমান ।—
ক্লেদখিন্ন রজনীর শেষে—
তন্দ্রাতুর নয়ননিমেষে
বিন্দু অশ্রুবারি
দিবে না দিবে না দেখা নারী ।
করুণায় অথবা বিষাদে ।
কেই বা না জানে—
নিজেরে করো নি দান প্রণয়ে কল্যাণে ।

তবু কাঁদে…
'কাঁদে প্রিয়া উৎপীড়িতা বারাংগনা-বুকে' ।…
রুদ্ধ যার ভবনসম্মুখে
নরকউৎসব নিশিদিন—

যে কুমারী তন্দ্রায় বিলীন
অতারক অচন্দ্রমা গূঢ় মর্মতলে,
সে কি জাগিত না কভু পূত অশ্রুজলে
শরৎ-শিশিরধৌত প্রসূনের সম
যদি তার চির প্রিয়তম
একবার দাঁড়াইত দ্বারে
চুমিত তাহারে
দূর করি' স্বপ্নঘেরা ঘুম ?

ত্রিদিবকুসুম
মর্ত্যে নারী
সন্ধানে তাহারি—
ফিরিয়াছি পথ হতে পথে ।…
সে সন্ধ্যায় আঁধারে আলোতে—
কে তুমি, কাহার লাগি' ছিলে প্রতীক্ষিয়া ?
হায়, তোরে চিনি নাই, প্রিয়া ।



দেবাঃ ন জানন্তি

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বেসরকারী কলেজের অধ্যাপক, পণ্ডিতলোক, নামডাকও এই অল্প বয়সে যথেষ্টই হইয়াছে, কিন্তু বেতন মাত্র এক শত টাকা। যাহাকে বলে কায়ক্লেশে চলা—তেমনি ভাবেই সংসার চলে। গৃহিণী নীলিমা বড় গোছালো মেয়ে—সে এই অল্প আয়েই বেশ পারিপাট্যের সহিত সংসারটি চালাইয়া থাকে। কিন্তু বিপদ তাহার স্বামীকে লইয়া, অধ্যাপক সৌরীন্দ্রমোহন মুক্তহস্ত পুরুষ, যেদিন বেতন পান, সেদিন কম করিয়া দশ টাকার নূতন বই কিনিয়া ফেলিবেনই, তাহার উপর গোটা একটা টাকার পয়সা ট্রাম-বাসে ভ্রাম্যমান Poor Box ও রাস্তাঘাটের কাণা-খোঁড়াকে দিয়া উননব্বইটি টাকা লইয়া বাড়ী ফেরেন। কখনও কখনও বা নীলিমার জন্য দশ পনের টাকার শাড়ী ব্লাউস কিনিয়া স্ত্রীর হাতে পঁচাত্তরটি টাকা দিয়া অপ্রতিভের মত হাসিতে হাসিতে বলেন, এ মাসে একটা লেখার জন্যে পঁচিশ টাকা পাব কিনা। সৌরীন্দ্র বাঙলা দেশের একজন খ্যাতনামা লেখকও বটেন।

নীলিমা কিছুই বলে না, অত্যন্ত মিষ্ট হাসি হাসে। কাপড় ও জামাটি লইয়া বাক্সে তুলিয়া রাখিয়া দেয়। রাত্রে স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া বলে, কেন আমার জন্যে ওগুলো কিনে মিছি-মিছি এতগুলো টাকা খরচ করলে বল তো? কি প্রয়োজন ওসবের?

সৌরীন্দ্র নীলিমার কপালের উপর খসিয়া-পড়া চুলগুলি সযত্নে বিন্যস্ত করিয়া দিয়া বলে, জান নীলিমা, আমার ইচ্ছে করে, রত্নালঙ্কার দিয়ে তোমাকে আমি সোনার সিংহাসনে সাজিয়ে রাখি। কিন্তু পারলাম কই? সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

সুখে নীলিমার চোখ ভরিয়া জল আসে, সঙ্গে সঙ্গে অপরূপ হাসি হাসিয়া সে বলে, ওই রকম ক'রে বললে তোমার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে যাবে কিন্তু। জান, তোমার গৌরবই হ'ল আমার হীরে মুক্তো। হাটে বাজারে যা বিক্রি হয়—সে গয়না আমি চাই না।

পরম সুখে তৃপ্তিতে দম্পতিযুগল পরস্পরকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে। কতক্ষণ পরে একটা তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ-চমকে উভয়ের খেয়াল হয়—আকাশে মেঘ করিয়াছে, বড় গরম বোধ হইতেছে।

নীলিমা হাসিয়া বলে, ও, ঘনঘটা ক'রে মেঘ করেছে, তাই বলি এত ঘেমেছ কেন? দাঁড়াও, পাখাটা আনি।

সৌরীন্দ্র হাসিয়া ফেলে, তারপর খানিকটা চিন্তা করিয়া বলে, দাঁড়াও, একটা টেবিল-ফ্যান কালই কিনে ফেলব। মাসে মাসে কিছু কিছু ক'রে দিয়ে দামটা শোধ করলেই হবে।

নীলিমা বাতাস করিতে আরম্ভ করিয়া বলে, না, ওসব হবে না। আমার অধিকার আমি ওই কলের পাখাকে দেব না কি? তা হ'লে একটা ইলেকট্রিক কুকার কিনো, রান্না ক'রে দেবে। কিম্বা বিলেত-টিলেতের মত হোটেলে বাস ক'র, পয়সা দিলেই সব হবে।

সৌরীন্দ্র খুশি হইয়া বলে, আজ একখানা বই এনেছি নীলু, কাল রাত্রে তোমাকে প'ড়ে শোনাব; পৃথিবীর সাহিত্যের একখানা শ্রেষ্ঠ বই।

নীলিমা মৃদু হাসিয়া বলে, না, আমি পড়ব, তুমি শুনবে। ভুলচুক হ'লে মাস্টারমশাই ব'লে দেবেন।

কিছুক্ষণ পরই সে আবার বলে, এবার কিন্তু আমি বি. এ. পরীক্ষা দেবই। আজকাল তুমি মোটেই আমার পড়ার ওপর নজর দাও না। কেবল সভা-সমিতি, ওসব আর চলবে না।

সৌরীন্দ্র মুখে মুখে কবিতা রচনা করিয়া উত্তর দেয়—

এ রাজ্যের রাণী তুমি; তোমার ইচ্ছাই হেথা
অলঙ্ঘ্য আদেশ। তাই হবে, তাই হবে দেবী!

নীলিমা কি উত্তর দিতে গেল, কিন্তু দেওয়া হইল না; একটা দীপ্ততর বিদ্যুৎ চমকিয়া চোখ যেন ধাঁধিয়া দিল, সে তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করিবার জন্য উঠিল; সৌরীন্দ্র বলিল, না থাক। চমৎকার মেঘ হয়েছে। শুয়ে শুয়ে মেঘ দেখা যাবে। আষাঢ়ের মেঘ—মেঘদূত আবৃত্তি করি শোন।

সৌরীন্দ্রের গলা জড়াইয়া ধরিয়া নীলিমা বলিল, একেবারে গোড়া থেকে আরম্ভ কর।

সৌরীন্দ্র বলিল, না। সামনে কলিকাতা মহানগরীর মাথার ওপরে মেঘের মেলা; অলকাপুরীর বর্ণনাটাই বড় ভাল লাগবে এখন।

সত্যই নগরীর সৌধ-শিখরগুলির মাথায় যেন মেঘ মদমত্ত ঐরাবতের মত শুণ্ডান্দোলন করিতে করিতে আকাশ হইতে নামিয়া আসিতেছে।

* * *

প্রবল বৃষ্টিতে কলিকাতা যেন ভাসিয়া গেল। পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত রাস্তায় স্থলচারী যানবাহন অচল হইয়া রহিল; স্থানে স্থানে সুইমিং ক্লাবের ছেলেরা নৌকা লইয়া খেয়া দিয়া ফিরিল। প্রায় সমস্ত দিনটা কাজকর্ম্ম বন্ধ থাকিয়া অপরাহ্ণের দিকে তবে শহরের অবস্থা অনেকটা স্বাভাবিক হইয়া উঠিল।

নীলিমা পাঁপর নিমকি তৈয়ারি করিয়াছিল; স্বামীকে খাবার ও চা খাওয়াইয়া বলিল, বেড়িয়ে এস দেখি একটু। আজ বর্ষার ওজর পেয়ে সারাদিন বইয়ে আর মুখে ব'সে আছ।

সৌরীন্দ্র আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, উঁহু, আবার বৃষ্টি আসবে।

—না, আসবে না। আসে তো না হয় ছুটে বাড়ী চ'লে আসবে, বেশ একটু একসারসাইজ হবে।...না ভারী কুঁড়ে তুমি, শরীরের ওপর একটুও নজর দেবে না। ওঠ বলছি, ওঠ।

অগত্যা সৌরীন্দ্রকে উঠিতে হইল। কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া সে বাহির হইয়া গেল। নীলিমা স্তব্ধ পরিতৃপ্ত মুখে জানালা দিয়া স্বামীর গমনপথের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, আপনার ভাগ্য-গৌরবের তৃপ্তি যেন তাহার অন্তরে আর ধরিতেছে না, কূল ছাপাইয়া অধরের তটভূমিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সহসা সে চকিত হইয়া উঠিল। এ কি, সৌরীন্দ্র দ্রুতগতিতে ফিরিয়া আসিতেছে কেন? সে তাড়াতাড়ি সব ফেলিয়া দরজার মুখে আগাইয়া গেল।

সৌরীন্দ্র দরজার মুখ হইতেই বলিল, You naughty girl, make haste—make haste!

—কি? Make haste কেন? কথার সুরে আশ্বস্ত হইয়াও নীলিমা বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিল, Make haste কেন?

—Lake—Lake; লেকটা নাকি ভ'রে উঠে কূলের ওপর ছাপিয়ে উঠেছে। Make haste—কাপড় জামা পাল্টে নাও। চল, বেড়িয়ে আসি।

—এই দেখ, পাগলের মত খেয়াল দেখ! বাড়ীতে কত কাজ রয়েছে বল তো? আমার কি বেড়াতে গেলে চলে?

—নি-শ্চয় চলে। আজ না হয় রান্নাবান্না হবেই না। তাতে আপত্তি থাকলে—ফিরে এসে একজনের কাজ দুজনে ক'রে নেব।

নীলিমা খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, লঙ্কা বাঁটতে হবে কিন্তু।

—তাতেই রাজি। কিন্তু তুমি চটপট কর দেখি।

নীলিমা আর আপত্তি করিল না, স্বামীর এ আগ্রহ দেখিয়া তাহারও অন্তর যেন স্বামীর সঙ্গে যাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি কাপড়-চোপড় পাল্টাইয়া ফিরিয়া আসিল। সে পরিয়াছিল অত্যন্ত সাদাসিধে একখানি ছাই রঙের লালপাড় ঢাকাই শাড়ি, ব্লাউসের রঙটা ছিল—ঘন নীল। পায়ে একজোড়া অল্প উঁচু-হিল চামড়ার ফিতা-বাঁধা জুতা।

সৌরীন্দ্র দেখিয়া শুনিয়া বলিল, নাঃ, এ পোষাক তোমার ভাল হ'ল না। একখানা ভাল শাড়ি পরলে না কেন? এই কাল যেখানা এনেছি।

—না, এই বেশ ভাল হয়েছে। ও প্রজাপতির মত রঙ-চঙ আমি ভালবাসি না।

রাস্তায় আসিয়াই সৌরীন্দ্র চলন্ত একখানা ট্যাক্সিকে ডাকিল, এই ট্যাক্সি!

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নীলিমা বলিল, ট্যাক্সি কেন? এই তো লেক দশ মিনিটের রাস্তা, দিব্যি—

—না। সব তাতে আপত্তি তোমার আমি শুনব না।

ট্যাক্সিটা আসিয়া পড়িয়াছিল, বাদানুবাদ এ ক্ষেত্রে অশোভন হইবে বিবেচনা করিয়া নীলিমা আর আপত্তি করিল না।

সত্যই লেকটা ভরিয়া উঠিয়াছে কানায় কানায়।

চারিদিকে ভ্রমণবিলাসীর ভিড়ে যেন একটা উৎসবক্ষেত্র সাজিয়া উঠিয়াছে। উপরের জনসমারোহের ছবি লেকের নিস্তরঙ্গ জলতলে প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠিয়াছে প্রবালপুরীর দৃশ্যের মত। ইউরোপীয়ান রোয়িং ক্লাবের প্রাঙ্গণে লাউড-স্পীকারের সাহায্যে গ্রামোফোন-রেকর্ডে বিলাতী অর্কেস্ট্রা বাজিতেছে। রাস্তার উপর দিয়া নূতন ঝকঝকে মোটর ঝড়ের গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। ফিরিওয়ালার গান, চীৎকার, কূলের উপর মানুষের ভিড়। কোথাও একটু বসিবার আসন খালি নাই। ঘাস এখনও ভিজা, সেখানেও বসা চলে না। খানিকটা বেড়াইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে তাহাদের ভাগ্যে একখানা আসন মিলিল।

বসিয়া অনুযোগের সুরে নীলিমা বলিল, এমন তোমার খেয়াল বাবু, খামখেয়াল! দিব্যি বাড়ী গেলেই হ'ত, না, চাঁদ ওঠা পর্য্যন্ত থাকতে হবে!

একটু দূরে বসিয়া আর একটি দম্পতি;—মহার্ঘ অলঙ্কারে ভূষিতা দামী বেনারসী সুটে সজ্জিতা নীলিমার বয়সীই একটি স্থূলাঙ্গী মহিলা ও তাহার পাশে খাকী হ্যাফপ্যান্ট সাদা শার্ট পরিয়া তাহার স্বামী মৃদুস্বরে গল্প করিতেছে।

নীলিমা মেয়েটির দেহ ও পোষাকের বহর দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল। ওদিকের মেয়েটি বোধ হয় তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল, সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নীলিমার দিকে চাহিল। নীলিমা কিন্তু হাসিয়াই লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল, সে মুখ ফিরাইয়া লইল ইচ্ছা করিয়াই।

ওদিকের মেয়েটি কিন্তু ছাড়িবার পাত্রী নয়, সে গম্ভীরভাবে বলিল, শুনুন।

নীলিমা গভীর মনোযোগের সহিত লেকের জলের দিকে আঙুল দেখাইয়া সৌরীন্দ্রকে বলিল, আচ্ছা, কতটা জল হবে বল তো?

সৌরীন্দ্র হাসিল, কয়েকজনই ইতিমধ্যে মাপবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ফিরে আসেন নি কেউ।

—শুনছেন!—ওপাশের মেয়েটি কিন্তু তখনও ছাড়ে নাই।

নীলিমা এবার মুখ ফিরাইয়া বলিল, আমাকে বলছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি—। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নীলিমার দিকে চাহিয়া মেয়েটি কথাটা ঘুরাইয়া লইল, বলিল, আপনার নামটি জানতে পারি কি?

—কেন বলুন তো?

এবার মেয়েটি হাসিয়া বলিল, আলাপ করতে ইচ্ছা করছে আপনার সঙ্গে। মানে আপনাকে বেশ ভাল লাগছে আমার, আমার মত বিশ্রী মোটা নন তো আপনি। কেমন নীলিমা-নীলিমা চেহারা আপনার।

নীলিমা ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া গেল, মেয়েটি তাহার নাম পর্য্যন্ত বলিয়া দিল, আর সে চিনি চিনি করিয়াও চিনিতে পারিতেছে না, অথচ সে যে চেনা মানুষ তাহাতে আর ভুল নাই। দুই দিকে দুইজনের স্বামীদ্বয়ও বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল। ফিস ফিস করিয়া উভয়েই প্রশ্ন করিল, কে বল তো?

স্মৃতির সাগর মন্থন করিয়া অকস্মাৎ হারানো মানুষকে বুকে করিয়া যেন নীলিমা ভাসিয়া উঠিল। আসন ছাড়িয়া একেবারে সে মেয়েটির কাছে আসিয়া বলিল, অতসী।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এই কুপোই আপনার সখী অতসী।

* * *

বাস্তব এমনই করিয়াই কল্পনার চেয়েও বিস্ময়কর বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পর দুই সখীতে দেখা হইয়া গেল। অথচ দেখা হইবার সম্ভাবনাও কেহ কোন দিন কল্পনা করে নাই।

পশ্চিমের একটি বড় শহরে পাশাপাশি বাড়ীতে অতসী ও নীলিমা পাঁচ হইতে পনের বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাস করিয়াছে, এমন কি একসঙ্গে মানুষ হইয়াছে এমন কথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

নীলিমার বাপ ছিলেন একটি বড় ইন্সিওরেন্সের একজন প্রধান এজেন্ট, সমগ্র বেহার প্রদেশটার তিনি ছিলেন চীফ এজেন্ট। উপার্জ্জনও ছিল প্রচুর। এই সময়েই তাহার পাশের বাড়িতে শহরের একটা প্রধান স্কুলের হেডমাস্টাররূপে আসিয়া বাসা গাড়িলেন অতসীর বাপ। পাঁচ বৎসরের দুইটি মেয়ে একসঙ্গে মিলিত হইয়া দিন কয়েকের মধ্যেই দুই বাড়ীর মধ্যে একটা সমারোহ জুড়িয়া দিল। নীলিমার পুতুল-কন্যার সহিত অতসীর পুতুল-পুত্রের বিবাহ। নীলিমার বাপ যেমন উপার্জ্জন করিতেন, খরচও করিতেন তেমনই, তাঁহার পাঁচ বৎসরের মেয়েটি সে সংবাদটি জানিত বোধ হয় সর্ব্বলের চেয়ে বেশী। সে ধরিল, বাবা, আমার মেয়ের বিয়ে।

বাবা হাসিয়া বলিলেন, বল কি মা? মেয়ের বিয়ে যে ভীষণ ব্যাপার, তা আমায় কি করতে হবে?

কি করিতে হইবে সে কথা পরিষ্কার করিয়া বলিতে মেয়ে পারিল না, বাপ নিজেই সমস্ত পরিষ্কার করিয়া বুঝিয়া লইলেন এবং ব্যবস্থা করিলেন।

কন্যার হাত ধরিয়া অতসীর পিতার নিকট গিয়া বলিলেন, আমার এই মেয়েটির মেয়ের বিয়ে আপনার মেয়ের ছেলের সঙ্গে। বরযাত্রী তো যাবেনই, তবু শরীর খারাপ কি কাজের অজুহাতে যদি না যান, তাই বলতে এলাম। যেতেই হবে আপনাকে।

মাস্টার মানুষটি হা হা করিয়া প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তারপরই পরিচয়টা হইয়া উঠিল প্রগাঢ়। রাত্রি দশটার পর তাঁহাদের মজলিস বসিত। মেয়ে দুটিও নিজেদের মজলিস সদ্য ভাঙিয়া আপন আপন বাড়ি যাইত। মজলিসে আলোচনা হইত হরেক রকম; কিন্তু একটা মূল সুর ফল্গুধারার মত অহরহ প্রবহমান ছিল। সেটা ছিল, উঃ, অসহ্য হয়ে উঠেছে, এই কি জীবন?

মাস্টার বলিতেন, সেই একঘেয়ে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন আর সেই ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি রিপীটিং এভরি ইয়ার, এভরি ডে!

ইন্সিওরেন্স-এজেন্ট বলিতেন, যা বলেছেন মশাই, সেই এক গৎ মুখস্থ বলা আর আচণ্ডাল মানুষের তোষামোদ করা, লাইফ মিজারেব্‌ল হয়ে উঠেছে!

—না, আপনাদের লাইন অনেক ভাল। অনেক বৈচিত্র্য আছে। পয়সা আছে।

—গুড হেভেন্স, বলেন কি আপনি? বৈচিত্র্য? পয়সা? বোগাস্, অল বোগাস্!

মেয়ে দুইটি এদিকে একই সঙ্গে খেলা করিত, ক্রমে একই সঙ্গে একই স্কুলে ভর্ত্তি হইল। স্কুলের অন্য মেয়েরা ক্রমে তাহাদের নামকরণ করিল জোড় মাণিক। উভয়ে একই সঙ্গে ম্যাট্রিক ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িল; তখন তাহারা দুইজনেই পনেরোয় পা দিয়াছে। এই সময়ই অতসীর বাপ হুগলী জেলায় এক নামকরা স্কুলে অধিক বেতনে হেড-মাস্টারী পাইয়া এখান হইতে চলিয়া গেলেন।

অতসী নীলিমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়াছিল, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সপ্তাহে একখানা করিয়া পত্র দিবেই। ছয় মাস প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে বজায় ছিল, তাহার পরই পত্রের সংখ্যা কমিল। ক্রমে কমিতে কমিতে দেড় বৎসরের মধ্যেই পত্র দেওয়া একরূপ বন্ধই হইয়া গেল। তাহার পর পরস্পরের বিবাহ হইয়াছে, কেহ কোন খবর রাখে নাই।

সমস্ত স্মৃতিকথা বলা হইয়া গেলে সৌরীন্দ্রই হাসিয়া বলিল, কবিরাই এঁদের চারিদিকে একটা মনোরম রহস্যের আবরণ মাখিয়ে দিয়েছেন। আসলে কিন্তু সব ভুয়ো। মেঘদূতের বিরহী যক্ষের স্ত্রী কখনও বিরহে কাতর হয়ে শীর্ণা হয়ে যান নি। তিনি তাঁকে ভুলেই গিয়েছিলেন, স্বর্ণ-বালুকণাময় নদীচরে নিশ্চয় তিনি কলরোল তুলে চেল ডিগ্ ডিগ্ খেলে বেড়াতেন সখীদের সঙ্গে!

তাহার কথায় অতসীর স্বামী মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল, বেশ বলেছেন মশায়। খাঁটি সত্য কথা।

অতসী কুপিত হইয়া বলিল, বেশ গো মশায়। তা ব'লে আপনাদের মত নই আমরা। ষাট বৎসর বয়সে দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণের মত অপরাধ আমরা করতে পারি না।

নীলিমা পরম খুশি হইয়া বলিয়া উঠিল, Rightly served ! বেশ বলেছিস ভাই অতসী ! এই রকম কথা আমার মনেই পড়ে না কাজের সময়।

অতসী হাসিয়া বলিল, পণ্ডিত লোকের গিন্নী তুই ভাই, এ সব কোঁদলের কথা তুই জানবি কি ক'রে ? যাকগে, চল, এখন আমার বাড়ীতে চল। ডাক না গো, সোফারকে গাড়ী আনতে বল।

অতসীর স্বামী কন্ট্রাক্টার মানুষ, তিনি হিসাব নিকাশ, কুলী মজুর প্লান, ইঁট কাঠ লোহা যেমন বুঝেন, সাধারণ জীবনে তিনি তেমনই পঙ্গু। তিনি সচকিত হইয়া উঠিলেন, হ্যাঁ, গাড়ীটা ডাকা তো সত্যই উচিত হইয়াছে। তিনি একটু অগ্রসর হইয়া ডাকিলেন, এই হরকিষণ, গাড়ী লে আও !

অতসী নীলিমা ও সৌরীন্দ্রকে একেবারে আপন বাড়ীতে লইয়া গিয়া তুলিল। নিঃশব্দ সুবৃহৎ আরামপ্রদ গাড়ীখানা পিচের রাস্তার উপর লেকের বুকের নৌকার মতই যেন পিছলাইয়া চলিয়াছিল।

* * *

প্রকাণ্ড বড় বাড়ী। কন্ট্রাক্টারের নিজের বাড়ী, নানা নূতন কায়দায় বাড়ীখানিকে সুবিধা ও সৌন্দর্য্যের নিকেতন করিয়া গড়িয়া তোলা হইয়াছে। সৌরীন্দ্র মুগ্ধ হইয়া গেল, সপ্রশংস হাসি হাসিয়া বলিল, মিস্টার চ্যাটার্জীর রুচির আমি প্রশংসা করি। এ যেন মনে হচ্ছে, সাগরপারের কল্পলোকে এসে পড়েছি।

অতসী বলিয়া উঠিল, আজ্ঞে না অধ্যাপকপ্রবর, ও প্রশংসাটা ওঁর প্রাপ্য মোটেই নয়। ওটা প্রাপ্য ষোল আনা আমার। কন্ট্রাক্টার লোকে বাড়ীর খরচ থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে লাভ করতেই জানে, খরচ বাড়িয়ে বাড়ী ভাল করতে জানে না।

অতসীর স্বামী মিস্টার চ্যাটার্জী অপ্রতিভের মত হাসিয়া বলিল, প্রশংসাটা হয়তো সত্যই তোমার প্রাপ্য ; কিন্তু খরচ বাঁচানো এবং বাড়ানোর পরিমাপটা কি কথার ভঙ্গির মধ্যে অনেকটা বেশী বেড়ে যাচ্ছে না। ব্যাঙ্কের একটা অ্যাকাউণ্টে তোমার সই চলে, এবং সেটার হিসেব লাগে না কাউকে। কৃপণ অপবাদটা পরে দেয় দিক, কিন্তু তুমিও দেবে ? বিশেষ এঁদের সম্মুখে !

অতসী ইহাতেই একটু আহত হইল, সে বলিল, দাতাকর্ণ তুমি ! ব্যাঙ্কের অ্যাকাউণ্ট বলে টাকার পরিমাণটা তুমিও কি বড় ক'রে তুললে না ? ব্যাঙ্কও বটে, অ্যাকাউণ্টও বটে, কিন্তু টাকাটা কত শুনি ? শোন ভাই নীলি, আমাকে সংসার-খরচে, আমার হাত-খরচে মাসে তিনশ টাকা উনি দেন। টাকাটা ব্যাঙ্কে থাকে, তাই বলেন, একটা অ্যাকাউণ্টে আমার সই চলে।

সৌরীন্দ্র হাসিয়া বলিল, বেশ ! আমরা দুজনে এসে পড়লাম দেখছি নাটার ফলের মত। এ যে আপনারা দুজনে রীতিমত ঝগড়া সুরু ক'রে দিলেন।

অতসী বলিল, করব না। আপনারা অন্যায় বলবেন আর আমরা কেবল সহ্যই ক'রে যাব বুঝি ?

চ্যাটার্জী করুণভাবে বলিল, কথাটা তোমার অর্দ্ধসত্য হ'ল অতসী, অন্যায় মধ্যে মধ্যে ব'লে ফেলি, চামড়ার মুখ তো ; কিন্তু ওই সহ্যের কথাটা যা বললে, ওটা মিথ্যে, ওটাও সেই এই হতভাগ্যদেরই করতে হয়। কোনও কালেই সহ্য তোমরা কর না।

সৌরীন্দ্র হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, বড় ভাল বলছেন। বনে এক কালে বাঘ ছিল, সে

মানুষ খেত, সুতরাং বনে চিরকালই বাঘ আছে এবং মানুষ খায় এ অপবাদ বনের আর গেলই না। অথচ সুন্দরবনই অর্দ্ধেক সাফ হয়ে গেল।

অতসী বলিল, আপনি পণ্ডিত লোক আপনার সঙ্গে তর্কে কে পারবে বলুন! আমার যাঁর সঙ্গে কারবার, তিনি কুলি-মজুরের মালিক, ধমক দিয়ে কথা না বললে কানে কথা ঢোকেই না!

নীলিমা আপনার মনেই সব ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতেছিল, এই সব কথাবার্ত্তা তাহার কানে বড় প্রবেশ করিতেছিল না।

অতসী রাত্রে একটা ভোজ করিয়া ফেলিল। নীলিমা ও সৌরীন্দ্রকে খাওয়াইবার জন্য সেই রাত্রেই একেবারে খাস হগসাহেবের বাজার হইতে তিন চার রকমের মাছ, মাংস, বড় দোকান হইতে দই-মিষ্টি আনিবার জন্য মোটর পাঠাইয়া দিল।

নীলিমা বলিল, কেন ভাই অতী, এত সব হাঙ্গামা করছিস? যাই বলিস, তুই ভয়ানক খরচে।

চ্যাটার্জ্জী বলিলেন, খরচের কথা আমি বলছি না; আমি বলছি অনেক রাত্রি হবার সম্ভাবনার কথা।

সৌরীন্দ্র কিন্তু অতসীকে সমর্থন করিয়া বলিল, আমার কিন্তু হাঙ্গামাতেও আপত্তি নেই, আর বেশী রাত্রি হ'লেও আপত্তি নেই। মানে, এ ক্ষেত্রে আমি সেই আদিম কালের ব্রাহ্মণ-সন্তান!

অতসী খুব খুশি হইল। সে নীলিমাকে টানিয়া লইয়া কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল। বলিল, উড়িষ্যাবাসী আমাদের মন্দ রাঁধেন না, তবু বরাত ক'রে দেখিয়ে শুনিয়ে ক'রে না নিলেই মুস্কিল বাধায়। আয়, ওঁরা দুজনে থাকুন। আমরা ভেতরে যাই।

চ্যাটার্জ্জী হাসিয়া বলিল, অতসী এই সবই বেশী ভালবাসে। একটা গোলমাল, সে আপনার অতিথি-সজ্জন নিয়ে হোক, বা ফিরিওয়ালার সঙ্গে ছিটের দর নিয়ে হোক, মোট কথা একটা হৈ চৈ তার চাই। ভেরি গুড গার্ল। নীলিমা দেবী দেখলাম, বড় শান্তপ্রকৃতির মানুষ!

সৌরীন্দ্রও হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ। অশান্ত হবার অবশ্য সুযোগও নেই, মানে, অবসর কোথায়? তার ওপর বাপ ছিলেন ভারী খরচে লোক, ইন্সিওরেন্সের এজেণ্ট ছিলেন, হৈ চৈ করাটাও ছিল তাঁর প্রকৃতিগত। ও কিন্তু আমার ভাগ্যগুণে পৈত্রিক দুটো গুণ বা দোষ যাই বলুন, একেবারেই পায় নি।

ভিতরে অতসী হৈ হৈ করিয়া নীলিমাকে লইয়া ঘুরিতেছিল। ঠাকুরের কাছে বসেই নাই, সে নীলিমাকে লইয়া সিঁড়ির কোলাপ্সিব্‌ল গেট হইতে জুয়েলারির বাক্স পর্য্যন্ত একটি একটি করিয়া দেখাইতেছিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর, পরদিন রাত্রে পাল্টা নিমন্ত্রণ দিয়া নীলিমা ও সৌরীন্দ্র বাড়ী ফিরিল।

অতসী নীলিমার বাড়ী দেখিয়া অবজ্ঞা এবং দুঃখ সত্ত্বেও বিস্মিত হইয়া গেল। বই—বই আর বই! আলমারির মধ্যে ঝকঝকে বই, ঘরের জানালার মাথায় কাঠের র‍্যাক লাগাইয়া তাহার উপর রাশি রাশি কাগজ, একটা বাক্স খুলিয়া নীলিমা আবার দেখাইল, এক বাক্স পুরানো পুঁথি! দেওয়ালে সভা-সমিতির ফোটো, তাহার অধিকাংশের ভিতরেই মাল্যশোভিত সৌরীন্দ্র সভাপতিরূপে বসিয়া আছে। অতসী দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। সে বলিল, বেশ আছিস ভাই। পণ্ডিতের স্ত্রী হয়ে তুইও পণ্ডিত হয়ে গেছিস! এবার তুই বি. এ. দিবি বলছিলি না?

নীলিমা বলিল, এক একবার ভাবি, দেব। আবার মনে হয়, কি হবে? সেই তো উনোনশাল আর বিছানা-পাড়া!

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অতসী বলিল, কেন, সে সব চাকর বাকরে করবে।

—বেশ! এতেই কুলায় না, তার ওপর চাকর। দেবতাটির আমার টিকিট খরচই মাসে কুড়ি পঁচিশ টাকা। দেশ বিদেশ, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মাজী, সার্ সি. ভি. রামন, ফ্রান্সে রোমা রঁ্যলা এই সব চিঠিপত্র চলছেই—চলছেই!

অতসীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না, বলিল, বলিস কি? কই, দেখি না ভাই, ওসব লোকের চিঠি! এ কি সাধারণ কথা রে!

নীলিমা একটি কাঠের সুদৃশ্য বাক্স খুলিয়া বড় বড় খাম বাহির করিয়া বসিল।

* * *

আকাশে মেঘ জমিয়া অপরাহ্ণটাকে চমৎকার ছায়াচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছিল।

অতসী বসিয়া কি যেন ভাবিতেছিল। চ্যাটার্জী কাজ হইতে ফিরিয়া বলিলেন, চল, আজ অনেক দূর বেড়িয়ে আসব।

অতসী বলিল, না। হৈ হৈ করতে আর ভাল লাগে না বাবু। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। রাত্রে সে বলিল, দেখ, আমাকে এক হাজার টাকা দিতে হবে।

চ্যাটার্জী শঙ্কিতভাবে চমকিয়া উঠিয়া বলিল, এখন যে টাকার বড় টানাটানি যাচ্ছে তু।

অতসী একটু ভাবিয়া বলিল, বেশ, আমি অনেকদিন থেকেই ভাবছি, জড়োয়া নেকলেসটা বেচব। ওইটেই বেচে দেব। বাড়ীতে একটা লাইব্রেরি না করলে লোকের বড় হীন ধারণা হয়। আমি একটা লাইব্রেরি করব।

চ্যাটার্জী হতভম্ব হইয়া গেল। অতসী বলিল, আমি কিন্তু প্রাইভেটে আই. এ. দেব। চ্যাটার্জী অবাক হইয়া স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অতসী তাহার মুখের ভাব দেখিয়া অকস্মাৎ রাগে যেন পাগল হইয়া গেল, বলিল, টাকাই চিনলে শুধু সংসারে। আর কিছু চিনলে না! ছি! ছি!

ঠিক সেই সময়েই সৌরীন্দ্র চায়ের জন্য অপেক্ষা করিয়া জানালার ধারে বসিয়া ছিল। আকাশে আবার মেঘ জমিয়াছে। নীলিমা চা ও জলখাবার আনিয়া টেবিলের উপর নামাইয়া দিল। টেবিলের একদিকে একটি নূতন বইয়ের প্যাকেট, সেটাকে টানিয়া লইয়া সে রূঢ়স্বরে বলিল, আবার আজ বই নিয়ে এলে তো?

সৌরীন্দ্র হাসিয়া বলিল, তোমার বি. এ.র কোর্স গো দেবী।

—ফিরিয়ে দিয়ে এস এগুলো।

—মানে?

—মানে, পরীক্ষা আমি দেব না।

—পরশু রাত্রে যে বললে?

—ঘাট হয়েছে। বলিয়া সে ক্রুদ্ধ পদক্ষেপেই চলিয়া যাইতেছিল, সহসা ফিরিয়া বলিল, কবি, সাহিত্যিক, পণ্ডিত—লোকগুলো এই জন্যেই চিরকাল না খেয়ে চরম দুর্দ্দশায় মরেছে!

সৌরীন্দ্র কথার অর্থ বুঝিল না, হতভম্ব হইয়া গেল। নীলিমা বলিল, নিজের একটা বাড়ী না, ঘর না, ভবিষ্যৎ বলতে সঞ্চয় না; কেবল বই—বই আর বই! ছি ছি ছি!

আকাশে ঝিকমিক করিয়া একটা আঁকাবাঁকা বিদ্যুৎরেখা খেলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে কড় কড় করিয়া মেঘের ডাক, সৌরীন্দ্রের মনে হইল, কে যেন অট্টহাসি হাসিতেছে।



ষষ্ঠী পূজা

শিল্পী—শ্রীসমর ঘোষ

শঙ্খ

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

যেথা চিরক্রন্দিত সিন্ধুর তলে
বঞ্চিতদের সঞ্চয় চলে
শত শতাব্দ নিঃশব্দের
মন্থিত হৃৎ-পঙ্ক,
সেথা সে নিভৃতে ঘনান্ধকারে
সুরলক্ষ্মীর বন্ধনাগারে
অশ্রুভাণ্ডের অতলান্তিকে
জন্মেছি আমি শঙ্খ।

*

আজি প্রশান্ত মধু-সন্ধ্যায়
কে গো কল্যাণি বাজাও আমায়
তুলিয়া দু'খানি বর্ত্তুল পাণি
শোভিত শুভ্র বলয়ে ?
উন্মুখ মুখ-মারুতের ঘায়ে
তুলিছ এ বুকে সাগর জাগায়ে !
বিদ্যুৎসম মনে পড়ে মম
মন্থনদিন-প্রলয়ে—

নীলকণ্ঠের অট্টহাস্যে
উঠেছিনু আমি শঙ্খ
অসংখ্য মূক-শঙ্কিতে করি'
মুখরিত নিঃশঙ্ক।
থামায়ো না তবে, নামায়ো না আর
ধ্বনিয়া আমারে তোল' বারবার
তুমুল হউক আহ্বান তব
মরণে করুক ধন্য।
অয়ি কল্যাণি, কুটীর-কন্যা
মুক্ত করো গো বেদনবন্যা,
পার্থের রথে কুরুক্ষেত্রে
বাজুক পাঞ্চজন্য।
সন্ধ্যা ঘনায় মুদ্রিত প্রায়
পদ্মযোনির পদ্ম—
চক্রপাণির চক্রের ডরে
রজনী খুঁজিছে ছদ্ম !

মানুষের মীন্‌নেস

সম্বুদ্ধ

প্রসিদ্ধ শিকারী ৺কান্তি চৌধুরীর একটি কাহিনী আপনাদের শুনাইতেছি।

কান্তি চৌধুরী বলিলেন :

শিকারীকে সব রকম বিপদের জন্যে তৈরি থাকতে হয়, বিপদ আগে থেকে জানান দিয়ে আসে না, সত্যিকার বিপদ আসে হঠাৎ। সেই সময় যে মাথা স্থির রেখে চলতে পারে, সেই বাঁচে; না পারলে নিশ্চিত মৃত্যু।

আমাদের দেশে একটা চলতি কথা আছে, রোজাকে বাগে পেলে ভূতে ছেড়ে কথা কয় না। জানোয়ারদেরও তাই। শিকারী যেমন তাদের মারবে ব'লে তাকে তাকে থাকে, তারাও শিকারী দেখলেই চিনে নেয়, ও তাদের প্রায় একটা ইন্‌স্টিংক্‌টের মত। বাগে পেলেই তারা শিকারীকে আক্রমণ করে। শিকারীর প্রাণ ঝুলছে সূক্ষ্ম সুতোর ওপর,—চারিদিকে হুঁস রেখে তাকে চলতে হয়, কখন যে কোন জিনিসটা কি ভাবে কাজে লেগে যায়, তার কিচ্ছু ঠিক নেই। এই ধর নেপালের সেই ভালুকের ব্যাপারটা।

হঠাৎ-বুদ্ধি খাটিয়ে আর একবার কি ভয়ানক বেঁচে গিয়েছিলাম, সেই গল্প বলি শোন।

বার্মার একটা জঙ্গল আমাদের কোম্পানি থেকে ইজারা নেওয়া হচ্ছিল। জায়গাটা আপার বার্মায়, মিচিনা থেকে কিছু দূরে। ওদিকটাতে বার্মা রেলওয়ের শেষ স্টেশনই মিচিনা, সেখানে নেমে আরও অনেকটা যেতে হয়।

হাজার দশেক একর নিয়ে বন, সেই বন মেপে জুপে চৌহদ্দি ঠিক ক'রে নিতে হবে, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কথাবার্ত্তা পাকা করতে হবে, কাঠ কাটাবার জন্যে লোকজন ঠিক করতে হবে, কাঠ কাটিয়ে কোন্ পথে চালান দেওয়া যায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে—সে এক এলাহি ব্যাপার। যাকে তাকে দিয়ে সে কাজ হয় না। তায় আবার জায়গাও খারাপ, না আছে লোকালয় না আছে পথঘাট, বনে ভর্ত্তি ময়াল সাপ হাতী আর বাঘ। জেনে শুনে সেই মৃত্যুপুরীতে কোন কর্ম্মচারী যেতে চায় না। শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হ'ল আমিই যাব।

আমরা বলিলাম, কিন্তু বার্মাতেও কি বাঘ আছে? রয়াল বেঙ্গল?

কান্তি চৌধুরী বলিলেন, রয়াল বেঙ্গল বল কাকে?

আমরা বলিলাম, কেন, বড় বাঘ যেগুলো।

কান্তি চৌধুরী বলিলেন, বড় বাঘ হ'লেই রয়েল বেঙ্গল হয় না। অবশ্য ভুলটা শুধু তোমাদের নয়, ও ভুল অনেকেই করে।

আমরা বলিলাম, তবে?

কান্তি চৌধুরী বলিলেন, বেশ, সেই কথাটাই তোমাদের আগে একটু ব'লে নিই। ভুল ধারণা থাকাটা কোন কাজের কথা নয়।

বলতে গেলে গোটা ভারতবর্ষই বাঘের দেশ। শায়াম চায়নাতেও বাঘ আছে, তবে সেগুলো এর কাছে কিছুই নয়। আফ্রিকায় বাঘ নেই।

ইণ্ডিয়াতে অনেক রকমের বাঘ পাওয়া যায়, তার মধ্যে মোটামুটি দুটো জাত—ডোরাদার আর বুটিদার। ডোরাদার বাঘরা দেখ্‌তে বড়, তাদের শক্তিও বেশি। বুটিদাররা ছোট, এদের চল্‌তি নাম চিতে; ইংরিজিতে বলে ল্যেপার্ড। চিতেবাঘ অনেক রকমের হয়। মানুষকে এরা বড় একটা ঘাঁটায় না, মাছ ছাগল ভেড়া গরু এই সব খায়। পোষা জন্তু মারতে সুবিধে হবে ব'লে চিতেরা অনেক সময় গ্রামের ভেতরে এসে বাসা করে। চিতেদের কোন কোন জাত বেশ গাছে চড়তে জানে, ইংরেজিতে তাদের বলে প্যান্থার। আমেরিকার জাগুয়ার এদেরই জাতভাই।

ডোরাদার বাঘদের ইংরিজি নাম টাইগার। টাইগারকে এক কথায় ভারতবর্ষেরই জীব বলা চলে। কাছাকাছি দুটো একটা জায়গা যেমন শায়াম, ইণ্ডোচীন, আর প্যাসিফিকের দুচারটে দ্বীপ ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও টাইগার নেই।

ইণ্ডিয়ান টাইগারদের ভেতরে দুটো গুষ্ঠি। একটা থাকে সমতল জায়গায়, এদের প্রধান আড্ডা হচ্ছে সুন্দরবন, মানে বরিশাল খুলনা চব্বিশ পরগণা এই তিন জেলার দক্ষিণ দিকে, বে অব্ বেঙ্গলের ধার ঘেঁষে। সেখানে জমি সাঁৎসেতে ভিজে, তার ওপর নলখাগড়া আর তারাগাছের জঙ্গল, সেই জঙ্গলে এদের বাস। ভিজে জায়গায় থাকে, তায় সমতল দেশ ব'লে লাফালাফি বেশি কর্‌তে হয় না, তাই এরা গায়ে খুব ভারী হয়। সাধারণত এদের স্বভাবও একটু আল্‌সে। কিন্তু শক্তি রাখে দারুণ, থাবার এক ঘায়ে একটা বড় ষাঁড়কে ঘায়েল ক'রে দিতে পারে। এদেরই নাম বাঘের রাজা—রয়াল বেঙ্গল টাইগার।

অন্য জাতটা থাকে পাহাড় অঞ্চলে। সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়ায়, জব্বলপুর হাজারিবাগের দিকে এদের দেখা যায়, কিন্তু এদের বড় আড্ডা হচ্ছে হিমালয়ের তলাকার জঙ্গলে। তার মানে ইউ. পি.র ওখান থেকে সুরু ক'রে হিমালয়ের রেঞ্জ ধ'রে পূবদিকে যদ্দুর যাও—নেপাল ভোটানের তরাই, আসাম আর বার্মার জঙ্গল, সব এদেরই রাজত্ব। আসাম আর বার্মার পাহাড়ও আসলে হিমালয়েরই দুটো ডাল কিনা। শায়াম আর আনামে যে বাঘ পাওয়া যায়, তারাও জাতে এদেরই জ্ঞাতিভাই, তবে তাদের আকার আর শক্তি দুইই এর চাইতে ঢের কম।

রয়াল বেঙ্গলের মত এই বাঘেরা গায়ে ভারী হয় না, এদের দেহ হালকা। পাহাড়ে পাহাড়ে ছোটাছুটি ক'রে ব'লে এদের গায়ে চর্বি বেশি জমতে পায় না। রয়ালের তুলনায় এরা চটপটেও ঢের বেশি। রয়াল গায়ের জোরে যা করে এরা সেটা ঐদিক দিয়ে পুষিয়ে নেয়।

দুটো যাতের চেহারাতেও তফাৎ আছে। রয়ালের মুখটা বেশি থোলো, রঙটা একটু বেশি লাল ঘেঁষা। পাহাড়ী বাঘের রঙে হলদের ছাঁটটা বেশি। তবে সে তফাৎ পাকা লোকের চোখে ছাড়া ধরা পড়ে না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গেও রঙের জেল্লা বদলে যায় কিনা।

যথাসময়ে আউটরাম ঘাটে গিয়ে জাহাজে চাপলাম। সঙ্গে চলল আমার চাকর বিশু, অফিসের এক দরোয়ান আর এক কেরানি। দরোয়ান অযোধ্যা সিং পুরোনো লোক। কেরানিটিকে আমি চিনতাম না, নতুন বহাল হয়েছে।

রেঙ্গুনে গিয়ে পৌঁছে নিলেম ডেকে নিলাম। তারপর কাগজপত্তর সব বুঝে নিয়ে রেলে চাপলাম।

রেঙ্গুন থেকে রেলে ক'রে মিচিনা। সেখান থেকে কতক হেঁটে, কতক ঘোড়ায় চেপে বনের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের এক সায়েব থাকে সেখানে, সে আমাদের রিসীভ ক'রে নিলে। বললে, রেঙ্গুন থেকেই সে টেলিগ্রাম পেয়েছে আমরা যাচ্ছি। তার বাড়ির কাছাকাছি একটা ছোট্ট বাংলোমতন আছে, অফিসার কেউ এলে থাকে। সেইটা আমাদের জন্য ছেড়ে দিলে।

পরদিন থেকে আমাদের কাজ সুরু হ'ল, সারাদিন বন্দুক ঘাড়ে ক'রে কুলি নিয়ে বনে বনে ঘুরি, মাপ জোপ দেখে দেখে পিলার গাড়ি, বা বাংলোয় ব'সে ব'সে কন্‌ট্রাক্টর আর কুলির সর্দারদের সঙ্গে দরদস্তুর ঠিক করি; রাতের বেলা দোর জানালা বন্ধ ক'রে দিয়ে ঘুমোই, আর মাঝে মাঝে যখন ঘুম ভাঙে দূর থেকে শেয়াল আর বাঘের ডাক শুনি।

এমনি ক'রে হপ্তা দুই কেটে গেল।

সায়েবটি ভারী কাজের লোক, আমাদের নানা ভাবেই সে সাহায্য করছিল। কাজও এগোচ্ছিল চমৎকার। সেদিক থেকে অসুবিধে কিছুই নেই, তবু যাবার পর থেকেই একটা ব্যাপারে বড্ড মুস্কিল বাধিয়ে তুললে।

প্রথম যে দিন গিয়ে পৌঁছেছি তার পর দিন সকালবেলার কথা।

বন দেখতে বেরোব, তার আগে বাংলোর বারান্দায় ব'সে ফরেস্টার সায়েবের সঙ্গে চা খাচ্ছি আর কাগজপত্র দেখছি। এর মধ্যে দুটো মেয়ে এসে বাংলোয় ঢুকল। সেই দেশী মেয়ে বয়স বেশি নয়, বেদেদের মত ঘাগরা পরনে। বললে, সায়েব কিছু খেতে দেবে? তোমাকে নাচ দেখাব।

আমি বললাম, নাচ দেখাতে হবে না বাপু, পয়সা নিয়ে যাও। ব'লে পয়সা দিতে যাচ্ছি, ফরেস্টার সায়েবটি বাধা দিলে। বললে, খবরদার অমন কাজটি ক'র না। ব'লে ধমকে মেয়ে দুটোকে ভাগিয়ে দিলে।

আমি বললাম, গরীব মানুষ, দুটো পয়সা দিতাম। তাড়িয়ে দিলে কেন?

সে বললে, তুমি এদের জান না তো, ভয়ঙ্কর চীজ। প্রশ্রয় দিলে আর রক্ষে নেই।

আমি বললাম, কেন?

সায়েব বললে, এরা হচ্ছে এই দেশী যাযাবর বেদের জাত, দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। মেয়েগুলো ভিক্ষে করে, নাচ দেখায় আর সেই তাকে ঘুরে ঘুরে খবর যোগাড় করে। আসলে এদের পেশাই চুরি চামারি, তোমাদের ইণ্ডিয়াতে সব ক্রিমিনাল ট্রাইবরা আছে না? ঠিক তাদের মত। পয়সা আছে জানলে রাত্রে এসে খুন ক'রে যাবে তোমাকে। এদের কক্ষণো পয়সা কড়ি দেবে না, বাংলোর ত্রিসীমানায় আস্‌তে দেবে না।

বিশু বললে, এই তো কাছেই বনের মধ্যে ওদের তাঁবু। অনেক লোক, ষাট পঁয়ষট্টি জন হবে, ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ সব রকম আছে দেখলাম।

আমি বললাম, যাক, আবার এলে তাড়িয়ে দিস্।

সত্যি ছুদিন না যেতে চুরি আরম্ভ হ'ল। চান ক'রে এসে জামা পরব, সোনার বোতামটা উধাও হয়েছে। আতিপাতি ক'রে খুঁজলাম, বৃথা। বিশু বললে, ঠিক ঐ বেদেদের কম্ম। সেদিন শার্ট গায়ে বারান্দায় বসেছিলেন তখন বোতাম দেখে গেছে, আজ ভোরে ঢুকে চুরি করেছে।

অসম্ভব নয়। আমরা চারটি মোটে প্রাণী, যে যার কাজ নিয়ে থাকি। চোরের পাহারা তো দেয় না কেউ। আশেপাশে আর জনমানব নেই, ওরা ছাড়া চুরি করবেই বা কে।

সায়েবকে বললাম। সায়েব বললে, তখনই বলেছি। এবার থেকে সাবধান থাক্‌বেন।

আমি বললাম, সে তো যেন থাক্‌লাম। কিন্তু বোতামটা?

সায়েব বললে, ও গেছে। এদের হাতে জিনিস গেলে স্বয়ং পরমেশ্বরের সাধ্য নেই খুঁজে বার করেন।

আমি বললাম, তবু তো একটা চেষ্টা করা যায়।

সায়েব বললে, কর্‌বে কে? আমার এদের সার্চ বা অ্যারেস্ট করার রাইট্ নেই, সে রাইট্ পুলিসের। পুলিস থাকে বহু দূরে—শহরে।

আমি বললাম, তুমি কিছুই করতে পার না?

সায়েব বললে, আমি পারি এক জায়গা থেকে তাড়িয়ে দিতে, তাও যদি গাছ কাটে বা হরিণ মারে তবেই। তা যতক্ষণ না করছে কিচ্ছু করার সাধ্য নেই।

ভাল কথা।

চুরি চলতে লাগল। আজ পেপার-ওয়েট যায়, কাল যায় ছুরি হারিয়ে, তার পরদিন যায় সাবান। সায়েবকে বললাম, এ তো মহা বিপদ দেখছি।

সায়েব বললে, টুকিটাকি জিনিসের ওপর ওদের ভয়ানক লোভ। বুনো জাত কিনা।

সে তো বুঝলাম। কিন্তু সেই অজবনের মধ্যে জিনিস হারালে পাই কোথায় বল তো? মহা সাবধান হয়ে থাকি, তবু কিছু হয় না, যা যাবার যায়ই। লোক দেখি না অথচ চুরি হয়, যেন মন্তরের খেলা।

এমনি ক'রে দিন কাটতে লাগল।

সেদিনটা ভয়ানক খেটেছি। সকালে আটটা না বাজতে বেরিয়ে গেছি, সারাটি দিনই কেটেছে পায়ের ওপর।

ফেরার পথে আবার ফরেস্টার সায়েবের ওখানে হয়ে বাংলোয় এসে যখন পৌঁছলাম তখন ন'টা বেজে গেছে।

বাংলোয় ঢুকেই শুনলাম ভেতরে একটা তুমুল ঝগড়া চেঁচামেচি চলেছে, অযোধ্যা সিং দরোয়ান আর কেরানিতে। বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু শুনতে চেষ্টা করলাম। শুনলাম দরোয়ান বলছে, সায়েব এলে আজ আমি সব কথা ব'লে দেব।

কেরানি চড়া গলায় বললে, যা না শালা, বল গে যা তোর বাবাকে।

দরোয়ান বললে, খবরদার বলছি গাল দেবে না। খুব তো ফটং ফটং কর্‌ছ, এস আবার মাসকাবারে ধার চাইতে। খাইয়ে দেব তখন।

কেরানি বললে, তবে রে শালা পাজি।

এর পরে আর চুপ ক'রে থাকা যায় না। গলা খাঁকারি দিয়ে ডাকলাম, বিশু।

আমার আওয়াজ পেয়ে ঝগড়া থেমে গেল। বিশু বেরিয়ে এল। আমি বললাম, ওটা কি হচ্ছিল?

বিশু বললে, ও তো রোজই হচ্ছে। দুটোই সমান, সারাদিনই ঐ চলে।

আমি বললাম, বল—আমি ডাকছি।

দুটিতে এসে আমার সামনে দাঁড়াল। দরোয়ান রাগে ফুলছে। কেরানি ভিজে বেরালটি, মুখে কথা নেই। সত্যি বলতে, এর আগে আমি লোকটাকে বিশেষ চেয়ে দেখি নি। এখন তার দিকে ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখলাম, যেটুকু চেহারা চোখে পড়ল, তাইতেই আমার অভক্তি ধ'রে গেল। রোগা প্যাঁশুটে চেহারাটি, অথচ বাবুগিরির সখটুকুন্ আছে, চুলে ঢেউ-খেলানো টেরি; হাবা-গোবা মুখ কিন্তু চোখ দুটো সব সময়ে টুলটুল করছে যেন ভয়ানক নার্ভাস—এই ধরণের লোকগুলো বড্ড ছিঁচকে হয়।

একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আমি বললাম, কিসের ঝগড়া হচ্ছিল?

দরোয়ান সেলাম ঠুকে বললে, সায়েব, আপনি বিচার করুন, রসুই ঘরে আস্ত এক টিন ভর্ত্তি চিনি রেখেছি, তার আদ্ধেকের বেশি কেরানিবাবু চুরি ক'রে খেয়ে দিয়েছে।

কেরানি হাঁউমাউখাউ ক'রে বললে, আজ্ঞে না স্যর, খাই নি। সব ঐ শালার বানানো।

আমি ধমকে বললাম, চুপ করুন। সুপিরিয়ারের সামনে এই ভাষা বলতে আপনার লজ্জা হ'ল না?

দরোয়ান বললে, আপনি নিজে দেখবেন সায়েব, ভাঁড়ারের ঘি মশলা মিষ্টি কিচ্ছু থাকে না, সব চুরি ক'রে ক'রে খায়। বড়ী তাজ্জবকী বাত।

কেরানি বললে, না স্যর, আমি স্যর ভদ্দরলোকের ছেলে স্যর, ওর কথায় আপনি বিশ্বাস করবেন না। আপনাকে বলছি আমি যদি স্যর খেয়ে থাকি, তবে আমি কায়েতের ছেলে নই।

আমি বললাম, থাক হয়েছে। আপনি অফিস স্টাফ্ আর ও দরোয়ান, আপনি ওর সঙ্গে সমানে ঝগড়া গালিগালাজ করতে যান কি ব'লে? যে অফিসে আপনি চাকরি করেন, তার একটা ডিগ্‌নিটি নেই?

সে বললে, না স্যর, আমি গালিগালাজ করি নি।

আমি বললাম, মিথ্যে কথা ব'লে লাভ নেই, একটু আগেই আমি নিজে শুনেছি। ভদ্রলোক কায়েতের ছেলে হয়ে আপনি ইতর ছোটলোকের মত দিব্যি গালেন, এ কী আপনার প্রবৃত্তি! ডিজ্‌গ্রেস! ফের যেন আমার কানে এসব না আসে।

দরোয়ানকে বললাম, তোমার যা নালিশ থাকে আমাকে বলবে। তুমি কেন তোমার অফিসারের সঙ্গে ঝগড়া করতে যাও? ফের অমন হ'লে আমি তোমাকে ডিসমিস ক'রে দেব।

দুটোতেই গজগজ করতে লাগল।

সারাদিন খাটুনির পর আবার এই উৎপাত, মাথাটাই গরম হয়ে গেল সেদিন। ঘুম আর পায় না, খাওয়া দাওয়া সেরে অনেক রাত অবধি বাইরে ব'সে ব'সে বই প'ড়ে কাটালাম।

বিশু আমার ঘরে জলটল দিয়ে মশারি ফেলে দিয়ে গেল। তখন হঠাৎ বললে, দরোয়ান মিছে বলে নি। কেরানিবাবুর একটু হাতটান অভ্যেস আছে।

আমি বললাম, যাঃ।

সে বললে, সত্যি। আপনার চায়ের বিস্কুট পর্য্যন্ত চুরি ক'রে খায়। আমি নিজে দেখেছি।

আমি বললাম, যদি খেয়েই থাকে একদিন, কি হয়েছে? খিদে পেয়েছে, খেয়েছে। এসেছিস বিদেশে বিভুঁয়ে, কোথায় মিলে মিশে সব থাকবি, না খালি ঝগড়া আর খেয়োখেয়ি। বকাস্ নি এখন, যা।

পরদিন খুব ভোরে আমার বেরোবার কথা। কিন্তু অনেক রাত ক'রে শোয়ার ফলে ঘুমই ভাঙল সাতটায়। তাড়াতাড়ি ক'রে মুখ হাত ধুয়ে কিছু খাবার নাকে মুখে গুঁজে নিয়ে পোষাক পরলাম। দারোয়ানকে বললাম, তৈরি হয়ে নাও, সঙ্গে যাবে।

সে বন্দুক কিরিচ বেঁধে নিলে। বন্দুক ছাড়া এ পথে এক পা চলা যায় না। আমি বিশুকে বললাম, আমার বন্দুক?

বিশু বললে, ঐ তো র‍্যাকে। দেখে নিন।

আমি বললাম, কেন, টোটা ভরিস নি?

সে বললে, তা ভরেছি। তবু একবার দেখে নেওয়া ভাল।

সে কথা ঠিক, সাবধানের মার নেই। বন্দুক ভেঙে দেখলাম দুটি ঘরেই কার্ট্রিজ পোরা আছে।

বেরোচ্ছি, দেখি বাংলোর ঠিক বাইরে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে কেরানিটি, সেদিনের সেই বেদে মেয়ে দুটোর সঙ্গে ফিস্‌ফিসিয়ে কথা কইছে। আমাকে দেখেই তারা একটু যেন কেমন হয়ে গেল। কেরানি ঘুরে দাঁড়াল। মেয়ে দুটো স'রে পড়ল। আমার তখন এসব দিকে তাকাবার সময় নেই, আমি ভাল ক'রে এদের লক্ষ্যও করলাম না তখন, সোজা বেরিয়ে গেলাম।

দিনের কাজ সেরে যখন বাড়িমুখো হলাম তখন বেলা দুপুর পেরিয়ে গেছে। খিদে পেয়েছে দারুন, দুজনেই যথাসম্ভব তাতাতাড়ি পা ফেলে চলেছি। আগে আগে আমি, পেছনে দরোয়ান।

পাহাড়ে জায়গা, জমি সেখানে উঁচুনীচু। এক জায়গায় রাস্তাটা একটা মস্ত টিলার গা বেয়ে উঠে আবার নীচে নেমে গেছে। রাস্তার একদিকে খাড়া পাহাড়ের গা, আর অন্যদিকে বোধ হয় ধ্বস নেমে পাহাড় ভেঙে পড়েছে, সেখানটা প্রায় হাজার ফুট খাড়া খড্। পা ফসকে তার ভেতরে পড়্‌লে আর রক্ষে নেই।

সাবধানে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে দুজনে এগোচ্ছি।

রাস্তার মাথায় উঠতে তখন অল্প বাকি, হঠাৎ একটা বোট্‌কা গন্ধ নাকে এল। দাঁড়িয়ে পড়লাম। দরোয়ানও আমার পাশে এসে থামল। বললে, উঃ, কিসের বিশ্রী গন্ধ, সায়েব?

বললাল, বাঘ।

দরোয়ান ঘাব্‌ড়ে গেল। বললে, রাম রাম, সে কি কথা?

আমি বললাম, কথা ঠিকই, এ গন্ধ ভুল হয় না। কিন্তু দিনদুপুরে পথের মাঝখানে বাঘ ব'সে কি করছে ?

দরোয়ান বললে, এখন উপায় ?

আমি বললাম, উপায় আর কি, যে ভাবে হোক যেতেই হবে পথ ক'রে। এক কাজ কর, বন্দুকের একটা ফাঁকা আওয়াজ ক'রে দাও। আওয়াজ শুনলে খুব সম্ভব বাঘ স'রে যাবে। আওয়াজ ক'রেই আবার গুলি ভ'রে নেবে কিন্তু।

কাঁধে ঝোলানো ছিল জলের ফ্ল্যাস্ক আর কাঁটাকম্পাশ, সেগুলোকে নামিয়ে রাখলাম, রেখে বন্দুক বাগিয়ে দাঁড়ালাম। পেছন থেকে দরোয়ান বন্দুক তুলে ফাঁকা আওয়াজ করলে।

আওয়াজ মিলিয়ে যেতে না যেতে সামনে পাহাড়ের গায়ে একটা ঝোপ ন'ড়ে উঠল ; তারপরই তার ভেতর থেকে বাঘ গর্জ্জন ক'রে রাস্তার ওপর লাফিয়ে পড়ল।

বন্দুকের আওয়াজ শুনলে বাঘ ভয় পেয়ে স'রে যায়, এই চিরকাল জানি। এ বেটা বোধ হয় সদ্য কোথাও তাড়া খেয়েছিল, ক্ষেপে রয়েছে। কিন্তু তখন আর লড়াই করা ছাড়া পথ নেই। দরোয়ানকে ডেকে বললাম, হুঁসিয়ার। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক তুলে সই ক'রে ঘোড়া টিপলাম।

খট্ ক'রে একটা শব্দ হ'ল শুধু। গুলি ছোটে নি। সর্ব্বনাশ। বাঘ আমার দিকে ফিরে তাকালে। তখন আর ভাববার সময় নেই ; আবার অন্য ঘোড়াটা টানলাম। আবার খট্ ক'রে শব্দ হ'ল। আর সঙ্গে সঙ্গেই বাঘ এসে আমার ওপর পড়্ল।

অনেকের ধারণা আছে, বাঘ আড়ি না ক'রে আক্রমণ করতে পারে না। সব বাজে কথা। আড়ি করার কোন ব্যাপারই নেই। বাঘের আক্রমণ একটা অদ্ভুত জিনিস, দেখবার মত দৃশ্য। বাতির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে নিলে একটা লম্বা আলোর লাইন চোখে পড়ে, দেখেছ ? বাঘের চার্জও কতকটা সেইরকমের। হলদে একটা আলোর রেখা যেন ছট্ ক'রে সামনের দিকে ছিট্‌কে চ'লে যায়, ভাল বোঝাই যায় না কি হ'ল—চোখ পালটাতে না পালটাতে বাঘ শিকারের ওপর এসে পড়ে।

এও তাই হ'ল, বন্দুক নামাতে না নামাতে বাঘ এসে আমাকে ধরলে। সোজা খাড়া হয়ে উঠে সামনের দুই থাবা আমার দুই কাঁধে দিয়ে দাঁড়ালে, তারপর সামনে ঠেলা দিয়ে আমাকে চিৎ ক'রে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল।

বাঘেরা অমনি ক'রেই মানুষ মারে—আমি জানতাম। চিৎ হয়ে প'ড়ে গেলে আর রক্ষে নেই, একদম বাঘের মুখের তলায়। প্রথম ধাক্কাতেই প্রায় পড়েছিলাম, বন্দুকটা মাঝখানে প'ড়ে বাঘকে একটু ঠেকিয়ে দিলে তাই বেঁচে গেলাম। পড়তে পড়তে এক পা পেছনে হ'টে গিয়ে টাল সামলে নিলাম, তারপর সুরু হ'ল দুজনে ঠেলাঠেলি। সেও আমাকে ঠেলে ফেলবে, আমিও তার ঠেলা স'য়ে দাঁড়িয়ে থাকব।

সাধারণ মানুষের চেয়ে আমার গায়ে জোর একটু বেশিই। তবু তার সঙ্গে পারা যায় না। ছ সাত মণ ওজন তার গায়ে, আর দুর্দ্দান্ত শক্তি—সেই ওজন দিয়ে সে আমাকে চাপ দিচ্ছে, সামলানো কি সোজা কথা। কোট শার্ট ফুঁড়ে আমার দুই কাঁধে তার নখ বিঁধে বসেছে, বেশ টের

পাচ্ছি কাঁধ ব'য়ে ঝরঝর ক'রে রক্ত পড়ছে। মাঝে মাঝে মুখ বাড়িয়ে আমার মুখ গলা কামড়াবার চেষ্টা করছে, আমি মাথা পেছনে সরিয়ে নিচ্ছি। বাঘের দুই রিস্ট্ আমি দু হাতে ধ'রে ঠেলা দিচ্ছি কাঁধটা যদি ছাড়ানো যায়—কিন্তু সে অসম্ভব ব্যাপার। একটা কিন্তু মজা দেখলাম, কাঁধ ব'য়ে রক্ত পড়ছে, মাংস কেটে তার নখ বসেছে স্পষ্ট টের পাচ্ছি, কিন্তু কাঁধে কোথাও ব্যথা লাগছে না, সমস্ত যেন কোকেন লেগে অবশ হয়ে গেছে। বাঘ সিংহের আক্রমণে এমন হয়—বইয়েও পড়েছি। হয়তো তখনকার মত একটা নার্ভাস প্যারালিসিস্ই হয়, না কি কে জানে!

সবচেয়ে বড় মুস্কিল হ'ল, পাথরের রাস্তা, জুতো আটকাতে পারি না, খালি পা হড়্কে যায়। বাঘ একটা ক'রে ঠেলা মারে, আর আমি এক পা দু পা ক'রে পেছন হটি—নইলে তাকে রাখা যায় না।

দরোয়ান ওদিকে পেছনে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। করবেই বা কি—হাতে বন্দুক থাক্‌তেও সে গুলি করতে পারছে না, বাঘ আর তার মাঝখানে আমি, গুলি লাগবে আমার গায়ে।

তবু সে যাত্রা আমার প্রাণ সেই বাঁচিয়ে দিলে। হঠাৎ চেঁচিয়ে বললে, হুঁসিয়ার, খড্। শুয়ে পড়ুন।

খড্! ওকথাটা মনেই ছিল না। তার চীৎকার কানে গিয়ে আচমকা মুখ ফিরিয়ে পেছনে চাইলাম। দেখি, হট্‌তে হট্‌তে রাস্তার প্রায় কিনারায় চ'লে এসেছি, হাত তিনচারেক পেছনেই খড্। আর কয়েক পা পেছলেই হয়ে গিয়েছিল, একদম খডের মধ্যে!

খডের মধ্যে! ভাবতেই হঠাৎ আরও একটা কথা মনে জেগে উঠল। লোকে শুনলে বলবে—পাগলামো, কিন্তু তখন আমার কেমন মনে হ'ল, এ ছাড়া বাঁচবার আর কোন উপায় নেই, এই শেষ ভরসা। আর সে সময় তখন সমীচীন অসমীচীন ভেবেই বা কি করব, প্রাণ তো যেতেই বসেছে।

পেছন থেকে আবার দরোয়ানের গলা কানে এল—শুয়ে পড়ুন। হঠাৎ মনে হ'ল যেন দরোয়ানের মুখ দিয়ে ভগবানই আমাকে ওকথা ব'লে দিলেন।

বাঘের দুই থাবা আমার দুহাতে ধরাই ছিল, গায়ে যতটুকু শক্তি ছিল একত্র ক'রে তাকে এক ধাক্কা মারলাম, থাবা একটু যেন কাঁধ থেকে আল্‌গা হয়ে গেল। যেতেই আমি বাঁ পাটা দুমড়ে চিৎ হ'য়ে শুয়ে পড়লাম। পড়তে পড়তে দুই হাতে বাঘকে দিলাম এক হ্যাঁচ্কা টান, আর সঙ্গে সঙ্গে ডান পা খানা তুলে বাঘের তলপেটে লাগিয়ে প্রাণপণ জোরে এক ঠেলা মারলাম।

বাঘ এ রকম আচমকা প্যাঁচের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে একেবারে উল্টো ডিগবাজি খেয়ে আমার মাথা ডিঙিয়ে সোজা খডের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে খডের কিনারায় ঝুঁকে প'ড়ে চেয়ে দেখলাম, বাঘ একেবারে সেই হাজার ফুট নীচে পাথরের ওপর আছড়ে প'ড়ে সারা হয়ে গেল।

দরোয়ান ছুটে কাছে এল। তার তখনও গলার স্বর কাঁপছে। বললে, সায়েব, এ কি কাণ্ড হ'ল? বড়ী তাজ্জবকী বাত! আমি বললাম, পরমাত্মা বাঁচালে কে মারে, বল?

দরোয়ান ঘাড় নেড়ে বললে, খুব ঠিক কথা।

সে যতটা অবাক হয়েছিল, আসলে কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই তত আশ্চর্য্য কিছু নয়। ওটা জুজুৎসুর একটা সোজা প্যাঁচ, ওকে বলে—স্টমাক্ থ্রো।

হাঁপিয়ে গিয়েছিলাম, সেইখানে ব'সে একটু জিরিয়ে নিলাম। বন্দুকটা তখনও মাটিতে প'ড়ে। দরোয়ান সেটাকে তুলে আনলে। বললে, গুলি চলল না কেন?

বললাম, সেইটেই আশ্চর্য্য লাগছে। আসবার আগের দিন টোটা কিনেছি। রডা কোম্পানির মাল তো খারাপ হবার কথা নয়। খোল তো বন্দুক।

দরোয়ান বন্দুক ভেঙে কার্ট্রিজ দুটো বার করলে। অবাক কাণ্ড! তাতে বারুদ গুলি কিচ্ছু নেই, দুটো খালি কার্ট্রিজের খোল শুধু বন্দুকে পোরা ছিল। আমার রক্ত চ'ড়ে গেল। বললাম, বাংলোয় চল, জল্‌দি।

এক রকম দৌড়েই দুজনে বাংলোয় এসে পৌঁছলাম। বিশুকে বললাম, আমার বন্দুকে গুলি তুই নিজে ভ'রে দিস নি?

সে বললে, আমিই তো ভরেছি, কাল রাত্রে। রোজ যেমন ভরি।

আমি বললাম, তারপর, আজ বন্দুক ধরেছিল কে?

বিশু বললে, সকালবেলা তো আপনাকে বললাম, বন্দুক দেখে নিন। কি হয়েছে?

আমি বললাম, দেখে মানুষ নেয় কার্ট্রিজ ভরা আছে কি না তাই। কার্ট্রিজ বার ক'রে দেখে না। কে ধরেছিল বন্দুক, তাই বল?

বিশু বললে, কেরানিবাবুকে একবার দেখেছিলাম বন্দুকের কাছে ঘুরঘুর করতে। তাইতেই আমার সন্দেহ হয়েছিল।

বললাম, ডাক তাকে।

কেরানি এল। তাকে বললাম, তুমি আমার বন্দুক ধরেছিলে কেন?

কি বুকের পাটা, বেমালুম ব'লে দিলে, কই, আমি তো ধরি নি।

বিশু বললে, ধরেছেন। আমি দেখেছি।

কেরানি খ্যাঁক্ ক'রে উঠল, তবে রে ব্যাটা পাজি, মিথ্যে নালিশ করছ। আমি স্যর ভদ্দলোকের ছেলে স্যর, আমি বন্দুক দিয়ে কি করব?

আমার আর সহ্য হ'ল না। তার চুলের মুঠি ধরে ঠাস ক'রে এক থাপ্পড় কষিয়ে বললাম, ফের ইতরামো! বল, কেন ধরেছিলে বন্দুক? কার্ট্রিজ বার ক'রে নিয়ে খালি খোল পুরে রেখে দিয়েছে, আমাকে খুন করবার মতলব?

সে ব্যাটা কথার জবাব দেয় না, খালি মোচড় খায় আর হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে। আমি একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, আজ মেরেই ফেলব তোমাকে। কি করেছ কার্ট্রিজ দিয়ে?

বলতেই সকালবেলার কথা মনে প'ড়ে গেল। বললাম, আমি যখন বেরোই, সেই বেদে মেয়েদের সঙ্গে তোমার অত কি কথা হচ্ছিল?

সে বললে, ভিক্ষে চাইতে এসেছিল স্যর, তাই তাড়িয়ে দিচ্ছিলাম।

দরোয়ান বললে, ভিক্ষে চাইতে এসেছিল, তাই তাদের সঙ্গে ফিস্‌ফিসিয়ে কথা বলছিলে? বড়ী তাজ্জবকী বাত।

আমি বললাম, বুঝেছি। কার্ট্রিজ চুরি ক'রে তাদের কাছে বেচেছ। ভেবেছিলে এক ঢিলে দুই পাখী মারবে, পয়সাও হ'ল আমিও মরলাম, কেমন?

সে তখনও গোঁ ছাড়বে না। হাউ হাউ ক'রে বললে, মিছে সন্দেহ করছেন আমাকে স্যর, এ সব দরোয়ানের কাজ। আপনাকে বলছি, আমি যদি স্যর ক'রে থাকি তবে আমি কায়েতের ছেলে নই।

আমি তার চুলে আর একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, চুপ। লোকটা এবারে বুঝলে তার পরিত্রাণ নেই। বুঝে সে হঠাৎ ক্ষেপে উঠল, ঘোঁৎ ঘোঁৎ কর্‌তে করতে দুই হাতে আমার হাতটাকে খিমচে ছ'ড়ে রক্তারক্তি ক'রে দিলে।

তারপরে আর ধৈর্য্য থাকে না। বিশু আর দরোয়ান ছুটে এল, বললে, আপনি ছেড়ে দিন সায়েব, আমরা দেখে নিচ্ছি।

আমি বললাম, না।

লোকটার মুখ দিয়ে তখন গাঁজলা ভাঙছে, দুই চোখ রক্তবর্ণ, পাগলের মত। দাঁত বার ক'রে বললে, বেশ করেছি। কেন আমাকে কাল গাল দিয়েছিলে?

আমি বললাম, সেই রাগে তুমি আমাকে খুন করতে চেয়েছিলে? নাও, এবার কর খুন। করলে না?

ব'লে ঠাস ঠাস ক'রে আর কয়েকটা চড় মারলাম, চড়ের চোটে সে মাটিতে শুয়ে পড়ল। তারপর লাথি মেরে মেরে তাকে বাংলো থেকে দূর ক'রে দিলাম। বললাম, থানা পুলিস করা আমার স্বভাব নয়। কিন্তু ফের যদি তোমাকে এখানে দেখতে পাই তো আর জ্যান্ত ফিরবে না, মনে রেখো।

সে আর কথাটি কইলে না, উঠে সুড়সুড় ক'রে স'রে পড়ল।

আমি দেশে ফিরলাম আরও মাসখানেক পরে। সে লোকটা দেশেই ফিরেছে, কি পথে তাকে বাঘেই খেয়েছে—ভগবান জানেন। কিন্তু ভেবে দেখ তো কী সাংঘাতিক ব্যাপার! বনের মধ্যে বাঘে তাড়া করবে এর মধ্যে আশ্চর্য্য কিছু নেই, সে জন্যে মানুষ তৈরিও থাকে। কিন্তু সময়কালে দেখা গেল বন্দুকে গুলি নেই, সত্যিকার বিপদ বলে এইটিকে। এইতেই মানুষ মারা পড়ে। সেইজন্যেই বলেছিলাম, মাথা কখনও হারাবে না, কখন কি উপায়ে প্রাণ বাঁচাতে হবে, তার কিচ্ছু ঠিক নেই। নইলে কবে কোন্ ছেলেবেলায় শিখেছিলাম জুজুৎসু, তখন কে জানত পঁচিশ বছর পরে সেই বিদ্যে এমন ক'রে কাজে লেগে যাবে।

নীলাবরণ

শ্রীসুরেশচন্দ্র সরকার

পাহাড়ের শুষ্ক শীত। দিগন্তে তপন।
দূর নীলাবরণের নিঃসঙ্গ চূড়ায় ব'সে ভাবি শুধু,
বিস্মৃত যুগের কাব্য এখানে কি মূর্তি ল'বে।
গ্রন্থ প'ড়ে কাটায়েছি দীর্ঘ রাত্রি, দীর্ঘ দিন।
বহুমতঘূর্ণাস্রোতে ভেসে ভেসে, অবশেষে
এ তীরে ঠেকেছি এসে।
স্বপ্নের দলিতাঞ্জনে এবার এ ক্লান্ত চোখ লভিবে কি শান্তি-অবলেপ,—
ফিরে যাব মানুষের শৈশবের বিস্মৃত প্রদোষে,—
মেঘনীল-গিরিবলয়িত, সংকীর্ণ স্বপ্নের দেশে,—
বর্বরের আদিম বিস্ময়ে।

ত্রস্ত চোখে চেয়ে দেখি সূর্য নামে অস্ত-পারাবারে;
নিঃশব্দচরণে আসে অন্ধকার,
সূর্য-চন্দ্র বিরহিতা, অনাথা সন্ধ্যাকে করে গ্রাস।

এখানে শরীরী স্বপ্ন। হেমন্তের শান্ত বায়ু
ভেষজলতার মৃদু গন্ধ বয়।
হেথা বন-কুক্কুটের কম্পমান প্রতিধ্বনি
সানুর সোপান বেয়ে পায়ে পায়ে দূরে চ'লে যায়।
হেথা শ্যাম দিক্-প্রান্তে আঁখি পায় অপার নীলিমা;
হেথা ঘনতর নীল শুয়ে আছে দিগন্তে পাহাড়,—
শিলীভূত বৃত্রদেহ সন্ধ্যাস্নিগ্ধ দূর মহিমায়;
তারি 'পরে ইন্দ্রাসনে কাঁপে ক্ষণ-স্তিমিত বিদ্যুৎ।

ওগো দূর পুরাতন! আজিকার নির্জন প্রদোষে
তোমার অস্ফুট ভাষা শুনি শান্ত, সুদূর তারায়;
পড়ি লেখা পশ্চিমের ম্রিয়মান বর্ণ আলিম্পনে
স্বপ্নলোক-নির্বাসিত কিন্নরের লুপ্ত ইতিহাস।

হে করুণ আদিযুগ ! হেথা তুমি কম্পমান রুদ্ধশ্বাস-স্পন্দিত ব্যথায়।
তোমারে খুঁজিয়া ফিরে মৃগয়ার নিষ্ঠুর ব্যসনে
বাষ্পতরী, বাষ্পরথ, বিষস্রাবী আয়স শকুন
উত্তরের 'তুন্দ্রা' হ'তে দক্ষিণের শ্যাম 'সাভানা'য়।

ওগো ত্রাসহতা ! জানি আমি কোথা শেষ এর !
একদিন এ নিভৃতে কুব্জপৃষ্ঠ মানুষের
ক্লান্ত অস্থিবেদনার নিরশ্রু কান্নার বিষে
যন্ত্রের উদ্গীর্ণ ধূমে নিরালোক নভোদেশ
সান্ত্বনা হারাবে। দীপ্ত, রূঢ়, বিদ্যুৎ-আলোকে
ম্লান দৃষ্টি, শীর্ণদেহ, পণ্ডিত পড়িবে বসি'
কালিদাস, ভবভূতি, বেদব্যাস, বাল্মীকি, হোমার।
—মনে কি জাগিবে ছবি অতীতের স্মৃতি সকরুণ :
এই শ্যাম বনরেখা, শৈলশ্রেণী—দূরতর, নীল,
অকলঙ্ক সন্ধ্যাকাশ, পায়ে-চলা দীর্ঘ প্রতিধ্বনি !
জ্যোতিহারা শ্রান্তচোখে দেখিবে কি বসি' বাতায়নে
সন্ধ্যাসূর্য অস্ত যায় মেঘ-তিরস্করণীর পারে
বিষবাষ্পসমাচ্ছন্ন, ধূলিধূমক্লিন্ন পশ্চিমের
শোণিতাক্ত কর্দ্দম-শয্যায় ?

যা হ'বার হবে জানি। প্রবাসের মুষ্টিমেয় দিনগুলি মোর
শান্তি পাক্, হে মুমূর্ষু ! তোমার করুণ স্নেহচ্ছায়ে।
সম্মুখে জীবন-স্রোত আশাহীন অকূল পাথার ;
তা'র মাঝে এ ক'দিন স্বপ্নদ্বীপে শুনি শান্ত গান।
দূর গৃহে সন্ধ্যা জ্বলে। সমাসন্ন রাত্রি-অন্ধকার।
দীর্ঘ পথ পার হ'য়ে ফিরে যাই প্রবাস-কুটীরে।

স্বপ্ন-কামনা

শ্রীসুশীল জানা

রাত তিনটের ট্রেনে সুজাতা এসে পৌঁছল। প্লাটফর্মে নীরেন এসে অপেক্ষা ক'রছিল প্রায় আধঘণ্টা আগে থেকে—তার সঙ্গে চোখো-চোখি হ'তে রহস্যময় চাপা হাসিতে সুজাতার আনন্দ-উচ্ছল অন্তরটি যেন উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল। প্লাটফর্ম থেকে বেরিয়ে এসে ওরা একটা ঘোড়ার গাড়ীতে উঠে ব'সল।

নীরেন হেসে ব'ললে, তুমি বেশ একটু মোটা হয়েছ দেখছি। পাশা-পাশি আগেও তো ব'সেছি, কোন অসুবিধে বোধ করি নি কিন্তু এখন কেমন জায়গা কম কম ব'লে মনে হচ্ছে।

ভ্রূকুটি ক'রে সুজাতা ব'ললে, খুঁড়তে আরম্ভ ক'রেছ যখন, দু'দিনেই শুকিয়ে যাব। তোমাকে অত রোগা দেখাচ্ছে কেন?

—বিরহে। নীরেন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ব'ললে, যাক দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই, আমার ক্ষতিটুকু পুষিয়ে নিয়ে যথার্থ অর্দ্ধাঙ্গিনীর কাজ ক'রেছ। যেটুকু বাকি আছে, সুমুখের সীটে ব'সে সেটুকু শেষ কর।

—আমি উঠব না তো। গাড়িটাই ছোট, তাই তোমার ওরকম ভুল মনে হ'চ্ছে।

—ভুল? তবে ভুলটা বেশ করুণভাবে উপলব্ধি করা গেল। আর না—

সুজাতার পাশ ছেড়ে নীরেনই উঠল।

কিন্তু হঠাৎ যেন ওরা এক লাফে ছেলেমানুষির দিনগুলিতে গিয়ে পৌঁছল। কৃত্রিম কলহ, ঠেলাঠেলি, শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু সুজাতাকে হারান গেল না; নীরেনের পাশে সে ব'সবেই। চব্বিশ বছরের সুজাতা আজ বহু দূর অতীতের আনন্দ-উচ্ছল ছেলেমানুষটির মত; ছিঁড়লই বা সুজাতার ব্লাউজ—ভাঙে, ভাঙুক নীরেনের রিষ্ট্‌ ওয়াচ্‌।

বিয়ে করেছে ওরা প্রায় এক বছর। দু'পক্ষ থেকেই সে বিয়েতে অভিভাবকদের কোন সম্মতিই ছিল না। নিজেদের নিরবলম্ব অবস্থা বেশ ভেবে চিন্তে দেখেও তবু ওরা বিয়ে ক'রেছে। তারপর সুজাতা চলে গেল একটা মফঃস্বল সহরে শিক্ষয়িত্রীর চাকরি নিয়ে আর নীরেন বড় কিছুর আশা ত্যাগ ক'রে কলকাতার মেসে পড়ে রইল ইন্‌সিওরেন্সের দালালী নিয়ে। এই ওদের প্রথম দীর্ঘ ছুটি। নীরেনকে সুজাতা লিখেছিল: হোষ্টেল থেকে সবাই চলে গিয়েছে, আমার ভাল লাগছে না এখানে। তোমার কাছে কবে যাব? তাই ছুটির দিনগুলি ওরা কাটাবার ব্যবস্থা ক'রেছে ভুবনেশ্বরে—তারপর তারা পুরীর সমুদ্র দেখে ফিরবে।

সুজাতা বেশ একটি একটি ক'রে গুছিয়ে ব'ললে, ইনসিওরেন্সের দালাল—ব'লেই সে খিল খিল ক'রে হেসে উঠল। দালাল কথাটায় তার ভারী হাসি পায়।

নীরেন গম্ভীর ভাবে সুজাতার অনুকরণে ব'ললে, নোয়াখালীর হেডমাষ্টারণী—ব'লে দাঁত বের ক'রে হাসবার চেষ্টা ক'রলে।

সুজাতা ব'ললে, পশ্চিমের দিকে বেড়াতে গেলে কি চমৎকার হ'তো বল তো।

—বটে! এক কাঁড়ি টাকার শ্রাদ্ধ না ক'রলে পশ্চিমে গিয়ে সমুদ্র দেখতে পেতে? আর স্বাস্থ্য? ও স্ত্রী সঙ্গে নিয়ে স্বর্গে গেলেও সুবিধে হবে না।

—থাক, আর দালালী করতে হবে না। ধমক দিলে সুজাতা, ব'ললে বাসা ঠিক ক'রে রেখেছ তো? তুমি এখানে কবে এলে?

—আজ সন্ধ্যের সময়। বাসাটি ভারী চমৎকার হয়েছে সু—উচ্ছসিত হ'য়ে নীরেন ব'ললে, খড়ের ছাউনি বাংলো—জানালা খুল্‌লেই পাহাড়ের চূড়ো…দূরের দিকে কত পাহাড়, সূর্য্য উঠলেই ঘরে রোদ…

—ফের দালালী। আজ সন্ধ্যের সময় তুমি তো সবে এলে। মিথ্যে কথা দেখছি মুখে আর আটকায় না।

নীরেন মুচকি হেসে ব'ললে, ভারী বিশ্রী বদ অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছে সু—মাঝে মাঝে আমাকে বেঞ্চির ওপরে দাঁড় করিয়ে দিও তো।

বাংলোয় এসে ওরা উঠলে। পাশা-পাশি দু'খানি ঘর—চারদিকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে কম্‌পাউণ্ড। নীরেন আলো নিয়ে সুজাতাকে দেখাতে যাচ্ছিল—সুজাতা ব'ললে, এখন থাক—ও সকালে দেখব, এখন একটু শুতে পারলে বাঁচি। ঘর ধোয়া নেই দেখ্‌ছি, খাটের ব্যবস্থা নেই?

—হুঁ, পালঙ্ক দেবে, গদী দেবে, জাজিম, ফরাস, চাই কি আলবোলা…

সুজাতা হেসে ব'ললে, দড়ির খাটিয়া একটা পড়ে আছে দেখছি। ওখানে কম্বল পাতা তোমার নিশ্চয়ই।

—হুঁ, ঘণ্টা 'কয়েক ওরই ওপরে আশ্রয় নিতে হ'য়েছিল। ওই খাটিয়াটুকু আদায় ক'রতে দারোয়ানকে কম খোসামোদ ক'রতে হ'য়েছে। যাক, কাপড়-চোপড় ছাড়তে হয়—ছেড়ে ফেল, রাত এখনও বেশ আছে। শোবার একটু ব্যবস্থা করে ফেল। আমি গেটটা বন্ধ ক'রে দিয়ে আসি।

নীরেন ফিরে এসে দেখলে—সুজাতা নীরেনের খাটিয়ার ওপরে চোখ বুজে পরিশ্রান্ত দেহ নিয়ে শুয়ে পড়েছে।

নীরেন আতঙ্কিত কণ্ঠে ব'ললে, আরে…ওঠ ওঠ দেখি…

সুজাতা ধড়্‌মড়্‌ ক'রে উঠে দাঁড়াল। নীরেন গম্ভীর হ'য়ে শুয়ে পড়লে—ব'ললে, দোহাই, এখানে আর শোবার চেষ্টা ক'রো না। নিজের বিছানা-পত্র আনোনি কেন?

সুজাতা হেসে ফেললে, বললে, দেখো আমি আর পারচি নে। ঠায় ব'সে ব'সে—ব'লে সে খাটিয়ার ওপরে ব'সে পড়লে।

নীরেন হাঁ হাঁ ক'রে উঠল। ব'ললে, তোমার সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে গরীব বেচারীর খাটিয়াটাকে তাই ছিঁড়ে ফেলতে হবে। আরে আরে—শোয়ার চেষ্টা ক'রো না, ছিঁড়ে পড়ে যাবে।

দেখো, আমার বড্ড মাথা ধরেচে—ব'লে সুজাতা নীরেনের হাতটা কপালে চেপে ধরলে আর নীরেনকে বেষ্টন ক'রলে একটা হাত দিয়ে। ওঠবার লক্ষণ তার মধ্যে দেখা গেল না। ক্লান্ত কণ্ঠে ব'ললে, ইনফ্লুয়েঞ্জায় কদিন ভোগার পর এমন দুর্বল ক'রে দিয়েচে।…

—কই জ্বরের কথা কিছুই তো জানাও নি ?

—মরবার ভয় তো ছিল না। মিছি মিছি তোমার কাজের ক্ষতি ক'রে···

—যাক, ঘুমোবার একটু চেষ্টা করো; মাথা ধরা ছেড়ে যাবে। সকালে আবার অনেক হাঙ্গাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সুজাতা ঘুমিয়ে পড়ল।

নীরেনের আর ঘুম এল না। গলার ওপর থেকে সুজাতার হাতটি ধীরে ধীরে সরিয়ে দিয়ে, বুকে গোঁজা মাথাটি সোজা ক'রে দিয়ে নীরেন উঠে বসল। সুজাতার অসহায় ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন ওর মায়া হলো। ঘুমন্ত মুখের অস্পষ্ট হাসি, মাঝে মাঝে এক একটি দীর্ঘনিশ্বাস সুজাতাকে যেন রহস্যময় ক'রে তুলল। বহুপরিচিত পুরান সুজাতা নীরেনের কাছে নতুন ক'রে লোভনীয় হ'য়ে উঠল। পাশা-পাশি থাকবার মত অর্থসঙ্গতি ওদের নেই। যে সংসারের ছায়া থেকে ওরা বঞ্চিত হ'য়েছে—ভবিষ্যতের জন্যে তেমনি একটি সংসার গড়ে তুলবে ওরা, দুটি জীবনকে সুন্দর ক'রে গড়ে তুলবে। তাদের ছেলে-মেয়েরা সংসারের প্রত্যেকটি জিনিষের মধ্যে উপলব্ধি ক'রবে তাদের শ্রমিক কর্তব্য কঠোর জীবনকে। নীরেন ধীরে ধীরে সুজাতার বিস্রস্ত চুলের ওপর হাত বুলিয়ে দিলে। এমনি একটি সুন্দর সাথীই সে কামনা ক'রেছিল—ভগবান তাকে নিরাশ করে নি। চোখ দিয়ে তারা বহুজনের মাঝে পরস্পর পরস্পরকে বেছে নিয়েছিল। আলাপ নেই, পরিচয় নেই—কিন্তু কতক্ষণ তারা চোখা-চোখি চেয়ে থাকত!—মনে প'ড়ে নীরেনের হাসি পেল, কি ছেলেমানুষ!

ভোর হ'য়ে গিয়েচে অনেকক্ষণ। সুজাতার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল কিন্তু তবু সে চোখ বুজে চুপ ক'রে পড়েছিল; সুখকাতর পশুর মত সর্ব-ইন্দ্রিয় দিয়ে নীরেনের হাত বুলানোর স্পর্শটুকু যেন উপভোগ করছে। মনের এই কাঙাল বৃত্তিতে সুজাতার কেমন হাসি পেল—ঠোঁটের ওপরে হাসিটি রেখায়িত হ'য়ে উঠল।

নীরেন ব'ললে, হাসলে যে! অনেকক্ষণ ভোর হ'য়ে গিয়েচে—ওঠো এবার।

সুজাতা চোখ মেলে ব'ললে, তুমি কত বড় স্ত্রৈণ তাই ভাবছিলাম—আর হাসি পাচ্ছিল।

নীরেন ব'ললে, আর আমি দেখছিলাম, তুমি কতকক্ষণ ঘুমের ভাণ ক'রে প'ড়ে থাকতে পার।

সুজাতা হেসে উঠে ব'সল।

নতুন ক'রে ঘর পাততে হবে—অনেক কাজ তাদের।

ঘর গুছিয়ে উঠতে প্রথম দিনটি কেটে গেল দু'জনের। পরের দিন কথা কয়ে সময় কাটাবার মত অবসর হ'লো তাদের।

সুজাতা এক তাড়া চিঠি নীরেনের হাতে দিয়ে ব'ললে, আমার বিধাতা-পুরুষের নতুন চিঠি।

চিঠিগুলো নাড়া-চাড়া ক'রতে ক'রতে নীরেন ব'ললে, বিধাতা-পুরুষটিকে ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না তো।

সুজাতা হেসে ব'ললে, ভুলে গেলে সব এরই মধ্যে! বাস রে, যেখানে গিয়েচি—সঙ্গে সঙ্গে সেইখানে চিঠি। ঠিকানা যে কোথায় পায়—তাই ভাবি। অথচ ভদ্রলোক যেই হোন কোথায় থাকেন, নামটাই বা কি, কোনদিন জানালেন না। নইলে আলাপ ক'রে আসতুম।

—অর্থাৎ আমাকে বেদখল দেবার মতলব।

দু'জনেই হেসে উঠলে। বিধাতা-পুরুষকে নীরেনের মনে পড়েচে। বাস্তবিক, যেই হোক, সে অদ্ভুত লোক। সুজাতাকে ক্রমাগত চিঠি লিখেছে কিন্তু উত্তরের কোন প্রত্যাশা রাখেনি। চিঠিগুলি দীর্ঘও নয়—অসম্মানজনকও নয়। অল্প কথায় নিজের নিঃসঙ্গতাকে জানিয়ে এসেছে শুধু। হয় সে মস্ত বড় এক কবি—নয় সে মস্ত এক পাগল।

নীরেন একখানি চিঠি খুলে ব'ললে, আরও অনেক চিঠি ছিল না?

—ছিল তো—কিন্তু কোথায় সব হারিয়ে গিয়েচে।

—উঃ, নিষ্ঠুর। মাষ্টারণীই বটে।

সুজাতা হেসে ফেলে ব'ললে, দেখো তো ওগুলোয় কি লিখেচে? আমি পড়ে দেখবারও আর সময় পাই নি। সেই একই কথা বোধ হয়—না?

—শোন তবে···

···চরম নিঃসঙ্গতাকে ঢেকে রাখবার জন্যে পৃথিবীর কত চেষ্টা, কত বিচিত্র আয়োজন, মানুষ তার পুরোহিত। আমার চোখের সুমুখের আকাশ, সন্ধ্যাতারাটি, দিগন্তপ্লাবিত জ্যোৎস্না এক বিরাট মহাশূন্যতায় অপেক্ষা ক'রচে—নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়। মনে হয়, আমার কিছুই পাওয়ার নেই, কিছুই পাবো না কোন দিন।···

সুজাতা হেসে ব'ললে, বাস রে।

শোন আর একখানা চিঠি।

উহুঁ, ও আর সহ্য হবে না। ও তুমি তোমার সময় মত প'ড়ো'খন। বুঝলে, গরীবের ঘোড়া রোগ ভাল নয়। খেটে খাই, কাজের কথায় এস। তোমার দালালী কেমন চলচে বলো তো, আমি একটা ইনসিওর ক'রবো ভাবচি।···

নীরেন বদলে গেল। উৎসাহিত হ'য়ে ব'ললে, বাস্তবিক ক'রে ফেল। কখন কি হয়—যন্ত্রযুগে জীবন যে রকম সঙ্কটাপন্ন···তাছাড়া নতুন হ'লে কি হবে—বেশ ভালো কোম্পানি, বিশ্বস্ত··· দিব্যি মোটা টাকা···

সুজাতা হেসে লুটিয়ে পড়ে ব'ললে, পাকা দালাল বনে গিয়েচ দেখচি। আমি তোমার স্ত্রী—সে খেয়াল আছে? শিকারের সন্ধান পেলেই কোন জ্ঞান থাকে না আর—না?

অভ্যেসের দোষ—নীরেন অপ্রতিভ হ'লো। গম্ভীর হ'য়ে ব'ললে, বুঝতে পারচি এবার—বিধাতা-পুরুষ ভদ্রলোক কেন তোমাকে নাম ঠিকানা আজও জানালে না। তুমি যে নোয়াখালীর হেডমাষ্টারণী তিনি নিশ্চয়ই জানেন। ঠিকানা পেলে কবে হয়ত গিয়ে কান মলে দিয়ে আসবে—ধমকানিতে স্মৃতিবিভ্রম ঘটবার আশঙ্কাও কম না।···

বাস্তবিক কত চিঠি পেয়েছে সুজাতা এ পর্য্যন্ত, মনের ওপরে তার প্রভাব একটুও নেই। তার জীবনের প্রত্যেকটি দিকে নীরেন এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে যাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রয়োজন একটুও হয়নি; তার সমস্ত চিন্তার দূরত্ব নীরেনের কাছে এসে থেমেছে। সুজাতার এই জগতের মধ্যে বিধাতা পুরুষের পরোক্ষ আবির্ভাব সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়, অপ্রাসঙ্গিক। প্রথম দিকে সুজাতা চিঠিগুলি

পড়ে হাসত—সে হাসি বিজয়িনীর জয়তৃপ্ত হাসি; সুজাতা এখন যা হাসে, সেটা কেবল সাধারণ একটা আমোদ। এদিক দিয়ে সে এতখানি সহজ ও সঙ্কোচহীন যে, তার মনে পলকের জন্যেও সন্দেহ হয় নি—নীরেনের মনে এর জন্যে কোন প্রতিক্রিয়ার আলোড়ন অথবা নাটকীয় পরিসমাপ্তি একটা সম্ভব হ'তে পারে।

বাংলোর গেট ঠেলে পিয়ন নীরেনের হাতে চিঠি দিয়ে গেল।

সুজাতা হাসি মুখে ব'ললে, ওই রে—বিধাতা-পুরুষের চিঠি এল বুঝি!

—আজ্ঞে না, এটা আমার রীতিমত অফিসসংক্রান্ত চিঠি।

—বাসরে—দালালীর চিঠি বলো! কিন্তু কেমন আশ্চর্য্য লাগচে—সাত দিন কেটে গেল, এবারে বিধাতা-পুরুষের চিঠির দেরি হ'চ্ছে যে বড়! নেশা কেটে গেল না কি?

নীরেন হেসে বললে, ঠিকানা পায় নি বোধ হয়।

—ভির্মি লেগেচে তা হ'লে। আশ্চর্য্য হই—ভদ্রলোকের কি কোন কাজ-কর্ম নেই! পুরুষ জাতটা যেমনি হ্যাংলা—তেমনি বেহায়া।

—এবং দালাল। সুজাতার অনুকরণে বাকীটুকু যোগ ক'রে দিয়ে নীরেন ব'ললে, তারা হেডমাষ্টারণীকে চিঠি লিখতে সাহস করে! দাও ওকে হাইবেঞ্চির ওপরে দাঁড় করিয়ে। নীরেন হুঙ্কার ছাড়লে। তারপর চাপা গলায় ব'ললে, তবে চিঠি না আসবার জন্যে মনে মনে যদি রেগে থাক—তা হ'লে মাভৈঃ, আমি নিজে গিয়ে চিঠি নিয়ে আসব।

কিন্তু একে একে তিনটি সপ্তাহ কেটে গেল—বিধাতা পুরুষের চিঠি এল না। মাসের পর মাস ধরে ক্রমাগত চিঠি আসত—নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মত তাই সেটা ছিল বৈচিত্র্যহীন। কিন্তু এখন আর চিঠি আসে না—সুজাতার জীবনে এইটাই এনে দিলে বৈচিত্র্য। মনকে সহসা সচেতন ক'রে তুললে এইটাই। চিঠি এসেছে—খাম খুলেই পত্রপ্রেরক দেখেই টেব্‌লের এক পাশে সরিয়ে রেখেছে—পড়ে দেখবার কৌতূহলটাও হয়নি। এ যেন ভৃত্যের সহজপ্রাপ্য শ্রদ্ধাবনত দৃষ্টি—যার সম্বন্ধে প্রভুর সচেতন হ'বার কোন প্রয়োজনই নেই; অবহেলা করাটাই প্রভুর সহজ ধর্ম।

কিন্তু সেদিন যখন গেটের সুমুখে পিয়নকে দেখা গেল, তারপর সে সুমুখের রাস্তা দিয়ে চোখের সুমুখ থেকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল, তখন সুজাতার প্রথমে মনে হয়েছিল, গেট ঠেলে পিয়ন ঢুকলো বুঝি—একখানা খাম···বিধাতা-পুরুষকেই মনে পড়েছিল সুজাতার। কিন্তু পিয়ন চলে গেল—সুজাতার মন খারাপ হ'য়ে গেল। তার মনে হ'লো—কে যেন বিশ্রী ভাবে মুখের ওপরে এক গাদা অপমানের কালি হাস্যকর ভাবে ছুঁড়ে দিয়ে গেল।

দিনের পর দিন গেল—আবার একটি সপ্তাহ কেটে গেল; বিধাতা-পুরুষের চিঠি এল না। নীরেনের চিঠি পত্র আসে—আজকাল সেই সব চিঠির সামান্য শিরোনামটুকুও পড়তে কেমন একটা সঙ্কোচ, একটা লজ্জা বোধ করে সুজাতা—সাহস ক'রে অনেক সময়ে চিঠিগুলোর দিকে তাকাতেও পারে না। অপেক্ষায় থাকে—তার নামের চিঠি থাকলে নীরেন নিশ্চয়ই দেবে। কিন্তু চিঠি একখানিও এল না। অপেক্ষমান মনের পরিবর্তন সুজাতা নিজেও বুঝল না—নীরেনও বোঝে নি।

সুজাতা ভাবে, চিঠি তাকে লিখবেই বা কে! এত বড় দুনিয়ায় এমন কেউই নেই যে তাকে

চিঠি লিখবে, যে তাকে মনে করে রেখেচে। কেমন একটা সূক্ষ্ম অভিমানে বুক তার ভারি হয়ে ওঠে। বিশেষ করে কারুকেই মনে পড়ে না, কিন্তু পৃথিবীর সকলের ওপরে মন তার বিরূপ হয়ে ওঠে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল। ডাকঘরে গিয়েছিল নীরেন—ফিরে এল একখানা চিঠি নিয়ে। নীরেন তারই দিকে এগিয়ে আসচে ক্রমশ—সুজাতার বুকের স্পন্দন হঠাৎ যেন বেড়ে গেল—ভালো করে সে তাকাতে পারলে না নীরেনের দিকে।

নীরেন বললে, তোমার চিঠি—বিধাতা-পুরুষের এতদিনে করুণা হলো বোধ হয়। বলে সে হাসলে।

উত্তরে আজ সুজাতা একটিও চটুল কথা বলতে পারলে না আগের মত; আজকের সুজাতার সঙ্গে পুরান সুজাতার অনেক তফাৎ। সে কাঠের মত বসে রইল। পাথরের মত তার দৃষ্টি—অবনত, দুই কানে আগ্নেয়গিরির উত্তাপ আর অশ্রান্ত ঝিঁঝির আর্তনাদ।

নীরেন চিঠিখানি দিয়ে চলে গেল।

বহুক্ষণ পরে সুজাতার সঙ্কোচ আর আড়ষ্টতা কাটল। খামের ওপরে শিরোনামাটুকু পড়বার চেষ্টা ক'রলে, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। এ যে বিধাতা-পুরুষের চিঠি—সে সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ নাই। কি জানি, আলো জ্বেলে চিঠি পড়বার মত তার সাহস হ'লো না। নীরেনের উপস্থিতিকে আজ সে এড়িয়ে যেতে চায়। চিঠিটা সে ব্লাউজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে।

দুপুর বেলা নীরেন থাকে না—তাসের আড্ডায় যায়। সেই অবসরে চিঠিখানি খুললে সুজাতা। দেখলে, চিঠিটি বিধাতা-পুরুষের নয়—একটি সহকর্মী শিক্ষয়িত্রীর। হতাশায় সমস্ত মুখ তার পাংশু হ'য়ে গেল।

কেবল বিধাতা-পুরুষের চিঠির অপেক্ষাতেই সে নেই—ছিঃ! এই ব'লে মনকে একদিন শাসন ক'রেছিল সুজাতা। মনে মনে ব'লেছিল, তবু কোন বন্ধুর কাছ থেকেও তো সে চিঠি পেতে পারে! কিন্তু তা যখন পেলে—মন তার খুসীতে ভরে উঠল না একটুও।

চুপ ক'রে সে ব'সে রইল—চিঠিটা পড়বার মত কোন স্পৃহা তার ছিল না। বিধাতা-পুরুষের নতুন চিঠি ব'লে সেদিন নীরেনকে যে চিঠিগুলি সে দিয়েছিল—সেগুলি সেদিন থেকে অযত্নে অদূরে ছড়ান হ'য়ে পড়েছিল। সুজাতা শূন্যদৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর উঠে গিয়ে অন্য মনে একখানি চিঠি তুলে নিলে। বাইরে সতর্ক দৃষ্টিতে একবার দেখে নিয়ে চিঠিখানি পড়লে—

পৃথিবীকে এত গভীর ক'রে ভালোবেসেছিলাম ব'লেই কি সে আজ দেখিয়ে দিলে—ওই দেখ: আমার দিগন্তপ্রসারী রৌদ্রস্তব্ধ মাঠের পর মাঠ—ওই যে নিঝ্‌ঝুম দিগন্তের কোলে ধোঁয়ার মত তালগাছটি কতো একা! তোমার রক্তেও যে ওই নিরালম্ব নিঃসঙ্গতার বিষ মিশে রয়েছে—তাই তো তুমি যতদূরে তাকাও কেবল ক্লান্ত শূন্যটাকেও নিঃশব্দে ঝিম্ ঝিম্ ক'রতে দেখ। আমার দূরবনান্তে যে সাথীহারা ঘুঘুটি কেবলি ডেকে ডেকে মরছে, মাঠের শেষের ওই নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ বটের ছায়ায় রাখালের যে বাঁশীটি মধ্যাহ্নস্তব্ধ দূর-দূরান্ত সুরের ঘায়ে ঘায়ে মূর্ছিত ক'রে তুলছে, তাতে সমস্ত অন্তর যে তোমার হুহু ক'রে উঠবেই। এ নিঃসঙ্গতার জন্যে অভিশাপ দিও না—এই তোমার পরম পরিচয়।

তারপর সুজাতা স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল বাইরের দিকে তাকিয়ে। নীরেনের কথা মনে পড়ল, নিজের সুদূর প্রবাসজীবনের কথা মনে পড়ল, বিধাতা-পুরুষের কত চিঠি হয়ত এতদিনে তার টেব্‌লের ওপরে জমা হ'য়েছে। হয়ত চিঠি আর আসেই না—কোথায় কতদূরে থাকে সে···তার চারপাশের দুরন্ত নিঃসঙ্গতাকে আর সহ্য ক'রতে না পেরে হয়ত সে এই পৃথিবীর কাছ থেকে একেবারেই বিদায় নিয়েচে! আঃ—জীবন যার এত দীন···তার আবার জীবন? এই তো মাত্র তার চব্বিশ বছরের জীবন—স্বপ্নের তৃপ্তি রূঢ় বাস্তবের ঘায়ে ভেঙে ভেঙে গেল। আবার সপ্তাহ দুই পরে কতদূরে চলে যেতে হবে!

খণ্ডগিরির আঁকা-বাঁকা রাঙা মাটির পথটি দু'পাশে দূরবিস্তৃত প্রান্তর নিয়ে বহুদূরে চলে গিয়েছে, ধুধূ প্রান্তরের শেষে ভরতপুরের অরণ্যের আবছা কালো রেখাটির ওপরে উদাস দিগন্তের কোলে একটি চিল কালো বিন্দুর মত ঘুরপাক দিচ্ছে, বহুদূরে বরুণ পাহাড়ের আবছা শিখরদেশ—রৌদ্রঝলোমল রেলের লাইন তার দুরন্ত নিরুদ্দেশ যাত্রার মাঝে নিস্পন্দ হ'য়ে পড়ে আছে। যতদূর চোখ যায়—প্রান্তরের সুরু থেকে দিগন্তের সীমা পর্য্যন্ত সব যেন নিঃসঙ্গ। বিষণ্ণ মধ্যাহ্নের এই বিশ্বজোড়া একাকীত্বের মাঝখানে সুজাতার সুমুখে—পথের ধারে ওই যে অশ্বত্থ গাছটি—এক একটি পাতা মাঝে মাঝে দোল খাচ্ছে—সেও যেন নিজের স্তব্ধ ছায়ার ওপরে ঝিম হ'য়ে আছে। নীরেন, বিধাতা-পুরুষ, ঘর-সংসার—ধীরে ধীরে সমস্ত জিজ্ঞাসা সুজাতার মন থেকে মুছে গেল। তার মনে হ'লো—সেও বড় একা। কোন দিন সে কিছু যেন পায় নি—পাওয়ার কোন প্রত্যাশা নেই। সকলের ভালবাসা, মায়া-মমতা থেকে বহুদূরে সে একা। ওই যে একটি পাখী পাখা কাঁপিয়ে দূরের দিকে উড়ে উড়ে চলেছে—তারপর কোথায় হারিয়ে গেল—সে কোন এক স্বপ্নগহন দেশে সুজাতাকে টেনে নিয়ে চলল। এই পৃথিবীর কাছে সুজাতার সবই দুরাশা—সব!

নীরেন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। সুজাতার স্তিমিত দূরচারিণী দৃষ্টিটুকু বড় ভাল লাগে তার—সুজাতার এই দৃষ্টিটুকুই প্রথমে ভালবেসেছিল সে—আজ আবার নতুন ক'রে যেন ভালবাসলে। মনে পড়ল—বিধাতা-পুরুষ এই দৃষ্টি সম্বন্ধে একখানি চিঠিতে লিখেছিল:

তোমার চোখ তুলে চাওয়াটুকু আজও আমার মনে পড়ে। সে দৃষ্টিতে ছিল ভীরুতা—জলাভূমির হিমসিক্ত আবহাওয়া। তুমি যখন তোমার স্তিমিত ভীরু দৃষ্টি তুলে তাকাতে তখন আমার মনে হ'তো: কোথায় যেন চিরবৈরাগী এক বাউল কতদূর পথে পথে কেবল ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এত বড় দুনিয়ায় ঘর তার কোথাও নেই। তোমার সেই দৃষ্টি বড় জটিল হ'য়ে জড়িয়ে গিয়েছে আমার জীবনে—তাই বোধ করি কেবল দূর পথ-প্রান্তরে ঘোরাটাই আমার কাছে এত প্রিয়, এত সত্য।

নীরেনের মনে হ'ল—বিধাতা-পুরুষ শুধু উচ্ছ্বাসই করে নি।

নীরেন ব'ললে, কি এত ভাবছ বল তো? কি দেখছ? সুজাতার কাঁধের ওপরে হাত রাখলে নীরেন, আঙুলগুলি খেলা ক'রতে লাগল গালের ওপরে।

জলের ফোঁটাগুলি এতক্ষণ সুজাতার চোখের কোণে ঝরে পড়বার জন্যই যেন অপেক্ষা ক'রে ছিল।

নীরেন কেমন আশ্চর্য্য হ'লো।

ছুটি শেষ হ'তে আর দুটি সপ্তাহ বাকি।

সুজাতা ধীর কণ্ঠে ব'ললে, কাল সকালেই এখান থেকে যাব ভাবছি। এখানে আর ভাল লাগছে না।

নীরেন কেবল ওর মুখের দিকে তাকালে। সুজাতা হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে উঠেছে কদিন—আশ্চর্য হ'য়েছে বটে সে কিন্তু কোন কারণ খুঁজে পায় নি। আর সে হচ্ছে সেই ধরণের লোক—যারা সব কিছুতেই নিস্পৃহ যে পর্যন্ত না তাদের সেই সব বিষয়ে ডেকে স্পৃহা না বাড়ান হয়। নীরেন তাই সুজাতার কথায় সায় দিয়ে ব'ললে, বেশ—তাই যেয়ো। ভাল না লাগলে এখানে থেকে লাভ কি। একবার পুরী হ'য়ে ঘুরে যাবে না—এত কাছে এসে ? কি জানি, হঠাৎ কি হ'লো তোমার।—

সুজাতা তাকাল নীরেনের সহজ অভিব্যক্তিশূন্য মুখের দিকে। সুজাতার চোখে রাত্রির মস্ত একটা কাল পাহাড়ের স্তূপ যেন থমকে আছে—হতাশ নির্বাক। ভাবলে সে, তার পরিবর্তন নীরেনের কাছে ধরা পড়েছে তা হ'লে কিন্তু কি ভাবছে ও—সন্দেহ ক'রছে কিছু কি ? সহসা নীরেন যেন তার খুব কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেল—তাকে ফেলে অতি নিষ্ঠুর ভবঘুরে তাতারের মত—তার সমস্ত ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মাঝখানে অসহায়—একা। ভীরু অপরিচিতের মত বহুদূর থেকে সে যেন ব'ললে, কোথাও যেতে ইচ্ছে নেই আর—

কিন্তু তবু সুজাতার লোভী কান উৎকর্ণ হ'য়ে রইল, এই হয়ত নীরেন ব'লে ব'সল—যেমন বিয়ের আগে একদিন সে ব'লেছিল সুজাতার হাতে হাত জড়িয়ে : তুমি যেন অনেক দূরে চলে যাও—মাঝে মাঝে বুঝতে পারিনে তোমাকে—বুঝতে পারিনে—আমাকে পাগল ক'রে দাও—

না, এর পরে সুজাতা আর কোথাও যেতে পারে না। নীরেন কেড়ে নিতে জানে না কিন্তু নীরবে সে যেন চায় অনেক—সুজাতা যেন তার কূলকিনারা পায় না। ক্ষুধার্ত কুকুরের মত দাঁত দিয়ে শুকনো হাড় কামড়ে ও যেন মাংসকে শুধু কল্পনায় অনুভব করে। এই নীরেন মুখ ফুটে যদি কিছু বলে—সে ফুলে ফুলে ওঠে ঝ'ড়ো সমুদ্রের মত।

কিন্তু নীরেন আজ ব'ললে, আমাকে একবার পুরী যেতেই হবে। আমাদের অফিসসংক্রান্ত একটু কাজ আছে ওখানে। যাক, তোমাকে তুলে দিয়ে না হয় পরে যাবো।

না, সুজাতা এ আশা ক'রছিল না। কিন্তু সে ভাবলে, নীরেনের এ উত্তর তার খুব পরিচিত। তাকে যেতেই হবে অনেক দূরে। তাকে ডেকেছে নীরেন কিন্তু ভালবাসে নি—না, কোনদিনই না, কেউ না—কেউ কোথাও নেই তার। এত বড় পরিচিত পৃথিবীতে এমন একটা চেনা মুখও তার মনে পড়ল না—যেখানে গিয়ে সে দাঁড়াবে।

পরের দিন সকালে প্লাটফর্মে।

একখানা আপ ট্রেণ ছেড়ে গেল। তার গতির সঙ্গে সঙ্গে মন তার ছুটে গেল অনেক গ্রাম অনেক দেশ পেরিয়ে—অনেক মাঠ আর পাহাড়ের পাশ দিয়ে। এক সময়ে ট্রেণটা অদৃশ্য হ'য়ে গেল। সুজাতার মনে হ'লো, একটা বর্ণহীন তুলির আঁচড়ে জগতের সব প্রাণস্পন্দন কে যেন মুছে নিলে, লাল কাঁকর-বিছানো মস্ত প্লাটফর্মটা তার মনের মাঝখানে নিঃসঙ্গতায় হুহু ক'রে উঠল। একটা দিক্‌চিহ্নহীন শূন্যতায় কান্না পেল তার। দূরের একটি বেঞ্চিতে অল্পবয়সী—নতুন দম্পতিই

হবে বোধ হয়, খুব হেসে হেসে কথা কইছে—সঙ্গে চাকর, অনেক মোটঘাট ; ধনী আভিজাত্যের জাঁকজমকে ঝলমল ক'রছে। সুজাতা সেই দিকে ভিখারীর মত তাকিয়ে রইল—কেমন হিংসা হ'ল তার।

এই সময়ে ছোকরা পিয়ন একজন তার সুমুখে এসে দাঁড়াল। একখানা খাম সুজাতার দিকে এগিয়ে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ব'ললে, আপনার চিঠি একখানা কাল সন্ধ্যের সময় এসেছে। আপনারা চলে যাচ্ছেন শুনে—ছোকরা সপ্রতিভভাবে হাসল।

সুজাতা খামের ওপরে শিরোনামাটুকু দেখে চিনলে, এ বিধাতা পুরুষের অতি পরিচিত হাতের লেখা। কিন্তু চিঠি খুলে পড়বার মত ইচ্ছে আজ একটুও ছিল না তার। বরং তার মনে হ'লো : এই আর একটা নিষ্ঠুর লোক। ভারী একা সে—ভারী অসহায়। সুজাতা উদাসীন—হাতে খামখানা নিয়ে ব'সে রইল। পিয়ন ছোকরা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। সুজাতা তার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে ব'ললে, আর কিছু আছে নাকি ?

—না না—শুধু ওই চিঠিটার জন্যেই—

পিয়ন ছোকরা চলে গেল। হ্যাঁ, কতকটা হতাশ হ'য়ে বই কি। এই ভুবনেশ্বরেই ওই পিয়ন ছোকরাকেই সে বখ্সিস দিয়েছিল একদিন সন্ধ্যাবেলা চিঠির জন্যে কিন্তু সে চিঠি বিধাতা-পুরুষের চিঠি নয়—হঠাৎ একটা আনন্দে ভুল করেছিল সুজাতা। কিন্তু আজ বিধাতা-পুরুষের নির্ভুল চিঠিটায় যাওয়ার দিনে বেচারী প্রত্যাশী পিয়ন ছোকরাকে বখ্সিস করার কথা তার একবার মনেও হ'ল না। অনেক আশায় পিয়নবেচারী দু' মাইল পথ ছুটে এসেছিল। কিন্তু সে তো জানে না—এতদিন ধরে বিধাতা পুরুষের যত চিঠি ছিল—আসবার সময় সব পুড়িয়ে দিয়ে এসেছে সুজাতা।

নীরেন প্লাটফর্মে পায়চারী ক'রছিল। সুজাতার পাশের বেঞ্চিতে ব'সে পড়ে ব'ললে, কার চিঠি এলো ? তাইত, তোমার বিধাতা পুরুষের মত হাতের লেখা দেখছি। হুর্‌রে—নীরেন হাসতে হাসতে ব'ললে, না সু—ভদ্রলোক বহু সন্ধান ক'রে চিঠি দিয়েছে—এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে আবার ভদ্রলোককে নাস্তানাবুদ ক'রো না। থেকে যাও দুটো সপ্তাহ—বড় জোর কাছাকাছি পুরী—কি বলো ?

নীরেন বিস্মিত মুখে তাকাল সুজাতার দিকে কিন্তু সুজাতা আজ বিবর্ণ। নীরেনের নিছক হালকা অভ্যস্ত রসিকতা যেন চাবুক মারল তাকে—এমন প্রত্যক্ষ অপমান কোন দিন যেন কেউ করে নি সুজাতাকে। সুজাতার মনে হ'লো : নীরেন ভাবছে যেন—বিধাতা-পুরুষের এতদিন কোন চিঠি পায় নি ব'লেই সে পরিচিত হোষ্টেলের ঠিকানায় ফিরে যাচ্ছে। সুজাতার হাত থেকে খামখানা খসে পড়ল—ফ্যাল ফ্যাল ক'রে নীরেনের হাস্যোৎফুল্ল মুখের দিকে তাকিয়ে ব'ললে, তুমি··· তুমি···

না, কিছুই ব'লতে পারল না সুজাতা—শুধু অসহায় অবরুদ্ধ কান্নায় ফুলে ফুলে উঠল।

নীরেন বোকা হ'য়ে গেল—এর জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না। ব'ললে, এ কি ! কি হয়েছে বলো তো তোমার ? আজ কদিন দেখছি—

—না না—তুমি যাও—তুমি যাও। এর চেয়ে আমাকে মেরে ফেল।—

—কি পাগলের মত—নীরেন ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়ল।

—না, আমি পাগল নই—সব বুঝি আমি। সুজাতা ফুঁপিয়ে উঠল, কোন দিন কোন ছলেই তোমার সুমুখে আর আসবো না আমি—আমাকে যেতে দাও—যেখানে হোক চলে যাবো আমি—যেখানে হোক—

কি সান্ত্বনা দেবে নীরেন! সে ভেবে পেল না—সুজাতার এতদিন পরে ওই নতুন রকম কথাগুলার বাস্তবিক কি অর্থ। অতি বড় শত্রুতেও তো বলতে পারবে না—নীরেন সুজাতাকে ভালবাসেনি—তাকে যন্ত্রণা দিয়েছে! কিন্তু তবুও এতখানি অতৃপ্তির ফাঁক সুজাতার মনে কি ক'রে গড়ে উঠল—কেন? এ কি সেই বিধাতা-পুরুষ—যে তার অদ্ভুত নিঃসঙ্গ ভালবাসার ইন্ধন দিয়ে দিয়ে চরম অতৃপ্তির মাঝখানে সুজাতার ভালবাসার ক্ষুধাকে এমন ক'রে তুলেছে—যার কাছে সে আজ এত অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেল! নইলে এতদিনের পরে সুজাতা বলে কি ক'রে এ কথা—কেন? সুজাতার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে নীরেন নির্বাক বসে রইল। মনে পড়ল তার, সুজাতা এইখানে এসে একদিন ব'লেছিল: আমি আর যাবো না তো। ওই অত দূরে একা আমার ভাল লাগে না। চাকরি আমি ছেড়ে দেবো।

নীরেন সুজাতার হাতে একটু চাপ দিয়ে ব'ললে, তোমার কোথাও গিয়ে কাজ নেই—আমার একা আর ভাল লাগে না। তুমি যেয়ো না আর।

কাঁকরের ওপরে বিধাতা-পুরুষের চিঠিখানা পড়েছিল। হঠাৎ এক ঝলক হাওয়ায় সুজাতার সাড়ীর আঁচল উড়্‌ল—ভেজা চোখের ওপর চুল উড়ে পড়ল আর কতকগুলো ধূলো এসে জমল খামটার ওপরে।



সিগারেট

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

নূতন বউ বাসরঘরে যাইবার সময় তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া বসিল। কোন মতেই যাইবে না সে। ব্যাপারটা বিশেষ কিছু নয়, সে শুধু বলিয়াছিল, সংগদোষে একটা ভয়ানক বদ্ অভ্যাস দাঁড়াইয়া গেছে, সিগারেটে গোটা কয়েক টান দিয়া সে ঢুকিবে বাসরঘরে—একটি মিনিট দেরি, ভিতরে গিয়া তো আর টানিতে পারিবে না।

বাসর-সংগিণীদের একজন চিপ্‌টেন কাটিয়া বলিল—"তাতেই বা ক্ষতি কি?—মেম সাহেবেদের পদাংক অনুসরণ ক'রে তো সবই এল একে একে—বব্, ডান্স, ফ্রি ল্যভ, সিগরেট,—আর বেচারি সিগরেট মুখচুম্বনের অধিকার যখন পেয়েচেই, তখন বাসরঘরে ঢুকতে আর দোষ কি?—দুদিন পরে তো ঢুকবেই।"

ক্রমে উত্তেজিত বচসা, কথা কাটাকাটি। কথাটা সামান্য, কিন্তু জেদাজেদির উপর একেবারে অন্যরকম দাঁড়াইয়া গেল।

অনেকে উভয় পক্ষের রাগ ভাঙাইবার চেষ্টা করিল। পরে যাহা হইবার হইবে, আপাততঃ ভেতরের এ কেলেঙ্কারিটা বাহিরে না প্রকাশ হইয়া পড়ে। কিন্তু বাগ মানান গেল না। নিজের স্যুটকেসটা হাতে ঝুলাইয়া নূতন বধূ বাহির হইয়া পড়িল। "ঢাক-ঢাক" সত্ত্বেও খুব একটা গোলমাল হইল কয়েকজন সংগে সংগে খানিকটা আসিল, তাহার পর হাল ছাড়িয়া আবার ফিরিয়া গেল।

যাহাতে আবার আসিয়া কেহ উপদ্রব না করে, সেই জন্য তাড়াতাড়ি কয়েকটা গলি বদলাইয়া শেষে একটা সরু গলিতে আসিয়া পড়িল এবং সেটা যেখানে বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছে সেই মোড়ে ফুটপাথে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহিরের হাওয়া লাগিয়া উষ্ণ মস্তিষ্ক তখন কতকটা ঠাণ্ডা হইয়াছে বোধ হয়, নিজের বেশভূষার পানে চাহিয়া একবার শিহরিয়া উঠিল। বুঝিল রাগের মাথায় কাজটা ভাল হয় নাই; এই সাজশয্যা, এত কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে। একবার মনে হইল পুরুষের বেশ করিয়া লয়। কিন্তু সে তো আর রাস্তায় দাঁড়াইয়া হয় না, তাহা হইলে আবার ফিরিয়া যাইতে হয়।...না, কস্মিন কালেও নয়, আবার সেই জায়গায়?...এত ভয়ই বা কিসের? লোকে হদ্দ মনে করিবে একজন অতি-আধুনিকা, ব্যস্। তা করুক গিয়া মনে মনে প্রাণ ভরিয়া, সে কেয়ার করে না।

তবে নিতান্ত নববধূর যা আভরণ—মাথার ঝাপ্‌টা, হাতের রতনচুর, খোঁপার কাজললতা, গলার মালা, এগুলা খুলিয়া স্যুটকেসে রাখিয়া দিল। পাশেই একটা জলের কল ছিল, মুখের চন্দন-বিন্দুর রেখাগুলা মুছিয়া লইল।

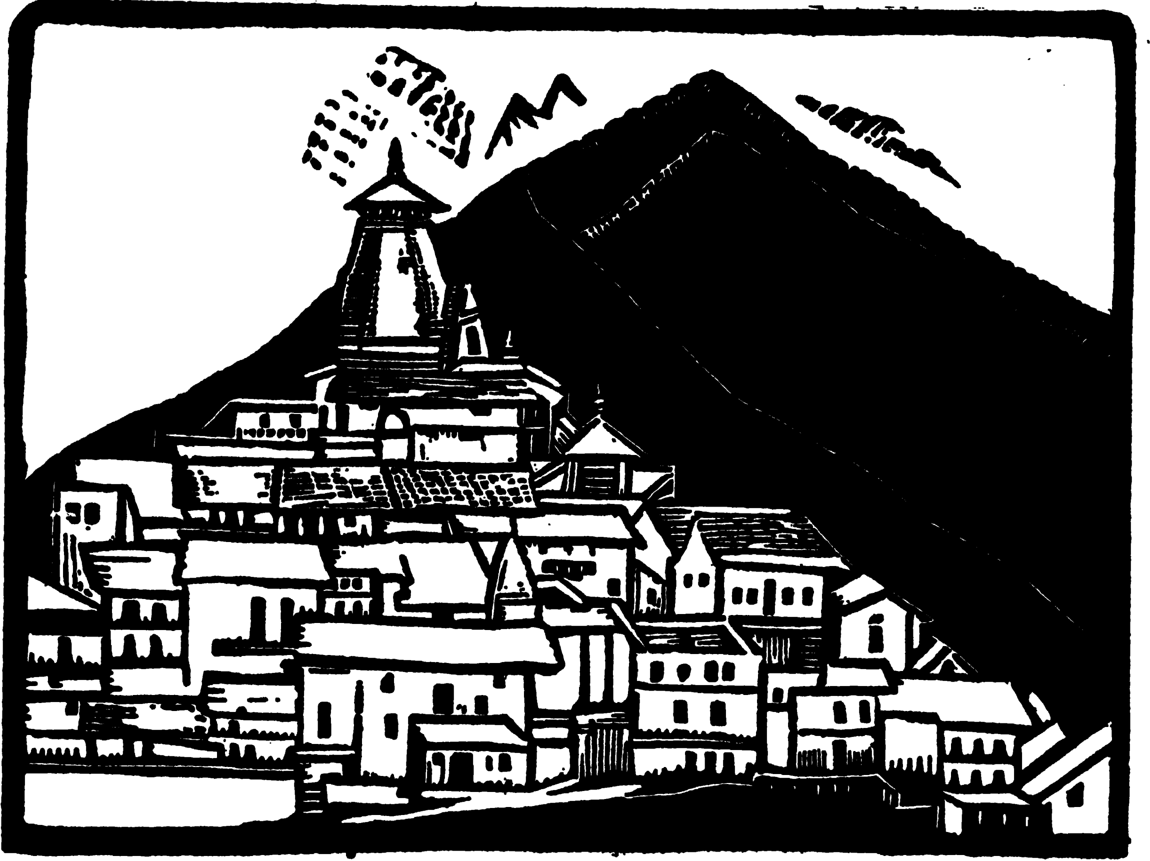
এদিক হইতে নিশ্চিন্ত হইয়া অন্য ভাবনা, অর্থাৎ কাজের ভাবনা মাথায় আসিয়া উদয় হইল। হাতে একটি পয়সা নাই, এদিকে ক্ষুধাও খুব পাইয়াছে। রাগে অভিমানে কাহারও কাহারও ক্ষুধা কমে, কিন্তু ইহার যেন আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

বদ্‌রিনাথের পথে—

—শিল্পী শ্রীললিতমোহন সেন, এ. আর্. সি. এ. (লণ্ডন)

শিল্পী তাঁর চিত্র সম্বন্ধে লিখেছেন—"পথের কষ্টে, রৌদ্রের প্রখর তেজে শরীর হয়ে উঠেছে একেবারে কয়লার মত কালো—চোখের দৃষ্টিতে হয়েছে রঙের অভাব। সারাপথের দৃশ্য, পাহাড়ের রূপ সবই যেন মসীবর্ণ। তাই রঙের পরিবেশন না করে, কুচ্‌কুচে কালো রঙে এই হিজিবিজির ছাপ"—কথাগুলি বিরক্তির বটে, কিন্তু আমরা মনে করি, তিনি কৌশলে এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে, যে পাহাড়ের ধূসর ও রুক্ষ রূপ কালোর রেখায় যেভাবে ফুটে ওঠে, বিচিত্র রঙের সমাবেশে তা সম্ভব নয়।

—সঃ অঃ



দেবপ্রয়াগ—উত্তরাখণ্ডের পঞ্চপ্রয়াগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম এই প্রয়াগ। হৃষীকেশ থেকে প্রায় মাইল ষাটেক দূরে। আগে এই পথটি হেঁটে আসতে হ'তো—লছমনঝোলা পার হ'য়ে, বান্দর চট্টি হ'য়ে—এখন হৃষীকেশ থেকে মোটরে যাওয়া যায়। অলকনন্দা ও ভাগীরথীর সঙ্গমে দেবপ্রয়াগ। পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে সাজানো বাড়ীগুলি। শিখরচূড়ায় রঘুনাথজীর মন্দির। বদ্রিনাথ ও কেদারনাথের পাণ্ডাদের এখানেই আড্ডা। এখান থেকেই চলার পথ সুরু।



রুদ্রপ্রয়াগের পথে। দেবপ্রয়াগ থেকে পাঁচদিন চলার পর রুদ্রপ্রয়াগের কাছে আসা গেল। পাহাড়ের উপর দিয়ে এঁকে বেঁকে চলেছে চড়াই উৎরাইএর পথ। হিমালয়ের রুদ্রমূর্ত্তি এখান থেকেই সুরু হ'ল। তরুশূন্য রুক্ষ ভীষণকায় পাহাড়ের শ্রেণী। ডানদিকে ব'য়ে চলেছে রুক্ষা নদী।



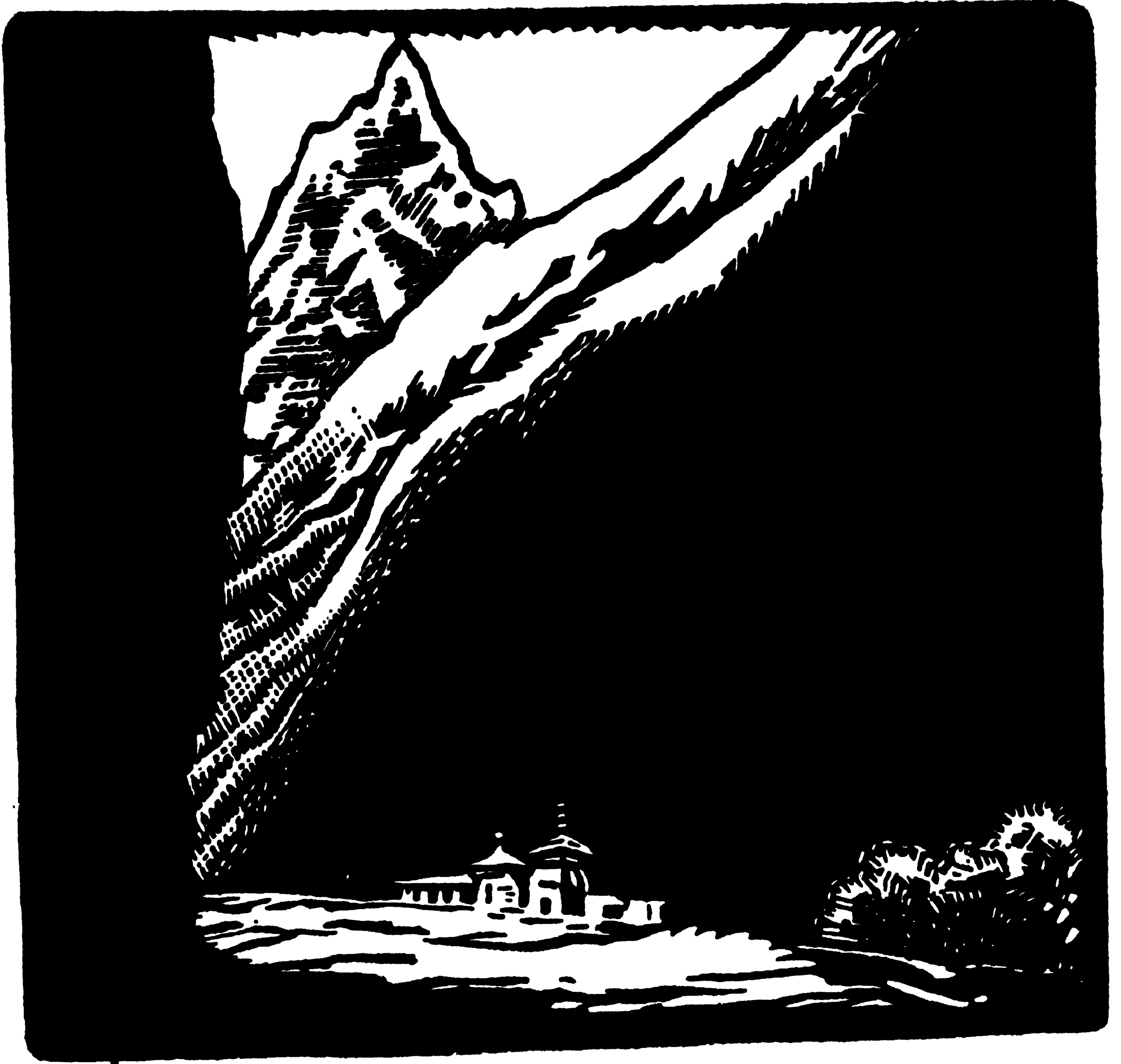
পাহাড়ী চটি। যাত্রীদের পথ চলার শেষে এইখানেই আশ্রয় নিতে হয়। গোয়ালঘরের মত চটির ঘর একদিক খোলা—আসবাববিহীন মাথা গোঁজবার স্থান। অতি অপরিষ্কার। পাশেই দোকানীর আস্তানা। চালডাল ইত্যাদি সবই অতি চড়াদরে পাওয়া যায়। জিনিষ কিছু কিন্‌লেই চটিতে থাক্‌বার অধিকার—নতুবা "আগে চল্‌।"



শ্রীনগরের গলি। শ্রীনগর গাড়োয়ালের প্রাচীন রাজধানী। আগেকার প্রাচীন সহরের সবই গঙ্গাগর্ভে লুপ্ত হ'য়েছে। ছু' একটি পুরাণো মন্দিরের চূড়া বালির মধ্য থেকে উঁকি মারে। যেদিকটা এখনো টিকে আছে, সেদিককার পথঘাটের স্থাপত্যনিদর্শনে এখনো একটু প্রাচীন কালের আভাস পাওয়া যায়।



যোশী মঠের মন্দির। শোনা যায় শঙ্কর এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বদ্রিনাথের মন্দির শীতকালে বরফে ঢেকে গেলে ছ' মাসের জন্তে যোশী মঠের এই মন্দিরে তাঁর পূজো হয়। বদ্রিনাথের রাওয়াল এখানে থাকেন। এখানে তাঁর প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা। এই মন্দিরের মধ্যে ছটি অপূর্ব্বসুন্দর কালো পাথরের মূর্ত্তি আছে। একটি নৃত্যশীল গণেশ—আর একটি শিব-পার্ব্বতী। এমন সুঠাম মূর্ত্তি বদ্রিনাথের পথে আর কোথাও দেখা যায় না।



পথের পাশে মন্দির। বদ্‌রিনাথের পথে নানা প্রাচীন মন্দির চোখে পড়ে। সব মন্দিরই প্রায় একরকম। ভাস্কর্য্যকলার নিদর্শন বড় বেশী নেই। মন্দিরের মাথায় কাঠের চৌকা আচ্ছাদন, সমস্ত মন্দিরটাকে বরফ থেকে বাঁচা'বার জন্যে। পথের বাঁকে ঘুরে নীলপাহাড়ের বিরাট পটভূমিকায় ওপরে ছোট ছোট এই রকম মন্দিরের আকস্মিক আবির্ভাব বদ্‌রিনাথের পথের একটী বিশেষত্ব।



বদ্রিনাথ থেকে ঠিক পাঁচ মাইল আগে হনুমান চটী। তারি কাছে উথ বা আউত গ্রাম। বসতি বেশীর ভাগ মার্চ্ছাদের। এই গ্রাম থেকে তুষারাবৃত গিরিশিখর মালার দৃশ্য বড়ই মনোরম।



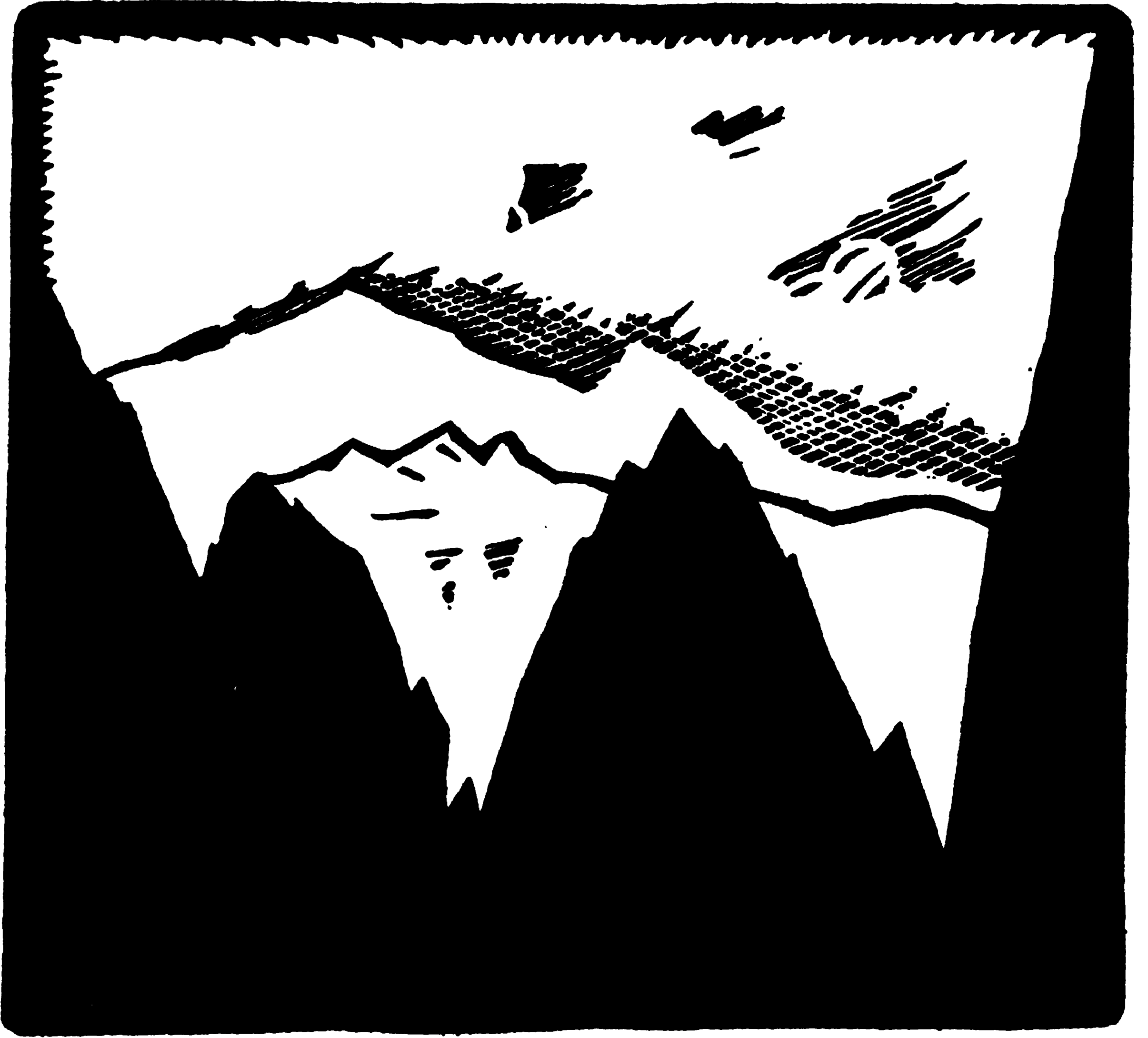
এক বৃদ্ধ গাড়োয়ালী—রাস্তায় ঘাটে সর্ব্বত্র এদের দর্শন মেলে। পথ হারালে পথের সন্ধান সর্ব্বদা এদের কাছে মিল্‌বে। অধিকাংশই প্রিয়ভাষী। তক্‌লিকাটা আর রাস্তায় চলা এই এদের সর্ব্বক্ষণ চলছে।



হৃষীকেশ ছাড়্‌বার পরে গরুর গাড়ী একেবারেই দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। যা রাস্তা! "পউরি" হ'য়ে 'দোগড্ডা'র কাছাকাছি এসে আবার গরুর গাড়ী চোখে পড়ে। অধিকাংশই ফৌজী মাল নিয়ে ল্যান্স্‌ ডাউনের দিকে চলে।



ঘাট চট্টি। যোশীমঠ থেকে বিষ্ণুগঙ্গা পার হয়ে ঘাট চট্টি। রাস্তা বড়ই দুর্গম। কথিত আছে যে, দু' দিকে পাহাড় যখন এগিয়ে এসে এক হয়ে যা'বে—(এখনই ত প্রতি বৎসর একটু একটু ক'রে পাহাড় বেড়ে চলেছে) তখনই কলি যুগের শেষ।



সারা পথ কেবল পাহাড় আর পাহাড়। মানুষের দৃষ্টি প্রতি পদে পাহাড়ে প্রতিহত হ'য়ে ফিরে আসছে—মহেশ্বরের দর্শন লাভের পথে নদীর উদ্যত নিষেধের মত।

সব সমস্যার সমাধান সেই বালীগঞ্জ লেক, কিন্তু সে যে এখান থেকে বহু দূর! উপায় কি? ফিরিয়া যাইবে?—ফিরিবার নামে সমস্ত অন্তরাত্মা যেন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ছিঃ, ধিক তাহার কলেজে পড়া আধুনিক উচ্চশিক্ষাকে, ধিক তাহার আত্মসম্মানজ্ঞানকে!—আবার সেই জায়গা?

কৌতূহলী নজর পড়িতেছে—ক্রমে বেশী বেশী—নিকট দূর দিয়া যে-ই যাইতেছে তাহারই গতি শ্লথ হইয়া পড়িতেছে। দুই একজনের দাঁড়াইয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া হঠাৎ কি সব সমস্যার সমাধান করিয়া লওয়া দরকার হইয়া পড়িল। যায়গাটা হঠাৎ মাথা ঠাণ্ডা করিবার এত অনুকূল হইয়া পড়িল কি করিয়া।

নূতন বধূর মাথায় একটা বুদ্ধি আসিল; বুকের নিকট হইতে রঙিন সুগন্ধি রুমালটা বাহির করিয়া হাতে করিয়া ধরিল এবং বেশ "লপেটা" গোছের একজন মন্থর গমনে যেই তাহার পাশ দিয়া যাইবে, আঙুল কয়টি আলগা করিয়া দিল।

"আপনার রুমাল?—পড়ে গিয়েছিল।"

"ও, খেয়াল করি নি; ভাগ্যিস আপনি দেখলেন। ধন্যবাদ।"

"মেন্‌শ্যন করবেন না দয়া ক'রে। হঠাৎ চোখে পড়ল, তাই—"

একটু ইতস্তত করিয়া—"কোন রকম উপকার করতে পারি কি? মনে হচ্চে যেন···মানে, কারুর অপেক্ষা করচেন কি?"

একটা আঙুলের নখ কামড়াইয়া—"উপকার?—হ্যাঁ—না,···"

—হঠাৎ নাটকীয় ভংগীতে—যেন বলিবার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও—"আপনি অনুমান করেছেন ঠিক—না ব'লে আমার উপায়ও নেই···আমার এক আত্মীয়ের সঙ্গে এইখানে সন্ধ্যের সময় দেখা হওয়ার কথা—তিন ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি—কি তাঁর মনে ছিল জানি না, কিন্তু এখন দেখছি তিনি আর এলেন না।"

হর্ষের মাঝে দুশ্চিন্তার ভাব ফুটাইবার চেষ্টা করিয়া—"তা হলে?"

ভয়ব্যাকুল ভাবে—"কি ক'রে ফিরে যাব?—এদিককার পথঘাট কিচ্ছু জানি না, কোথায় ট্রাম কোথায় কি—ট্যাক্সি আর গাড়িতে একলা যেতে কখন সাহস হয় না—"

"একলাই বা যাবেন কেন? যদি আপত্তি না থাকে—"

পরম বিশ্বাস ও নির্ভরের দৃষ্টিতে—"অসুবিধে হবে না আপনার? এতটা রাত হয়ে গেছে? না হলে সত্যি আমিই বা কি করব? কতক্ষণ এ অবস্থায়—?"

একটা ট্যাক্সি চলিয়া যাইতেছিল, 'লপেটা' ডাকিলে ফুটপাথের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। নববধূ জড়িত চরণে উঠিয়া বসিল, যুবক উঠিলে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "লোক রোড।···কিন্তু আপনাকে দয়া ক'রে একটু আগেই আমায় ছেড়ে দিতে হবে। খানিকটা হেঁটেই যাব।"

"কেন?"

সংগিনী শুধু সঙ্কুচিত ভাবে মুখের দিকে চাহিল।

তাহাতেই উত্তর পাইয়া যুবক বলিল, "ও।...বেশ যেমন আপনার অভিরুচি।" একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল।

মোটর উড়িয়া চলিল; মনও কোথায় উড়িয়া চলিয়াছে, কতদূর কোন্ অজানা জগতে।

নববধূ তীব্র বায়ুস্রোত হইতে যেন রসসঞ্চয় করিয়া বলিল, "মাগো বাঁচলাম। গলা যেন শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেছল।"

গাড়ির ঝাঁকানির সুবিধায় 'লপেটা' একেবারে পাশে আসিয়া পড়িয়াছিল, দরদমাখা জিজ্ঞাসু নেত্রে মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "তেষ্টা পেয়েছিল?"

"নাঃ।"

আবদারের সুরে—"না, নিশ্চয় পেয়েছিল, লুকোচ্ছেন।"

একটু চুপচাপ।

"বলবেন না? আর সত্যিই তো আমার জানতে চাওয়ার অধিকারই বা কি?"

"সেই চারটের সময় বাড়ি থেকে বেরিয়েছি—সেই থেকে—"

"কি সর্ব্বনাশ। সেই চারটে থেকে মুখে একটু জল দেন নি? তাই বলি—মুখখানি যে একেবারে শুকিয়ে গেচে।"

একটু পরেই ট্যাক্সি গিয়া কর্পোরেশন ষ্ট্রীটের বেশ একটি ছোট-খাট, ভদ্র অথচ নিরিবিলি হোটেলের সামনে দাঁড়াইল।

* * * *

বালীগঞ্জের রাসবিহারী এভিনিউতে পরস্পরের বিদায়-দৃশ্যটি হইল বড় করুণ। লপেটা হোটেলে গোপনে একটি পেগ টানিয়া লইয়াছিল, বিদায় দিবার সময় হাতের একটি সোনার আংটি খুলিয়া সঙ্গিনীর অনামিকায় পরাইয়া দিয়া গদগদ কণ্ঠে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু কণ্ঠ আরও গদগদ হইয়া পড়ায় বলিতে পারিল না। নব বধূটি দূরের একটা বাড়ি দেখাইয়া দিয়া নামিয়া পড়িল, তাহার পর লেক রোড ধরিয়া চলিল।

* * * *

মেসে আসিয়া এক তুমুল কাণ্ড। সবার মুখে স্রধু ত্রস্ত প্রশ্ন,—

"এ্যাঁ, তুই এই বেশে এই এতটা পথ এলি কি ক'রে?"

"আর ওদের প্লে শেষ হয়ে গেল?—এরই মধ্যে।"

"সে কি রে। তুই বাসরঘরের সীনের আগেই চলে এলি—ঝগড়া ক'রে? বন্ধ হয়ে গেল তো তাদের প্লে?"

"অবশ্য চালিয়ে নেবেই কোন রকম ক'রে তারা, থিয়েটার কিছু বন্ধ হবে না; কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি হলধরবাবু, এটা আপনার ভাল হ'ল না মশাই।"

হলধর পরচুলাটা আছড়াইয়া টেবিলে ফেলিয়া, নব বধূর বেনারসীটা ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, "আচ্ছা, মন্তব্য পরে হবে 'খন; এখন তাড়াতাড়ি কেউ একটি সিগারেট ছাড় দিকিন, পেট ফুলছে, বাব্বা।"

রবীন্দ্র-পরিচয়

(তৃতীয় দফা)

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী

পূর্ব্বেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠিক সাধারণ মানুষের মতন নন—তাঁর মধ্যে যে মানুষ রবীন্দ্রনাথটি আছেন, তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়, যখন তাঁকে দেখতে পাওয়া যায় তাঁর অন্তরঙ্গদের মাঝখানে। সাহিত্য-ক্ষেত্রে যেমন তাঁর প্রকাশ অনন্যসাধারণ, সাহিত্যের বাইরে লোকজনদের সঙ্গে মেলা-মেশাতেও তেমনি তাঁর ব্যবহার ঠিক সাধারণ রকমের নয়। নিজের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা তাঁর নীতি নয়, ওটা তাঁর মজ্জাগত স্বভাব। সবকিছুর মধ্যে জড়িয়ে প'ড়ে সব কিছু থেকে বেমালুম নিজেকে দূরে টেনে নেবার কৌশল তিনি জানেন—এটা বললে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে—যেটাকে আপাতদৃষ্টিতে কৌশল ব'লে মনে হয়, সেইটাই তাঁর প্রকৃতি। মোহ হিসাবে যেটা তাঁকে পেয়ে বসে সেটার থেকে সজোরে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করা তাঁর প্রকৃতির ধর্ম্ম। বেশ মনে পড়ে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন তাঁর কনিষ্ঠা কন্যার পুত্র শ্রীমান্ নীতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মরণাপন্ন রোগে জার্মানিতে কাতর, তখন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং কাতর হয়ে পড়েছিলেন। আমরা যাঁরা কাছে ছিলুম যেন বুঝতে পারছিলেম, কী দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণা কয়েক দিন তিনি ভোগ করেছিলেন। কিন্তু বাইরে থেকে বাইরের লোকের পক্ষে সেটা বোঝবার কোনো উপায় ছিল না। সেই মানসিক অবস্থার মধ্যেও, কবি-প্রকৃতি তার স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে নি; ক্ষণে ক্ষণে দুঃখ-মোহ হতে মুক্তি নিয়েছেন অন্তরে। তাই তখন উৎসবের গান এবং কবিতাও লিখেছেন। উৎসব-আয়োজনের ব্যবস্থার মধ্যেও যোগ দিয়েছেন। বাইরে থেকে বিচার করলে মনে হয়, কবি রবীন্দ্রনাথের বোধ করি সেই মনটির অভাব আছে, যে মন, পারিবারিক সুখদুঃখকে, আন্তরিকতার মোহকে আঁকড়ে থাকতে চায়। কিন্তু সেটা ঠিক ব'লে মনে হয় না। যেটাকে গভীর ভাবে আঁকড়ালে, মানুষের মনের প্রগতি অ-গতি কিম্বা কু-গতিতে এসে ঠেকে, সেইটার থেকে মুক্ত হওয়াই কবির জীবনের ধর্ম্ম। নীতুর মৃত্যু-সংবাদ যখন এল, এবং নীতুর মায়ের টেলিগ্রাম পড়ে যখন কবি বুঝলেন যে, পুত্রের মৃত্যু-জনিত শোককে পুত্রহীনা জননী সহ্য করেছেন ধৈর্য্যের সঙ্গে, দেখা গেল রবীন্দ্রনাথের চিত্ত হাল্‌কা, মনে যেন শান্তি ফিরে এসেছে। সাধারণত অধিকাংশ ব্যক্তি এ রকম খবরে চলতি কথায় মর্ম্মাহত হয়ে ব'সে পড়ে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অশান্তির পীড়ন থেকে উঠে পড়লেন উপরে। সঙ্গে সঙ্গে শান্তিনিকেতন থেকে কবি তাঁর কন্যাকে জার্মানিতে টেলিগ্রাম পাঠালেন, যতদূর মনে হয় এই রকম,—Greatly relieved to see your fortitude.

মৃত্যুকে বীরের মতন গ্রহণ করা এবং মৃত্যু-বেদনার ভিতর দিয়ে চিরসুন্দরের সাধনায় এগিয়ে চলাই রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম। মৃত্যুর কাছে চিরাচরিত প্রথায় বেদনায় শোকে মুহ্যমান হয়ে নেতিয়ে পড়াটা সাধারণ মানুষের কাছে স্বাভাবিক হ'লেও রবীন্দ্রনাথ সেই স্বাভাবিক নীতি এবং রীতিতে

কোনদিন মৃত্যুর দানকে গ্রহণ করেন নি। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সমীন্দ্রনাথ ১৪ বৎসর বয়সে যখন মারা যান, তখনো রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত হতে দেখিনি।

তিনি নিজে মৃত্যু সম্বন্ধে যা ভাবেন, অন্যকেও সেই দিক দিয়ে মৃত্যুকে বিচার করতে বলেন, মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর কন্‌সেপ্‌শন কি, সে বিষয় একটু ইঙ্গিত দেই। তাঁর এক অল্পবয়স্ক স্নেহভাজন ছাত্রের মৃত্যু উপলক্ষেই তিনি গান লিখেছিলেন—

"জীবনে যত পূজা হোল না সারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা
যে ফুল না ফুটিতে
ঝরেছে ধরণীতে
যে নদী মরু পথে হারালো ধারা
জানিহে জানি তাও হয়নি হারা।
জীবনে আজো যাহা রয়েছে পিছে,
জানিহে জানি তাও হয়নি মিছে।
আমার অনাগত
আমার অনাহত
তোমার বীণা-তারে বাজিছে তারা
জানিহে জানি তাও হয়নি হারা।"

এই জীবনের উপর মৃত্যু যখন তাঁর দুঃখের কালো পর্দ্দা টেনে দেয়, তখন সেই পর্দ্দাকেই আমরা চরম ব'লে মেনে নিই এবং সেই জন্যেই সংসারে প্রিয়জনের মৃত্যু ঘটলে আমরা হই অতি মাত্রায় চঞ্চল এবং সেই চাঞ্চল্য হতেই অনেকটা প্রমাণ হয়ে যায় যে আমরা অধিকাংশেরা কেবল-মাত্র বুদ্ধিজীবী নই—আমরা রক্তে মাংসে গড়া মানুষও বটি। কিন্তু যাঁদের চোখের সামনে ঐ কালো পর্দ্দাটা চরম ও শেষ কথা না কয়ে অন্তহীনের বাণী বলে, বলে, অশেষ পথে ক্রমাগত বিকশিত হবার পরম বার্ত্তা, তাঁদের কাছে মৃত্যুর রূপ, হয়ত বন্ধুর রূপ। কাজেই মৃত্যুকে যাঁরা ভয় পান না, তাঁদের মধ্যে আমরা অসাধারণ মনুষ্যত্বের একটা পরিচয় পাই, ও সেই মনুষ্যত্বের পরিচয়টা ফোটে রক্তে মাংসে তৈরী মানুষেরই ভিতর দিয়ে।

নিজের স্বাস্থ্য নিয়ে, নিজের চিন্তা নিয়ে, রবীন্দ্রনাথ কত রকম যে পরীক্ষা করেন, তার গুনতি করা যায় না। এই রাজ্যেও সেই একই ধর্ম্ম, একঘেয়ে দৈনন্দিন-পাকে বাঁধা না পড়বার চেষ্টা। একবার বেশ মনে পড়ে, কবির ইচ্ছে গেল, কেবল কাঁচা শাকসব্‌জি খেয়ে থাকবেন। যেমনি ইচ্ছে অমনি কাজ।

(১) গজ ওঠা কাঁচা মুগ (এটা বহুকেলে অভ্যেস)
(২) কচি মূলো শাক
(৩) সরষে শাক
(৪) পালঙ্ শাক

(৫) পেঁপে,

(৬) কচি মূলো

(৭) কচি শসা—ইত্যাদি

সঙ্গে বড় জোর ২।১ স্লাইস্ রুটি।

দুই বেলা চল্‌ল এই রকম, কিছুদিন ধরে। তারপর দেখা গেল, শরীরে পরীক্ষা সইছে না—ছেড়ে দিলেন। একবার দেখি—(বেক্‌ড পটাটো, পোড়া আলু বা আলু পোড়া খাওয়া ভাল), রাঙাআলু পোড়া খাওয়া চল্‌ছে। সেটাও শেষ পর্য্যন্ত টিক্‌ল না। বিপদ হয় যখন তিনি আশে পাশের অন্যদের পরম উৎসাহে খাদ্য ব্যাপারে ঐ রকমের পরীক্ষা করতে বলেন। বেশ মনে পড়ে—ছোট তখন আমি, চা খাচ্ছি কবির সঙ্গে। টেবিলে সাজানো উত্তম আহার্য্য বস্তু সবই খেতে দিলেন। কিন্তু তাঁর নিজের জন্য একটি কাঁচের গ্লাসে সবুজ রঙের যে পানীয়টি ছিল, তা দিলেন না। মনে মনে বললুম, নিশ্চয়ই ওটা উত্তম কিছু, তাই কবি ওটার ভাগ কাউকে দিতে চান না। একদিন যায়, দুদিন যায়, অবশেষে মুখ ফুটে বললুম ও জিনিসটা কি? তিনি সামান্য একটু হেসে, অথচ বেশ গাম্ভীর্য্য রক্ষা কোরে আর একটি গেলাসে আধ গেলাস ঐ সরবৎ ঢেলে বললেন, "যদি রোজ খেতে পার খুব উপকার হবে।" খোশ-মেজাজে দিলাম চুমুক—আঃ ছিঃ, বিশ্রী তেতো! কবি তখন হো হো ক'রে হেসে উঠে বললেন, "এই জন্যই ওটা কাউকে দেই না। কিন্তু তোমার লোভের একটা শাস্তি হওয়া দরকার ব'লে ভাবলুম আসল তত্ত্ব ফাঁস না করে, আগে খাইয়ে নিই।" ও রসটি কাঁচা নিমপাতা-বাটা। প্রায়ই ওটা পান করেন, পান করবার সময় মুখভঙ্গিমায় প্রকাশ পায় না যে উৎকট তিক্ত রসনাকে সিক্ত করেছে।

সময় নিয়ে খেলা করা এটাও দেখি তাঁর ধর্ম্ম। আলস্যে দিন তাঁর কাটে না। যখন কবিতা বন্ধ তখন গান লিখ্‌ছেন, যখন কবিতা-গানের মরসুম বন্ধ তখন প্রবন্ধ রচনা। যখন সিরিয়াস্ কিছু করবার মতন মনের অবস্থা নয় তখন হাল্কা-ছন্দে হাল্কা ভাবে হয়ত আটপহুরে বিষয়ের উপর হাস্য রসের কবিতা লিখে ফেললেন। কলম যদি নিতান্তই বিশ্রাম চায় তো ছবির তুলি ওঠে জেগে। তুলিও যদি বলে আমি ছবি আঁকব না, তা হ'লে বিবিধ বিষয়ের বই পড়তে বসে যান। সম্প্রতি দেখছি, বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় বই পড়েন বেশী। কয়েক দিন আগে দেখেছি, মানুষের ফিজিওলজীর একটা নূতন বই পড়ছেন। শুধু পড়া নয়, একেবারে ডাক্তারবাবুর কাছে খবর গেল যে, বইটা পড়া হ'লে, ডাক্তারবাবুকে কবির সামনে বসে, ডিসেক্‌ট ক'রে দেখাতে হবে, ছাগের হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, যকৃৎ, প্লীহা। ঐ বইএর লেখার সঙ্গে ডিসেক্‌শনের হিসেব মিলিয়ে নেবেন কবি। পাঠকবর্গ মনে রাখবেন কবির বয়েস উনাশি বৎসর। কিন্তু নব নব দিক থেকে জ্ঞানার্জ্জনের উৎসাহ উদ্যম এখনও পর্য্যন্ত কী প্রবল! কিন্তু এ সবই তাঁর পক্ষে কতকটা রিক্রিয়েশন। কবিতায় কিম্বা গানে পেলে এসব বই ছিকেয় উঠে যায়। চিকিৎসাসংক্রান্ত বই বা প্রবন্ধ পড়ায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ। বিশেষ ধ্যান দিয়ে এ সব বই পড়েন। কিছুদিন হ'ল একদিন যখন সিরিয়াস্ কিছু করবার নেই, তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি শ্রীমান অনিলকুমার চন্দ এবং আমাকে উপলক্ষ ক'রে দিলেন লিখে একটা ছড়া। আট-পহুরে সময় নষ্টের একটা কবিজনোচিত চেষ্টা। সেক্রেটারিদের সঙ্গে তিনি যে সম্বন্ধ রক্ষা করেন সেটাকে কোনদিন প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধ বলা চলে না। প্রায়ই আমি আর অনিল কবির সঙ্গে চা খাই।

সে সময় মানুষ রবীন্দ্রনাথ যে সব কথা আমাদের বলেন, সব যদি নোট করা থাকত, তা হ'লে বিরাট গ্রন্থ হয়ে পড়ত। যাক্ সে কথা। সেদিনকার কবিতাটি দেখছি সম্প্রতি শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী-সম্পাদিত ভাদ্রের (সন ১৩৪৬ সাল) 'বঙ্গলক্ষ্মী'তে ছাপা হয়েছে। এই রচনায় সেই কবিতাটির সন্নিবেশন প্রাসঙ্গিক ব'লেই 'বঙ্গলক্ষ্মী' থেকে সেটি উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি, কবিতাটি এই—

ধ্যানভঙ্গ

পদ্মাসনার সাধনাতে দুয়ার থাকে বন্ধ,
ধাক্কা লাগায় সুধাকান্ত, লাগায় অনিল চন্দ।
ভিজিটরকে এগিয়ে আনে, অটোগ্রাফের বহি
দশ-বিশটা জমা করে, লাগাতে হয় সহি।
আনে ফটোগ্রাফের দাবি, রেজেষ্টারি চিঠি,
বাজে কথা, কাজের তর্ক, নানান খিটিমিটি।
পদ্মাসনের পদ্মে দেবী লাগান মোটরচাকা,
এমন দৌড় মারেন তখন, মিথ্যে তাঁরে ডাকা।
ভাঙা ধ্যানের টুকরো যত খাতায় থাকে পড়ি'
অসমাপ্ত চিন্তাগুলোর শূন্যে ছড়াছড়ি।

সত্য যুগে ইন্দ্রদেবের ছিল রসজ্ঞান,
মস্ত মস্ত ঋষিমুনির ভেঙে দিতেন ধ্যান,
ভাঙন কিন্তু আর্টিষ্টিক, কবিজনের চক্ষে
লাগত ভালো, শোভন হোত দেবতাদিগের পক্ষে।
তপস্যাটার ফলের চেয়ে অধিক হোত মিঠা
নিস্ফলতার রসমগ্ন অমোঘ পদ্ধতিটা।
ইন্দ্রদেবের অধুনাতন মেজাজ কেন কড়া,
তখন ছিল ফুলের বাঁধন, এখন দড়িদড়া।
ধাক্কা মারেন সেক্রেটরি, নয় মেনকা রম্ভা
রিয়লিষ্টিক আধুনিকের এই মতোই ধরম বা।
ধ্যান খোয়াতে রাজি আছি দেবতা যদি চান তা,
সুধাকান্ত না পাঠিয়ে পাঠান সুধাকান্তা।
কিন্তু জানি ঘটবে না তা, আছেন অনিল চন্দ,
ইন্দ্রদেবের বাঁকা মেজাজ, আমার ভাগ্য মন্দ।
সইতে হবে স্থূল হস্ত-অবলেপের দুঃখ,
কলিযুগের চালচলনটা একটুও নয় সুক্ষ্ম॥

হাস্যরসের একটি সহজ প্রকাশ তাঁর মধ্যে আছে। তাঁর স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য্যের মধ্যে মাঝে মাঝে এক একটি রসাত্মক বাক্য শ্রোতাদের মনে চমক লাগিয়ে দেয়। এই সেদিনের কথা, চা-এ বসেছি আমি আর শ্রীযুক্ত তেজেশচন্দ্র সেন। একটা বইতে কি একটা কথা ছিল, ঔষধসংক্রান্ত, আমাকে কবি বললেন "পড়ে দেখ, যদি মনে কর এ ওষুধ আনানো দরকার আনিয়ে নিও।"—আমার নিজের চশমা কাছে না থাকায় আমি তেজেশবাবুর চশমা নিয়ে লেখাটা পড়লুম। কবি হেসে বললেন, "তেজেশ তোমার বন্ধু সেইজন্যেই বুঝি তোমাদের "সমদৃষ্টি"।" সময় ও সুযোগ হ'লে বারান্তরে এই রকমের "রবীন্দ্র-পরিচয়" উপহার পাঠকবর্গের কাছে পাঠা'ব।

ট্রেণে আধঘণ্টা

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ট্রেণ ষ্টেশন ছাড়িয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময়ে মণীশ ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া একটা ছোট ইণ্টার ক্লাস কামরায় উঠিয়া পড়িল।

রাত্রি এগারটা পঁচিশের প্যাসেঞ্জার ধরিয়া আজ বাড়ী ফিরিবার কোনো আশাই তাহার ছিল না; করুণাকেও বলিয়া আসিয়াছিল যে সকালের গাড়ীতে অন্যান্য বরযাত্রীদের সঙ্গে সে ফিরিবে। কিন্তু হঠাৎ সুযোগ ঘটিয়া গেল।

আজ বৈকালের গাড়ীতে এক বন্ধুর বিবাহে তাহারা বরযাত্রী আসিয়াছিল। পাশাপাশি দুটি ষ্টেশন—মাঝে মাত্র পনের মাইলের ব্যবধান, ট্রেণে আধ ঘণ্টার বেশী সময় লাগে না। কিন্তু অসুবিধা এই যে এগারটা পঁচিশের পর রাত্রে আর গাড়ী নাই। তাই স্থির হইয়াছিল যে, রাত্রে ফেরা যদি সম্ভব না হইয়া উঠে, পরদিন প্রাতে ফিরিলেই চলিবে। সকলেই প্রায় রেলের কর্ম্মচারী,—রেল তাহাদের ঘর-বাড়ী।

এগারটা বাজিয়া পাঁচ মিনিটের সময় আহার শেষ করিয়া অন্যান্য বরযাত্রীরা যখন গাড়ী ধরিবার আশা ত্যাগ করিয়া পান-সিগারেটের জন্য হাঁকাহাঁকি করিতেছিল, সেই ফাঁকে মণীশ কাহাকেও কিছু না বলিয়া চুপি চুপি সরিয়া পড়িয়াছিল। বিবাহ বাড়ী হইতে ষ্টেশন পাকা দুই মাইল,—এই কয় মিনিটে এতটা পথ হাঁটিয়া আসিয়া সে এই মাঘ মাসের শীতেও ঘামিয়া উঠিয়াছিল। চুরি করিয়া বন্ধুর বিবাহের আসর হইতে পলাইয়া আসার জন্য পরে তাহাকে লজ্জায় পড়িতে হইবে তাহাও বুঝিতেছিল, কিন্তু তবু রাত্রেই বাড়ী ফিরিবার দুরন্ত লোভ সম্বরণ করিতে পারে নাই। বাসায় আর কেহ নাই—করুণা সারারাত একলা থাকিবে—দিনকাল খারাপ এম্‌নি কয়েকটা কৈফিয়ৎ সে মনে মনে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিল।

করুণার জন্য বস্তুত ভয়ের কোনো কারণ ছিল না। ষ্টেশনের কাছেই মণীশের কোয়ার্টার, আশেপাশে অন্যান্য রেল-কর্ম্মচারীদের বাসা; আজিকার বরযাত্রীদের মধ্যে তাহার মত অনেকেই তরুণী স্ত্রীকে একলা রাখিয়া আসিয়াছিল। প্রয়োজন হইলে নাইট ডিউটির সময় সকলকেই তাহা করিতে হয়, কখনো কাহারও বিপদ উপস্থিত হয় নাই। তবু যে মণীশ রাত্রেই বাড়ী ফিরিবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল তাহার একমাত্র কারণ— ; কিন্তু ওটা একটা কারণ বলিয়াই গ্রাহ্য হইতে পারে না। সত্য বটে, মণীশের মাত্র দুই বছর বিবাহ হইয়াছে এবং বৌ ছাড়িয়া থাকিতে পারে না—এমন বদনামও তাহার রটিয়া গিয়াছে; কিন্তু কৈফিয়ৎ হিসাবে ওকথা উত্থাপন করা অতীব লজ্জাকর।

সে যাহোক, বারটার মধ্যেই সে বাড়ী পৌঁছিয়া যাইবে, আধ ঘণ্টার পথ। হয়ত করুণা লেপের মধ্যে ঢুকিয়া পরম আরামে ও গরমে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হয়ত কেন, নিশ্চয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, করুণা মোটে রাত জাগিতে পারে না। মণীশকে হঠাৎ দেখিয়া তাহার ঘুমন্ত চোখে বিস্ময়

ও আনন্দ ফুটিয়া উঠিবে। মণীশ পরিপূর্ণ তৃপ্তির একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বেঞ্চির উপর বসিয়া পড়িল। ট্রেণ তখন সবেগে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

কামরার মধ্যে দুইটি লোক। একজন একটা বেঞ্চি জুড়িয়া লম্বাভাবে লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া কেবল মুখটি বাহির করিয়া ছিলেন; গোলাকৃতি থলথলে মুখমণ্ডলে হপ্তাখানেকের দাড়ি গজাইয়া কৃষ্ণতার একটা গাঢ়তর প্রলেপ লাগাইয়া দিয়াছিল; তিনি শুইয়া শুইয়া অনিমেষ চক্ষে মণীশকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। অপর ব্যক্তিকে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক বলিয়া বোধ হয়,—সেও একটা বিলাতী কম্বল গায়ে দিয়া অন্য ধারের বেঞ্চির কোণে ঠেসান দিয়া বসিয়া ছিল এবং পরম কৌতূহলের সহিত মণীশকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। তাহার চেহারা রোগা—হাড় বাহির করা, গাল বসিয়া গিয়া চোয়ালের অস্থি অস্বাভাবিক রকম উঁচু হইয়া উঠিয়াছে, দুই চোখের কোলে গভীর কালির আঁচড়। এই দুই যাত্রীর মধ্যে একটা বেশ রসালো গল্প জমিয়া উঠিয়াছিল, মণীশের আগমনে তাহা অর্দ্ধপথে থামিয়া গিয়াছে।

মণীশ বসিলে রোগা লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, 'কদ্দূর যাওয়া হবে?'

মণীশ বলিল, 'আমি পরের ষ্টেশনেই নেমে যাব।'

একজাতীয় লোক আছে, রেলে উঠিয়াই অন্য যাত্রীদের পরিচয় গ্রহণ করিবার অদম্য আগ্রহ তাহাদের চাপিয়া ধরে। রোগা লোকটি সেই শ্রেণীর। মণীশের রূপালী বোতামলাগানো কালো রঙের ওভারকোট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি রেলেই কাজ করেন?'

'হ্যাঁ, আমিও ষ্টেশনের পার্সেল ক্লার্ক্।'

লোকটি তখন হাসিয়া বলিল, 'বেশ বেশ। আসুন, এই কম্বলের ওপর বসুন। আমি অনেক রকম লোকের সঙ্গে মিশেছি, কিন্তু রেলের বাবুদের মতন এমন মাই-ডিয়ার লোক খুব কম দেখা যায়। কিছুতেই পেছপাও নন। তা মশায়ের জলপথে চলা অভ্যাস আছে কি? যদি থাকে, মালের অভাব হবে না।'

মণীশ একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, 'জলপথ?'

লোকটি রসিক, একটা শিহরণের অনুকরণ করিয়া বলিল, 'মাঘ মাসের শীত, তার ওপর ট্রেণ-জার্নি। শরীর গরম থাকে কি ক'রে, বলুন দেখি।'

মণীশ হাসিয়া ফেলিল, 'ও, বুঝেছি। না, আমার ও-জিনিষ চলে না। কিন্তু আপনি যদি চালাতে চান, কোনো বাধা নেই।'

লোকটি বেঞ্চির তলা হইতে একটি হ্যাণ্ড-ব্যাগ তুলিয়া লইয়া তাহার ভিতর হইতে একটি বোতল ও গেলাস বাহির করিল, বোতলের তরল পদার্থ গেলাসে ঢালিতে ঢালিতে বলিল, 'একলা এ জিনিষ খেয়ে সুখ হয় না। ও-ভদ্রলোককে অফার করলুম, তা উনিও এ রসে বঞ্চিত। বলুন দেখি, এর মত ফুর্ত্তির জিনিষ পৃথিবীতে আর আছে কি?'

মণীশ মৃদুহাস্যে বলিল, 'তা ত বটেই।'

গেলাসের পানীয় গলায় ঢালিয়া দিয়া উৎসাহিতভাবে লোকটি বলিল, 'সেই কথাই এতক্ষণ

ও-ভদ্রলোককে বলছিলুম, দুনিয়ায় আসা কিসের জন্যে ? ফূর্ত্তি করার জন্যে। যতদিন বেঁচে আছি, প্রাণ ভ'রে মজা লুটব, কি বলেন ?'

মণীশ যতই গৃহের নিকটবর্ত্তী হইতেছিল ততই উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছিল, বলিল, 'ঠিক কথা।'

বোতল গেলাস ব্যাগে পুরিয়া নামাইয়া রাখিয়া লোকটি পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিল, একটি নিজে ঠোঁটে ধরিয়া মণীশকে একটি দিল। সিগারেট ধরাইয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, 'আমার নাম চারুচন্দ্র গুপ্ত, ইন্সিওরেন্সের দালালী করি, ছত্রিশ বছর বয়স হয়েছে। অনেক বাজার ঘেঁটে বেড়িয়েছি মশায়; কিন্তু এ দুনিয়ায় সার বস্তু যদি কিছু থাকে তো সে ওই বোতল, আর—; বুঝেছেন তো ?'

মণীশ সিগারেট টানিতে টানিতে বলিল, 'হুঁ।'

চারুচন্দ্র গুপ্ত বলিল, 'এতে লজ্জাই বা কি ? পুরুষ হয়ে জন্মেছি কি জন্যে ? মজা লুটব বলে। কিন্তু মশায়, একটি বিষয়ে আপনাদের সাবধান করে দি, যদি ফূর্ত্তি করতে চান, বিয়ে করবেন না। খবরদার। খবরদার। ও পথে হেঁটেছেন কি সব ভেস্তে গেছে।'

মণীশ কোনো কথা বলিল না, চারু আবার আরম্ভ করিল, 'এই আমাকেই দেখুন না—পনের বছর বয়স থেকে ফূর্ত্তি করতে আরম্ভ করেছি, কখনো ঠকেছি কি ? নিজে রোজগার করি, নিজের ফূর্ত্তিতে ওড়াই, কারুর তোয়াক্কা রাখি না। ক্যা মজায় আছি বলুন ত ? কিন্তু বিয়ে করলে এটা হত কি ? অ্যাদ্দিনে সতেরটা ছানা গজিয়ে যেত। প্যান্-প্যান্ ঘ্যান্-ঘ্যান্, ডাক্তার আর ঘর, একবার ভেবে দেখুন দিকি !'

মণীশ এবারও চুপ করিয়া রহিল। লেপের মধ্যে শয়ান লোকটির মুখ দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, অবিবাহিত জীবনের অপ্রাপ্য সুখৈশ্বর্য্যের কথা স্মরণ করিয়া এখনি তাঁহার মুখ দিয়া নাল গড়াইয়া পড়িবে। তিনি কোনো মতে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, 'যে গল্পটা হচ্ছিল, সেটাই হোক না।'

চারু মণীশকে বলিল, 'ওঁকে আমার জীবনের ইতিহাস শোনাচ্ছিলুম, ইতিহাস ত নয়, মহাভারত। পনের বছর বয়স থেকে আজ পর্য্যন্ত কত কাণ্ডই যে করলুম! শুনলে বুঝবেন।' গলা খাটো করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কখনো প্রেমে প'ড়েছেন ?'

মণীশ সভয়ে বলিয়া উঠিল, 'না।'

লেপ-ঢাকা ভদ্রলোকটি স্মরণ করাইয়া দিলেন, 'ওটা হয়ে গেছে। শাল্‌কের গল্পটা বলছিলেন।'

চারু বলিল, 'হ্যাঁ, শাল্‌কের গল্পটা। কিন্তু ওতে নূতনত্ব কিছু নেই মশায়। অমন দশটা আমার জীবনে হয়ে গেছে।'

মণীশ ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'শাল্‌কের গল্প ?'

চারু বলিল, 'হ্যাঁ, তখন আমি শাল্‌কেয় থাকি। বছর তিনেক আগেকার কথা।—ঠিক পাশের বাড়ীতেই, বুঝলেন কিনা, একটি ষোলো বছরের তরুণী। খাসা দেখতে মশাই, রঙ্ ফেটে পড়ছে, ঠিক বাঁ চোখের নীচে একটি তিল, আর গড়ন, সে কথা না-ই বললুম, মনে মনে বুঝে নিন। এক কথায় যাকে বলে—রমণী। বলুন দেখি, লোভ সাম্‌লানো যায় ?

তা'র তখনো বিয়ে হয়নি, তবে হব-হব করছিল। আমি দেখলুম, বিয়ে হলেই ত পাখী উড়বে ; অতএব তার আগেই বুঝলেন কিনা ? মতলব ঠিক করে জানলা দিয়ে চিঠি ফেলতে আরম্ভ করলুম। চিঠি যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছুচ্ছে কিন্তু জবাব নেই। সে আগে জানলায় এসে দাঁড়াত, আজকাল আর তাও দাঁড়ায় না ; আমাকে দেখে মুখ রাঙা করে সরে যায়। কিন্তু আমিও পুরোনো ঘাগী, অত সহজে ছাড়বার পাত্র নই। লেগে রইলুম। বুঝলুম কিছুদিন খেলবে। তারপর দিন পনের পরে হঠাৎ একদিন জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে খুব গরম হয়ে বললে, 'আপনি আমাকে যদি আর চিঠি দেন, বাবাকে বলে দেব।'

চারু কিছুক্ষণ মনে মনে হাসিয়া বলিল, 'বাবাকে বলে দেব কথাটা সব মেয়েরই বাঁধি গৎ, বুঝেছেন। ন্যাকামি। আসলে পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ। আমি আরো প্রেম্সে চিঠি চালাতে লাগলুম। কিন্তু এক হপ্তা কেটে গেল, তবু সে কোনো সাড়াশব্দ দিলে না। অবিশ্যি বাপকেও বললে না, সেকথা বলাই বাহুল্য।

বাড়ির ঝিটাকে আগে থাকতেই টাকা খাইয়ে হাত করেছিলুম, ঠিক করলুম, এবার আর চিঠি নয়, অন্য চাল চাল্‌তে হবে। খবর পেলুম, রোজ সন্ধ্যের পর ছুঁড়ি খিড়কির বাগানে যায়। একদিন শর্ম্মাও পাঁচিল ডিঙিয়ে সেখানে গিয়ে হাজির। আচমকা আমাকে দেখে তো সে আঁৎকে উঠল, পালাবার চেষ্টা করলে। আমি পথ আগলে দাঁড়ালুম, থিয়েটারি কায়দায় বললুম, 'বুক ফেটে যাচ্ছে তোমার জন্যে।' সে চেঁচামেচি করে লোক ডাকবার চেষ্টা করলে। আমি তখন নিজ মূর্ত্তি ধারণ করলুম, বললুম, 'চেঁচালে কোনও ফল হবে না। আমি বড় জোর দু'ঘা মার খাব, কিন্তু তোমার ইহকাল পরকালের দফা রফা, সেটা ভেবে চেঁচিয়ে লোক জড় কর।'

মেয়েটা চেঁচালে না বটে, কিন্তু তবু বাগ মানতে চায় না। তখন আমি ব্রহ্মাস্ত্র ঝাড়লুম, বললুম, 'আমার দু'জন মুসলমান বন্ধু পাঁচিলের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে। চেঁচামেচি গোলমাল করেছ কি তারা এসে মুখে কাপড় বেঁধে—বুঝলে ? কিন্তু যদি ভাল কথায় রাজি হও তাহলে আর কেউ জানবে না, শুধু তুমি আর আমি।' চারু আবার ব্যাগটা বাহির করিল, বোতল হইতে গেলাসে মদ ঢালিতে প্রবৃত্ত হইল।

লেপ-ঢাকা ভদ্রলোকটির চোখ হইতে লুব্ধতা ঝরিয়া পড়িতেছিল, তিনি প্রশ্ন করিলেন, 'তারপর ?'

গেলাস গলায় উপুড় করিয়া ঢালিয়া দিয়া চারু একটু মুখ বিকৃত করিল, তারপর হাসি হাসি মুখে বলিল, 'তারপর আর কি—হে হে—রাজি হয়ে গেল।'

মণীশের হাতের সিগারেট অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় নিবিয়া গিয়াছিল, সমস্ত শরীর শক্ত করিয়া সে এই কাহিনী শুনিতেছিল। এখন হঠাৎ সিগারেটের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে সেটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

চারু বলিল, 'কিন্তু হলে কি হবে মশায়, মেয়েটা পোষ মানলে না। তারপর থেকে খিড়কির বাগানে আসাই ছেড়ে দিলে। ওদিকে বিয়ের সম্বন্ধও ঠিক হয়ে গিয়েছিল, আমারও শাল্‌কের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল'—ব্যাগটা আবার বেঞ্চের নীচে রাখিয়া দিল, 'দিন কয়েক পরে আমিও

শালুকে ছেড়ে দিলুম, তার বিয়েটা আর দেখা হল না।—বলিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল।

ট্রেণের বেগ ডিস্টাণ্ট-সিগ্নালের কাছে আসিয়া মন্দীভূত হইল। চারু আর একটা সিগারেট ধরাইয়া বাক্সটা মণীশের দিকে বাড়াইয়া দিল, বলিল, 'খান আর একটা। আপনার তো এসে পড়ল! শুনলেন তো গল্পটা? এর পর আর কোন ভদ্রলোকের বিয়ে করতে সাধ হয়? ভাবুন দেখি, আমার কপালেই যদি ঐ রকম একটি; নিন না—'

মণীশ হাত নাড়িয়া সিগারেট প্রত্যাখান করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মণীশের মুখখানা স্বভাবত খুব ধারাল না হইলেও বেশ সুশ্রী, কিন্তু গত কয়েক মিনিটের মধ্যে তাহা শুকাইয়া কুঁকড়াইয়া যেন কদাকার হইয়া গিয়াছিল। গাড়ি প্ল্যাটফর্মে থামিতেই সে কম্পিত হস্তে হাতল ঘুরাইয়া নামিবার উপক্রম করিল।

চারু বলিল, 'আচ্ছা, তাহলে নমস্কার মশায়।'

মণীশ নামিতে গিয়া হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার অন্তরে একটা ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল, সে মনে মনে বলিতেছিল, না, জিজ্ঞাসা করব না, জিজ্ঞাসা করব না; কিন্তু শেষে আর পারিল না, স্খলিতকণ্ঠে বলিল, 'মেয়েটির নাম কি?'

চারু বলিল, 'নাম? নামটা, রসুন, করুণাময়ী, কিন্তু নামের সঙ্গে চরিত্রের একটুও মিল নেই মশায়, হ্যা হ্যা, আচ্ছা, নমস্কার নমস্কার।'

* * *

মণিমণ্ডিত-দেহ বিষোদগারী সর্পের মত অন্ধকার আকাশে গাঢ় ধূম নিক্ষেপ করিতে করিতে ট্রেণ চলিয়া গেল।

মণীশও একটা হোঁচট খাইয়া প্ল্যাটফর্মের বাহিরে আসিল। টিকেট-কলেক্টর তাহার বন্ধু, ডিউটির জন্য সে বরযাত্রী যাইতে পায় নাই, নিদ্রাজড়িত স্বরে তাহাকে কি জিজ্ঞাসা করিল, মণীশ শুনিতে পাইল না।

স্টেশন হইতে একশত গজের মধ্যেই মণীশের ছোট্ট লাল ইটের বাসা; অন্ধকার পথ দিয়া এক রকম অভ্যাসবশেই সে সেই দিকে চলিল। মাথার মধ্যে তাহার রক্ত ঘুরপাক খাইতেছিল! করুণা! করুণা এই! আজ দুবছর ধরিয়া সে অন্যের উচ্ছিষ্ট নারীকে নিজের একান্ত আপনার স্ত্রী বলিয়া ভাবিয়া আসিতেছে! একদিনের জন্যেও সন্দেহ করে নাই যে করুণা তাহাকে ঠকাইতেছে। উঃ, এই করুণা!

একটা শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিয়া সে বাহ্য চেতনা ফিরিয়া পাইল। দেখিল তাহার শরীরের সমস্ত পেশীগুলা শক্ত হইয়া আছে। মুষ্টিবদ্ধ হাতের নখ হাতের তেলোয় বিঁধিয়া জ্বালা করিতেছে। সে জোর করিয়া পেশীগুলা শিথিল করিয়া দিল; তারপর দ্রুতপদে বাড়ির দিকে চলিল। করুণা একটা—

কি করা যায়! এরূপ অবস্থায় মানুষ কি করে? খুন!···হাঁ, খবরের কাগজে তো এমন অনেক দেখা যায়। যাহার স্ত্রী কুমারী অবস্থায় লম্পট দ্বারা উপভুক্ত হইয়াছে, সে আর কি করিতে পারে? করুণাকে খুন করিয়া নিজে ফাঁসি যাওয়া ছাড়া অন্য পথ কোথায়?

কিন্তু—, মণীশ থমকিয়া রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া পড়িল। সেই লম্পটটাকে সে ছাড়িয়া দিল কেন? তাহাকে আগে খুন করিয়া তারপর করুণাকে—

বাড়ির সম্মুখস্থ হইয়া সে দেখিল, তাহার শয়নঘরের জানালা দিয়া আলো আসিতেছে। আলো কিসের? করুণা তো ঘুমাইয়াছে। তবে কি—?

পা টিপিয়া টিপিয়া চোরের মত গিয়া মণীশ জানালার কাচের ভিতর দিয়া উঁকি মারিল। দেখিল, করুণা মেঝেয় কম্বল পাতিয়া একটা র‍্যাপার গায়ে জড়াইয়া বসিয়া বই পড়িতেছে।

মণীশ কিছুক্ষণ হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর গিয়া দরজায় ধাক্কা মারিল, চাপা বিকৃতস্বরে বলিল, 'দোর খোল।'

করুণা দোর খুলিয়া দিতেই মণীশ ঘরে ঢুকিয়া দরজার খিল আঁটিয়া দিল, তারপর করুণার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

করুণা মৃদু হাসিয়া বলিল, 'আমি জানতুম তুমি এ গাড়িতে ফিরে আসবে, তাই শুই নি।'

মণীশের মাথার ভিতরটা যেন ওলট-পালট হইয়া গেল। এই কথাগুলির পরিপূর্ণ অর্থ পরিগ্রহ করিবার শক্তি তাহার ছিল না; তবু সে অস্পষ্টভাবে অনুভব করিল যে, ইহার বেশী আর কেহ কোন দিন পায় নাই, প্রত্যাশা করিবার অধিকারও কাহারও নাই। নিশীথরাত্রে তাহার জন্য করুণার এই নিঃসঙ্গ প্রতীক্ষা, ইহার তুল্য পৃথিবীতে আর কি আছে?

'করুণা!'

সহসা সে দুই হাত বাড়াইয়া করুণাকে বুকে চাপিয়া ধরিল। এত জোরে চাপিয়া ধরিল যে, করুণার শ্বাস রোধের উপক্রম হইল। সে হাঁপাইয়া উঠিয়া বলিল, 'কি?'

মণীশ তাহার গলার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া দিয়া অবরুদ্ধ স্বরে বলিল, 'কিছু না। ট্রেণে আসতে আসতে বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। উঃ! এমন বিশ্রী দুঃস্বপ্ন দেখলুম! চল শুইগে।'



বিপিনের সংসার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেনা জড়াইয়া গিয়াছে একরাশ। তিন মাস বাড়ী বসিয়া থাকার দরুণ, বলাইয়ের চিকিৎসার দরুণ। কোনো দোকানে আর ধার পাইবার যো নাই।

কৃষ্ণলাল চক্রবর্ত্তী সংসারের বন্ধু, দুবেলাই যাতায়াত করেন, খোঁজখবর যা নেবার, তিনিই লইয়া থাকেন, অন্য লোকে বড় একটা ইহাদের লইয়া মাথা ঘামায় না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা রোয়াকে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে কৃষ্ণলাল বলিলেন, পলাশপাড়া যাবার তোমার আর দেরি কিসের হে বিপিন? বেরিয়ে পড়, চলে যাও এবার। তোমার দোষ একবার বাড়ী এসে চেপে বস্‌লে তুমি নড়্‌তে চাও না।

বিপিন বলিল, সে চাকরী আর এতদিন কি আছে কাকা? সে গিয়েচে।

—কি করে জানলে?

—জানাজানি নয়, তবে আমি ধাত বুঝি কি না!

—ওসব কথা নয়, তুমি চলে যাও।

—আপনার কাছে আর লুকোব না কাকা, চাকরী গিয়েচে আজ মাস খানেক হোল, অনাদিবাবু চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যদি আমি এক হপ্তার মধ্যে না ফিরি, তিনি অন্য লোক রাখতে বাধ্য হবেন। সে চিঠির উত্তর দিই নি।

—চিঠির উত্তর দাও নি? না খেতে পেয়ে কষ্ট পাচ্চ সে ভালো খুব, না? তোমার উপায় যে কি হবে আমি কিছু বুঝি নে বাপু। না, শোনো, আমার মনে হয় তোমার চাকুরী এখনও যায় নি। নতুন লোক খুঁজে পাওয়া শক্তও বটে, আর বিশ্বাস যাকে তাকে করাও যায় না বটে। তুমি যাও, কাল সকালেই দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়।

—বেরিয়ে পড়্‌বো কাকা, তবে সে দিকে নয়। আমি ডাক্তারি কর্‌বো ভেবে রেখেচি অনেক দিন। ওই সোনাতনপুর, কামার গাঁ, পিপ্‌লিপাড়া এসব অঞ্চলে ডাক্তার নেই। কে যাবে ওসব অজ পাড়াগাঁয়ে মরতে? আমি সোনাতনপুর বস্‌বো ভেবেচি। সোনাতনপুরের রামনিধি দত্ত ওখানকার মধ্যে একজন বিশিষ্ট লোক, সেখানে গিয়ে বাবার পরিচয় দিয়ে ওই গাঁয়েই বস্‌বো। দেখি কি হয়। জমিদারী শাসন আর প্রজা ঠ্যাঙানো, ও আর করচি নে কাকা। বলাই মারা যাওয়ার পর আমি বুঝতে পেরেচি ও কাজে সুখ নেই। আর আমি ওপথে—

কৃষ্ণলাল অবাক হইয়া বলিলেন, ডাক্তারি করবে! ডাক্তারি শিখলে কোথায় তুমি যে ডাক্তারি করবে! যত বদখেয়াল কি তোমার মাথায় আসে!

ডাক্তারি আমি করেচি এর আগেও। ধোপাখালির কাছারিতে বসে। আর শেখার কথা বলচেন, কেন বই পড়ে বুঝি শেখা যায় না? জমিদারবাবুর মেয়ে আমাকে কতকগুলো ডাক্তারি বই দিয়েছিল, তাই পড়ে শিখেচি। সেই আমায় ডাক্তারি করতে পরামর্শ দেয়, কাকা। বলেছিল,

তার এক দেওর বীজপুরে ডাক্তারি করে, তার কাছে গিয়ে শেখার ব্যবস্থা করে দেবে ওই বলেছিল। বেশ চমৎকার মেয়ে, মনটাও খুব ভাল, আমায় বলেছিল—

হঠাৎ বিপিন দেখিল মানীর কথা একবার আসিয়া পড়িয়াছে যখন, তখন ওর কথাই বলিবার ঝোঁকে তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। ডাক্তারির কথা গৌণ, মুখ্য কাজ মানীর সম্বন্ধে কথা বলা। কৃষ্ণকাকার সামনে।

বিপিন চুপ করিল।

কৃষ্ণলাল বলিলেন, জমিদারবাবুর মেয়ে? বিয়ে হয়েচে? তোমার সঙ্গে কি ভাবে আলাপ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, বিয়ে হয়েচে বৈকি। বাইশ বছর বয়েস। আমার সঙ্গে তো ছেলেবেলা থেকেই আলাপ ছিল কিনা। বাবার সঙ্গে ওদের বাড়ী ছেলেবেলায় যেতাম, তখন থেকেই আলাপ। এক সঙ্গে খেলা করেচি। এখনও আমাকে যত্ন আত্যি করে বড্ড, আর কিসে আমার ভাল হবে সর্ব্বদা ওর সেদিকে—

বিপিনের গলার সুরে কৃষ্ণলাল একটু আশ্চর্য্য হইয়া উহার দিকে চাহিয়াছিলেন, বিপিন আবার দেখিল সে মানীর সম্বন্ধে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলিয়া ফেলিতেছে। কি যেন অদ্ভুত নেশা। মানীর সম্বন্ধে কতকাল কাহারও কাছে কোনো কথা বলে নাই। আজ যখন ঘটনাক্রমে তাহার কথা আসিয়া পড়িয়াছে, তখন আর থামিতে ইচ্ছা করে না কেন? অনবরত তাহার কথা বলিতে ইচ্ছা করে কেন?

বিপিন আবার চুপ করিয়া রহিল।

কৃষ্ণলাল বলিলেন, তা বেশ। তোমার সঙ্গে এবার বুঝি দেখাশুনো হয়েছিল? শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছিল বুঝি?

না, বিপিন আর কিছু বলিবে না। সে সামলাইয়া লইয়াছে নিজেকে। কৃষ্ণলালের প্রশ্নের উত্তরে সংক্ষেপে বলিল, হ্যাঁ। তাহার বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছে, কেমন এক প্রকারের উত্তেজনা। মানীর কথা এতদিন কাহারও সহিত হয় নাই, অনেক জিনিস চাপা পড়িয়াছিল। হঠাৎ অনেক কথা, অনেক ছবি তাহার মনে পড়িয়া গেল মানীর সম্বন্ধে। কান দুটা যেন গরম হইয়া উঠিয়াছে, লাল হইয়া উঠিয়াছে কি দেখিতে? কৃষ্ণলাল কি দেখিতে পাইতেছেন?

দিন পনেরো পরে।

রাত্রে একদিন মনোরমা বলিল, তোমায় তো কোনো কথা বল্লেই চটে যাও। কিন্তু আমার হয়েচে যত গোলমাল, ঝক্কি পোয়াচ্ছি আমি। তিন দিন কাঠা হাতে করে এর ওর বাড়ী থেকে চাল ধার করে আনি, তবে হাঁড়ি চড়ে। আমি মেয়ে মানুষ, ক'দিন বা আমাকে লোকে দেয়? পাড়ায় আর ধার পাওয়া যাবে না, এবার বে-পাড়ায় বেরুতে হবে কাল থেকে। তা আর কি করি, কাল থেকে তাই করবো। ছেলেগুলো উপোস করবে, মা উপোস করবেন, এ তো চোখে দেখতে পারবো না।

মনোরমার কথাগুলি খুব ন্যায্য বলিয়াই বোধ হয় বিপিনের কাছে তিক্ত লাগে। সে ঝাঁঝের সহিত বলিল, তা এখন তোমাদের জন্যে চুরি করতে পারবো না তো। না পোষায়, ভাইকে চিঠি লিখো, দিনকতক গিয়ে বাপের বাড়ী ঘুরে এসো। সোজা কথা আমার কাছে।

মনোরমা কাঁদিতে লাগিল।

নাঃ, বিপিনের আর সহ্য হয় না। কি যে সে করে। চাকুরী তাহার নিজের দোষে যায় নাই। বলাইয়ের অসুখ, বলাইয়ের মৃত্যু, বীণার ব্যাপার, নানা গোলোযোগ। সে ইচ্ছা করিয়া চাকুরী ছাড়িয়া আসে নাই। অথচ স্ত্রী দেখিতেছে সবটাই তাহার দোষ।

রাত্রি অনেক হইয়াছে। পল্লীগ্রামের লোক সকালে সকালেই শুইয়া পড়ে। কোনো দিকে কোনো শব্দ নাই। উত্তর দিকের ভাঙা জানালাটার ধারেই তক্তাপোষখানা পাতা। বিপিন উঠিয়া দালান হইতে তামাক সাজিয়া আনিয়া তক্তাপোষের উপর বসিয়া জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া হুঁকা টানিতে লাগিল। জানালার বাহিরেই কোঠার গায়ে লাগানো ছোট্ট তরকারীর ক্ষেত, বলাই গত চৈত্র মাসে কুমড়া পুঁতিয়াছিল। এখন খুব বড় গাছ হইয়া অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া লইয়াছে বাগানে। তরকারীর ক্ষেতের পর তাহাদের কাঁঠাল গাছ, তারপর রাস্তা, রাস্তার ওপারে নবীন বাঁড়ুয্যের বাঁশঝাড় ও গোহাল। ঘন ঠাস্‌বুনানি কালো অন্ধকার বাঁশঝাড়ের সর্ব্বাঙ্গে অসংখ্য জোনাকি জ্বলিতেছে।

মনোরমার উপর তাহার কেমন সহানুভূতি হইল। বেচারী অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ঘরের মেয়ে, তাহাদের বাড়ীতে অনেক আশা করিয়াই উহার বাপ-মা বিবাহ দিয়াছিলেন। এখন খাইতে পায় না পেট ভরিয়া দুবেলা। পাড়ায় কোথাও সে বাহির হয় না, সমবয়সী বৌ-ঝিয়ের সঙ্গে কমই মেশে, কারণ গরীব বলিয়াও বটে এবং বীণার ব্যাপার লইয়াও বটে, নানা অপ্রীতিকর কথা শুনিতে হয় বলিয়া সে কোথাও বড় একটা যায় না। ঘরের কাজ লইয়াই থাকে।

বিপিন বলিল, কেঁদো না, বলি শোনো।

মনোরমা কথা কহিল না, আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে লাগিল। আধ-ময়লা শাড়ীর আঁচলটা মাদুর হইতে খানিকটা মেঝের উপর লুটাইতেছে। সত্যি কষ্ট হয় দেখিলে।

—শোনো, আমি কাল কি পরশু বাড়ী থেকে যাই। পিপলিপাড়া গিয়ে ডাক্তারি করবো ভেবেছি। তুমি কি বলো? পিপলিপাড়া বেশ গাঁ, চাষীবাসী লোক অনেক। হয়তো কিছু কিছু পাবো। তুমি কি বলো?

স্বামী তাহার মতামত চাহিতেছে, ইহা মনোরমার কাছে এক নূতন জিনিস বটে। সে একটু আশ্চর্য্য হইল, খুসিও হইল। চোখের জল মুছিয়া বিপিনের দিকে চাহিয়া বলিল, তুমি ডাক্তারি জানো?

—জানিই তো। ধোপাখালি থাকতে রুগী দেখতাম।

—কোথা থেকে শিখলে ডাক্তারি?

—বই পেয়েছিলাম জমিদার বাড়ীর ইয়ে মানে লাইব্রারি থেকে। বেশ বড় লাইব্রারি আছে কিনা ওঁদের বাড়ী।

মনোরমার পিতৃগৃহ গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর। সে বলিল, লাইব্রারি আবার কি? লাইব্রেরি তো বলে। আমাদের পাড়ায় মস্ত লাইব্রেরি আছে গোয়াড়িতে। জেঠীমা বই আনাতেন, আমরা দুপুরবেলা পড়তাম।

—ওই হোলো, হোলো। তা আমি বলছিলাম কি, দিনকতকের জন্যে একবার ঘুরে এসো না কেন সেখানে? আমি একটু সামলে নিই। যদি পিপলিপাড়ায় লেগে যায়, তবে পুজোর পরেই নিয়ে আসবো এখন। কি বলো?

মনোরমা বলিল, সেখানে যাব কোন্ মুখ নিয়ে? নিজের বাবা মা থাকলে অন্য কথা ছিল। জ্যাঠামশায় বিয়ের সময় যা দিয়েছিলেন, তুমি তা ঘুচিয়েছ। শুধু গায়ে শুধু হাতে তাদের সেখানে গিয়ে দাঁড়াব যে, তারা হল বড়লোক, দুই জ্যাঠতুতো বোন ইস্কুল কলেজে পড়ে, বউদিদিরা বড়লোকের মেয়ে, তারা মুখে কিছু না বললেও মনে মনে হাসে। তার চেয়ে না খেয়ে এখানে পচে মরি সেও ভাল।

যুক্তি অকাট্য। ইহার ওপর বিপিন কিছু বলিতে পারিল না। বলিল, তা নয় মনোরমা, আমি ডাক্তারিতে বসলেই আজই যে হুড়্ হুড়্ করে টাকা ঘরে আসবে তা তো নয়? দুদিন একটু আমায় নির্ভাবনায় থাকতে না দিলে আমি তোমাদের বেহ্মডাঙায় ফেলে রেখে গিয়ে কি সোয়াস্তি পাব? তাই বলছিলাম।

মনোরমা বলিল, তুমি যাও তো চলো। আমাদের ভাবনা আমরা ভাব্‌বো।

—ঠিক? সে ভার নেবে তো?

—না নিয়ে উপায় কি বল। নিতেই যখন হবে।

দিন চার পাঁচ পরে বিপিন ছোট্ট একটি টিনের সুটকেস্ হাতে করিয়া পিপলিপাড়া রামনিধি দত্ত মহাশয়ের বহির্বাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বেলা প্রায় বারটা বাজে। সকালে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে আসিয়াছে। পায়ে এক পা ধুলা, গায়ের কামিজটি ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে।

রামনিধি দত্তের বাড়ি দেখিয়া সে কিছু হতাশ হইল। ভাঙা পুরোনো কোঠা বাড়ি, বহুকাল মেরামত হয় নাই, কার্নিসে স্থানে স্থানে বট অশ্বত্থের চারা গজাইয়াছে। আর কি ভয়ানক জঙ্গল গ্রামটিতে। শুধু আমের বাগান আর ঘন নিবিড় বাঁশবন।

দত্ত মহাশয়কে পূর্ব্বে সে একখানা চিঠি লিখিয়াছিল, তিনি বিপিনকে আসিতেও লিখিয়াছিলেন। তবুও নতুন অচেনা জায়গায় আসিয়া বিপিনের কেমন বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল, বাহির-বাটির চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া সে সুটকেস্‌টি নামাইয়া একখানা হাতল-ভাঙা চেয়ারের উপর বসিয়া চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিল। চণ্ডীমণ্ডপটী সেকালের, দেখিলেই বোঝা যায়। নিম কাঠের বড় কড়ি হইতে একটি কাঠের বিড়াল ঝুলিতেছে, সেকালের অনেক চণ্ডীমণ্ডপে এ রকম বিড়াল কিংবা বাঁদর ঝুলিতে বিপিন দেখিয়াছে। একদিকে রাশীকৃত বিচালি, অন্যদিকে একখানা তক্তাপোষের উপর একটা পুরান শপ্ বিছানো। ঘরের মেঝেতে একস্থানে তামাক খাইবার উপকরণ টিকে, তামাক, হুঁকা, কলিকা। ইহা ব্যতীত অন্য কোন আসবাব চণ্ডীমণ্ডপে নাই।

খানিকটা অপেক্ষা করিবার পরে একটি ছোট ছেলে বাড়ির ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। বিপিন তাহাকে ডাকিয়া বলিল, দত্ত মশায় বাড়ি আছেন খোকা? বল গিয়ে একজন লোক ডাকছেন। বল, ডাক্তারবাবু এসেছেন।

ছেলেটি একবার তাহার দিকে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেল এবং অল্প কিছুক্ষণ পরে জনৈক বৃদ্ধের পিছু পিছু সে আবার বাহিরের উঠানে আসিল।

বৃদ্ধ চণ্ডীমণ্ডপে উঠিতে উঠিতে বলিলেন, আপনিই ডাক্তারবাবু? ব্রাহ্মণের চরণে প্রণাম। আসুন আসুন। বড় কষ্ট হয়েছে এই রোদ্দুরে?

বৃদ্ধ বিবেচক লোক, অল্প কিছুক্ষণ কথা বলিবার পর তিনি বলিলেন, আপনি বসুন, আমি জল পাঠিয়ে দিই হাত পা ধোবার। জামা খুলে একটু বিশ্রাম করুন, তারপরে পাশেই নদী, ওই বাঁশঝাড়টার পাশ দিয়ে রাস্তা। নেয়ে আসবেন এখন। তেল পাঠিয়ে দিচ্ছি।

স্নান করিতে গিয়া নদীর অবস্থা দেখিয়া বিপিন প্রমাদ গণিল। কচুরীপানার দামে স্নানের ঘাটের জল পর্য্যন্ত এমন ছাইয়া ফেলিয়াছে, যে, জল দেখাই যায় না। জল রাঙা, স্নান করিয়া উঠিলে গা চুলকায়। কোনরকমে স্নান সারিয়া সে ফিরিল।

বৃদ্ধ বলিলেন, এত বেলায় রান্না করতে গেলে আপনার যদি কষ্ট হয় তবে বলুন চিঁড়ে আছে, দুধ আছে, ভাল কলা আছে, নারকোল-কোরা আছে, আনিয়ে দিই। ওবেলা বরং সকাল সকাল রান্নার ব্যবস্থা করে দেব এখন।

ইতিমধ্যে দশ এগারো বছরের একটি ছেলে একখানা রেকাবিতে একপাশে খানিকটা নারিকেলকোরা আর এক পাশে একটু গুড় লইয়া আসিল। বৃদ্ধ বলিলেন, জল খেয়ে নিন্, সেই কখন বেরিয়েছেন, ব্রাহ্মণ দেবতা, স্নান আহ্নিক না হলে তো জল খাবেন না, কষ্ট কি কম হয়েছে! ওরে, জল আনলি নে? খাবার জল ঘটি করে নিয়ে আয়, সন্ধ্যে আহ্নিক হয়েছে কি?

বিপিন দেখিল দত্ত মহাশয় গোঁড়া হিন্দু। এখানে যদি সুনাম অর্জ্জন করিতে হয়, তবে তাহাকে সব নিয়মকানুন মানিয়া আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণসন্তান সাজিয়া থাকিতে হইবে। সুতরাং সে বলিল, সন্ধ্যে আহ্নিক নদী থেকে সারব ভেবেছিলাম কিন্তু তা হোল না, এখানেই একটু—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি সব পাঠিয়ে দিচ্ছি। এখানেই সেরে নিন।

ওঃ ভাগ্যে সে বাড়িতে পা দিয়াই একঘটি জল চাহিয়া লইয়া খায় নাই! তাহা হইলে এ বাড়িতে তাহার মান থাকিত না। অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটিলে কি কষ্টেই পড়িতে হয় মানুষকে!

—তা হলে রান্নার ব্যবস্থা করে দেব, না চিঁড়ে খাবেন এ বেলা?

—না না, রান্না আর এত বেলায় করতে পারব না। এ বেলা যা হয়—

দত্ত মহাশয় মহাব্যস্ত হইয়া বাড়ির ভিতর চলিয়া গেলেন।

দিন পনর কাটিয়া গিয়াছে।

বিপিন থাকে দত্ত মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপে, পাশের একখানা ছোট চালাঘরে রাঁধিয়া খায়। দত্ত মহাশয় বাড়ি হইতেই প্রতিদিন চালডাল দেন, বিপিনের তাহা লইতে বাধ বাধ ঠেকিলেও উপায় নাই, বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হয়।

একদিন রোগী দেখিয়া সে একটি টাকা পাইল। দত্ত মহাশয়ের নাতিকে ডাকিয়া বলিল, হীরু,

আজ তোমার ঠাকুমাকে বল, আজ আর আমায় সিধে পাঠাতে হবে না। রুগী দেখে কিছু পেয়েছি, তা থেকে জিনিসপত্র কিনে আনব।

এখানে কিছুদিন থাকিয়া সে দেখিল একটা ডাক্তারখানা না খুলিলে ব্যবসা ভাল করিয়া চলিবে না। পাশের গ্রামের নাম কাপাসডাঙ্গা, সেখানে সপ্তাহে দুইবার হাট বসে, আট দশখানি গ্রামের লোক একত্র হয়। দত্ত মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া সেখানে হাটতলায় এক চালাঘরে টিনের উপর আলকাতরা দিয়া নিজের নাম লিখিয়া ঝুলাইল। একটা কেরোসিন কাঠের টেবিলে অনেকগুলি পুরান শিশি বোতল সাজাইয়া দত্ত মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপ হইতে সেই হাতলভাঙ্গা চেয়ারখানা চাহিয়া আনিয়া টেবিলের সামনে পাতিয়া রীতিমত ডিস্‌পেনসারি খুলিয়া বসিল।

এ গ্রামেও লোক নাই, যেখানে সে থাকে সেখানেও লোক নাই। তাহার উপর নিবিড় জঙ্গল দুই গ্রামেই। দিনমানেই বাঘ বাহির হয় এমন অবস্থা। কথা কহিবার মানুষ নাই। সকালে উঠিয়া সে এখানে আসিয়া ডাক্তারখানায় বসে, দুপুরে ফিরিয়া স্নান ও রান্নাবান্না করে। আহারান্তে কিছু বিশ্রাম করিয়া আবার হাটতলায় আসিয়া ডাক্তারখানা খোলে। চুপ করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসিয়া থাকে, তারপর অন্ধকার ভাল করিয়া হবার পূর্ব্বেই দত্তবাড়ি ফিরিয়া যায়, কারণ পথের দুধারের বনে বাঘের ভয় আছে।

রোগী বিশেষ আসে না। এসব অজ পাড়াগাঁয়ে লোকে চিকিৎসা করাইতে শেখে নাই, ঝাড় ফুঁক শিকড় বাকড়েই কাজ চালায়। বিপিন তাহা জানে, কিন্তু জানিয়া উপায় কি? তাহার মত হাতুড়ে ডাক্তারের কোন্ সহরে স্থান হইবে?

বাড়িতে তাহার বাবার একজোড়া পুরানো চশমা পড়িয়াছিল, সেটা সে সঙ্গে আনিয়াছিল, ডাক্তারখানায় বসিবার বা দৈবাৎপ্রাপ্ত কোন রোগীর বাড়ি যাইবার সময় সেই চশমা চোখে লাগায়। কিন্তু সব সময় চোখে রাখা যায় না, সে চশমার কাচের ভিতর দিয়া সব যেন ঝাপসা দেখায়, যুবকের চোখের উপযুক্ত চশমা নয়, কাজেই অধিকাংশ সময়ই চশমা চোখ হইতে খুলিয়া পুঁছিবার ছুতা করিয়া হাতে ধরিয়া রাখিতে হয়।

আশপাশের গ্রাম হইতে মাঝে মাঝে লোক হাটবারে আসিয়া ডিস্‌পেন্‌সারিতে বসে। তাহারা প্রায়ই নিরক্ষর চাষী, চশমা পরা ডাক্তারবাবুকে দেখিয়া সম্ভ্রমের সহিত বলে, স্যালাম ডাক্তারবাবু, ভাল আছ? আপনার ডিস্‌পিন্‌সিল ভাল চলছেন?

নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, বড্ড ডাক্তার গো। ভাল জায়গার ছাওয়াল, হাতের পানি খালি' ব্যামো সারে। চেহারাখানা ত্যাখছ না চাচা?

কিন্তু ওই পর্য্যন্ত। পসার যে খুব বেশি জমে, তা নয়। ইহারা নিতান্ত গরীব, বিপিন দেখিল পয়সা দিবার ক্ষমতা ইহাদের নাই।

একদিন একজন লোক তাহাকে আসিয়া বলিল, ডাক্তারবাবু, আপনাকে একটু দয়া করে যেতে হবে, রুগীর অবস্থা খুব সঙ্গিন। নরোত্তমপুরের যদু ডাক্তার এয়েছেন, আপনার নাম শুনে বললেন, আপনারে ডাক্‌তি। সলা পরামর্শ করবার জন্যি।

বিপিন গতিক সুবিধা বুঝিল না। যদু ডাক্তারের নাম সে শুনিয়াছে, তাহারই মত হাতুড়ে

বটে তবে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। অনেক দিন ধরিয়া নাকি এ কাজ করিতেছে আর সে একেবারে নূতন, যদি বিদ্যা ধরা পড়িয়া যায় তবে পসার একেবারে মাটি হইবে। বিপিন লোকটাকে তাড়াইবার উদ্দেশ্যে গম্ভীর মুখে বলিল, ওসব কনসাল করার ফি আলাদা। সে আপনি দিতে পারবেন?

—কত লাগবে বাবু? যদুবাবু যা বলে দেবেন তাই দেব।

—যদুবাবুর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? তিনটাকা ফি দিতে পারবে?

লোকটা এক কথায় রাজি হইল।

—হাঁ বাবু, চলুন, তিনডে টাকাই দেবান্থ। মনিষ্যি আগে, না টাকা আগে?

এত সহজে লোকটা রাজি হইবে, বিপিন ভাবে নাই। বিপদ তো ঘাড়ে চাপিয়া বসিল দেখা যাইতেছে। বলিল, গাড়ি নিয়ে আসতে হবে কিন্তু। হেঁটে যাব না।

বেলা দশটার সময় রোগীর বাড়ি পৌঁছিয়া বিপিন দেখিল বাহিরের ঘরে একজন রোগা মত প্রৌঢ় লোক বসিয়া বিড়ি টানিতেছে, গায়ে কাল সার্জ্জের কোট ও সাদা চাদর, পায়ে কেম্বিসের ফিতা-আঁটা জুতা। বুঝিল ইনি যদু ডাক্তার। বিপিনের বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল।

প্রৌঢ় লোকটি হাসিয়া কাল দাঁতগুলি বাহির করিয়া বলিল, আসুন ডাক্তারবাবু, আসুন, নমস্কার। এসেছেন এ দেশে যখন, তখন দেখা একদিন না একদিন হবেই ভেবে রেখেছি। বসুন।

বিপিন নমস্কার করিয়া বসিল। পাড়াগাঁয়ের চাষী লোকের বাহিরের ঘর, অন্তঃপুর যেদিকে, সেদিকে কেবল মাটির দেওয়াল, অন্য কোন দিকে দেওয়াল নাই। নতুন ডাক্তারবাবুকে দেখিবার জন্য বহু ছেলে মেয়ে ও কৌতূহলী লোক উঠানে জড় হইয়াছে।

এতগুলি লোকের কৌতূহলী দৃষ্টির কেন্দ্রস্বরূপ হওয়াতে বিপিন রীতিমত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু ইহাও সে বুঝিল আজ যদি সে জয়ী হইয়া ফেরে, তবে তাহার নাম ও পসার আজ হইতেই এ অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। জিতিতেই হইবে তাহাকে যে করিয়াই হউক।

যদু ডাক্তার বলিল, আপনার পড়াশুনা কোথায়?

বিপিন একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়াছিল যদু ডাক্তার সম্পর্কে, লোকটা শিক্ষিত নয়। বিপিন মামলা মোকর্দ্দমা সম্পর্কে রাণাঘাটে অনেক উকীল মোক্তারের সঙ্গে মিশিয়াছে, তাহাদের কথাবার্ত্তার সুর ও ধরণ অন্য রকম। সে চশমার ভিতর দিয়া যেন সম্মুখের নারিকেল গাছের মাথার দিকে চাহিয়া আছে এমন ভাবে চশমা শুদ্ধ নাকের ডগাটি খুব উঁচু করিয়া বেপরোয়া ভাবে বলিল, ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে।

—ও! কোন বছর পাশ করেছেন?

—আজ তিন বছর হ'ল।

এদিকে কতদূর পড়াশুনা করেছিলেন?

বিপিন বুঝিয়াছিল লোকটা নিতান্ত গেঁয়ো বটে। ভাল লেখা-পড়া জানা লোকে এসব কথা প্রথম পরিচয়ের সময় জিজ্ঞাসা করে না। মানীদের বাড়ি সে এত কাল বৃথাই কাটায় নাই। সে খুব চালের সহিত বলিল, আই. এস. সি. পাশ করে ক্যাম্বেল স্কুলে ঢুকি। যদু ডাক্তার যেন বেশ একটু ঘাবড়াইয়া গিয়াছে। বলিল, তা বেশ বেশ।

বিপিন মানীর প্রদত্ত ডাক্তারি বইগুলি পড়িয়া এটুকু বুঝিয়াছিল রোগ নির্ণয় জিনিসটা বড় সহজ নয় এবং ইহা লইয়া ডাক্তারে ডাক্তারে মতভেদ ঘটিলে সাধারণ লোকের পক্ষে ইহা বোঝা শক্ত যে কোন্ ডাক্তারের মত অভ্রান্ত।

সে বলিল, এ বাড়ির পেশেণ্টের রোগটা কি?

—রেমিটেণ্ট ফিভার। সঙ্গে রক্ত আমাশা আছে, দেখুন আপনি একবার।

বিপিন ও যদু ডাক্তার বাড়ির মধ্যে গেল। রোগীর বয়স উনিশ কুড়ির বেশী নয়, চেহারা রোগের পূর্ব্বে ভাল ছিল, বর্ত্তমানে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

বিপিনকে যদু ডাক্তার বলিল, আপনি দেখুন আগে।

বিপিন অনেকক্ষণ ধরিয়া নাড়ি টিপিয়া বুকে পিঠে নল বসাইয়া পিঠ বাজাইয়া বুক বাজাইয়া দেখিয়া বলিল, একটু নিমোনিয়ার ভাব রয়েছে।

যদু ডাক্তার তাড়াতাড়ি বিপিনের মতেই মত দিয়া বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, ওটা আমি লক্ষ্য করেছি।

বিপিন সাহস করিয়া আন্দাজে বলিল, টাইফয়েডের দিকে যেতে পারে বলে মনে হচ্ছে। আজ ন' দিনের দিন বল্লেন না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ন' দিন। টাইফয়েডের কথা আমারও মনে হয়েছে—

বিপিন দেখিল লোকটা ভড়্‌কাইয়া গিয়াছে, তাহার মতে মত দিতে খুবই আগ্রহ দেখাইতেছে। বলিল, আপনি একটা ভুল করেছেন যদুবাবু, কুইনেন্‌টা দেওয়া উচিত হয় নি। প্রেস্‌ক্রিপশনটা দেখি ক'দিনের।

যদু সত্যই ভয় খাইয়া গিয়াছিল। সে দুখানা প্রেস্‌ক্রিপশন বিপিনের হাতে দিয়া ভয়ে ভয়ে বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে হাতুড়ে ডাক্তার আর এ তরুণ যুবক, ক্যাম্বেল স্কুল হইতে বছর দুই পাশ করিয়াছে, আধুনিক ধরণের কত রকমের চিকিৎসা-প্রণালীর সহিত পরিচিত। কি ভুলই না জানি বাহির করিয়া বসে। যদু ডাক্তারের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল।

কিন্তু বিপিন বুঝিল অনেক দূর আগাইয়াছে, আর বেশী নয়। যদু ডাক্তারকে হাতে রাখিলে এ সব পাড়াগাঁয়ে অনেক সুবিধা। এ অঞ্চলে তাহার যথেষ্ট পসার, সলাপরামর্শ করিতেও দু চার টাকা ভিজিট জুটাইয়া দিতে পারা তাহার হাতের মধ্যে।

সে গম্ভীরস্বরে বলিল, চমৎকার প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন। ঠিকই দিয়েছেন। কিছু বদ্‌লাবার নেই।

যদু ডাক্তার একবার সগর্ব্বে চারিধারের সমবেত লোকজনের দিকে চাহিল। তাহার মন হইতে বোঝা নামিয়া গিয়াছে।

—যদুবাবু, একটু গরম জলের ফোমেণ্ট্ করলে বোধ হয় ভাল হয়।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। আমিও কাল থেকে তাই ভাবচি।

—আর একবার আজ জোলাপটা দেওয়ান—

—জোলাপ, নিশ্চয়ই। আমিও তা—

ফিরবার পূর্ব্বেই দুজনে খুব বন্ধুত্ব হইয়া গেল। দুজনের কেহই বুঝিতে পারিল না, পরস্পরকে তাহারা বুঝিয়া ফেলিয়াছে কিনা।

বাঙালীর নাঙ্গা-পর্ব্বত অভিযান

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

[বিদেশী অভিযাত্রীদের নাঙ্গা-পর্ব্বত অভিযানের কথা খবরের কাগজে পড়িয়া একদিকে যেমন মানুষের অসাধ্য-সাধনপ্রিয়তার জন্য গর্ব্ব অনুভব করিতাম, অন্যদিকে তেমনি, অসাধ্য-সাধন তো দূরে থাক, সাধ্যসাধনেও বাঙালীর আলস্যের কথা মনে করিয়া লজ্জিত হইতাম ; অর্থাৎ একদিকে হইতাম বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় অবাক এবং অন্যদিকে হইতাম লজ্জায় ও দুঃখে নির্ব্বাক।

কিন্তু এখন আর লজ্জার কারণ নাই, অথবা থাকিলেও সে কারণ অন্যপ্রকার। এতদিন যে বিনা কারণে লজ্জিত হইতাম সেই কথা মনে করিয়াই এখন লজ্জিত হই। কিছুদিন আগে এক প্রবীণ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইয়াছে ; বিদেশীরা যখন হয়তো এ ব্যাপারটার কল্পনাও করে নাই সেই সুদূর অতীতে তিনি, অবশ্য তখন তিনি ছিলেন দুঃসাহসী তরুণ, নির্ভীক, বেপরোয়া—নাঙ্গা-পর্ব্বত অভিযানের কল্পনা তো করিয়াছিলেনই, উপরন্তু অনেকদূর অগ্রসরও হইয়াছিলেন। সে কাহিনী যেমন রোমাঞ্চকর, বাঙালী জাতির পক্ষে তেমনি গৌরবের। দুঃসাহসিক অভিযানে যে বাঙালী পশ্চাৎপদ নহে, তাহা বিশ্ববাসীকে আজ জোর গলায় জানাইয়া দেওয়া দরকার। সে কথা মনে করিয়াই এই কাহিনী সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

এই মহাগৌরবময় কাহিনী এতদিন যে ধামাচাপা ছিল, তাহার কারণ কাহিনীর নায়ক বঙ্গগৌরব ভদ্রলোকটির সঙ্গে এতদিন আমার আলাপ হয় নাই, এবং আত্মপ্রকাশ ব্যাপারে তিনি বরাবরই অতিমাত্রায় লাজুক। নেহাৎ দৈবক্রমেই আমার ইঁহার সঙ্গে আলাপের সৌভাগ্য হইয়াছে ; এবং কাহিনীটি তাঁহার নিকট হইতে আদায় করিতেও আমার কম বেগ পাইতে হয় নাই। মনে করিয়াছিলাম, এই ভদ্রলোকটির সহিত বাঙালী জাতির প্রত্যক্ষ পরিচয় করাইয়া দিয়া একটা পুণ্য সঞ্চয় করিব। কিন্তু ভদ্রলোক আমাকে একরকম হাতে পায়ে ধরিয়াই প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছেন যে, তাঁহার নাম ধাম কাহারও কাছে প্রকাশ করিব না।

যতদূর মনে পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রই বলিয়া গিয়াছেন যে, বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি। আমার কিন্তু মনে হয় এই আত্মবিস্মরণের ব্যাপারে শুধু জাতির উপর দোষ চাপানো অসঙ্গত ; কারণ ব্যক্তির অপরাধও বড় কম যায় না। ব্যক্তিরা যদি নিজেকে এভাবে চির অন্ধকারে ডুবাইয়া রাখিতে ব্যস্ত হয়, তাহা হইলে জাতি বেচারা করিবে কি ?

কিন্তু এত উত্তেজিত হইলে আসল কাহিনীটি ধামাচাপা পড়িবার ভয় আছে। অতএব বর্ত্তমান সত্য কাহিনীটির নায়কের নাম ধরা যাক বিরিঞ্চিকুমার পাকড়াশী, অথবা সংক্ষেপে বিরিঞ্চিবাবু। বিরিঞ্চিবাবুর সঙ্গে প্রথম দেখা ও আলাপ হইয়াছিল মনুমেণ্টের ধারে চিনাবাদাম খাইতে খাইতে। সেই আলাপ হইতে কি প্রকারে তাঁহার নাঙ্গা-পর্ব্বত অভিযানের কাহিনীতে আসিয়াছিলাম, তাহা বলিতে গেলে অনেক কিছু বলিতে হইবে, সময়ে কুলাইবে না। সুতরাং সে সব কথা এখন থাক। কাহিনীটাই বলা যাক—এবং তাহা বিরিঞ্চিবাবুর নিজের অননুকরণীয় ভাষাতেই। তাঁহার ভাষা পর্য্যন্ত মনের মধ্যে পরিষ্কার গাঁথিয়া গিয়াছে। দুই একটা কথা এদিক ওদিক হইয়া যাইতেও পারে, কারণ হাজার হইলেও মানুষের মন গ্রামোফোন নহে। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু লোকসান হইবে না।...]

বাঙালী না পারে এমন কর্ম্ম এখনো জন্মায় নি মশাই, জান্‌লেন ? অন্য জাতের সঙ্গে বাঙালীর তফাৎ কোথায় ? না, অন্য জাত যা পারে তাই ক'রে ফেল্‌তে চায়, আর বাঙালী যা পারে তা অনেক সময় করবার চেষ্টাই করে না। বলে "যাক্ গে ছাই ; ও ক'রে আর কি হবে ?"

তা ছাড়া অন্য জাত যা কিছু করে, তারি সঙ্গে বাজায় ঢাকের বাদ্যি। যেমন কাজ তার তেম্নি

ঢাক—অনেক সময় ঢাকটাই কাজের চাইতে বড়ো। কিন্তু বাঙালী, মশাই, ঢাক বাজাতে জানে না। বলে "কি দরকার?" তাই বাঙালী দেখবেন অনেক দুঃখুকষ্ট স'য়ে অনেক কিছু করে, আর তারি ওপর টেক্কা মেরে দেয় অন্যে।

আমার নাঙ্গা-পর্ব্বত অভিযানের কাহিনী শুনতে চেয়েছেন আপনি। বিশ্বাস আপনি করবেন কিনা জানি না, তবু বলি। সে মশাই অনেক বছর আগেকার কথা। সায়েব ব্যাটারা তখনও এমন পাহাড়ী হয় নি। তখন যৌবন বয়েস, সারা গায়ে রক্ত যেন টগবগ ক'রে ফুটছে। তখনকার দিনে কচি বয়েসেই বিয়ে হয়ে যেত, আজকালকার মত প্রেম ট্রেম চলত না। হ্যাঁ, আমারো বিয়ে হয়ে গিছিলো বই কি? সেই কথাই তো বল্‌ছি। এখন উনি স্বর্গে আছেন, বলতে নেই, গল্পের খাতিরে তবু বলি, বউ ছিল ভারী বদ্‌রাগী মশাই, একবার একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া করে রেগেমেগে গেল চলে বাপের বাড়ি। প্রথমটা দুঃখ হ'ল; শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু চ'টে উঠলুম। ভাবলুম "ধুত্তর্, একটা অ্যাড্‌ভেঞ্চার এবার করবই।" কিন্তু অ্যাড্‌ভেঞ্চার বাড়িতে বসে হয় না। বেরিয়ে পড়া চাই। কোথায় বেড়িয়ে পড়া যায় তাই ভাবতে ভাবতে তো অস্থির হয়ে উঠলুম। একদিন হঠাৎ আনমনা ভাবে ভুগোলের পাতা উলটাতে চোখে পড়ল নাঙ্গা-পর্ব্বত। কিছুক্ষণেই যে তা চোখে পড়্‌ল মশাই! তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠে বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতের একটা প্রচণ্ড থাপ্পড় কষিয়ে দিয়ে বললুম "মিল্ গিয়া! মিল্ গিয়া! মার্ দিয়া কেল্লা!" ইত্যাদি। বেজায় চটলে অথবা বেজায় খুশী হয়ে গেলে অনেকের মুখ থেকে যেমন ইংরিজী বেরয় আমার বেরুত তেম্নি হিন্দী।

যাই হোক, ঠিক ক'রে ফেললুম যেমন ক'রেই হোক নাঙ্গা-পর্ব্বতে যেতেই হবে, তাতে প্রাণ যায় যাক, থাকে থাক, কুছ পরোয়া নেই। বিশেষ ক'রে বউর ওপর রাগের বা অভিমানের, যে জন্যেই হোক, প্রাণটার ওপর সামান্য যা একটু আধটু মায়া আগে ছিল তাও উবে গিয়েছিল কর্পূরের মত।

পাশের পাড়াতেই থাকত ভুগোলের মাস্টার ভজহরি সোম। তার সঙ্গে কনসাল্ট ক'রে আর টাইম-টেবিল ঘেঁটে প্ল্যান ঠিক ক'রে ফেললুম, মতলবটা অবশ্য ভজু মাস্টারকে টের পেতে দিই নি। কেন তা বুঝতেই তো পারছেন। তারপর তল্‌পী তল্‌পা গুছিয়ে নিতে বেশী বেগ পেতে হ'ল না, গুছানোর কাজটা অনেকদিন আগেই বেশ রপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া বেশী কিছু জিনিসপত্তরও নিলুম না, কেন তাও বোধ হয় বুঝতে পারছেন। পাঁজির ওপর বরাবরই একটা অচলা ভক্তি ছিল, ওটা কন্‌সাল্ট না ক'রে পার্‌লুম না। বেশ ভাল ক'রে যাচ্ছেতাই দেখে একটা দিন ঠিক করলুম, অশ্লেষা, মঘা না দিক্‌শূল, ঠিক এখন মনে হচ্ছে না। অ্যাড্‌ভেঞ্চার করতে হ'লে ঐ করতে হয় মশাই, তা নইলে অ্যাড্‌ভেঞ্চার হবে কেন? শুভদিন শুভলগ্ন বেছে অ্যাড্‌ভেঞ্চার হয় না।

তারপর তল্‌পী তল্‌পা নিয়ে একদিন রাত্তিরে স্নুট ক'রে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম। হ্যাঁ, তার আগে অবশ্য মার কাছে বিদায় নিয়ে নিলুম। মা মানেই মার একখানা ছবি—তিনি আমার জন্মের বছর পাঁচেক পরেই স্বর্গে গিয়েছিলেন কি না! বল্‌লুম "মাগো! যাবার ক্ষণে আজ আমায় দাও তোমার আশীর্ব্বাদ নয়, অভিশাপ। নিদারুণ অভিশাপ। সে অভিশাপ যেন হিংস্র সাপের মত অনবরত আমার পিছু পিছু তাড়া ক'রে নাঙ্গা-পর্ব্বতের মাথা পর্য্যন্ত নিয়ে যায়। সে অভিশাপ যেন কিছুতেই আমায় পথের মাঝখানে থাম্‌তে না দেয়, যেন একটু জিরিয়ে নেবার নেশায় পড়লেই

তখ্খুনি হাজার বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালায় সর্ব্বাঙ্গ জ্বালিয়ে দেয়। যেন সকালে, দুপুরে, বিকেলে, রাত্রে—কখন একটা মুহূর্ত্তের জন্যও নাঙ্গা-পর্ব্বতকে ভুল্তে না পারি। ওগো আমার বাঙালী মা, আজ অন্ততঃ একটি মিনিটের জন্য অবাঙালী হও। আজ তোমার—" কান্নায় গলা ভারী হয়ে এল, মুখে আর কথা সরল না। দেখলুম ছবিতে, বিশ্বাস করুন বা নাই করুন, পষ্ট দেখতে পেলুম, মার চোখ দুটি ছলছল ক'রে উঠেছে। কোথায় অভিশাপের নির্ম্মম শুষ্ক ভ্রূকুটি? তার বদলে আশীর্ব্বাদের ছলছল অশ্রু। বাঙালী মায়ের ঐ তো দোষ মশাই। জানে শুধু প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করতে, অভিশাপ দিতে জানে না। ঐজন্যই বাঙালী গোল্লায় যাচ্ছে—যাক্গে। বেরিয়ে তো পড়লুম বাড়ির মায়া ছেড়ে। অ্যাঁ, কি বল্ছেন?···না না, ওসব অবান্তর কথা টেনে আনবেন না মশাই। তা হ'লে কাহিনীর খেই হারিয়ে ফেলব হয়তো। এ তো আর আজকের কথা নয়। আপনারা তখনো পৃথিবীর আলো দেখেন নি।···

চ'লে গেলুম পাটনা। সেখানে ছিল বৃন্দাবনপ্রসাদ ক্ষেত্রী, সুর্ত্তি, জর্দ্দা আর কিমামের দোকান ক'রে সে তখন দিব্বি জাঁকিয়ে বসেছে। অনেকদিন আগে হয়েছিল আলাপ কল্কাতায়। ব্যাটা কিছুতেই আমায় ভুলতে পারে নি। মাঝে মাঝেই চিঠি লিখত। উত্তর দিতুম বটে, নেহাৎই ভদ্রতার খাতিরে, কিন্তু সবগুলোর নয়। কে মশাই 'ফরনাথিং' পয়সা খরচা ক'রে মরতে যায়? পাটনা যেতে লিখেছিল কয়েকবার বিশেষ ক'রে, ওর বাড়িতে। ভাবলাম, এই সুযোগে ওকে একটু খুশী করাই যাক না কেন। অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রে উঠলুম গিয়ে ওর বাড়িতে। সে এক বিরাট বাড়ি মশাই। সুর্ত্তি-জর্দ্দা বেচে কেউ অমন এলাহি বাড়ি করতে পারে তা চোখে দেখলেও হঠাৎ বিশ্বাস করা শক্ত।

আমায় পেয়ে তো বৃন্দাবন খুব খুশী। কি তার আদর যত্ন! রোজ ভোর হতে না হতেই চা, লুচি, হালুয়া, কিছু মিষ্টি, আর পাঁপরভাজা—সব বৃন্দাবনের বউএর নিজের হাতের তৈরী। কি মিষ্টি হাত! বৃন্দাবনের ওপর হিংসা হতে লাগল। প্রত্যেকটি জিনিস যেন অমৃত—কোন্টা ফেলে কোন্টা খাই, তাই হয়ে উঠ্ল সমস্যার ব্যাপার। তারপর দুপুরের আর রাতের খাওয়ার ফর্দ্দ দিলে আপনি হয়তো মনে করবেন ধাপ্পা দিচ্ছি। তা ছাড়া অত মনেও নেই এখন।

ক্ষেত্রী অনেকের সঙ্গেই আলাপ করিয়ে দিলে। তখন বিহার আর বাংলা ছিল দুটি যমজ বোনের মত মিলেমিশে। বিহারীরা বাঙালী পেলে বেজায় খুশী হ'ত, এখনকার মত ক্ষেপে উঠতো না। বাঙালীদের কথা আর কি বলব? তাঁরা তো মহাপ্রভুর মত প্রেমে গলেই আছেন, বিহারী পেলে এখন মহা খুশী। এ তো দেখতেই পাচ্ছেন। বাংলার থানায়, রেল আর ষ্টীমার স্টেশনে, রান্নাঘরে, বাজারে রাস্তার মোড়ে মোড়ে পান-সরবতের দোকান—নানা জায়গায় বিহারীরা সানন্দে বিহার করছে বাঙালীর প্রেমের ধারায় স্নান করে। বাঙালীর বিহারী-প্রেম তখন এইরকম ছিল। তখনকার দুতরফা এখন একতরফা হয়ে গেছে, এই যা তফাৎ।

এর বাড়ি ওর বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে হয়রান হয়ে গেলুম। বাড়ির কথার সঙ্গে সঙ্গে নাঙ্গা-পর্ব্বতের কথাও ভুলে যাবার যোগাড় হ'ল। ফের মনে হ'ল যখন বৃন্দাবনের বউ চ'লে গেল বাপের বাড়ি—অবশ্য রাগ ক'রে নয়, অন্য কোন কারণে। তখন আমারো মনে পড়ে গেল বাপের বাড়ি চ'লে যাওয়া বউএর কথা, রাগ আর অভিমান আবার উঠল মাথা উঁচিয়ে, নাঙ্গা-পর্ব্বত যেন দুহাত বাড়িয়ে

ডাকতে লাগল। আবার তল্‌পী-তল্‌পা গুছিয়ে নিয়ে রওনা হয়ে গেলাম এলাহাবাদ, বৃন্দাবনকে অনেক বুঝিয়ে। বৃন্দাবন সঙ্গে দিয়ে দিল প্রায় এক হাঁড়ি আধ-চাটনী আধ-মোরব্বা, ওর বউএর নিজের হাতের নাকি তৈরী। আচ্ছা বউ-পাগলা লোক ছিল এই বৃন্দাবন। খানিকটা আমলকী, খানিকটা তেঁতুল, এইরকম আর কি কি সব মিশিয়ে তৈরী—ভারী চমৎকার জিনিস। অমন জিনিস আর কোনদিন খাই নি। আশা করেছিলুম বেঁচে থাকলে আরো খাব। কিন্তু আমি বেঁচে থাকলেও বৃন্দাবনের বউ মরে গেল। তার দুমাস বাদে বৃন্দাবন ফের বিয়ে করেছিল বটে, কিন্তু এই দু নম্বর বউয়ের সখও ছিল না, গুণও ছিল না।

যা হোক, ট্রেণে প্রায় সারাটা রাস্তা ঐ অপূর্ব্ব জিনিস খেতে খেতে চ'লে গেলুম সটান আগ্রাতে। নাঙ্গা অভিযান থেকে ফিরে আসতে পারবো কিনা কে জানতো? তাই ভাবলুম শাজাহানের চিরন্তন অশ্রু তাজমহল একবার নিজের চোখে দেখে যাই। দেখলুম। অনেকে বলেন, তাজমহল দেখে নাকি তাদের ভুল ভেঙেছে; যে অলৌকিক সৌন্দর্য্যের জন্য তাজমহলের নাম লোকের মুখে মুখে ফেরে, বাস্তবিক পক্ষে তাজমহলে নাকি তার কিছুই নেই। সুতরাং অনেক আশা নিয়ে তাজমহল দেখতে এসে তাঁরা নাকি ফেরেন নিরাশ হয়ে। আমার বেলায় কিন্তু হ'লো তার ঠিক উল্‌টো। তাজমহল যে আমার এত ভালো লাগবে তা আমি আগে ভাবতে পারি নি। কথাটা কি জানেন? শুধু তাজমহলটাই সত্যিকারের তাজমহল নয়, সত্যিকারের তাজমহল হচ্ছে আদ্ধেক তাজমহল আদ্ধেক কল্পনা। তাই যারা শুধু তাজমহলটাই দেখে তারা সত্যিকারের তাজমহল দেখতে পায় না।

তাজমহল দেখে শাজাহান ও মমতাজের কথা মনে হতে লাগলো। ভাবতে লাগলুম এক একটা লোক কি ভাগ্য নিয়েই না জন্মায়।

আগ্রা থেকেই বেশ একটু ঠাণ্ডা পাচ্ছিলুম, দিল্লী গিয়ে আরো পেলুম, তারপর সিমলা গিয়ে দেখি রীতিমতো হাড়-কাঁপানো শীত। আমাদের বাংলাদেশের শীত মশাই, তার কাছে নিতান্ত ছেলেমানুষ। সাধে কি আর গভর্মেণ্ট সিমলাকে করেছে গ্রীষ্মকালের রাজধানী? ইংরেজ জাতটার লক্ষ্য ক'রে দেখবেন আপনি, মগজে পদার্থ আছে, যাকে আমরা 'কমন্‌-সেন্‌স' বলি।

আমার অভিযানের সত্যিকারের আভাস যেন প্রথম পেতে লাগলুম। যত নাঙ্গা-পর্ব্বতের কাছাকাছি পৌঁছুবো ততই শীত বাড়বে হু হু ক'রে, তাই নিজেকে আস্তে আস্তে শীতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া ভালো। বলে বটে "শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়", কিন্তু নামে আর কাজে সব সময় মিল থাকে না। বেশী সওয়াতে গেলে শরীর আবার দুরাশয় হয়ে ওঠে। তাই বিশেষ ক'রে পাহাড়ী অভিযানের ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলছি, শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই হচ্ছে সত্যিকারের পলিসি। সায়েব ব্যাটাদের মাথায় এ পলিসিটা ঢোকে না, আর ঐ তো হয় ওদের কাল। ব্যাটাদের বুদ্ধি আছে, মরণকে ডোণ্ট কেয়ার করবার মতো সাহস আছে, কিন্তু শনৈঃ পন্থা ওদের ধাতে নেই। যে ঘোড়াকে চাবুক মেরেও নড়ানো শক্ত সে এক আপদ বটে, কিন্তু যে ঘোড়াকে রাশ টেনেও থামানো যায় না সেও আপদ কম নয়। এই যে কতগুলো সায়েব পাহাড়ে চড়তে গিয়ে মারা পড়লো, এরা মারা পড়তো না যদি শনৈঃ পলিসিটা এদের মাথায় ঢুকতো।



"সপ্ত-পদী" শ্রীসুধীরকুমার রায়

এরা করে কি জানেন? উঠছে তো উঠছেই। যতই ওরা উঠছে, থার্মোমিটারে ডিগ্রী ততই নামছে, তবু ব্যাটাদের গ্রাহ্যি নেই। অবশ্য তার কারণ আছে। ঠাণ্ডা দেশের মানুষ কিনা, কাজেই রক্ত ওদের আমাদের গরম দেশের লোকের চাইতে ঢের বেশী গরম থাকে। ভগবান্ Law of Average, মানেই গড়ের নিয়ম মানেন কিনা, কাজেই যে দেশে যত বেশী গরম বা ঠাণ্ডা, সে দেশের রক্ত ততই বেশী ঠাণ্ডা বা গরম। তা ছাড়া ওদের সঙ্গে ব্র্যাণ্ডি থাকে কিনা। ও পদার্থটি বরফ রক্তকেও একেবারে গরম জল বানিয়ে ছেড়ে দেয়। কাজেই সায়েবরা যে ঝাঁ ঝাঁ ক'রে উঠে যাবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু শেষকালে ব্যাটারা গড়ের মাত্রা ছাড়িয়ে উঠে যায়, ওদিকে ব্র্যাণ্ডিও যায় ফুরিয়ে। পাহাড়ে তো আর পিপে পিপে ব্র্যাণ্ডি নিয়ে ওঠা যায় না, বা রেললাইনও নেই যে ওয়াগন বোঝাই ক'রে ব্র্যাণ্ডি চালান দেবে।

তখন খাঁটি বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে কি? না, আস্তে আস্তে শরীরকে সইয়ে সইয়ে ওঠা। খানিকটা উঠে ঠাণ্ডাটা যখন দেহে স'য়ে গেল, তখন আরো উঁচুতে আরো ঠাণ্ডায় ওঠা। কিন্তু ওরা তো তা করে না। সবতাতেই ওদের 'ধেৎ-তেরি' ভাব কিনা। শরীরকে হঠাৎ অসম্ভব রকম সওয়াতে যায়। ফলে যা হয় তা তো খবরের কাগজেই দেখতে পান।

আমি কিন্তু সিমলার শীত দেখেই বুঝলুম গোঁয়ার্ত্তুমি করতে গেলে কিস্‌সু হ'বে না। গরম সুট করিয়ে নিলুম এক জোড়া। প্রথম প্রথম পরতে একটু অসুবিধা হয়েছিল বটে, বরাবর ধুতি পরা অভ্যাস কিনা। কিন্তু অ্যাড্‌ভেঞ্চার করতে বেরুলে ওরকম অসুবিধা একটু আধটু এসে থাকে। ও 'মাইণ্ড' করলে চলবে কেন?

হোটেলটা কিন্তু ছিল ভালো। ম্যানেজার দিব্বি মিশুক ভদ্রলোক। সন্ধ্যাবেলা নানারকম খোসগল্প ক'রে অমন শীতেও হাসির হল্লায় আসর গরম ক'রে তুলতেন। কিন্তু একদিন তাঁর ওপর বেজায় খাপ্পা হয়ে উঠলুম, যখন শুনলুম, ওঁর ধারণা বাঙালী মোটেই 'অ্যাড্‌ভেঞ্চারাস্' নয়। নিজের অপমান সওয়া যায় মশাই, কিন্তু জাতির অপমান কি প্রাণে সয়? ক্ষেপে গিয়ে আরেকটু হ'লেই আমার অভিযানের কথা ব'লে ফেলতুম, অনেক কষ্টে চেপে গেলুম। এত বড় একটা আইডিয়া ফাঁস ক'রে দেওয়াটা ঠিক মনে হ'লো না। আত্মসংযম, আত্মগোপন না থাকলে কোনো বড় কাজই করা চলে না। পাছে সংযম হারিয়ে ফেলি সেই ভয়ে চ'লে গেলুম কাশ্মীরে—শ্রীনগর।

বাস্তবিকই শ্রীনগর। স্বর্গ কোথায় লাগে মশাই তার কাছে? তখন তুষার পড়তে সুরু হয়েছে। ভোরবেলা উঠেই দেখতুম চারদিকে যা কিছু সব সাদা, ভোরের তুষার এসে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে দুহাত দিয়ে যেন মুছে দিয়ে গেছে। ধর্ম্মশালার জানালা থেকে ভারী চমৎকার লাগতো দেখতে। মুখে ব'লে আপনাকে বোঝানো যাবে না। পারেন তো গিয়ে দেখে আসবেন একবার।

ঠাণ্ডা তখন খুব। পথে অমৃতসর থেকে একখানা ভালো গরম দেখে শাল কিনে নিয়েছিলুম; অমৃতসরের শাল ও কার্পেট্ যে বিখ্যাত তা ভুগোলে প'ড়ে থাকবেন। কিন্তু শীত তাতেও মানতে চায় না।

বাড়ী ছাড়ার পর তখন বোধ হয় মাসখানেক হ'য়ে গেছে; এসেছিও বোধ হয় কম্‌সে কম্ হাজার দেড়েক মাইল। নাঙ্গা-পর্ব্বত আর বেশী দূরে নয়। গায়ের রক্ত যেন টগবগ ক'রে উঠলো।

এবার প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে তৈরী করতে হবে। নৌকো তীরের কাছে এলো ; ওরে মাঝি! এবার কসে দাঁড় টানতে হবে, হাল রাখতে হবে ঠিক। মস্ত লম্বা পাড়ি দিয়ে এসেছিস তুই, বুকে নিয়ে অসীম অদম্য সাহস। আর সামান্য পথ মোটে বাকী।

আকাশের কোণে মেঘের মতো এক ঠাণ্ডা উদাসী সন্ধ্যাবেলা—হঠাৎ ঠাণ্ডাটা একটু বেশী পড়ার জন্যেই হয়তো—শরীরটা যেন একটু কেমন কেমন ক'রে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে মনটাও। থার্ম্মোমিটার লাগিয়ে দেখ্‌লুম জ্বর হয়েছে একটু। কিন্তু একটু থেকেই অনেকটুকু হয়। কাজেই ভাবনা হ'লো সেবাধর্ম্মে মতি আছে এ হেন লোক দরকার হ'লে এ ধর্ম্মশালায় পাওয়া যাবে কিনা!

বিছানায় শুয়ে শুয়ে চিন্তা ক'রে যাচ্ছি। তখনকার অবস্থাটা কেমন যেন একটু নির্লিপ্ত ভাব ; চিন্তা আছে, অথচ উদ্বেগ নেই। সমস্ত শরীরটা যেন ঝিমিয়ে আছে। এক দিকে অনেক দূরে ধূ ধূ দেখা যাচ্ছে যেন আমার পেছনে ফেলে আসা বাড়ী, অন্য দিকে মাথা উঁচু করে নাঙ্গা পর্ব্বত, আর মাঝখানে আমি। বাড়ীর চিন্তা, মোক্ষদাসুন্দরীর চিন্তা—সে সব যেন ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। মানুষ নিজেকে যখন খুব অসহায় মনে করতে থাকে তখন শেষটায় তার এমন একটা অবস্থা আসে যখন সে নিজের অসহায়তার কথা ভুলে যায়। আমারো তাই হ'লো। তারপর আস্তে আস্তে কখন ঘুমিয়ে পড়লুম টের পেলুম না। কেউই পায় না।

স্বপ্ন দেখলুম—নাঙ্গা-পর্ব্বতের সব চেয়ে উঁচু চূড়ায় নিজেকে অদ্ভুত কৌশলে ব্যাল্যান্স ক'রে দাঁড়িয়ে আছি আমি—প্রথম বাঙালী, প্রথম ভারতীয়, প্রথম মানুষ। মানুষের কাছে পরাজয়ের আনন্দে চুপ ক'রে আছে নাঙ্গা পর্ব্বত, আর অনেক নীচে কে এক নারী কাতর চোখে চেয়ে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ভালো ক'রে চেয়ে দেখলুম মোক্ষদাসুন্দরী। বাপের বাড়ী থেকে ফিরে এসে ডাকছে "ওগো নেমে এসো, নেমে এসো।"

স্বপ্ন আর ঘুম একই সঙ্গে ভেঙে গেল। দেখি বিছানায় আমার শিয়রের কাছে ব'সে আছে কে এক ভদ্রলোক। মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে বললুম "ন্যাপ্‌লা না ?"

উত্তর হ'লো "হ্যাঁ, কিন্তু খবরদার! ন্যাপ্‌লা ন্যাপ্‌লা আর বল্‌বি না। আমি আজকাল রিভলিউশনারি।"

দুজনে পাঠশালায় পড়েছিলুম একসঙ্গে ছেলেবেলায়। তখন থেকেই ভাব জমে উঠেছিলো। তারপর কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণে ন্যাপ্‌লা যে বাড়ী ছেড়ে কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিলো, তারপর তার আর পাত্তা পাওয়া যায় নি। এতদিন পরে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে সুদূর বিদেশে সজ্বর শয়ান সহায়হীন অবস্থায় তাকে পেয়ে মনটা অপূর্ব্ব আনন্দে ভরে উঠলো। এমন কি তার নিজের মুখ থেকে তার রিভলিউশনারিত্বের কথা শুনেও। ওর এই অপ্রত্যাশিত উপস্থিতিকে কিছুতেই অপ্রত্যাশিত ব'লে ভাবতে পার্‌লুম না ; মনে হতে লাগলো এই তো স্বাভাবিক।

বললুম "সে কি ?"

ন্যাপ্‌লা বল্লে "সে ভাই অনেক কথা। যাই হোক, আমাকে এখন তুই যে নামে খুশী ডাক, কিন্তু ন্যাপ্‌লা নয়। ভরদ্বাজ, অতুলচন্দ্র, অরিন্দম…যা তোর খুশী। আমি এখন ফেরারী আসামী

কিনা! আসল নাম কেউ শুনে ফেললে ধরা পড়বার ভয় আছে। আর ধরা পড়লেই…" বলে ন্যাপ্‌লা নিজের গলা দেখিয়ে দিয়ে হাসতে লাগলো।

বললুম "বলিস্ কি অতুল?" যদিও ন্যাপলা বল্লেও শুনবার অন্য কেউ কাছাকাছি ছিল না।

ন্যাপ্‌লা হেসে বললো "নির্জলা খাঁটী কথা। বিপ্লবী হতে হ'লে প্রাণ হাতের মুঠোয় পুরে নিয়ে তবে বেরুতে হয়। প্রাণের মায়া থাকলে রিভলিউশনারি হওয়া চলে না। এই তো সেদিন আমাদের দলের পিনাকী বাঁড়ুজ্যে—অবশ্য এ হচ্ছে তার বিপ্লবী নাম, আসল নাম তার অন্য—কিন্তু যাকগে। ও 'কাউয়ার্ড'টার কথা মনে করলেও লজ্জায় গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। কিন্তু তোকে যে দেখবো এই সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে, তা তো ভাবতেই পারি নি। ওদিকে তোকে নিয়ে তো হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার।"

বললুম "বলিস্ কি অরিন্দম?"

"দুহাজার টাকা পুরস্কার।"

"তার মানে?"

"ওগো ফিরে এসো। বিরিঞ্চি ফিরে আয় বাবা।"

"হেঁয়ালি ছেড়ে সোজা কথা বল অপরেশ।"

"নেহাৎই আমি ফেরারী রিভলিউশনারি। তা নইলে এবার দু হাজার টাকার বাজী মারতুম। কিন্তু তোর মত গোবেচারা নিরীহ ভালো মানুষ যে এত কাণ্ড করবে—এ আমি কোনোদিন কল্পনাও করতে পারি নি বিরিঞ্চি।" ব'লে ন্যাপ্‌লা আমার তক্তপোষের তলা থেকে টেনে বার করলো এক ছোট্ট সুটকেস। তারপর সুটকেস খুলে এক তাড়া খবরের কাগজের ছোট বড় নানা রকমের কাটিং—ইংরিজী, বাংলা, হিন্দী, উর্দু। কতকগুলো বিজ্ঞাপন দুঃখিনী মোক্ষদাসুন্দরীর নামে, তার সার কথা "ওগো ফিরে এসো।" উচ্ছ্বাস ছিল অবশ্য নানারকম। কতকগুলো বিজ্ঞাপনের সারমর্ম্ম "বিরিঞ্চি, ফিরে আয় বাবা, ফিরে আয়", আর তার নীচে "তোমার হতভাগ্য পিতা।" কতকগুলো বিজ্ঞাপনে আমার ফোটো ছাপা, তার তলায় লেখা আমার খোঁজ ক'রে দিতে পারলে নগদ দু হাজার টাকা পুরস্কার।

বললুম "আশ্চর্য্য! না ব'লে বেড়াতে চ'লে এসেছি এতেই এত? ওদের কি মাথা খারাপ হ'ল না কি?"

ন্যাপলা বললে "অন্ততঃ একখানা চিঠি দেওয়া তো উচিত ছিল। ওরা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দিয়ে যে ফতুর হয়ে যাবে! আমি যতদিন ছিলুম বাংলা মুলুকে, একটি দিনও বিজ্ঞাপন বাদ যেতে দেখি নি।"

ভেবে দেখলুম বাস্তবিকই তাই। এমন বেপরোয়া হয়ে "ওগো ফিরে এস" আর "বিরিঞ্চি ফিরে আয় বাবা" ছাপ্‌লে কুবেরের ভাণ্ডারও যে ফাঁকা হয়ে যায়। আর কি বিশ্রী ব্যাপার বলুন তো! সারা বাংলা মুলুকে একটা ঢি ঢি প'ড়ে গেল, না? দু হাজার টাকা তো আর চাট্টিখানি কথা নয়! কত লোক যে ওরি লোভে আহার নিদ্রা ভুলে খুঁজে বেড়াচ্ছিল বিরিঞ্চি পাকড়াশীকে, কে তার

হিসেব রাখে? তবু ভাগ্যি এ কথা কারুর খেয়াল হয়নি, আমি বাংলার সীমা ছাড়িয়েও পাড়ি দিতে পারি। তা হ'লে ভারতবর্ষের কোন কাগজেই বিজ্ঞাপন বাদ যেত না।

এ কথা ভেবে কিন্তু মনটা সত্যি ভারী খুশী হয়ে উঠল, যেমন খুশী তার আগে কোন দিন হইনি,—যে বউ যতই রাগ করুক, অভিমান করুক, তার প্রাণের বালুর তলায় প্রেমের ফল্গু ব'য়ে চলেছে আমার জন্যে। বাস্তবিক মশাই, এ রকম একটা কাণ্ড না করলে আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন না আপনাকে কে কত ভালবাসে।

কিন্তু মন খুশী হয়ে উঠলেও মাথাটা বিষম ধরেছিল। নাড়ী দেখে হ্যাপলা বললে "জ্বর হয়েছে বোধ হয়। আর খুব সম্ভব ভোগাবে। নাড়ী এ রকম নাচা ভাল নয়, আমায় একবার পাক্কা দুটি মাস ভুগিয়েছিল। আমি নেহাৎ রিভলিউশনারি ব'লে আমায় কাবু করতে পারেনি।"...ভুগলুম। দুমাস নয়, সাত দিন। রিভলিউশনারি হ্যাপলা না থাকলে যে কি অবস্থা হতো সেটা ভাবতেও ভয় হয়।

সেরে উঠতেই হ্যাপলা বললে "এবার আর দেরী নয়। সটান বাড়ি চ'লে যা। নইলে যা বিশ্রী রকম বরফ পড়তে সুরু হয়েছে, শেষ কালে ঠাণ্ডায় মারা পড়বি।"

কোন কথা সে শুনতে চাইলে না। এক রকম জোর ক'রেই টিকেট কিনে গাড়িতে তুলে দিয়ে বললে "বিয়ে যখন করেছিস তখন বেচারা বউকে কেন কাঁদিয়ে মারিস? ফিরে যা। তুই তো আর আমার মত রিভলিউশনারি নস্ যে পেছন পানে না তাকিয়ে শুধু সামনের দিকে এগিয়ে চলবি, কার চোখে ঝর্‌ল দু ফোঁটা জল বা কার বুক গেল ফেটে চৌচির হয়ে সে দিকে এক মুহূর্তও না তাকিয়ে তোর জীবন তো পিছল বা বন্ধুর আঁধার পথে বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলার নয়। ফাগুনে ফুলের বাগিচায় যে যৌবন উতলা দখিন হাওয়ায় ভেসে আসে, তোর হচ্ছে সেই যৌবন; ঊষর মরুর ধূ ধূ বালুতে যে শুকনো বসন্ত আসে, সে তো তোর নয়। তোর যৌবন গড়ে তুলবার, আমাদের যৌবন ভেঙে চুরমার ক'রে দেবার। তোর যৌবনের জন্যে আছে সুখের সোনার খাঁচা; কাঁটা গাছের অনেক উঁচু ডালে ব'সে পুচ্ছ নাচাতে তুই পারবি কেন?"

আমার যা কিছু বলার ছিল, কিছুই বলতে পারলুম না। ওর কথার স্রোতের প্রাবল্য একটু কমতেই মনে হ'ল এবারে আমার তরফ থেকে আমিও কিছু বলি, তখন হুইসিল দিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে।

বললুম "আবার কবে কোথায় তোর সঙ্গে দেখা হবে বীরেশ?"

হ্যাপলা বললে "সে কথা ভগবানও বলতে পারেন না বিরিঞ্চি।" ব'লে পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে বাতাসে দোলাতে লাগল।

হু হু ক'রে ছুটেছে ট্রেণ, পেছনে ফেলে শ্রীনগর, রিভলিউশনারি হ্যাপলা আর নাঙ্গা-পর্ব্বত। গরম সুট্ আর অমৃতসরের শাল হার মেনে যেতে লাগল, এম্নি কন্‌কনে শীত। সাত দিনের কাশ্মীরি জ্বরের জের তখনও রয়েছে; কিছুদিন আরও থাকবে বলেও মনে হচ্ছে।

হাসিও পেতে লাগল হ্যাপলার কথা মনে প'ড়ে "কাঁটা গাছের অনেক উঁচু ডালে ব'সে পুচ্ছ নাচাতে তুই পারবি কেন?" কোথায় নাঙ্গা-পর্ব্বত আর কোথায় কাঁটা গাছ। রিভলিউশনারি

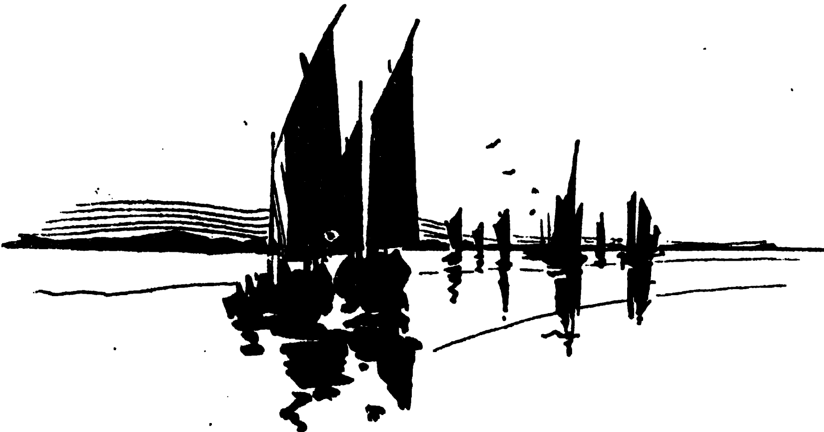
স্যাপলা দুরূহ-নাঙ্গা-পর্ব্বত-অভিযাত্রী বিরিঞ্চি পাকড়াশীকে বলছে "তোর যৌবনের জন্যে আছে সুখের সোনার খাঁচা !" আপন মনে হাসতে হাসতে শালটা আরও ভাল ক'রে গায়ে জড়িয়ে নিলুম, কাঁচের জানালা ভেদ ক'রেও যেন বাইরের ঠাণ্ডা হু হু ক'রে চল্‌তি কামরার ভেতরে আসছে ব'লে মনে হচ্ছিল।...

যাক্ গে'। কাহিনী লম্বা হয়ে যাচ্ছে, এবারে সংক্ষেপ না ক'রে উপায় নেই। যে পথে বাড়ি থেকে এসেছিলুম, সে পথেই আবার বাড়ি ফিরে গেলুম যন্ত্রচালিতের মত। খুব হুঁশিয়ার হয়ে অবশ্য, দুহাজার-টাকা-পুরস্কার-লোভী ওঁৎ-পাতিয়েরা কেউ চিনতে পেরে পাকড়াও না করে।

বাড়ি ফিরে মশাই কি যে পরিবর্ত্তন কি আর বলব ? বউ একেবারে আলাদা মানুষ হয়ে গেছে। বদ্‌রাগ যে এমন গভীর অনুরাগে পরিণত হতে পারে তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। পাছে আবার বিবাগী হয়ে চ'লে যাই সেই ভয়েই বোধ হয় বউ আর বাপের বাড়ি যাবার নামটিও করত না। আর সীতা, সতী, সাবিত্রী যে এদেশেই জন্মেছেন তা প্রমাণ করবার জন্যে যেন উঠে পড়ে লাগল। বুঝলুম অভিযান ব্যর্থ হয়নি একেবারে।

তারপর নাঙ্গা-পর্ব্বতের ডাক অনেকবার শুনেছি। খুবই স্বাভাবিক। এক রকম হাতের কাছে পেয়েও ফেলে চ'লে এসেছিলুম কি না ? অনেকবার পা দুটো যেন সুর সুর ক'রে উঠতো। কিন্তু মোক্ষদার ম্লান অশ্রুছলছল চোখ দুটি, আর "ওগো, বল আমায় ছেড়ে আর কখনও তুমি যাবে না।" মনে পড়েই আবার সব গুলিয়ে যেত। ফলে আর যাওয়া উঠল না।

আমি আজ বৃদ্ধ। সে যৌবন আমার আর নেই। আর আসবেও না। তবু দুঃখ করি না। যখন তুমি আসবে এস, নোটিশ দিয়ে বা না দিয়ে, ওগো মরণ, ওগো বন্ধু ! এই গর্ব্ব নিয়েই হাসিমুখে তোমায় আমি বরণ করব, পৃথিবীর সর্ব্ব প্রথম নাঙ্গা-পর্ব্বত অভিযাত্রী আমি বাঙালী !



কবিকঙ্কণ

শ্রীসুশীলকুমার মজুমদার

নিরালা গ্রামের প্রান্তে, হে দরিদ্র কবি,
সহি' ক্ষত অত্যাচার কত না বেদনা
পেয়েছিলে মনোমাঝে কবির চেতনা
দেখেছিলে দারিদ্র্যের মূর্ত্তিমান ছবি—
ফুল্লরার খেদগীতি, অম্বিকার মায়া,
সরল সহজ প্রীতি, সরল বিশ্বাস,
হিংসুকের নিন্দুকের গরলনিঃশ্বাস,
খুল্লনার ফুল্লমুখে বিষাদের ছায়া।

দুঃখদাহে কাব্য তব নিকষিত হেম,
ঝটিকার ঊর্দ্ধে যেন তারকার ভাতি,
সাগর-গর্জ্জনমাঝে কমলে কামিনী,
মুমূর্ষু শিয়রে যেন অপলক প্রেম—
নিদ্রাহীন বসি' আছে জাগি' সারারাতি,
ঊষালোকে ম্লান যেন ধূসরা যামিনী।



সমাজ ও সাহিত্য

শ্রীসৌরীন্দ্র মিত্র

সমাজ ও সাহিত্য কথা ছুটি নিয়ে তর্ক আর কাটাছেঁড়ার অন্ত নেই। গবেষণার পর উদ্ধৃতি-কণ্টকিত গবেষণায়, তত্ত্বের পর গভীরতম দার্শনিক তত্ত্বের প্রহারে কথা ছুটি জর্জ্জরিত। সে-সব পাণ্ডিত্যপূর্ণ তথ্যের পুনরাবৃত্তির জন্য এ-প্রবন্ধের অবতারণা নয়। সে-পাণ্ডিত্য এবং সে-অবসর সকলের নেই। এখানে শুধু সমাজ ও সাহিত্য সম্পর্কে সাম্প্রতিক সাহিত্যবিবেচক মহলে যে মত চল্‌তি হয়েছে, তারই সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলবো।

মাসিক কাগজের পৃষ্ঠায় আজকাল একদল সমালোচক প্রায়ই একথা বলে থাকেন যে, সাহিত্য-সম্পর্কে সনাতন যে কয়টি রীতি ও ধর্ম্ম সাহিত্যিকেরা এ যাবৎ মেনে এসেছেন, তা এক কালে সত্য ও কার্য্যকরী হ'লেও, বর্ত্তমানে অচল। তার কারণ, আজ থেকে পঞ্চাশ ষাট বছর পূর্ব্বেও, অর্থাৎ ভিক্টোরীয় যুগের শেষভাগেও বাংলার সমাজ যে অবস্থায় ছিল, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিবর্ত্তনের ফলে আজ আর তা নেই। ভিক্টোরীয় যুগের সাবকাশ, পরিপুষ্ট সমাজের সঙ্গে, সমরোত্তর কালের হৃতস্বপ্ন, অশান্ত সমাজের বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নেই। সে যুগের জীবন ছিল পৃথক, সে যুগের মানুষ ছিল আলাদা। তাদের পক্ষে যা ছিল সত্য, যে আশা-আকাঙ্খা ছিল তাদের, ধর্ম্ম ও সমাজ বিধির প্রতি যে মনোভাব ছিল তাদের, ঐতিহাসিক তথ্য হিসেবে তাদের মূল্য অবিসম্বাদিত হ'লেও, আমাদের জীবন ও আমাদের বর্ত্তমান সমাজের পক্ষে তা অপ্রযোজ্য অতীত-কাহিনী। এই দীর্ঘ ঘটনাবহুল শতকার্দ্ধে সেতুর নীচে দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে, প্রগতির দ্রুতচক্রের আবর্ত্তনে আমরা ও আমাদের সমাজ সেই পুরোনো যুগের ছায়াশীতল পরিবেশ ছেড়ে বহু দূরে সরে এসেছি। অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক কারণে আমাদের জীবন জটিলতর ও কঠিনতর হয়ে উঠেছে; সমাজ, যার আশ্রয়ে এতকাল আমাদের জীবনের বাহ্যিক সমতা বজায় ছিল, তার সমস্ত গলদ আমাদের কাছে আজ প্রত্যক্ষ। আজ আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিশৃঙ্খল সমাজের হাতে বিপন্ন, আমাদের ভবিষ্যৎ—অন্তঃক্ষয়িষ্ণু সমাজের স্বাস্থ্যহীনতায় অন্ধকার। সুতরাং আমাদের জীবন ও সমাজের এই আমূল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিক রীতি ও আদর্শেরও পরিবর্ত্তন শুধু সঙ্গত নয়, অনিবার্য্য। কাজেই সমাজের প্রতি সাহিত্যিকের, বিশেষ ক'রে কবির, যে ঐতিহ্যপুষ্ট নির্লিপ্ততা, যে আদর্শের দ্বারা এতকাল প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে, সে-আদর্শেরও আজ পরিবর্ত্তন আবশ্যক। কেন না, আদি কবি বাল্মীকির যুগ থেকে এমন কি প্রাগ্‌রবীন্দ্র-যুগের কবিকুল পর্য্যন্ত সমাজচক্র থেকে অল্পবিস্তর নিজেদের দূরে রাখতে সমর্থ হ'লেও বর্ত্তমানে তা সম্পূর্ণ অসম্ভব,—সমাজ-যন্ত্রের বৈকল্যের দরুন তার প্রতি অচেতনতা বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সেই কারণে আজকের দিনের সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হবে বলিষ্ঠ বাস্তবতা, মোহ-হীন সমাজ-সচেতনতা। শুধু আদর্শ ও দৃষ্টি-ভঙ্গিই নয়, আজ বিষয়বস্তুও বাস্তব হতে বাধ্য। অর্থাৎ বর্ত্তমানে যে-লেখায় সমাজের ছায়া না পড়বে, সে লেখা কিছুতেই ভালো হবে

না,—ভালো হবে না, যদি মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সে রচনা না লেখা হয়, কিম্বা যদি বর্ত্তমানের ভাঙনধরা সমাজ ও তার আওতায় উদ্‌ভ্রান্ত মানুষের সমস্যা থেকে তার বিষয়বস্তু হয় পৃথক্।

স্বীকার করবো, এ কথায় সত্য আছে অনেকখানি। কিন্তু তাই ব'লে সাহিত্য-সম্পর্কে এটাই চূড়ান্ত ব্যাখ্যা নয়। আজ নানা দিক দিয়ে সমাজের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর এবং বর্ত্তমান-কালের বাস্তবপন্থী সাহিত্য যে তারই একটা প্রধান ফল, একথা অনস্বীকার্য্য। এটা সত্য যে আধুনিক যুগের অনেক মহৎ সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যেই সমাজ তার নোঙ্‌রামী আর ক্লীবতা, তার ব্যভিচার আর অন্তঃশূন্যতা নিয়ে দেখা দিয়েছে। গোর্কী আর হাম্‌সুন দুটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। কিন্তু তাই ব'লে এমন কথা কি ক'রে বলি যে, যে রচনা প্রধানত সমাজকে নিয়ে লেখা নয়; শুধু সেই কারণেই, তা প্রথম শ্রেণীর হবে না বা অমরত্বের দাবী তার গ্রাহ্য হবে না। সমাজকে নিয়ে ভালো, প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য লেখা হয়েছে, কিন্তু তাতেই প্রমাণ হয় না সমাজ-ছাড়া সাহিত্য-সৃষ্টি হতে পারে না বা হয় না। অনেক উচ্চাঙ্গের সাহিত্যে সমাজের ও রাষ্ট্রের ছবি পাওয়া যায়, কিন্তু তাতে কখনই প্রমাণ হয় না যে, আধুনিক সাহিত্য একটি আর্‌শি-বিশেষ—সমাজের মূর্ত্তি বিম্বিত করাতেই যার পরম চরিতার্থতা।

সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের এবং সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ যে অঙ্গাঙ্গী—বিশেষ ক'রে বর্ত্তমান যুগে—এ কথা সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করবেন। সাহিত্য যে ধীরে-ধীরে সমাজকে গড়ে তুলতে পারে, ইতিহাস তার সাক্ষী। আর চাঁদ যেমন ক'রে নদীর জোয়ার-ভাঁটাকে নিয়ন্ত্রিত করে তেমনি সমাজও যে কখনও কখনও নিয়ন্ত্রিত করেছে সাহিত্যের স্রোতকে, এ কথা এতই সত্য যে তা' প্রায় ধরা বুলিরই সামিল। সাহিত্যিক যখন আর দশজনেরই মত সামাজিক জীব, সমাজের বিবর্ত্তন বা বৈকল্যের প্রতি তিনি কোন ক্রমেই নির্ব্বিকার থাকতে পারেন না। বিশেষ ক'রে বর্ত্তমান কালে, যখন তমসার তীরে হোমাগ্নি-পরিশুদ্ধ নির্জ্জন তপোবনে বা শিপ্রাতীরে উজ্জয়িনীর উপকণ্ঠে "কানন ঘেরা বিজন বাড়িতে", ধ্যান আর চিন্তা, গান আর কবিতা নিয়ে নিরুপদ্রব জীবন আমরা চাইলেও পাচ্ছি না। আজকের দিনে সমাজ অনস্বীকার্য্য এবং সমাজের অধীনে থাকতে গিয়ে সমাজ-সম্পর্কিত নানাজাতীয় অনুভূতি যে লেখকের হবে, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। আর যেহেতু অনুভূতিই সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা-উৎস, কখনও কখনও সমাজই যে হবে তার বর্ণনীয় বা মন্তব্যের বিষয়, সেটাও অস্বাভাবিক নয়। যে লেখক সমাজের কোন কোন ব্যাপার গভীরভাবে অনুভব করেছেন এবং তেমনি গভীরভাবেই পাঠককেও অনুভব করাতে পেরেছেন, তাঁর রচনা যে সার্থক, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু এই সমাজ-সচেতনতা এবং সমাজ-চিত্রই যে আধুনিক লেখকের পক্ষে একমাত্র সার্থকতা, এমন জবরদস্তি আর যেখানেই চলুক, সাহিত্যে চলে না।

লেখক সমাজের অন্তর্গত, সুতরাং সমাজ-সচেতন। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। তিনি সব সময়েই যে সমভাবে সচেতন থাকবেন বা তাঁর সব লেখাতেই যে সমাজ-অনুভূতির প্রকাশ হবে এমন আইন লেখকের ওপর খাটে না। বরং এটাই সত্য যে, যে মন নিয়ে আমরা কংগ্রেসের রাইট-উইং লেফ্‌ট-উইং নিয়ে তর্ক ক'রে পেয়ালায় চা জুড়িয়ে যেতে দিই—চাকরির বাজার নিয়ে হা-হুতাশ করি, মন্ত্রী-সভার বিরুদ্ধে চেঁচামেচি করি;—যে মন নিয়ে আমরা খাই, ঘুমোই, পান চিবিয়ে আড্ডা দিই, বাজার করতে গিয়ে দরদস্তুর করি, সে মন নিয়ে সাহিত্য-সৃষ্টি চলে না, কবিতা লেখা চলে না। অথচ

ঐ সব টুক্‌রো কাজের ভেতর দিয়েই আমরা সামাজিক এবং আমাদের সামাজিক অনুভূতি। আসলে একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, যে মন সমাজের বিশৃঙ্খলার দ্বারা বিড়ম্বিত ও সমাজের অসমব্যবস্থার দ্বারা নির্য্যাতিত আর যে মন সৃষ্টি করে,—যে মনের অতল অন্ধকারের কুহেলি-স্রোত থেকে তরঙ্গ-উত্থিতা আফ্রোদিতের মত ফুটে ওঠে রূপের স্বর্ণকমল,—তারা মূলত এক হয়েও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। শিল্পী-মনের আবছা কুয়াসা সরিয়ে একটু একটু ক'রে যখন জ্যোতিষ্পিণ্ড নীহারিকার মত তাঁর প্রদীপ্ত সৃষ্টি ফুটে উঠতে থাকে,—ভাবী সৃষ্টির প্রজ্জ্বলন্ত শিখায় তাঁর মন যখন দ্যুতিময়,—তখন পৃথিবী, সমাজ, রাষ্ট্র, এমন কি তাঁর প্রতিদিনের সত্তা পর্য্যন্ত প'ড়ে থাকে তাঁর চেতনার বাইরে; তিনি এক হয়ে যান তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে, তাঁর কল্পনার স্বপ্নালোকে। সেই মুহূর্ত্তে তিনি উন্নীত, রূপান্তরিত, স্বতন্ত্র। যে শেলী "I arise from dreams of thee !"-র মত কবিতা লিখ্‌ছেন, সেই মুহূর্ত্তে নিশ্চয়ই তিনি গডুইন-শিষ্য চার্চ্চ-বিদ্রোহী নাস্তিক শেলী নন। যে লরেন্স রাইনের তীরে 'কৃষ্ণ অরণ্যের' মৌন ছায়ায় ব'সে দীর্ঘ, নিরবয়ব, বোবা গাছের সারি দেখে, তাদের কথা ভাবতে ভাবতে বৃক্ষজীবনের গোপন রহস্যময় মর্ম্মমূলে গিয়ে বৃক্ষজাতির মূক লোলুপতায়, উদ্দাম আরণ্য উল্লাসে মর্ম্মরিত হয়ে উঠেছিলেন, কিম্বা পথে যেতে ছোট্ট লাল সাইক্লামেন ফুল দেখে চ'লে গিয়েছিলেন সৃষ্টির শৈশবকালে—যেখানে রক্তসন্ধ্যার পরিম্লান ছায়ায় গুহাবাসিনী আদিম নারী আনন্দে, বিস্ময়ে, ভয়ে সঙ্কোচে আগুনের স্ফুলিঙ্গের মত এই ফুলকে তুলে নিয়ে খোঁপায় পরেছিল—তখন, অন্তত তখন তিনি মুক্ত, নিজের কাছ থেকে, সমাজের হাত থেকে, এমন কি স্থান ও কালের অমোঘ শাসন থেকে। হয়তো তার আধঘণ্টা পরেই তাঁকে চাকর পাঠাতে হয়েছিল ব্যাঙ্কে 'চেক্‌' ভাঙ্গাতে, সমর্পণ করতে হয়েছিল নিজেকে সমাজের হাতে—কিন্তু তখন নয়, সেই মুহূর্ত্তে নয়, কিছুতেই। সৃষ্টির সেই অবর্ণনীয় দৈবী মুহূর্ত্তে শিল্পী মনের ওপর কোন কিছুরই নিরঙ্কুশ আধিপত্য চলে না—তখন সমাজের যেটুকু দাবী, রূপকথার কল্পলোকেরও ঠিক ততখানি, তখন মানুষের যতখানি অধিকার, অ-মানুষের (যেমন ঈশ্বর, কি ফুল) অধিকার তার চেয়ে কিছু কম নয়। সেই মুহূর্ত্তে যদি তাঁর বাণীর জ্যোতির্ম্ময় খড়্গ ঝল্‌সে ওঠে সমাজের ব্যভিচারের বিরুদ্ধে, আমাদের আপত্তির কারণ নেই, কেননা আমরা বুঝবো সে বিদ্রোহের পেছনে আছে তীব্রতম অনুভূতি। কিন্তু তিনি যদি এমন কোন রূপরাজ্যের বর্ণনা করতে বসেন, যেখানে :

> Midnight's all a-glimmer, and noon a purple glow
> And evening full of the linnet's wings.

তা হ'লেও আমরা এ-কথা বলবো না, এ রচনা সাহিত্য নয়। কেননা আমরা জানি এই যন্ত্রযুগের ভীড় আর কোলাহলময় রাজপথে দাঁড়িয়েও সত্যিই ঐ হ্রদসনাথ প্রবালদ্বীপের স্বপ্ন দেখা শিল্পীর পক্ষে অসম্ভব নয়। নিছক এস্‌কেপিজ্‌ম্ নয়,—এ হচ্ছে প্রতিদিনের পুরোনো পারিপার্শ্বিককে নতুন ক'রে সৃষ্টি করা, এ হচ্ছে অভ্যাসের পর্দ্দা সরিয়ে পরিচিত পৃথিবীকে নতুন ক'রে 'দেখা'। এই নতুন ক'রে দেখার ক্ষমতা আছে ব'লেই অনেক অসাধারণ ও বিচিত্র অনুভূতি কবি ও লেখকের বরাতে ঘটে। এবং সাহিত্যের মৌল উৎস এই অনুভূতি কেন এক বিশেষ জাতীয় হবে না, অর্থাৎ সমাজ-সম্পর্কিত হবে না, এ-জাতীয় অভিযোগ শুধু অসঙ্গত নয়, হাস্যকর।

শিল্পীর সামাজিক সত্তা আর তাঁর সৃষ্টিশীল মন কখনও এক নয়। সুতরাং এদের মধ্যে একটা অপরিহার্য্য ও অনিবার্য্য কার্য্যকারণ সম্বন্ধে কি ক'রে স্থাপন করি? তবে এইটুকু আমরা বলতে পারি যে কখন কখনও একটা অন্যটার চেয়ে প্রবল হয়ে উঠতে পারে। এবং তা পারে ব'লেই কেউ সমাজের পরিণাম ভবে চিন্তাকুল, কেউ বা জল্পনা করছেন জোরোয়াস্টর, গ্যালিলিও এমন কি কীট্‌স্ পর্য্যন্ত যা দেখেন নি, চাঁদের সেই চির অদৃশ্য উল্টো পিঠ নিয়ে। কিন্তু তাই ব'লে এক জাতীয় লেখক অপর জাতীয় লেখকের চেয়ে কম কি বেশী উন্নত নয়। বিষয়বস্তু কখনই সাহিত্যের উৎকর্ষ-অপকর্ষের মাপকাঠি হতে পারে না।

আমার বিশ্বাস এই কথাটি বুঝলেই সাহিত্য সম্পর্কে অনেক জটিলতার নিরসন হয়ে যায়। বিষয়বস্তু রচনার একটা প্রধান অঙ্গ, সে-কথা ঠিক—কিন্তু কেবলমাত্র বিষয়বস্তুর গৌরবেই রচনা সাহিত্য হয়ে ওঠে না। তা যে ওঠে না তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের কাঁচা অনুকারীরা,—রবীন্দ্রনাথের ভাব আত্মসাৎ ক'রেও তাঁরা বড় বেশী সুবিধে ক'রে উঠতে পারেন না। সাহিত্য তাঁদের লেখাকে কেউ কোন কালে বলবে না,—যদিও তাঁদের উপাদান অনেক ক্ষেত্রে আমাদের সাহিত্যে যা মহত্তম, সেখান থেকেই আহৃত। উপাদান এক হিসেবে উপলক্ষ্য ছাড়া কিছু নয়। কল্পনা ও অনুভূতির রসে রূপান্তরিত হয়ে, লেখনীর মায়াবী জাদুর স্পর্শে যে-কোন বিষয়বস্তুই আর্টের দুরধিগম্য শিখরদেশে উত্তীর্ণ হতে পারে,—এবং সে বিষয়বস্তুর সঙ্গে মানুষের সমাজের, মানুষের সংসারের কোন যোগ যদি নাও থাকে, তবুও;—যদি তা হয় দূর আকাশের সবুজ তারা, হ্রদের বুকে মূর্চ্ছিত গোধূলি আলো, যদি হয় নির্জ্জন বনের রজনীগন্ধার নিশীথ গন্ধ। উদাহরণ ইয়েট্‌স্। উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ।

তা ছাড়া, ট্রামে, বাসে যেতে যেতে, আপিসে কলম চালনার বা দিনানুদৈনিক জীবনের বিরল অবকাশে যা কিছু আমরা দেখতে বা অনুভব করতে না পারি, তাই যে মিথ্যা, অবাস্তব এ-কুসংস্কার আমাদের কেন? সাহিত্যের সত্য তো আর সংবাদপত্রের বা Statistics-এর সত্য হতে পারে না। যে জিনিস 'আছে', যে জিনিস আমরা দেখছি, যা ঘটছে সর্ব্বদা আমাদের আশে-পাশে, তার সঙ্গে বিষয়বস্তুর মিল হ'লেই সাহিত্য সত্য বা বাস্তব হবে, এ-দুর্ব্বুদ্ধিতা বা নির্ব্বুদ্ধিতা যেন আমাদের কোনদিন না হয়। সাহিত্যের সত্য একমাত্র অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ নয়, অনুভূতি-নির্ভরও,—যাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমরা জানি এ-মিথ্যা হতে পারে না। রাস্কল্‌নিকফের মতো হত্যাকারী, আর্পাডের মতো অধ্যাপক, মিকবারের মতো উড়নচণ্ডী, সাইলাস মার্নারের মতো কৃপণ যখন আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন আমরা ব্যস্ত হই না জাগতিক দৃষ্টান্তের সঙ্গে তাদের মিলিয়ে নিতে। প্রাত্যহিক সংসারে হয়তো হত্যাকারী প্রায়ই রাস্কল্‌নিকফের মতো দার্শনিক হয় না, অধ্যাপক যাদের আমরা দেখি সত্যিই হয়তো তারা আর্পাডের সমগোত্রেয়, আমাদের পরিচিত অমিতব্যয়ীরা হয়তো মহাপ্রাণ নয় মিকবারের মতো। কিন্তু এদের প্রতিরূপ দৈনন্দিন জীবনে থাক বা না থাক, কিছু এসে যায় না। থাকে ভালোই, না থাকে, তাতেও ক্ষতি নেই। পার্থিব অর্থে অস্তিত্ব-নিরপেক্ষ ব'লেই তারা অবাস্তব নয়। তারা যে অবাস্তব নয় তার প্রমাণ, এদের সহজেই আমাদের মনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারি—

সহজেই আপনার ক'রে নিতে পারি, মিলিয়ে নিতে পারি মনোজগতের পটভূমি সঙ্গে—যেখানে ঈশ্বর সত্য, পরীরা সত্য, যেখানে সত্য ইয়েটসের Lake Isle of Innisfree, সত্য রবীন্দ্রনাথের 'কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ'। যখন বলি সারা গ্যাম্প মিথ্যা নয়, ফল্স্টাফ সত্য, সত্য সাঞ্চো পাঞ্জার মত প্রভুভক্ত ভৃত্য, তখন ভিতর দিক থেকে কোন প্রতিবাদ আসে না। প্রতিবাদ আসে না নিখ্লুডফের মত Altruist, সোনিয়ার মত গণিকা, ম্যাদাম বোভারীর মত ভাবপ্রবণা নারী, অমিত রায়ের মত কবিপ্রকৃতির বিরুদ্ধে। এদের কোনটিই সরকারী অর্থে 'ছাপ-মারা' বাস্তব চরিত্র নয়। প্রতিদিনের জীবন থেকে এরা 'নকল'-করা নয়, কল্পনার রসে এরা চিরকালের জন্য 'সৃষ্টি' করা। এরা যদি বাস্তব না হয়, তবে ও-কথার কোন অর্থ নেই। হয়তো বলা চলে, 'কই রেস্টরাঁতে এদের কারুর সঙ্গেই তো আমাদের দেখা হয় না জীবনে, ট্রেণের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় দেশলাই চাবার অছিলায় তো এদের কেউ-ই গায়ে পড়ে আলাপ জমাতে আসে না, এ রকম চরিত্র তো আমরা কখনও দেখি নে।' এর জবাব সূর্য্যাস্তের চিত্র প্রসঙ্গে টার্ণার দিয়েছিলেন, 'কিন্তু দেখতে পেলে কি খুশি হতেন না?' ডি-এইচ-লরেন্সও এই মর্ম্মে বলেছিলেন—"If you are too personal, too humun, the flicker fades out, leaving you with something awfully lifelike, and as lifeless as most people we meet."

বাস্তব-সৃষ্টির বেলাতেও বিষয়বস্তু গৌণ। কলের মজুর কি গাড়োয়ান, বিড়িওয়ালাদের নিয়ে লিখলেই যে, সে লেখা বাস্তব এবং প্রথম শ্রেণীর রচনা হবে, এবং কল্পনা থেকে যে জিনিস লেখা তাই 'এস্কেপিস্ট' এবং তৃতীয় শ্রেণীর হবে, এ অন্ধ ধারণা আর যার থাক্, সমালোচকের থাকা উচিত নয়। গোর্কী, হামসুন, শলোকভ্ মহৎ লেখক, তাঁদের লেখায় সমাজচিত্র ও প্রোলিটেরিয়াটদের নিয়ে প্রোপাগাণ্ডা আছে ব'লেই নয়; আমরা বরং বলব, থাকা সত্ত্বেও,—অর্থাৎ সাহিত্যের যা প্রাণ, অনুভূতির প্রগাঢ়তা আর প্রকাশের সততা তা আছে ব'লেই।

আসল কথা, সমাজ যদি লেখকের বর্ণনীয় বিষয় হয়, ভালই, যদি না হয় তা হ'লেও মাথায় হাত দিয়া ব'সে পড়বার কোন হেতু নেই। অস্কার ওয়াইল্ড্ একদা এই মর্ম্মে আক্ষেপ করেছিলেন যে,—'My business had been with Ariel, but I set to wrestle with Caliban' কিন্তু এ-আক্ষেপের মূলেও ছিল ভুল ধারণা। আর্টের ক্ষেত্রে এরিয়েলের যে দাবী, ক্যালিবানের দাবী তার চেয়ে কম কি বেশী নয়। আর্টিস্টের কারবার উভয়ের সঙ্গেই। কিন্তু তাই বলে এত বড় দাবী ক্যালিবান করতে পারে না যে, শিল্পীর একমাত্র কাজ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তারই বিকৃত মূর্ত্তি আঁকা। শিল্পী-মনের ওপর সমাজেরও এই ধরণের নিরঙ্কুশ অধিকারের দাবী অগ্রাহ্য। সমাজ-চেতনা অথবা বিচারবোধ অবশ্য প্রত্যেক উঁচুদরের সাহিত্যিকের মধ্যে থাকা উচিত। কিন্তু তাই ব'লে কেবলমাত্র কোন মত বা সাম্প্রদায়িক মনোভাবের কাছে লেখকের ব্যক্তিত্ব উৎসর্গ করতে হবে, এ কথার কোন অর্থ নেই। সহানুভূতি নিশ্চয়ই একটা অপরিহার্য্য উপকরণ, তা সে সামাজিক হোক, কিংবা মানবীয় হোক। কিন্তু এ-সহানুভূতি যদি লেখার বাহন মাত্র না হয়ে লেখকের ওপর প্রভুত্ব করতে আরম্ভ করে, তা হ'লে নাওমি মিচিসন হওয়া যায়, সংযত কল্ডার-মার্শাল হওয়া যায় না।

সাগরিকাদের গান

শ্রীসুনীলরঞ্জন ঘোষ

ফেন-বারিধির নন্দিনী মোরা, অপ্সরী নই—সাগরিকা!
নিদ্রা-গহন অতলে জ্বালাই
দীপাধারে নীল আলো-শিখা।
তারি আভা লেগে রঙে টলমল
শ্যামল-সুনীল সাগরের জল,
সে-ছায়ে উজল দূর-নভতল,
হিমানী-সজল নীহারিকা।
ফেন-বারিধির নন্দিনী মোরা, অপ্সরী নই—সাগরিকা!

জ্যোৎস্না-অধীর বিজন নিশীথে রক্ত-গভীর পাখা মেলি'
দিকে দিকে তাই মোরা ভেসে যাই
সোনালি তনুর ছায়া ফেলি'।
মোদের অলক-গন্ধ-নেশায়
রাতের নাবিক পথ ভুলে যায়,
পাতাল-পুরীর কুমারেরা হায়,
জলে লিখে যায় প্রেম-লিখা।
ফেন-বারিধির নন্দিনী মোরা, অপ্সরী নই,—সাগরিকা!

রতি-বিহ্বল দেহ হ'তে খুলি' রঙীন মেখলা লীলাভরে
আসি বারে বারে মোরা অভিসারে
শৈবালময় বালুচরে।
ছড়ায়ে পাখায় ঝিকিমিকি জল
আমরা শুকাই মেঘ-কুন্তল
দেখাই সবারে করি' কত ছল
তনুর তরুণ মরীচিকা।
ফেন-বারিধির নন্দিনী মোরা, অপ্সরী নই,—সাগরিকা।

খেলা শেষে মোরা ফেলে রেখে যাই মাণিক মুকুতা যাহা কিছু,
এঁকে রেখে যাই বালুকা-বেলায়
চরণ-চিহ্ন পিছু পিছু।
মানুষের লাগি' আমরা যে নিতি
গেয়ে চ'লে যাই সাগরের গীতি,
স্বপ্ন-মধুর মোদের এ-প্রীতি
জানাতে নহি যে সাহসিকা!
ফেন-বারিধির নন্দিনী মোরা, অপ্সরী নই—সাগরিকা।

নটী

শ্রীকল্পিতা দেবী

সহরের সন্ধ্যা। ধূলো ধোঁয়ায় নোংরা আকাশ, সূর্য্যাস্তের লালচে আভায় মরচে পড়া। 'বট্‌ল্‌পামে'র পাতার হাতছানি, ধূসর পর্দার পিছন থেকে ছমছমে ছায়ার ভূতুড়ে ইসারা। হঠাৎ আকাশ-ফাটা আওয়াজ উঠল—দৈত্যের হুঙ্কার যেন, জলস্থলের বুক উঠল ধড়াস করে। প্রকাণ্ড ছুই ডানা ছড়িয়ে নেমে আসে উভচর যন্ত্র-গরুড়, নিরীহ ডিঙিগুলো কে কোথায় সরে পড়ে। ঠেলা খেয়ে ফুলে ওঠে নদীর জল, শিউরে ওঠে সহর।

গঙ্গার পশ্চিম তীরে জীর্ণ দোতলা-ঘরের জানলা খোলা, জ্বলচে লণ্ঠন, আয়না হাতে রিণি এঁকে চলেছে নিজের মুখ, আজ তার রিহার্সলের দিন। দেখতে দেখতে চেহারা তৈরী হ'য়ে উঠচে, বিধাতার হাতের কাজে চালাচ্চে কারিকুরি, মনের কামনা কল্পনার পোঁচ লাগিয়ে চলেছে। চোখের পাতার তলায় কালো কাজলের টান। আনত চোখের বাঁকা চাউনির কোণে থমকে রইল আবেগের চাতুরী। ঠোঁটের ভাঙনের ধারে অস্পষ্ট রঙের বিন্যাসে মুচ্‌কে হাসির জাছু।

ঘরের চেহারা অত্যন্ত এলোমেলো, অযত্নের হেলাফেলা চারিদিকে। পাশের ঘরে অসুস্থ স্বামী শুয়ে, মেয়েটা কেঁদে কেঁদে স্যাঁৎসেতে মেঝের উপর ঘুমিয়ে পড়েছে, দারিদ্র্যকে উপহাস করে হারিকেন-লণ্ঠনের আলো আভা দিয়েছে তার মুখের উপরে।

হর্ণ বাজিয়ে মোটর এসে খিড়কিতে থামে। সওয়ার বেরিয়ে আসে হাল-ফেশানের সৌখীন বাবু, রিষ্টওয়াচ হাতে; নতুন খোলা থিয়েটারের ম্যানেজার। খোলা জানলায় পড়ল তার নজর, তীক্ষ্ণ শিষের সিগ্ন্যাল পৌঁছল উর্দ্ধে। সিঁড়ি বেয়ে কে উঠে এল, দাঁড়াল তরুণীর পিছনে, বড়ো আয়নার উপরে ফুটে ওঠে ছুজনের ছবি, আর গলির ছাদে ঘেরা আকাশের তারাখচিত খণ্ড নীলাম্বরীর এক আঁজলা।

রিণি হেসে বেঁকে পড়ে, সিগারেট ধরায়। তেল শুকিয়ে দীপ ঝিমিয়ে পড়েছে, কেবল শিখার ছুটি ফোঁটা অন্ধকারে আয়নার উপর রোম্যান্সের ইঙ্গিত করে। দেয়ালের পিছন থেকে অসম্ভব কাশীর ফিট ছুজনকে চমকিয়ে তোলে। মেয়েটি দৌড়ে চলে যায় পাশের ঘরে, একখানা দশ টাকার নোট রুগীর হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, "ঝিকে দিয়ে দুধ আনিয়ে নিও। আমাকে এখনি যেতে হবে রিহার্সলে।" পরক্ষণে দমকা হাসির আওয়াজে সিঁড়ির শূন্যকে আলোড়িত করে দিয়ে দ্রুত নেমে যাওয়ার শব্দ শোনা যায়। দেয়াল ভেদ করে পিছনে ডাক দেয় রোগের কাৎরানি। অন্ধকারের ব্যর্থ অনুনয় ভাঙা চৌকাঠের উপর মাথা ঠুকে পড়ে। রোগীর হিম হাতের মুঠো ঢিলে হয়ে আসে, অজানিতে নোটখানা মাটীতে পড়ে গড়ায়, মেয়ে কেঁদে উঠে ডাকে "বাবা," জবাব পায় না।

হলিউডের নকলে থিয়েটরের আসর জমেছে। জুটেছে কুমারী, কিশোরী, তরুণী; নানা-রকম চেহারা, রঙীন আলোর ভোজবাজী; চাদরের আবরণের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মুখের পালিস ঝকঝক করে আলোর ঢেউয়ে। বিবিধ মনের নাট্যলীলায় হরেক রকম বহুরূপীর চেহারা নতুন নতুন

ছাঁদে তৈরী। মুখগুলো তরুণ কোমল বিহ্বল ব্যঞ্জনার বানানো মুখোষ। ঘরের হাওয়া গাঁজিয়ে উঠেছে রঙ্গভঙ্গের কচ্‌লানিতে। মুক্তির ভরসায় যে বেরিয়ে পড়েছিল, বেড়া ভাঙল, গহ্বরের মধ্যে সে পড়ল আটকা।

অসংলগ্ন ঢিলে মন রিণির, আত্মবিজ্ঞাপনী-নেশায় মত্ত, কালের কলের পুতুলের ছাঁচ সে, হাল-ফেশানের আঙুলের চাপের ছাপে তৈরী ; কোন্ যন্ত্রে চালাচ্ছে তাকে।

রাত অনেক হয়েছে। দূরে দূরে মিটমিট করছে রাস্তার বাতি। প্রাণের শেষ উত্তেজনার মতো কোনো আধেক বন্ধ জানলার প্রদীপ দপ দপ করতে করতে নিবে এল। থার্ড ক্লাস গাড়ীর খড়খড়ে আওয়াজে আকাশের বিরক্তি ধরে, নগরের বুক-আঁচড়ানো তার চলা।

উদ্‌ভ্রান্ত প্রাণের নিশাচরগুলো তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে অলিতে গলিতে। রাত জাগা চোখ তাদের লাল, চোখের কোটরে দাগ কেটেছে জীবনের লুকানো ইতিহাস, গালে টোল্ খেয়েছে, বিষবাষ্পের ভুসোকালি মলিন করে দিয়েছে তাদের মুখ। বাড়ির কাছে গাড়ী এসে থামে। লক্ষপতি স্টেজ-ম্যানেজার গেছে তার প্রাসাদে ফিরে। বল হরি হরিবোল—রব আসে গলির মোড় থেকে। জানিনে কোন ঘাটের পাশে কার চিতার আগুন তখন নিবু নিবু। পোষা কুকুরটি ছটফট করে বেরিয়ে আসে, আঁচল ধরে টানে, মরণের গন্ধ পেয়েছে সে ঘরের আকাশে। মাথার উপরে রাতের পাখী ডাক দিয়ে চলে যায়, নির্মম বিধাতার টিটকারির মতো।

উড়ো জাহাজ চলেছে শুকতারার শান্ত চোখের সামনে দিয়ে, সমুদ্রের পার থেকে সমুদ্রের পারে। ভোরের ফ্যাকাসে চাদরের তলায় ঢাকা পড়ল নাট্যভূমির যবনিকা, কালরথের নকীব মোরগ আস্তাবলের আবর্জ্জনার উপর থেকে জানিয়ে দিল জীবনযাত্রার নূতন পরিস্থিতি।



একদা বসন্তকালে

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

'কামারপুর সাহিত্য-বাসর' যদিচ এই সতর দিন মাত্র হইল জন্মলাভ করিয়াছে, কিন্তু এই কয়দিনের ভিতরই ইহার দপ-দপানীতে কামারপুরের অধিবাসীবৃন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ইহার আলো-বাতাস, বৃক্ষ-লতা, পুকুর-ডোবা, মাঠ-ঘাট-পথ সচকিত এবং সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

'সাহিত-বাসর' বসিবার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। সকাল হইতে সুরু করিয়া রাত এগারটা পর্য্যন্ত কেহ না কেহ 'বাসরে' হাজির থাকেই এবং একের অধিক সভ্য-সমাগম ঘটিলেই সাহিত্য সম্বন্ধে তুমুল ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। কেহ স্বরচিত কবিতার আবৃত্তিতে ঘর এবং পাড়া ফাটাইয়া দেয়; কেহ গিরিশ ঘোষ বা ডি. এল. রায়ের নাটকের কোন একটা অংশ-বিশেষের সাহিত্যিক অভিনয় করিয়া স্তব্ধ বাতাসকে চঞ্চল করিয়া তোলে; কেহ বা উচ্চকণ্ঠে কোন দৈনিক-পত্রের সম্পাদকীয় পড়িয়া যায় এবং তাহা লইয়া শ্রোতাদের মধ্যে স-কলরব এবং সচঞ্চল আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হয়।

'সাহিত্য-বাসরে'র এই ভীষণ আসর বসে, খোদ সেক্রেটারী শিবকালীরই বৈঠকখানায়। শিবকালী আর হরকালী দুই ভাই। হরকালী বড়, শিবকালী ছোট। হরকালীর বয়স ছত্রিশ, শিবুর ছাব্বিশ। হরকালী বিবাহিত, শিবু অবিবাহিত। মাস-খানেক হইল, হঠাৎ কলিকাতায় একটা চাকুরী পাইয়া হরকালীর বাড়ি ছাড়িয়া যাইবার পরই সুযোগ পাইয়া শিবু অত্যন্ত উৎসাহ এবং জাঁক-জমকের সহিত তাহাদের বৈঠকখানা-ঘরে এই 'সাহিত্য-বাসর' বসাইয়া ফেলিয়াছে।

সেদিন সন্ধ্যার পর খুব মৃদু এবং মোলায়েম ভাবে আলোচনা সুরু হইল, বঙ্কিম বড়, না শরৎচন্দ্র বড়? ক্রমবিকাশের নিয়মানুযায়ী এই মৃদু মধুর আলোচনা কিছু পরেই পেঁাছাইল তর্কে। আরও কিছু পরে এই তর্ক দাঁড়াইল হাতা-হাতিতে। সর্ব্বশেষে এই তর্ক-যুদ্ধ যখন প্রবল আকার ধারণ করিয়া ঘরের টেবিল, চেয়ার, তক্তাপোষ, আয়না, আলো, ছবি প্রভৃতি ভাঙ্গিবার উপক্রম হইল, ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে খোলা দরজায় কাহার ছায়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গেই অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে হরকালী ঘরের মধ্যে প্রবেশ কবিয়া বজ্রকঠোর স্বরে কনিষ্ঠের উদ্দেশে কহিল—"এখনি সব বন্ধ কর।"

সুতরাং তখনি সব বন্ধ করিতে হইল। হরকালীর ছিল সিংহ রাশি। তাহার আদেশের বিরুদ্ধে কাজ করা একটা শিবকালীতে সম্ভব নয়, দশটাতে সম্ভব কি না, সন্দেহের কথা। অতএব, শুধু সেদিনের জন্য বন্ধ নয়, 'সাহিত্য-বাসর' সেই সতর দিনের আঁতুড়-ঘরেই তাহার কচি দেহ রক্ষা করিল।

করিলেও, শিবুকে দিয়া গেল একটা মর্ম্মান্তিক লজ্জা এবং অপমানের তীব্র আঘাত। আঘাতে পীড়িত হইয়া শিবু তখনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, সে মরিবে, অর্থাৎ আত্মহত্যা করিবে। এবং সাধারণ ভাবে আত্মহত্যা নয়, সে অনশন দ্বারা আত্মহত্যা করিবে। সুতরাং সেই রাত্র হইতেই শিবু অনশন সুরু করিয়া দিল।

কলিকাতার চাকুরী সুবিধাজনক না হওয়াতে একটা মাস কাজ করিয়া হরকালী সেইদিন সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিল।

পরদিন সকালবেলা গিরিবালা স্বামীর নিকট আসিয়া জানাইল, "ঠাকুরপো অনশন আরম্ভ করেছে।"

"কারণ?"

"কারণ, কালকের ব্যাপার।"

"বেশ। করে যা'ক।"

কিন্তু 'করে যাওয়া'টা চলিল না। উনিশ ঘণ্টা পরে শিবুকে পান খাইয়া অনশন ভঙ্গ করিতে হইল।

শিবু সব পারে, কিন্তু পান না চিবাইয়া বেশিক্ষণ থাকা তাহার পক্ষে একটা অসম্ভব ব্যাপার। প্রাণ যায় ক্ষতি নাই, কিন্তু পান তাহার চাই-ই। উনিশ ঘণ্টা বিনা পানে থাকিয়া শিবু অন্তরে-বাহিরে ছটফট করিতে লাগিল। অবশেষে বেলা তিন প্রহরের সময় আর থাকিতে না পারিয়া গোটাকতক পান খাইয়া অনশন ভঙ্গ করিয়া ফেলিল। বলা বাহুল্য যে, পান যখন তাহাকে খাইতেই হইল, তখন পানাহারও আর তাহার বাকি রহিল না।

ইহার পর তিন চার মাস সাধারণ ভাবেই অতিবাহিত হইয়া গেল। একদিন শিবু নিজের মনে বলিল, 'সাহিত্য-বাসর উঠে গেল, কিন্তু সাহিত্য সাধনা ছাড়ি কেন? সে তো আমার অন্তরের জিনিষ, সেটা তো আর দাদার বৈঠকখানা নয়। সুতরাং যতদিন বাঁচব, সাহিত্য সাধনা ছাড়ব না।' এই মনে করিয়া, সে কাগজ কলম লইয়া একটি গল্প লিখিতে সুরু করিল। বহুক্ষণ ধরিয়া গল্পের প্লটকে মনের মধ্যে সাজাইয়া গোছাইয়া লিখিতে আরম্ভ করিল, 'একদা বসন্তকালে—

"ঠাকুরপো!"

জমাট ভাব, সব নষ্ট হইয়া গেল। একটু বিরক্ত হইয়া শিবু মুখ তুলিয়া কহিল, "কি বলছ, বউদি?"

"বলছি যে, তোমার পান খাওয়াটা একটু কমাতে পার?"

গল্পের কাগজখানা ভাঁজ করিয়া রাখিয়া, দেয়াত-কলমটা সরাইয়া, বউদির মুখের দিকে চাহিয়া শিবু কহিল, "কেন বউদি?"

"তোমার অত পান খাওয়ার জন্যে সংসারে বড্ড অযথা খরচ হচ্চে।"

একটুখানি ম্লান হাসির সহিত শিবু কহিল, "বড্ড না হলেও যৎসামান্য কিছু হয় বটে। কিন্তু কত লোকের কত রকম সখ থাকে, আমার তো আর কোন সখই নেই বউদি; সুতরাং দুটো পান যদি বেশিই খাই, তা'তে আর এমন কি—"

কথাটা সম্পূর্ণ না শুনিয়া গিরিবালা অপ্রসন্ন মনে মুখখানা ভার করিয়া চলিয়া গেল।

রাত্রে হরকালী শিবুকে কহিল, "দেখ, পানে বড্ড বেশি খরচ হ'চ্চে। রোজ ষাট-সত্তর করে পান খাওয়া—

"হ্যাঁ, বউদিও বলছিল বটে।"

"সুতরাং পানটা একটু তোমায় কমাতে হবে ; অর্থাৎ বড় জোর আট দশটা পর্য্যন্ত তুমি সারা দিন রাত খেতে পার।"

"তা হলে আমার অকাল-মৃত্যু ঘটবে, দাদা।"

"তা'র মানে ?"

"তা'র মানে, না খেয়ে ছ'মাস বাঁচতে পারব, আফিং খেয়ে আত্মহত্যা ক'রে মরতে পারব, মাটিতে শুয়ে রাত কাটাতে পারব, জলে ডুবে থাকতে পারব, বর্ষায় ভিজতে, শীতে জমতে, গরমে পচতে, সবই পারব দাদা, কিন্তু পান খাওয়া কমাতে পারব না।"

"দেখ, অত কথা শুনতে চাই না ; কাল থেকে দশ খিলি পানের বেশি তুমি পাবে না। পৈতৃক বিষয়ের তোমার যা অর্দ্ধেক ভাগ, তা থেকে তোমার পান, আর ভাত, দুটো হয় না ; বড় জোর একটা হতে পারে, হয় ভাত, নয় পান।"

দাদা কথা কয়টি বলিয়া চলিয়া গেলে, শিবু খানিকক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিল ; তারপর একটা সুদীর্ঘ শ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে নিজের মনে বলিল, 'পান ছাড়ব না, ঘরই ছাড়ব।'

পরদিন শিবুকে আর গৃহে কিম্বা গ্রামে দেখা গেল না। হরকালী শুনিল শিবু কলিকাতা যাত্রা করিয়াছে।

২

শিবু কলিকাতায় আসিয়াছে।

বেলেঘাটায় তাহাদের গ্রামের নন্দীদের বাঁশ খুঁটি প্রভৃতির একটা আড়ৎ ছিল। শিবু সেইখানে আসিয়া আশ্রয় লইল। দু'বেলা তাহাদেরই ওখানে খাওয়া-দাওয়া করে, আর অবসর সময়ে এখানে-ওখানে ঘুরিয়া কাজের সন্ধান করে। একদিন একটি ভদ্রলোক শালের খুঁটি কিনিতে আসিলে, শিবুর সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হইল। ভদ্রলোকটি কহিলেন, "আমার ছোট ছোট চারটি নাতি-নাতনী আছে। দু'বেলা তাদের একটু-আধটু পড়াবার জন্যে একজন মাস্টার দরকার। দশ টাকা করে আমি দোব। পারবেন আপনি ?"

শিবু লাফাইয়া উঠিল এবং তখনি তাঁহার সহিত কথা পাকা-পাকি করিয়া লইয়া তাঁহার সঙ্গে গিয়া তাঁহার বাড়ি চিনিয়া আসিল।

এত সত্বর যে শিবু এইরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে একটা কাজ পাইয়া যাইবে, ইহা সে আশা করে নাই। নন্দীদের এখানে খাওয়ার খরচ তাহার না লাগিলেও, বেশীদিন তো আর এইভাবে ইহাদের গলগ্রহ হইয়া থাকা যায় না। তারপর তার পানের খরচ। দৈনিক প্রায় দুইটি আনা তাহাতে লাগে। সে কলিকাতা আসিবার সময় গ্রামের একজনের নিকট হইতে দশটা টাকা ধার করিয়া লইয়া আসিয়াছিল। ট্রেণভাড়া বাদে যাহা বাকী ছিল তাহাতে বর্ত্তমানে তাহার পানের খরচ চলিতেছে। কিন্তু কলসীতে মধ্যে মধ্যে সময়মত জল না ভরিয়া, কেবলই তাহা হইতে ঢালিয়া পান করিলে সে জল আর কতদিন থাকে ? তাই তাহার হাতের পয়সা যতই কমিয়া আসিতেছিল,

তাহার ভাবনাও ততই জমিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু হঠাৎ এই দশ টাকার কাজটি পাওয়াতে তাহার সেই চিন্তা এখন প্রসন্নতায় রূপান্তরিত হইল। সে মনে মনে একটা হিসাবও প্রস্তুত করিয়া ফেলিল,—যথা, খোরাকির জন্য নন্দীদের পাঁচ টাকা, পানে টাকা চার এবং বাকী একটা টাকার এ-ও-তা খুচরা খরচ।

পরের দিন হইতেই শিবু, বিধুবাবুর নাতি-নাতিনীদের পড়াইতে সুরু করিয়া দিল। বিধুবাবু লোক খুবই সৎ। ভয়ানক ধর্ম্মভীরু। কাহাকেও তিনি মনে ব্যথা দিতে চান না। জীব-জন্তুর প্রতি তাঁহার অসাধারণ দয়া। যতই দিন যাইতে লাগিল, শিবু বিধুবাবুর গুণাবলীতে ততই মুগ্ধ হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে ছেলেদের পড়াশুনা হইয়া গেলে পর, বিধুবাবু শিবুর কাছে আসিয়া বসেন এবং উভয়ের মধ্যে নানাবিধ গল্প এবং ধর্ম্ম-কথার আলোচনা হয়।

এইভাবে এক একটি করিয়া দিন কাটে, আর শিবু মনে মনে তাহার প্রাপ্য বেতনের হিসাব করে—আজ ৭৲, আজ ৭।/৫, আজ ৭॥৵১০—, আজ—।

মাস কাবার হইলে শিবু একদিন ছেলেদের মধ্যে যেটি বড় তাহাকে বলিল, "আমার মাইনেটা চেয়ে আন দেখি।" সে তাহার উভয় হাতের মুঠা এবং মুখের সংযোগে অদ্ভুত ভাবে বংশীধ্বনি করিতে করিতে ভিতরে গেল এবং সেইরূপ ভাবে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "দাদামশাই বিছানায় শুয়ে গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছেন আর চোখ বুজে আছেন ; মাইনে এখন পাওয়া যাবে না।"

শিবু জিজ্ঞাসা করিল, "চোখ বুজে রয়েছেন ?"

"হ্যাঁ, ঐ রকম চোখ বুজে ধ্যান করেন।"

বহুক্ষণ হইতে একটি মশক শিবুর কর্ণমূলে দংশন করতঃ রক্তপান করিতেছিল। শিবু চটাস করিয়া একটি চড়ে তাহাকে মারিয়া ফেলিতেই, নন্দরাণী বলিয়া মেয়েটি চমকাইয়া উঠিয়া কহিল, "মাস্টারমশাই, কী করলে তুমি ?"

"কি করলুম ?"

"মশা মারলে!"—বলিয়াই সে বাটীর ভিতরে ছুটিল। অপর তিনজন মুখে কিছু না বলিলেও হাঁ করিয়া শিবুর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

মিনিট কয়েক পরেই বিধুবাবু শিবুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার পশ্চাতে নন্দরাণী। বিধুবাবু শিবুর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "কাল থেকে আর আপনার পড়াতে আসবার দরকার নেই। দিন ১০।১২ পরে আপনার মাইনেটা এসে নিয়ে যাবেন।"

ব্যাপারটা শিবু কিছুই বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল, "আজ্ঞে হঠাৎ এরকম—"

"হঠাৎ-টঠাৎ নয় ; আমার বাড়িতে জীবহত্যা! আপনি চটাস্ করে একটা মশা মেরেছেন ? যান—আপনি চলে যান এক্ষনি ; আর আপনি আসবেন না। উঃ! মশক মার! জীবহত্যা!"

অতিমাত্রায় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া শিবু কহিল, "আজ্ঞে সামান্য একটা মশা মেরেছি তাতে—"

মনে মনে ভীষণ কুপিত হইয়া বিধুবাবু কহিলেন, "সামান্য হউক, অসামান্য হউক, জীব তো বটে। সেদিন কাদের একটা বেড়াল ভাঁড়ার-ঘরে ঢুকে একটা আরশোলা মেরেছিল। তাকে

মুগুরের বাড়ি এমন মার মারলুম যে বাছাধনকে তক্ষুনি অক্কা পেতে হ'ল! জীবহত্যা-টীবহত্যা আমার বাড়িতে চলবে না, যান আপনি—।"

"আজ্ঞে, আর কখনও এমন কাজ হবে না। দেখুন, বর্দ্ধমান জেলায় বাড়ি—একেবারে খাস মশার ডিপো; নিত্যি মশা মেরে মেরে কেমন একটা অভ্যাস হ'য়ে গেছে তাই—তবুও অনেকক্ষণ ধরে তার দংশন-জ্বালা সহ্য করেছিলুম; শেষকালে যখন আর থাকতে পারলুম না, তখন—"

"তখন চটাস্ করে অমনি জীবহত্যা করে বসলেন? যান—যান; ওসব এখানে চলবে না।—" বলিয়া বিধুবাবু রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে অন্দরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। শিবু হাঁ করিয়া বসিয়া রহিল।

৩

নৌকা কূলে লাগিয়াও লাগিল না। অর্থাৎ শিবুর একটা উপায় হইয়াও ফসকাইয়া গেল। কিন্তু সে বিধুবাবুর নিকট হইতে তাহার মাহিনার পাই পয়সাটি পর্য্যন্ত পাইয়াছে। জীবহত্যাকারীকে তিনি হিসাব করিয়া ১২।/৭॥ চুকাইয়া দিয়াছেন।

যাহা হউক, আবার শিবু কাজের হন্য ঘোরা-ঘুরি করিতে সুরু করিল।

নারীর চরিত্র আর পুরুষের ভাগ্য—গভীর রহস্যাবৃত; এ উভয়ের কখন কি ঘটে, কিছুই বলা যায় না। শিবুর ভাগ্য সুপ্রসন্ন। কয়েক দিনের মধ্যেই তাহার আর একটি নূতন কাজের যোগাড় হইয়া গেল। ছেলে পড়ানো নয়—ছেলের বাবাকে পড়ানো! অর্থাৎ, নোয়াখালীর এক জমিদার, চোখের অসুখের চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছেন এবং এখন হইতে কলিকাতাতেই থাকিবেন। চোখের ডাক্তাররা তাঁহার লেখাপড়ার কাজ একেবারেই বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, এবং সেই কারণেই তাঁহার কাছে ও কাজে শিবুর আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। শিবু তাঁহাকে প্রত্যহ খবরের কাগজ পড়িয়া শুনাইবে, জমিদারীসংক্রান্ত চিঠিপত্র পড়িয়া শুনাইবে, সে-সবের জবাব লিখিবে, আবশ্যক হইলে মধ্যে মধ্যে বই-টইও পড়িয়া শুনাইতে হইবে। মোট কথা, লেখাপড়ার কাজে শিবুর চক্ষু এবং হস্তই হইবে জমিদারবাবুর উপচক্ষু এবং উপহস্ত।

সুতরাং শিবু মনে মনে খুবই খুসী হইল; ভাবিল, 'বার টাকা মাহিনা, খোরাক, আর থাকবার জন্যে নীচের তলায় সম্পূর্ণ পৃথক একখানা ঘর। এর চেয়ে সুবিধা আর কি হ'তে পারে। তবে পানটার কথা একবার ব'লে দেখলে হয়। ঐ সঙ্গে ওটাও যদি বেয়ারিং-পোস্টে হ'য়ে যেত, তা হ'লে সোনায় সোহাগা হ'ত। কিন্তু, যাক। বেশী বাড়াবাড়িতে হিতে বিপরীত ঘটতে পারে। অত পান খাওয়ার কথা শুনলে হয় তো শেষে—'

উপর হইতে বাবু ডাকিলেন, "শিববাবু!"

"আজ্ঞে, এই যে!"—শিবু দোতালায় ছুটিল।

বাবু কহিলেন, "সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে রোজ খানিক করে বেড়িয়ে আসবেন; তাতে শরীরটা ভাল থাকবে। তবে, খুব সাবধান! কোন 'পার্কে' যেন বেড়াবেন না। আজকাল অনেক টি. বি. রোগী 'পার্কে' এসে বেড়ায়। বুঝেছেন ত?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"টি. বি.-টা দিন দিন বড্ডই ছড়িয়ে পড়ছে! কি বলেন?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

"আপনার বংশাবলীর মধ্যে কারো কখনো ও-রোগটা—"

"আজ্ঞে, আমাদের কোন পুরুষেও ওসব নেই।"

"ভাল—ভাল!"

অতঃপর দিন পনর কাটিয়া যাইবার পর, শিবু ভাবিল, 'আমার অসমাপ্ত গল্পটা এইবার ফের লিখতে আরম্ভ করলে হয়। দুপুরবেলাটায় ত কোনই কাজ আমার নেই। সুতরাং সেটা আবার—'

পরদিনই শিবু দোকান হইতে আধদিস্তা কাগজ কিনিয়া আনিল এবং দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে তাহার সেই অসমাপ্ত গল্পটি লিখিতে বসিল। তাহার মনের মধ্যে গল্পটির সূত্র ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া হারাইয়া গিয়াছিল। বহুক্ষণ ধরিয়া ভাবিবার পর সে সেই হারানো সূত্র খুঁজিয়া বাহির করিল এবং তখনি তাহা তাহার কাগজের পাতার মধ্যে গাঁথিয়া রাখিতে সুরু করিল—'একদা বসন্তকালে—'

"কি হয় শিববাবু?"

মুখ তুলিয়া শিবু দেখিল, সমুখে দাঁড়াইয়া তাহার নোয়াখালীর জমিদারবাবু।

তাহার মনটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। মাস কতক আগে, এই গল্প লেখার সূত্রপাতেই, একদিন এমনি ভাবেই তাহার বউদিদি তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, যাহার ফলে তাহাকে দেশ ছাড়িতে হইয়াছে। আজও অবস্থা সেইরূপ। প্রভেদের মধ্যে—সেবার ভ্রাতৃবধূ, এবার প্রভু; সেবার নারী, এবার নর। তাহার ভাগ্যে বা আবার কি ঘটে! তবে আশার কথা এই যে, শক্তির আধার নারীর তুলনায় পুরুষ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র; নারীর পদতলেই পুরুষের স্থান। সুতরাং দেশ ছাড়ার চেয়ে বড়, এক্ষেত্রে তাহার আর কিছু হইতে পারে না।

প্রভু ডাকিলেন, "কি হয় শিববাবু?"

"আজ্ঞে, এই একটু লিখছিলুম। অনেকদিন আগে একটা—"

"আচ্ছা, আমাদের ঠাকুরের চেহারাটা আপনি লক্ষ্য করেছেন?"

"আজ্ঞে, খাবার সময় ত বিশেষ করেই লক্ষ্য করতে হয়।"

"ওটা দিন দিন ওরকম শুকিয়ে যাচ্ছে কেন বলুন দেখি? গায়ে যেন রক্ত নেই, চোখ দুটো কোটরে ঢুকেছে, মুখখানা ফ্যাকাসে, যেন—। ব্যাটাকে টি. বি.-তে ধরল না ত?"

"আজ্ঞে, তা নয়, তবে—"

"তাই-ই ঠিক। বিকেলের দিকে প্রায়ই দেখছি শুয়ে থাকে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, পেটের ব্যথা। আমার মনে হয়, পেট ব্যথা-ট্যথা ওসব কিছুই নয়। বোধ হয় একটু করে ওর জ্বরই হচ্ছে। না—না—ও ঠিকই টি. বি.।"

সেইদিনই রাত্রে খাইতে বসিয়া শিবু শুনিল, ঠাকুরকে জবাব দেওয়া হইয়াছে এবং একজন নূতন ঠাকুরকে আনা হইয়াছে।

ইহারই দিনকয়েক পরে, একদিন সকালবেলা শ্রীযুক্ত বাবুর কথামত নোয়াখালীতে এবং অন্যান্য স্থলে দুই চারিখানি চিঠি লিখিবার পর যখন শিবু উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন শ্রীযুত তাহার হাতে একটি মোড়ক দিয়া কহিলেন, "বেশ করে বিছানার চারিপাশে ছড়িয়ে দেবেন, ছারপোকা মরবে।"

শিবু মোড়কটি হাতে লইয়া কহিল, "ছারপোকা ধ'রে ধ'রে না মারলে ওষুধ-বিষুধে কিছু হয় না।"

"কিছু হয়। তবে, আপনার দুপুরবেলা ত কোন কাজ নেই, ধরে ধরে মারতে পারলেই অবশ্য ভাল হয়; পারবেন না?"

ঘর-পোড়া গরু যেমন ভয়ে ভয়ে সিঁদুরে মেঘের দিকে তাকাইয়া থাকে, সেইভাবে শিবু জমিদারবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আজ্ঞে, জীব-হত্যাটা আর কোরবো!"

"জীবহত্যা! সে কি! আপনার দেখছি শিবুবাবু, জীবের প্রতি অসীম দয়া! এদিকে জীব যে আপনাকে দিন দিন হত্যা করছে, তার কি? আরও গুরুতর একটা ব্যাপার আছে। মনে করুন, আমি টি. বি. রোগী। জীব মহাশয় আমার রক্তটি শুষে ফেললেন; তারপড় গুড়্-গুড়্ করে দেওয়াল বেয়ে আপনার ঘরে গিয়ে আপনাকেও আপ্যায়িত করলেন, তার থেকে কি হোতে পারে বুঝেছেন ত?"

"বুঝিছি; কিন্তু ছারপোকার কামড়ে ত ও সব কিছু হয় না। ডাক্তারেরা বলে যে শুধু কালাজ্বরই—"

"রেখে দিন ডাক্তারের কথা। ওদের থিওরী এ বেলা ও বেলা বদলাচ্ছে। আগেকার সব ভাল ভাল ডাক্তার বলতেন যে, চল্লিশের পর কারো টি. বি. হয় না। আর এখনকার দিগ্‌গজেরা বলেন যে, ওটা নাকি সর্ব বয়সেই হোতে পারে।"

কথাগুলি বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই নোয়াখালীর জমিদারবাবুর মুখের উপরে একটা বিমর্ষতার ভাব ফুটিয়া উঠিল। শিবু আর কিছু না বলিয়া, এক পা এক পা করিয়া নীচে তাহার ঘরে চলিয়া আসিল।

৪

নোয়াখালীর জমিদারবাবুর বাড়ীর চাকুরী শিবুর গিয়াছে। অপরাধ—জীবহত্যা নয়, থুতু ফেলা। হঠাৎ একদিন তাহার থুতু দেখিয়া জমিদারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "রক্তের ছিটা বেশ?"

শিবু কহিল, "রক্ত নয়, পান খেয়েছিলুম, তারই—"

জমিদারবাবু আর সেখানে দাঁড়াইলেন না, ভিতরে চলিয়া গেলেন এবং নূতন ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিলেন, "শিববাবুর ভাত তাহার ঘরে দিয়ে আসবে।"

ভাগ্যদোষে সেইদিনই বিকালের দিকে শিবুর সামান্য একটু জ্বর হইল। ফলে, পরদিন সকালেই তাহাকে বিদায় গ্রহণ করিয়া আবার নন্দীদের বাঁশ-খুঁটির গোলায় আসিয়া আশ্রয় লইতে হইল।

এবার শিবু প্রতিজ্ঞা করিল যে, সে আর বাঙালীর কাছে চাকুরী করিবে না। সুতরাং সে এবার মরিয়া হইয়া সাহেব পাড়ার আফিসগুলিতে ঘোরাঘুরি আরম্ভ করিল। তাহার মত সামান্য ইংরাজী-জানা লোকের পক্ষে সাহেবের আফিসে কাজ পাওয়া দায় হইলেও, শিবুর চাকুরী-ভাগ্য ছিল ভাল এবং সেই সৌভাগ্যের জোরে শীঘ্রই সে এক আফিসে পঁচিশ টাকা বেতনে একটা কাজ পাইয়া গেল।

এই কাজটি পাইয়া শিবুর উৎসাহের আর সীমা রহিল না। সে তাহার দৈনিক পানের খরচ আরও কিছু বাড়াইয়া দিল। তাহার সেই অসমাপ্ত গল্প 'একদা বসন্তকালে—' লিখিবার কথা এই সময় একবার তাহার মনে হইল, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল, ঐ অপয়া গল্পটাই যত নষ্টের মূল! সুতরাং তাহার মন হইতে এই আপদকে নোয়াখালীর জমিদারবাবুর মত সে সঙ্গে সঙ্গেই বিদায় দান করিল এবং প্রতিজ্ঞা করিল যে, যতদিন বাঁচিবে, আর কখনো গল্প লেখার নামও সে করিবে না।

অতঃপর বেশ আনন্দেই শিবুর দিন কাটিতে লাগিল। খায় দায়, অফিস যায়, সারাদিন পান চিবোয় আর অবসর সময়ে খোসগল্প করিয়া কাটায়। মধ্যে মধ্যে দেশের কথা, দাদার কথা, বউদির কথা তাহার মনে পড়ে। সে সময়ে তাহার চিরকালের গ্রাম,—তাহার জন্মভূমির জন্য মনটা তাহার একটু চঞ্চল হইয়া পড়ে, কিন্তু সহরের অবিশ্রান্ত কলরব ও হট্টগোলের মধ্যে শীঘ্রই সে চঞ্চলতা মিলাইয়া যায়। তবে শিবু মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছে যে, মাহিনা পাইলে সে এইবার কোন এক শনিবারে দেশে যাইবে। সমস্ত মাহিনাটা দাদার পায়ের তলায় ধরিয়া দিয়া সে একটা প্রণাম করিবে, আর যাইবার সময় কলিকাতা হইতে দুইশো পানের খিলি অর্ডার দিয়া সঙ্গে লইয়া যাইবে, দাদা ও বউদিকে দেখাইয়া দেখাইয়া রবিবার সারাদিন ধরিয়া তাহা চিবাইয়া, সোমবার ভোরের ট্রেণে আবার সে ফিরিয়া আসিবে।

সকল আফিসেই মাহিনার দিনে বাবুদের মধ্যে বেশ একটু উৎসাহ আনন্দ দেখিতে পাওয়া যায়। মাহিনার দিন শিবুও তাহার আফিসে আসিয়া দেখিল, সকলের মধ্যে খুব একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কোথাও দুই চারিজন বায়েস্কোপের গল্পে মশগুল, কোথাও বা ফুটবল ম্যাচের গল্প, কোথাও রেঞ্জার্সের লটারীর টিকিট লইয়া হট্টগোল। শিবু যে ডিপার্টমেণ্টে কাজ করে, সেখানে কে একখানি 'চির-বসন্ত' মাসিক পত্র লইয়া আসিয়াছে এবং তাহারই কি একটা গল্প লইয়া সকলের মধ্যে খুব আলোচনা চলিতেছিল।

একজন বলিল, "গল্পের মত গল্প বটে!"

আর একজন বলিল, "গল্প তো অনেকেই লেখে, কিন্তু এরকম গল্প—"

মধ্যপথে বাধা দিয়া আর একজন বলিয়া উঠিল, "আরে তা না হ'লে দেশ জুড়ে ওঁর এমনধারা নাম জাহির হ'য়ে পড়ে!"

শিবু একবার কাগজখানা লইয়া গল্পের লেখকের নামটা পড়িয়া লইল,—পাঁচকড়ি চক্রবর্ত্তী! মনে মনে বলিল, হায় রে পাঁচকড়ি! আজ যদি সে তাহার গল্প লেখা চালাইয়া আসিতে পারিত, তা হলে দশ বিশ হাজার কড়িও তাহার কাছে ঘেঁষিতে পারিত না। শিবু তখনি মনে মনে স্থির

করিয়া ফেলিল, সে আর লেখে বা না লেখে, তার সেই অসমাপ্ত গল্পটাকে সে লিখিয়া শেষ করিবে এবং ইহাদের একবার শুনাইয়া দিবে।

সুতরাং বাসায় আসিয়াই সে কাগজপত্র গুছাইয়া লইল এবং তাহার সেই, 'একদা বসন্তকালে—' লিখিতে বসিয়া দেখিল, তাহার কৌটার পান সব ফুরাইয়া গিয়াছে। তখন গল্প লেখা পরদিনের জন্য রাখিয়া দিয়া সে বাজার হইতে পান কিনিয়া আনিবার উদ্দেশে বাহির হইল।

পরদিন সকালে গোলার নন্দী মশাইয়ের সঙ্গে শিবু এমন এক গল্প জুড়িয়া দিল যে, তাহার 'একদা বসন্তকালে—'-তে আর হাত দিবারই অবকাশ পাইল না। আফিস যাইবার সময় হইয়া পড়িলে, তাড়াতাড়ি স্নানাহার সারিয়া আফিসে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু তাহা হইলেও 'একদা বসন্তকালে—' তাহার মগজের মধ্যে ক্রমাগতই ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল।

আফিসে পদার্পণ করিয়াই, শিবু শুনিল, সাহেব তাহাকে ডাকিয়াছে। শুনিবামাত্র 'একদা বসন্তকালে—' তাহার মাথা হইতে খসিয়া পড়িল; এবং সমস্ত মাথাটা তাহার ঘোলাইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বুকটাও একটু কাঁপিয়া উঠিল, সাহেব ডাকিয়াছে! কেন? সাহেব তো তাহাকে ডাকে না; ডাকিবার কথা নয়। সাহেব যে বড় রাগী মেজাজের! কি করিয়া তার সামনে সামনে গিয়া দাঁড়াইবে! কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিলে কি-ই বা তার জবাব দিবে!

বড়বাবু তাড়া দিলেন, "যান না শিববাবু!"

"আজ্ঞে, যাই। যাই।"

"মুখের পানটা ফেলে দিয়ে যান।"

কথাটায় শিবু কর্ণপাত করিল না; কারণ মুখের পান ফেলিয়া দিতে সে রাজী নয়। তাহা কষের মধ্যে ঠেলিয়া রাখিয়া সে সাহেবের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। সাহেব মুখ তুলিয়া শিবুর দিকে চাহিল; কহিল, "Do you know the Electric Corporation Head Office?"

শিবু ভিতরে-ভিতরে কাঁপিতেছিল। 'Yes, sir' বলিতে গিয়া হঠাৎ সে ভয়ানক এক বিষম খাইল এবং তাহার ফলে, তাহার মুখের সমস্ত পান ছিটকাইয়া গিয়া পড়িল সাহেবের মুখে, চোখে, জামায়, কলারে, নেকটাইয়ে এবং টেবিলের কাগজপত্রে। সঙ্গে সঙ্গেই সাহেবের মুখের একটা ভীষণ গর্জ্জন শিবুর কানে গেল মাত্র, কিন্তু সে নিজেই বুঝিতে পারিল না যে, সে সজীব, কি নির্জীব।

ইহার কিছু পরেই শিবুকে কেন্দ্র করিয়া আফিসের বাবুদের মধ্যে একটা ঘোর আন্দোলন আলোচনা সুরু হইল। বড়বাবু কহিলেন, "আমি বার বার বললুম যে, মুখের পানটা ফেলে দিয়ে যান; এখন হল তো?"

হরিশবাবু বলিলেন, "সাহেবের হুকুম, কাল থেকে আফিসের মধ্যে আর একটি পানও খেতে পাবেন না; পারবেন তো শিববাবু?"

নন্দ বলিল, "পানের বদলে বিড়ি ধরুন, বিড়ি ধরুন, এক পয়সায় আটটা।"

জ্ঞানবাবু কহিলেন, "সাহেবের কড়া হুকুমের কোন্‌টা তামিল করবেন? পান ছাড়বেন, না চাকরী ছাড়বেন? একটাকে ছাড়তেই হবে।"

শিবু কাহারো কোন কথার জবাব না দিয়া গুম্‌ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর পাঁচটা

বাজিলেই সে বাসায় চলিয়া আসিল। মনের মধ্যে নানারূপ তর্ক-বিতর্ক ও চিন্তায় সেরাত্রে তাহার আর ঘুম আসিল না। সারা রাতের অনিদ্রার পর ভোরের বেলা সে সকল চিন্তার শেষ করিয়া ফেলিল। মনে মনে স্থির করিল, সে পান ছাড়িবে না, চাকুরিই ছাড়িবে এবং দেশে ফিরিয়া যাইবে। দেশে গিয়া সে তাহার নিজ অংশের ধান-জমিগুলাতে সারি সারি পানের বরজ বসাইবে। আর তারই ধারে ধারে পাঁচ হাজার সুপারী গাছ লাগাইবে। অত্যন্ত রোকের মাথায়, মরিয়া হইয়া, এ প্রতিজ্ঞাও সে করিয়া বসিল যে, তাহার ঘোর অপয়া সেই 'একদা বসন্তকালে—' গল্পটি, যাহার সংস্পর্শে আসিবামাত্রই বার বার তাহার কোন না কোন বিপদ ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, দেশে গিয়াই সে সর্ব্বাগ্রে ঐ গল্পটি লিখিতে সুরু করিবে। তাহাতে ভাগ্যে তাহার যাহাই ঘটে, ঘটুক।

সুতরাং সেইদিনই দেশে যাইবার জন্য সে তাড়াতাড়ি সব গোছগাছ করিয়া ফেলিল। তারপর স্নানাহার শেষ করিয়া, আফিসের সাহেবের নামে একখানা পোস্টকার্ড লিখিয়া ডাকে ফেলিয়া দিল; তাহাতে লিখিল—'পান ছাড়িতে পারিব না। পানের জন্য দাদা ছাড়িয়াছি, বউদি ছাড়িয়াছি, দেশ ছাড়িয়াছি; চাকুরীও ছাড়িলাম।'

সেইদিনই সন্ধ্যার কিছু পরে শিবু কামারপুরের বাটীতে গিয়া পৌঁছাইল এবং পৌঁছিয়াই যখন হরকালীর পায়ে ঢিপ্‌ করিয়া একটা প্রণাম করিল, তখন হরকালী অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। গিরিবালা জিজ্ঞাসা করিল, "বস্তাটায় কি ঠাকুরপো?"

তাহার পায়েও একটা প্রণাম করিয়া শিবু কহিল, "ওতে পাঁচ হাজার পান, পাঁচ সের সুপুরী আর পাঁচ পোয়া খয়ের আছে।"

তারপর মুখ হাত ধুইয়া কিছু জলযোগান্তে শিবু তাহার গল্পের কাগজ লইয়া তাহার সেই অপয়া গল্পটাই লিখিতে সুরু করিল—

একদা বসন্তকালে—



আলীবৰ্দ্দী খাঁ ও বাঙ্গালার শাসন-বন্দোবস্ত

স্বর্গীয় নিখিলনাথ রায়

সরফরাজের দুর্ব্বল হস্ত হইতে স্খলিত বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়া নবাব আলিবৰ্দ্দী খাঁ স্বীয় অলৌকিক প্রতিভাবলে বঙ্গরাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারই রাজত্বকালে মুর্শিদাবাদের গৌরব উচ্চতম শিখরে অধিরূঢ় হয়। যদিও তিনি নির্ব্বিবাদে রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই, মহারাষ্ট্রীয়গণের রণহুঙ্কারে ও আফগানগণের অসিঝনৎকারে সর্ব্বদাই তাঁহাকে চকিত ও সন্ত্রস্ত হইতে হইয়াছিল, তথাপি ঐ সমস্ত বিপ্লবের মধ্যে তিনি যেরূপ রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিয়াছিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত জগতে বিরল। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আলিবৰ্দ্দী খাঁ সরফরাজের যাবতীয় সম্পত্তি হস্তগত করিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁ হইতে সরফরাজের সময় পর্য্যন্ত মুর্শিদাবাদ রাজকোষে অনেক কোটি টাকা সঞ্চিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, নবাব আলিবৰ্দ্দী খাঁ সেই সমস্তেরই একমাত্র উত্তরাধিকারী হইয়া উঠিলেন। তিনি সরফরাজের উকীল যুগলকিশোরকে বাধ্য করিয়া বাদসাহদরবার হইতে তিন সুবার সনন্দ আনাইয়া লইয়াছিলেন। তাহারই বলে তিনি মুর্শিদাবাদের নিজামতআসনে সুদৃঢ় হইয়া বসেন। বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার সুবেদারী লাভের জন্য তাঁহাকে বাদসাহদরবারে কোটি মুদ্রা প্রেরণ করিতে হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন উজীর ইসাক খাঁ ও অন্যান্য কর্ম্মচারীবর্গকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য অনেক বহুমূল্য সামগ্রী প্রেরিত হয়। সেই সময়ে আলিবৰ্দ্দী খাঁ সুজা উল-মুল্ক ও হেসামউদ্দোলা উপাধি লাভ করিয়া সহস্র অশ্বারোহীর অধীশ্বর ও মাহীচিহ্নে * ভূষিত হন। তাঁহার পরিবারস্থ যাবতীয় ব্যক্তি বাদশাহদরবার হইতে সম্মান ও উপাধি লাভ করেন। নবাবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদ রেজা নওয়াজিস্ মহম্মদ মাহীচিহ্নে ভূষিত হইয়া সামতজঙ্গ দ্বিতীয় সৈয়দ আহম্মদ সৌলদজঙ্গ ও কনিষ্ঠ জৈনউদ্দীন আহম্মদ হায়বতজঙ্গ উপাধি লাভ করেন। † নওয়াজিস মহম্মদের সহিত আলিবৰ্দ্দীর জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘষিটা বা মেহেরউন্নিসার, সৈয়দ আহম্মদের সহিত তাঁহার মধ্যমা কন্যা মায়মানার ও জৈনউদ্দীনের সহিত কনিষ্ঠা কন্যা আমিনার বিবাহ হইয়াছিল। জৈনউদ্দীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মির্জা মহম্মদ সিরাজউদ্দোলা সাকুলী খাঁ বাহাদুর এবং তৎকনিষ্ঠ এক্রামউদ্দোলা বাদশা কুলী খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন।

এইরূপে সম্মানিত হইয়া নবাব আলিবৰ্দ্দী খাঁ রাজ্যশাসনে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি প্রথমতঃ স্ববংশীয়দিগকে প্রধান প্রধান পদ প্রদান করিয়া অন্যান্য উপযুক্ত কার্য্যদক্ষ ব্যক্তিকেও শাসনকার্য্যে নিযুক্ত করেন। নওয়াজিস মহম্মদ খাঁ ঢাকার শাসনকর্ত্তা ও বাঙ্গলার দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময় হইতে শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম প্রদেশদ্বয় ঢাকাবিভাগের অন্তর্নিবিষ্ট হয়। সৈয়দ আহম্মদকে রঙ্গপুরের ফৌজদারী হইতে উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করা স্থির হয়। কিন্তু সে

---

* মৎস্যচিহ্নকে "মাহী" কহিয়া থাকে, ইহা একটি সম্মানের চিহ্ন।

† রিয়াজুস সালাতীনে নওয়াজিস মহম্মদ খাঁ ও জৈনউদ্দীন আহাম্মদ খাঁ উপাধিও এই সময়ে প্রদত্ত হয় বলিয়া লিখিত আছে, কিন্তু মুতাক্ষরীণে তাহা নাই।

সময়ে উড়িষ্যা সরফরাজের ভগিনীপতি মুর্শিদকুলী খাঁর অধীন ছিল। তাঁহাকে উড়িষ্যা হইতে বিতাড়িত করিয়া পরে সৈয়দ আহম্মদকে উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। জৈমুদ্দীন আহম্মদ পূর্ব্ব হইতে পাটনার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত ছিলেন। তিনি এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে উক্ত প্রদেশের ভার প্রাপ্ত হইলেন। সিরাজউদ্দৌলা ঢাকার নৌবিভাগের অধিপতির পদ লাভ করেন। নবাবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজী আহম্মদের জামাতা আতাউল্লা খাঁ ভাগলপুরের ফৌজদার নিযুক্ত হন, তিনি পূর্ব্বে রাজমহলের ফৌজদার ছিলেন। এতদ্ভিন্ন হোসেন কুলী খাঁ ঢাকার সহকারী শাসনকর্ত্তার পদে এবং নবাবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আতাইয়ার খাঁ, ফকীরউল্লা খাঁ, নূরউল্লাবেগ খাঁ, নবাবের বৈমাত্রেয় ভগিনীপতি মীরজাফর খাঁ ও মুস্তাফা খাঁ প্রভৃতি সসম্মানে প্রধান প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন। রায়রায়ান আলমচাঁদের সহকারী চায়েন রায় রায়রায়ান উপাধি প্রাপ্ত হইয়া নবাবের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হন। চায়েন রায় পূর্ব্বে জাফর খাঁর জায়গীরের মোহরের ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিশ্বাসী ধর্ম্মপরায়ণ ও শান্তপ্রকৃতির বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। আলিবর্দ্দীর পূর্ব্ব দেওয়ান জানকীরাম সৈনিক বিভাগের দেওয়ানী লাভ করেন। তদ্ব্যতীত নসরৎ আলি খাঁ বক্‌সীর পদে এবং ফকির উল্লাবেগ খাঁ সহকারী বক্‌সীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে মোরাদ খাঁ নামক বাদসাহের জনৈক কর্ম্মচারী বাঙ্গলার রাজস্ব ও সরফরাজের ত্যক্ত সম্পত্তি গ্রহণের জন্য বাদসাহ-দরবার হইতে প্রেরিত হন। তাঁহার বাঙ্গলা অভিমুখে যাত্রা-সংবাদ পাইয়া নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ মোরাদ খাঁকে কিছুদিন পাটনায় অবস্থান করিবার জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন। নবাব রাজমহলে উপস্থিত হইয়া সকরীগলিতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করার প্রস্তাব করেন ও তথায় সরফরাজ খাঁর সম্পত্তি ও বাঙ্গলার রাজস্ব প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। মোরাদ খাঁ তাঁহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলে আলিবর্দ্দী রাজমহলাভিমুখে যাত্রা করিয়া তথায় মোরাদ খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে সরফরাজ খাঁর সম্পত্তি বলিয়া নগদ কয়েক লক্ষ মুদ্রা, ৭০ লক্ষ মুদ্রা মূল্যের জহরৎ, বহু সংখ্যক স্বর্ণরৌপ্যের পাত্র, বহুমূল্যের কারুকার্য্যসমন্বিত সামগ্রী, অনেকগুলি হস্তী ও অশ্ব প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট হইতে একখানি প্রাপ্তিপত্র লিখিয়া লইলেন। তদ্ব্যতীত তাঁহাকেও যথোচিত উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন। মোরাদ খাঁ সন্তুষ্ট হইয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। *

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগত হইয়া রাজ্যমধ্যে একেশ্বর হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একমাত্র সরফরাজের ভগিনীপতি মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁহার অন্তরায় হওয়ায় আলিবর্দ্দী তাঁহাকে দমন করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হন। মুর্শিদকুলী উড়িষ্যা প্রদেশের সহকারী শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আলিবর্দ্দী তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া উড়িষ্যা অধিকার করিতে ইচ্ছা করেন। নবাবের অপরিমিত সৈন্যের কথা শুনিয়া মুর্শিদকুলী সুরাটবাসী আগা মহম্মদ তকী খাঁর দ্বারা তাঁহার

* রিয়াজুস সালাতীনে লিখিত আছে যে, আলিবর্দ্দী খাঁ সরফরাজের সম্পত্তি হইতে বাদসাহ-দরবারে ৪০ লক্ষ টাকা ও পেস্কস স্বরূপ ১৪ লক্ষ এবং ৩ লক্ষ কোমরুদ্দীন উজীরকে, ১ লক্ষ আসফজা নিজাম-উল-মুল্‌ককে এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগকেও যথোচিত অর্থদান করিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠান। যৎকালে উভয়পক্ষের সন্ধির কথা চলিতেছিল, সেই সময় মুর্শিদকুলী খাঁর স্ত্রী দুর্দ্দানা বেগম ও তাঁহার জামাতা মির্জা বাখর খাঁ তাঁহাকে সন্ধি করিতে বারংবার নিষেধ করেন। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর শৈথিল্য দর্শনে তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি তাঁহার প্রতি কোন রূপ অত্যাচার করিতে ইচ্ছা করেন না। তবে যতদিন মুর্শিদ কটকে অবস্থিতি করিবেন তত-দিনপর্য্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে নানারূপ গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে। সেই জন্য তিনি যত শীঘ্র পারেন, উড়িষ্যা পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুস্থানে অথবা দাক্ষিণাত্যে গমন করিলে ভাল হয়। * মুর্শিদকুলী খাঁ উক্ত পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া বিজয়ী আলিবর্দ্দীর সহিত বিবাদ করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। তিনি জানিতেন যে, আলিবর্দ্দীর প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তাঁহার সেই বিপুল সৈন্য-সাগরের নিকট মুর্শিদকুলী আপনাকে তৃণের ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগেলেন। দুর্দ্দানা বেগম উড়িষ্যাবাসীগণের নিকট হইতে যথেষ্ট সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় গৌরবের বলেও আপনাকে অপরিসীম ধনশালিনী মনে করিয়া স্বীয় জামাতা মির্জাবাখরকে আলিবর্দ্দীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পরামর্শ দিলেন। মুর্শিদকুলী অগত্যা তাঁহাদের পরামর্শে চালিত হইয়া আলিবর্দ্দীর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। তখন উভয় পক্ষের যুদ্ধ ভিন্ন আর উপায় রহিল না। আলিবর্দ্দী হাজি আহম্মদ ও নওয়াজিস মহম্মদের উপর নগর রক্ষার ভার দিয়া বহুসংখ্যক সৈন্য সহ মুর্শিদাবাদ হইতে উড়িষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। †

আলিবর্দ্দীর উড়িষ্যাভিমুখে যাত্রার কথা শুনিয়া মুর্শিদকুলী আপনার কর্ম্মচারিগণকে দরবার-গৃহে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহাদের সহিত আলিবর্দ্দীর ব্যবহারের বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিরূপে আলিবর্দ্দী অন্যায়রূপে সরফরাজকে নিহত করিয়া মুর্শিদাবাদের সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন এবং এক্ষণেই বা কিরূপে তাঁহাকে উড়িষ্যা হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন, সমস্ত বিবৃত করিয়া আপনার কটিদেশ হইতে তরবারি ভূমিতলে স্থাপন করিয়া সকলকে তাঁহার সাহায্যের জন্য অনুরোধ করিলেন। তাঁহার জনৈক সৈনিক কর্ম্মচারী আবেদআলি খাঁ সমস্ত সমিতির প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁহাকে অভয় প্রদান করিয়া কটিদেশে পুনর্ব্বার তরবারি সংলগ্ন করিয়া দিলেন এবং আলিবর্দ্দীর কার্য্যের প্রতিশোধের জন্য প্রস্তুত হইতে অঙ্গীকার করিলেন। সকলেই তাহাতে সম্মত হইলে মুর্শিদকুলী খাঁ স্বীয় জামাতা বাখরআলির সহিত কটক পরিত্যাগ করিয়া বালেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। ‡ তিনি বুড়াবালাং নদী পার হইয়া চতুর্দ্দিকে নদীবেষ্টিত বন

---

* রিয়াজুস সালাতীনে লিখিত আছে যে, মুর্শিদকুলী খাঁ সন্ধির জন্য হাজী আহম্মদের জামাতা মোখলেস আলি খাঁকে মুর্শিদাবাদে পাঠান। মোখলেস আলি খাঁ মুর্শিদাবাদে আসিলে হাজী ও আলিবর্দ্দী চতুরতা পূর্ব্বক একখানি পত্র লিখিয়া মুর্শিদকে নিশ্চিন্ত করেন। কিন্তু মুর্শিদের সৈন্যগণকে হস্তগত করিবার জন্য পুনর্ব্বার মোখলেস খাঁকে পাঠাইয়া দেন। মোখলেস মুর্শিদের সহিত মৌখিক প্রণয় করিয়া তাঁহার সৈন্যদিগকে প্রলোভনের দ্বারা বশীভূত করিতে চেষ্টা করেন। এদিকে আলিবর্দ্দীও ধীরে ধীরে উড়িষ্যাভিমুখে অগ্রসর হন।

† রিয়াজে লিখিত আছে যে, তিনি লক্ষাধিক পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য সহ উড়িষ্যা যাত্রা করিয়াছিলেন। ষ্টুয়ার্ট বলেন, তিনি ১২ হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য লইয়া অগ্রসর হন।

‡ সালাতীনে লিখিত আছে যে, তাঁহার অপর জামাতা আলাউদ্দীন মহম্মদ খাঁও তাঁহার সহিত যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন। যুদ্ধযাত্রাকালে তিনি দুর্দ্দানা বেগম ও পুত্র ইয়াইয়া খাঁকে রায়াবতীর দুর্গে রাখিয়া যান।

ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ একটি উচ্চ ভূমিতে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন। * শিবিরের চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন, বুরুজ নির্ম্মাণ করা হইল। তিনশত বন্দুক ও কামান দ্বারা উক্ত বুরুজ সজ্জিত করিয়া তাঁহারা বিপক্ষপক্ষের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মুর্শিদের শিবির এরূপ সুরক্ষিত ভাবে অবস্থিত হইয়াছিল যে, তাঁহাকে পরাজিত করা অত্যন্ত দুর্ঘট হইয়া উঠে। এদিকে আলিবর্দ্দী খাঁ মেদিনীপুর হইতে জলেশ্বরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া শত্রুপক্ষের সুরক্ষিত শিবির দেখিয়া তাহাকে আক্রমণ করা ক্লেশকর বিবেচনা করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ তাঁহাকে অত্যন্ত বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। বাঙ্গলার সীমান্তপ্রদেশস্থ জমীদারগণ তাঁহার শিবিরে খাদ্যদ্রব্যাদি প্রেরণে অবহেলা করিতেছিলেন, এবং যাহা কিছু প্রেরিত হইয়াছিল, তৎসমস্তই তাঁহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ উড়িষ্যার জমিদারগণ কর্ত্তৃক পথিমধ্যে লুণ্ঠিত হইয়া যায়। নারায়ণগড়ের শাসনকর্ত্তা কিঞ্চিৎ দ্রব্যাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাও পথিমধ্যে অপহৃত হইয়াছিল। এইরূপ খাদ্যদ্রব্যাদির অভাবে আলিবর্দ্দী বিশেষ কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। আলিবর্দ্দী মেদিনীপুর হইতে প্রথমে জলেশ্বরে উপস্থিত হন। সুবর্ণরেখা নদীর রাজঘাট নামক স্থানে ময়ূরভঞ্জের রাজা রঘুনাথ † আপনার চাওয়ার ও খণ্ডাইত সৈন্য লইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। সে স্থান অত্যন্ত জঙ্গলময় হওয়ায় দুর্গম হইয়া উঠে। আলিবর্দ্দী রাজা রঘুনাথকে তাঁহার সাহায্যের জন্য আহ্বান করিয়া পাঠান। রঘুনাথের অধীনে অনেক সৈন্য ছিল, তিনি নবাবের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে অসম্মত হন। আলিবর্দ্দী তাঁহার সৈন্যের সম্মুখে কামান স্থাপন করিয়া গোলাবর্ষণে তাহাদিগকে উত্যক্ত করিয়া তুলেন। রাজসৈন্যগণ অবশেষে বনমধ্যে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। নবাব রাজঘাট উত্তীর্ণ হইয়া মুর্শিদকুলীর শিবিরের নিকট রামচন্দ্রপুর নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁ শত্রুপক্ষের এইরূপ বাধাপ্রাপ্তি আরও কিছুদিন দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এই সময়ে বর্ষা উপস্থিত হওয়ায় উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধিরও এক প্রস্তাব হয়। কিন্তু তাহাতে কালক্ষয় হইতেছে বিবেচনা করিয়া মুর্শিদের জামাতা মির্জাবাখর যৌবনসুলভ চাপল্য প্রযুক্ত মুর্শিদকুলী খাঁর নিষেধ সত্ত্বেও শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিবার জন্য সেই সুরক্ষিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া বিপক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার দুঃসাহসের জন্য বন্দুক ও কামান সজ্জিত শিবির-প্রাচীরের কতক ভগ্ন হওয়ায় আলিবর্দ্দী খাঁ ঐ সমস্ত বন্দুকাদি অধিকার করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। পরে উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। মুর্শিদকুলী খাঁ ধীর ভাবে যুদ্ধ করিতেছিলেন, সহসা এক বিপদ উপস্থিত হইল। তাঁহার অভয়দাতা সেনাপতি আবেদ খাঁ স্বদেশবাসী মুস্তাফা খাঁর সহিত যোগদান করে। আবেদ খাঁ অত্যন্ত তৎপরতার সহিত যুদ্ধের ভান করিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে চালিত করিল। সে মুস্তাফা খাঁর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া স্থির ভাবে সমস্ত

* সালাতীনে লিখিত আছে যে, মুর্শিদকুলী খাঁ তিলিয়া গড্ডির পাহাড়ের ফুলওয়ার নামক ঘাট হইতে জুন নদী পর্য্যন্ত সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিলেন।

† রিয়াজে জসরধর আছে আবার তারিখ বাঙ্গলার চক্রধর দেখা যায়। কিন্তু ময়ূরভঞ্জের রাজবংশের তালিকায় চক্রধরকে ১৭৫০-৬১ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিতে দেখা যায়, তৎপূর্ব্বে রঘুনাথ বিদ্যমান ছিলেন। রঘুনাথ ১৭২৮ হইতে ১৭৫০ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সুতরাং এই সময়েই রঘুনাথ ময়ূরভঞ্জাধিপ ছিলেন।

সৈন্য সহ কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিল।* মুর্শিদকুলী খাঁ আবেদ খাঁর ব্যবহারে বিচলিত না হইয়া আবদুল আজিজের অধীন বাঢ়-বাসী † কতিপয় সাহসী সৈয়দের সাহায্যে নবাবের সৈন্যকে এরূপভাবে আক্রমণ করিলেন যে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। আলিবর্দ্দী খাঁ অত্যন্ত ভীত ও ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার বিজয়-গৌরবের লোপ হইবার উপক্রম হইল। বর্দ্ধমানের রাজ্যের পেস্কার মাণিকচাঁদ সসৈন্যে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধে কোন্ পক্ষ জয়লাভ করিবে স্থির করিতে না পারিয়া গোপনে মুর্শিদকুলী খাঁর সহিতও আনুগত্য করিয়াছিলেন। তিনি মির্জা বাখর খাঁর সৈন্যের সম্মুখীন হইয়া মুর্শিদকুলী খাঁর পতাকা উত্তোলন করেন। বাখর তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া উহাকে মাণিকচাঁদের চতুরতা মনে করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এইরূপে উভয় পক্ষের যুদ্ধ চলিতে থাকে। মির্জাবাখর দক্ষিণ দিক পরিত্যাগ করিয়া বামপার্শ্বে নবাব-সৈন্য আক্রমণ করিলে আলিবর্দ্দীর সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হইতে লাগিল। মীরজাফর খাঁ সৈন্যগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া আপনার অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া একদল সাহসী সৈন্যের সহিত মুস্তাফা খাঁ, দীলার খাঁ ও আনালত খাঁর সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিয়া মহাসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। এই অপরিসীম সাহস প্রদর্শনের জন্য তাঁহার গৌরব চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই ভীষণ যুদ্ধে মুর্শিদকুলী খাঁর পক্ষে মীর মহম্মদআলি ও মীর আকবরআলি নামক সৈয়দ বীরদ্বয় প্রাণত্যাগ করে, এবং মির্জাবাখরও অত্যন্ত আহত হইয়াছিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁ আপনার প্রতি বিজয়লক্ষ্মীকে বিমুখ দেখিয়া মির্জাবাখরকে শিবিকারোহণে অপসারিত করিলেন এবং নিজেও যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি বালেশ্বর বন্দরে উপস্থিত হইলে, তথায় তিন সহস্র লোক তাঁহার অনুবর্ত্তী হয়। মুর্শিদ বালেশ্বরে শিবির সন্নিবেশ করিবার উদ্দেশ্যে নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে মৃৎপ্রাচীর উত্তোলন করিলেন। পরে নদীতীরে গমন করিয়া বিশ্রাম লাভের জন্য স্বীয় হস্তী হইতে অবতীর্ণ হইলেন। ঘটনাক্রমে এই সময় তাঁহার মিত্র সুরাটবাসী হাজী মসিনের একখানি জাহাজ দ্রব্যাদি বহন করিয়া যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। হাজী মসিন বালেশ্বরে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। উক্ত জাহাজের একখানি পান্‌সী মুর্শিদকুলী খাঁর সংবাদ অবগত হইবার জন্য তীরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। হাজী মসিন জাহাজের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, ঈশ্বর এক্ষণে উত্তম সুযোগ প্রদান করিয়াছেন, কদাচ এ সুযোগ পরিত্যাগ করা উচিত নহে। মুর্শিদকুলী খাঁ কাহারও সহিত পরামর্শ না করিয়া মির্জাবাখরের সহিত নৌবিহার ছলে পান্‌সী আরোহণে জাহাজে উপনীত হইলেন এবং মছলিপত্তনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মুর্শিদকুলী খাঁ মছলিপত্তনে উপস্থিত হইয়া শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। তিনি আপন পরিবার ও যাবতীয় ধনসম্পত্তি কটকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। এক্ষণে স্বীয় স্ত্রী পরিবারের অভাবে ও তাঁহাদের বিপদের আশঙ্কায় তাঁহার মন বিচলিত হইয়া উঠিল। তিনি

---

* পলাশীর যুদ্ধে মীর্জাফরও এইরূপ চাতুরী অবলম্বন করিয়াছিলেন।

† বাঢ় দিল্লীর উত্তর-পশ্চিমে, এই নামে বেহারেও একটি নগর আছে।

মির্জাবাখরকে উড়িষ্যার সীমাস্থিত চিকাকোল ও গঞ্জামে প্রেরণ করিয়া কটক হইতে সংবাদপ্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা করিতে আদেশ করিলেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাঁহার সকল আশার শান্তি হইল। পুরুষোত্তমের রাজা মুর্শিদকুলী খাঁর সহিত সৌহার্দ্যবশতঃ স্বীয় দুরবস্থ মিত্রের পরিবারবর্গের আনয়নের জন্য কটকে লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁর পরিবারবর্গ ও যাবতীয় ধন-সম্পত্তি সা মোরাদ নামক জনৈক বিশ্বাসী কর্ম্মচারীর অধীনে গঞ্জাম প্রদেশস্থ ইঞ্ছাপুরে আনীত হইলে * উক্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা মুর্শিদকুলী খাঁর বন্ধু বিখ্যাত আনোয়ারউদ্দীন তাঁহাদিগকে যথেষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে মির্জাবাখরও তথায় উপস্থিত হইয়া যাবতীয় ধনসম্পত্তি ও পরিবারবর্গকে মুর্শিদকুলী খাঁর নিকট পাঠাইয়া দেন, এবং কিছুদিন পরে নিজেও তথায় গমন করেন। মুর্শিদকুলী খাঁ এক্ষণে সপরিবারে দাক্ষিণাত্যের সুবেদার নিজাম-উল্‌-মুলকের রাজ্যে বাস করিয়া আপনাকে নিরাপদ মনে করিতে লাগিলেন।

বিজয়লাভের পর আলিবর্দ্দী খাঁ সমস্ত উড়িষ্যা প্রদেশ আপনার বশে আনয়ন করিলেন। সুজা খাঁর উড়িষ্যা-শাসনকালে তিনি তথায় অনেক দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তজ্জন্য উক্ত প্রদেশের কোন বিষয়ই তাঁহার অবিদিত ছিল না। তৎপ্রদেশস্থ অধিকাংশ লোকের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। অতঃপর তিনি সমস্ত জমীদারগণকে আহ্বান করিয়া সাধু ব্যবহারে তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় প্রদান করেন। অবশেষে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা সৈয়দ আহম্মদকে আনাইয়া তাঁহাকে বহুমূল্য খেলাৎ প্রদান করিয়া মসনদে বসাইয়া সাধারণের সমক্ষে উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তার পদে নিয়োগ করিলেন। কিন্তু সৈয়দ আহম্মদ অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্ক হওয়ায় নবাব গুজর খাঁ নামে আপনার এক বিশ্বাসী পুরাতন কর্ম্মচারীকে তাঁহার সহকারী নিযুক্ত করিয়া প্রয়োজনানুযায়ী সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধির ভারার্পণ করিয়া উড়িষ্যা ত্যাগ করিলেন, এবং যথাসময়ে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলেন।

রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ রাজস্বসংক্রান্তবিষয়ে সৈন্যগণের সুশিক্ষা প্রদানে এবং প্রজাবর্গের সন্তোষোৎপাদনে মনোনিবেশ করিলেন। কি সম্ভ্রান্ত, কি ইতর, সকলেরই মনোরঞ্জনের জন্য তিনি প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও তৎকনিষ্ঠ এক্রামউদ্দৌলার প্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন এবং দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তি লইয়া আপনার দরবার গঠন করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় তিনি সরফরাজ খাঁর পরিবারবর্গের প্রতি বিশেষ সম্মান ও যত্ন প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সরফরাজের মাতা জিনেতেন্নেসা বা নফিসা বেগমকে † তাঁহার

---

* রিয়াজে লিখিত আছে যে, আলিবর্দ্দী খাঁর সৈন্যের হস্তে মুর্শিদের সমস্ত ধনরত্ন নিপতিত হইয়াছিল।

† জিবেতেন্নেসা বেগমকে মুতাক্ষরীণের ইংরাজী অনুবাদক অনেক স্থলে নফিসা বেগম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি প্রথম প্রথম জিন্নতেন্নেসা বলিয়া লিখিয়াছেন। ষ্টুয়ার্ট সাহেব কিন্তু সর্ব্বত্রই জিনেতেন্নেসাই লিখিয়াছেন। মুতাক্ষরীণের অনুবাদে নফিসা বেগম দেখিয়াও ষ্টুয়ার্ট একস্থলে নফিসা বেগমকে সরফরাজের ভগিনী কিন্তু তাঁহাকে নওয়াজিন মহম্মদের অন্তঃপুরপরিদর্শিকা বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু মুতাক্ষরীণে স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে তিনি স্বীয় পিতা জাফর খাঁর খাসতালুকের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। রিয়াজে নফিসা বেগমকে সরফরাজের ভগিনী ও তাঁহার নওয়াজিসের অন্তঃপুরে অবস্থানের কথা দেখা যায়।—**Vide Mutakherin, Vol, I p 585, also Stewart, p 279.**

অনুমতিক্রমে সসম্মানে স্বীয় জ্যেষ্ঠ জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র নওয়াজিস মহম্মদের অন্তঃপুর কর্ত্রী নিযুক্ত করেন। নওয়াজিস মহম্মদ তাঁহাকে আপন প্রাসাদে লইয়া গিয়া মাতার ন্যায় ভক্তি করিতেন, এবং নওয়াজিসের পত্নী ঘসিটা বেগম জিনেতেন্নেসার আজ্ঞাপালনে সর্ব্বদাই তৎপর থাকিতেন। তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে, এমন কি আলিবর্দ্দী খাঁ পর্য্যন্ত, তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহারা উক্ত সম্ভ্রান্ত মহিলার নিকট উপস্থিত হইয়া সম্মান প্রদর্শন করিতেন। জিনেতেন্নেসা স্বীয় পিতা জাফর খাঁর খাস তালুকের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। তাঁহার যাবতীয় উপস্বত্ব তিনি ভোগ করিতেন, ইহাতে কেহই তাঁহাকে বাধা প্রদান করিতেন না। যেদিন গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজের প্রাণত্যাগ হয়, সেই দিন তাঁহার একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। জিনেতেন্নেসা তাহাকে স্বীয় দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। * সরফরাজের কোন বিবাহিতা পত্নী না থাকায় তাঁহার সন্তান-সন্ততিগণ নওয়াজিস মহম্মদের তত্ত্বাবধানে ঢাকায় প্রেরিত হইয়া উপযুক্ত রূপ আর্থিক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। নওয়াজিস আপনাকে সরফরাজ খাঁর সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক বলিয়া প্রচার করিয়া বহুলোককে সাহায্য প্রদান করিতেন। তিনি নিজে মুক্তহস্ত ছিলেন। প্রতি মাসে ত্রিশ হাজার টাকা বিধবা, অনাথ ও বিপন্ন কর্ম্মচারিগণের জন্য ব্যয়িত হইত। এইরূপে সরফরাজের পরিবারবর্গ ঢাকায় বসতি করিতে লাগিলেন।



* ইহার নাম আকাবাবা কুচুক খাঁ, রিয়াজে নফিসা বেগম কর্ত্তৃক ইনি পোষ্যপুত্র গৃহীত হন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

দক্ষিণবঙ্গে শিবের গীত

শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

চৈত্রমাসের সংক্রান্তির কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতে বাঙলার প্রায় সর্ব্বত্র শিবের ছড়া-গান প্রচলিত হইতে থাকে। এ সময় একদল লোক শিবের নাম করিয়া উপবাস করে এবং শিবঠাকুরের পাট কাঁধে করিয়া গৃহে গৃহে ঘুরিয়া বেড়ায়। আর একদল লোক সঙ্ সাজিয়া নাচিতে গাহিতে থাকে। চৈত্রমাসের শেষের কয়েকদিন গ্রামবাসী আনন্দে বিভোর হইয়া থাকে।

চৈত্রসংক্রান্তির উৎসব বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গে ইহাকে গাজনের পূজা বলে, দক্ষিণবঙ্গে ইহা দেলপূজা নামে অভিহিত। প্রধানতঃ ইহা চড়ক পূজা নামে পরিচিত। দক্ষিণবঙ্গের দেলপূজার সময় গ্রাম্য যুবকেরা সঙ সাজিয়া নাচ-গান করে। উহা অষ্টকের গান নামে পরিচিত। এ সময় সাধারণতঃ আট সখী সাজিয়া নাচ-গান চলিতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে খোল করতাল লইয়া এক দল লোক মাতিয়া যায়। পাড়ার ছেলের দল তাহাদের সঙ্গ লইয়া বিশেষ আনন্দ উপভোগ করে।

অষ্টক গানের মধ্যে শিবের বিয়ে, ঘরকন্না, শিব-দুর্গার বিবাদ প্রভৃতি উপভোগ্য রূপে স্থান পাইয়া থাকে। শিবের গীত আমাদের দেশে অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে। বৈদিক রুদ্র পরবর্ত্তী কালে শিবের রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া বাঙলার ধর্ম্ম-মঙ্গল সাহিত্যের উদ্ভব। কারণ, শিবই ধর্ম্মের প্রতীকস্বরূপ, তিনি সত্য এবং সুন্দর। সকলেই শিব পূজার অধিকারী, সেজন্য আমরা শিবকে আমাদের পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছি। পারিবারিক মিলন-কলহের সহিত তিনি বিজড়িত। বস্তুতঃ শিবের গীতে বাঙালীর পূর্ব্বতন পারিবারিক জীবনের সন্ধান পাওয়া যায়। কৃষিপ্রধান বাঙ্গালা দেশ ক্রমে তাঁহাকে কৃষির দেবতা করিয়া লইল এবং সাধারণ কৃষি-গৃহস্থের মত তাঁহার দ্বারা অনেক ক্ষেতের কাজ করাইয়া লইল। বাঙ্গালার মনসামঙ্গল তথা ধর্ম্মমঙ্গল সাহিত্যে শিবের মালঞ্চ-সৃষ্টির বিবরণ পাওয়া যায়। দক্ষিণবঙ্গের দেলপূজার ছড়ার মধ্যে শিবের মালঞ্চ-সৃষ্টির উল্লেখ আছে। বল্লুক সাগরের কূলে মালঞ্চ সৃষ্টি করিলেন।

কেহ কেহ অনুমান করেন, এই বল্লুক সাগর বর্দ্ধমানের দামোদর নদ হইতে বাহির হইয়া মৃজাপুরের খালে পড়িয়াছে। আমাদের দেশে অনেক সময় বড় বিলকে সাগর বলা হইয়া থাকে—পূর্ব্ববঙ্গের শ্রীহট্টের দিকে "হাওর" অর্থে বিল বুঝায়। "সায়র" শব্দ আমাদের দেশে বিশেষ ভাবে প্রচলিত, তাহা সাগরের অর্থদ্যোতক। অন্য পক্ষে, বল্লুকসাগর গঙ্গোপসাগরের শাখাবিশেষ বলিয়া ধারণা করা চলে। যাই হউক, শিবের আজ্ঞাক্রমে নন্দী বল্লুক সাগরের কাছে মালঞ্চ-সৃষ্টির চেষ্টা করিতে লাগিল। ভূমি চাষ করিয়া সে শিবের নিকট সংবাদ পাঠাইল।

চাষ মই দিয়া ভূমি করিল সুসার।
সংবাদ পাঠাইল নন্দী প্রভুর গোচর॥

(দেল পূজার ছড়া—খুলনা জেলা)

রামেশ্বরের শিবায়নে অনুরূপ বিষয়বস্তুর উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈদিক রুদ্র শিবরূপে পরিণত হইলে ত্রিশূল স্থলে তিনি লাঙ্গল ধারণ করিলেন। ক্রমে শিব কৃষিকর্ম্মের দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্দ্রের নিকটে শিব ভূমিভিক্ষা করিয়া লইয়াছিলেন—

তুমি ভূমি দিলে আমি চষি গিয়া চাষ।
পূর্ণ হয় তবে পার্ব্বতীর অভিলাষ॥
(রামেশ্বরের শিবায়ন)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে শিবের গীতে বাঙালীর পারিবারিক জীবনের সন্ধান মিলে। পূর্ব্বে বাঙলা-দেশে বহুবিবাহের রীতি ছিল এবং বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। অনেক বৃদ্ধ তরুণী ভার্য্যার প্রতি বিশেষ আসক্ত ছিলেন। এমন কি বুড়ো শিবের সহিত দুর্গার বিবাহ হইয়াছিল। দক্ষিণবঙ্গের "অষ্টক গানে"র মধ্যে শিবের বিয়ের বিষয় উপভোগ্য রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। বিবাহ করিবার জন্য শিব গিরিপুরে গমন করিলে তাঁহাকে দেখিয়া গিরিপুরের এয়োতি যুবতীগণ রঙ্গ করিতে লাগিল। "মেয়ের মামী" তাঁহাকে দাঁত-পড়া কাঁচা ছেলে বলিলেন—

গিরিপুরের আইয়েগণ সকলে,
ও মামার কাজল পরায় কপালে,
আর মাইয়ের মাসি এসে বলে,
দাঁত-পড়া কাঁচা ছেলে।"

এরূপ "দাঁত-পড়া কাঁচা ছেলের" সহিত কচি মেয়ের বিবাহ দিতে সকলেই নারাজ। শ্রীদুর্গার সখীগণ রাণীর নিকট যাইয়া প্রতিবাদ করিতে লাগিল—এ রকম বরের হাতে মেয়ে দেওয়া অন্যায়।

বলে রাণীর কাছে ডাকি
অমন বরে দিস্‌না বিয়ে
তোর কাঁচা মেয়ে॥

সখীগণ বলে—

ও তোর জামাইর মুখে পাকা দাড়ী,
ননীর পুতুল সোনার বেড়ি,
আমরা সকলে বারণ করি,
কি জন্যেতে বুড়ার হাতে
দিস মা তাড়াতাড়ি॥

এ সব নিষেধ সত্বেও গৌরীকে বুড়ো শিবের হাতে সম্প্রদান করিতে হইল্। বাঙলার গৌরীদান প্রথা এই ভাবে বাড়িয়া উঠিতে থাকে। মেয়ের বাপ মা, বৃদ্ধ কিম্বা যুবার পার্থক্য দেখিতেন না। "অষ্টমবর্ষে" মেয়েকে দান করিতে পারিলে, গৌরী দানের অক্ষয় (?) ফল লাভ করা যায় বলিয়া একটা ধারণা জন্মিয়াছিল।

এ রকম ক্ষেত্রে মেয়ে যে সুখে থাকিতে পারে না, তাহা স্বাভাবিক। সেজন্য বোধ করি গৌরীর জীবনে সুখ ছিল না। বুড়োদের স্বভাবতঃ একটু সন্দেহের বাতিক থাকে, সেজন্য বহুদিন পরে গৌরী পিত্রালয়ে গমন করিতে চাহিলেও, শিব তাহাতে বাদ সাধিতেন। নারদ সব সময় কোন্দল বাধাইবার চেষ্টায় থাকিতেন—তিনি ও তলে তলে শিবকে নিষেধ করিতেন।

তবে নারদ বলেন মামা, এও ক'র না ভাল।
ব'স্-কালে নারীলোক না'য়েরে পাঠাও কেন॥

দুর্গাকে বাপের বাড়ী যাইবার জন্য শিব নিষেধ করেন। তাহার চরিত্রের উপর সন্দেহ করেন।

ও নাইয়ারের[১] ছুতো নিয়ে,
কলঙ্ক রটাবি গিয়ে,
শুন সতী ভাল না ভাল না॥

শ্রীদুর্গাও ছাড়িবার পাত্রী নহেন। ভোলানাথ যে চুপি চুপি কুচনগরে যাতায়াত করেন, তাহা পার্ব্বতী লক্ষ্য করিয়াছেন। তাহাকে যদি না যাইতে দেন, তাহা হইলে তিনি আর সংসারের কাজ করিবেন না।

ও তবে দেবী বলে শূলপাণি
তোমার বৃত্তান্ত জানি,
কুচ-নগরে কর যাতায়াত।
ও তবে পাঠায়ে না দেও যদি,
তোমার সঙ্গে এই অবধি,
রান্ধিয়া না দিব তোমার ভাত॥
ও তবে নাইয়ারে যাব আমি,
যা' পার তা কর তুমি,
পুরাইব মনের বাসনা।

মহাদেব বেগতিক বুঝিয়া পার্ব্বতীর সঙ্গ লইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। কারণ এ বুড়ো বয়সে তাহাকে দেখিবার আর কেহ নাই। ৺দাশরথি রায়ের পাঁচালীতে তাহা বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে,—

দেখিয়া গমনোদ্যোগী, মহাদুঃখে মহাযোগী
অনুযোগ করেন গৌরী প্রতি॥
তুমি সদয়া অচলে, আমার কিরূপে চলে,
চলাচল শক্তি নাই ঈশানি।
বয়স হয়েছে অশীতিপর, হ্রাস হচ্ছে পর পর,
এর পর কি হয় না জানি॥

১। নাইয়ার—কুটুম্ববাড়ী, বাপের বাড়ী।

বাধ্য হইয়া শিবকে লইয়া পার্ব্বতী গিরিপুরে আগমন করিলেন। পার্ব্বতীর গিরিপুরে আগমন-ই বাঙলাদেশে "আগমনী" নামে পরিচিত। "আগমনী গান" পশ্চিমবঙ্গের দিকে বিশেষ ভাবে প্রচলিত। শ্রীদুর্গার পিত্রালয়ে আগমনকে উপলক্ষ্য করিয়া বাঙলার বহু কবি "আগমনী গান" রচনা করিয়া গিয়াছেন।

দক্ষিণবঙ্গের "শিবের গীতে" গঙ্গা-দুর্গার বিবাদের বিষয় উল্লিখিত আছে। "সতীনের ঘর" করা পূর্ব্বেকার বাঙালী মেয়েদের একরকম গা-সওয়া হইয়া গিয়াছিল; সতীনের সঙ্গে অনবরত কলহ লাগিয়াছিল। গঙ্গাদুর্গার কলহের মধ্যে তাহা রূপপ্রাপ্ত হইয়াছে।

বলিছে গঙ্গাধনি, পতি হয় শূলপাণি,
পতির বুকে পা দিয়েছ, লজ্জা নাই ভবানী॥

দুর্গাও তাহার উত্তর দেন।—

রাগ করে ভবানী কয়,
সব দোষ কি আমার হয়,
আমি থাকি পতির বুকে,
তুই কেনে পতির মাথায়॥

শিবের গীতের সন্ধান করিলে এরূপ অনেক বিষয় জানা যায়। ইহাদের মধ্যে বাঙালীর পারিবারিক জীবনের ছায়া পড়িয়াছে।

প্রতীক্ষা

শ্রীশোভারাণী রায়

নভের মতন সুনীল বসনে
এ তনুদেহটি ঢাকি'
তোমারি লাগিয়া সাঁঝের বেলায়
একেলা বসিয়া থাকি।
শিথিল খোঁপাটি ঘিরিয়া আজিকে
পরেছি বকুল মালা
নিরালা তারার মতন কপালে
এঁকেছি সিঁদুর-জ্বালা

কনক-কাঁকণে বেঁধেছি আজিকে
আমার এ বাহু দু'টি—
মুখর নূপুর সহসা জাগিয়া
নীরবতা ফেলে টুটি'।
মেঘের মতন সঘন কাজল
আঁখির পাতায় আঁকি'
প্রদীপ জ্বালিয়া বসেছি আশায়,
আজিকে আসিবে না কি?



চলন্তিকা

সম্বুদ্ধ

এক সময়ে লোকের ধারণা ছিল, ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। স্রষ্টার ছাপ সৃষ্টের মধ্যে পড়ে, এই বিশ্বাসে তাহারা মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের সন্ধান করিত। এখন দিন বদলাইয়াছে। আমরা বিজ্ঞান শিখিয়াছি। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন শুনিলে আমরা ক্ষেপিয়া যাই। আমরা জানি আত্মা-টাত্মা বাজে কথা; মন বুদ্ধি চৈতন্য পর্য্যন্ত সমস্তই দৈহিক ব্যাপার; এবং সেই দেহ পঞ্চভূতে গঠিত। জানিয়া আমরা পরম হৃষ্টমনে ভূত হইয়া যাইতেছি।

*

ভুলটা আসলে ঈশ্বরের। মানুষের পূর্ব্বে তিনি বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মানুষ গড়িয়া তাহাকে তিনি সেই সমস্ত দেখাইলেন। বলিলেন, বৎস, এই সমস্তই তোমার জন্য আমি গড়িয়াছি। এখন চরিয়া খাও।

মানুষ সহর্ষে কহিল, প্রভু, সমস্তই খাইব?

ঈশ্বর কহিলেন, চিবাইয়া যতদূর নরম করিতে পার, গিলিয়া যতদূর হজম করিতে পার, আমার আপত্তি নাই।

মানুষ পরমানন্দে চাখিতে আরম্ভ করিল।

জগতে ও জীবনে শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য যে খাওয়া, সে কথা ঈশ্বরই প্রথম মানুষকে শিখাইয়া দিলেন। মানুষের কানে সেই তাঁহার প্রথম উচ্চারিত মন্ত্র। মানুষ মন্ত্রের মর্য্যাদা রাখিয়াছে। ঈশ্বরের মুণ্ড পর্য্যন্ত সে বিনা দ্বিধায় বিনা সঙ্কোচে চিবাইয়া খাইয়াছে।

*

প্রথমে সে খাইল ফলমূল। একটা ফল ঈশ্বর তাহাকে খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন—করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন; জানিতেন, সেইটা না খাইলে তাহার জ্ঞাননেত্র খুলিবে না, সে রাঁধিতে শিখিবে না, কাজেই অন্য জীবকেও খাইতে পারিবে না।

কিন্তু অত সহজে ঠকিবে, মানুষ অমন গাধা নয়। সে সেই ফল খাইল। খাইবার ফলে তাহার জ্ঞান বিকশিত হইল, সে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করিল। আগুন জ্বালাইল,

অস্ত্র বানাইল, পশুপক্ষী মারিতে শিখিল। তাহার ভোজ্যবস্তুর তালিকাও উদ্ভিদ্‌রাজ্য ছাড়াইয়া জলে স্থলে অন্তরীক্ষে জীবরাজ্যে প্রসারিত হইল।

*

তিমি ও ডাইনোসর হইতে সুরু করিয়া ফড়িং উইপোকা পর্য্যন্ত চাখা সারা হইয়া গেল। মানুষ কহিল, ওহে বিধাতা-পুরুষ, এখন কি চাখিব? তোমার সৃষ্টি তো ফুরাইয়া গেল!

বিধাতা কহিলেন, নূতন জীব সৃষ্টি করিতেছি। আমাকে খাইও না, রক্ষা কর।

মানুষ কহিল, আচ্ছা, মানুষের মাংস কেমন লাগে? ওটা তো চাখা হয় নাই, ঐটাই শুধু বাকি আছে।

বিধাতা বাঁচিয়া গেলেন। কহিলেন, করিয়াছ কি? মানুষই চাখো নাই! চাখো, চাখো।

মানুষ চাখিয়া দেখিল। দেখিয়া কহিল, এতকালে যথার্থ সুস্বাদু খাদ্যের সন্ধান পাইলাম। তোমাকে আর নূতন অখাদ্য সৃষ্টি করিতে হইবে না, আমরা মানুষই খাইব।

*

মানুষের মাংসই যে খাইতে মাংসোত্তম, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। এ বিষয়ে বহুবিধ প্রমাণ দেখানো যায়। ভাষায় ইহার নাম মহামাংস। শাস্ত্রে বলে, দেবতাদের মধ্যে যাঁহারা মাংসাশী তাঁহারা নরবলিই সকলের চেয়ে বেশি পছন্দ করেন। জীবজন্তুদের তো কথাই নাই। বাঘ একবার মানুষ খাইলে আর গরু খাইতে চায় না, পেশাদার নরভুক্ হইয়া উঠে। রূপকথার রাক্ষসেরাও তাই করিত। তান্ত্রিক সাধনার বৃহৎ কথা নরমাংস-ভক্ষণ। সকলের চেয়ে বড় প্রমাণ মানুষের মাংসই একমাত্র মাংস, যাহা খাওয়া আইন করিয়া বন্ধ করিতে হইয়াছে। খাইতে বিস্বাদ হইলে আইন করিতে হইত না। বাঘের কামড় খাইও না, লাঠির বাড়ি খাইও না, কানমলা ঘুষি বা আছাড় খাইও না, শকুনির মাংস বা পচা কৎবেল খাইও না বলিয়া আইন বানাইতে হয় না। মানুষ নিজের গরজেই ওগুলা বাদ দিয়া চলে। মানুষের মাংস খাইতে বারণ করা হয়, তবু খাওয়া ঠেকানো যায় না, ইহার একমাত্র কারণ তাহার স্বাদ ভাল, তাহার মোহ বেশি।

*

প্রাচীনকালকে আমরা স্বর্ণযুগ বলি, কারণ তখন মানুষের আনন্দ ও তৃপ্তির পথে কৃত্রিম বাধা আসিয়া রসভঙ্গ করিত না। প্রাণের কথা মুখ খুলিয়া বলা যাইত বলিয়া আর্য্যরা ইহার নাম দিয়াছিলেন—সত্যযুগ।

সেই মহান্ যুগে এ রকমের কুৎসিত আইন ছিল না। মানুষ তখন নির্ব্বিঘ্নে ও নির্ব্বিবাদে মানুষের মাংস খাইতে পাইত। খাইতও। সেই যুগের ভাগ্যবানদের হিংসায় পরবর্ত্তী কালের মানুষরা জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিত। জলুনির চোটে তাহারা তাঁহাদের নাম দিয়াছিল—ক্যানিবল। এমন করিয়া নাক সিঁটকাইয়া তাহারা কথাটাকে উচ্চারণ করিত, যেন ক্যানিবল হওয়াটা অতীব রকমের একটা হীনতা ও নোংরামি। অথচ তাহাদেরই যুগকে স্বর্ণযুগ বলিতে ইহারা সঙ্কুচিত হইত না। ভাবটা ছিল এই, যুগটা স্বর্ণময়, কিন্তু মানুষগুলা যাচ্ছেতাই। যথোচিতরূপ ভদ্রলোক তাহারা নয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, হইলে তাহারা ভদ্র আচরণ করিত, নিজেরা মরিয়া যাইয়া আমাদের

জায়গা ছাড়িয়া দিত, যেন মহামাংসের সেই মহাভোজে আমরা পাতা পাতিতে পারি। ছাড়ে নাই অতএব তাহারা পাজি লোক; আমরা খাইতে পাই নাই, অতএব সেই আঙুর খাওয়া নিশ্চয়ই গর্হিত কাণ্ড। যাহারা খাইত তাহারা অশিষ্ট।

*

আমরা শিষ্ট। আমরা নরমাংস খাই না। খাইবার প্রবৃত্তিটাকে আমরা অবদমন করিয়াছি, ইংরেজীতে যাহাকে বলে—সাব্‌লাইমেশন। প্রবৃত্তিকে চুনকাম করিয়া আমরা অন্যরূপে প্রকাশ করিয়া থাকি। কামড়াইয়া খাইবার প্রবৃত্তিটাই চুম্বনে পরিণত হইয়াছে, এইরূপ একটা কথা কিছুদিন আগে বাংলা মাসিকে পড়িয়াছিলাম। মানুষের মাংস খাইতে হইলে মানুষ শিকার করিতে হয়, কারণ মৃতমাংসের তুলনায় জীবন্ত-হত মাংস খাইতে ভাল। মানুষ শিকারের গ্রাম্য নাম হত্যা, সেটা মূর্খদের সমাজে নিন্দিত। অধিকাংশ মানবই মূর্খ, তাই এই জঘন্য সমাজের মধ্যে বাস করিয়া ভদ্রলোকে শান্তি পায় না। যেখানে মহামাংস ভক্ষণ তো দূরের কথা, মহামাংস আহরণের অনাবিল আনন্দটুকুও ভোগ করার সুযোগ জোটে না, সে সমাজে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে মনোদুঃখে জীবন্মৃত হইয়াই থাকিতে হয়। নরহত্যার প্রবৃত্তি তবুও টিকিয়া থাকে; হাতে মারিতে না পারিয়া আমরা ভাতে মানুষ মারি। মামলা মোকদ্দমা করা এবং দৈনিকপত্রের সম্পাদকীয় কুৎসা লেখা, হত্যা-প্রবৃত্তির চুনকাম-করা বহিঃপ্রকাশ।

*

ভরসার কথা এই, এখনও যুগে যুগে মহামানবেরা জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহাদের জীবনের ব্রত জনগণের হিতার্থে নিজের কর্ম্মক্ষমতা নিয়োগ করা। পঞ্জরের পিঞ্জরে বদ্ধ মানবের মুক্তিকামী আত্মার বিক্ষোভ দেখিয়া ইঁহাদের হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠে। বিধিনিষেধশৃঙ্খলার শৃঙ্খলে নিপীড়িত মানব-মনের আকুতি ইঁহারা সহিতে পারেন না। হউক ক্ষণিকের জন্য, তবু সেই শৃঙ্খল মোচন করিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাকে মুক্ত বায়ুতে নিঃশ্বাস ফেলিবার স্বাধীনতা আনিয়া দিতে পারিলে ইঁহারা ধন্য হইয়া যান। সেই আত্মপ্রসাদই ইঁহাদের পরম পুরস্কার; ব্যক্তিগত মস্তকে অভিনন্দনের পুষ্পমাল্য কিংবা পরাজয়ের কলঙ্ক যাহাই বর্ষিত হউক, সেদিকে তাঁহারা দৃক্‌পাতও করেন না। ইঁহাদের অক্লান্ত সাধনার ফলে যুগে যুগে সমাজশৃঙ্খলাপীড়িত মানব এক একবার সমস্ত বাধানিষেধের বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া মহোল্লাসে হত্যামহোৎসবে মাতিয়া উঠে। সেই মহোৎসবের নাম যুদ্ধ। সেই মহামানবদের প্রতিভূ জেঙ্গিস খাঁ, তৈমুরলঙ্গ, আলেক্‌জাণ্ডার, হিট্‌লার।

*

যুদ্ধ উত্তম জিনিস। যুদ্ধে মানুষের মনের সঞ্চিত দ্বেষ ও বিদ্বেষ কাটিয়া যায়, জাতীয় দেহের জড়তা কাটিয়া যায়। লোকভারপীড়িত, জন্মনিরোধব্যস্ত দেশের অনাবশ্যক মানুষগুলা মরিয়া যাইয়া তাহার স্থান-সমস্যা, অন্ন-সমস্যা ও বেকার-সমস্যার অতি সহজ সুষ্ঠু ও নিশ্চিত সমাধান হইয়া যায়। সাধারণত পুরুষদেরই যুদ্ধে যাওয়া ও মরা অভ্যাস বলিয়া যুদ্ধের অন্তে দেশের অনূঢ়া তরুণীরা প্রসাধন ও সৌন্দর্য্যচর্চ্চার দিকে অধিকতর মনোযোগ দিতে বাধ্য হয়। ফলে দেশের রাস্তা ও

ট্রামগাড়ি সুন্দরতর হইয়া উঠে। শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসায়ে মন্দার জড়তা কাটিয়া শিল্প-প্রগতি দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়। উঠানের কোণের ভাঙা কড়াইটা পর্য্যন্ত সাড়ে তিন টাকা দরে বেচিয়া আমরা লাভবান হইতে পারি। খবরের কাগজ অধিক বিক্রয় হয়। দেশের জমি উর্ব্বর হয়। বহু বৎসর পূর্ব্বে ক্রেসি ও এজিনকোর্টের মাটি নররক্তে সিক্ত প্লাবিত হইয়াছিল। এখনও এই জায়গা দু'টি আঙুরের চাষের জন্য প্রসিদ্ধ। আঙুর গাছের পক্ষে সবচেয়ে ভাল সার রক্ত, এবং তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ নররক্ত। ফলের মধ্যে আঙুর অতি মূল্যবান ও সুস্বাদু, শৃগালেরা যাহাই বলুক।

*

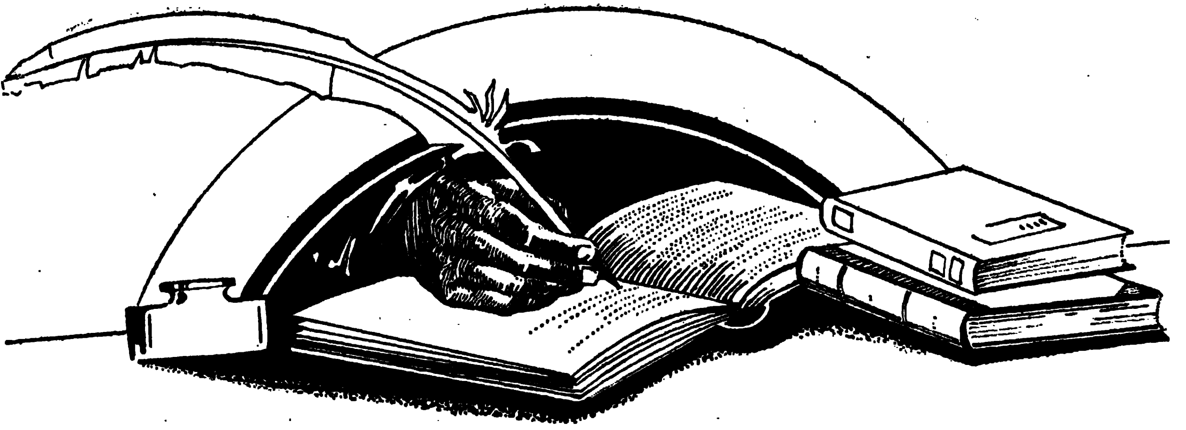
তবুও এমন মূর্খ আছে, যাহারা বলে যুদ্ধ ভাল নয়। যে দুর্ব্বুদ্ধি মানুষেরা নিজেদের হীনবুদ্ধির গর্ব্বে মহামাংস ভক্ষণ ও মহামৃগয়া নিষিদ্ধ করিতে চাহিয়াছিল, যুদ্ধ-নিবারণের অপচেষ্টাও তাহাদেরই আবিষ্কার। যুদ্ধের নিয়ম, দুই পক্ষ পরস্পরকে মারিতে মারিতে শেষ পর্য্যন্ত যাহারা বা যাহাদের ধ্বংসাবশেষরা বাকি থাকে, তাহাদেরই জয় হইল বলিয়া স্বীকার করা হয়। এ পক্ষের একজন মানুষ আর ও পক্ষের একজন মানুষ মোটামুটি সমান যদি ধরিয়া লওয়া হয়, তবে মোটের উপর যাহারা দলে ভারী তাহারাই শেষ পর্য্যন্ত জিতিবে, এই রকম একটা আন্দাজ করাও চলে। সেই আন্দাজের জোরে ইহারা স্থির করিল, মারামারি করার দরকার নাই, দুই দলের কার কি লোকসংখ্যা গণিয়া দেখিয়া, অঙ্ক কষিয়াই জয় পরাজয় ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইবে। মাথা ভাঙিবার বদলে মাথা গণিয়া কর্ত্তব্যে ফাঁকি দেওয়ার এই পদ্ধতির নাম—ডিমোক্রাসি।

*

মারামারি করা আর অঙ্ককষার মধ্যে কোন্‌টা বেশি শক্ত, সেটা ব্যক্তিগত মতামতের ব্যাপার। আমি নিজে মনে করি প্রথমটাই সোজা ; আমি জানি মারামারিতে তবু পরের মাথায় একটা বাড়ি মারিতে পারিলেও পারি এবং আমার মাথায় বাড়ি বসাইতে সে না পারিলেও পারে ; কিন্তু অঙ্ক কষিতে হইলে আমার মাথায় বাড়ি নয়, একেবারে বাজ পড়ে। তবুও, যদি দেশে প্রচুর পরিমাণ অঙ্কবিদ্‌ থাকে, হয়তো ডিমোক্রাসি চলিতে পারে। চলা উচিত নয়, কারণ ডিমোক্রাসি মানুষকে হীনবল, ভীরু ও অকর্ম্মণ্য করিয়া তোলে।

*

কিন্তু এখন আর তাহাকে গালাগালি দিতে চাই না। ভূপতিত শত্রুকে পদাঘাত করা—কাপুরুষতা। ডিমোক্রাসির ডিম ঘোড়ার ডিম বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ডিমোক্রাসির কাঁধে চড়িয়া তাহার মাথায় কাঁঠাল ভাঙিয়া খাইবার যে সিদ্ধবাদী পদ্ধতির আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার নাম ডিক্টেটরশিপ। সেই মহা-আবিষ্কারের জয় হউক, মানুষ প্রাণ খুলিয়া মারামারি করিয়া বাঁচুক, শোণিতসিঞ্চনে স্নিগ্ধ বসুন্ধরা উর্ব্বরতায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠুক। ডিমের রাজত্বের ছলনায় মূর্খরা ভুলিতে পারে। আমরা মূর্খ নই।



সম্পাদকীয়

ইউরোপে যে যুদ্ধের আগুন লেগেছে, এ খবর আমরা তারে বেতারে গত পয়লা সেপ্টেম্বর বিকেলে পাই। এ সংবাদ শুনে আমি চম্‌কে উঠি নি, কেন না এ ঘটনার উদ্যোগ-পর্ব্ব বহুদিন হতে চল্‌ছিল।

(২)

যুদ্ধ যখন বেধেছে, তখন যুদ্ধ ছাড়া আর কোন্ বিষয়ে কথা কওয়া যায়? পাঁচজন ঘরে ঘরে আজকের দিন, আর কি বিষয়ে আলাপ করছেন? কিন্তু দুঃখের বিষয় যুদ্ধের খবরবার্ত্তা বিশেষ কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। গত যুদ্ধের সময় আর যে বস্তুরই আমদানি বন্ধ হোক—খবরের হয় নি। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় বড় বড় জাতরা এক্ষেত্রে লুকোচুরি খেলছে। যুদ্ধের আগুন লেগেছে শুনছি, কিন্তু চোখে দেখছি সুধু ধোঁয়া।

(৩)

একটি মাত্র অপ্রত্যাশিত খবর পাওয়া গিয়েছে। রাশিয়া পোলাণ্ডে—অর্থাৎ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে, এবং অর্দ্ধেক পোলাণ্ড—বেওয়ারিশ মাল বলে আত্মসাৎ করেছে। এ খবর শুনেও আমি চম্‌কে উঠি নি। কারণ Bolshevism রাশিয়ার স্বদেশের শৃঙ্খলার নব পদ্ধতি। কিন্তু ইউরোপের রাজ্য মাত্রেই পরস্পরে পরস্পরের শত্রু।

(৪)

আমি এক্ষেত্রে রাশিয়ার যোগদানটা অপ্রত্যাশিত বলেছি। কেন না বাংলার হঠাৎ-দার্শনিকরা আমাদের বুঝিয়েছিলেন যে, Bolshevism পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে ব্রতী হয়েছে, যার বিলেতি নাম Utopia। অর্থাৎ Karl Marx নামক মহাদার্শনিক যার কল্পনা করেছিলেন, Lenin তা বাস্তবে পরিণত করেছেন। এ দর্শনের নাম হেগেলিয়ান বামমার্গ—অর্থাৎ যে পদ্ধতি অবলম্বন করে হেগেল জ্ঞানকাণ্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই একই পন্থা অনুসরণ করে Marx কর্ম্মকাণ্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর নূতনত্বের প্রধান কথা praxist। জ্ঞানের চেয়ে কর্ম্ম প্রধান এ কথা ভারতবর্ষে পূর্ব্বমীমাংসকরা বহুকাল পূর্ব্বে বলে গেছেন, এবং তাঁরাও ছিলেন নাস্তিক।

যাঁরা কোন দর্শনেরই ধার ধারেন না, তাঁরা এই নূতন দর্শনের মহাভক্ত হয়ে পড়েছেন। এ দর্শনের মোদ্দা কথা হচ্ছে revolution, evolution নয়; এ দু'য়ের আসলে প্রভেদ কি?—Evolution-এর তাল বিলম্বিত, আর revolution-এর দ্রুত। উভয়েরই উদ্দেশ্য মানব-সমাজের চরম উন্নতি। সে যাই হোক, মারামারি কাটাকাটির ইউটোপিয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ ইউটোপিয়া সনাতন।

(৫)

জার্ম্মাণী ও রাশিয়ার মিলনেতে আমি বিস্মিত হয়েছি; কিন্তু এ 'মোতা' বিবাহ যে অসম্ভব, তা কখনই মনে ভাবি নিঁ। রাশিয়াও Totalitarian State, জার্ম্মাণীও তাই; এ উভয়ের ভিতর নাড়ীর যোগ আছে। সুতরাং এ উভয়ের মিলন হচ্ছে সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলি।

(৬)

শুনতে পাই Democracy রক্ষার জন্য এ যুদ্ধ। Totalitarian State ডিমোক্রাসীর হন্তারক, সুতরাং ডিমোক্রাসীকে রক্ষা করতে হলে Nazismকে ধ্বংস করা প্রয়োজন। ডিমোক্রাসী যে কি, তার definition আমি দেব না। Kant থেকে সুরু করে Morley পর্য্যন্ত ইউরোপের বহু মনীষী তা দিয়েছেন। কিন্তু কোন definitionই অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয় নি। তবু কোন্ রাষ্ট্র democratic আর কোন্ রাষ্ট্র তা নয়—তা আমরা দেখলে চিনতে পারি। আর কি লক্ষণে যে তাদের চিনতে হবে—সে সন্ধান Bertrand Russell সম্প্রতি দিয়েছেন। তাঁর কথা এই:

"This is the essential differece between the liberal outlook and that of the totalitarian state, that the former regards the welfare of the state as residing

ultimately in the welfare of the individual, while the latter regards the state as the end, and individuals merely as indispensable ingredients, whose welfare must be subordinated to a mystical totality, which is a cloak for the interest of the rulers."—'Power', 317

(৭)

এই যুদ্ধ নামক জঘন্য ব্যাপারে আমরা অবশ্য অবশ্য হিটলারের বিরোধী ও ডিমোক্রাসির জয় কামনা করি, যদিচ আমাদের দেশে ডিমোক্রাসি নেই, কেন না আমরা পরাধীন জাত। এ অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য কি? কংগ্রেস বলেছে যে, ভারতবাসীরা ইংরাজের সহায় হ'তে প্রস্তুত যদি ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট আমাদের ডিমোক্রাসির পথে অনেকটা অগ্রসর করে দেয়। এ দাবী সম্পূর্ণ সঙ্গত কেন না ডিমোক্রাসি কোনও জাতের একচেটে নয় বিশ্বমানবের কামনার ধর্ম্ম।

(৮)

দেখে খুসী হলুম যে দেশবিদেশের পলিটিক্স সম্বন্ধে জনৈক বিদেশীরও এই মত। Gunther-এর 'Inside Europe' একখানি জগৎপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তিনি সম্প্রতি 'Inside Asia' নামক আর একখানি বই লিখেছেন, উক্ত গ্রন্থের India-র বর্ত্তমান পলিটিক্সের পরিচয় তিনি এই বলে শেষ করেছেন—

"Crisis will probably come in the event of an European war. Will India be loyal, as it was in 1914? The easy thing to say is of course that if Congress plays its cards correctly, it could gain enormously by any such crisis. It could promise to remain loyal—in return for an advane in independence."

—'Inside Asia', p. 528

(৯)

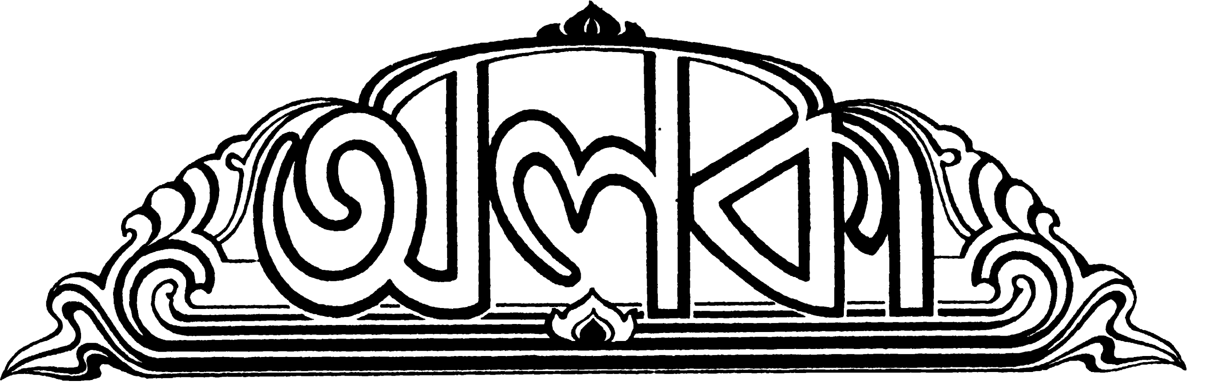
পলিটিক্সের তাস খেলায় মহাত্মা গান্ধী নেহাৎ আনাড়ী খেলোয়াড় নন, তিনি ইংলণ্ডের এই বিপদের সুযোগ নিয়ে—যে ছক্কাপাঞ্জা ধরবেন তার কোন সম্ভাবনা নেই। অতবড় war profit করা তাঁর ধাতে নেই। কিন্তু মনে হয় এ বাজি তিনি হাতের পাঁচ রাখবেন।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত
শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও
৩৬।১ এলগিন রোড হইতে প্রকাশিত



শকুন্তলা

শিল্পী শ্রীদেবীন্দ্রনারায়ণ [illegible]



দ্বিতীয় বর্ষ { কার্ত্তিক, ১৩৪৬ } দ্বিতীয় সংখ্যা

বাঙ্গালী হিন্দু

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

(১)

বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজের ইংরেজী-শিক্ষিত উপরের স্তর চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। এ চাঞ্চল্যের কারণ বাইরের আঘাত, সুতরাং ও অংশের সজীবতার প্রমাণ।

ভারতবর্ষের ইংরেজ-শাসন-আমলে সে বিদেশী শাসন তার অধীন দেশের লোককে যতটা সুযোগ দিয়েছিল তার ষোল-আনা সুবিধা নিয়েছিল উচ্চবর্ণের বাঙ্গালী হিন্দু। রাজার দেশের ভাষা শিখে, এবং মোগল-শাসন ও স্বদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা মিশিয়ে কর আদায় ও শান্তি-শৃঙ্খলা-রক্ষার যে প্রকাণ্ড ও জটিল শাসন-যন্ত্র ইংরেজ এ দেশে আমদানি ক'রেছে তার মোটা কলকব্জাগুলো চালাবার বিদ্যা আয়ত্ত ক'রে তার প্রতিষ্ঠা ও চলার কাজে সে কম সাহায্য করে নি। এই মিস্ত্রিগিরির মজুরি সে যা পেয়েছে তাই হচ্ছে উচ্চশ্রেণী বাঙ্গালী হিন্দুর এ দেশে প্রতিপত্তি ও নেতৃত্বের বাস্তব ভিত্তি। বাঙ্গালী হিন্দু যে এই নূতন ভাষা ও বিদ্যায় সহজেই নিজেকে রপ্ত ক'রে তুলেছিল তার এক কারণ তার মনে অতীত গৌরবের এমন কোনও স্মৃতি ছিল না যার অভিমান এর বাধা জন্মাতে পারে। বৃটেনের রাজতক্ত-দখল সে সানন্দেই বরণ করেছিল। আর পাটনা থেকে পেশোয়ার, কটক থেকে মধ্য-ভারত ইংরেজের বিজয়-নিশানের পিছু পিছু সে ছুটেছিল—হাতে কলম, বগলে ইংরেজী বিদ্যা শেখাবার পুঁথি। বিজিত দেশে নব শাসন-রীতি চলতি করতে, আর সে বিদ্যায় সে দেশের লোকের হাতে খড়ি দিতে। কেরাণীগিরি ও গুরুগিরির এই একচেটে ব্যবসায় উত্তরাপথ জুড়ে বাঙ্গালী হিন্দুর বহুদিন কায়েম ছিল। আজও সেখানকার বড় বড় সহরে তার ধ্বংশাবশেষ আমাদের আপসোস ও আস্ফালনের খোরাক যোগাচ্ছে। স্বভাবতই এ 'মনপলি' ছিল সাময়িক; আর তা না হ'লে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হ'তে হ'তো। যে মাস্টার আশা করে ছেলেরা স্কুলের বিদ্যা শেষ ক'রে নিজেরা কখনও মাস্টার হবে না, নিরাশ তাকে হ'তেই হয়।

কিন্তু এইটুকুই পুরো সত্য নয়। রাজশাসনের সঙ্গে সঙ্গে নব ইউরোপের যে সব ভাব ও বিদ্যা ইংরেজ এ দেশে এনেছিল, সাংসারিক সুবিধার উপায় স্বরূপে ছাড়াও বাঙ্গালী হিন্দুর তা মনে হয়েছিল পরম উপাদেয়। কারণ যাই হউক হিন্দু বাঙ্গালীর মনে এমন কিছু ছিল যা এদের অনুকূল। সেইজন্য রামমোহন রায়ের মত আশ্চর্য্য মানুষের বাঙ্গালায় আবির্ভাব হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের মত প্রাচীন শিক্ষায় শিক্ষিত পণ্ডিত এ নব বিদ্যা ও ভাব প্রচারে অগ্রণী হয়েছিলেন। এবং প্রথম প্লাবন কেটে গেলে দেখা গেল যে বাঙ্গালীর মন এ বন্যায় ডুবে মরে নি, উর্ব্বর হয়েছে। ফলে ইংরেজ যুগের বাঙ্গলা সাহিত্য—যা আধুনিক ইউরোপের প্রধান সাহিত্যগুলির তুলনায় নানা দিকে ছোট, কিন্তু কেবল সেই তুলনাতেই ছোট। কারণ ভারতবর্ষ কি এশিয়ার আর কোথায় এর তুল্য মূল্য আধুনিক সাহিত্য আজ নেই। এ সাহিত্যের একটা প্রধান বাণী নব ইউরোপের মুক্তির বাণী—মনে, সমাজে, রাষ্ট্রে। বাঙ্গালার এই মুক্তির বাণী প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে সমস্ত ভারতবর্ষের চিন্তা ও কর্ম্মকে উদ্বুদ্ধ করেছে। আর এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাঙ্গালী হিন্দু ভারতবর্ষের জাতীয়তা ও রাষ্ট্রীয় ঐক্যের যে বার্ত্তা প্রচার করেছে, বৃহৎ রাষ্ট্রীয় চেষ্টার দুরূহ পথে সাহস, নিষ্ঠা ও ত্যাগের যে আদর্শ দেখিয়েছে রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও কর্ম্মে তা ভারতবর্ষের নবজন্ম। বৃটিশ-শাসনের কলের মজুরি কেমন ক'রে করতে হয় বাঙ্গালী হিন্দু অর্দ্ধেক ভারতবর্ষকে তা শিখিয়েছিল, ভারতবাসীকে মানুষের মত বাঁচতে ও মরতে হ'লে ও কলের যে বদল দরকার এ জ্ঞানেও বাঙ্গালী হিন্দু ভারতবর্ষকে দীক্ষা দিয়েছে। প্রথম গুরুগিরির পুরস্কার সে ইংরেজের হাতে পেয়েছে। দ্বিতীয় গুরুগিরির দণ্ড-ও হাতে না পেলে প্রমাণ হ'ত সে গুরুগিরি নিষ্ফল হয়েছে।

(২)

নিষ্ফল কিন্তু হয় নি। ভারতবাসীর বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় চেতনা ভারতবর্ষে ইংরেজের সর্ব্বময়ত্বের অবসান সূচনা করেছে। ওর পরিপুষ্টিতে তার ধ্বংস। এ চৈতন্যের প্রধান উৎস যে বাঙ্গালী হিন্দু তাতে অ-বাঙ্গালী ভারতবাসীর মনে যে মোহই থাকুক ইংরেজের মনে কোনও সংশয় নেই। এই উৎসের মুখ বন্ধ করতে সাম্রাজ্যভোগী বৃটিশ শাসক সম্প্রদায়ের যে চেষ্টা হবে তা স্বাভাবিক। এ শতাব্দীর প্রথমে সে চেষ্টা হয়েছিল বাঙ্গালীর রাষ্ট্রীয় জীবনকে দু-ভাগ ক'রে। ফল হ'ল উল্টো। রুদ্ধ স্রোত বাধাকে ঠেলে ফেলে ভারতবর্ষময় ছড়িয়ে পড়ল—যার গতিবেগে ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও চেষ্টা আজকের খাদে প্রবাহিত হচ্ছে। এইবার চলেছে দ্বিতীয় চেষ্টা। পূর্ব্ব ও পশ্চিমে পৃথিবীর অবস্থা ও ভবিষ্যতের আশঙ্কা আজ এমন হয়েছে যে ভারতবর্ষের শাসন ও শোষণের পূর্ব্বরীতির বদল হয়ে উঠেছে বৃটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে প্রয়োজন। আশা আছে ওর ভিতরটা বহাল রেখে চেহারাটা বদলে দিলেই এখনকার মত কাজ চলবে। বৃটিশ শাসকেরা যখন এ দেশের রাষ্ট্র-ব্যবস্থার 'রিফর্মে'র কথা বলেন তখন সম্ভব তাঁদের মনে থাকে কথাটার ধাত্বর্থ—'ফর্ম' অর্থাৎ আকারের পরিবর্ত্তন। আর যদি বাধ্য হয়ে বাইরের আকারের সঙ্গে ভিতরের উপাদানেরও বদ-বদল ক'রে ভারতবাসীর সঙ্গে রফাই করতে হয় তবে বাকি ভারতবর্ষের মন থেকে বাঙ্গালী হিন্দুর

রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও আদর্শের প্রভাব দূর হ'লে আপোষ-নিষ্পত্তিতে বর্ত্তমান সুবিধার অনেকটাই বজায় থাকবে ব'লে ইংরেজের বিশ্বাস। বাঙ্গালী হিন্দুর 'একষ্ট্রিমিজ্‌ম্' বাদ দিলে বাকি ভারতবর্ষের 'সুইট' ও 'রিজিনেব্‌ল' হবার আশা আছে। সেইজন্য 'রিফর্মে'র শেষ কিস্তিতে বাঙ্গালী-হিন্দুকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা হ'য়েছে বাঙ্গালী মুসলমানের ভোটের চাপে। বাঙ্গলা দেশে হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের সংখ্যা বেশী। তার ফলেই বাঙ্গালার রাষ্ট্র-পরিষদে হিন্দুর চেয়ে মুসলমান সংখ্যায় আসবে বেশী, এবং তাতে বাঙ্গালী-হিন্দুর রাষ্ট্রীয় প্রভাব ও অন্য প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হবে 'রিফর্ম'-কর্ত্তারা এই ভরসাতেই নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন নি। বাঙ্গালী-হিন্দু যে ডেমক্রেসির বচন আওড়ায় তার পাটিগণিতের মারে তাকে কাবু ক'রে মজা দেখার লোভেও নয়। তাঁদের মনে এ আশঙ্কা ছিল যে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে হিন্দু-মুসলমান মিশিয়ে দিলে হিন্দুয়ানি ও মুসলমানির চেয়ে রাষ্ট্র ব্যাপারে বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের কাছে বাঙ্গলা দেশ বড় হয়ে উঠতে পারে। আর 'ওয়াইলি' হিন্দুকে বিশ্বাস কি! সেইজন্য গড়তে হয়েছে ধর্ম্মসাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন-মণ্ডলী। যাতে মুসলমান যে পরিষদে আসবে সে বুঝবে মুসলমান ব'লেই সে সেখানে এসেছে। সে মুসলমানের প্রতিনিধি দেশের নয়। আর যারা তাকে পাঠাবে তারাও জানবে রাষ্ট্রব্যাপারে তারা বাঙ্গালী নয় তারা মুসলমান; প্রতিবেশী হিন্দুর সঙ্গে এক নয়, যদিও তাদের ভাষা এক এবং রক্তও এক, আর দুঃখ-সুখের ভোগও এক। এখানেই শেষ নয়। নষ্টের গোড়া গোটা বাঙ্গালী-হিন্দু-সমাজ নয়, উচ্চ বর্ণের বাঙ্গালী হিন্দু। সুতরাং প্রয়োজন হয়েছে উচ্চ হিন্দু ও অনুচ্চ হিন্দুর মধ্যে প্রাচীর তোলা যাতে উচ্চবর্ণ বাঙ্গালী হিন্দু বাঙ্গলা দেশে একঘ'রে হয়। মহাত্মার উপবাস দৈব সুযোগ; ইংরেজের আর পাঁচটা সৌভাগ্যের মধ্যে একটা সৌভাগ্য।

(৩)

বৃটিশ যুগের প্রথম আমলে পশ্চিমের নূতন ভাব ও বিদ্যার দিকে বাঙ্গালী-হিন্দুর মত বাঙ্গালী-মুসলমান ঝুঁকে পড়ে নি। কতকটা রাজ্যাপহারী ইংরেজের উপর আক্রোশে, কতকটা সংস্কারান্ধ মৌলভি-মৌলানার বিরোধিতায়। ফলে আধুনিকতার যে নদীতে বাঙ্গালী-হিন্দু স্নান করেছে, বাঙ্গালী-মুসলমান তখন তার জলে নামে নি। প্রচলিত ধর্ম্ম ও সংস্কারকে বাঙ্গালী-হিন্দু যেমন যুক্তির বিচারে যাচাই করতে সাহস করেছে, বাঙ্গালী-মুসলমান তা পারে নি। মুসলমান রামমোহন কি মুসলমান বিদ্যাসাগর বাঙ্গলা দেশে সম্ভব হয় নাই। এই আধুনিকতা-বিরোধী, ইংরেজী-শিক্ষা পরাঙ্মুখ সম্প্রদায়ে আর্থিক সুতরাং সামাজিক বিপ্লব ঘটলো যখন ইংরেজের আপিস-আদালতে ফার্সীর বদলে প্রচলন হলো ইংরেজী ভাষার। মুন্সী মৌলভির হাতের কাজ চ'লে গেল ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দুর হাতে। তাদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একটা বড় মধ্যবিত্ত শ্রেণী গ'ড়ে উঠলো—যাদের যে শিক্ষা আন্‌লো হাতে অর্থ, সেই শিক্ষায় করলো মনকে সজীব। মুসলমান হ'য়ে পড়লো দরিদ্র এবং মনে অচল। আধুনিক কালে যখন বাঙ্গালী-মুসলমানের চেতনা হলো, এবং নব-শিক্ষায় তারা শিক্ষা পেতে লাগলো তখন রাজ-দরবার ও রাজ-সরকারের দেশী লোকের জায়গা

হিন্দুর দখলে এবং ইংরেজী বিদ্যায় উপার্জ্জনের আর যে সব পথ খুলেছে সেখানে হিন্দুর ঠাসাঠাসি ভীড়। নব-ব্রতী মুসলমানের ওস্তাদ হিন্দুর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মাথা গলান কঠিন।

বাঙ্গালী-মুসলমান সমাজের এই অবস্থায় রিফর্মের শেষ চালের লক্ষ্য ব্যর্থ হয় নি। নব-শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী-মুসলমানের সংখ্যা বাঙ্গালী হিন্দুর তুলনায় এখনও অতি অল্প। যদি হিন্দুর সঙ্গে বিনা প্রতিযোগিতায় কেবল মুসলমানত্বের খাতিরে, শিক্ষিতের সংখ্যার অনুপাতে নয়—মুসলমান সমাজের নিরক্ষরত্বের পরিমাণে শিক্ষা-সাপেক্ষ সরকারি চাকরি ও সরকার-অনুগৃহীত অর্থাগমের অন্যান্য উপায় মুসলমানের হাতে আসে তবে এই অল্প-সংখ্যক শিক্ষিত মুসলমানের অনেকেরই একটা হদিস হয়। বাঙ্গালী-মুসলমানের দারিদ্র্য কমে, শিক্ষিত মুসলমানের সন্তান সন্ততিদের শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ জীবনোপায়ের পথ হয়, দেশে বাঙ্গালী-মুসলমানের প্রতিপত্তি ও সম্মান বাড়ে। শুধু যোগ্যতার জোরে যে মুসলমান দেড়তলা উঠতে পারে না, সাম্প্রদায়িক লিফ্‌টে সে অনায়াসে তেতলা উঠে যায়। এ লোভ কম লোভ নয়। সুতরাং বাঙ্গলার রাষ্ট্র-সভায় যে ইংরেজেরা রয়েছেন প্রাপ্যের বহুগুণ সংখ্যায় রিফর্মের 'পলিসি' 'ইম্‌প্লিমেণ্ট' করতে তাদের আওতায় মুসলমান সভ্যদের যেই কিঞ্চিৎ আধিপত্য হয়েছে অমনি চড়া সুর উঠেছে মুসলমানের বিশেষ স্বার্থের। স্থানে এবং অস্থানে মুসলমান ধর্ম্মে ধার্ম্মিকের সংখ্যার অনুপাতে ভাগ-বাটোয়ারার দাবী চলেছে,—যা কখনও করুণ কখনও কমিক। এর যুক্তি এক সময় বাঙ্গালী-মুসলমানের শিক্ষার দৈন্য—যাকে অ-মুসলমানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ফেলা অন্যায়, অন্য সময় বাঙ্গালী-মুসলমানের পৌরুষ—যা রাজার জাতিতেই কেবল দেখা যায়। কখনও মুসলমানের বৃটিশ-রাজভক্তির কাহিনী, কখনও আরবদের বিশ্বজয়ের ইতিহাস। কাজেই সাম্প্রদায়িক ভাগকে আঁকড়ে থাকতে হবে প্রাণপণে, এবং সবখানে চাই তার প্রসার—মন্ত্রীগিরি থেকে পেয়াদাগিরি পর্য্যন্ত। এবং এই ভাগাভাগির মূল মালিক ইংরেজকে রাখতে হবে হাতে, কখনও চোখ রাঙিয়ে, কখনও চোখ নামিয়ে; এবং সব চেয়ে বড় কথা তার স্বার্থে ঘা না দিয়ে। তবে খোদার মেহেরবানিতে এমন দিনও আসতে পারে যখন বাঙ্গলা দেশের চাকরি-বাকরি মুসলমানের হবে একচেটে, যেমন এককালে বাঙ্গালী-হিন্দুর ছিল। মোট কথা বাঙ্গালী-মুসলমানের চাকরি চাই—চাকরি, আরও চাকরি।

(৪)

উচ্চ-বর্ণের বাঙ্গালী-হিন্দু যে ক্ষোভে ও আশঙ্কায় চঞ্চল হ'য়ে উঠবে তাতে বিচিত্র কি! যে ইংরেজীশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাঙ্গালী-হিন্দুর মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্ক এই চাকরি তাদের প্রাণস্য প্রাণঃ। সরকারি চাকরি, আধা-সরকারি চাকরি, সরকারকে যারা চালায় এবং সরকার যাদের জন্য চলে, সেই ইংরেজ-সওদাগরের চাকরি। এ শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে এই চাকরিতে, চাকরিতেই তা বেঁচে আছে, এবং চাকরির লোপে তার বিলোপের ভয়। আর এ চাকরিই যখন অন্ন তখন বাঙ্গালী হিন্দুর মন ও আনন্দ যে আধুনিক 'কালচারের' ফুল ফুটিয়েছে তার রসও আসছে সেখান থেকেই। সে 'কালচারে'র ভাল-মন্দ যা-ই থাকুক ভারতবর্ষে তা অদ্বিতীয়। এ সব চাকরির উদ্দেশ্য টাকা উপার্জ্জন হ'লেও তার

কতকগুলি বিদ্যা ও বুদ্ধিকে প্রয়োগ ক'রে সার্থক করার সুযোগ, সুতরাং আত্মতৃপ্তির মূল, এবং সম্মান ও প্রতিপত্তির হেতু। এই চাকরির যা এখন বাঙ্গালী-হিন্দুর হাতে আছে তার অধিকাংশ অন্যের হাতে যাবার সম্ভাবনায় উদ্বেগ ও আশঙ্কা স্বাভাবিক। এবং এমন লোকের হাতে যদি যায় তুলনায় যাদের বিদ্যা, বুদ্ধি ও যোগ্যতা কম তাতে ক্ষোভের কারণও আছে যথেষ্ট।

সুতরাং এর প্রতিকারের ডাকে ইংরেজীশিক্ষিত হিন্দু-বাঙ্গালীর বড় রকম সাড়া পাওয়া যাবে। সাম্প্রদায়িক ভাগাভাগি বন্ধ করতে হবে। সব অনিষ্টের মূল কারণ সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন তুলতে হবে। সে জন্য বাঙ্গালী-হিন্দুর একজোট হওয়া চাই। জাতীয় কংগ্রেসের অন্য প্রদেশের লোকেরা, যাদের অধিকাংশ হিন্দু, তারা যখন বাঙ্গালী-হিন্দুর এ বিপদকে ভারতবর্ষের বিপদ মনে ক'রে সর্ব্বস্বপণ করছে না তখন প্রয়োজন হ'লে বাঙ্গালী-হিন্দুর কংগ্রেস থেকে স'রে দাঁড়াতে হবে, 'হিন্দু মহাসভার' নামে জয়ধ্বনি দিয়ে। ভারতবর্ষের অন্য হিন্দুদের সঙ্গে মিলে সঙ্ঘ গড়তে হবে হিন্দুর স্বার্থ রক্ষার জন্য। 'হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?' মোট কথা ভারতবর্ষ ও বাঙ্গালার মুসলমান যেমন হয়েছে কমুন্যাল হিন্দুস্থানের এবং বাঙ্গালী হিন্দুকে হ'তে হবে তেমনি কমুন্যাল,—কথায় না হোক মনে এবং কাজে। মুসলমানের স্বতন্ত্র স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজন যে দেশের হিতের জন্যই 'মোসলেম লিগে'র কর্ত্তাদেরও সেই বুলি। বাঙ্গালী-হিন্দুর এই নব-লব্ধ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি যে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার প্রতিক্রিয়া তাতে সন্দেহ নেই। সেই জন্য এ সব বক্তৃতায় প্রবল উৎসাহ সঞ্চার হয়, এবং বক্তার নামে ঘন ঘন জয়ধ্বনি ওঠে। কিন্তু একটা প্রশ্নের উত্তর সব সময় উহ্য থেকে যায় বাঙ্গালা দেশে হিন্দুর চেয়ে মুসলমান সংখ্যায় বেশী। বাঙ্গালী-হিন্দু যদি বাঙ্গালী-মুসলমানের কমুন্যালিজমের আঘাতে ও অনুকরণে তাদের মতই কমুন্যাল হয় তবে মুসলমানের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি না ক'মে অবশ্য বেড়ে যাবে। হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতার ভয়ে মুসলমান-সাম্প্রদায়িকতা দূর হবে এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। ঘাত-প্রতিঘাতে দু পক্ষের সাম্প্রদায়িকতার বৃদ্ধিই হবে। দলাদলি ক'রে দলাদলি কমে না, বেড়েই যায়। এমন অবস্থায় যদি কমুন্যাল ইলেক্‌টোরেটের পরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ ডেমক্রেটিক নির্ব্বাচক মণ্ডলীর ব্যবস্থা হয় তাতে কিসের ভরসা যে মুসলমান নির্ব্বাচিত হবে এখনকার চেয়ে কম সংখ্যায়, বা যারা হবে তাদের কমুন্যাল মনোবৃত্তি হবে বর্ত্তমানের চেয়ে কম। এবং তা না হ'লে সাম্প্রদায়িক ভাগাভাগি ও বিশেষ স্বার্থের দাবী কেন দূর হবে, আর হিন্দুর হিত বা দেশের হিত সিদ্ধ হবে কেমন করে! দেশের মন যদি থাকে কমুন্যাল পুরো ডেমক্রেটিক নির্ব্বাচনের ফলে ঘোর কমুন্যাল রাষ্ট্রসভার সৃষ্টি কিছু অসম্ভব নয়। যারা আশা করেন মিশ্র নির্ব্বাচনের প্রতিযোগিতায় মুসলমানকে কুড়তে হবে হিন্দুর ভোট আর হিন্দুকে খুঁজতে হবে মুসলমানের ভোট, সুতরাং যারা ঘোর কমুন্যাল তারা বাদ পড়বে, যারা মধ্যপন্থী তারাই হবে নির্ব্বাচিত—তাদের নিরাশ হতে দেরী হবে না। রাগদ্বেষ যখন প্রবল থাকে তখন ও রকম ভোট ভাগাভাগি বেশী হয় না। তখন হিন্দুয়ানির ডাকে হিন্দু দেবে হিন্দুকে ভোট, মোসলেমের ডাকে মুসলমান দেবে মুসলমানকে ভোট, [illegible] উৎকট মুসলমান ও উৎকট হিন্দু তারাই যেতে পারবে প্রতিনিধি হ'য়ে, আপোষপন্থী কাফের ও অনার্য্য হবে একঘ'রে। এবং খাঁটি হিন্দু ও খাঁটি মুসলমানের এই মিশ্র-নির্ব্বাচনের এমন পরিণতি হতে পারে

যে বাঙ্গালী-হিন্দুকে ছুটতে হবে ইংরেজের দরবারে—ডেমক্রেটিক কুত্তা বুলিয়ে নেবার আর্জি পেশ করতে।

(৫)

বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীক দল গড়ার স্পষ্টার্থ দু পক্ষের পাল্লা দিয়ে ইংরেজের আনুগত্য করা। আমরা হিন্দু কারও অহিত করতে চাই না, শুধু চাই নিজেদের ন্যায্য স্বার্থ রক্ষা করতে; আমরা মুসলমান কারও অনিষ্ট চিন্তা করি না কেবল নিজেদের ন্যায় সঙ্গত দাবীর পুরণ চাই—এ বুলিতে সত্য উল্টে যায় না। সে সত্য হচ্ছে ধর্ম্ম-মতের তফাৎ রাষ্ট্রীয় কাজে অবান্তর। যেখানে পরাধীন দেশে সেই ভেদকে করতে হয় স্বতন্ত্র অধিকারের ন্যায়-অন্যায়ের বাটখারা সেখানে এই বিরুদ্ধ স্বার্থের 'ব্যালান্স' রক্ষার ভার যাবেই যাবে তৃতীয় পক্ষের হাতে। সে তৃতীয় পক্ষ নিরাসক্ত মধ্যস্থ নয়। নিজের দিকে পাল্লা ভারি করতে এমন কি মাপ সমান রাখতে তাকে খুসি করতে হবে। তার দাম আছে। শিক্ষিত বাঙ্গালী-হিন্দু যদি সে দাম দিতে রাজী থাকে চেষ্টা ক'রে দেখতে পারে। সে দাম হচ্ছে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান জাতীয় আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াতে হবে। কথায় না হোক কাজে হতে হবে তার পরিপন্থী। এ-দেশে ইংরেজের যে শক্তি ও সুবিধা আছে তাকে বহাল রাখতে, এবং বর্ত্তমানে তার যেটুকু লাঘব হয়েছে তার পুরণে ইংরেজের পুরো সহায় হতে হবে। বাঙ্গালী-হিন্দুর বুদ্ধির উপরে ইংরেজের কিঞ্চিৎ আস্থা আছে। দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষ বিজয়ে তার এই সাহায্য ইংরেজ স্বীকার করলেও করতে পারে। এবং তার বিনিময়ে ছোট-বড় চাকরি ও আনুষঙ্গিক প্রভাব-প্রতিপত্তির আর্জি হয় ত মঞ্জুর হবে। বাঙ্গালী-হিন্দুর স্বতন্ত্র স্বার্থ রক্ষায় হিন্দুর এক জোট হওয়ার যে ডাক সে এই পথে চলার ডাক। কিছু কাজ আরম্ভ হ'লেই তা সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠবে। জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভারতবর্ষে মহারাষ্ট্রের স্বপ্ন বাঙ্গালী-হিন্দু দেখেছে ও ভারতবাসীদিগকে দেখিয়েছে। সে আদর্শের অনুসরণে মৃত্যুপণ তার নিকট—অতীতের ইতিহাস। সে আদর্শ ও ইতিহাসকে অস্বীকার ক'রে খণ্ড খণ্ড স্বার্থের রক্ষায় বিদেশীর চিরপ্রভুত্বই কি সে বরণ করবে? গোয়ালন্দের পদ্মা কি হরিদ্বারের ঘাটে ফিরে যাবে, মহাতীর্থের পুণ্যলোভে? আমাদের যৌবনে স্বদেশীয় যুগে আমরা একটা গান গেয়েছি, যার ভাবার্থ—মার দিয়ে দেশকে ভুলাবে আমরা দেশের তেমন ছেলে নই। হাতের মারে আমরা দেশকে ভুলি নাই, ভাতের মারের ভয়ে ভুলি কিনা তার পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে। বাঙ্গালী-হিন্দু পাস না ফেল?

(৬)

তবে এ সাম্প্রদায়িক মহামারী থেকে দেশেকে বাঁচাবার কি উপায় নেই? আছে না আছে স্থির করতে এ রোগের নিদান জানা চাই। রোগ জানলেই যে তার ঔষধ আছে এমন নয়, কিন্তু রোগ-নির্ণয় না হ'লে চিকিৎসার চেষ্টাই চলে না—হাতুড়ে চিকিৎসা ছাড়া। বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক

রোগের ব্যাসিলাই উৎপত্তির প্রধান বীজাণু-ক্ষেত্র হচ্ছে শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের চাকরির দ্বন্দ্ব, চাকরি এবং প্রতিপত্তি, চাকরির ফলে প্রতিপত্তি, প্রতিপত্তির ফলে চাকরি দেশের অশিক্ষিত ও অচাকুরে হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ, যাদের নামে এবং ভরসায় এই দ্বন্দ্ব চলে, তারা করে এতে লাঠিয়ালি বিনা পেট-ভাতায় নিজের খেয়ে। এই লাঠালাঠিতে তাদের নিজের হিত কিছুমাত্র নেই, অহিত আছে ষোল আনা, দেশের সকল উন্নতির পথ বন্ধ হয়ে বা বিপথে চ'লে। ধর্ম্মের নামে অন্ধ উত্তেজনায় এই অজ্ঞানদের নিজের ভালমান্দ-বোধ লোপ হয়, আর সে উত্তেজনার সৃষ্টি করে শিক্ষিত মুসলমান ও শিক্ষিত হিন্দু নিজেদের শ্রেণীর সাংসারিক স্বার্থ ও সাংসারিক ক্ষমতা হাসিল করার অভিসন্ধিতে।

কমুন্যাল রোগের এই নিদান। অন্য সব কারণ এই মূল থেকেই পুষ্টি পেয়ে রোগকে জটিল ক'রে তোলে। সুতরাং এ রোগের চিকিৎসা দেশের জনসাধারণকে—মুসলমান চাষী ও হিন্দু চাষীকে মুসলমান কারিকর ও হিন্দু কারিকরকে, মুসলমান মজুর ও হিন্দু মজুরকে—পলিটিকাল দল গড়তে শেখান পলিটিকাল আদর্শ ও উপায়ের ভিত্তিতে। কলমা পড়া ও গায়ত্রী জপার ভেদও সাম্য দলে টানার ফন্দি ও ফাঁকিতে তাদের সচেতন করা। দেশের হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ যেদিন নিজের স্বার্থ মোটামুটিও বুঝবে, যেদিন পলিটিক্সে দীন্-এর তত্ত্ব ছেড়ে দুনিয়ার তথ্যে চোখ যাবে—শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের চাকরি প্রতিপত্তির ঝগড়ার সেই দিন সমাপ্তি হবে। কারণ যে খুঁটির জোরে লড়াই সে আর খুঁটিগিরি করতে রাজী হবে না। কলমা-গায়ত্রীর চাকরি ভাগাভাগির দ্বন্দ্ব দেশ তখন বরদাস্ত করবে না। চাকুরে হিন্দু-মুসলমানের কমুন্যাল বিষ ছড়ান বন্ধ হবে না—যতদিন না অচাকুরে জনসাধারণের নিজেদের পলিটিক্স সে বিষের থলি উপড়ে ফেলে। শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান অন্যোন্যের যুদ্ধসজ্জার ভয়ে বা যুদ্ধান্তে নিজেরাই চাকরি প্রতিপত্তির একটা রফা নিষ্পত্তি ক'রে দেশের বড় কাজে হাত দেবে সে আশা দুরাশা। চাকরির কামনা চাকরিতে শান্ত হয় না, যত পাওয়া যায় লোভ ততই বাড়ে। 'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।' কমুন্যাল রোগের চিকিৎসা দেশের চাকরি-পন্থীদের হাত থেকে দেশের পলিটিক্সকে ছিনিয়ে নেওয়া।

এ কাজ কঠিন। এ পথ চড়াই উৎরাই-এর বিষম পথ, যার মোড়ে মোড়ে বিপদ। এ পথে প্রকাশ্য ও গোপন, মুসলমান ও হিন্দু শত্রুর অবধি থাকবে না—স্বার্থনাশের যাদের আশঙ্কা। যাদের মধ্যে কাজ এবং যাদের জন্য কাজ তারাই সন্দেহ করবে ও মারমুখ হবে। তাদের উত্তেজিত করার লোকের অভাব হবে না। কমুনিষ্ট ব'লে পুলিশ লেলিয়ে দেবার কমুন্যালিষ্ট জুটবে অনেক। এ কাজের উপায় মানুষের বুদ্ধিকে জাগান, অন্ধ সংস্কারকে উস্কান নয়। সবচেয়ে কঠিন কাজ। বিশেষ সে মানুষের দলের অধিকাংশ যখন নিরক্ষর অজ্ঞান। এ কাজের যারা কর্ম্মী তাদের চেতন ও অবচেতন মনকে করতে হবে সকল রকম সাম্প্রদায়িক রাগদ্বেষের কলুষমুক্ত। এবং আচার ব্যবহারে যারা ভিন্ন তাদের সঙ্গে শত্রুতায় ক্রোধ ও ঘৃণার যে তীব্র মাদকতা তাতে মাতাল হওয়ার আনন্দ এতে নেই। বহু শ্রমে ফল ফলবে অল্প, বহু ডাকে সাড়া দেবে অল্প লোক। আশা-ভঙ্গ হবে পদে পদে। তবুও এই পথই পথ, আর সব অন্ধগলি।

এ পথেও সিদ্ধি যে অবশ্যম্ভাবী তা নয়। জাতির এমন দুর্দ্দিন আসে যখন ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্র

লোভ, অন্ধ বিদ্বেষকে দূর ক'রে তার শুভবুদ্ধি কিছুতেই জাগে না। ভারতবর্ষ ও বাঙ্গলার যদি এমন দুর্ভাগ্যই হয়, যদি জাতীয়তার কোনও মন্ত্রেই সাম্প্রদায়িক বিষ ধ্বংস না হয়—তবে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার পাল্টায়, তার আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা হয়তো অনিবার্য্য হবে। কিন্তু তাতে উৎসাহের কিছু নেই; সে আমাদের পরাজয়। এমন প্রাণী আছে পারিপার্শ্বিক যখন তাদের স্বাভাবিক জীবনলীলার প্রতিকূল হয় তখন উঁচু স্তরের প্রাণীর উপযোগী শরীরের যন্ত্রপাতি লোপ হ'য়ে তারা ধাপে ধাপে নেমে যায় আদিম ভ্রূণের পিণ্ডাকার অবস্থায়—শুভদিনের অপেক্ষায়। তবুও বেঁচে থাকে। সে বাঁচা জীবন্মৃত্যু, হিন্দু স্মৃতিকারেরা যাকে বলেছেন জীবন্ত শব। 'জীবিতা এব শবাস্তে তস্মাৎ পারশবা স্মৃতাঃ'। জাতির পারশবত্ব প্রাপ্তি জয়ধ্বনির কারণ নয়।

কমুন্যাল-সমস্যা মীমাংসার অন্য উপায় যে কল্পনা করা যায় না তা নয়। ভারতবর্ষের বাইশ কোটি হিন্দু আট কোটি মুসলমানকে দমিয়ে ইংরেজকে তাড়ালে, অথবা আট কোটি মুসলমান বাইশ কোটি হিন্দুকে দাবিয়ে ইংরেজকে খেদালে এ সমস্যার অবশ্য মীমাংসা হয়। হিন্দু-মহাসভার ভীষ্ম-দ্রোণেরা ও মোস্‌লেম লিগের সিংহ-ব্যাঘ্রেরা চেষ্টা করে দেখতে পারেন। তবে যে শক্তিতে তা সম্ভব চাকরি ভাগাভাগির উৎসাহে তার সৃষ্টি হয় না। ভাতের চুল্লীর আগুনে ড্রেড্‌নট চলে না।

(৭)

উচ্চবর্ণের বাঙ্গালী-হিন্দুর চাকরি ও প্রতিষ্ঠার উপর মুসলমানের সাম্প্রদায়িক অভিযানের একটা সুফল ফলেছে। উচ্চহিন্দু যে বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজের ক্ষুদ্র অংশ সে চেতনার সুরু হয়েছে। ভাব ও চিন্তার প্রচার অল্প লোকে করা যায়, তার সৃষ্টি করে আরও অল্প লোক, চাকরি ও প্রতিপত্তি প্রার্থী লোক অনেক হ'লে বিপদ—কিন্তু সংখ্যার চাপ যেখানে প্রয়োজন সেখানে দল বড় না হ'লে কাজ হয় না। বাঙ্গালী হিন্দুর এই সংখ্যা আছে উচ্চ বর্ণের হিন্দুর মধ্যে নয়, নীচু জাতি হিন্দুর পল্লীর ভিতরে। সুতরাং উচ্চ বর্ণের হিন্দু মুখে এনেছে যে উঁচু নীচু সব হিন্দু আমরা পরস্পরের ভাই। আমরা ভিন্ন নই, আমরা এক। এই নিম্ন শ্রেণী হিন্দুর প্রাণ-শক্তি যে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হ'য়ে আসছে, অর্থহীন ও আত্মঘাতী আচারের নাগপাশে যে তাদের হৃদ্‌পিণ্ড বন্ধ হবার উপক্রম, জীবনকে পঙ্গু ক'রে মৃত্যুকে ঘনিয়ে আনার যতরকম ফন্দী দিনের পর দিন যে তারা আবিষ্কার ক'রে চলেছে—সে দিকেও দৃষ্টি পড়েছে। এরা যে কত দুর্ব্বল, নিজের শক্তিতে কত আস্থাহীন, যেখানে এরা সংখ্যায় অল্প এবং যেখানে এরা সংখ্যার বেশী প্রতিবেশী দুর্দ্দান্ত মুসলমানের অত্যাচার যে এরা বিনা প্রতিকারে সহ্য করে, স্ত্রী কন্যার সম্মান রক্ষায় হাত তুলতে ভরসা করে না—সে বার্ত্তাও আমাদের বিচলিত করতে আরম্ভ করেছে। এ সব ব্যাপার নূতন নয়, ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের পর থেকে এদের আরম্ভ হয় নি। দু-চারটি সন্ন্যাসী গোছের প্রতিষ্ঠান ছাড়া উচ্চ-হিন্দুর ব্যাপক দৃষ্টি এতদিন এদিকে যায় নি। আজ যাচ্ছে নিষ্কাম প্রীতিতে নয়, নিজের গরজে। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। কোন আঘাতে চৈতন্য এলো সেটা মুখ্য নয়, আশার কথা যে ঘুম ভাঙ্গছে।

এর প্রতিকারের যে উপায় উচ্চ বর্ণের হিন্দু ব্যবস্থা করছে তার নাম হয়েছে 'হিন্দু-সংগঠন'।

হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুর, উচ্চশ্রেণীর সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর নাড়ীর যোগ এমন দৃঢ় করতে হবে যে এক অঙ্গের আঘাতে সমস্ত শরীর ব্যথা পাবে এবং প্রতিবিধানে তৎপর হবে। অসহায় নিম্নশ্রেণীর হিন্দুকে ভরসা দিতে হবে, কথায় ও কাজে, যে তারা অসহায় নয়,—উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত হিন্দু, যাদের অর্থ আছে, বুদ্ধি আছে, বল আছে, তারা তাদের ভাই, আপদ বিপদে সহায়, দুঃখ-সুখের ভাগী। এবং আশা করা অন্যায় হবে না যে এতে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুও উচ্চবর্ণের হিন্দুর আপদ বিপদকে নিজেদের আপদ বিপদ মনে করবে, সব কাজে তাদের অনুবর্ত্তী হবে, সংখ্যার প্রয়োজনে নিজেদের সংখ্যা দিয়ে বাঙ্গালী হিন্দুর অখণ্ড সংখ্যা বাড়াতে দ্বিধা করবে না।

যে 'সংগঠন' বাঙ্গালী-হিন্দুকে বড় ছোট অভেদে একগোষ্ঠি ক'রে গড়তে চায় তার প্রেরণা যে অবস্থার ফেরেই এসে থাকুক না কেন জাতির পক্ষে তা পরম মঙ্গলের। কিন্তু প্রথম উৎসাহের উত্তেজনার ফেনা প্রশমন হ'লেই দেখা যাবে যে, এ 'সংগঠনে'র যেসব পেটেণ্ট মাল-মশলার বিজ্ঞাপনে দেশের মনের দেয়াল ভর্ত্তি, গড়নের কাজ তা দিয়ে বেশী দূর এগোয় না। কারণ তাতে আর যা-ই থাকুক চূণ-সুর্কি নেই। ইট সাজান যায় কিন্তু তাদের জোড়া লাগান যায় না। যে আশ্চর্য্য ভ্রাতৃত্বে ভাই-এর স্পর্শ অশুচি, তার হাতের অন্ন অমেধ্য, তার সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধ পাতিত্য আনে—সেই আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃত্ব দিয়ে কোনও রকম ব্যবহারিক একত্ব-বন্ধন সম্ভব নয়। 'অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, মন্দিরের দ্বার মোচন, হাতের জল-চল—এ সব উপসর্গের চিকিৎসা, রোগকে বহাল রেখে। রোগ থাকতে উপসর্গ দমন করা যাবে কিনা সন্দেহ। আর যদি যায় তবে সে রোগ যে অন্য উপসর্গের আকারে অচিরেই আত্মপ্রকাশ করবে তা নিঃসন্দেহ। হিন্দু-সমাজের সেই মূল রোগ হচ্ছে জাতিভেদের গণ্ডী। ওর অভেদ্য খোলার আবরণ সমস্ত সমাজে এক নাড়ীর যোগ স্থাপন অসম্ভব করেছে। 'হিন্দু-সংগঠন' যদি প্রকৃতই সে কাজ করতে চায় তবে ঐ গণ্ডী তুলতে হবে, ঐ খোলা ভাঙ্গতে হবে। জাতির খোপ খোপ যেমন আছে তেমনি থাকবে শুধু ভাই ব'লে ডাক শুনে সমস্ত হিন্দু হবে একমন একপ্রাণ—এ আশা নিজেকে বঞ্চনা করা, পরকে ফাঁকি দেওয়া। সামাজিক অসম্বন্ধের গভীর পরিখায় যে ভেদ সুস্পষ্ট নামের জোরে সে ভেদ অভেদ প্রমাণ হবে না, কলিতে নামের মাহাত্ম্য যতই প্রবল হোক। আর এ সব বর্জ্জন-মোচন আন্দোলনের মধ্যে যে মনুমেণ্ট-স্পর্শী দম্ভ রয়েছে কেবল শুনে শুনে গা সওয়া হয়েছে ব'লেই আমরা তাতে লজ্জা পাই নে। আমাদের স্পর্শ পেলে নিম্ন হিন্দু কৃতার্থ হবে এ রামচন্দ্রত্বের অভিনয় উচ্চবর্ণের হিন্দু করে কোন লজ্জায়! আমাদের দেবমন্দিরে ঢোকার অধিকারে চণ্ডাল হবে ধন্য দেবতার এ অপমান তারা করে কোন সাহসে যারা গর্ব্ব ক'রে বলে হিন্দুর 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'।

(৮)

এ প্রস্তাবে তর্ক উঠবে জানি—ইতিহাস, বিজ্ঞান, শাস্ত্রের তর্ক। এমন কোন প্রস্তাব আছে পণ্ডিত লোকে যাকে গ্রাহ্য অগ্রাহ্য দুই-ই প্রমাণ করতে না পারে।

অতি বুদ্ধিমান লোকে বলে হিন্দু-সমাজে উঁচু জাত যে তার নীচু জাতের হাতে ভাত খায় না, তাদের মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ যে নিষেধ,—তার মধ্যে ঘৃণা অবজ্ঞার লেশ নেই। ওটা শুধু আচার, যেমন অনেক বিধবা মা ছেলের হাতের ছোঁয়া খান না। তফাত কেবল এই শূদ্রের উপর ব্রাহ্মণের মনোভাব ছেলের উপর মায়ের স্নেহ নয়, অন্তত শূদ্র তার কোন প্রমাণ পায় না। অন্য সমস্ত গুণ-

দোষ নিরপেক্ষ কেবল জন্মের ফলে একদল লোকের শ্রেষ্ঠত্ব ও অন্য দলের হীনত্ব জাতিভেদের ভিত্তি। মনু বলেছেন বটে যে ব্রাহ্মণের শাস্ত্রোক্ত গুণ নেই সে হচ্ছে তেমনি ব্রাহ্মণ যেমন কাঠের হাতীও হাতী। কিন্তু সেই পুতুল ব্রাহ্মণেরও শূদ্রের মেয়ে বিয়ে করলে জাত যায়, সে শূদ্রের যতই ব্রাহ্মণোচিত গুণ থাকুক না কেন। নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বোধ ও অন্যের হীনত্বের ধারণা এক বস্তুর দুই পিঠ। একটি ছেড়ে অন্যটি থাকে না। জাত অল্প নীচু হ'লে তার উপর অবজ্ঞা, আর বেশী নীচু হ'লে তার উপর ঘৃণা এর অবশ্যম্ভাবী ফল। অবশ্য এই অবজ্ঞা ও ঘৃণা যখন দু পক্ষের একান্ত অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন যে ঘৃণা করে তার সে মনোভাবে কোনও তীক্ষ্ণতা থাকে না, যে ঘৃণা পায় তারও অপমানবোধ থাকে না। ব্যাপারটা দু পক্ষের রোদ-বাতাসের মত স্বাভাবিক মনে হয়। দাসত্বের ইতিহাসে বার বার তা প্রমাণ হয়েছে। এটা ঘৃণার অভাব নয়, ঘৃণার চরম ও ভয়ঙ্কর পরিণতি। যাক এ মনস্তত্ত্বের তর্কে লাভ নেই। যাদের বাঁচিয়ে 'আচার' তারা একে অপমান ব'লে মনে করতে আরম্ভ করেছে। শিক্ষিত ও উচ্চ শিক্ষিতের সংখ্যা তাদের মধ্যে যত বাড়বে এ অপমানবোধ তত বেশী হবে, এবং জাতের দেয়াল আঁকড়ে থাকলে উচ্চবর্ণের হিন্দুর সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ হবে অনতিক্রমণীয়। এর লক্ষণ চার দিকে দেখা যাচ্ছে। 'হিন্দু-সংগঠনে' যারা উদ্যোগী একে উপেক্ষা করার তাদের উপায় নেই।

ইতিহাসের তর্ক কম নয়। এ জাতিভেদ ত হিন্দু-সমাজে হাজার হাজার বছর রয়েছে। আর হিন্দু-সভ্যতা আজও টি'কে আছে। কোথায় অন্য সব প্রাচীন সভ্যতা! হিন্দু-সভ্যতা যে টি'কে আছে, অর্থ তার যা-ই হোক, আর এক কালে যে সে সভ্যতা গৌরবের ছিল—সেটা জাতিভেদের ফল নয়, জাতিভেদ সত্ত্বেও—অন্যগুণে এবং পারিপার্শ্বিকের অনুকূলতায়। বাইরের আঘাত যেই প্রবল হয়েছে অমনি ঐ দুর্ব্বলতা তাকে আচ্ছন্ন করেছে। শরীরে অনেক রোগের বীজ থাকে। তা সত্ত্বেও মানুষ বেঁচে থাকে মোটামুটি সুস্থ অবস্থায়, শরীরের অন্য শক্তি যতদিন রোগের বীজ চেপে রাখতে পারে, এবং পারিপার্শ্বিক যতদিন বীজ থেকে রোগ প্রকাশের অনুকূল ক্ষেত্র তৈরী না করে। যখন তা ঘটে তখন জীবন-যাত্রার প্রণালী বদলাতে হয়, রোগ প্রতিষেধের বিশেষ উপায় করতে হয়। সহজ কথা অবস্থা বদলেছে, বাঁচতে হ'লে ব্যবস্থা বদলাতে হবে। সেইজন্য হিন্দুর 'স্মৃতি' বার বার বদল হয়েছে, এবং এক মুনির সঙ্গে অন্য মুনির মতের মিল নেই।

তর্কটা যখন পণ্ডিত লোকেই তোলে তখন দু একটা কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া অবান্তর নয়। হিন্দুর জাতিভেদের আজ যে চেহারা,—ভাতের হাঁড়ির শুচিতা, ও বিবাহে পাথরের বেড়া,—হিন্দু-সভ্যতার গৌরবের দিনে তার এমন আকার ছিল না। আপস্তম্বের স্মৃতিতে দেখি পাকটা ছিল আর্য্যাশ্রিত শূদ্রের কাজ, কেবল নামটা দেওয়া হয়েছিল পাকযজ্ঞ। অনুলোম বিবাহ হিন্দু-সভ্যতার গৌরবের শেষ যুগ পর্য্যন্ত চল্‌তি ছিল; স্মৃতিগ্রন্থের পাতায় নয়, সামাজিক ব্যবহারে। একটা দৃষ্টান্ত দিই। বাণভট্ট মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক; হিন্দু-সভ্যতার গৌরবের শেষ যুগ, অনেকের মতে সব চেয়ে গৌরবের যুগ যখন সে সভ্যতা সমস্ত এশিয়ায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত হয়েছিল। বাণভট্টের বংশ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের বংশ। যার পরিচয়ে তিনি 'কাদম্বরী'র প্রস্তাবনা শ্লোকে বলেছেন যে, অনেক গুপ্ত রাজারা তাঁর পূর্ব্বপুরুষের পাদপল্লব অর্চ্চনা করেছেন। তাঁদের বাড়ীর পোষা শুকপক্ষীও ক্রমাগত

শুনে শুনে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতো। সেই বাণভট্ট 'হর্ষ-চরিতে' বিনা দ্বিধায় লিখেছেন যে তিনি তাঁর পিতার ব্রাহ্মণী-পত্নীর পুত্র, কিন্তু তাঁর আর দুটি ভাই আছে যারা তাঁর পিতার শূদ্রা-স্ত্রীর সন্তান; তাদের নামও তিনি দিয়েছেন। সেদিনকার উচ্চ ব্রাহ্মণ-সমাজে যদি এমন বিবাহে বিন্দুমাত্রও দোষস্পর্শ থাকতো, বাণভট্ট সে কাহিনী কখনই লিখতেন না!

কিন্তু 'বায়লজি' কি এ প্রস্তাবের বিরোধী নয়? হিন্দু-সমাজে এই যে উঁচু-জাতি নীচু-জাতির ভেদ, এ কি কতকগুলি বিশেষ শ্রেষ্ঠ গুণকে রক্ত-মিশ্রণে লোপের আশঙ্কা থেকে বাঁচিয়ে চিরকালের জন্য রক্ষা করার ব্যবস্থা নয়? এ ভেদ তুলে দিয়ে একাকার করলে কি বহুকালের এই গুণের পুঁজি তছরুপ হবে না? বাঙ্গালী-ব্রাহ্মণ ও বাঙ্গালী-শূদ্রের দিকে তাকিয়ে, ও শিক্ষা সমান পেলেও তাদের বুদ্ধির তারতম্যে, যাঁরা জাতির তফাত দেখতে ও ধরতে পারেন, তাঁরা নিশ্চয় অসামান্য লোক! বাঙ্গালী-ব্রাহ্মণের ফর্শা চামড়া, কটা চামড়া, কাক-কৃষ্ণ চামড়া; উঁচু নাক, খাঁদা নাক; লম্বা মাথা, গোল মাথা সব দেখেও তাদের রক্তের বিশুদ্ধতায় যাঁরা বিশ্বাস হারান না, তাঁদের বৈজ্ঞানিক মতের দৃঢ়তাও অসাধারণ! মানুষে মানুষে ভেদ আছে, বুদ্ধির, শক্তির, নানা পটুতার—যা জন্মগত; কোনও শিক্ষার বলে সে ভেদ লোপ করা যায় না। এর চেয়ে স্পষ্ট সত্য আর কি আছে! কিন্তু যারা প্রমাণ করতে চান যে, হিন্দুর জাতিভেদ মানুষে মানুষে এই স্বাভাবিক প্রভেদের রেখা ধ'রে নিজের গণ্ডী এঁকেছে তারা 'বায়লজির' নাম নেন বৃথা। 'বায়লজি' কেবল প্রমাণ করবে যে এই কল্পনার সঙ্গে পরীক্ষিত সত্যের, সুতরাং বিজ্ঞানের কোনও সম্বন্ধ নেই। জাতি-ভেদ তুলে দিলে হিন্দু-সমাজ একাকার হবে না। অন্য আর সব সমাজের মত নানা স্বাভাবিক ভেদ বজায় থকেবেই। যেমন শিক্ষিত পরিবারের সঙ্গে অশিক্ষিত পরিবারের বিবাহ সম্বন্ধ ঘটবে কদাচিৎ। এবং শিক্ষিত হবার সামর্থ্যই প্রমাণ দুই পরিবারে জন্মগত গুণের অমিশ্রেয় প্রভেদ কিছু বর্ত্তমান নেই।

প্রাচীন হিন্দু আচার্য্যেরা জাতিভেদের গুহাহিত এই 'বায়লজি'র তত্ত্ব অবশ্য অবগত ছিলেন না। মনুর 'ভাষ্যে' মেধাতিথি প্রশ্ন তুলেছেন ব্রাহ্মণজাতি ও শূদ্রজাতির এই যে ভেদ—এ কেমন ভেদ? এ কি গোজাতি ও অশ্বজাতির যে দৃষ্ট ভেদ, তাকিয়ে দেখলেই দেখা যায়, সেই রকম ভেদ? অবশ্য নয়; কারণ দেখে কেউ বলতে পারবে না কে ব্রাহ্মণ কে শূদ্র। সুতরাং এ ভেদ অদৃষ্ট শাস্ত্রীয় ভেদ, লৌকিক জ্ঞান দিয়ে এর ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু এ কালের সনাতনপন্থীরা মীমাংসকদের লৌকিক অলৌকিক জ্ঞানের তফাত মানেন না। হিন্দু-ধর্ম্মের 'বৈজ্ঞানিক' ব্যাখ্যায় সুবিধা পেলেই তাঁরা রাজী। প্রাচীন ঋষিদের অভ্রান্ত জ্ঞানের উপর তাঁদের অগাধ ভক্তি, এবং আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের জড়বাদের উপর তাঁদের অসীম অবজ্ঞা। কিন্তু ও বিজ্ঞানের কোনও কিছু তাদের সনাতন মতের সমর্থক মনে হ'লেই তৎক্ষণাৎ তা লুফে নেন। কিছু আশ্চর্য্য নয়। তাঁরা আঁকড়ে থাকতে চান তাঁদের সংস্কারগুলিকে, বিনা বিচারে ও বিশ্লেষণে। যদি ঋষি-বাক্য পাওয়া যায় ভালই। আর যদি জড়বাদী ম্লেচ্ছ বৈজ্ঞানিকের সমর্থন পাওয়া যায় সোভি আচ্ছা।

যাঁরা বলেন জাতিভেদ হিন্দু-ধর্ম্মের অত্যাজ্য অঙ্গ, ওকে না মানলে ধর্ম্ম হানি হয়, এবং ঐহিকের সুবিধার জন্য পারত্রিক ক্ষতি মূর্খতা—তাঁদের সঙ্গে কোনও তর্কই নেই। বাঙ্গালা দেশে ও ভারতবর্ষে হিন্দু বাঁচুক কি মরুক সেটা বড় কথা নয়, জাতিভেদের শুচিতা রক্ষা তার চেয়ে অনেক বড়

কথা। তাঁরা সে শুচিতা সযত্নে রক্ষা করুন। তাঁদের অশূদ্রস্পৃষ্ট স্বর্গের দরজা কেউ অবরোধ করবে না।

(৯)

এতকালের অভ্যস্ত প্রথা বর্জ্জন করতে বহু-তর্ক ও বহু আন্দোলনের ফলেও সমস্ত বাঙ্গালী-হিন্দু একমত হবে সে আশা কেউ করে না। এবং এখানে ওখানে দুচার জন ন্যায় ও ধর্ম্ম-বোধে জাতি বর্জ্জন করলে তারা একঘরে হওয়া ছাড়া বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজের উপরে তার অন্য ফল আর কিছু ফলবে না। বাঙ্গালী-হিন্দুর মধ্যে এ সংস্কার আনার পথ ওকে জাতীয় আন্দোলনের অংশ করা। যারা মনে করে এবং আন্দোলন আলোচনার ফলে মনে করবে ও ভেদের লোপ জাতির জীবন ও পুষ্টির জন্য আজ একান্ত প্রয়োজন তাদের দল বেঁধে ওকে বর্জ্জন করতে হবে। হিন্দু থেকে ও হিন্দু-সমাজের মধ্যে থেকে জাতিভেদকে অগ্রাহ্য করতে হবে। প্রথম থেকেই সে দল ছোট হবে না, এবং তাকে একঘরে করার চেষ্টা হবে অর্থহীন। দলাদলি অবশ্যই আরম্ভে থাকবে কিন্তু মনে হয় বেশী দিন নয়। ও সংস্কারের মধ্যে সত্যের ও মনুষ্যত্বের যে ভিত্তি এবং প্রয়োজনের যে তাগিদ আছে তাতে অল্পদিনের মধ্যে বিরোধীরাই হবে একঘরে। এবং ফল দেখে চোখের ঠুলি একবার খুললে স্বাভাবিককেই মনে হবে স্বাভাবিক।

এ কাজ অবশ্য আরম্ভ করতে হবে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর। জাতের গণ্ডী তারা না তুললে শুধু তাঁদের উপদেশে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু নিজেদের সব অদ্ভুত ভেদ তুলে দেবে এ মনে করা মূঢ়তা। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর অনুকরণেই বাঙ্গালী নিম্নবর্ণের হিন্দুর মধ্যে জাতির বিভাগ হচ্ছে আদিম cell-এর মত। এক হচ্ছে দুই, দুই হচ্ছে চার। এবং বিবাহের ক্ষেত্র সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হয়ে বহু শ্রেণীর হিন্দু চলেছে লোপের মুখে। উপদেশ বৃথা। নিজেরা জাত তুলে দিয়ে জাত যে তোলা যায় তা দেখাতে হবে। 'আপনি আচরি ধর্ম্ম পরেরে শিখায়।'

জাতিভেদের উচ্ছেদে বাঙ্গালী-হিন্দু যে কেবল নিজেদের যথার্থ এক মনে ক'রে গাঢ়ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হবে তা নয়। ঐ সংস্কারের চেষ্টায় ও ফলে তার মধ্যে যে শক্তি আজ রুদ্ধ আছে তা প্রকাশের পথ পাবে। এবং তাতে বাঙ্গালী-হিন্দুর হবে নবজন্ম, নবশক্তি ও নবদৃষ্টি নিয়ে। বাঙ্গালী-হিন্দু আধুনিক ভারতবর্ষকে ভাব ও আদর্শ কম দান করে নি। তার এ চেষ্টা সফল হ'লে ভারতবর্ষের সমস্ত হিন্দুর উপর তার ফল ফলতে দেরী হবে না।

(১০)

ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। অনেকে মনে করেন এ যুদ্ধ ক্রমে পৃথিবীব্যাপী হবে, এবং ভরসা করেন তার ফলে মানুষের মধ্যে আসবে এক নবযুগ—'নিউ অর্ডার'। জাতির সঙ্গে জাতির ও দেশের সঙ্গে দেশের অত্যাচারী অত্যাচারিতের সম্পর্ক আর থাকবে না। পৃথিবীর মানুষ হবে

একগোষ্ঠি, সকলের দরদে হবে সকলে দরদী। এমন যদি ঘটে তবে কথাই নেই। কোথায় থাকবে বাঙ্গালা দেশে ও ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া, আর কোথায় থাকবে বাঙ্গালী-হিন্দুর জাতিভেদ ও দুর্ব্বলতা। মহাযুদ্ধের মহাম্যাজিকে ও সব ছোটখাট ব্যাপার কোথায় তলিয়ে যাবে লক্ষ্যই হবে না। বিনা চেষ্টায় আপনাআপনি হয়ে যাবে তাদের মীমাংসা।

মানুষের বাইরের ও মনের সভ্যতাকে ধাপে ধাপে টেনে তুলতে হয় প্রাণান্ত পরিশ্রমে। কখনও এক ধাপ উঠে আবার নীচে গড়িয়ে পড়ে। পরিশ্রমের শেষ নেই, আশা-ভঙ্গেরও অবধি নেই। যুগ-যুগান্তব্যাপী এই সংগ্রাম জয় হ'য়ে যাবে একটা মাত্র বিরাট হত্যাকাণ্ডে—কার না আকাঙ্ক্ষা যায় বিশ্বাস করতে! 'মিরাকেলে' বিশ্বাসের তাই ত মূল।

কুরুক্ষেত্রের ফলে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা হ'য়েছিল। দাম্ভিক দুর্য্যোধনের রাজ্যহানি ও মৃত্যু, এবং মিষ্টভাষী যুধিষ্ঠিরের জয় ও রাজ্যলাভ এ ছাড়া সে ধর্ম্মরাজ্যের স্বরূপ কি ছিল বেদব্যাস কিছু বলেন নি।



ছোট ভাবী

শ্রীভবেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

আলোহীন শ্বাসরোধকর সাত দিনের বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। সমস্ত বিলের ফসলের মাথার উপর দুই তিন হাত জল বাতাসে ঢেউ তুলিয়া চলিয়াছে। বাড়ীর পাশের খালে যেখানে চ'রোলঙ্কার ক্ষেত ছিল, সেখানে এক তালের উপর জল দুরন্ত স্রোতে বিল ভাসাইতেছে। আটটি কুমড়া আর জলে ডোবা চারি সের চ'রোলঙ্কা লইয়া স্বামী হাটে গিয়াছে। ঘরে চাউল নাই। সন্ধ্যার কত পরে হয়ত চারি সের চাউল আর এক পোয়া তৈল লইয়া অন্ধকারে কাশিতে কাশিতে স্বামী ঘরে ফিরিবে।

গেল বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবল জলে সকল ফসল ভাসাইয়া লইয়া গেল। রাত্রে খাইয়া-দাইয়া ঘর-সংসার সারিয়া তাহারা শুইল, আর সকাল বেলায় উঠিয়া দেখিল—জল, নিষ্ঠুর জল, খালের মুখ দিয়া প্রবল স্রোতে বিলে পড়িয়া সমস্ত ফসল ডুবাইয়া, ঢেউ তুলিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে।

তাহাদের আজ আর কিছুই নাই। আউড়ির ধান ফুরাইয়া গিয়াছে; মাটীতে পোঁতা পঁচিশটি টাকা, গায়ের গহনা, দুই বিঘা জমি, সবই গিয়াছে। জল, অসময়ের অশান্ত নিষ্ঠুর জল, ফসলের মাথার উপর তিন হাত উঁচু হইয়া, তাহাদের সর্ব্বনাশ করিয়া, দুই বৎসরের এমন কি সারা-জীবনের প্রাণশক্তি নিঃশেষ করিয়া তাহাদের জীবন-ধারায় এক আকস্মিক পরিবর্ত্তন আনিয়া চলিয়া গিয়াছে।

শুকনা দিনের পার হইতে সবুজ ধানের মাথা নোয়াইয়া, পালা-দেওয়া কাটা আউশ ধানের ভ্যাপ্‌সা গন্ধ তাহার নাকে লাগে। তাহার মন কেমন করিতে থাকে।

ও-বাড়ীর ছোট ভাবী এমনি করিয়া ভাবিয়া চলে।

আহাম্মদের ছেলে রহমান খালের জলে নৌকা ভাসাইয়া গান গাহিয়া চলিয়াছে। রহমান! রহমান! কত দিন, কত বৎসর আগে এক রহমান ছিল সেই ছিলুমপুরে। তাহার ঘরে কত লোক, কত গরু, কত গোলাভরা ধান, কত মনভরা খুশী। জল নাই সে দেশে, ধান মরে না সেখানে। আউশ ধান সেখানে এখনও কত পালায় সাজান আছে, ছয়টি গরু এখনও সেখানে ধান মাড়িতেছে, আর ছেলেমেয়েরা হয়ত ল্যাম্পো জ্বালাইয়া দুধ দিয়া ভাত খাইতেছে।

রহমান! দরজার ফাঁক হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া ঈষৎ হাসিয়া তাহার গাল টিপিয়া দিত রহমান। অন্ধকার রাত্রে চুপি চুপি ডাকিয়া ঘরের কোণে ফিস্ ফিস্ করিয়া মধুর মত কথা কহিত রহমান। বছির সাজিয়া 'ও আমার কালিজা ফাটেরে গুণা' বলিয়া গুণোযাত্রায় গাহিয়া তাহার বুকে ব্যথা দিত রহমান!

রহমান! সেই রহমান! যাহাকে লইয়া সে স্বপ্ন দেখিত, সংসার পাতিত, ছেলেমেয়ে হইবে ভাবিত, ছেলের নাম মজনু আর মেয়ের নাম লাইলি রাখিত, যাহাকে লইয়া সুখে আনন্দে, হাসি গানে, গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, দালান-দেওয়া বাড়ী, লোকজন, আর মজনু লাইলিকে কোলে

করিয়া বাস করিবে ভাবিয়াছিল, সেই কত বছরের আগের টেরিকাটা মনভোলান কালো চেহারার প্রথম স্বামী তাহার রহমান।

বাহিরের খালে জলস্রোত বহিয়া চলে, বিলের উপর অসীম জলরাশি নাচিয়া বেড়ায়; আর তাহারই দিকে তাকাইয়া ছোট ভাবী রুদ্ধ বেদনায় অসহায় বোধ করিতে থাকে।

* * *

চ'রোলঙ্কার ক্ষেতে আর লঙ্কা নাই, মাচার কুমড়া ফুরাইয়া গিয়াছে। হাট হইতে ধান কিনিয়া চাউল বানাইয়া তাহারা বিক্রয় করে, আর তাহার লাভ দৈনিক তিন চারি আনা, তাহা দিয়াই সংসার চালাইয়া লয়।

সেদিন দুপুর বেলায় ছোট ভাবী কাঁদিতে কাঁদিতে ভিজা কাপড়ে বাড়ী ফিরিয়া স্বামীকে কহিল যে, এত সহ্য হয় না, ও বাড়ীর দানেজ ঘাটে ছিল, সে ইঙ্গিতে তাহাকে কি অপমান করিয়াছে। সব সয়, কিন্তু এমন অপমান সহ্য করা অসম্ভব।

স্বামী ক্ষেপিয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া বলিল যে, দানেজশালার মাথা সেদিন মাটীতে না মিশাইয়া তাহার আর কোন কাজ নাই।

ছোট ভাবী প্রমাদ গণিল। সে স্বামীকে জানে, রাগিলে সে বাঘের মত সাংঘাতিক। নরম সুরে কহিল যে, দোষ কাহারও নহে, দোষ তাহাদের কপালের। ভাবী আরও অনেক কথা কহিল।

স্বামী বুঝিল, ঠাণ্ডা হইয়া দুর্ভাগ্যের কথাই মনে করিল। তাহার মন ভারী খারাপ হইয়া গেল। বার বার মনে করিল, ছোট ভাবীর কাপড় ছিঁড়িয়াছে, একখানার দাম আঠারো আনা, আর দিনে আয় হয় তিন চারি আনা। আস্তে আস্তে হুঁকা কলিকা লইয়া তামাক সাজিয়া টানিতে টানিতে কত কথাই সে ভাবিতে লাগিল। বাল্যকালে সে দুধভাত ছাড়া খায় নাই। বাড়ীতে তাহার কত লোক। পাঁচ দিনের কলেরায় তাঁহাদের সব গেল। অবশিষ্ট রহিল সে। সেই অবধি কত বিপদের মধ্য দিয়া একা একা সে এই গ্রামে বাস করিতেছে। বাপ, মা, দাদা, আর দাদীর শ্রাদ্ধে, তারপর দুইবার বিবাহ করিতেই তো তাহার দশ বিঘা জমি চলিয়া গেল, গোলাপালা গেল, সব গেল। যাহাও ছিল তাহাও আজ দুই বৎসরের প্রবল বন্যায় শেষ করিয়া দিয়াছে। নতুবা দানেজ, ওই পাঁচ বিঘা জমিওয়ালা দানেজ—আজ কোন্ সাহসে তাহার স্ত্রীকে বিদ্রূপ করিতে পারে। কপালে এতও ছিল।

হঠাৎ তাহার মনে পড়িল—সেদিন হাটে সে এক অপূর্ব্ব বিচারের খবর শুনিয়াছে। তাহার নাম শালিশী বোর্ড (Debt Settlement Board) বন্ধকী জমি ছাড়াইতে আর টাকার দরকার হয় না, সে যত বৎসরের দেনাই হউক না কেন। আবার নাকি উলটা টাকা ফেরত পাওয়া যায়। তাহা হইলে সে তাহার জমিগুলি ছাড়াইবার চেষ্টা দেখিবে। হয়ত নজীম বিশ্বাস, বাবর মুন্সী আর এনাৎ ফকীরের নিকট হইতে সে একটি মোটা টাকা ফেরৎ পাইবে। জমি ফেরত পাইবে। তাহার বাবার জমি, দাদার জমি তাহার বংশের নিজস্ব জমি, দশ বিঘা জমি সে ফেরত লইবে, সে টাকা পাইবে।

যাহারা তাহার বাপ পিতামহের ন্যায্য সম্পত্তি হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছে তাহাদের সে শিক্ষা দিবে, আর দেখাইবে—সেও বড়লোক হইতে পারে। সে দেখিল—আগামী সন সে বড়লোক হইয়াছে। ছোট ভাবীকে সে ডাকিয়া কহিল—'শুনেছ ? ও, শুনেছ ?'

ছোট ভাবী কাপড় ছাড়িয়া পান খাইয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

স্বামী তাহার দিকে তাকাইয়া মিটিমিটি হাসিতে হাসিতে কহিল, 'সামনের বছর, বুঝলে, আমরা বড় লোক হব।'

ছোট ভাবী অবিশ্বাসের হাসি হাসিল। স্বামী উত্তেজিত হইয়া কহিল, 'ঠিক বুঝলে, ঠিক আমরা বড়লোক হব, শালীশ বোড, শালীশ বোডে যাবো।'

ছোট ভাবী তবুও বুঝিতে পারে না—কোন্ কারণে, না খাইতে পাওয়া দারিদ্র্যের কোন্ অবকাশে এই অশান্ত আশা তাহার স্বামীকে উন্মত্ত করিয়াছে।

স্বামী উত্তেজিত স্বরে শালীশ বোর্ডের অপূর্ব্ব বিচারের কাহিনী বিবৃত করিয়া পরম বিশ্বাসের সহিত কহিল, 'দেখো, আমার কথা কেমন সত্যি হয়। ওই ওখানে একটা গোলা বাঁধবো, বুঝলে ?' সে দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল। ছোট ভাবী আনন্দে অধীর হইয়া স্বামীর মুখের দিকে হাসিমুখে তাকাইয়া রহিল।

* * *

অনেক রাত্রে স্বামী বাড়ি ফিরিল হাট হইতে। আধপোয়া তামাক, একটি পোনামাছ, একখানি মসজিদপেড়ে কাপড় লইয়া স্বামী ঘরে ফিরিয়াছে। ছোট ভাবী বেসাতি নামাইয়া হাসিয়া কহিল, 'ভাল তো, বড় ভাল কাপড় হয়েছে।'

স্বামী কহিল, 'তোমার জন্যেই তো আনলাম!' সে 'হে হে' করিয়া হাসিতে লাগিল।

সানন্দে ছোট ভাবী কহিল, 'আজ তোমাকে ঝালবাঁটা দিয়ে চচ্চড়ি রেঁধে খাইয়ে দেবো।' স্বামী পরম আনন্দে হাসিতেই লাগিল।

* * *

ছোট ভাবী নূতন কাপড় পরিয়া শুইয়াছিল। অর্দ্ধেক রাত্রে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, অদূরে বিলের ঢেউয়ে, খালের স্রোতে চাঁদের আলো পড়িয়া চক্চক্ করিতেছে।

ওই ওখানে আগামী সনেই স্বামী গোলা বাঁধিবে, বাড়ির ঘর বদল করিয়া চৌরী ঘর বাঁধিবে, সারা বাড়ি ধান পল বিছাইয়া থাকিবে। পালা দেওয়া ধানের, গাদা দেওয়া পলের গন্ধ, গলায় ঘন্টি দেওয়া বলদের পায়ের শব্দ আর গরুর গাড়ির ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ধরিল।

অদূরে স্বামী শুইয়া ছিল। তাহার গোঁপদাড়ি, তাহার বুকের ছাতি, হাতের মাংসপেশী আর নিশ্বাসের শব্দ ছোট ভাবীর মন ভোলাইল। তাহার স্বামীর মত স্বামী আর কাহারও নাই। সে নূতন কাপড় দেয়, সামনের সন ওই ওখানে গোলা বাঁধিবে। তাহার স্বামী খুব ভাল।

চাঁদের আলোয় একছিলিম তামাক সাজিয়া ছোট ভাবী স্বামীর গায়ে ঠেলা দিল। স্বামী ওঁ ওঁ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। ভাবী কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে আবার ঠেলিল। স্বামী চাহিয়া দেখিয়া কলিকা ও হুঁকা লইয়া 'এঃ' বলিয়া উঠিয়া বসিল। ভাবী বারান্দার পাশের দিকে বসিয়া কহিল, 'কেমন চাঁদ উঠেছে!'

স্বামীর নাকে নূতন কাপড়ের সঙ্গে ভাবীর গায়ের গন্ধ ভাসিয়া আসিল। নূতন কাপড়পরা ভাবীর দিকে তাকাইয়া সে দাঁত বাহির করিয়া 'হ্যা হ্যা' করিয়া হাসিতে লাগিল। ছোট ভাবী স্বামীর বুকের ছাতি, হাতের পেশী, মুখের দাড়ি দেখিতে দেখিতে ধারাল হাসিতে চোখ টানিয়া তাকাইয়া রহিল।

তাহার স্বামী খুব ভাল। সে নূতন কাপড় দেয়, আগামী সন ওই ওখানে গোলা বাঁধিবে।

হাতের কাচের চুড়ি বাজাইয়া, রূপার নাকছাবি ঘুরাইয়া, নূতন কাপড়ের পাড় উড়াইয়া এই কয়দিন ছোট ভাবী প্রাণ ভরিয়া কাজ করিয়াছে। রান্নাঘরের সমস্ত ছোট হাড়ি, মেটে কড়াই, বড়ঘরের জলের কলসী, পানের পাত্র আর ছেঁড়া বিছানাগুলি সবই সাজাইয়া গুছাইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া দিয়াছে। তিনটা শিকার জো তুলিয়াছে আর সেই সঙ্গে ধান ভানিয়া স্বামীকে হাটে পাঠাইয়া নিত্যকারের খোরাক জোগাড় করিয়াছে।

কিন্তু হঠাৎ একদিন স্বামী হাট হইতে ফিরিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। পা ধোওয়ার জল ও সাজা তামাক লইয়া ভাবী কত সাধাসাধি করিল, স্বামী কথা কহিল না। ভাবীর মন আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল।

ভাত খাইতে গিয়া স্বামীর মুখে কিছুই ভাল লাগিল না। ভাবীর দিকে কটমট করিয়া তাকাইয়া কহিল, 'কারো বউ হতে গেলে এমন ব্যাগারে চলে না বুঝলে?'

ইহার পর ব্যাপার অনেকদূর গড়াইল। ভাবী রাগিল, স্বামী রাগিল, কথা কাটাকাটি হইল এবং ভাতের থালা উঠানে পড়িয়া ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠিল। স্বামী দ্রুত উঠানে নামিয়া হাত ধুইতে লাগিল, ভাবী দুম্‌দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া ওপাশের বারান্দায় গিয়া খুঁটি হেলান দিয়া বসিয়া রহিল।

যদি কোন স্বামী তাহার স্ত্রীকে কাপড় কিনিয়া দিয়া তাহার দাম সময়মত শোধ করিতে না পারে এবং পনরদিন পরে যদি সেই পাওনাদার তাহাকে হাটে ফেলিয়া চাউলসুদ্ধ ধামা কাড়িয়া লইয়া অপমান করে তবে তাহার জন্য দায়ী হইবে কি স্ত্রী? সমস্ত দিন খাটিয়া, ধান ভানিয়া, উদয়াস্ত অবিশ্রান্ত আহারের চেষ্টা করিয়া, যে স্ত্রীর গা ব্যথা ছাড়ায় না, হাট হইতে বহিয়া আনা অপমানের কৈফিয়ৎ দিবে কি সে? নিকা হওয়ার সময় এমন কড়ার সে করে নাই; জীবনে তাহার অনেক সহিয়াছে। আর অসম্ভব।

ওই বারান্দার এই মুড়ায় ল্যাম্পের আলোয় বসিয়া স্বামী ফড়াৎ ফড়াৎ করিয়া হুঁকা টানিতেছে, একহাত লম্বা দাড়ী বুক পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। আধো আলো অন্ধকারে স্বামীকে তাহার এক গুহাবাসী লোমশ পশুর মত বোধ হইতে লাগিল।

৩

স্বামী গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, 'যত ইয়ের কিছু না করে, এই, বুঝলে। ভাত খেয়ে আসার দরকার।'

ভাবী উঠিয়া গিয়া বারান্দার শেষ প্রান্তের খুঁটিতে হেলান দিয়া বসিল।

খালের উপর দিয়া একে একে তিনখানা নৌকা চলিয়া গেল। কোন্ দেশের কোন্ ঘাটের নাইয়া ঘরে ফিরিয়া যায় উহারা। ঘাটে ওই নাইয়া ছেলেটির বাবা মা অথবা ছোট ভাইটি হয়ত আলো ধরিয়া বসিয়া আছে। তাহার নিজেরও বাবা আছে, মা আছে। হয়ত তাহারা এতক্ষণে তাহারই গল্প করিতেছে। ভাইটি হয়ত 'বুজীকে কবে আন্‌বে বাবা' বলিয়া বাবার নিকট আব্দার করিতেছে। তাহার কাণে বাজিতে লাগিল—সেই যেদিন সে এখানে চলিয়া আসিল তাহার আগের দিন, সেই টুর-টুরের আমতলায় বসিয়া ভাই তাহার গলা জড়াইয়া কহিয়াছিল—'ভাই বলে আমায় ডাক ত'। সে ডাকিলে ভাই কহিয়াছিল—'আবার আসিস্ বুজী, আবার আসিস্।'

স্বামী ঝন্ ঝন্ করিয়া দরজা ঠেলিয়া ঘরের এপাশ হইতে ওপাশ পর্য্যন্ত হাঁটিয়া কহিতে লাগিল—'বেশ, এ কিন্তু ভাল হ'লো না। আমি যার জন্যে যত করি সে তত ইয়ে করে। বুঝলে? ভাল হ'লো না কিন্তু—'

ভালুকের মত স্বামী তাহাকে এমনি করিয়া অকারণ কত দিন কত রাত্রি ধরিয়া পীড়ন করিয়া যাইবে! ভাবীর কান্না পাইতে লাগিল।

ঘরের আলো নিবাইয়া স্বামী শুইয়া পড়িল। ভাবীর মনে কষ্ট হইতে লাগিল। একবার কেহ খাইতে দিল না, হাত ধরিয়া কেহ শুইতে লইয়া গেল না, গায়ে হাত বুলাইয়া কেহ সান্ত্বনার একটি কথাও কহিল না!

ছিলুমপুরের রহমানের 'ও আমার কলিজা ফাটেরে গুণা'র সুর খাল ডিঙ্গাইয়া জলে ভরা বিল পার হইয়া তাহার কাণে বাজিতে লাগিল। দরজার ফাঁক হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া চট্ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া মধুর মত কথায় সে কহিল—'চল্, আমরা চলে যাই, আয়।' দাদীর গল্পেবলা মরুভূমির বালু উড়াইয়া বালুবাগানের আঙ্গুরক্ষেতের মাচা দোলাইয়া লাইলী মজনু ডাকিয়া উঠিল—'মা—মাগো-ও…'



তাজমহল

শ্রীসুশীলকুমার মজুমদার

শুনি ইতিহাসে,
কতশত কবিদের ভাষে,—
তব প্রেমবারিধারে স্নাত যাত্রীদল
পেয়েছে অমল
উদার প্রীতির স্নিগ্ধ শীতল পরশ
শোকতপ্ত হৃদিমাঝে ; কি যে সে হরষ
আজো, ওগো গুণী,
বুঝি নাই ভাল করে'। এখনো অঋণী
হে সম্রাট, হ'তে যে পারি নি আমি তব কাছে।
আজো বাকী আছে
ঢেলে দিতে মোর হৃদয়ের
ভক্তি-শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি দ্বারে মন্দিরের।

তবু ওগো কবি
আঁখি আগে ভাসে তব ছবি
সীমাহীন অনন্তের শ্বেত শুভ্র চিত্রপটে ;
ত্রস্ত চিত্ততটে
উর্ম্মিরাজি ফেনিল বিরাট
ভেঙে পড়ে তব প্রেম-সাগরের ; হে সম্রাট,
পুলকিত চিতে
শুধু যেন শুনি চারি ভিতে
ধ্বনিতেছে অহরহ তোমার বেদনাবাণী ;
যেন কানাকানি
করে সর্ব্বলোকে ; সর্ব্বদেশে
তব প্রেম বিশ্বসুরে বিশ্বসাথে মেশে।

যমুনা-পুলিনে
কোন দূর অতীতের দিনে
বেজেছিল প্রেমবাঁশী ; উচ্ছ্বসিত করি' হৃদি
কোন গোপনিধি
এনেছিল গোকুলের মাঝে
প্রেমবন্যা ক্ষীরধারা,—আজিও হৃদয়ে রাজে
লুপ্ত বৃন্দাবন ;
নিখিলের মন
আজো দেখি পল্লবিত সে বাঁশীর ডাকে,
এখনও আঁকে
মনোমাঝে সেই প্রেমছবি ;—
অমর করিছে তা'রে যুগে যুগে কতশত কবি।

সেই নদীতীরে
মানসী প্রতিমা ঘিরে'
যে ছবি তুলিলে ধীরে,
যে মৌন মর্ম্মর ভাষা তা'রে করে মর্ম্মরিত,
মর্ম্মে যে ধ্বনিত
তা'র সুর ; অন্তরে স্বনিত
তাহা মূক সঙ্গীতের তালে—
আঁখি অন্তরালে
স্বপনের জালে
বাঁধা সে যে—বল কবি তবে,
বাহিরের সীমা মাঝে দেখিয়া তা'রে কি হ'বে ?
তা'র চেয়ে যবে,
মনে হ'বে সৌন্দর্য্যকমল
বিশ্বপটে ম্লান ছিন্নদল,
জাগিবে মানস মাঝে সে তাজমহল।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ

ডাঃ শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য, ডি-টি-এম্

অন্ধকারে মানুষ কখনো নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকতে পারে না। অন্ধকারের অসুবিধা দূর করবার জন্যে লোকে আলো জ্বালতে চায়। কিন্তু একটি আলো জ্বাললে অসুবিধা দূর হয় না। তখন চারিদিক থেকে আরো কত আলো জ্বালা হয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্ধকার না ঘোচে। সেইজন্যে অন্ধকার হ'লেই আমরা দেখতে পাই একটির পর একটি ক'রে চতুর্দিক থেকে কত আলোই জ্বলে। যখন একবার সুরু হ'য়ে যায় তখন পরে পরে দ্রুতগতিতে অনেক আলো জ্বলে উঠতে থাকে, দেখতে দেখতে অসংখ্য হ'য়ে যায়।

পৃথিবীতে এতকাল আমরা অজ্ঞানের অন্ধকারেই ছিলুম। এখন আমাদের জ্ঞানের আলো জ্বলতে সুরু হয়েছে। অতি দ্রুতগতিতে একটির পর একটি করে আলো জ্বলে উঠছে। জ্ঞানের বাতি জ্বালতে জ্বালতে আমরা অনেকটা এগিয়েছি, সেইজন্যে এখনকার কালকে আমরা বলি আলোর যুগ বা বিজ্ঞানের যুগ। পৃথিবীর ইতিহাসে এখনকার মত একসঙ্গে এতগুলো আলো ইতিপূর্ব্বে জ্বলেনি। সকল দিক থেকেই আমরা নতুন নতুন আলো দেখতে পাচ্ছি। পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জৈব বিজ্ঞান, জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান, ভূবিজ্ঞান, খনিজ বিজ্ঞান, জ্ঞানসম্পদে কোনোটিই কম নয়। অগ্রগতিতে যেন পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। বিজ্ঞানের দ্বারা পৃথিবীর অনেক উন্নতি হয়েছে। বিজ্ঞান মানুষকে শক্তিমান করেছে, সম্পদ্‌বান করেছে। কিন্তু ফলিত বিজ্ঞান একদিকে আমাদের যেমন ইষ্টও করে, অন্যদিকে তেমনি আবার অনিষ্টও করে। একদিকে আমাদের নানা প্রকারের সুখ সুবিধা বাড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু অন্যদিকে আমাদের স্বার্থপরতা এবং লালসাও অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। বিজ্ঞানের জোরে আমরা এখন আর অল্পে সন্তুষ্ট থাকি না। বৈজ্ঞানিক ক্ষমতা নিয়েই এখন আমাদের লড়াই চলে। এখনকার দিনে অন্তত দেখা যাচ্ছে যে, জ্ঞানের আলোক প্রজ্বলিত করাই বিজ্ঞানের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, এর অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে শক্তি সঞ্চয় করা। সকল রকম বিজ্ঞানেরই এই দুই প্রকার উদ্দেশ্য দেখা যায়, কেবল একটি বিজ্ঞান আছে যার একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষের কল্যাণ, এ ছাড়া তার আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য নেই। সে হলো চিকিৎসা-বিজ্ঞান। এর একমাত্র লক্ষ্য, কিসে মানুষের অমঙ্গল দূর হয়, কিসে মানুষকে সুস্থ করা যায় এবং সুস্থ রাখা যায়, কিসে তারা দীর্ঘজীবী হয়। এই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কতটা উন্নতি হয়েছে তারই কিছু ইতিহাস আপনাদের শোনাব। প্রত্যেক বিজ্ঞানেই এক একজন মহা মহা রথী জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরাই হন উন্নতির অগ্রদূত। প্রত্যেক বিজ্ঞানের মন্দিরে তাঁরাই হন চিরস্মরণীয়। এর মধ্যে যে কে বড়ো আর কে ছোটো সে কথা আমি বলতে পারবো না। যিনি মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করেছেন তাঁকেই আপনারা অধিক মর্য্যাদা দেবেন, না যিনি ম্যালেরিয়ার জীবাণু আবিষ্কার ক'রেছেন তাঁকেই অধিক মর্য্যাদা দেবেন, সে বিচার অবশ্য আপনারাই করবেন। কিন্তু একটা কথা কেবল এইখানে বলতে চাই যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের যাঁরা উন্নতি করেছেন, তাঁরা সকলেই মহা মহা পণ্ডিত কিংবা বড় বড় প্রফেসর ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে অনেকেই সামান্য ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁদের অভিজ্ঞতা

ও আবিষ্কার একত্রিত ক'রেই আজ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যিনি গরুর বসন্তের বীজের টীকা দিয়ে মানুষের বসন্ত নিবারণ করবার উপায় প্রথম জানতে পারেন তিনি ছিলেন বিলাতের এক পল্লীগ্রামের একজন নিরক্ষর চাষা, নাম বেঞ্জামিন জেষ্টি।

তাঁকে লণ্ডনে নিয়ে গিয়ে তাঁর একটা ছবি নেবার জন্যে অনেক বেগ পেতে হয়েছিলো, স্থিরভাবে তাঁকে বসানোই গেল না। ম্যালেরিয়ার ঔষধ আবিষ্কার করেছিলো পেরু প্রদেশের এক বর্ব্বর জাতি, সেখানকার গভর্ণর Count of Cinchona তাই জেনে এই ঔষধ প্রচার করলেন, সেইজন্যে ঔষধেরও নাম হলো সিনকোনা। ডোভার্স পাউডার নামে যে চমৎকার ঔষধ এখনো আমরা ব্যবহার করি সেটি আবিষ্কার করেছিলো একটি জলদস্যু, তার নাম টমাস ডোভার। খোসের পোকা আবিষ্কার করেছিলো কর্সিকা দ্বীপের এক তরকারীওয়ালি। জল চিকিৎসার আবিষ্কার করেছিলো অষ্ট্রিয়ার একজন নিরক্ষর চাষার ছেলে, তার নাম প্রিস্‌নিজ। মাইক্রোস্কোপ যন্ত্রের লেন্স প্রথম আবিষ্কার করে জ্যানসেন নামে একজন চশমাওয়ালা। তখন সেটা ছিলো একটা খেলার জিনিষ, তাতে এইটুকু মশাকে এত বড় পাখীর মতো দেখাত। কিন্তু তাই থেকে সৃষ্টি হলো মাইক্রোস্কোপ। অন্যান্য বিজ্ঞানের সঙ্গে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কিছু পার্থক্য আছে। এই বিজ্ঞানের তথ্যগুলি আবিষ্কারের জন্যে মানুষকে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে হয়েছে। অনেকে বিষাক্ত জিনিষ নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে নিজের হাতে নিজের মৃত্যু বরণ ক'রে নিয়েছেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে যেখানে সত্য আবিষ্কারের কৌতূহল মাত্র, এ ক্ষেত্রে সেখানে জীবন বাঁচাবার ঐকান্তিক চেষ্টা। মানুষ নিজের জীবন বাঁচাবার জন্যে কী না চেষ্টা করে, অসুস্থ শরীরকে সুস্থ করবার জন্যে কত কাণ্ডই না করতে পারে? আগেকার কালে রোগ সারাবার জন্যে মানুষ লোহা পুড়িয়ে গায়ে ছেঁকা দিয়েছে, ছুরি দিয়ে দেহকে ক্ষতবিক্ষত করেছে, জোঁক দিয়ে রক্তপান করিয়েছে; কত রকমের যন্ত্রণাদায়ক আঘাত সহ্য করেছে, কত রকমের কটু দ্রব্য অম্লান বদনে গলাধঃকরণ করেছে। এমনি ক'রে কতকাল পর্য্যন্ত আমাদের অন্ধকারে মাথা কুটে মরতে হয়েছে, কতকাল আমাদের নিতান্ত অসহায় জন্তুর মত রোগের যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার যন্ত্রণাও সহ্য করতে হয়েছে। বহুকাল পর্য্যন্ত রোগের চিকিৎসা বিজ্ঞানের অন্তর্গত ছিল না, এটা ছিল এক রকম ব্যক্তিগত বিদ্যা—সম্পত্তি। এ বিদ্যা ছিল অত্যন্ত গোপনীয়, কারো কাছে প্রকাশ করবার নয়। এর কারণ আর কিছুই নয়, জ্ঞানের আলো তখনো প্রজ্বলিত হয়নি। সকলেই তখন অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে নিজের আন্দাজের ওপর নির্ভর ক'রে কাজ করতো। যার আন্দাজের জোর বেশী তারই তত কদর বেশী। তখন রোগের কারণও কেউ জানতো না, আর কোনো রোগকে দমন করবার নিশ্চিন্ত উপায় কি তাও কেউ জানতো না। সমস্তই নির্ভর করতো ব্যক্তিগত আন্দাজের উপর। মানুষের জীবনে এই অন্ধকারের যুগ কত সহস্র বছর ধ'রে ছিল। প্রকৃত যেটা জ্ঞান সেটা গোপনীয় বস্তু নয়, সকলেই সেটা জানবে, সেটা প্রয়োগ ক'রে সকলেই সমান রকমের ফল পাবে, এবং সকলেই সেটার কার্য্যকারণ সম্পর্ক বুঝতে পারবে।

একেই বলে বিজ্ঞান। চিকিৎসাবিদ্যাও যখন এই সত্য পর্য্যায়ে এসে উপস্থিত হল তখন সেটা বিজ্ঞানে পরিণত হল। বর্ত্তমান চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বয়স খুব বেশী নয়, এখনও তিন শত বৎসর সম্পূর্ণ হয়নি। কবে যে এর প্রথম আলোটি জ্বলে উঠল সে কথা বলতে গেলে আগেই সুরু করতে

হয় মাইক্রোস্কোপের কথা। লিউভেন হোয়েক নামে একজন ডাচ্ পূর্ব্বোক্ত জ্যানসেনের লেন্স দিয়ে মাইক্রোস্কোপ নামে এক রকম যন্ত্রের সৃষ্টি করলেন যাতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম পদার্থ দুই শত গুণ বড় করে দেখা যায়, সুতরাং যে সব জিনিষ অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলেই মানুষের কাছে অদৃশ্য, তা এ যন্ত্রের সাহায্যে বেশ স্পষ্টভাবেই দেখা যেতে লাগল। এই যন্ত্র দিয়ে তিনি দেখতে পেলেন যে আমাদের বীর্য্যের মধ্যেও একরকম জীবন্ত পোকা আছে, আমাদের মুখের থুথুর মধ্যেও নানা রকমের জীবন্ত পোকা আছে আর জলের মধ্যেও অনেক রকমের পোকা আছে। ১৬৭৪ সালে রয়েল সোসাইটিতে তিনি এই সব জিনিষ চাক্ষুষ দেখালেন। বর্তমান রোগ-বিজ্ঞানের এইখানেই হল প্রথম সূত্রপাত। কিন্তু মানুষের শরীরের রোগের সঙ্গে এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের যে কি সম্পর্ক থাকতে পারে সে কথা তখন কিছু ধারণা করাই যায়নি। এর অনেক কাল পরে ১৮৩৯ শালে এই মাইক্রোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে স্লিডেন আর সোয়ান (Schleiden and Chwaun) দুই বন্ধুতে আবিষ্কার করেন যে উদ্ভিদই হোক্ কিম্বা প্রাণীই হোক্, জৈব পদার্থ মাত্রই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীবকোষের দ্বারা গঠিত। ইট দিয়ে গেঁথে গেঁথে যেমন দেয়াল তৈরী হয়, জীবকোষ দিয়ে গেঁথে গেঁথে তেমনি গাছ-পালা কীট-পতঙ্গ এবং মানুষের দেহ তৈরী হয়। স্লিডেন ছিলেন বটানির ছাত্র আর সোয়ান ছিলেন ফিজিওলজির ছাত্র, সেইজন্যেই ওঁদের এই আবিষ্কারের সুবর্ণ সুযোগ হয়েছিল। এর দশ বছর পরেই বিরচাও (Virchow) আবিষ্কার করলেন যে শুধু তাই নয়, মানুষের শরীরে যে সব রোগ জন্মায় তাও প্রকৃত পক্ষে শরীরস্থ জীব-কোষেরই বিকৃতি। মাইক্রোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে তিনি প্রমাণ করে দেখালেন যে আমাদের শরীর এক একটা রাজ্য বিশেষ, আর জীবকোষগুলো সেখানকার প্রজা, তাদের নিয়েই এই রাজ্যের গঠন হয়েছে। রাজ্যে প্রজাদের মধ্যে যখন বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তখনই জন্মায় রোগ। থাইসিস রোগ হলেও তাই হয়, ফুসফুসের কোষ সমূহের বিকৃতি ঘটে, আর সামান্য একটা ফোড়া হলেও তাই হয়, তখন স্থানীয় কোষগুলোর বিকৃতি ঘটে। রোগ সমূহের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক নিদান এই প্রথম আবিষ্কৃত হল। কিন্তু এই বিদ্রোহ আসে কোথা থেকে? কে এই বিদ্রোহ ঘটায়? এই চিরন্তন প্রশ্নের জবাব দিলেন পাস্তুর (Pasteur)। তিনি ছিলেন একজন ফরাসী রাসায়নিক, গুটিপোকার রোগ নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি দেখলেন অসুস্থ গুটিপোকার মধ্যে বীজাণু থাকে সুস্থ পোকার মধ্যে তা থাকে না। তারপর তিনি দেখলেন, মুরগীর রোগের মধ্যেও বীজাণু থাকে। অসুস্থ মুরগীর বীজাণু যদি সুস্থ মুরগীর শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তখনই তার শরীরে রোগ জন্মায়। এই সকল বীজাণু মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে দৃষ্টিগোচর করা যায়। তখন তিনি বললেন রোগ মাত্রই বীজাণুর দ্বারা আসে, রোগের বীজাণু আকাশে বাতাসে ছড়ানো আছে, যখন তারা শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে তখনই রোগ হয়। এই প্রথম ব্যাক্টিরিওলজির প্রতিষ্ঠা হল, আর আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই প্রথম আলো জ্বলে উঠল। এর পরেই দ্রুতগতিতে একটির পর একটি আলো জ্বলে উঠতে লাগল। এলেন তখন রবার্ট কক। এঁর স্ত্রী জন্মদিনে এঁকে একটি মাইক্রোস্কোপ উপহার দিয়েছিলেন। বীজাণুর দ্বারা রোগ জন্মায়-এই কথা তখন নতুন শোনা যাচ্ছে, প্র্যাকটিস ছেড়ে তিনি এই নিয়েই পরীক্ষা করতে লাগলেন। অ্যানথ্রাক্স নামে একরকম রোগ আছে, এর বীজাণু তিনি দেখতে পেলেন। এই বীজাণু নিয়ে ইঁদুরের গায়ে প্রবেশ করিয়ে দিলে ইঁদুর মরে যায়, তার শরীরে তখন

অংসখ্য বীজাণু দেখা যায়, তাও তিনি দেখলেন। কিন্তু রোগীর শরীরে বীজাণু এত কম কেন, আর ইঁদুরের শরীরেই বা অত বেশী হয় কেন? মনে মনে ভাবলেন, এরাও তো জীবন্ত বস্তু, সুবিধা পেলেই এরা বংশ বৃদ্ধি করে। সুতরাং জীবদেহের মত সুবিধা যদি বাইরেও করে দেওয়া যায়, তবে নিশ্চয় এরা বাইরেও বংশ বৃদ্ধি করবে। এই ধারণা থেকে তিনি ইনকিউবেটরের সৃষ্টি করলেন যার মধ্যে শরীরের মত উত্তাপ সর্বক্ষণই থাকবে, আর মাংসের ব্রথ তৈরী করে তাতে অ্যানথ্রাক্স বীজাণু রেখে সেটা ঐ ইনকিউবেটরের মধ্যে রক্ষা করলেন। দেখতে দেখতে বীজাণুর সংখ্যা বেড়ে উঠল। এর নাম হল বীজাণুর কালচার। তারপর তিনি উপর্য্যুপরি আরো অনেক আবিষ্কার করলেন। ঘা ফোড়া যে ষ্ট্রেপটোকক্কাস এবং ষ্ট্যাফিলোকক্কাস বীজাণুর দ্বারা জন্মায় একথা তিনিই প্রথম বলেন। যক্ষ্মারোগ যে টিউবারকল ব্যাসিলির দ্বারা হয় এও তাঁরি আবিষ্কার। ককের আবিষ্কারের পর দ্রুতগতিতে আরও অনেকে অনেক রোগের বীজাণু আবিষ্কার করতে লাগলেন। ১৮৭০ সাল থেকে আরম্ভ করে ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ রোগের বীজাণুই আবিষ্কার হয়ে গেল। তখন আর প্রমাণ হতে বাকি রইল না যে সংক্রামক রোগ মাত্রই বীজাণুর দ্বারা জন্মায়। এদিকে বিলাতের লর্ড লিষ্টার পাস্তুরের আবিষ্কারের পর ১৮৬৭ সালে অ্যান্টিসেপটিক সার্জারির প্রথম প্রতিষ্ঠা করলেন। আগে কোন অপারেশন করলে সেটা বিষাক্ত হয়ে উঠত, অধিকাংশ রোগীই অপারেশনের পর আর বাঁচত না। পাস্তুরের কথায় লিষ্টার ভাবলেন যে যদি হাওয়াতে বীজাণু থাকে, তবে সেইগুলিই ত কাটা ঘায়ে প্রবেশ করে তাকে বিষাক্ত করে। কয়েক প্রকার ওষুধে এবং আগুনে বীজাণু মরে যায়। সেই সকল ওষুধ ব্যবহার করে এবং অপারেশন সংক্রান্ত জিনিষ-পত্র মাত্রই উত্তমরূপে আগুনে পুড়িয়ে এবং সিদ্ধ করে নিয়ে তিনি দেখলেন যে তাতে আর কোন কাটা ঘা বিষাক্ত হয় না। এই থেকেই অ্যান্টিসেপটিক সার্জারির প্রতিষ্ঠা হলো। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসে এ এক মহামূল্য আবিষ্কার। কিন্তু সার্জারি সম্পর্কে আরো একটা মহামূল্য আবিষ্কারের কথা এখনো বলা হয় নি, সেটা অ্যানিস্থিসিয়ার কথা, অর্থাৎ মানুষকে অসাড় এবং অজ্ঞান করে অস্ত্র প্রয়োগ করবার উপায়। জীবন্ত মানুষের গায়ে ছুরি চালালে তার কত অসহ্য যন্ত্রণা হয়? লোকে বলে, মরে যাই সেও ভালো, তবু গায়ের মাংস কাটতে দিতে পারবো না। বাস্তবিক এইজন্যেই সেকালে কোন বড় রকমের অপারেশন করা যেত না; কত রোগীকে বিনা চিকিৎসায় মরতে দেওয়া হয়েছে।

অপারেশনের সময় রোগী অজ্ঞান হ'য়ে থাকবে, গায়ে ছুরি বসালেও টের পাবে না, এমন একটা উপায় সকলেই খুঁজছিল। জিনিষটা আবিষ্কার হলো আমেরিকাতে। ডাক্তার ওয়েলস্ বললেন যে নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস শুঁকলে কোনো যন্ত্রণা টের পাওয়া যায় না। তিনি এইটে সকলের সামনে প্রমাণ করতে গেলেন, কিন্তু বিফল হ'য়ে মনের দুঃখে নিজের হাতের রক্তশিরা কেটে দিয়ে আত্মহত্যা করলেন। কিন্তু তিনি ভুল কথা বলেন নি, ঠিকই বলেছিলেন। তারপর তাঁর বন্ধু মর্টন দেখলেন যে জ্যাকসন নামে একজন রাসায়নিক ক্লোরিন গ্যাস শুঁকে ভয়ানক যন্ত্রণা পাচ্ছিল, ইথার শোঁকবামাত্র সে যন্ত্রণা সেরে গিয়ে লোকটি ঘুমিয়ে পড়লো। মর্টন ছিলেন একজন ডেন্টিষ্ট, তিনি ইথার শুঁকিয়ে লোকের দাঁত তুলতে লাগলেন, এবং সকলকে এর আশ্চর্য্য শক্তি দেখালেন। তখন থেকে ইথার আর ক্লোরোফর্মের ব্যবহার সুরু হলো।

বীজাণুতত্ত্বের আবিষ্কার হলো, সার্জারির চরম উন্নতি হলো, এরপর এলো ঔষধ আবিষ্কারের যুগ। রোগের কারণ যখন জানা গেছে তখন আর তার উপযুক্ত ঔষধ আবিষ্কারের দেরী হবে কেন? দেহ মাত্রই এক একটা মেসিন। মেসিনের কলকব্জাগুলো সমস্তই যখন জানা গেল, কেমন ক'রে সেগুলো বিগড়ে যায় তাও যখন বোঝা গেল, তখন তো তাকে মেরামত করবার উপায় খুঁজে বের করা খুবই সহজ। সে উপায় আবিষ্কৃত হ'তে আর বিলম্ব হলো না। রাসায়নিক বিজ্ঞান এবং জৈব রসায়নের যতই উন্নতি হচ্ছে ততই নতুন রকম ঔষধ আবিষ্কৃত হচ্ছে। জীবদেহে সেগুলো পরীক্ষা করা হচ্ছে, তারপর সফল হ'লেই সেগুলো সকলে জানছে। এ যুগের একটা নতুন চিকিৎসা পদ্ধতির কথা আগেই বলি, সেটা হচ্ছে ইনজেকশনের দ্বারা ঔষধ প্রয়োগ। এখনো আশী বছরও হয়নি, এই পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এর আগে মুখ দিয়ে ওষুধ খাওয়ানো হতো, মালিশ ক'রে এবং ধোঁয়া দিয়েও ওষুধ প্রয়োগ করা হতো; কিন্তু ছুঁচ ফুটিয়ে পিচকারীর দ্বারা যে চিকিৎসা করা যায় একথা কেউ জানতো না। প্রথম আবিষ্কার হলো মর্ফিয়ার ইনজেকশন। আফিম থেকে মর্ফিয়ার আবিষ্কার অনেক দিন আগেই হয়েছে সারটুনার (Serturner) নামক এক ব্যক্তির দ্বারা। এই ঔষধে যন্ত্রণা কমানো যায় এবং ঘুম পাড়ানো যায়। ঘুমের দেবতার নাম ছিল মর্ফিয়াস, তাই থেকে তিনি এর নাম দিয়েছিলেন মর্ফিন। কিন্তু ওষুধটা বড় তেতো, রোগীদের খেতে দিলে প্রায়ই বমি করে ফেলে। ফ্রান্সিস রিন্দ (Francis Rynd) নামে এক ব্যক্তি তখন উপায় বের করলেন হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ। তিনি বললেন ওষুধ খেতে না পারলেও এই যন্ত্রের দ্বারা চামড়া ফুঁড়ে গায়ের মধ্যে ওষুধ ঢুকিয়ে দেওয়া যায় এবং তাতে আরো তাড়াতাড়ি কাজ হয়। এর উপকারিতা দেখে তখন অন্যান্য ওষুধও এ উপায়ে প্রয়োগ করা সুরু হলো। এখন অনেক রোগের চিকিৎসাই ইনজেকশনের দ্বারা করা হয়।

রোগের চিকিৎসার জন্যে এখন অনেক আশ্চর্য্য রকমের উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। সেগুলি সদ্য ফলপ্রদ এবং মন্ত্রের মত কাজ করে। এখন আর আন্দাজের অবকাশ নেই, রোগটি জেনে নিয়ে উপযুক্ত চিকিৎসাটি প্রয়োগ করলে তা নিশ্চয় আরোগ্য হবে, একথা বলতে আর দ্বিধা হয় না। কয়েকটি মাত্র রোগের উল্লেখ করি। সিফিলিস এবং গণোরিয়া রোগ দুটি অত্যন্ত জঘন্য, পূর্ব্বে কিছুতেই আরোগ্য করা যেত না। কাউকে একবার ঐ রোগে ধরলে তার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠতো। সকলেই জানেন, সিফিলিসের অমোঘ ঔষধ আবিষ্কৃত হ'য়েছে, তার নাম স্যালভারসন। গণোরিয়া রোগেরও একটি চমৎকার ঔষধ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। ম্যালেরিয়াতে কুইনিন ছাড়াও আর দুইটি অপূর্ব্ব ঔষধ পাওয়া গেছে, সুতরাং কুইনিনই আমাদের এখন একমাত্র সম্বল নয়। কলেরাতে রজার্স সাহেবের সেলাইন ইনজেকশন দিলে বহু রোগী মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা পায়। এমিবিক আমাশাতে এমিটিন সাক্ষাৎ ফলপ্রদ। টায়ফয়েড এবং ব্যাসিলারি আমাশার জন্য ডিহেরেল যে ব্যাকটিরিওফাজ চিকিৎসার আবিষ্কার করেছেন সর্ব্বত্র ফলপ্রদ না হলেও তা অনেক স্থলে আশ্চর্য্য ফল দেয়। কালাজ্বরের যে অব্যর্থ ওষুধ ডাঃ ব্রহ্মচারী আবিষ্কার করেছেন, সেকথা আপনারা সকলেই জানেন। কুষ্ঠ রোগেরও এখন উত্তম চিকিৎসা বেরিয়েছে। ষ্ট্রেপটোকক্কাস বীজাণুকে নাশ করবার উপায় আমরা জানতুম না। সম্প্রতি তারও অব্যর্থ ওষুধ বেরিয়েছে, সালফানিল

অ্যামাইড। ঐ বীজাণু থেকে সকল প্রকার রোগই এই ঔষধের দ্বারা আরোগ্য হয়। নিউমোনিয়ারও এখন এক চমৎকার ওষুধ বেরিয়েছে তার নাম 693, প্রথম অবস্থায় খাওয়াতে পারলে শীঘ্র সেরে যায়। ডায়েবিটিস রোগ কখনো আরোগ্য হ'ত না, অনেকে তাতে অকালে মারা যেত, এখন ইনসুলিন প্রয়োগ করলে মৃত্যুমুখ থেকেও রক্ষা করা যায়। এ্যানিমিয়া বা রক্তহীনতায় লক্ষ লোক মারা যেত, এখন তার চিকিৎসা বেরিয়েছে লিভার একষ্ট্রাক্ট। মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করবার জন্যে হয়েছে গ্লুকোজ ইনজেকশন, আরো কত রকমের নতুন ওষুধ বেরিয়েছে তার সংখ্যা নেই। যক্ষ্মা রোগের কোন চিকিৎসাই ছিল না, এখন গোল্ড ইনজেকশন আর নিউ-মোথোরাক্স প্রভৃতির দ্বারা অনেক রোগী প্রাণ ফিরে পাচ্ছে। ক্যানসার রোগের কোন চিকিৎসাই নেই; তবু মাদাম কুরীর রেডিয়ামের সাহায্যে অনেক প্রথমাবস্থার ক্যানসার এখন আরোগ্য হয়। রণ্টজেন কর্ত্তৃক এক্সরে আবিষ্কারের ফলে এখন আভ্যন্তরিক রোগ নির্ণয়ে কত সুবিধা হয়েছে, অনেক রকমের টিউমারও এর দ্বারা আরোগ্য হচ্ছে।

এ ছাড়া বীজাণুর থেকে প্রস্তুত সিরাম ভ্যাক্সিন প্রভৃতির উপকারিতাও কম নয়, ডিফথিরিয়া প্রভৃতি বহু প্রকারের রোগ তাতে আরোগ্য হয়, এবং তার দ্বারা অনেক রকম রোগ আগের থেকে নিবারণ করাও যায়। খাদ্যের ভিটামিন আবিষ্কারও যুগান্তকারী, তার দ্বারা অনেক রকম রোগের এখন চিকিৎসা হচ্ছে। এই সমস্ত কথা শুনে আপনারা মনে মনে কি ভাবছেন তা জানি। ভাবছেন যে এতোই যদি আবিষ্কার হলো, তবু লোকে রোগে ভুগে মরে কেন? সে কথার জবাব আমি দিতে পারব না। বিজ্ঞানের উন্নতি হ'লেও ঠিক জায়গায়, ঠিক সময়ে, ঠিক ভাবে তার উপায়গুলি প্রয়োগ করা চাই। জ্ঞান আলাদা কথা, আর তার ব্যবহারিক প্রয়োগ আলাদা কথা। এ ছাড়া বিজ্ঞানের উন্নতি এখনো অনেক বাকি আছে। এমনও একদিন আসতে পারে যেদিন এখনকার মত রোগে ভুগে কেউ আর মরবে না। ভবিষ্যতের কথা কিছুই বলা যায় না।



বিপিনের সংসার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

হাটতলায় বিপিনকে রোগীর আশায় বসিয়া থাকিতে হয় প্রায় সারাদিনই। রোগী যদি আসিত, তবে চুপ করিয়া নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিবার কষ্ট হয়তো পোষাইত, কিন্তু রোগী আসে না।

প্রথম মাস দুই রোগী হইয়াছিল, যদু ডাক্তারও কয়েকটি জায়গায় পরামর্শ করিবার জন্য তাহাকে ডাকাইয়া লইয়া গিয়াছিল, প্রথম মাসে কুড়ি এবং দ্বিতীয় মাসে পঁয়ত্রিশ টাকা আয় হইবার পরে বিপিনের মনে নতুন আশা, আনন্দ ও উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। পাঁচ টাকা ব্যয় করিয়া সে কলিকাতা হইতে ডাকে একখানা বাংলা 'জ্বর-চিকিৎসা' বলিয়া বই আনাইল। ভারি উপকার হইল বইখানি পড়িয়া। যদু ডাক্তারের ইচ্ছা ছিল তাহাকে দিয়া অস্‌লারের বিখ্যাত বইখানা কেনাইবে। বিপিন বলিতে পারে না যে সে ইংরাজি এমন কিছু জানে না যাহাতে করিয়া সে অস্‌লারের বই বুঝিতে পারে। সুতরাং সে কোনোরূপে এড়াইয়া পাশ কাটাইয়া চলিতে লাগিল। তৃতীয় মাস হইতে কেন যে দুরবস্থা ঘটিল, তাহা সে বোঝে না।

প্রথম দুই সপ্তাহ তো শুধু বসিয়া। কে একজন এক ডোজ ক্যাষ্টর অয়েল লইয়া গিয়াছিল, দুই সপ্তাহের মধ্যে সেই একমাত্র রোগী ও খরিদ্দার।

মুদীর দোকানে বাকী পড়িতে লাগিল, ডাক্তারবাবু বলিয়া খাতির করে তাই ধারে জিনিস দেয়, নতুবা কি বিপদেই পড়িতে হইত!

একদিন চুপ করিয়া বসিয়া আছে, প্রায় সন্ধ্যার সময় একজন লোক বিপিনের ডাক্তারখানার চালাঘরের সামনে দাঁড়াইয়া বলিল, এইটে কি ডাক্তারখানা?

বিপিনের বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এসো, কোত্থেকে আসচো বাপু?

—আপুনিই ডাক্তারবাবু? পেন্নাম হই। আপনাকে যাতি হবে নরোত্তমপুর। যদুবাবু ডাক্তার চিঠি দিয়েছেন, এই নিন্।

লোকটা একটা চিরকুট কাগজ বিপিনের হাতে দিল। বিপিন পড়িয়া দেখিল কলেরার রোগী, যদু ডাক্তার লিখিয়াছে তাহার স্যালাইন দিবার তোড়জোড় নাই, বিপিনকে সে সব লইয়া শীঘ্র আসিতে। বিলম্ব করিলে রোগী বাঁচিবে না।

স্যালাইন দিবার তোড়জোড় বিপিনেরও নাই। কিন্তু বিপিন একটা ব্যাপার বুঝিয়া ঠিক করিয়া লইল। জলে লবণ গুলিয়া শিরার মধ্যে ঢুকাইয়া দিতে বেশি বেগ পাইতে হইবে না। চিকিৎসা করিবার সাহস আছে বিপিনের। সে বাহির হইয়া পড়িল।

—শোনো, আমার বাক্সটা নিয়ে চল, পাঁচ টাকা দিতে হবে কিন্তু—

—চলেন বাবু আপনি। যদুবাবু যা বলে দেবেন, তাই পাবেন।

রোগীর বাড়ীতে পৌঁছিয়া গৃহস্থের সাধারণ অবস্থা দেখিয়া বিপিন ভাবিল, ইহাদের নিকট হইতে পাঁচ টাকা তো দূরের কথা, এক টাকা কি আট আনা পয়সা লইতেও বাধে।

যদু ডাক্তার বলিল, স্যালাইন দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়, বিপিনবাবু।

রোগীর ব্যাপার খুব সুবিধা নয়, বিপিন নাড়ী দেখিয়া বুঝিল। বলিল, এ তো শেষ হয়ে এসেছে যদুবাবু। এরকম ঘাম হচ্ছে, নাড়ী নেমে যাচ্ছে, কতক্ষণ টিক্‌বে ?

যদু ডাক্তার বিপিনের অপেক্ষা অনেক অভিজ্ঞ লোক। সে আজ আট দশ বৎসর এই অঞ্চলে বহু রোগী ও বহুপ্রকার রোগের অবস্থা দেখিয়া আসিতেছে। সে বলিল, ওতে ভয় পাবার কারণ নেই বোধ হয়। স্যালাইন দিন আপনি—

বিপিনের জিদ্‌ চাপিয়া গেল। সে বলিল, নুন জলে গুলে ওর শির কেটে ঢুকিয়ে দিতে হবে। অন্য কিছু ব্যবস্থা নেই। কিন্তু রোগী তার মধ্যেই মারা না যায়—

—আপনি শির কেটে নুনজল ঢোকান, আমি ওর মধ্যে নেই।

বিপিন অসীম সাহসী মানুষ। যে আসুরিক চিকিৎসা করিতে অভিজ্ঞ পাশ করা ডাক্তার ভয় খাইত, বিপিন তাহা অনায়াসে বুক ঠুকিয়া করিয়া ফেলিল। যদু বিপিনের কাণ্ড দেখিয়া ভয় খাইয়া বলিল—

—কত সি, সি দেবেন বিপিনবাবু ?

—সি, সি ফি, সি কি মশাই এতে ? বাংলা নুন গোলা জল, তার আবার সি, সি। দেখুন আমি কি করি, আপনি যখন হাত দিচ্ছেন না।

এ পল্লীগ্রামের কোনো লোক এ ধরণের কাণ্ড দেখে নাই, ঘরের দোরের কাছে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া সবাই বিপিনের ক্রিয়াকলাপ দেখিতে লাগিল।

হঠাৎ রোগী একেবারে অসাড় হইয়া পড়িল।

যদু ডাক্তার বলিল, বিপিনবাবু, হয়ে গেল বোধ হয়।

—হয় নি। ভয় খাবেন না—

বিপিনের কথা কেহ বিশ্বাস করিল না। বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল। বিপিন হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া সতেজ রাখিবার জন্য একটা ইন্‌জেক্‌সন করিল, যদু ডাক্তারের বারণ শুনিল না। যদু বলিল, আপনি যা হয় করুন বিপিনবাবু, আমায় যেন এর পরে কেউ দোষ না দেয় তা বলে রাখছি।

বিপিন বলিল, আপনার সাহস নেই যদুবাবু, সব সময় বই পড়ে ডাক্তারি চলে না, অন্ধকারে লাফিয়ে পড়তে হয়। বাঁচে না বাঁচে রোগী, আমার যা ভাল মনে হচ্ছে, তা করে যাবো।

যদু ডাক্তার বাহিরে চলিয়া গেল।

রোগী আর নাই বলিলেই হয়। কান্নাকাটি বেজায় বাড়িয়াছে ঘরের বাহিরে। বিপিন আর দুবার ইন্‌জেক্‌সন করিল, রোগীর বিছানার পাশ ছাড়িয়া সে একটুও নড়িল না। তাহাকে যেন কি একটা নেশায় পাইয়াছে, কিসের ঘোরে সে কাজ করিয়া যাইতেছে সে নিজেই জানে না। আরও আধ ঘণ্টা পরে রোগী চোখ মেলিয়া চাহিল। রোগীর চোখের চাহনি দেখিয়া বিপিনের মন আহ্লাদে

নাচিয়া উঠিল যেন, সে লোকজন ঠেলিয়া বাহিরে গিয়া দেখিল যদু ডাক্তার উঠানের গোলার তলায় দাঁড়াইয়া বিড়ি টানিতেছে ও কয়েকজন গ্রাম্য লোকের সহিত কি কথা বলিতেছে।

—আসুন যদুবাবু, একবার নাড়ীটা দেখুন তো। আর ভয় নেই, সামলে নিয়েছে।

যদু ডাক্তার ফিরিয়া আসিয়া রোগী দেখিয়া বলিল, বেঁচে গেল এ যাত্রা। ওকে যমের মুখ থেকে টেনে বার করলেন মশাই।

যে ঘরে রোগী শুইয়া আছে, সে ঘরের মেঝেতে বন্যার জল কিছুদিন আগেও ছিল প্রায় একহাঁটু, বাঁশের মাচার উপর রোগী শুইয়া, ঘরে চারিদিকে চাহিয়া বিপিন দেখিল কয়েকটি দড়ির শিকা এবং ছেঁড়া কাঁথার পুঁটুলি ও হাঁড়িকুড়ি ছাড়া অন্য আসবাব নাই। ইহাদের কাছে ভিজিটের টাকা লইতে পারা যায়?

বিপিন ও যদু বাহিরে চলিয়া আসিল। যদু বলিল, একটা ডাব খাবেন? ওরে ব্যাটারা ইদিকে আয়, ডাক্তারবাবুকে একটা ডাব কেটে খাওয়া।

গ্রামশুদ্ধ লোক ঝুঁকিয়া পড়িয়া বিপিনের চিকিৎসা দেখিয়াছিল। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, এত বড় ডাক্তার বা এমন চিকিৎসা তাহারা জ্ঞানে কখনও দেখে নাই। যদু ডাক্তার লোকটা চালাক, দেখিল এ স্থানে বিপিনের প্রশংসা করিলেই সে নিজেও খাতির পাইবে, নতুবা লোকে ভাবিবে যদু ডাক্তারের হিংসা হইয়াছে। সুতরাং সে বক্তৃতার সুরে সমবেত লোকজনের সামনে বলিল, ডাক্তার অনেক দেখিচি, কিন্তু বিপিনবাবুর মত সাহস কোন ডাক্তারের দেখিনি। হাজার হোক পেটে বিদ্যে আছে কিনা? ভয়ডর নেই কিছুতেই।

একজন লোক গোটা চারেক কচি ডাব কাটিয়া আনিল। বিপিন বলিল, আমাদের ডাব তো দিচ্ছ, রুগীকে এখন অনবরত ডাবের জল দিতে হবে, সে তৈরী আছে তো?

—খান বাবু, আপনাদের ছিচরণ আশীর্ব্বাদে দশটা নারকেলের গাছ বাড়ীতে। বাবু সহর বাজার হ'লি এই গাছ কডার ফল বিক্রী করে বেশ কিছু প্যাতাম, এখানে জিনিসের দর নেই। কাপাসডাঙার হাটে ডাব একটা এক পয়সা তাও খদ্দের নেই।

ফিরিবার সময় বিপিন ভিজিট লইতে চাহিল না। যদু ডাক্তার অনেক করিয়া বুঝাইল, পাড়াগাঁয়ে সবই এই রকম অবস্থার মানুষ। তাহা হইলে চলিবে কি করিয়া যদি ইহাদের নিকট ভিজিট না লওয়া যায়?

বিপিন বলিল, তা হোক, যদুবাবু। আমি ডাক্তারি করছি শুধুই কি নিজের জন্যে, অপরের দিকটাও দেখি একটু। আচ্ছা যাই, আজ হাট বার। ডাক্তারখানা খুলি গিয়ে ওখানে। লোক এসে ফিরে যাবে।

বিপিন ভিজিট লইবে কি, মানীর কথা এসময় অনবরত মনে পড়িতেছে। মানী তাহাকে এ পথে নামাইয়াছে, যদি সে কোন গরীব রোগীর প্রাণ দান দিয়া থাকে তবে তাহার বাপ মায়ের আশীর্ব্বাদ মানীর উপর গিয়া পড়ুক। মানীর লাভ হউক। এই অতি দুরবস্থাগ্রস্ত রোগীর নিকট সে মোচড় দিয়া টাকা আদায় করিলে মানীর স্মৃতির সম্মান ঠিকমত বজায় রাখা হইত না।

কাপাসডাঙার হাটতলায় যখন সে ফিরিয়া আসিল তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে।

আজ এখানকার হাটবার, পাড়াগাঁয়ের ছোট্ট হাট, সবশুদ্ধ একশো কি দেড়শো লোক জমিয়াছে, খুচরা ঔষধ কিছু কিছু বিক্রয় হইয়া থাকে।

কুমড়া বেগুন বিক্রয় করিয়া যে যেখানে চলিয়া গেল। বিপিন ডাক্তারখানা বন্ধ করিয়া পাশে বিষ্ণু নাথের মুদীর দোকানে হারিকেন লণ্ঠনটি ধরাইতে গেল। বিষ্ণু খরিদ্দারকে খৈল আর ক্রাসিন তৈল মাপিয়া দিতেছে। বিপিন বলিল, বিষ্ণু, বাড়ী যাবে না?

বিষ্ণু বলিল, আমার এখনও অনেক দেরি ডাক্তারবাবু। এখন তবিল মেলাবো, কালকের তাগাদার ফর্দ্দ তৈরী করবো, আপনি যান। হ্যাঁ ভাল কথা, আপনার যে ভারি সুখ্যাত শোনলাম।

—কে করলে সুখ্যাত?

—ওই সবাই বলাবলি করছিল। আজ কোথায় রুগী দেখে এলেন, তাকে নাকি শির কেটে নুনগোলা জল ঢুকিয়ে কলেরার রুগী একেবারে বাঁচিয়ে চাঙ্গা করে দিয়ে এসেছেন, এই সব কথা বলছিল। সবারই মুখে ঐ এক কথা।

যাহারা প্রশংসা চিরকাল পাইয়া আসিতেছে, তাহারা জানে না জীবনে কত লোক আদৌ কখনো ও জিনিসটার আস্বাদ পায়ই না। বিপিনকে ভাল বলিয়াছিল কেবল একজন, সে গেল অন্য ধরণের ব্যাপার। কাজ করিয়া অনাদিবাবুর সুখ্যাতি সে কোনোদিনই অর্জ্জন করিতে পারে নাই। এই প্রথম লোকে অযাচিতভাবে তাহার কাজকে ভাল বলিতেছে, তাহার ব্যক্তিত্বকে সম্মান দিতেছে, মানুষের জীবনে এ অতি মূল্যবান ঘটনা।

বিষ্ণু আরও বলিল, ডাক্তারবাবু, আপনি নাকি ওরা গরীব বলে এক পয়সা নেন নি? সবাই বলছিল, কি দয়ার শরীল! মানুষ না দেবতা! গরীব বলে শুধু একটা ডাব খেয়ে চলে এল।

হ্যারিকেন লণ্ঠনটা জ্বালিয়া দুধারের ঘন বনের ভিতরকার সুঁড়িপথ বাহিয়া বিপিন প্রায় দেড় মাইল দূর রামনিধি দত্তের বাড়ী ফিরিল।

দত্ত মশায় চণ্ডীমণ্ডপেই বসিয়া বিষয়সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখিতেছিলেন। তক্তপোষের উপর মাদুর বিছানো, সামনে কাঠের বাক্স, তাহার উপরে লণ্ঠন।

বলিলেন, আসুন ডাক্তারবাবু, আজ বাড়ীতে আমার জামাই মেয়ে এসেছে অনেক দিন পরে। আজ একটু খাওয়া দাওয়া আছে, তা আপনাকে আর হাত পুড়িয়ে রাঁধতে হবে না। দুখানা লুচি না হয় অমনি গরীবের বাড়ী—

—বিলক্ষণ, সে কি কথা! তা হবে এখন। ওসব কি বলছেন? জামাইবাবু কই?

—বাড়ির মধ্যে গিয়েচেন। এতক্ষণ বাঁওড়ের ধারে বেড়াচ্ছিলেন, চা খেতে ডাক দিলে তাই গেলেন। ওরে কেষ্ট, ডাক্তারবাবুকে চা দিয়ে যা, সন্দে আহ্নিক সেরে ফেলুন হাত পা ধুয়ে।

ইহারা কখনও চা খায় না। আজ জামাই আসিয়াছে, তাই চা খাওয়ার ও দেওয়ার ব্যস্ততা। বিপিনের হাসি পাইল।

একটু পরে দত্ত মশায়ের জামাই বাহিরে আসিল। বিপিনের সমবয়সী হইবে, দেখিতে শুনিতে খুব ভাল নয়, মুখে বসন্তের দাগ।

দত্ত মহাশয়ের কথায় সে বিপিনের পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া তক্তপোষের এক পাশে বসিল।

বিপিন বলিল, জামাইবাবু কোথায় থাকেন?

—আজ্ঞে কুলে বয়ড়া। সেখানে তামাকের ব্যবসা করি।

—এখানে ক'দিন থাকবেন তো?

—থাকলে তো চলে না। এখন তাগাদা পত্তরের সময়, নিজে না দেখ্‌লে কাজ হয় না। পরশু যাবো ভাবচি।

জামাইয়ের সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। আজ এবেলা রান্নার হাঙ্গামা নাই বলিয়াই বিপিন নিশ্চিন্ত মনে গল্প করিবার অবকাশ পাইয়াছে। দত্ত মশায়ের সঙ্গে অন্যদিন যে গল্প হয় তাহা বিপিনের তেমন ভাল লাগে না, দত্ত মহাশয় শুধু রামায়ণ মহাভারতের কথা বলেন। আজ সমবয়সী একজন লোককে পাইয়া অনেকদিন পরে সে গল্প করিয়া বাঁচিল।

তামাক খাইবার উপায় নাই, দত্ত মহাশয় বসিয়া আছেন। অনেকক্ষণ পরে বোধ হয় তাঁর খেয়াল হইল তিনি উপস্থিত থাকাতে ইহাদের ধূমপানের অসুবিধা হইতেছে। বলিলেন, তাহলে বসুন ডাক্তারবাবু, আমি দেখি খাওয়া দাওয়ার কতদূর হল, এদিকে রাতও হয়েছে।

কিছুক্ষণ পর বাড়ীর ভিতর হইতে আহারের ডাক পড়িল।

পাশাপাশি খাইবার আসন পাতা হইয়াছে দত্ত মহাশয় ও জামাইয়ের। বিপিন ব্রাহ্মণ, সুতরাং তাহার আসন একটু দূরে পৃথকভাবে পাতা।

একটি চব্বিশ পঁচিশ বছরের তরুণী লুচি লইয়া ঘরে ঢুকিয়া সলজ্জভাবে বিপিনের দিকে চাহিল।

দত্ত মহাশয় বলিলেন, এইটি আমার মেয়ে। শান্তি, ডাক্তারবাবুকে প্রণাম কর মা।

তরুণী লুচির চুপড়ি নামাইয়া রাখিয়া বিপিনের পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। তারপর সকলের পাতে লুচি দিয়া চলিয়া গেল।

বিপিনের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল আর একদিনের কথা। মানীদের বাড়ী, সেও এই রকম জামাই আসিয়াছিল, রান্নাঘরে এই রকম জামাইবাবু, অনাদিবাবু ও সে খাইতে বসিয়াছিল। সেদিন আড়ালে ছিল মানী—খাইয়া উঠিয়া জানালার ধার দিয়া যাইবার সময় তাহার সহিত দেখা হইত—কারণ জানালার ধারে দাঁড়াইয়া থাকিত মানী—তাহার সঙ্গে কথা বলিবার জন্যই দাঁড়াইয়া থাকিত। সে প্রায় তিন বৎসর আগেকার কথা।

আজ কোথায় সে আর কোথায় মানী!

আর কি তাহার সঙ্গে দেখা হইবে? সম্ভব নয়। দেখা সাক্ষাতের সূত্র ছিঁড়িয়া গিয়াছে। আর সে সম্ভাবনা নাই।

ভাবিতেই বিপিনের বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়া উঠিল। লুচির ড্যালা গলায় আটকাইয়া গেল, কান্না ঠেলিয়া আসে। মন হু হু করিয়া উঠিল। সে কোথায় আছে? ইহারা কে? ওই যে শ্যামা মেয়েটি আধ ঘোমটা দিয়া পরিবেশন করিতেছে, কে ও? বিপিন ইহাদের চেনে না।

অতি সুপরিচিত পরিবেশের মধ্যে ইহারা সবাই অপরিচিত। কোন দিক দিয়াই বিপিনের সঙ্গে ইহাদের কোন যোগাযোগ নাই।

শান্তি আসিয়া পায়েসের বাটি প্রত্যেকের পাতের কাছে রাখিয়া সেই ঘরের মধ্যেই দাঁড়াইয়া রহিল। দত্ত মহাশয় বিপিনের ডাক্তারির প্রশংসা করিতেছিলেন, শান্তি একমনে যেন তাহাই শুনিতেছিল।

বিপিন একবার মুখ তুলিয়া চাহিতেই শান্তির সঙ্গে চোখোচোখি হইয়া গেল। শান্তি তাহারই দিকে চাহিয়াছিল এতক্ষণ নাকি? বিপিন কেমন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

দত্ত মহাশয় তাঁহার মেয়েকে অনুযোগ করিতে লাগিলেন, তিনি লুচি খাইতে ভালবাসেন না, তবে কেন তাঁহাকে লুচি দেওয়া হইয়াছে। দত্ত মহাশয়ের আহারাদির বিশেষত্ব আছে, পূর্ব্বে অবস্থা ভাল থাকার দরুণই হউক বা যে জন্যই হউক, তাঁহার খাওয়া দাওয়া একটু সৌখীন ধরণের। তাঁহার জমিতে সাধারণতঃ মোটা নাগরা ধান হয়, কিন্তু সে ধানের চাল তিনি খাইতে পারেন না বলিয়া সেই ধানের বদলে উৎকৃষ্ট সরু চামরমণি ধান সংগ্রহ করিয়া আনেন সোনাতনপুরের বিশ্বাসদের গোলাবাড়ী হইতে। বারমাস তিনি এই চামরমণি ধানের চাল ছাড়া খান না। বাড়ীর আর কেহ নয়, শুধু তিনি। অন্য সকলের জন্য ক্ষেতের মোটা চালের ব্যবস্থা। তবে অতিথি-সজ্জন আসিলে অবশ্য অন্য কথা।

বড় বগী থালায় চূড়ার আকারে ভাত বাড়িয়া চূড়ার মাথায় ক্ষুদ্র কাঁসার বাটিতে গাওয়া ঘি দিতে হইবে। ঢাকনিওয়ালা ঝকঝকে কাঁসার গ্লাসে তাঁহাকে জল দিতে হইবে। খুব বড় কাঁঠাল কাঠের সেকেলে পিঁড়ি পাতিয়া থালায় সুগোছাল করিয়া ভাত সাজাইয়া না দিলে তাঁহার খাওয়া হয় না।

অনেকদিন পরে মেয়ে আসিয়াছে, দত্তমহাশয় একটু বেশি সেবা পাইতেছেন। পুত্রবধূরা শ্বশুরের সেবা যথেষ্ট করিলে বিপত্নীক দত্ত মহাশয়ের তাহা মনে ধরে না। মেয়ে কেন ভাত সাজাইয়া না দিয়া লুচি খাওয়াইতেছে, ইহাই হইল দত্ত মহাশয়ের অনুযোগের কারণ।

খাওয়ার পর বিপিন বাহিরে যাইতে যাইতে দালানের পাশে জানালার দিকে চাহিল। মানী দাঁড়াইয়া আছে? কেহ নাই। রোজ তাহার খাওয়ার পরে বাহিরে যাইবার পথে এই জানালার ধারে সে দাঁড়াইয়া থাকিত। কি ছাই ভস্ম সে ভাবিতেছে! এটা কি মানীদের বাড়ি যে মানী দাঁড়াইয়া থাকিবে জানালায়? বাহিরে সে একাই আসিয়া তামাক খাইতে বসিল।

বেশ অন্ধকার রাত্রি। উঠানের নারিকেল গাছের মাথায় জট পাকান অন্ধকার কিন্তু ক্রমশঃ স্বচ্ছ তরল হইয়া উঠিতেছে, পূর্ব্ব দিগন্তে চাঁদ উঠিবার সময় হইল বোধ হয়। গোলার পাশে হাস্নুহানার ঝাড় হইতে অতি উগ্র সুগন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। এমন রাত্রে ঘুম হয়?

শুধুই বসিয়া ভাবিতে ইচ্ছা করে।

আর কি কখনও তাহার সঙ্গে দেখা হইবে না?

আজ যে ডাক্তার হিসাবে তাহার এত খাতিরযত্ন, লোকমুখে এত সুখ্যাতি, এ সব কাহার দৌলতে?

যে তাহাকে এ পথ দেখাইয়া দিয়াছিল সে আজ কোথায় ?

আজ বিশেষ করিয়া ইহাদের বাড়ির এই জামাই আসার ব্যাপারে মানীদের বাড়ির তিন বৎসর পূর্ব্বের সে ঘটনা তাহার বিশেষ করিয়া মনে পড়িয়াছে। এমন এক দিনেই মানীর সঙ্গে তাহার আলাপ হয় আবার নূতন করিয়া, বাল্যের দিনগুলির অনেক, অনেক পরে। মানীর জন্য এত মন কেমন করে কেন ?

বিপিন কত রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া বসিয়া রহিল। সে আরও বড় হইবে। ভাল করিয়া ডাক্তারি শিখিবে। মানীর যে দেওর বীজপুরে থাকিয়া ডাক্তারি করে, তাহার কাছে গেলে কেমন হয় ? বিপিন নিজের মধ্যে একটা অদ্ভুত শক্তি অনুভব করে। সে ডাক্তারি খুব ভাল বোঝে। এ কাজে তাহার ঈশ্বরদত্ত স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে। কিন্তু আরও ভাল করিয়া শেখা চাই জিনিসটা।

ভাবিতে ভাবিতে কখন সে ঘুমাইয়া পড়িল।

শেষ রাত্রে বিপিন স্বপ্ন দেখিল মানী আসিয়াছে। হাসিমুখে তাহার দিকে চাহিয়া বলিতেছে, পোলাও কেমন খেলে বিপিনদা ? তোমার জন্যে আমি নিজের হাতে—ভাল লাগল ?

ঠিক তেমনি হাসি, সেই সুপরিচিত, অতি প্রিয় মুখ !

বিপিন বলিল, আমি মরে যাচ্ছি মানী, তোকে দেখতে না পেয়ে, তুই আমায় বাঁচা, আমায় ডাক্তারি শেখাবি নে বীজপুরে তোর দেওরের কাছে ?

খুব ভোরে বিপিন হাত মুখ ধুইয়া সবে চণ্ডীমণ্ডপে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া বসিয়াছে, এমন সময় দত্ত মহাশয়ের মেয়ে শান্তি এক কাপ চা আনিয়া রোয়াকের ধারে রাখিয়াই বিন্দুমাত্র না দাঁড়াইয়া চলিয়া গেল।

বিপিন একটু অবাক হইয়া গেল। ইহাদের বাড়ির আবরু বড় কড়া, এতদিন এখানে আছে সে, বাড়ির কোন মেয়ে, অবশ্য মেয়ে বলিতে দত্ত মহাশয়ের দুই পুত্রবধূ, কখনও তাহার সামনে বাহির হয় নাই। শান্তি যে বড় বাহিরে আসিয়া চা দিয়া গেল ? তবে হাঁ, শান্তি তো আর ঘরের বউ নয়, বাড়ীর মেয়ে। তাহার আসিতে বাধা কি ? সেদিন সারাদিনের মধ্যে শান্তি আরও অনেকবার বিপিনের সামনে বাহির হইল। শান্তি মেয়েটি বেশ সেবাপরায়ণা ও শান্ত। চেহারার মধ্যে একটা মিষ্টত্ব আছে, যদিও দেখিতে এমন কিছু সুশ্রী নয়।

যদি আজ শান্তির বদলে এখানে মানী থাকিত ?

এক জায়গায় ভালবাসা পড়িলে আর দু জায়গায় কিছু হয় না।

ভালবাসা এমন জিনিস, যাহা কখনও দুই নৌকায় পা দেয় না। হয় এ নৌকা, নয় ও নৌকা। কত মেয়ে তো আছে জগতে, কত মেয়ে তো সে নিজেই দেখিল, কিন্তু মানীর মত মেয়ে সে কোথাও দেখে নাই। আর কাহারও দিকে মন যায় না কেন ?

পরবর্ত্তী দুই তিন দিনের মধ্যে বিপিন অনেকগুলি রোগী হাতে পাইল। রোজ সকালবেলা ডাক্তারখানা খুলিতে গিয়া দেখে যে ডাক্তারখানার সামনে হাটচালায় রীতিমত রোগীর ভিড় জমিয়া গিয়াছে, সকলে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ম্যালেরিয়ার সিজন্ পড়িয়া গিয়াছে। দুই তিন দিনের মধ্যে সে ভিজিটই পাইল সাত আট টাকা।

বিপিনের ডাক্তারখানা এই সপ্তাহ হইতেই বেশ জমিয়া উঠিল। গোগা, মল্লিকপুর, সরুলে প্রভৃতি দূর গ্রাম হইতেও তাহার ডাক আসিতে লাগিল। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল যদু ডাক্তারের পশার একেবারে মাটি হইয়া গেল, নূতন ডাক্তারবাবু আসাতে।

দত্ত মহাশয় একদিন বলিলেন, আপনার চেহারাখানার গুণে আপনার পশার হবে ডাক্তারবাবু। ডাক্তারের এমন চেহারা হওয়া চাই যে তাকে দেখলেই রোগীর রোগ আদ্ধেক সেরে যাবে। আপনার সম্বন্ধেও সকলেই সেই কথা বলে। যদু ডাক্তার আর আপনি! হাজার হোক আপনি হলেন ব্রাহ্মণ। কিসে আর কিসে!

বিপিন হিসাব করিয়া দেখিল সে পাঁচ মাস আদৌ বাড়ি যায় নাই। অবশ্য এই পাঁচ মাসের মধ্যে প্রথম তিন মাস কিছুই হয় নাই, শেষ দুই মাসে প্রায় দেড়শত টাকা আয় হইয়াছে। ম্যালেরিয়ার সিজন্ এখনও পুরাদমে চলিবে আরও অন্ততঃ এক মাস। এই সময়ে একবার বাড়ি ঘুরিয়া আসা দরকার।

ক্রমশ



আমরা কবি

শ্রীসুনীলকান্তি সেন

আমরা প্রাচীন কবি
রসোত্তীর্ণ কবিতা লিখি।
ফুলে আর চাঁদে, চাঁদে আর ফুলে যে রস আছে
নিশীথে সে রস হরণ করি
মনের গোপন ভাঁড়ার ভরি।
কোকিল, বকুল, প্রিয়ারে ঘেরিয়া যে সব ভাব
বেঁধেছে দানা,
নানান্ খানা,
তারি দুএকটা বাছিয়া বাছিয়া ডুবায়ে রসে,
রসোত্তীর্ণ কবিতা লিখি।

রসিকেরা মিলি কানাকানি করে অবাক মানি'
ফুলে আর চাঁদে, চাঁদে আর ফুলে
এত রস আছে ছিলনা না জানা,
কিবা বিচিত্র ভাবের দানা,
বাহবা কবি!
রসোত্তীর্ণ কবিতা তোমার আরও তো আছে?
ফুল যদি তার গন্ধ ছড়ানো বন্ধ করে,
শশী যদি আজ মসিমাখা হয়ে ঘুরিয়া মরে,
অন্ধ ব্যোমে,
আমার রসের ভাঁড়ার তথাপি হবেনা খালি।
ফুল ও চাঁদের কবিতায় তবু দিওনা গালি,
আমরা প্রাচীন কবি
রসোত্তীর্ণ কবিতা লিখি।

আমরা নবীন কবি,
উন্মাদ মোরা, প্রমত্ত মোরা, আমরা "রোলার" কবি,
আমরা বর্ষা, আমরা প্লাবন, আমরা উল্কা, আমরা শ্রাবণ,
আমরা ভীষণ বিদ্রোহী আর "রোলার" কবি।

বাধা আর কাদা দলিয়া মথিয়া আমরা ছুটি ;
কোথা ছুটিতেছি তাই কি জানি ?
নিষেধ-শাসন লঙ্ঘন করি ছুটাই ঘোড়া।
জীবনে মোদের অনেক ব্যথা,
হৃদয়ে মোদের রয়েছে অনেক গোপন ক্ষত
সন্ধান তার রাখ কি কিছু ?
তাহারি ব্যথায় কবিতা লিখি
তরুণ আমরা নবীন কবি ;
ফুল হ'তে আর চাঁদ হ'তে শুধু রস চুরি করা
ব্যবসা নহে,
আমরা "রোলার" কবি।



প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব

শ্রীইন্দ্রসোম বর্মন

জাঁ ক্রিস্তফে রোম্যা রোলাঁ নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকটির অনুবাদ করিয়াছেন :

সংসারবিষবৃক্ষস্য দ্বে ফলে অমৃতোপমে।
কাব্যামৃতরসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সজ্জনৈঃ সহ ॥

সভ্যতা যে পরিমাণে উন্নত হইলে ধনসাম্যহীন সংসার অর্থাৎ সমাজ বিষময় বলিয়া ঠেকে, ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসেও তাহার যথেষ্ট ইঙ্গিত আছে। এই শ্লোকটিও সংসারবিষজর্জর একাকী মনের বেদনাকে বহন করিতেছে। শ্লোকস্থ 'সজ্জন'-শব্দটিতে বোধ করি ভালোমানুষ বোঝায় না (কারণ ভাল লোকই যদি পাওয়া গেল, তবে আর সংসার বিষবৎ লাগিবে কেন ?); উহার সহজ অর্থ 'সহৃদয়' বা একই ভাবের ভাবুক। মানুষ যখন মনের স্ফূর্তি হারায়, সমাজের গতানুগতিকতায় তাহার মননশক্তিতে যখন ভাঁটা পড়ে, তখনই সে বৈচিত্র্যের সংঘাত এড়াইয়া মনের মানুষ খুঁজিতে ব্যস্ত হয়। তাহার কাব্যও তখন সুখদুঃখবিচিত্র কর্মের উপলবন্ধুর রামগিরি হইতে অবিরল আনন্দের কৈবল্যভূমি অলকায় মেঘদূত প্রেরণে সার্থকতা লাভ করে। এমন অবস্থায় তাহার কাব্যতত্ত্বও একটি বিশেষ রূপ গ্রহণ করে। ঐতিহাসিক কারণের পুনরাবর্তনে সকল দেশে, সকল যুগেই এইরূপ ঘটিয়াছে, অনুমান করি।

কাহার, তাহা মনে পড়িতেছে না, কিন্তু এরূপ একটি মতবাদ আছে যে, আদিতে কাব্য ছিল না, সঙ্গীতও ছিল না, কেবল মন্ত্রই ছিল ;—"ন কাব্যং ন চ সঙ্গীতং, কেবলা মন্ত্রশক্তিঃ"। এই মন্ত্রের মধ্যেই সঙ্গীত ও কাব্যের বীজ সুপ্ত ছিল, পরে তাহারা অনুকূল অবস্থায় মন্ত্রশরীর বিদীর্ণ করিয়া আপন আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কাব্য এবং সঙ্গীতের শৈশবে মন্ত্রের প্রভাব যে একেবারে ছিল না এমন নয় ; কিন্তু পরযুগের রসিকচিত্তে তাহারা আপন আপন মূল্যেই বিকাইয়াছে। আদিম সমাজে মন্ত্রের কাজ ছিল কর্মপ্রবর্তনায় নিজের অথবা অপরের, ব্যষ্টি অথবা সমষ্টিগত ভাবে,— অহৈতুক শিল্পরসানুভবে নয়। মানুষকে কতকগুলি কাজ স্বয়ংপ্রণোদন ব্যতিরেকেই করিতে হয় ; সম্মুখে বাঘ দেখিলে পলায়ন সে যান্ত্রিকভাবেই করে, যুক্তির জন্য বিলম্ব করে না, কিন্তু শস্যের বপন এবং আহরণ করিতে গেলে, অথবা জীবন বিপন্ন করিয়া গোষ্ঠীকে বাঁচাইতে গেলে তাহাকে যে চেষ্টা করিতে হয় তাহার জন্য একটি বিশেষ মানসিক শক্তির প্রয়োজন। প্রাচীন যুগে মন্ত্রই তাহাকে প্রেরণা দিত ; মন্ত্রের সাহায্যেই সে আপনার ব্যক্তিত্বকে সমগ্র গোষ্ঠীচেতনার উন্মাদনায় ভরিয়া তুলিত ; তাই তাহার নিজের অসুবিধা, নিজের বিপদ কর্তব্যের ক্ষেত্রে তাহার কাছে খুব বড় বলিয়া ঠেকিত না। প্রাচীন যুগের শিল্প এই জন্যই মন্ত্রস্বভাব ; শিল্পকৈবল্য সেকালে অভাবনীয়। প্রাচীন বৈদিক সূক্তে কাব্য এবং সঙ্গীতের এই মন্ত্রমূর্তিই আমরা দেখিতে পাই। ঋগ্‌বেদের ৭ম মণ্ডলে, ১০৩তম সূক্তে দেখি, মণ্ডূক দেবতা এবং বশিষ্ঠ ঋষি ; সূক্তটি আর কিছুই নয় ; পর্জন্যের প্রিয় জীব ভেকের নিকটে কৃষি-জীবী ঋষি ধন প্রার্থনা করিতেছেন। কিন্তু তাহাতে বর্ষার পরিপূর্ণ অনূপ-ভূমির তীরে তীরে কোলাহল-

মুখর, বিচিত্রবর্ণ, বিচিত্রকণ্ঠ, চঞ্চল মণ্ডুকদলের যে সংক্ষিপ্ত ছবিটি ফুটিয়াছে, তাহা এমনই একটি সরল মহিমায় মণ্ডিত যে তাহাকে কাব্য না বলিয়া উপায় নাই। ১০ম মণ্ডলের ৫৮তম সূক্তে মৃত ভ্রাতা সুবন্ধুর আত্মাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য যে আকাংক্ষা অজানিত সুদূর প্রদেশে অতি দূরে বিবস্বানের পুত্র যমের রাজ্যে, সুদূর সমুদ্রে, চতুর্দিকে বিকীর্যমান কিরণমণ্ডলে, অথবা দূরস্থিত পর্বতমালার উপরেও আপনাকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে, তাহার কাব্যমাধুর্য আধুনিক মনকেও আকৃষ্ট করে। কীট্‌সের Life of Sensations আধুনিক শিল্পের মূল উপজীব্য; তাহাতে যেখানে ভাবনা আছে সেখানেও কর্ম্মমুখীনতা নাই; কিন্তু উপরিউক্ত মন্ত্রগুলি কেবল কতকগুলি নিষ্ক্রিয় অনুভূতি অথবা ভাবনারই প্রকাশ নয়; তাহাদের মধ্যে একটি উন্মাদনাও আছে যাহা আদিমযুগের মানুষকে ইষ্ট-সাধনে প্রেরণা দিত।

সুতরাং কাব্য যখন মন্ত্রশক্তির আশ্রয় ছাড়িয়া স্বচ্ছন্দ বিচরণ সুরু করিল, তখন নিশ্চয়ই বহু মনীষী এই নবীন শিশুটির বিস্ময়কর গতিবিধি এবং তাহার উদ্দেশ্য লইয়া মাথা ঘামাইয়াছিলেন। ফ্রয়েড্ তাঁহার 'টোটেম্ এবং ট্যাবু' পুস্তকে বলিয়াছেন যে, আপনার ইচ্ছার উপরে বহিশ্চেষ্টানিরপেক্ষ একটি শক্তির আরোপ করা আদিম মানুষের স্বভাব; তাহার ঐ স্বভাবের জন্যই মন্ত্র এবং তদানুষঙ্গিক যাহা কিছুর উদ্ভব। কবিতা যে ঠিক সর্বার্থসাধক মন্ত্র নয় এ কথা প্রাচীনেরা বুঝিতেন, কিন্তু কী যে তাহার উদ্দেশ্য ইহার কোন মীমাংসা করিতে না পারিয়া নানা জনে নানা মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সর্বাপেক্ষা কৌতুকজনক মতটি এই যে, কাব্য সেই প্রিয়া স্ত্রীর মত, যিনি মনোরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর আত্মারও কল্যাণ সাধন করেন।

আসল কথা হইতেছে, যে প্রাচীন সমাজে গরু হারাইলে তাহাকে খুঁজিয়া দিতে বজ্রপাণি ইন্দ্রের ডাক পড়িত, যে-যুগে বর্ষাপ্লাবিত জলাভূমির চারিদিকে বহুবর্ণ, বিচিত্রকণ্ঠ, কোলাহলরত ভেকদলের নিকট বিস্মিতচক্ষু, ভক্তিবিহ্বল ঋষি ধন-প্রার্থনা করিতেন, সেই মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাসপ্রবণ যুগের ও সমাজের পরিবর্তন হইলেও, শিল্প-প্রচেষ্টার অবসান ঘটে। যে সম্প্রদায় বৈদকযুগে গীত রচনা করিতেন, তাঁহারাই পরযুগে বিশুদ্ধতর ছন্দে শব্দশিল্প রচনা করিয়া চলিলেন। ক্রমশঃ বিষয়বস্তু পরিবর্তিত হইল, ছন্দ এবং অন্যান্য আঙ্গিক উন্নত হইল, এবং শিল্পের প্রয়োজনও ভিন্ন হইয়া পড়িল। এইভাবে সভ্যতার প্রসারে সাহিত্য এবং শিল্পের মন্ত্রযুগ যখন দূরে পড়িয়া রহিল, তখনই দেখিতে পাই ভারতীয় কাব্যতাত্ত্বিকেরা কাব্য বিশ্লেষণে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। দণ্ডী প্রভৃতি আলংকারিকগণ বলিতেছেন, কাব্যের আত্মা হইতেছে অলংকার; নিভূর্ষণ বাক্য কাব্য নয়। বক্রোক্তিবাদিগণ আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, সরল, সহজ বাক্য লৌকিক, তাহা কাব্য নহে। বাক্য আপনা আপনি না বাঁকিলে কাব্য হয় না। বক্র উক্তিই কাব্যকে অলৌকিক মহিমায় মণ্ডিত করে। সুতরাং এবংবিধ স্বভাবোক্তি:

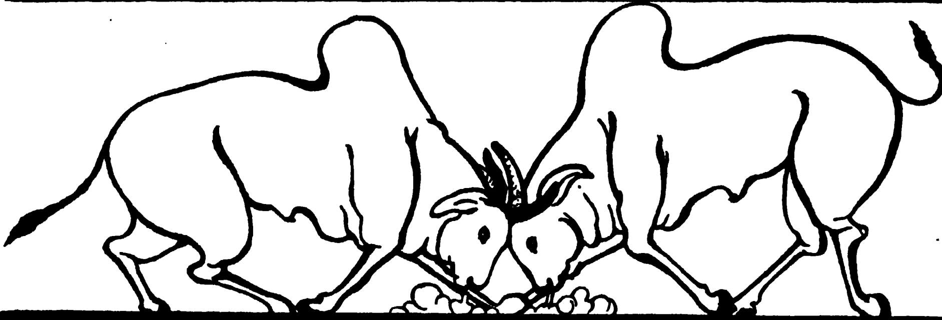
এবংবাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী।
লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী ॥ *

—তাঁহাদের মতে কাব্যই নহে। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ বর্তমানে যাহা লিখিতেছেন তাহা তাঁহাদের চোখে

* 'কাব্য-জিজ্ঞাসা'য় শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

পড়িলে, তাঁহারা আনন্দবিগলিতাশ্রু হইয়া নৃত্য করিতেন সন্দেহ নাই। কাব্যতত্ত্বের বিশ্লেষণে যাঁহাদের কীর্তিকে কোনও পরবর্তী ভারতীয় কাব্যতত্ত্ববিদ্ এখনও ম্লান করিতে পারেন নাই তাঁহারাই রসবাদী বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে রসই হইতেছে কাব্যের প্রাণবস্তু। তাঁহাদের মতে কাব্য হইতেছে সহৃদয়হৃদয়সংবেদ্য, বিভাবানুভাবসমুদিত, বাসনানুরাগসুকুমার, স্বসংবিদানন্দ-চর্বণব্যাপার, রসনীয়রূপ।

সুতরাং দেখিতেছি, কাব্য শেষ পর্যন্ত দাঁড়াইল ব্যষ্টির ভাল লাগা, মন্দ লাগার উপর, যদিও তাহা সহৃদয় ব্যক্তির অপেক্ষা রাখে। আর্য্যজাতি যাযাবরত্ব ছাড়িয়া এখন স্থবির আত্মমুখীনতায় শান্ত হইয়াছে। সমাজচক্র শাস্ত্রসংহিতার দৈবনির্দেশে, পরাজিত দাসজাতির রক্তনিষেকে মসৃণ ভাবে চলিতেছে; নিরুদ্দেশ্য মননশক্তি এখন হয় অদ্ভুত, আত্মপীড়ক তপশ্চর্যায় অথবা সমাজনিরপেক্ষ কল্পনাসৃষ্টিতে চরিতার্থ হইতেছে। নিষ্কর্মার কাছে সংসার বিষবৃক্ষ; সুতরাং তাহার দুইটি অমৃতফল বা আফিঙ্ ফল অবশ্যতঃই লোভনীয়।



অপূর্ব্ব দম্পতি

শ্রীঅপরাজিতা দেবী

সকাল বেলা একটা কাক কেবলই আমার মুখের উপরে ডাকিতে আরম্ভ করিয়া দিল, যেখানে যাই, উড়িয়া গিয়া সামনে বসে এবং ডাকিতে থাকে—ক—ক—ক অ—অ—অ। স্বরটা অলস শিথিল ও কিছু উদাস।

'দূর—দূর লক্ষ্মীছাড়াটা—'

শাশুড়ী বলিলেন—'গাল দিয়ো না, হয়ত ভাল খবর আছে—'

'সত্যি মা? তবে যে বলে কাকের ডাক ভাল না?'

'ডাক শুনলেই ভাল মন্দ বোঝা যায়—কেমন মিষ্টি ডাকছে—শোন না!'

'তা যদি হয়—বুঝলি রে? মিষ্টি খেতে দেব'—কাককে বলিলাম।

দুপুর বেলা একটা চিঠি পাইলাম, অপ্রত্যাশিত খবর যা আশা করি নাই,—জেঠিমা লিখিয়াছেন, সত্য চিঠি দিয়াছে, পশ্চিমে লক্ষ্ণৌ না অযোধ্যা কোথায় আছে, এক বড়লোকের নজরে পড়িয়াছে এবং তাঁহারই কাছে চাকরী পাইয়াছে। কাকের উপর শ্রদ্ধা বাড়িল।

সত্য আমার পিসতুত ভাই—আমার চেয়ে অনেক বড়। মাতুল গৃহে দাদার যে অবস্থা ছিল সে না বলাই ভাল। মামারা অবশ্য ভালই বাসিতেন, কিন্তু জেঠিমা ও মা দু'চক্ষে দাদাকে দেখিতে পারেন নাই। তিন মাইল পথ হাঁটিয়া স্কুলে পড়িয়া ম্যাট্রিক পাস করিল, বড় সাধ কলেজে পড়িবে, জেঠিমার এক তাড়ায় সব গেল বন্ধ হইয়া। একটা বছর বাড়িতে বেকার বসিয়া থাকিয়া এবং মামীদের গঞ্জনা সহিয়া সহিয়া শেষে একদিন দাদা নিখোঁজ হইয়া গেল। সে আজ চারি বছরের কথা।

দাদা বড় সুন্দর ছিল দেখিতে, স্বভাবটা ছিল চাপা ও রাগী। আমি দাদার সবচেয়ে প্রিয় ছিলাম,—এবং আমি ছাড়া দাদাকে ভালবাসিতে, দুঃখ বুঝিতে আর কেউ ছিল না। দাদা নিরুদ্দেশ হইয়া গেলে বাপের বাড়ি আর যাই না বড়—গেলে সুখ পাই না—দাদার কথা তুলিলেই সকলের মুখ বেজার হয়।

সেই দাদার খবর মিলিল—এবং ভাল খবর।

বাপের বাড়ি গিয়া দেখি—দাদার কথা সকলেরই মুখে, দাদা চিঠিপত্র দেয়—মানুষ হইয়াছে—নিশ্চয়ই টাকা-পয়সাও করিয়াছে,—সুতরাং এখন দাদার আদর বাড়িলে আশ্চর্য্যের কি আছে?

আরও বছর দুই পর। দুপুরের ডাকে জেঠিমার চিঠি আসিল—দাদা বিবাহ করিয়াছে সেই বড়লোকের মেয়েকে, বধূর যৌতুক বাবদ দু'শো টাকা পাঠাইয়াছে সকলকে যথাযোগ্য উপহার দিতে।—আমার ভাগ্যে ননদ-পুঁটুলি ত একটা পড়িয়াছেই। জেঠিমা অনেক কিছু লিখিয়াছেন—

আমাদের দেশের নিয়ম-কানুন তারা কিছু জানে না—তাদের প্রথাও আমরা জানি না—তবে বধূর যাহা করণীয় অবশ্য করিবে বই কি।

খবরটা শুনিয়া যেমন আনন্দ তেমনি কৌতূহল হইল—দাদা পশ্চিম দেশে বিয়ে করিল কেন? দেশে কি বউ মিলিল না? সেই হাঁসুলি ও রূপার ভারি ভারি অদ্ভুত গহনা পরা—কপালে টিকুলী, পেটো পাড়িয়া খোপা বাঁধা, রঙে ছোপানো কাপড় কোঁচা দিয়া পরা বউ— দাদার সঙ্গে মানাইয়াছে কেমন? বউদির চেহারাটা কল্পনায় দেখিয়াই অত্যন্ত হাসি পাইল।

তবু বউদিকে দেখিতে সাধ হইল—যে-ই হোক বউদি তো বটে!—দাদার অপূর্ব্ব বিবাহের খবর পাইয়া দেশসুদ্ধ লোক উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে বউ দেখিতে এবং সস্ত্রীক আসিবার জন্য নিমন্ত্রণের পর নিমন্ত্রণের চিঠি চলিতেছে।

মাস দুই পর দাদার চিঠি পাইলাম—আমাকে লিখিয়াছে,—দাদার শ্বশুর বলিয়াছেন বউকে একবার আত্মীয়-স্বজনদের দেখাইয়া আনা কর্ত্তব্য। তাই দাদা সস্ত্রীক বাড়ি আসিতেছে—অতি অবশ্য আমি যেন যাই। আমি না গেলে দাদা বাড়িতে কোনই সুখ পাইবে না,—তা ছাড়া নূতন বউদিটিও আমার কথা দাদার কাছে শুনিয়া শুনিয়া আমায় দেখিবার জন্য খুব উদ্‌গ্রীব। চিঠি পড়িয়া বড় আনন্দ হইল,—ভাবনাও হইল—আহা—আমার হিন্দুস্থানী বউদিটি প্রথম দর্শনে ননদকে না জানি কি অপূর্ব্ব ভাষায় সম্ভাষণ করিবে—আমিই বা কি বলিয়া সেই নথ ও মল-ধারিণীকে অভিনন্দন জানাইব? আমাদের খাস পাঁড়াগাঁয়ের লোকেরাই বা কিরূপে বিদেশী বউটিকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবে!—আমার অমন দাদার কপালে কি শেষে একটা জংলী বউ জুটিল!

উগ্র কৌতূহল লইয়া পিত্রালয়ে চলিলাম।

বাড়িতে ঢুকিয়াই শুনিলাম আগের দিন দাদারা পৌঁছিয়াছে। ব্যস্ত হইয়া বলিলাম—'কোন ঘরে?'

জেঠিমা বলিলেন—'দক্ষিণের ঘরে—'

দাদা আগে বৈঠকখানায় থাকিত। যা হোক ভাল ঘরটা তাহাকে দেওয়া হইয়াছে।

'বউ কই জেঠিমা?'

'ঘরেই আছে—মাগো, কি বউ বিয়ে করলে সত্য—দেশে কি পাত্রী মিলতো না? অমন সোনার ছেলে—'

ততক্ষণ আমি দক্ষিণের ঘরে পৌঁছিয়াছি—ঘরে পা দিয়াই বউ দেখিতে পাইলাম,—একদিকে একটা পুরাণো টেবিলের দুপাশে দুখানা চেয়ার ও টুল। ও পাশের টুলের উপরে বউ বসিয়া,—সোনালী জরিপাড় সবুজ রেশমের সাড়ী পরা—ঘন লাল রংয়ের একটি হাত-কাটা জামা, জামার গলায় ও হাতে সরু রূপালী জরি বসান। দুই হাতের আঙ্গুলে চার পাঁচটি আংটি—গলায় তিন চারিটি খাট লম্বা নানা গড়নের হার—সোনার তৈরি। কানে বড় বড় সোনার ঝুমকা। হাতে সোনার চওড়া কঙ্কণ, বাহুতে চওড়া তাবিজ—পাথর দেওয়া এবং মোটা ঝাঁপা দেওয়া। কপালে ছোট একটি সিঁদুরের টিপ—মোটা মোটা দুইটি চুলের বেণী দু'পাশ দিয়া সামনের দিকে কাপড়ের উপর ঝুলিতেছে,

আগায় লাল ফিতার ফাঁস বাঁধা। একটি পা একটা জলচৌকিতে, আর একটি পা লাল ভেলভেটের চটি জুতার উপরে।

আমার কল্পনা লজ্জায় মুখ লুকাইল—গায়ের রংটি বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল—যেমন টানা কালো চোখ—তেমনি টানা ভুরু—তেমনি পরিপূর্ণ গঠন সর্ব্বাঙ্গের। আংটিগুলি আঙ্গুলে উঠিয়া যেন ধন্য হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী ধরণের নয়—বাঙ্গালীর কোমল চেহারাও নয়,—দেখিলেই বোঝা যায় বাঙ্গালী নয়—কিন্তু এমন আশ্চর্য্য তেজোদ্দীপ্ত সুন্দরী আমি আর দেখি নাই।

ঘরের একদিকে বিছানা—মোটা রঙ্গীন ফুলকাটা কভারে ঢাকা। অপর কোণে ষ্টোভ এবং কিছু হিন্দুস্থানী বাসনপত্র। চীনেমাটির চায়ের সেটও রহিয়াছে। ঘরখানার জীর্ণ সাজসরঞ্জাম বদল হইয়া এক সম্ভ্রান্ত বিলাসিতার ছাপ পড়িয়াছে সর্ব্বত্র।

বউয়ের সামনে এক পেয়ালা দুধ—পিছনে দাঁড়াইয়া একটি হিন্দুস্থানী মহিলা শাসন করিতেছে, বউয়ের মুখের ভাব প্রসন্ন নয়—সম্ভব বকুনি খাইয়া; আপন মনে আঙ্গুল হইতে একটা আংটি খুলিতেছে, আবার পরিতেছে,—কখনও টেবিলে গড়াইয়া দিয়া খেলা করিতেছে।

দাদা বিছানার ধারে দাঁড়াইয়া মাথা আঁচড়াইতেছিল—একটা জামা গায়ে দিয়া টেবিলের কাছে আসিতে আসিতে আমাকে দেখিয়া আনন্দে অবাক হইয়া বলিল—'আরে তুই? কখন এলি? আয়—আয়—'

বউ একবার চোখ তুলিয়া আমাকে দেখিল—কৌতূহলও নাই—বিরক্তিও নাই—নির্ব্বিকার ভাবে।

একটু ক্ষুণ্ণ হইলাম—তখনি মনে হইল—বউ তো আমায় চেনে না। দাদা বলিল—'আয়, চা খাবি আয়—ওঃ কতকাল পরে দেখা।'—নিজের চেয়ারটা আমাকে সরাইয়া দিয়া দাদা আর একটা চেয়ারের উপর হইতে ছোট দুটা বাক্স মাটিতে নামাইয়া সেইটা টানিয়া লইয়া বসিল। বউকে বলিল—'এই অশোকা—'

অমনি বউয়ের মুখে ফুটিল হাসি—উঠিলও না—কথাও বলিল না—শুধু হাসিমুখে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

হিন্দুস্থানী মেয়েটি আমাদের চা দিল—মোহনভোগ, পাঁপড়ভাজা ও লাড্ডু দিল। আমি বলিলাম—'বউয়ের নাম কি দাদা?'

'সরস্বতী।'

বউ আবার হাসিল। বউ দেখিতে দেখিতে আমি চায়ের পেয়ালা ভুলিয়া গিয়াছি।

'বউকে চা দিলে না যে?'

'শরীর ভাল নেই,—তাই দুধ দিয়েছে—তা খাচ্ছে না।'

শরীর খারাপের কোনই লক্ষণ নাই,—তবু বলিলাম—'কি হয়েছে?'

'রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি—বার বার জেগে উঠছিল—যে গরম—তায় নতুন জায়গা—'

ওরে বাবা,—এক রাত্রে ভাল ঘুম না হইলে বউ মানুষের অসুখ করে—এমন কথা এই গৃহস্থ-

ঘরে জন্মেও কেহ শোনে নাই। বউয়ের মুখ দেখিয়াই বোঝা গেল দুধে তাহার রুচি নাই—এই জন্যই ঝি শাসন করিতেছিল।

দাদা আমার দিকে ফিরিয়া কথা বলিতেছিল—পশ্চিমে থাকিয়া দাদার স্বাস্থ্যও যেমন ভাল, চেহারাও অনেক বেশি সুন্দর হইয়াছে—চিক্কণ মিহি জামা-কাপড়—দামী জুতা পায়ে। হাতের আঙ্গুলে একটি হীরার আংটি।

ও দিকে বউ নিঃশব্দে চট করিয়া নিজের দুধের পেয়ালাটি দাদার সামনে সরাইয়া রাখিয়া দাদার চায়ের পেয়ালাটা তুলিয়া লইয়াই নিজের মুখে ধরিল—সঙ্গে সঙ্গে খিল্ খিল্ করিয়া হাসি। হাসির সেই মিষ্ট মধুর সুর ঘর ভরিয়া বাজিতে লাগিল,—অবিশ্রান্ত হাসি,—থামে না।—

এতক্ষণ মহিমময়ী দেবীর মত যে চুপ করিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া ছিল—তাহার মধ্যে তবে মানুষের দুষ্টামি-বুদ্ধিও আছে! এমনি করিয়া প্রথম দর্শনেই সরস্বতী অর্থাৎ আমার বউদি আমার হৃদয় কাড়িয়া লইল।

সরস্বতীর বাবা বড় ব্যবসায়ী—নামকরা লোক। পশ্চিমে নানা জায়গায় অনাথের মত ঘুরিয়া দাদা তাঁহার কাছে চাকরীপ্রার্থী হইল, চাকরী মিলিল—হিসাব রাখিবার,—অর্থাৎ মুহুরীগিরি। তারপর দাদার চেহারা ও অবস্থা দেখিয়া মায়া হইল—পরিচয় লইয়া নিজের পরিবারভুক্ত করিল—অল্প দিনেই দাদা বুদ্ধি ও বিশ্বাসের পরিচয়ও দিয়াছিল, একবছর পরে কারবারের অংশীদার হইয়া গেল। এক কথায় দাদা প্রথম হইতেই শ্বশুরের সুনজরে পড়িয়াছিল।

এর মধ্যে বিধাতা করিলেন কৌতুক। সরস্বতী বাঙ্গালীকে ভালবাসিয়া ফেলিল।

চোখের দেখা শুধু—দাদার অন্দরে গতিবিধি ছিল না, বাদশাজাদী যেমন কালাপাহাড়কে বাতায়ন হইতে দেখিয়া প্রেমে পড়িয়া বরণ করিয়াছিল—তেমনই আর কি! তবে সরস্বতীরা তত পর্দ্দানশীন নয়—বাপের সঙ্গে দেশ-বিদেশ বেড়ায়, তখন দাদাও অনেকবার সঙ্গী হইয়াছে। শ্বশুর উদারমনা লোক, তাঁর সন্তানের মধ্যে এক সরস্বতী, খুসী মনেই বাঙ্গালীর হাতে কন্যাদান করিলেন।

স্বামীকে যে ভালবাসে, স্বামীর দেশকেও সে ভালবাসিবে নিশ্চয়। আগ্রহ করিয়াই সরস্বতী আসিয়াছে এখানে। আনন্দরূপিণী ধনীর দুলালী পরদেশী মেয়েটি নিজের আভিজাত্যগর্ব্বে আলাদা হইয়া থাকে না—সকলের সঙ্গে মিশিতে চায়—কিন্তু না বোঝে সে কারো কথা—না কেউ বোঝে তার কথা।

পশ্চিমের সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে সে—পল্লীর অতি সাধারণ গৃহস্থ মেয়েদের কাজকর্ম্ম চালচলন সবই তার কাছে অপূর্ব্ব অভিনব। যা দেখে, অবাক হইয়া যায়। কিছুই বোঝে না, শুধু হাসে। মা কি জেঠিমা যখন কাহাকেও গালাগালি করেন সে হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে—তাহার হাসি দেখিয়া তাঁহারা সংযত হইয়া যান। রান্নাঘরের দরজায় বসিয়া মাছ তরকারী কাটা—বহু রকম রন্ধন-প্রণালী দেখে আর হাসে। বাঙ্গালীর খাদ্য তারা খায় না,—লখিয়া রাঁধে,—মোটা পরেটা, আতপ চাল, অড়হর বা ছোলার ডাল—নানা রকম মিঠাই লাড্ডু।—

লখিয়া সরস্বতীর ঝি—সর্ব্বদা সরস্বতীকে আগলাইয়া রাখে। বিবাহ-ব্যাপারে সেই ছিল সরস্বতীর প্রধান সহায়।

হায় রে!—দেশে আসিয়া সরস্বতীর কি দশা হইল! এ রকম আশ্চর্য্য অপূর্ব্ব বিবাহ তো কেহ দেখে নাই,—গ্রামে বিপুল আলোড়ন উঠিল। দিনরাত্রি বাড়িতে বিষম ভিড়—বউ দেখিতে আসার বিরাম নাই।

কয়েক দিন পরে অপরিচয়ের প্রথম কুণ্ঠাটা ভাঙিলে আরম্ভ হইল সমালোচনা—সরস্বতীকে মেয়েরা সর্ব্বদা ঘিরিয়া থাকে—বেচারী অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল,—'এই তাবিজ জোড়া ষোল ভরির কম না—ওমা পশ্চিমের গয়না ত আমাদেরই মতন কতকটা—কত রঙের পাথর,—আচ্ছা এগুলো কাঁচ না পাথর?'—সরস্বতীর গলা হাত আঙ্গুল নাড়াচাড়া করিয়া অসঙ্কোচে এই রকম আলোচনা করা আমার ভাল লাগিত না,—যখন তখন যে সে ইচ্ছামত গায়ে হাত দিতেছে—সরস্বতী আদৌ পছন্দ করে না—সেটা তার কুঞ্চিত ভ্রূ দেখিয়াই বুঝিতে পারি,—লখিয়াও চটিয়া যায়।

বলিলাম—'ও রকম ওকে বিরক্ত কর কেন?'

—'ইস্!—তোর তো বড্ড দরদ!—নতুন বউ এলে এমনি করেই লোকে দেখে।'

কেহ বা হাসিয়া সরস্বতীর গায়েই ঢলিয়া পড়ে। যেখানে লখিয়া রাঁধে—সেখানেই বা কি ভিড়—কি সমালোচনা! কয়েক দিনের মধ্যেই সরস্বতী বিব্রত হইয়া উঠিল,—আর ঘর ছাড়িয়া বাহির হয় না—তাহাতেই কি নিস্তার আছে? অতঃপর তাহার ঘরেই আড্ডা বসিতে লাগিল। কৌতূহল আর ফুরায় না,—সমালোচনাও থামে না,—ভাষা না বুঝিলেও ভাব বুঝিতে দেরী হয় না,—দিনে দিনে সরস্বতী কেমন ম্লান হইয়া উঠিল। অমন সুন্দর শোভন কাপড় পরিবার রীতি তার—তারই বা কত ব্যাখ্যানা!—কেহ কেহ কাপড় পরা শিখাইয়া দিতে আসে!

এক এক সময় আমি ঘরে খিল আঁটিয়া দিয়া বসি—তখন সরস্বতী খুব খুসী হয়। আমি ও ও দাদা গল্প করি, বালিকার মত সরস্বতী একবার আমার দিকে, একবার দাদার দিকে চায়,—দাদা বুঝাইয়া দেয়, তখন হাসে—প্রত্যেকটা কথা বোঝানো চাই—একটু দেরি হইলে অমনি ঠোঁট ফুলায়।

দাদার সঙ্গে তার ব্যবহারে কোন লজ্জা নাই—ভাণও নাই,—এক থালায়ই দু জন খাইতে আরম্ভ করিল,—কিম্বা পান লইয়া কাড়াকাড়ি করে,—হয়ত দাদা তার কপালের চুল সরাইয়া দিল—কিম্বা কাণের ঝুমকা ঠিক করিয়া দেয়। সেও হয়ত দাদার কোন কথায় খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া দাদারই পিঠে মুখ লুকায়;—দাদার হাঁটুর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া আমাদের গল্প শোনে।

আমার মত ভক্ত ইহাদের আর কেহ ছিল না। সরস্বতী আমাকে আন্তরিক ভালবাসে সেটা বুঝিয়াছি।

ঘরের ভিতর বদ্ধ থাকিতে থাকিতে সরস্বতী ক্রমে হাঁপাইয়া উঠিল। এক এক সময় দেখি ঘন কোঁকড়া চুলগুলি বালিশে মেলিয়া দিয়া সে শ্রান্ত অলস ভাবে শুইয়া আছে—এই পল্লীর ক্ষুদ্র সংসারে কোথাও তাকে খাপ খায় না, কিছুতেই মিশিতে পারে না—এ কি কম শাস্তি?

বলিলাম—'দাদা, তুমি ওকে নিয়ে যাও—'

দাদা কুণ্ঠিত ভাবে বলিল—'কেউ না বললে—'

'আচ্ছা আমি বলাচ্ছি—'

কেহই রাজী হইল না। দাদার উপর সকলেরই মায়াটা হঠাৎ বড় বেশি হইয়া গিয়াছে। 'সেকি কথা—এতকাল পরে এলো, একটু আদরযত্ন পেরে উঠছিনে—একদিন পিঠে করলাম না, ছাতুর দেশে কি বা ছাই খায়—বাড়ীর বড় ছেলে ওরই তো সব—এখুনি যেতে দিচ্ছি আর কি !'

দাদার মন ভাল—সব ভুলিয়া গেছে। সকলকেই দামী দামী জিনিষপত্র কিনিয়া দিয়াছে, কত টাকা খরচ করে—যে যখন যা চায় অমনি দেয়। তারই বউ—এমন বউ—তার উপর মা জেঠিমার আন্তরিক স্নেহ কই ? মেয়ে-মহলের অত্যাচারে তাঁরাও তো বেশ যোগ দেন দেখি।

একদিন ঘরের চৌকাঠ ধরিয়া সরস্বতী দাঁড়াইয়া আছে, পাড়ার মেয়েরা সরস্বতীকে নিজেদের বাড়ী বেড়াইতে লইয়া যাইতে আসিল—জেঠিমা বলিলেন—'বেশ তো নিয়ে যাও না।'

এটা অন্যায়—নূতন বউ কোথাও যায় না, নিজেদের বউয়ের বেলা ত এত উদার দেখি না।

মেয়েরা অমনি সরস্বতীকে ঘিরিয়া ধরিল, সরস্বতী আমার দিকে চাহিল—আমি হিন্দী বাংলায় মিশাইয়া অনেক চেষ্টায় বুঝাইয়া দিলাম—'এরা তোমায় এদের বাড়ী নিয়ে যেতে চাইছে।'

সরস্বতী মাথা নাড়িল।

প্রশ্নবৃষ্টি সুরু হইয়া গেল—'কেন ? কেন ? কেন যাবে না ? আমরা কি পর ? যেতেই হবে—ছাড়ছিনে—'

সরস্বতী আবার আমার দিকে চাহিল, আবার বুঝাইলাম, 'এরা ছাড়বে না।'

সরস্বতী দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িল, সে কথা বলিলে সকলে হাসে, কাজেই আমি ছাড়া আর কারো সঙ্গে কথা বলে না।

এবার সকলে রীতিমত টানাটানি লাগাইল। কেহ পিছনে, কেহ সামনে, কেহ হাত, কেহ কাঁধ ধরিয়া ঠেলাঠেলি আরম্ভ করিল, সরস্বতীর গায়ে জোরও আছে—অনায়াসে সকলের হাত ছাড়াইয়া ঘরের ভিতর পিছাইয়া গেল।

তখন কি ঠাট্টা বিদ্রূপ, পরাজয়ের লজ্জায় কি তীক্ষ্ণ সমালোচনা ! 'অত ভারি গয়না নেই, কোঁচা ঝুলিয়ে কাপড় পরি নে,—তা বলে আমরা মানুষ নই ? ওমা কি অহঙ্কার, কি দেমাক ! হলেই বা বড়মানুষ—পশ্চিমে ভূত—তার আবার এত ? গরবে বাঁচেন না।'

লখিয়া দূরে দাঁড়াইয়া রাগে ফুলিতেছে। ঘরের মেঝেয় দাঁড়াইয়া স্থির প্রতিমার মত সরস্বতী মেয়েদের মুখের ভঙ্গী ও হাত মুখ নাড়া দেখিতে লাগিল। তাহাকে বুঝিবে এমন কেহ নাই সংসারে —সে যেন একা।

মানায় না—একটু মানায় না।—বাংলার নিতান্ত পল্লীগ্রামের এই অশিক্ষিতা সাধারণ জ্ঞান-বোধহীনা নারীদলের মধ্যে সরস্বতীকে একেবারেই মানায় না।

সরস্বতীর পক্ষ লইয়া আমি কিছু বলিলে বিষম ঝগড়া বাধিত, তবু দুই চারি কথা বলিলাম—উত্তরে শুনিলাম হাজারখানেক।

কিছুক্ষণ পরে ঘরে গিয়া দেখি—দাদা বিছানায় বসিয়া,—সরস্বতী দাদার কোলের ভিতর মুখ লুকাইয়া অবসন্ন ভাবে পড়িয়া আছে,—দাদার মুখ বিষণ্ণ।

পরের দিন জরুরী চিঠি আসিল—কারবারে কাজে অবিলম্বে দাদাকে যাইতে হইবে।

বাঁচা গেল।—এই মুহূর্ত্তে এই ব্যবস্থা ছাড়া সরস্বতীর আর কি উপায় ছিল? দাদা তো নিজ হইতে যাইতে পারিত না—সংসারে যতই লাঞ্ছনা পাক—প্রতিবাদ বা আঘাত করিতে সে কোন দিনই জানে না।

অনেক হা হুতাশ 'আহা' 'উহু'র মধ্যে দাদারা যাত্রা করিল—বিদায়-মুহূর্ত্তে রাজবধূর মত সরস্বতী সাজিয়া বাহির হইল—আমার হাত ধরিয়া মৃদুস্বরে বলিল—'বহিন—দিদি—'

আর কি বলিতে চাহিয়াছিল—হয়ত ভাষায় কুলাইল না কিম্বা আবেগে গলা ধরিয়া বলিতে বাধিল।—লখিয়াকে দেখিলাম বড় প্রফুল্ল,—সে মনের মত করিয়া সরস্বতীকে সাজাইয়া দিয়াছে। যে সাঁচ্চার কাজ করা নীল রংয়ের বেনারসী সরস্বতী পরিয়াছে—খুব কম বড়লোকেই তা কিনিতে পারে,—বাক্সে যে গহনাগুলি ছিল তাও গায়ে উঠিয়াছে,—একখানা চিক্কণ ফিকে গোলাপী রেশমী ওড়না মাথায় দেওয়া—খোঁপার গহনা স্পষ্ট দেখা যায়।

নূতন বাড়িতে যে নূতন অপরূপ ভাব ও আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল তা পিছনে ফেলিয়া সরস্বতী চলিয়া গেল।

ইহার পরে বছর তিনেক কাটিয়াছে,—সরস্বতীর একটি মেয়ে হইয়াছে। সে আমাকে ভোলে নাই—দাদার চিঠিতে সেটা জানিতে পারি।

দাদার শ্বশুর কলিকাতায় একটা বাড়ি করিয়াছেন,—জামাই বাঙ্গালী—সুতরাং বাংলা দেশে একটা বাড়ি থাকা ভাল। তাছাড়া ব্যবসার কাজের জন্যও কলিকাতায় মাঝে মাঝে আসিতে হয়,—সবচেয়ে জরুরী দরকার—সরস্বতী সিনেমায় বাংলা ছবি দেখিতে অত্যন্ত ভালবাসে এবং বাংলা দেশের উপর টানটাও কম নয়।

গৃহপ্রবেশের নিমন্ত্রণ-চিঠি পাইলাম—দাদা সস্ত্রীক কলিকাতা আসিয়াছে—আমাকে যাইতে হইবে—সরস্বতী আমায় দেখিতে ভয়ানক ব্যগ্র।

কলিকাতায় তাহাদের নূতন বাড়িতে আসিয়া উঠিলাম। ভিতরে গিয়া দেখি লখিয়ার কোলে একটি শিশু,—মুখ দেখিয়াই বুঝিলাম দাদার মেয়ে। তাহাকে কোলে লইয়া আদর করিতেছি—পিছন হইতে কে কানের কাছে মিষ্টি সুরে বলিল—'ভাইঝি বড় না বউদি বড়?—'

ফিরিয়া দেখি সরস্বতী।—ভিজে চুলের এক গোছা পিছনে এক গোছা সামনে—গা ভরা তেমনি গহনা, লাল রংয়ের সাড়ী পরা—পরিবার ধরণটি হিন্দুস্থানী,—অৰ্দ্ধেক বাঙ্গালী অৰ্দ্ধেক হিন্দুস্থানী মেয়েটি যেন দুই দেশের মিলনের ছবি!—কি সুন্দর বাংলা বলিতে শিখিয়াছে!—প্রথম দিন তাহাকে দেখিয়াছিলাম অপরিচয়ের মৃদু আলোকে, আজ দেখিলাম আমার চিরপরিচিত কল্যাণময়ীকে বিদেশী ভাষার বাধার উর্দ্ধে—আমার অন্তরের অতি কাছে।

বলিলাম—'তোমার চেয়ে আমার ভাইঝি বেশী সুন্দর—'

'বেশ—বেশ—ভাই সুন্দর—বহিন সুন্দর—তাদের বাড়ীর মেয়ে কেন না সুন্দর হবে? আমাকে কে দেখে? কে জিজ্ঞেসা করে?'—বলিয়া ঠোঁট দুটি ফুলাইল।

বাঃ—বাঃ—বাঙ্গালী কথার কায়দা ও শিখিয়া ফেলিয়াছে! খুবই ভাল লাগিল—তাহার গাল দুটি টিপিয়া দিলাম।

কথা বলিতে বলিতে ভিতরে আসিলাম—সরস্বতী বলিল—'রোজ পথ চেয়ে থাকি—খবর দাওনি কেন? ইষ্টিশানে গাড়ী নিয়ে যেতাম—'

আমার অপেক্ষায় রোজই সে ভোরে উঠিয়া স্নান করিয়া খাবার তৈয়ারি করিতে বসে—সেই কথা বার বার তাহার নিজস্ব বাংলায় আমাকে বুঝাইয়া দিল।

অবিলম্বে টেবিলে চা দেওয়া হইল।—মোটা খাস্তা পরেটা, আলুর ছক্কা, পেস্তা দেওয়া মোহন-ভোগ—মতিচুর—সবই সরস্বতীর হাতের তৈয়ারি।

বাংলার মিহি সরু চাল—তাও পুরাণো,—মাছের ঝোল, সুক্তো—দুর্ব্বল বাঙ্গালীযোগ্য পথ্য। খাদ্য বলিতে হয় পশ্চিমদেশবাসীর।

দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'সরস্বতী সুন্দর বাংলা বল্‌তে শিখেছে ত? কে শেখালে?'

দাদা সগর্ব্বে বলিল—'আমি, আমার মত মাষ্টার কোথা পাবে তোর বউদি?'

সরস্বতী হাসিল। আমি বলিলাম—'লিখতে পারে না?'

সরস্বতী বলিল—'পারি।'

'তবে নিজের হাতে চিঠি লেখনি কেন?'

দাদা বলিল—'ওরে বাপ্‌রে!—তোর বৌদির গরব কত! বলে—তোমার চেয়ে যখন ভাল লেখা হবে—তখন চিঠি লিখ্‌বো—'

'তা হয়েছে নাকি?'

'উঁহু—' দাদা উঠিয়া গিয়া একখান খাতা লইয়া আসিল—পরিষ্কার গোটা গোটা অক্ষরে খাতা ভরিয়া স্কুলপাঠ্য প্রবন্ধ লেখা।

সরস্বতী বলিল—'খুব বেশী দেরি নাই, না দিদি?'

'না—মোটেই না। দাদা, তুমি হেরে গেলে—দশ বছর তুমি লেখাপড়া করেছ—ওর তো মোটে তিন বছর—পাঁচ বছর না হতেই তোমার চেয়ে ঢের ভাল লিখ্‌তে পারবে বউদি—'

'সেটা ত ভাল কথা নয়। শেষে কি গুরুকে ছাড়িয়ে যাবে?'

সরস্বতী মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

দাদা বলিল—'তোর বউদি দেশে যেতে চায়।'

'সত্যি বউদি?'

'হেঁ দিদি,—কিছু জানি নাই—বুঝি নাই—কারো ভাল লাগতো না—এবার আমাকে ভাল লাগবে—না দিদি? লাগবে না?'

সরস্বতীর কথা কিছু হিন্দী মিশানো বাংলা,—কি মিষ্ট শুনিতে!

যে বিদেশিনী রূপে ধনে মানে প্রেমে আমার অভাগ্য দাদার অদৃষ্ট ফিরাইয়া দিয়াছে—স্বামী সন্তান সুখ সৌভাগ্য তার অপর্য্যাপ্ত—তবু নিজের দেশ ও কথা ভুলিয়া স্বামীর দেশ ও কথা নিজের করিয়া লইতে চায়। হৃদয়ে বুঝি লুকানো একটা ব্যথা আছে—তাই সে অক্লান্ত চেষ্টায় বাংলা শিখিয়াছে—বাংলা দেশের সঙ্গে নিজেকে মিশাইয়া দিতে—। কিন্তু সেদিনের সেই মনোরমা বালিকাটিকে যারা ব্যথাই দিয়াছিল—আজ বাঙ্গালিনী সাজিয়া সরস্বতী কি তাহাদের জয় করিতে পারিবে?

কতকগুলি অনাদৃত, পুরাতন পুস্তকপুঞ্জের উদ্দেশে

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

পুরাণো সিঁদুরের দাগলাগা একটা আল্‌মারির নিভৃত কোণে
তোমরা ছিলে !
কত জন এল, গেল—
তোমাদের দিকে চেয়ে
কা'রো বা মনে এল সম্ভ্রম
কা'রো বা অজ্ঞানের উপেক্ষা !
তোমরা ছিলে তোমাদের নিরালা কোণে
তোমাদের জীর্ণ পাতা, জীর্ণ মলাটে
সোনার জলে লেখা নাম—
বন্ধ আল্‌মারির কোণের ধূলো, গুঁড়ো গুঁড়ো কাঠ,
আর অদ্ভুত সব শুঁড়ওয়ালা বইএর পোকার
অনলস কাজের মধ্যে
একে আর একজনের গায়ে হেলান দিয়ে
কাটিয়ে দিলে অনেক বছর।

•

বাইরের মাঠে ফুটেছে আকন্দ, রজনীগন্ধা,
আর সিঁজুকাঁটার ফুল।
কাঁটা-তার-লাগানো আম্‌ড়া গাছের পাতার মধ্যে
ধরেছে আমেরই মত জিরি জিরি মুকুল
তারপরে ধরেছে কসি কসি ফল—
পাশের বেলীফুলের বাগান থেকে
অতর্কিত গন্ধের উচ্ছ্বাস
মন করেছে চঞ্চল,
সারি সারি নারিকেলকুঞ্জের
হিলিমিলি পাতার মধ্যে লেগেছে দক্ষিণার উৎসব—
ডোবার ধারের ফালি পথ ধ'রে
হেঁটে গিয়েছে কত লোক—
কত বর্ষা শরৎ শীত বসন্ত হ'য়ে এসেছ পার—
তোমাদের পাশের জানালা খোলা হ'য়েছে কতবার।
তোমাদের নিঃশব্দ গাম্ভীর্য্যের পাশেই
কত তরুণীর মিলন-নিঃশ্বাস ঘরের বাতাসকে
করেছে আকুল ;
আবার ঘনিয়ে এসেছে কত অশ্রুকরুণ বিরহ রাতি
কত উৎসব, কত পূজা-পার্ব্বণ, কত ধূমধাম—
কত রোগ, কত শোক আর কত মৃত্যু—
পোকায়-কাটা-পাতা আর সোনার জলে লেখা নামের মধ্যে
তোমরা ছিলে তোমাদের বচন আর বচনাতীতকে নিয়ে
কতজনের বিস্ময়স্তিমিত চোখের পাতার স্পন্দন
আজ এল আমার মনে—
পুরাণো একটা আল্‌মারির নিভৃত কোণে
তোমরা ছিলে।

* * তোমরা চেনো আমাকে
আর আমি চিনি তোমাদের :
মাঝের দীর্ঘ ব্যবধান পার হ'য়ে
আজ এলে তোমরা আমার কাছে
অনেকদিনের পুরাণো জীর্ণ পত্রের মধ্যে
আমি খুঁজে পাই আমার শৈশব, আমার কৈশোর—
খুঁজে পাই সেই দুর্লভ আগ্রহ, আর আকুল স্বপ্নের ভুবন !
সামান্য কতকগুলি অক্ষরের মধ্যে
মানব মহামনের স্পন্দন এসে লাগ্‌ত সেদিন
নির্জ্জন গৃহকোণে—
কেরোসিনের আলোর সম্মুখে
তোমাদের ক'রেছিলাম আবিষ্কার !
ঘনবর্ষার রিমিঝিমি ছন্দে,
বাদ্‌লা পোকার পাখার বর্ষণে,
আর হাস্নুহানার ঝোপ থেকে ভেসে আস্‌ত যে সৌগন্ধ,
তা'রই মধ্যে তোমাদের সঙ্গে আমার মিলন
সে কি ভুল্‌বার !

সেদিনের সেই যবনিকা তুলে
একে একে চ'লে এলে তোমরা
আমার এই স্তিমিতশিখ জীবনের প্রদীপ-আলোকে,
যখন ধূলোর ধূলোটে বাজে বৈরাগ্যের সুর,
যখন চুপ ক'রে চেয়ে থাকতেই ভালো লাগে,
একবৃত্ত চক্রগতি জীবনের ভারি গুমোট
যখন মনকে করেছে স্মৃতির রোমন্থ-মন্থর—
সেদিন থেকে এই রকমের দিনগুলিতে এলে চ'লে।
আজ তোমাদের মলাটের ধূলো ঝেড়েই আমার সুখ—
পোকার হাত থেকে তোমাদের বাঁচাব ভেবেই আনন্দ।
আর এই ভেয়ে আনন্দ,
পাতাগুলো খুলব যখন,
তখন সেদিনের সেই যবনিকা তুলে দিও তোমরা
—সেখান থেকে ভেসে আস্‌বে নিভৃত রজনীগন্ধার গন্ধ
আর শ্যামায়িত বনশ্রেণীর সুদূর সঙ্কেত
আর, হয়ত সেই জীবনের কোনো একটা দিনের
স্বর্ণহরিৎ অপরাহ্ণের স্বপ্ন !



চলন্তিকা

'সম্বুদ্ধ'

কলিকাতায় কিছুদিন আগে 'বোমা-সপ্তাহ' উদযাপিত হইয়া গেল। কোথায় ইউরোপে যুদ্ধ, তাহার বোমা ছিটকাইয়া আসিয়া কলিকাতায় পড়িবে বলিয়া পোষ্ট অফিসে ঠেলাঠেলি ভিড়, যে যাহার টাকাকড়ি দেশের বাড়িতে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইতেছে, বোমার ঘায়ে না উড়িয়া যায়। ইহার পরও যে বলিবে, এ জাতের বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টি নাই, সে নিজেই মূর্খ।

বুদ্ধি নাই তো আমাদের আছে কি? দূরদৃষ্টি আমাদের চিরকালই প্রখর ও প্রসিদ্ধ। এত দূরপ্রসারী যে, সে টেলিস্কোপের দৃষ্টিতে নিকটের বস্তুর ছায়াও পড়ে না; পৃথিবীর সংকীর্ণ গণ্ডি ছাড়াইয়া সে দৃষ্টি পরকালের চিলেকোঠায় গিয়া আবদ্ধ হইয়া আছে। এই দূরদৃষ্টিই আর্যসন্তানের বিশেষত্ব।

*

একমাত্র দুঃখের কথা, সেই পরকালের চিন্তাও শান্তিতে করিবার যো নাই। বেয়াড়া বৃষ্টি মাথায় পড়িয়া গোল বাধায়, তাহাকে ঠেকাইতে বটপত্রের খোঁজ করিতে হয়। মাঝে মাঝে সেই বটপত্র দমকা হাওয়ায় নড়িয়া উঠে, হঠাৎ ভয় হয় বুঝি উড়িয়া গেল। তৎক্ষণাৎ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠি।

*

টাকার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও বাড়ি পাঠাইতে পারিলে ভাল হইত। কিন্তু উপায় নাই। চাকুরিটি কলিকাতায়। প্রাণ গেলে পুনর্জন্ম হয়; না হইলে তো বাঁচিয়াই গেলাম। চাকুরি একবার গেলে হওয়া শক্ত।

অগত্যা যে প্রকারে হউক টিকিয়া থাকিতেই হইবে। ভরসার মধ্যে নিজের বাড়িতে থাকি না, বোমা যদিই পড়ে, ভাড়াটে বাড়ির উপর দিয়া যাইবে। এখন শুধু একটু মজবুত দেখিয়া বাড়ি দেখা দরকার। ভাগনেকে বলিলাম, খোঁজ করত, টাওয়ার হাউসের একতলায় ঘর খালি আছে কি না! সেখানে ঘর পাইলে তবু একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইতে পারি, উপরে ছ'তলা প্রমাণ ইমারত না ভাঙিয়া বোমা আসিয়া নীচে পৌঁছিতে পারিবে না।

সে খবর আনিল, ঘর নাই।

*

কি করি, ভাবিয়া মাথা গরম হইয়া উঠিল। একটা বড় পাগড়ি বাঁধিলে হয়। পাগড়ির মধ্যে গোটাকতক স্প্রিং বসাইয়া লইলে তো আরও ভাল।

প্রলয়ের দেবতা শিব কিন্তু বুদ্ধিমান ছিলেন। পরকে মারিয়া বেড়াইতেন, আত্মরক্ষার ফিকিরও জানিতেন। মাথায় একরাশ জটা আর তাহার ফাঁকে ফাঁকে গঙ্গার ধারা, হাজার বোমা পড়ুক, তাঁহার ভয় ছিল না। জটায় বোমা আটকাইয়া যাইত, আঘাতের অভাবে ফাটিত না, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জলে পড়িয়া নষ্ট হইয়া যাইত। বিউবনিক প্লেগের বীজাণু পড়িয়াও সুবিধা করিতে পারিত না। জাহ্নবীর পবিত্র বারি ঘোরতর বীজাণুধ্বংসী, একাধারে গোবর কার্বলিক পটাশ পার্‌মাঙ্গানেট অমৃত ও লাইজলের বিচিত্র সমন্বয়।

একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, শিব অমর ন'ন। সমুদ্রমন্থনের সময় অমৃতটা অন্য দেবতারাই সাবাড় করিয়াছিলেন, শিবের ভাগে পড়িয়াছিল বিষ। অথচ তাঁহাকেই সারাক্ষণ প্রলয় ভূমিকম্প ও রোগবীজাণু প্রভৃতি মারণাস্ত্র লইয়া কারবার করিতে হয়। অ্যান্টিসেপ্‌টিকের বন্দোবস্ত সঙ্গে না রাখিয়া তাঁহার রক্ষা আছে!

*

বিপদ আমাদের। না আছে জটা, না আছে টাক, আমরা মাথা বাঁচাই কি দিয়া? মাথায় স্যাণ্ড-ব্যাগ লইয়া তো আর বেড়ানো যায় না। চেষ্টা-চরিত্র করিয়া জটাই একপ্রস্থ বানাইয়া ফেলিব কি না ভাবিতেছিলাম। বানানো অবশ্য সোজা কথা নয়, গোড়ায় কেশরঞ্জনের সার ঢালিলেও প্রমাণ সাইজের একটা জটা খাড়া করিতে কমপক্ষে দুই বছর লাগে। ততদিনে কেলেঙ্কারি যা হওয়ার হইয়া যাইবে, জটা যখন সারা হইবে, তখন মাথাটা থাকিবে কি না তাহাই ঘোর সন্দেহ।

*

তবুও ভবিষ্যতে আশা রাখিতে হয়। ইতিমধ্যে একটু সুবিধাও হইয়া গেল। যুদ্ধ বাধিয়া ন'টাকা দরের লোহা ছ'চল্লিশ টাকায় উঠিয়াছে, এবং লোহাই কাঁচি' ও ক্লিপের র-মেটিরিয়াল, এই বলিয়া হেয়ার কাটার সেলুনে চুলকাটার দর তিন আনা হইতে সাড়ে পাঁচ আনা হইল। অগত্যা এই যুদ্ধটা শেষ হইলে পরেই চুল কাটিব মনে করিয়াছিলাম। দেড় মাস না কাটিয়া ঘাড়ের গোড়ার চুল সওয়া ইঞ্চি পরিমাণ দীর্ঘ হইয়াছে, এবং জটা একটা বানানো সম্ভব হইলেও হইতে পারে, এই কথাটা মনে উদিত হইয়াছে, এমন সময় তিনকড়িদা আসিয়া দেখা দিলেন। হাতের খবরের কাগজখানা আন্দোলিত করিয়া কহিলেন, ওহে, বোমা কি সত্যই পড়িবে? তোমার কি মনে হয়?

একই প্রশ্ন দিনে লক্ষবার করিয়া পুনরাবৃত্ত হইতে শুনিলে তাহার মাধুর্য আর কানে লাগে না। অনভ্যস্ত চুলের ভারে মাথার মধ্যেও সারাক্ষণ কুট্‌কুট্‌ করিতেছিল। অকারণে চটিয়া কহিলাম, পড়িবে যখন, টেরই পাইবেন।

তিনকড়িদা নাছোড়বান্দা। কহিলেন, আহা সে তো পাইবই। কিন্তু তোমার কি মনে হয়, বল না শুনি।

কহিলাম, আমার মনে হয়, বোমা কিছু পড়াই দরকার। জঞ্জাল কমিত।

তিনকড়িদা বিস্মিত হইলেন মনে হইল। কহিলেন, জঞ্জাল বলিতেছ কাহাকে ?

আমি কহিলাম, জঞ্জাল সকলেই। এরা ওরা এবং আরও অনেকে। আপনি। আমিও।

শেষ পর্যন্ত তিনকড়িদা শুনিলেনও না। হঠাৎ উঠিয়া হনহন করিয়া চলিয়া গেলেন। বুঝিলাম তিনি চটিয়াছেন।

*

কিন্তু চটিলে আমি কি করিব ? আমার নিজের মত চাহিতে তাঁহাকে আমি তো বলি নাই। তিনিই শুনিতে চাহিয়াছিলেন। উত্তর যেখানে হজম করিতে পারিবেন না, সেখানে প্রশ্ন করা তাঁহার উচিত হয় নাই।

তিনকড়ি দা চলিয়া গেলেন। আমি বসিয়া বসিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিলাম। বাহিরের কুটকুটুনি কিছুটা প্রশমিত হইলে অভ্যন্তরটাও একটু শীতল হইয়া আসিল। তখন মনে হইল, কড়া কথাটা না বলিলেও হইত।

*

অথচ কম দুঃখে কথাটা বলি নাই। দেবাংশে-জাত আর্য সন্তানদের কারিকুরি যতই দেখিতেছি, ততই মনপ্রাণ ভরিয়া উঠিতেছে। পুলকে নয়, ধিক্কারে ও বিবমিষায়। মনে হইতেছে, কি হইবে এই জাতের বাঁচিয়া ?

এই ক'দিন আগের একটা ঘটনা বলি। বঙ্গদেশেরই কোন শহরে একটি শিক্ষায়তনে ছাত্রদের মধ্যে 'বিক্ষোভ' চলিতেছিল। তাহাদের অভিযোগ, কর্তৃপক্ষের মধ্যে একজন নবাগত ব্যক্তি তাহাদের যথেচ্ছ উৎপীড়ন ও অপমান করিতেছেন; ইহাকে অপমান করিয়া উহার নামে কুৎসা ও কুরুচিপূর্ণ উক্তি করিয়া, পরস্পরের নামে মিথ্যা কথা বলিয়া, তাহাদের মধ্যে দলাদলি মনোমালিন্যের সৃষ্টি করিতেছেন। অভিযোগটা সত্য, এবং তাহাদের জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, এ বিষয়ে তাহারা সকলেই একমত দেখিলাম। অথচ ইহাও দেখিলাম, তাহারা দিনের পর দিন 'বিক্ষোভ প্রকাশ'ই করিতেছে, স্থানে অস্থানে গিয়া নাকে কাঁদিতেছে, কিন্তু যাহা করিলে প্রতিকারের উপায় হইতে পারে, তাহার কিছুই করিতেছে না। মারামারি করুক এমন কথা আমি বলি না, অশিষ্ট হইতেও উপদেশ দিই না; কিন্তু শিষ্টভাবেই যে প্রতিকার অনায়াসে করা যায় তাহাও না করিয়া পদাহত মানুষ যখন নেড়িকুত্তার মত খালি কেঁউ কেঁউই করে এবং সেই পদাঘাতের দাগ সজল চক্ষে লোককে দেখাইয়া বেড়ায়, তখন আমার ধৈর্য থাকে না। তখন মনে হয়, শিষ্টতার ছদ্মবেশে এই হীনতা, কাপুরুষতার তুলনায় অশিষ্ট হওয়াও শতগুণে ভাল, তাহাতে অন্তত পৌরুষের পরিচয় মেলে।

আমার দুর্ভাগ্য, আমাকে ইহাদের অনেকে চেনে। যথারীতি আমাকেও আসিয়া ধরিল, 'আপনি কি বলেন ?' উপদেশ চাহিতে তাহারা আসে নাই, আসিয়াছে 'বাণী' চাহিতে। আমি যাহা বলিব তাহা করিবে না, সশ্রদ্ধচিত্তে শুনিয়া যাইবে, এবং অন্য কোথাও যখন আবার নাকে কাঁদিতে বসিবে, তখন আমার বাণীটাও সঙ্গে সঙ্গে 'কোট ফ্রম্ মেমরি' করিবে। তাহার জন্য মালমশলা সংগ্রহ করা ছাড়া ইহাদের আর কোন উদ্দেশ্য নাই।

আমি ক'দিন ধরিয়াই দেখিতেছিলাম। কহিলাম, কি আর বলিব ভাই, যা পার তোমরা, তাই কর।

তাহারা ঘন হইয়া আমাকে ঘিরিয়া বসিল। আঙুলে একটা করিয়া ত্রিপত্র দুর্ব্বা থাকিলেই দৃশ্যটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। কহিল, কি করিব বলুন ?

আমি কহিলাম, সকলে মিলিয়া একটা বৃহৎ মাঠে গিয়া জমা হও। গলায় যথাসাধ্য ট্রেমোলো দিয়া বল, 'ভাই সব, এই অপমানে আমাদের তথা সমস্ত ছাত্রসমাজের আত্মসম্মানে যে নিদারুণ আঘাত লাগিয়াছে, তাহার আমরা তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। এবং আমাদের সম্মান ও সম্ভ্রমের যে অপরিসীম ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পরিমাণটা জগৎকে দেখাইতে সভাস্থ সকলকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি, এক মিনিট সময় নিঃশব্দে দণ্ডায়মান হইয়া থাকুন।' পরদিন রিজলিউশনের কপি ও সভার বিবরণ 'আনন্দবাজারে' পাঠাইয়া দিও, সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের প্রত্যেকের নাম দিও। তারপর সেই কাগজ লইয়া গিয়া সদর্পে যে যাহার পিসীমাকে দেখাইয়া বলিও, 'পিসীমা, এই দেখ আমার নাম কাগজে ছাপিয়েছে।'

ইহাই তোমরা করিতে জান; ইহার বাহিরে কিছু করিতে পারিবেও না, সে চেষ্টাও করিবে না জানি।

তাহারা মুগ্ধ হইয়া শুনিল, এবং দাঁত বাহির করিয়া হাসিল। রসিকতটা তাহারা উপভোগ করিল, কিন্তু কথার চাবুকটা ইহাদের লাগিল না। দাঁত বাহির করার পরিবর্ত্তে যদি তাহারা ক্ষেপিয়া আমাকে মারিতে আসিত, আমি অনেক বেশি আনন্দ পাইতাম। স্বীকার করিতাম, তাহারা বেটা-ছেলে, তাহাদের গায়ে রক্ত আছে, তাহাদের অপমান-বোধ আছে।

*

এইখানেই শেষ নয়। পরদিন ইহাদের 'ক্ষোভ' আরও একটু বাড়িল; সমস্ত ছাত্রদের লক্ষ্য করিয়াই খোলাখুলি অপমানের কথা উচ্চারিত হইল।

আমাকে একটি ছেলে আসিয়া কহিল, আচ্ছা, ইহাতে কি কিছু ফল হইবে মনে করেন ?

আমি কহিলাম, লাথিটা যদি পিঠ ছাড়াইয়া বুক পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া থাকে, তবে হয়তো হইবে।

সে অতি আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, কিসের লাথি ?

আমি লজ্জা পাইয়া কহিলাম, আমারই ভুল হইয়াছে ভাই, আর বলিব না।

*

ইহাদের লাথি মারিয়া আবার তাহার 'Short Notes on 'লাথি' ও লাথি Made Easy' লিখিয়া দিতে হয়। না হইলে ইহারা বোঝে না। অথচ ইহারা ছাত্র—দেশের যুবশক্তি, জাতির ভবিষ্যৎ। ইহারা সভা সমিতি আন্দোলন করে, স্টুডেন্টস্ ফেডারেশন বানায়, আরও কত কি করে। ভবিষ্যৎ। কিন্তু 'বর্তমান' ইহারা নয়।

এই ছেলেগুলা ছাত্র বলিয়াই লজ্জাটা আমার বেশি বাজে। যে দেশের ছাত্র এই, তাহার সংসারী লোকেরা কি হইতে পারে? বিলাতি ফ্যাশন আমরা শিখিয়াছি, এবং শিখিয়া মরিয়াছি। অতি বড় বান্ধবের মৃত্যুতে আমরা 'এক মিনিট নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া' শোক উদযাপন করি; লাঞ্ছনা ও অপমানে জর্জরিত হইলে সভা ডাকিয়া 'তীব্র প্রতিবাদ' করি; বাসে কণ্ডাক্টরের হাতে গলাধাক্কা খাইয়া সংবাদপত্রে চিঠি লিখিয়া কাঁদুনি জানাই; অপহৃতা ধর্ষিতা মাতা ভগিনী ও পত্নীর অপমানের প্রতিকার করিতে আমরা আদালতে যাই। যে লাঞ্ছনায় যে অপমানে মানুষ উন্মত্ত হইয়া নরহত্যা করে, আমরা তাহার প্রতিবাদ করি সভা ডাকিয়া, রিজলিউশন করিয়া। ক্বচিৎ কোন মূর্খ এই জড়তাকে ভাঙিতে চেষ্টা করিলে তাহাকে বক্তৃতা দিতে ডাকি, সময় বুঝিয়া হাততালি দিয়া তাহাকে আনন্দিত করি, তারপর নিশ্চিন্ত মনে তাহার কথা ভুলিয়া যাই, শুধু বলি, 'লোকটা বলে ভাল।' ইহা 'ভব্যতা' নয়, 'সভ্যতা' নয়। ভব্যতার নামে ইহা হীনতা ও দুর্বলতার পোষণ। ইহাকে 'সভ্যতা' বলিয়া আমরা গর্ব করি। ক্লীবের ব্রহ্মচর্য্য-গর্বের মতই সে গর্ব অর্থহীন।

*

এই কথাটাই মনে পড়িয়াছিল। মনে হইয়াছিল, বোমা পড়িয়া যদি এই কৃমিকুলের কিছু ধ্বংসই হইয়া যায়, কি ক্ষতি? মানুষ বলিয়া ইহারা বাঁচে না, বাঁচিতে চায় না। শুধু অন্নই যদি ধ্বংস করিবে, ইহারা মরুক, সেই অন্নে শক্তিমানের দেহ পুষ্ট হউক, পৃথিবীর সমৃদ্ধি বাড়িবে।

*

তিনকড়িদা জন্মশাসনের বিরোধী। তিনি বলেন, ইউরোপের দেশগুলা তাহাদের 'ম্যান-পাওয়ার' লইয়া গর্ব অনুভব করে, লোক-সংখ্যা বাড়াইতে চেষ্টা করে। তাহারা জানে লোক অর্থই শক্তি। আর আমাদের দেশ বলে, লোক কমাও। ইহার কোন অর্থ হয়?

হয় না, আমিও মানি। কিন্তু 'ম্যান-পাওয়ার' কথাটা আমার হজম হয় না। তিনকড়িদা ইউরোপের দোহাই দেন, সেখানে একটা পুরুষ-ছেলে অর্থ একটা ভাবী সৈনিক। যে দেশের একটা পুরুষ-ছেলে বলিতে বুঝায় একটা ভাবী কাপুরুষ, সে দেশের লোকের জন্মিবার বা বাঁচিয়া থাকিবার কোন্ সত্যকার অধিকার আছে?

'ম্যান-পাওয়ার' কথাটা শ্রুতিমধুর। কিন্তু সেই 'ম্যান' কোথায়? সব তো দেখি ক্লীবের রাজ্য। পুরুষত্ব তো দেহ-সংস্থানের ব্যাপার নয়। পুরুষত্বের স্থান মেরুদণ্ডে, মনে। সে আপদ আছে, এমন প্রমাণের অত্যন্ত অভাব।

*

কিংবা হয়তো আমারই ভুল। পুরুষত্ব দেশে আছে। বরং গত ক'বছরে বাড়িয়াছে মনে হয়। যে দেশে এত নারীহরণ ও নারীনিগ্রহের ঘটা, সে দেশে পুরুষ নাই, একথা অবিশ্বাস্য। এবং ইহার চেয়েও বড়, অকাট্য ও অলঙ্ঘ্য প্রমাণ সম্প্রতি আমার হস্তগত হইয়াছে।

পঞ্জিকা পড়েন, পঞ্জিকা? পি. এম্. বাক্‌চি, গুপ্তপ্রেস? আমি পড়ি। পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন অতি সুপাঠ্য জিনিস, ভারি সুন্দর সুন্দর তথ্য ও ছবি থাকে।

মাঝখানে বছর কয়েক দেশে ছিলাম না। পঞ্জিকাও পড়িতে পাই নাই। সম্প্রতি দেশে ফিরিয়া দেখিতেছি, দেশের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পঞ্জিকারও।

*

১৩৩৬ ও ১৩৪৬ সালের পঞ্জিকা পাশাপাশি মিলাইয়া দেখুন। দশ বছর আগে পঞ্জিকায় বিজ্ঞাপনের পাতা ভরা থাকিত বিশেষপ্রকার 'ফকিরি দ্রব্যগুণের' বিজ্ঞাপনে। এখন তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে জন্মশাসনের বিজ্ঞাপন। ইহাতেই প্রমাণ হয়, দেশে লোকেদের পুরুষত্ব বাড়িয়াছে। এখনকার বিজ্ঞাপন, সেই দশ বছর আগেকার বিজ্ঞাপনের অবশ্যম্ভাবী ফল।

স্বয়ং পঞ্জিকা এই বিষয়ের সাক্ষ্যপ্রমাণ বহন করিতেছে। ইহার পরেও যাহারা দ্রব্যগুণের মাহাত্ম্যে ও জাতির নবজাগ্রত পৌরুষে সংশয় প্রকাশ করিবে, তাহারা পঞ্জিকা মানে না, তাহারা হিন্দু নহে। তাঁহাদের সহিত আমি কথা বলি না।

*

অতএব আর সেই ম্লেচ্ছদের সঙ্গে বৃথা কথা না বলিয়া পরম পবিত্র পঞ্জিকার চরণেই প্রার্থনা জানাই : হে পঞ্জিকা, যুগ যুগ ধরিয়া তুমি আমাদিগকে জীবনযাত্রার পথের ও ছুটির নির্দেশ দিয়াছ, আজও আমাদের বাঁচাও, তোমার শুভদিনের নির্ঘণ্টে বোমাপতনের পক্ষে প্রশস্ত দিনের নির্দেশ দাও। এই হতভাগ্য নির্বীর্য জাতির মাথায় বোমা পড়ুক, বজ্রপাত হোক, ঝড়ঝঞ্ঝা অগ্ন্যুৎপাত ভাঙিয়া আসুক। অনেকে মরে মরুক ক্ষতি নাই ; কিন্তু সেই দুর্ভাগ্যের আঘাতে বাকি মানুষগুলা মজ্জাগত আলস্য ও ক্লীবত্ব ঝাড়িয়া ফেলিয়া একটু জীবনের সাড়া দেখাক, এই জড়ত্বের কলঙ্ক ঘুচুক। "নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে" বাস করিয়া করিয়া আমরা বলহীন চেতনাহীন পশুতে পরিণত হইয়াছি। যে বিপদে জাতির মেরুদণ্ড গড়িয়া দেশে আবার মানুষের সৃষ্টি হইবে, সে আমাদের শত্রু নয়, পরম মিত্র ; কাপুরুষত্বের এই অতল পঙ্ক হইতে আমাদের উদ্ধার করিতে সে ছাড়া আর কেহ পারিবে না।

*

তাই আজ, হে রুদ্র, নাচ তোমার ভৈরব তাণ্ডব, পাঠাও তোমার মৃত্যুর দূতকে—সেই মৃত্যুর প্রহারে জীর্ণ কঙ্কালের ধ্বংস হইয়া নবজীবনের, নবযৌবনের সূচনা হোক।

আর তাহা যদি না পার, হে প্রলয়ের দেবতা, এই জাতিকে নিঃশেষে ধ্বংস করিয়া দাও। যে অপরিসীম গ্লানি ও হীনতা এই জাতির দেহে ও জীবনে পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার সন্ধান বিদেশীরা এখনও হয়তো পায় নাই। পাইলে আর আমাদের বোমার ভয় করিতে হইবে না। এই ক্লীবদের মারিতে তাহারা তখন বোমার অপচয় ও অপমান করিবে না ; এরোপ্লেনে চড়িয়া দলে দলে আসিয়া শুধু ইহাকে লক্ষ্য করিয়া থুথু ফেলিয়া চলিয়া যাইবে, নিষ্ঠীবনের প্লাবনেই আমরা ডুবিয়া মরিব। সেই লজ্জা হইতে আমাদের বাঁচাও। তোমার আহ্বানে হিমালয় আগ্নেয়গিরি হইয়া অগ্নির প্লাবনে ভারতবর্ষ ভাসাইয়া দিক ; আমাদের কাপুরুষতার অবসান যদি নাই হয়, এই কাপুরুষ-জীবনের অবসান হোক।

নির্জ্জন গৃহকোণে

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

সকাল হয়েছে বটে, রবিরশ্মি কিন্তু এখনও মলিনার ঘরে প্রবেশ করে নি। নদীবক্ষে, বালুকাস্তূপে, পথে প্রান্তরে সর্ব্বত্র সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত। বাগানের গাছের দীর্ঘ ছায়া এসে পড়েছে জানলার সার্সীতে, মলিনার ঘরে তাই আলো নেই।

মধ্যাহ্নে সূর্য্য যখন মধ্যগগনে, তখন এই ঘরে ক্ষণকাল বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ে অজস্র আলো, মেঝের ধূলিকণাগুলি পর্য্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে, প্রাচীরের ওপর থেকে টবের গাছগুলির ছায়া ইতস্ততঃ ভেসে বেড়ায়।

কিন্তু কতক্ষণ, ঘূর্ণ্যমানা পৃথিবী, সূর্য্য সরে যায়, দেয়ালে মেঘের ছায়া ক্রমশঃ প্রসারিত হয়। লাল, নীল, ধূসর কত বিচিত্র ছায়া।

গ্রীষ্মের উত্তপ্ত দিনে আকাশ আর মেঘ যখন পাথরের মত কঠিন, আলোর ঔজ্জ্বল্য রূঢ় রুক্ষ হয়ে ওঠে, এ হোল সে দিনের প্রাকৃতিক ইতিহাস।

মেঘাচ্ছন্ন দিনে আকাশ নেমে আসে নীচে—আরও নীচে। প্রভাত, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন ও সূর্য্যাস্তের কোনও রূপ নেই, বৈচিত্র্য নেই, গতি নেই, মেঘভারাক্রান্ত আকাশে সবই সমান। অন্ধকার বেড়ে চলে। দেয়ালের ছবি ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে আসে। সার্সী সারাদিন বন্ধ—বাইরের জোলো হাওয়া ঘরে না আসে, দীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন প্রদোষান্ধকার সারাদিনকে গ্রাস করেছে।

উজ্জ্বল আর ম্লান—আকাশ নদী বা দিনের এই প্রাকৃতিক ইতিহাসই মলিনার জীবনের সব-চেয়ে বড় কথা, মলিনার অস্তিত্ব যেন আবহাওয়ার সংবাদে দাঁড়িয়েছে। টেম্পারেচার-চার্ট জীবনের একমাত্র পরিবর্ত্তনশীল বৈচিত্র্য।

স্বল্পপরিসর ঘরের এক প্রান্তে মলিনার রোগশয্যা বিছানো, সেখান থেকে জানলা ও দরজা লক্ষ্য করা সহজ। বিছানার ওপর সাদা চীনেমাটির বুদ্ধমূর্ত্তি পড়ে রয়েছে, অসুখের সূচনায় শৈলপতি একদিন এটা কিনে এনেছিল। প্রথম প্রথম বাগান থেকে তুচার রকম ফুল তুলে এনে শৈলপতি মলিনার মাথার দিকের টিপয়ে সাজিয়ে রাখত, ইদানীং আর সময় হয় না, মাস খানেক আগেকার ফুল ফুলদানিতে শুকিয়ে আছে। সেই টিপয়ের ওপরই এখন জমেছে ওষুধের ছোট বড় নানা রকম শিশি, থার্ম্মোমিটার আর টাইমপীস। মলিনা দিনে অন্ততঃ পনের ষোল বার টেম্পারেচার দেখে, তবু তো একটা কাজ, জ্বর বাড়লে বা কমলেও সে খুসী, সেও একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। টাইমপীসটা শৈলপতি সম্প্রতি কিনেছে, সাধারণ টাইমপীস নয়, নতুনত্ব আছে, পিয়ানোর সুরে ঘড়িটা বাজে। আর আছে একটা হাত আরশী, মুখ দেখে দেখে নিজের মুখের সরল, বক্র, কুঞ্চিত রেখাগুলি মলিনার মুখস্থ হয়ে গেছে।

নাম তার মলিনা হলেও বর্ণ তার একদা উজ্জ্বল ছিল, সে হিসাবে তার নাম হওয়া উচিত ছিল সুবর্ণা, কিন্তু ইদানীং অসুখের জন্য মলিনার চেহারা শুধু ম্লান নয়, পাণ্ডুর বিশীর্ণ হয়ে পড়েছে।

এখানকার বড় ডাক্তার শশিশেখরবাবু, অন্য কোথাও প্র্যাকৃটিস করলে হয়তো আরও নাম হোত, কিন্তু এদেশ তাঁর ভাল লাগে তাই এখানেই সারাজীবনটা কাটিয়ে দেবেন স্থির করেছেন। ঘড়ির কাঁটার মতো নিয়মিতভাবে তিনি মলিনাকে দেখে যান, তার উপস্থিতিতে মলিনা পরম প্রশান্তি অনুভব করে, শুধু মর্ফিয়াতেই এই শান্তি সম্ভব। সহসা সে ফিরে পায় জীবনের চাঞ্চল্য, মলিনার অন্তর আনন্দে পক্ষ প্রসারিত করে চেতনাময় যৌবনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়ে।

গতানুগতিকভাবে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ডাক্তারবাবু মলিনার শয্যাপার্শ্বে বসেন, তারপর গম্ভীরভাবে হাত দেখে নাড়ীর গতি অনুভব ক'রে কিছুক্ষণ পরে প্রশ্ন করেন, রাতে ঘুম হয়েছিল? তারপর : সেই ব্যথাটা একটু কম ছিল ত? এর পর মলিনার উত্তরের ওপর নির্ভর ডাক্তারবাবুর দুটি বাঁধা কথা 'বেশ' কিংবা 'হুঁ'। প্রতিদিন একই কথার পুনরাবৃত্তি, কিন্তু সর্ব্বদাই নূতন শক্তি, বিশ্বাস ও নির্ভরতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে মলিনা।

এ সময়টায় শৈলপতি নিয়মিতভাবে ঘরে উপস্থিত থাকে, জানলার ধারে দাঁড়িয়ে উদাসভাবে সিগ্রেটের কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ার অন্তরালে নিজের বিচ্ছিন্ন চিন্তাসূত্রের সন্ধান করে, কখনও আবার মলিনার বিছানার কাছে এসে অসংলগ্ন দুটো একটা কথা কিংবা রসরহস্য করে হেসে ওঠে, কখনও বা ছোটখাট জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখে। শৈলপতির এ একটা কাজ। মলিনা কিন্তু ঠিক এ সময়ে তার উপস্থিতিতে আনন্দিত হোত না, মাথার কাছে যেন গুঞ্জনরত মক্ষিকার ভীতিজনক উপস্থিতি। এই অতি-ব্যস্ততার ভান তাকে আহত করে।

মেয়েদের মতো ক্ষিপ্রতায় শৈলপতি নিজের হাতে সব গুছিয়ে তবে বেরোত, সব কাজ সে এমন সহজভাবে করতো যে মলিনা সময় সময় বিস্মিত হয়ে পড়তো, শৈলপতির কোনো কাজেই ও লাগছে না, এর জন্য মনে মনে মলিনার অনুশোচনার আর সীমা নেই। দশ বছর ওদের বিয়ে হয়েছে, কিন্তু এ দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের মধ্যেও শৈলপতির আবির্ভাব মলিনার কাছে প্রথম দিনের মতো নিবিড় অনুভূতির সৃষ্টি করে, শৈলপতির আশঙ্কাকরুণ স্নিগ্ধ স্পর্শে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে মলিনা আনন্দময় উদ্দেশ্যহীনতায়। সুদীর্ঘ অন্তরঙ্গতার পরও শৈলপতির গতিচঞ্চল সুঠাম দেহভঙ্গিমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মলিনা, সারা দেহমনে সুস্থতা ফিরে পাবার জন্যে তার কত অধীর আগ্রহ।

মৃত সন্তানের মুখে দুগ্ধভারানত স্তন দিয়ে মলিনা একদিন হৃদয়ে যে বেদনা অনুভব করেছিল, আজও মাঝে মাঝে সেই বেদনা ওকে বিহ্বল করে তোলে, তার যা কিছু শ্রেষ্ঠ সম্পদ সব আজ ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে।

বুকের ব্যথা একটু কম পড়লেই মলিনা মনে করে এইবার সে সেরে উঠবে, আর কষ্ট পাবে না, কিন্তু কতক্ষণ। অখণ্ড স্তব্ধতার মাঝে নির্জন গৃহের এই নিরালা কোণে শুয়ে মলিনা বুকের চারপাশে রুগ্ন আঙুলগুলি সঞ্চালিত করে একটু শান্ত হতে চায়, কিন্তু ধীরে ধীরে আবার ব্যথায় যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। যন্ত্রণায় বিভীষিকায় ছিন্ন হয়ে যায় মলিনার অন্তর—সারা দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন অকস্মাৎ বন্ধনমুক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হতে চায়। মলিনা নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে, নড়বার শক্তি নেই।

ক্রমশঃ রাহু-মুক্ত চন্দ্রের মতো মলিনার বেদনার প্রকোপ কমে আসে, মলিনা ভাবে, একাকী এই ঘরের নির্জ্জন কোণে এইবার হয়ত সে মরে যাবে, দেয়ালে জ্বলবে প্রখর সূর্য্যালোক, নদীতে বইবে উচ্ছল জোয়ার। যদি সে মরতে পারতো, অন্ততঃ সে এই যন্ত্রণা-বিভীষিকার হাত থেকে মুক্তি পেত। আর কতদিন!

ব্যথা ক্রমশঃ কমে যায়, নিষ্প্রাণ শক্তিহীন দেহ নিয়ে মলিনা চুপ করে শুয়ে শুয়ে ভাবে, একটা নার্স থাকলে হয়ত ভালো হোত, আজ শৈলপতি এলে বলবে।

সন্ধ্যার পর শৈলপতি ফিরল, উচ্ছ্বসিত উৎসাহে সারা বাড়ি সচকিত করে তোলে—চীৎকার করে ওঠে—কেমন আছো গো রাণী! আজ ফার্ষ্টক্লাস আঙুর পেয়েছি।

মলিনার জীবনে যেন সৌভাগ্য-সূর্য্যোদয় হ'ল, সব ভুলে গেল মলিনা, যন্ত্রণার কথা, রোগের কথা, নার্সের কথা। শৈলপতি মলিনার রুক্ষ চুলগুলিতে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল, আর মলিনা ক্ষীণকণ্ঠে বল্লে—কত কষ্টই না তোমায় দিচ্ছি!

—কষ্ট কি রাণী! তুমি সেরে উঠলেই আমার সুখ। তুমি চুপ করে শোও, কলেজের একজন বন্ধু এসেছেন, একটু চা-টা করে দিই।

স্তিমিত হয়ে আসে মলিনা। পাশের ঘরের কলহাস্য, কথার ভগ্নাংশ মলিনার কানে ভেসে আসে, কত অবান্তর অসংলগ্ন কথা, ম্যালেরিয়া থেকে মহাযুদ্ধ, কি উত্তেজনা! কিন্তু রুগ্না স্ত্রীর পরিচর্য্যায় যার দিন কাটে তার জীবনে উত্তেজনার উৎসাহ কোথায়, কোথায় পাবে সে অফুরান আয়ু, চেতনাময় যৌবন!

সেদিন সকালে যখন শশিশেখরবাবু এলেন, শৈলপতি তখন কোথায় যেন বেরিয়েছে, সেই অবসরে মলিনা ডাক্তারবাবুকে প্রশ্ন করলে, সেরে ত উঠলাম না; মুক্তি কবে হবে বলতে পারেন?

ডাক্তারবাবু হেসে বল্লেন—আমি ত ভগবান নই, কি করে বলি বল?

নির্লিপ্ত কণ্ঠে মলিনা বল্লে—মানে আর কতো দেরী?

স্নিগ্ধ সংযত কণ্ঠে ডাক্তারবাবু বল্লেন—মরণের কথা কেউ কি বলতে পারে, যে কোনো মুহূর্ত্তে তা ঘটতে পারে, কিন্তু অত ব্যস্ত হলে কি চলে মা?

মলিনা আর কথা কয় না।

তারপর কয়েকটি স্তব্ধ মুহূর্ত্ত, বারান্দায় যেন মৃত্যুর পদধ্বনি শোনা যায়। শশিশেখরবাবু আবার কথা সুরু করেন, তোমার কিন্তু নার্স রাখার আপত্তিটা ছাড়তে হবে, আমি কদিন ধরেই বলছি এ ভাবে একা একা থাকা ঠিক নয়।

বিস্মিত হোল মলিনা—বললে,—আমার রাজী হওয়া মানে?

—শৈলবাবু বলছিলেন কি না। তারপর মলিনার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, তা তোমার কি আপত্তি নেই মা?

—আপত্তি মানে, হ্যাঁ আপত্তি—কিন্তু আপনি জানলেন কি করে? যদি দরকার বিবেচনা করেন, তাহলে রাখতেই হবে।

বেশ তাহলে আমি আজই ব্যবস্থা করছি, ভাল লোক আছে, আমার জানা লোক।

ডাক্তারবাবু চলে গেলেন, মলিনা শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল, শৈলপতি নার্স সম্বন্ধে এ কথা বলেছে কেন? ওর সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করলে ও চটে যায়, কিন্তু মলিনাকে সে সত্যি ভালবাসে, মলিনার অসুখের ব্যাপারে ওর দুশ্চিন্তার আর সীমা নেই।

সেদিনই এক পাত্‌লা রঙীন চাদর কিনে আনলে শৈলপতি, মলিনা গায়ে ঢাকা দিয়ে বললে, ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে কিন্তু, ঠিক যেন বিয়ের দিনের মত।

কি-ই বা বলবে মলিনা, তবু কিছুক্ষণ পরে ভয়ে ভয়ে বললে, ডাক্তারবাবু বলছিলেন একজন নার্স রাখা দরকার, আজই পাঠিয়ে দেবেন।

একটু চুপ করে থেকে শৈলপতি বললে, বেশ ত। তারপর অনাবশ্যক হাসি হেসে বললে, আমি ঠিক এই কথাই ভাবছিলুম, ভয় ছিল পাছে তুমি অজ্ঞাতকুলশীলার সঙ্গ অপছন্দ কর, তাই কিছু বলি নি।

পাঁচটার পর নার্স এলো, সুশ্রী, পরিচ্ছন্ন এবং তরুণী। নাম তার জয়ন্তী। রীতিমত আধুনিক এবং শিক্ষিত নার্স। নার্সের আগমনে মলিনা অনেকটা সুস্থ বোধ করতে লাগল, রোগের বোঝা এইবার অপরের ঘাড়ে নামিয়ে সে একটু বিশ্রাম করতে পারবে। শৈলপতির সেবাযত্নের পেছনে মলিনার কুণ্ঠামিশ্রিত তৃপ্তি বর্ত্তমান।

এবার সে উপভোগ করবে অকুণ্ঠিত তৃপ্তি। মলিনার চারপাশে নিয়তই দুশ্চিন্তার জাল প্রসারিত, এই নির্জ্জন গৃহকোণের নিঃসঙ্গ পরিবেশ মলিনার কাছে রোগশয্যার চেয়েও ক্লান্তিকর, ব্যথার চেয়েও দুর্ব্বিষহ হয়ে উঠেছে।

একদিন দুপুরে সদর-দরজার কড়া নড়ে উঠেছিল, সেই সময় ব্যথাটা বেড়েছে, যন্ত্রণায় মলিনা ছটফট করছে, অনেকক্ষণ ধরে কড়া নাড়ার আওয়াজ শোনা গেল, মলিনার ইচ্ছা হোল একবার উঠে দেখে, কিন্তু তার নড়বার শক্তি নেই, চীৎকার করবার সামর্থ্য নেই। মলিনার মনে হোল, তার বেদনা উপশম করবার জন্যে দোর ভেঙে পাশের বাড়ির লোকেরা ছুটে আসছে। সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তে এমন সব সম্ভব অসম্ভব কথা সব মনে পড়তে লাগল যার কোনো মানে নেই, একবার মনে হোল হয়ত শৈলপতি আহত হয়েছে মোটর-দুর্ঘটনায়, ষ্ট্রেচারে করে নিয়ে এসেছে বুঝি তার আহত দেহ! বিপদ ঘটতে কতক্ষণ, এমন তো কত হয়! তারপর, অবশেষে কড়া নাড়ার আওয়াজ থামলো, ধৈর্য্যেরও সীমা আছে। অজ্ঞাত রহস্যে ডুবে রইল মলিনা, কে যে কড়া নাড়লে, তা আর কোন দিন জানা গেল না।

নার্সের আগমনে মলিনা তাই সুস্থ বোধ করছে, বুকের ব্যথাটা একটু কম পড়েছে যেন, বারে কমেছে। মলিনার আর ভয় করে না। জয়ন্তী বই পড়ে, খবরের কাগজ পড়ে শোনায়, গল্প বলে, মাঝে মাঝে আবার মৃদুকণ্ঠে গান গায়। মলিনাকে ভুলিয়ে রাখে জয়ন্তী—নার্স ও সখীর সমন্বয়। মলিনার নির্জ্জনতার কষ্ট, নিঃসঙ্গের দুঃখের অবসান হয়েছে। সূর্য্যদেবের গতিপ্রকৃতি নদীর উচ্ছল স্রোতের হিসাব-নিকাশ আর সে তেমন রাখে না। মানুষ ও সমাজের কথা শুন্‌তে মলিনার আবার ভাল লাগে।

মলিনা আবার নতুনভাবে জীবন সুরু করেছে, ভুলে যেতে চায় এই কয়মাসের গ্লানিকর জীবনের ইতিহাস।

নার্সকে মলিনা জয়ন্তী বলেই ডাকে, শৈলপতি কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে মিস্ সেনের নীচে নামতে পারেনি, তার এই অর্থহীন ভদ্রতা মলিনার ভাল লাগে না। মলিনা চায় জয়ন্তীকে আত্মীয়ের মতো নিবিড় করে টেনে নিতে, তার করুণায় সে পুনর্জ্জীবন লাভ করেছে। জয়ন্তীর সংস্পর্শে এসে আজ মলিনার বাঁচতে ইচ্ছে করে, তাড়াতাড়ি সেরে ওঠবার তার অসীম আগ্রহ। জীবনের যা কিছু রমণীয়, বিছানায় শুয়ে আঙুলের ফাঁকে তা আর গলে যেতে দেবে না মলিনা। শৈলপতির সর্ব্বব্যাপিত্ব ও প্রাধান্য যেন ইদানীং কমে এসেছে, সে আর এখন মলিনার রুগ্ন জীবনের অনিবার্য্য প্রয়োজন নয়, কিন্তু জয়ন্তী এখন অপরিহার্য্য প্রয়োজন।

মলিনা দেখাতে চায় সে যেন সেরে উঠেছে, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই ফিরে আসে ব্যথার প্রকোপ। এবারকার আক্রমণ আরো গভীর—আরো ব্যাপক, ফলে মর্ফিয়া দুদিন মলিনাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখলে, এর পর মলিনা আরো দুর্ব্বল এবং ক্ষীণ হয়ে পড়লো। সেরে ওঠবার বাসনা ভেঙে গেল, জয়ন্তীকেও আর সব সময় ভাল লাগে না, সেই সময় মলিনার মনে হয়, আর এ জীবনে কি প্রয়োজন, বেঁচে থাকার কোনো মানে নেই।

ক্রমশঃ এ ভাবও কাটলো, আবার জয়ন্তীর কাছে মলিনা শোনে হাসপাতালের গল্প, ডাক্তারের কাহিনী, মেট্রনের মেজাজ, আরো কত কি—মলিনা অবাক হয়ে যায়। ডাক্তার আর নার্স, মলিনার কাছে এদের আসন অনেক উঁচুতে, কিন্তু জয়ন্তীর গল্পে অনেক রহস্যের যবনিকা উঠলো।

শৈলপতির মনে আর তেমন আনন্দ নেই, জয়ন্তী ঘরে থাকলে সে মলিনার কাছে আসতে কুণ্ঠিত হয়, মলিনা মনে মনে ভাবে—ঈর্ষা, শৈলপতি এলে তাই জয়ন্তীকে ইসারা করে বাইরে পাঠিয়ে দেয়। তারপর শৈলপতি মলিনার লিক্‌লিকে সরু হাতখানা তুলে নিয়ে আদর করে, দুটো মিষ্টি কথা বলে—আশার কথা, সান্ত্বনার কথা। মলিনা শীগগির সেরে উঠবে।

কিন্তু এও বাঁধা ফর্ম্মুলা, মলিনা যে সেরে উঠবে সে বিশ্বাস তার নেই।

আজকাল শৈলপতির জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতার আভাস পাওয়া যায়। গলার আওয়াজ ভারী, প্রকৃতি গম্ভীর হয়ে ওঠে। একবার ফিরে আসে—আবার কোথায় বেরিয়ে যায়, কপালের কুঞ্চিত রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মলিনা সবই বোঝে। বাক্যের অসংযম, ব্যবহারে দীপ্তির অভাব—সবই তার চোখে ধরা পড়ে। তবু সে নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে চুপ করে থাকে।

মলিনার বিরক্তি বেড়ে যায়, জয়ন্তীকে কি শৈলপতি মলিনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে চায়। শৈলপতির স্বার্থপরতায় মলিনা যতই উত্তেজিত হয়—ততই তার জয়ন্তীর ওপর নির্ভরতা বেড়ে চলে।

আধো-ঘুম আধো-জাগরণে মলিনার মনে হয়, জয়ন্তী যেন স্বর্গের দেবী, মলিনাকে সুস্থ করবে বলে নেমে আস্‌ছে স্বর্গ থেকে, মাথার চারপাশে বিকিরিত স্বর্গীয় জ্যোতির্ব্বন্যা, হাতে অমৃতভাণ্ড, কৃতাঞ্জলিবদ্ধ মলিনা সবিনয়ে অমৃত প্রার্থনা করছে, কিন্তু অদৃশ্য লূতাতন্তুর বাধা অতিক্রম করে

কিছুতেই আর জয়ন্তীর কাছে পৌঁছতে পারছে না, শৈলপতিই সেই অদৃশ্য সূত্রের এক প্রান্ত ধরে আছে, বিশ্রী চীৎকার করে গাত্রবস্ত্রের ঘনতর সংস্পর্শের কৃত্রিম অন্ধকারে মুখ ঢাক্‌লে মলিনা। জয়ন্তী তাড়াতাড়ি ছুটে এলো, কিন্তু সেই যে মলিনার ঘুম ভাঙলো, কিছুতেই আর ঘুম আসে না, অবশেষে জয়ন্তীকে ঘুমের ওষুধ দিতে হ'ল।

শৈলপতির সেদিন শহরে যাবার কথা, ঘুম ভেঙে মলিনা কিন্তু পাশের ঘরে টুক্‌রো টুক্‌রো কথা শুন্‌তে পেলে, কলহাস্যের উচ্ছ্বাসে কথা মাঝে মাঝে চাপা পড়ে যাচ্ছে। তখনও ঘুমের ঘোর ভাল করে কাটেনি, তবুও ঘুম ছাড়িয়ে কথা কানে ছড়িয়ে পড়ছে। মলিনার দক্ষিণের জানলা দিয়ে নদী দেখতে পাওয়া যায়, নিস্তরঙ্গ শান্ত নদীর দিকে চেয়ে নিস্পন্দ মলিনা ক্ষণকাল চুপ করে পড়ে রইল, কান রইলো পাশের ঘরের নর-নারীর গুঞ্জনে। কোনো কথাই স্পষ্ট বোঝা যায় না, তবু পুরুষের কণ্ঠ পরিচিত, শৈলপতির চিরপরিচিত হাসি মলিনার ভোলবার কথা নয়। হাস্যরত শৈলপতির মুখখানি মলিনার স্পষ্ট মনে পড়লো।

প্রকম্পিত হ'ল পৃথিবী, এক মুহূর্তে সব শেষ হ'ল, মূর্ত্তি গেল ভেঙে, সুর হ'ল ম্লান। যে দুজনকে ও বিশ্বাস করে, যাদের ওপর একান্ত অসহায়ের মতো নির্ভর করে আছে মলিনা, তারাই পাশের ঘরে রয়েছে। ভীত, চকিত মলিনা উত্তেজনায় বিছানায় উঠে বস্‌লো। রুগ্নকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করে উঠলো,—জয়ন্তী, জয়ন্তী, নার্স!

রাজ্যহারা অনাথার আকুল আর্ত্তনাদ!

ছুটে এলো জয়ন্তী, একি আপনি উঠেছেন কেন দিদি? সে কথার উত্তর না দিয়ে যেন বিকারের ঘোরে মলিনা চীৎকার করে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, কে কথা কইছে, ওঘরে ওরা কারা?

—ও, ওঘরে, ইলেক্‌ট্রিকের মিটার দেখতে এসেছিল। চলে গেছে। জয়ন্তী দরজাটা আস্তে আস্তে ভেজিয়ে দিলে। এই দরজার সাম্‌নে দিয়েই বাইরে যাবার রাস্তা।

মলিনা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বল্লে—খুলে দাও শীগগির, খুলে দাও দরজা। পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল, একটু হেসে জয়ন্তী দরজা খুলে দিলে। লোকটি ইতিমধ্যে চলে গেছে।

বিছানা থেকে উঠতে গেল মলিনা, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই বুকের ব্যথাটা আবার বেড়ে উঠলো, সেই যন্ত্রণার মধ্যেই মলিনা সদর-দরজা বন্ধ করার আওয়াজ শুনতে পেলে।

জয়ন্তী মলিনার কাছে দৌড়ে এলো, মুখের হাসি তখন মিলিয়ে গেছে। বুকে হাত বুলোতে বুলোতে বল্লে, এখুনি কমে যাবে, সেরে যাবে, ভয় নেই দিদি, আপনি একটু চুপ করে শুয়ে থাকুন।

মলিনা জানে, এ ব্যথা আর সারবে না, খেলা শেষ হ'ল, এবার ভাঙার পালা। যন্ত্রণায় টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে পড়ছে মলিনা, অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে আছে জয়ন্তীর মুখের দিকে, এ ব্যথার অংশ নিক জয়ন্তী, তবু মনে মনে সে আর তাকে বিশ্বাস করে না। জয়ন্তী যেন আর সে জয়ন্তী নয়। মলিনার কাছে আজকের এই ব্যাপারের পর সেবাপরায়ণা নার্স যেন অন্য রূপে দেখা দিলে।

কিন্তু মলিনার ব্যথা কমলে দেখা গেল, জয়ন্তী ফুলে ফুলে কাঁদছে। জয়ন্তী বল্লে, অনেকের

সেবা করেছি, কর্ত্তব্য বলেই করেছি, কিন্তু আপনার কষ্ট আর দেখতে পারি না, আপনি সেরে উঠুন দিদি।

খাটের পাশে বসে মাথাটা বিছানায় এলিয়ে দিয়েছে জয়ন্তী গভীরতম বেদনায়, বিশীর্ণ আঙুল দিয়ে মলিনা সস্নেহে তার মাথার অবিন্যস্ত চুলগুলি ঠিক করে দেয়। এ সংসারকে ভালবাসবার ক্ষমতা আজো মলিনার বর্ত্তমান, এই আনন্দেই সে আত্মহারা হয়ে রইল।

বিছানার চাদরে মুখ ঢেকে জয়ন্তী পড়ে ছিল, মলিনার আঙুলের শান্ত স্পর্শে জয়ন্তীর কঠোর মনোভাব ক্রমশঃ কোমল হতে লাগল।

মলিনা বল্লে, তোমার কাছে যা পেয়েছি তা আমি ভুলতে বসেছিলুম। এর পর মলিনাও কেঁদে ভেঙে পড়ে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে জীবনের গতি-প্রাবল্যের ঝড়, রঙ ও লাস্য সব সে হারিয়েছে, দেয়ালে মাথা খুঁড়ে মরছে শরতের সোনালি রোদ, জানলার সার্সীতে আছাড় খায় নদীর ঢেউ, বর্ষার বৃষ্টিধারা। আর এই নির্জ্জন গৃহকোণে রোগশয্যায় শুয়ে আছে রোগজীর্ণ মূর্ত্তিমতী অশান্তি, মৃত্যুর নিঃশব্দ পদধ্বনি শোনবার আকুল আশায় পড়ে রয়েছে মলিনা।

যথারীতি পরদিন সকালে শশিশেখরবাবু এলেন, সেদিন মলিনাকে দেখে তিনি খুশি হলেন। এতদিনে তবু একটু আশা হ'ল। ডাক্তারবাবু চলে যাবার পর মলিনা ঘুমিয়ে পড়লো—গভীর ঘুম। দুতিন ঘণ্টা পরে ঘুম যখন ভাঙলো, তখন দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকালে পৌঁছেছে। শান্ত হয়ে শুয়ে রইল মলিনা, নদীর গতিবিভঙ্গ লক্ষ্য করতে লাগল। ওপরে অশান্ত ঢেউয়ের উচ্ছ্বাস, অথচ অন্তরে নিবিড় প্রশান্তি। জয়ন্তী বলে—সেরে উঠুন দিদি, সেরে উঠতে কার না সাধ! মাটির ভেতর থেকে উদ্ভিদের উদ্ভব, তারপর একদা নীলবৃন্তে একদিন কুঁড়িতে ফুল ফোটে—সেই তার সার্থকতা, নদীর জল তট-ভূমিতে আছাড় খেয়ে আহত আনন্দে অভিভূত হয়—সেই তার সার্থকতা।

জলতরঙ্গের উদ্দাম উচ্ছ্বাস অন্তরে অনুভব করলে মলিনা। সেই মুহূর্ত্তেই মনে হলো যেন তার নিশ্বাস আটকে আসছে। আতঙ্কে শিউরে উঠলো মলিনা। জয়ন্তী, জয়ন্তী!

কোনো সাড়া নেই, রুদ্ধ ঘরের বাইরে পৌঁছলো না সে আওয়াজ; প্রতিধ্বনি ফিরে এলো, জয়ন্তী, জয়ন্তী!

আর একটু অপেক্ষা করলে মলিনা, কোনই সাড়া নেই। হয়ত জয়ন্তী কলঘরে আছে। খাট ধরে আস্তে আস্তে মেঝেয় নেমে এলো মলিনা, তারপর দেয়াল ধরে ধরে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো।

ছ' মাসের মধ্যে এই প্রথম ঘর ছেড়ে বেরুলো মলিনা।

জয়ন্তী! রুগ্ন কণ্ঠে জোর নেই, অবসন্ন হয়ে মলিনা আবার ডাকলে, জয়ন্তী!

মৃত দেয়ালের গায়ে আহত হয়ে ধ্বনি ফিরে এলো। রান্নাঘরে, দালানে, কলঘরে কোথাও জয়ন্তী নেই, কেউ নেই।

মলিনার পায়ের নীচের মাটি সরে গেল। মলিনা শেষবার ডাকলে, জয়ন্তী! অসীম শূন্যে

মিলিয়ে গেল ক্ষীণকণ্ঠের প্রতিধ্বনি। শুধু দুরন্ত নদীর জল-কল্লোল সেই নির্জ্জন গৃহকোণে ভেসে এলো।

প্রবল হয়ে উঠলো বুকের ব্যথা, সজোরে দুর্ব্বল আঙুল দিয়ে বুকটা চেপে ধরলে মলিনা, এখনই ঘরে ফিরতে হবে, কিন্তু এটুকু পথ ফিরে যাবার ক্ষমতা তার আর নেই, কান্নায় মলিনার চোখ ঝাপসা হয়ে এলো, অসহায় শিশুর মতো কাঁদতে লাগল মলিনা। কুঁড়িতেই শুকিয়ে গেল ফুল, পাপড়ি ঝরে গেল, ফোটার অবসর নেই।

বিছানার ধারে মলিনা পৌঁছতে পারলে না, দক্ষিণের জানলার ধারে ক্ষীণ মুঠিতে চেয়ারটা ধরে মলিনা বসে পড়লো, ব্যথায় যন্ত্রণায় সারা দেহ তার এখনই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

মলিনার চোখে আর জল নেই, ব্যথার যন্ত্রণায় কাঁদবারও তার শক্তি নেই, আতঙ্কের কেন্দ্র থেকে ব্যথার দুঃসংবাদ প্রতিধ্বনিত হয়ে স্নায়ু-শিরায় সংঘর্ষ সুরু করেছে। অসহ্য বেদনায় শতধা বিভক্ত হয়ে পড়লো মলিনার সারা দেহ। বাইরে গর্জ্জন করছে বর্ষা-বিস্ফারিত নদী। কোনো সংযোগ নেই ওদের মলিনার জীবনের সঙ্গে, তবু যেন ওরা একই সূত্রে জড়িয়ে পড়েছে।

এতক্ষণে সদর-দরজা খোলার আওয়াজ হ'ল, জয়ন্তী ফিরলো তাহলে, পরম নির্ভরতায় সাময়িকভাবে বেদনার তীব্রতা কমলো। অর্দ্ধ-অচেতন মলিনা নিস্পন্দের মতো পড়ে আছে।

পায়ের ধ্বনি ক্রমশঃই এগিয়ে এল,—রাণী, কি খবর?

জয়ন্তী নয়, শৈলপতি ফিরলো। মুখে কথা বেরোল না, নড়বার ক্ষমতা নেই মলিনার।

শৈলপতি ঘরে ঢুকে দেখলে—চেয়ার ধরে মেঝেয় পড়ে আছে মলিনা, তার ধূসর রুক্ষ চুলগুলি পিছনে ভেঙে পড়েছে, লুটিয়ে পড়েছে তার বিস্রস্ত কাপড় আর দেহ, রক্তহীন পাংশু মুখে তীব্র ব্যথা ও অসহ্য বেদনার চিহ্ন বর্ত্তমান। মৃত্যুর ভয়ঙ্করতা অবশেষে সেই নির্জ্জন গৃহকোণে এনেছে পরম প্রশান্তি।

জীবন ও মৃত্যুর প্রান্তসীমায় মলিনা মাথা খুঁড়ে মরেছে, ইচ্ছা শক্তি ও সামর্থ্য তার প্রাণহীন দেহ থেকে নির্গত হয়ে নিরাকার সান্ধ্য বাতাসে মিলিয়ে গেছে। ধূসর অন্ধকারের নিবিড় ছায়ায় হারিয়ে গেছে মলিনা—শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে প্রাণশক্তি মুক্তি পেয়েছে। আজ আর শৈলপতির নয়, মৃত্যুর তুহিন-শীতল স্পর্শে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছে মলিনা।



স্বপ্ন

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রভাতে বাহিরে চাহি—
সিন্ধুর মত সুনীল আকাশ চলিয়াছে পরবাহি'।
মেঘের তরণী মোহন লীলায় চলে দিগন্ত পানে,
তারি সাথে মোর উধাও পরাণ কোথা যায় কেবা জানে ?
কর্ম্মক্লান্ত জীবনে আজিকে একটি প্রভাত জাগে,
একটি তপন উদিয়াছে আজি কল্পনা-অনুরাগে ;
বদ্ধ তীরের তরী—
স্বপ্নের স্রোতে কোথা ভেসে যায় অজানায় অনুসরি'।

সে গেছে কোথায় দূরে
নদী ও আকাশ মিশে আছে যেথা দিগ্‌দিগন্ত জুড়ে।
তারি কূলে কোন্ নিভৃত কুটিরে পল্লীপ্রান্তে একা
হেরিছে তোমায় বাতায়ন-পাশে, আননে অরুণ-লেখা।
দু'টি চোখ ভরি' জাগে বিস্ময়, যেন দুই উড়ো পাখী
স্বপন-পাথার ঠেলিয়া চলেছে ফেনিল আলোক মাখি'।
...নগরীর কারা ছাড়ি'
তোমার আমার দু'টি মন আজ সুদূরে দিয়েছে পাড়ি।

মোদের কল্পলোকে
আর কেহ নাই, তুমি আর আমি চলেছি মুগ্ধ চোখে।
জুড়ায়ে গিয়েছে জীবনের তাপ, ফুরায়েছে সব ব্যথা,
আকাশে বাতাসে ভাসে সৌরভ, কুসুমের কোমলতা।
মন্থর বায়ু শিশির-শীতল, ওঠে মৃদু নিঃশ্বসি'
মুহূর্ত্তগুলি পাপড়ির মত ধীরে ধীরে যায় খসি' ;
দু'টি পলাতক মন,
ছায়ায় মায়ায় স্বপনের পথে করিছে সঞ্চরণ।

আলিবর্দ্দী খাঁ ও বাঙ্গালার শাসন-বন্দোবস্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

স্বর্গীয় নিখিলনাথ রায়

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে নওয়াজিস্ মহম্মদ ঢাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া হোসেনকুলী খাঁকে আপনার সহকারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই মুর্শিদাবাদে বাস করায় হোসেনকুলী খাঁর দেওয়ান রায় গোকুলচাঁদ ঢাকা প্রদেশ শাসন করিতেন। এই সময়ে শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম ঢাকা প্রদেশের অন্তর্ভূত হয়। আলিবর্দ্দী খাঁর শ্যালক কাসিমআলি খাঁ * রঙ্গপুরের ফৌজদার নিযুক্ত হন। তিনি তথায় অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। যে সময়ে বাঙ্গলা দেশে আলিবর্দ্দী খাঁর আধিপত্য দূরীভূত হয়, সেই সময় সৈফুদ্দীনআলি খাঁ পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সৈফুদ্দীন নবাব মুর্শিদকুলী জাফর খাঁর সময়ে উক্ত পদ প্রাপ্ত হন। আলিবর্দ্দী খাঁকে বলপূর্ব্বক মুর্শিদাবাদের সিংহাসন অধিকার করিতে দেখিয়া তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিদ্রোহী আলিবর্দ্দীর দমনের জন্য অগ্রসর হইবেন এইরূপ এক ঘোষণা করিয়া দিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে চৈতন্য উদয় হইলে আলিবর্দ্দীর বিরুদ্ধে গমন করা ধৃষ্টতা বিবেচনা করিয়া সৈফুদ্দীন স্বীয় ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন। তাঁহার ঘোষণা অধিক দূর প্রচারিত না হওয়ায় তিনি উন্মাদের ভান করিয়া উক্ত কার্য্যকে গোপন করিতে চেষ্টা করেন। আলিবর্দ্দী খাঁ তাঁহাকে দমন করিতে ইচ্ছা করেন নাই। বিশেষতঃ সম্রাট-দরবারে সৈফুদ্দীনের অনেক আত্মীয়, বিশেষতঃ তাঁহার ভ্রাতা আমীর খাঁ থাকায় এবং আলিবর্দ্দী তাঁহাদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করায়, সৈফের উক্ত ব্যবহার তিনি উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

যে সময় আলিবর্দ্দী খাঁ বঙ্গবিজয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেই সময়ে জৈনুদ্দীন আহম্মদ তাঁহার প্রতিনিধিরূপে পাটনা বা আজিমাবাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তৎকালে মুতাক্ষরীণকার গোলাম হোসেনের পিতা হেদাৎআলি খাঁর উপর কয়েকটি প্রদেশের শাসনভার অর্পিত হয়। জৈনুদ্দীন পাটনার শাসন-কর্ত্তৃত্বের সম্পূর্ণ ভার প্রাপ্ত হইলে, হেদাৎআলিকে সমগ্র বিহারের বক্সীর পদে নিযুক্ত করেন, এবং উভয়ে মিলিত হইয়া যাহাতে সৈন্যরক্ষা, সমস্ত প্রদেশের বন্দোবস্ত প্রভৃতি কার্য্য সুচারু-রূপে সম্পন্ন করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান। হেদাৎআলি জৈনুদ্দীনের সাধু ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার লিখিতমত কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। এই সময় তিনি দেওয়ান রায় চিন্তামণি দাসকে উন্নীত করিবার জন্য আবেদন করিয়া পাঠান এবং তাঁহার আদেশানুসারে চিন্তামণি দাস সমগ্র বিহারের রাজস্বসচিব নিযুক্ত হইলেন। জৈনুদ্দীনের এইরূপ কার্য্যদক্ষতায়

---

* কাসিমআলি খাঁ মিরজাফরের রাজত্বকালে নিহত হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় অন্তঃপুরে এক কোটী টাকা লুকাইয়া রাখেন; মীরণ উক্ত টাকা গ্রহণ করিয়া তাঁহার দুইটি অবিবাহিতা কন্যাকে হতশ্রী করিয়া দেয়।

Matakherin (Foot note) Vol. I. p. 386

সকলেই তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হন। তিনি কার্য্যদক্ষ, সাহসী এবং অত্যন্ত সাধুপ্রকৃতি ছিলেন। আলিবর্দ্দী খাঁর পাটনা পরিত্যাগের সময় মগ প্রদেশের ব্রাহ্মণ জমিদার সুন্দর সিংহ ও ত্রিহুত সুমাই প্রদেশের দুইজন জমিদার তাঁহার সহিত বাঙ্গালা-বিজয়ে যাত্রা করেন। তাঁহারা আপনাদের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আলিবর্দ্দীর নিকট হইতে বহুমূল্য হীরকাদি, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি পুরস্কার লাভের পর গৃহে প্রত্যাগত হইলে জৈনুদ্দীন তাঁহাদিগকে আপনার অধীনে নিযুক্ত করিলেন। আলিবর্দ্দী খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় সৌভাগ্যের চরম সীমায় উপনীত হইলেও উপকারী ব্যক্তিদিগের প্রতি যত্ন করিতে কদাচ পরাঙ্মুখ হইতেন না। তাঁহারা উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতেন। যে যেরূপ ব্যক্তি তাঁহার প্রতি সেইরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শিত হইত। তাঁহারা কি আত্মীয় কি পর সকলকেই সমান চক্ষে দেখিতেন। এই সমস্ত সদ্‌গুণের জন্য সকলেই তাঁহাদিগকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিত। এই সমস্ত কারণে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ সর্ব্বত্র আদর্শ নবাব বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছিলেন।

আলিবর্দী খাঁ উড়িষ্যা-বিজয় করিয়া সৈয়দ আহম্মদকে উক্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু সৈয়দ আহম্মদ স্বীয় কর্ম্মচারী ও প্রজাবর্গের সন্তোষবিধান করিতে না পারায় এক ভীষণ কাণ্ডের অবতারণা হয়। তিনি কাহারও কাহারও পরামর্শে ব্যয়লাঘবের উদ্দেশ্যে সৈন্যগণের ও প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর বেতন হ্রাস করিলেন। যাহারা বিদেশে থাকিয়া স্ত্রীপুত্র প্রতিপালনের আশায় আলিবর্দ্দী খাঁর আদেশমত উড়িষ্যার রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই একে একে কার্য্য পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল এবং তাহাদের স্থান উড়িষ্যাবাসীদিগের দ্বারা পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। * যে সমস্ত কর্ম্মচারী মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া কটকে অবস্থিতি করিতেছিল, তাহাদের উপরে নানা প্রকার অত্যাচার হওয়ায় এবং সৈয়দ আহম্মদ তাহাদিগের কষ্ট দূর করিবার চেষ্টা না করায় তাহারা গোপনে মুর্শিদকুলী খাঁ ও মির্জ্জা বাখরের সহিত যোগদানের চেষ্টা করিতেছিল। এই সময়ে সা এহিয়া নামে একজন কুচরিত্র ফকীর কটকে উপস্থিত হয়। এহিয়া দিল্লীতে সৈয়দ আহম্মদের সহপাঠী থাকায় পূর্ব্বপরিচয়ানুসারে এক্ষণে তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। সৈয়দ আহম্মদ তাহার অত্যন্ত বশীভূত হইয়া পড়িলেন। সে তাঁহাকে যে কুকর্ম্মে প্রবৃত্তি দিত, তিনি কোনরূপ বিবেচনা না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাই সম্পন্ন করিতেন। এইরূপ কুপরামর্শ প্রাপ্ত হইয়া তিনি অত্যন্ত অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন। মুর্শিদকুলীর অর্থ অধিকার করিয়াছে বলিয়া ধনী ব্যক্তিদিগকে যার-পর-নাই কষ্ট দেওয়া হইত, এবং তাহাদের অন্তঃপুরে সেই সমস্ত অর্থ রক্ষিত আছে, এই ছল করিয়া স্ত্রীলোকগণের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচারের আদেশ দিতেন। ফলতঃ ধনী ব্যক্তি অথবা সুন্দরী রমণীর কথা শ্রুত হইলে তাহাদের প্রতি অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত হইত। এহিয়া এই সকল কার্য্যে অত্যন্ত অভ্যস্ত ছিল। তাহার ভবন অত্যাচারাগার হইয়া উঠে এবং দিবারাত্র লোকের হাহাকারে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিত। সে সৈয়দ আহম্মদকে

* রিয়াজে লিখিত আছে যে, সৈয়দ আহম্মদ ব্যয়লাঘবের জন্য সলিম খাঁ, দরবেস খাঁ, নেয়ামত খাঁ ও মীর আজিজ উল্লা প্রভৃতি মুর্শিদকুলী খাঁর সৈনিক কর্ম্মচারীদিগকে অল্প বেতনে নিযুক্ত করেন এবং গুজর খাঁকে মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়া দেন, কিন্তু মুতাক্ষরীণে গুজর খাঁর মুর্শিদাবাদে প্রেরণের কথা নাই।

এরূপ বশীভূত করিয়াছিল যে, তাহার আদেশ প্রতিপালনে কেহই পরাঙ্মুখ হইতে সাহসী হইতেন না। কতিপয় সম্ভ্রান্ত রাজস্ব-কর্ম্মচারী ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তার সময়ে আপনাদিগের দেয় অর্থ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল। এক্ষণে তাহারা ধৃত হইয়া উক্ত দেয় অর্থের জন্য অত্যন্ত উৎপীড়িত হইতে লাগিল। এই প্রকারে লোকের ধন ও মানের উপরে হস্তক্ষেপ করায় উড়িষ্যার যাবতীয় লোক তাঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বিশিষ্টরূপ চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল। সকলেই এইরূপ শাসনকে অত্যন্ত ঘৃণিত বিবেচনা করিতে লাগিল, এবং তাহারা ভয়ে ও ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল। সমস্ত উড়িষ্যাবাসী একমনে একপ্রাণে ইহার প্রতিবিধানের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। তাহাদিগের চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। গুজর খাঁর অধীনে কেবলমাত্র তিন শত সৈন্য ছিল। বেতন হ্রাসের জন্য তাহাদের অনেকে প্রস্থান করিয়াছিল। সেই সমস্ত সৈন্যের মধ্যে অধিকাংশ উড়িষ্যাবাসী। তাহারা মুর্শিদকুলী খাঁকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিত, এবং মির্জা বাখরের উপরও তাহাদের বিশিষ্টরূপ সহানুভূতি ছিল। সাধারণ ও সৈনিক যাবতীয় লোক মির্জা বাখরের উপর সন্তুষ্ট থাকায়, সৈয়দ আহম্মদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কিছু গুরুতরই হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি কটকে এক বৎসর বাস করিয়াও বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহার সুখের অবসান হইয়া আসিয়াছে।

তৎকালে মির্জাবাখর দাক্ষিণাত্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। কিন্তু উড়িষ্যার আশা তাঁহার হৃদয় হইতে একেবারে বিদূরিত হয় নাই। তিনি মুর্শিদকুলী খাঁকে সরফরাজের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রতিনিয়ত উত্তেজিত করিতেন। কিন্তু বহুদর্শী মুর্শিদকুলী খাঁ আলিবর্দ্দীর সহিত বিবাদ করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিতেন না, সেইজন্য মির্জাবাখরের উত্তেজনা তাঁহার মনে স্থান পাইত না। মির্জাবাখর মুর্শিদকে নিতান্ত অনিচ্ছুক দেখিয়া নিজেই উড়িষ্যা অধিকারের উপায় দেখিতে লাগিলেন। তিনি স্বকীয় উৎসাহ ও কৌশল-প্রভাবে কতিপয় দাক্ষিণাত্যবাসীর সহিত বিশিষ্টরূপ আনুগত্য স্থাপন করিয়া তাহাদের দ্বারা কটকের সংবাদ অবগত হইতে লাগিলেন। সৈনিক ও রাজস্ব-বিভাগের এমন কি সৈয়দ আহম্মদের গার্হস্থ্য কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত, এবং তদ্ভিন্ন উড়িষ্যাবাসী সকলেই সৈয়দ আহম্মদের প্রতি অসন্তুষ্ট ও তাঁহার প্রতি অনুরক্ত জানিয়া তিনি তাহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে সকলের মনোভাব অবগত হইয়া তিনি তাহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত তাহারা গুজর খাঁর সৈন্যদিগকে আক্রমণ না করিবে অথবা অন্য কোন প্রকারে তাহাদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি না পাইবে, ততদিন এই সমস্ত পরামর্শ সফল হইবে না। এই সঙ্কেত প্রাপ্ত হইয়া সকলেই আপনাদিগের পথ পরিষ্কারে প্রবৃত্ত হইল। একদিন তাহারা সকলে সমবেত হইয়া রাজপথে "অত্যাচার অত্যাচার" বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। বহুসংখ্যক লোক তাহাতে যোগ দিয়া সমস্ত নগরকে আন্দোলিত করিয়া তুলিল। সৈয়দ আহম্মদ আপনার মোহনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া মিষ্ট কথায় তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিবার জন্য গুজর খাঁকে আদেশ দিলেন। কিন্তু গোলযোগ এরূপ বাড়িয়া উঠিল যে, গুজর খাঁ কিছুই করিতে পারিলেন না। নগরের সমস্ত পথে ও অন্যান্য স্থানে সকলেই চীৎকার করিয়া বিদ্রোহের অবতারণা করিল। কি সম্ভ্রান্ত, কি সাধারণ সকলেই একবাক্যে বর্ত্তমান শাসনের অত্যাচার ঘোষণা করিয়া মুর্শিদকুলী খাঁ ও মির্জা বাখরের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই বিদ্রোহের মধ্যে মুর্শিদের পরিবারবর্গের উদ্ধারকর্ত্তা সা মোরাদ তৎপরতার সহিত সকলকে সৈয়দ

আহম্মদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছিলেন। সা মোরাদ কটক প্রদেশে অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। অনেকে তাঁহার কথায় নির্ভর করিয়া বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করিল। এইরূপে বিদ্রোহীদিগের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, এবং তাহাদের উৎসাহ বাড়িয়া উঠিল। পরদিবস প্রাতঃকালে যখন গুজর খাঁ সৈয়দ আহম্মদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলেন, সেই সময়ে বিদ্রোহীগণ পথিমধ্যে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচারিত হইল যে, মির্জাবাখর নগরের বহির্ভাগে অবস্থিতি করিতেছেন। বস্তুতঃ মির্জাবাখর তৎকালে নগর-প্রান্তেই ছিলেন। তাঁহার নিকট সংবাদ পৌছিলে তিনি বিদ্রোহীদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তোরণদ্বার উন্মুক্ত না হইলে তিনি প্রবেশ করিতে পারিবেন না। বিদ্রোহীরা তোরণ-রক্ষকদিগকে অল্পসংখ্যক জানিয়া তাহাদিগকে ভয়প্রদর্শন করিয়া তোরণদ্বার মোচনের জন্য উত্যক্ত করিতে লাগিল। রক্ষকেরা আপনাদিগের জীবনের আশঙ্কায় সৈয়দ আহম্মদের অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল। মির্জা বাখর স্বীয় অনুচরগণের সহিত নগরে উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহীদিগের সহিত যোগদান করিলে, তাহাদের মধ্যে উল্লাসের স্রোত প্রবাহিত হইল। মির্জা বাখর সৈয়দ আহম্মদকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী-পরিবারকে বারাবতী দুর্গে * বন্দীস্বরূপে পাঠাইয়া দিলেন। তাহার পর মসনদে উপবেশন করিয়া আপনাকে উড়িষ্যার অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিলেন। †

এই বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্ব হইতেই আলিবর্দ্দী খাঁ উড়িষ্যার যাবতীয় সংবাদ প্রাপ্ত হইতেছিলেন। এক্ষণে তিনি মির্জা বাখরের উড়িষ্যা অধিকার, গুজর খাঁর মৃত্যু ও সৈয়দ আহম্মদের কারাবাস শ্রবণ করিয়া সসৈন্যে উড়িষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু তাঁহার মনে হইল যে, দাক্ষিণাত্যের সুবেদার নিজাম-উল্-মুল্কের প্ররোচনা ব্যতীত মির্জা বাখর কদাচ এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে ব্রতী হন নাই। এরূপ চিন্তা করিয়া তিনি আপন কর্ম্মচারী ও আত্মীয়গণের সহিত পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সৈয়দ আহম্মদের মাতা সৈয়দ আহম্মদ ও তাঁহার পরিবারবর্গের মুক্তির আশায় মির্জা বাখরকে উড়িষ্যা প্রদেশ প্রদান করিতে পরামর্শ দিলেন, হাজী আহম্মদও ঐরূপ মত প্রদান করেন। কিন্তু আলিবর্দ্দী খাঁ তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি মির্জা বাখরের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আপনাকে অপমানিত বোধ করা কাপুরুষের কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন। আলিবর্দ্দী স্বীয় দেশব্যাপী সুনাম ও আপনার রাজ্য-শাসনকে কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি অবশেষে এইরূপ জোর প্রকাশ করিলেন যে, তিনি যদি সৈয়দ আহম্মদকে আনয়ন করিতে না পারেন, তাহা হইলে আর মুখ দেখাইবেন না। মুস্তাফা খাঁও আলিবর্দ্দীকে

---

* এই দুর্গ কটকের নিকটবর্ত্তী ; ১৮০১ খৃঃ ইংরাজেরা ইহা অধিকার করেন। Vide Stewart.

† সালাতীনে লিখিত আছে যে, সলিম খাঁ প্রভৃতি বিদ্রোহের সূচনা করিলে সৈয়দ আহম্মদ তাহাদের সহিত পুনর্ম্মিলনের জন্য গোলন্দাজ সৈন্যের অধ্যক্ষ কাসেম বেগ ও কটকের ফৌজদার সেখ হেদায়েত উল্লাকে তাহাদের নিকট পাঠাইলে তাহারা কাসেম বেগকে নিহত করে। তাহার পর নগরবাসিগণের সহিত বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহারা সৈয়দ আহম্মদকে বন্দী করে এবং চিল্কা হ্রদের পরপার চিকাকল হইতে মির্জাবাখরকে আনাইয়া মসনদে স্থাপিত করে।

যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইবার জন্য বারংবার উত্তেজিত করিতেছিলেন। এক্ষণে আলিবর্দ্দী খাঁ মির্জা বাখরকে দমন করিবার জন্য সুসজ্জিত হইতে প্রবৃত্ত হইলেন। মির্জা বাখরের সহিত নিজাম-উল্-মুল্কের যোগ আছে সন্দেহ করিয়া তিনি আপনার সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধি ও রসদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। নূতন সৈন্য সংগৃহীত হইতে লাগিল। এইরূপে মুস্তাফা খাঁর অধীন পঞ্চ সহস্র; সমসের খাঁ, মীর খাঁ প্রত্যেকের অধীনে তিন সহস্র; সর্দার খাঁ ও আতাউল্লা খাঁর অধীনে দুই সহস্র; আমানত খাঁর অধীন সার্দ্ধ সহস্র; হায়দার কুলী খাঁ, ফকিরউল্লা বেগ খাঁ এবং মীরজাফর খাঁ প্রত্যেকের অধীন এক সহস্র; মীর সেরিফউদ্দীন, সা মহম্মদ মসুক, বাহাদুর আলি খাঁ প্রত্যেকের অধীনে পঞ্চ শত; মীর কাসেম খাঁর অধীনে দুই শত সৈন্য এবং ফতেরায় ও অন্যান্য হিন্দু সেনাপতির অধীন পঞ্চাশৎ সহস্র বন্দুকধারী সমবেত করা হইল।* নবাব নওয়াজিস্ মহম্মদকে পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী ও দশ সহস্র পদাতিক প্রদান করিয়া, মুর্শিদাবাদ রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া বিংশতি সহস্র অশ্বারোহী, অগণ্য পদাতিক এবং গোলন্দাজ সৈন্য সহিত উড়িষ্যা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি বর্দ্ধমান অতিক্রম করিয়া মেদিনীপুরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া এরূপ ঘোষণা করিলেন যে, সৈয়দ আহম্মকে যে তাঁহার নিকট আনয়ন করিতে পারিবে, তাহাকে তিনি লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিবেন। যদি কোন সৈনাধ্যক্ষ উক্ত কার্য্য করিতে পারে, তাহাকে কথিত পারিতোষিকের উপর তাহার প্রত্যেক সৈন্যকে দুই মাসের অতিরিক্ত বেতন প্রদান করা হইবে।

এদিকে মির্জা বাখরও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি আলিবর্দ্দী খাঁর আগমন-সংবাদ পাইয়াই তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবার জন্য সজ্জিত হইতে লাগিলেন। যদিও তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আলিবর্দ্দীর সম্মুখীন হওয়া তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নহে, তথাপি তিনি এই ভীষণ বিপদসমুদ্রে আপনার জীবনতরী ভাসমান করিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি কটক হইতে কিছু দূরে মহানদীর তীরে সৈন্য স্থাপন করিলেন। মহানদীকে পশ্চাদ্ভাগে রাখিয়া তাঁহার সৈন্যগণের সমক্ষে পরিখা নিখাত হইল, এবং তথা হইতে প্রায় তিন চারি ক্রোশ দূরে তাঁহার শিবিরে খাদ্যদ্রব্যাদি সঞ্চিত হইল। সৈয়দ আহম্মদও তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সৈয়দ আহম্মদ শ্বেতবস্ত্র মণ্ডিত রথে† উপবিষ্ট ছিলেন, দুইজন ইরাণী মোগল প্রহরীরূপে তাঁহার পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছিল।‡ মোগল-দ্বয়ের প্রতি এইরূপ আদেশ ছিল যে, শত্রুপক্ষকে উপস্থিত হইতে দেখিলে, তাহারা সৈয়দ আহম্মদের উপর সুতীক্ষ্ণ তরবারি চালনা করিবে। পাঁচ শত মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য রথের চারিপার্শ্বে অবস্থিত ছিল। তাহারাও এইরূপ আদিষ্ট হইয়াছিল যে, বিপক্ষগণকে অগ্রসর হইতে দেখিলেই তাহারা আপন আপন বর্শা শকটের প্রতি চালিত করিবে, পরে প্রধান বাহিনীর সহিত মিলিত হইবে। অথবা যেরূপে হউক আত্মরক্ষা করিবে। আলিবর্দ্দী খাঁ মির্জা বাখরের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া আপন কর্ম্মচারিগণের মধ্যে

---

* Vide Mutakherin Vol. I. p. 394-95.

† চতুশ্চক্রযুক্ত গো-শকট।

‡ রিয়াজে লিখিত আছে যে, উক্ত দুইজন মোগল ব্যতীত মুর্শিদকুলী খাঁর ভ্রাতা মহম্মদ আমীন উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে সৈয়দ আহম্মদের পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন।

কতিপয় সুদক্ষ ব্যক্তিকে* আদেশ দিলেন যে, যখন তাঁহারা শত্রুসৈন্যগণকে বিচলিত হইতে দেখিবেন, তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া তাহাদের পশ্চাদ্ভাগ বেষ্টন করিয়া তাহাদের শিবির আক্রমণ করিবেন ও যাহাতে সৈয়দ আহম্মদের উদ্ধার সাধন করিতে পারেন, তাহারই চেষ্টা করিবেন। এইরূপে তাঁহাদিগকে বিদায় করিয়া নবাব নিজে গভীর রজনীযোগে সমস্ত সৈন্যের সহিত যাত্রা করিলেন ও প্রাতঃকালে পরিখাবেষ্টিত বিপক্ষ সৈন্যগণের সম্মুখীন হইলেন। তাহারা সহসা তাঁহার আগমনে ও তাঁহার বিপুল বাহিনী দর্শনে ভয়ে পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাদিগের প্রতি দুই একটি গোলাবৃষ্টি হইতে না হইতেই তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইল। তাহাদিগের এইরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া নবাবের সৈন্যগণ পশ্চাৎ দিক হইতে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। এই সময়ে মুস্তাফা খাঁ ও মীরজাফর খাঁ প্রভৃতি সৈন্যাধ্যক্ষগণ সৈয়দ আহম্মদের উদ্ধারের জন্য শত্রুপক্ষের পশ্চাদ্ভাগে শিবির হইতে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার পথে উপস্থিত হইলে, নবাবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, মীরজাফর খাঁর শ্যালক মহম্মদ আমীন খাঁ এবং আসলৎদ্দৌল্লা খাঁ এই দুইজন দক্ষ কর্ম্মচারী আরও কতিপয় কর্ম্মচারীর সহিত মিলিত হইয়া শিবির অভিমুখে অশ্বারোহণে ধাবিত হইলেন। তাঁহারা শ্বেতবস্ত্রমণ্ডিত রথের নিকট উপনীত হইলে, মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যেরা শকটের উপর বর্শা চালনা আরম্ভ করিল এবং কিছুক্ষণ পরে আপন আপন অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। তাহাদের বর্শা চালনায় দুইজন মোগল রক্ষকের মধ্যে একজন নিহত ও দ্বিতীয় ব্যক্তি আহত হইয়াছিল। সৈয়দ আহম্মদ নিজ দেহ অবনত করিয়া রাখায় সেই ভীষণ বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন।† এই সময় উক্ত কর্ম্মচারীগণ অগ্রসর হইয়া রথমধ্যে সৈয়দ আহম্মদকে অক্ষত শরীরে জীবিত দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। এবং তাহাকে তাঁহাদের একটি অশ্বে আরোহণ করাইয়া‡ নবাবের নিকট লইয়া যাইবার জন্য সকলে সাবধানে অগ্রসর হইলেন। কিছুদূর যাইয়া তাঁহারা মীরজাফর খাঁকে সমাগত হইতে দেখিলেন। মীরজাফর স্বীয় হস্তী হইতে অবতরণ করিয়া সৈয়দ আহম্মদকে তদুপরি উপবেশন করাইয়া তাঁহার রক্ষকস্বরূপে গমন করিতে লাগিলেন। কয়েকটি দ্রুতগামী অশ্বারোহীর দ্বারা নবাবের নিকট সংবাদ প্রেরিত হইল। তাহার অল্পক্ষণ পরে সৈয়দ আহম্মদ আলিবর্দ্দীর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তাহার পর সৈয়দ আহম্মদ স্নান করিয়া গাত্রে গন্ধদ্রব্য অনুলেপনপূর্ব্বক

---

* রিয়াজে লিখিত আছে যে, উক্ত যুদ্ধে মীরজাফর খাঁ সৈন্যাপত্যে বৃত হইয়াছিলেন।

† রিয়াজে লিখিত আছে যে, গ্রীষ্মাধিক্যবশতঃ সৈয়দ আহম্মদ ও মহম্মদ আমীন আসন পরিবর্ত্তন করেন এবং উক্ত রক্ষীদ্বয়ই বর্শা চালনা করিয়া মহম্মদ আমীনকে আহত করে। সৈয়দ আহম্মদ অক্ষতই থাকেন।

‡ রক্ষী আহত মোগল অতীব প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখাইয়াছিল। মহম্মদ আমীন খাঁ প্রথমতঃ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া স্বীয় অশ্ব সৈয়দ আহম্মদকে প্রদান করিবার সময় যেমন তাহার সহিত সকলে কথোপকথন করিতেছিলেন, অমনি সেই আহত মোগলটি একলম্ফে উক্ত অশ্বে আরোহণ করিয়া মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হয়। আমীন খাঁ প্রভৃতি সকলে আপনাদের চক্ষে ধূলি নিক্ষিপ্ত হইল দেখিয়া হাস্য করিয়া উঠিলেন। অবশেষে দীলার খাঁ সৈয়দ আহম্মদকে স্বীয় অশ্ব প্রদান করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন। রিয়াজে উক্ত মোগলের পরিবর্ত্তে মহম্মদ আমীনের অশ্বারোহণের কথা আছে।

নবাবপ্রদত্ত খেলাৎ ও হীরকাদিতে ভূষিত হইয়া মসনদে উপবিষ্ট হইলে, নবাবের আদেশানুসারে যাবতীয় সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহাকে নজর প্রদান করিল। নবাব এক্ষণে সৈয়দ আহম্মদের পরিবার-বর্গকে আনয়নের জন্য বারাবতী দুর্গে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাহারা দুর্গের নিকট উপস্থিত হইলে, দুর্গরক্ষকদিগের মধ্যে কেহ কেহ দ্বারোন্মোচন করিতে স্বীকৃত হইল, কেহ কেহ বা তাহার বিরোধী হইয়া উঠিল। কিন্তু অবশেষে তাহারা দ্বার উন্মোচন করিয়া দিল। নবাবের প্রেরিত সৈন্যগণ সৈয়দ আহম্মদের পরিবারবর্গকে সসম্মানে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিল। নবাব স্বীয় কন্যা ও তাঁহার সন্তানাদি দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন। তাহার পর নবাব সৈয়দ আহম্মদ ও তাঁহার পরিবারবর্গকে হাজী আহম্মদ ও তাঁহার পত্নীর সন্তোষবর্দ্ধনের জন্য মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করিলেন। তাহার পর বাখর খাঁ নবাবের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হন। পুরুষোত্তমরাজের বক্সী মোরাদ খাঁ বাখরের সাহায্যের জন্য সসৈন্যে উপস্থিত ছিলেন। তিনি নবাবের বিপুল বাহিনীর বেগ সহ্য করা অসাধ্য মনে করিয়া বাখর খাঁকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করাইয়া দক্ষিণাপথের দিকে প্রেরণ করেন। উড়িষ্যা সম্পুর্ণরূপে নবাবের করায়ত্ত হইল। কিছুদিন পরে মোখলেশ আলী খাঁকে উড়িষ্যার সহকারী শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া আলিবর্দ্দী খাঁ নবাব বেগম ও সিরাজউদ্দৌলার সহিত মুর্শিদাবাদাভি-মুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তিনি মস্তাফা খাঁর অনুরোধক্রমে মোখলেশ খাঁর পরিবর্ত্তে সা মহম্মদ মস্থম নামক একজন দুষ্ট কর্ম্মচারীকে উড়িষ্যার সহকারী শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠান।

যে সময়ে আলিবর্দ্দী খাঁ উড়িষ্যা-বিজয়ে নিযুক্ত হন, সেই সময়ে পাটনার শাসনকর্ত্তা জৈনুদ্দীন আহম্মদ ভোজপুরের কতিপয় বিদ্রোহী জমিদারকে শাসন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। উক্ত প্রদেশস্থ রাজা গরুৎ সিংহ ও উদ্বন্ত সিংহ নামক দুইজন প্রবল জমিদার নবাবের অধীনতা ছেদন করিয়া আপনাদিগেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। বক্সী সৈয়দ হেদাৎ আলি খাঁর বিহার প্রদেশে অত্যন্ত প্রাধান্য ছিল ; তিনিও যে জৈনুদ্দীনকে সাহায্য করিবেন, ইহা সকলে বিবেচনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু কোন কারণে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। জৈনুদ্দীনের দেওয়ান চিন্তামণি দাস ও হেদাৎ আলির মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। চিন্তামণি প্রভুর নিকট এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন যে, হেদাৎ আলির সহিত জমিদারগণের অত্যন্ত প্রণয় ; তাহারা তাঁহার নিকট হইতে অনেক বিষয়ে আশা করিয়া থাকে। জমিদারগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলে যখন তাহারা নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িবে, তখন হেদাৎ আলির নিকট তাহারা নিষ্কৃতির জন্য আগমন করিলে হেদাৎ আলির অনুরোধ কখনও অবহেলা করিতে পারা যাইবে না। সুতরাং অর্থব্যয় করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যাত্রা করা সম্পুর্ণ ব্যর্থ হইবে। তাহারা মৌখিক অধীনতা স্বীকার করিবে বটে, কিন্তু সুযোগ পাইলেই নিজ নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিতে ত্রুটি করিবে না। অতএব যাহাতে হেদাৎ আলি কিছু দূরে অবস্থান করেন, তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। জৈনুদ্দীন চিন্তামণির প্ররোচনায় বাধ্য হইয়া হেদাৎ আলিকে দূরে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতে তাঁহাকে ত্রিহুত-সুমাই প্রদেশ শাসন ও তাহার রাজস্বের বন্দোবস্তের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে হেদাৎ আলিকে তথায় যাইতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন ত্রিহুত প্রদেশ ও মগধ প্রদেশস্থ রাজা কুঞ্জর সিংহকে দমন করা বিশেষ প্রয়োজন। তাহারা পার্ব্বত্য প্রদেশের অনেক ভূভাগ অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহারা যেরূপ দুর্দ্দান্ত, তাহাতে তাহাদিগকে দমন করিতে

হইলে একজন দক্ষ লোকের যাওয়াই যুক্তিযুক্ত। সুতরাং হেদাৎ আলির তথায় যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এদিকে তাঁহারা সাহাবাদ ও রোটাসের জমিদারগণকে দমন করিতে অগ্রসর হইতেছেন। হেদাৎ আলির ত্রিহুত প্রদেশে অবস্থানের সময় জৈনুদ্দীন তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা মেহেদী নেসার খাঁকে বক্সীর পদ প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন। হেদাৎ আলি চিন্তামণিকে ইহার একমাত্র কারণ জানিয়া বিনা আপত্তিতে আদেশ প্রতিপালনে অগ্রসর হইলেন। এদিকে জৈনুদ্দীনও সাহাবাদের জমিদার-গণের দমনার্থ যাত্রা করিলেন। ভোজপুরের জমিদারেরা অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। তাহারা কৃষক, ব্যবসায়ী, পথিক যাবতীয় লোকের প্রতি অত্যাচার করিত। যে কেহ তাহাদের রাজ্য দিয়া গমন করিত, তাহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া শেষে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইত। জৈনুদ্দীন একদল সুশিক্ষিত সৈন্য ও কতিপয় গোলন্দাজের সহিত তাহাদের দেশে উপস্থিত হইলেন। দুইটি যুদ্ধ ও কয়েকটি অবরোধের পরে জমিদাররা পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। তাহাদের দুর্গ ও বাসস্থানাদি বিধ্বস্ত হইয়া যায়। অবশেষে জৈনুদ্দীন তত্তদ্দেশবাসী কৃষক ও সাধারণ লোকদিগকে সান্ত্বনা দিয়া ও রাজস্ব সম্বন্ধে সুবন্দোবস্ত করিয়া পাটনায় উপস্থিত হন।

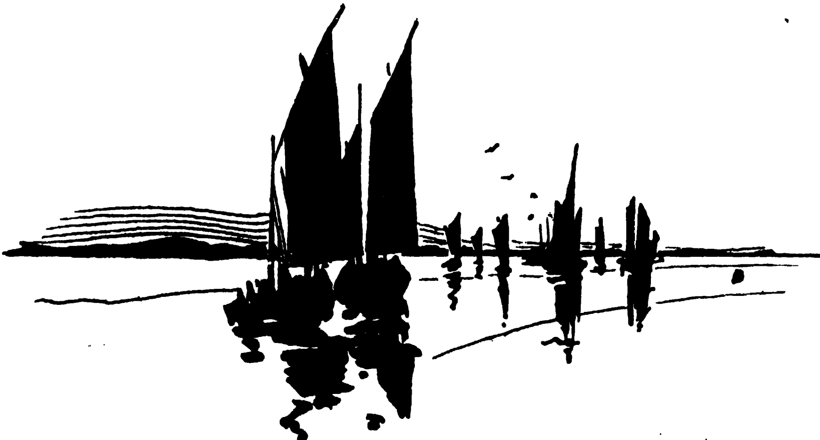
এই সময় রোসেন খাঁ তরাই নামক একজন আফগান কর্ম্মচারী সাহাবাদ ভোজপুরের ফৌজদারী পদে নিযুক্ত ছিল। এই সাহসী আফগান আজিমাবাদ ও এলাহাবাদ প্রদেশে অত্যন্ত সুপরিচিত থাকায় তদ্দেশস্থ জমিদারগণের সহিত ইহার বিশেষরূপ সম্বন্ধ ছিল। জমিদারগণের যাবতীয় অনুরোধ রক্ষার জন্য সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিত। তজ্জন্য রোসেন খাঁ সাহাবাদের জমিদারগণের উচ্ছেদসাধনের বিরোধী হয়। সে নূতন শাসনকর্ত্তা জৈনুদ্দীনের নিকট প্রতিনিয়ত গতায়াত করিত। প্রথমতঃ সে তাঁহাকে যুদ্ধযাত্রা করিতে নিষেধ করে, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া জমিদারগণের দোষ মার্জ্জনা করিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব অধিকার প্রদানের জন্য বিশেষরূপ অনুরোধ করিতে থাকে। জৈনুদ্দীন তাহার কথায় কর্ণপাত করিতেন না। কিন্তু রোসেন তাঁহাকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিত। একদিন সে ক্রোধান্ধ হইয়া জৈনুদ্দীনের প্রতি কিছু রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করে। জৈনুদ্দীন তাহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠেন। তিনি এইরূপ দুঃসাহসী লোককে দমন করিবার জন্য মীর কোদরৎ উল্লা ও দুর্গের অধ্যক্ষ হোসেন বেগকে নিযুক্ত করিলেন। ইহার পর সন্ধ্যাকালে রোসেন খাঁ জৈনুদ্দীনের সহিত সাক্ষাতের জন্য তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইবামাত্র কোদরৎ উল্লা ও হোসেন বেগের সুতীক্ষ্ণ তরবারি তাহার উপর নিপতিত হইয়া তাহাকে ইহলোক হইতে বিদায় করিয়া দিল। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মেহেদী নেসার খাঁকে বক্সীর পদে নিযুক্ত করা হয়। মেহেদী নেসার খাঁ জমিদারগণের সহিত যুদ্ধে অত্যন্ত পরাক্রম প্রদর্শন করায়, তাঁহাকে খেলাৎ হস্তী, অশ্ব, তরবারি প্রভৃতি পুরস্কার দেওয়া হয়। মেহেদী নেসার খাঁ উক্ত পারিতোষিক পাইবার উপযুক্ত পাত্রই ছিলেন। তিনি যেরূপ যুদ্ধকার্য্যে পারদর্শী ছিলেন, সেইরূপ স্বীয় আত্মীয় ও স্বদেশবাসিগণের মঙ্গলের জন্যও সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। তিনি লোকের সহিত সাধু ব্যবহারে, সত্যপালনে এবং জীবনকে পবিত্রভাবে চালিত করিবার জন্য সচেষ্ট হইতেন। তাঁহার ন্যায় চরিত্রের লোক তৎকালে অল্পই দৃষ্ট হইত।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে, সৈয়দ হেদাৎ আলি খাঁ ত্রিহুত ও পার্ব্বত্য প্রদেশের কতিপয়

জমিদারকে শাসন করিবার জন্য গমন করেন। তিনি প্রথমতঃ রামগড়ের রাজাকে দমন করিবার চেষ্টা পান। উক্ত রাজা পার্ব্বত্য প্রদেশের অনেক ভূভাগ অধিকার করিয়া নবাবের অধীনতা স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ হন। এতদ্ভিন্ন পালামৌ প্রদেশের জমিদার সুন্দর সিংহ ও রাজা জয়কৃষ্ণ রায় ও সেবেয়া কুটুম্বা প্রদেশের কতিপয় জমিদারও রামগড়ের রাজার পথানুসরণ করেন। হেদাৎ আলি রামগড় অধিকার করিয়া যখন পার্ব্বত্য প্রদেশের অন্যান্য জমিদারগণকে দমনের চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময় সংবাদ পাইলেন যে, বিরারের মহারাষ্ট্রীয় অধিপতি রঘুজী ভোঁসলা স্বীয় প্রধানকে চল্লিশ হাজার সৈন্যের সহিত বঙ্গবিজয়ে প্রেরণ করিয়াছেন, এবং তাহারা অচিরকালমধ্যেই তাঁহারই নিকটস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশ দিয়া বাঙ্গালাভিমুখে অগ্রসর হইবে। এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র বিহারের শাসন-কর্ত্তাকে তাহা অবগত করাইলে জৈনুদ্দীন নবাবের নিকট সেই সংবাদ প্রেরণ করেন। কিন্তু আলিবর্দ্দী খাঁ তাহাতে বিশ্বাস না করিয়া জৈনুদ্দীনকে লিখিয়া পাঠান যে, তাঁহার চিন্তার কোন কারণ নাই। যখন মহারাষ্ট্রীয়েরা সত্য সত্যই উপস্থিত হইবে, তখন তাহাদিগকে রীতিমত অভ্যর্থনা করা যাইবে। হেদাৎ আলি নবাবের মনোভাব অবগত হইয়া স্বীয় বন্ধুগণের সহিত পরামর্শ করিলেন ও পার্ব্বত্য প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া তাহার প্রান্তভাগে শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ প্রথমে বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, মহারাষ্ট্রীয়গণের বাঙ্গালায় আগমনের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু অল্পকাল পরে আপনার সে ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার সমুদয় রাজত্বের শান্তি তাহাদিগের দ্বারা এরূপ ভাবে বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল যে, দ্বাদশ বৎসর তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিতে হয়। তজ্জন্য তিনি রাজ্যশাসনের অবসর পান নাই। *

---

* স্বর্গীয় পূজনীয় পিতৃদেব রচিত আলিবর্দ্দীর সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের সংঘর্ষের ইতিহাসের অধিকাংশই ১৩৪৫ সালের বৈশাখ হইতে কার্ত্তিক সংখ্যার 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।—শ্রীত্রিদিবনাথ রায়।



চিরবিস্ময়

শ্রীবিভাবতী দেবী

সে যে কতকাল আগে—
পথের পাগল বাহিরিল কোন
অজানার অনুরাগে !
কবে কোন্ দিন উতলা বাতাসে
কার ইঙ্গিতখানি
উন্মনা করি মদির চিত্ত
দিয়েছিল হাতছানি।
চঞ্চল তার রঙিন পরাণে
লেগেছিল শিহরণ,
কোথাকার কোন অজানা ব্যথায়
কেঁপেছিল তনু মন !
কত গিরি দরি বন কান্তার
পার হল পরে পরে,
সেই অজানারি প্রতি ছায়া দেখি
নিখিলের ঘরে ঘরে।
কোন্ বেদনায় অদ্রি-অশ্রু
নির্ঝর-রূপ ধরি'—
নামিল ধরার উষর বক্ষ
সরস শ্যামল করি'।
সৌর ভুবন, অন্ধ আকাশ
করিয়া দীপ্যমান
ব্যোমচারণের পন্থা বহিয়া
কেন ঘোরে দিনমান !
মুক্ত বিহগ সম অন্তর
কল্প পাখার ভরে,
ঊর্দ্ধাভিযান করিছিল যবে
গগন-বর্ত্ম ধরে,
তারালোক হতে এসেছিল ভেসে
কার যেন সুধা-স্বর,
নিঃসীম নীল মন্থর ব্যোম
কেঁপেছিল থর থর।

গগনের বুকে হেরিয়া চাঁদের
রভসের উৎসব,
বিপুল বারিধি-বুকে কেন জাগে
তরঙ্গ-বিক্ষোভ।
মেরু হতে মেরু প্রান্তর পারে
চলেছিল অভিযান,
ইঙ্গিতই শুধু এল হাসে ভাসে
নাহি পেল সন্ধান।
চকিতে কখনও হয়েছিল মনে
ওই বুঝি তার ছায়া।
আতপ্ত মরু বক্ষেতে হায়,
সে যে মরীচিকা-মায়া।
মানব-রচিত দেউলে দেখিয়া
মানবের গড়া দেবে,
প্রতি রূপে রূপে কোন্ অপরূপে
মরিল সে ভেবে ভেবে !
শুনিল অনেক শাস্ত্র-কাহিনী
পুরাণের কথা কত,
সৌরী, শৈব অনেক দেখিল,
বৈষ্ণব কত শত।
বহু পথ তবু পন্থা কোনই
দেখিল না কিবা আছে,
বিমূঢ় চিত্তে ঘুরে ম'ল শুধু
গোলকধাঁধাঁর মাঝে।
এখন সন্ধ্যা ঘনায়ে এসেছে
নেমেছে অন্ধকার,
আয়ুবিহঙ্গ অচিরে হইবে
মৃত্যু-তোরণ পার
তবু কৌতুক নাহি হল শেষ—
নব নব বিস্ময়,
সেই চিরচেনা সেই সে অজানা
দেখাইল বরাভয়।

দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থকে সুপ্রাপ্য করেছেন—তাতে সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকসমাজের বিশেষ কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। বহু লোকে এ-গ্রন্থগুলি পড়বেন না, কেননা এখন শুনি আমাদের যুগ হচ্ছে রসসাহিত্যের যুগ—অর্থাৎ বাঙ্গালী পাঠক ও পাঠিকারা এখন রসসাহিত্যই গলাধঃ করতে প্রস্তুত। সে রসসাহিত্যের অর্থ যাই হোক।

এঁদের পুনঃপ্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে মাত্র দুখানি পুস্তিকা আছে, যাকে এ যুগের নব আলঙ্কারিকরা রসসাহিত্য বলবেন। একখানির নাম 'নববাবুবিলাস'—অপরখানির 'নব বিবি বিলাস'। এ-দুখানির বিষয়ে আমি কিছু বলব না, কেননা এর রস আমার মুখরোচক নয়। এদের অন্তরে যদি কোন রস থাকে ত সে চিটেগুড়ের রস। তার ঘ্রাণেই অর্দ্ধবমন হয়ে যায়।

বাকিগুলি আর যে শ্রেণীর সাহিত্য হোক, রসের সাহিত্য নয়। এ সাহিত্য বৈষ্ণব পদাবলীর জের টানেনি। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' রসসাহিত্য নয়—কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'পাষণ্ডপীড়ন'ও প্রেমের কথায় ভর্ত্তি নয়। এ সত্ত্বেও আমাদের জনকতকের পক্ষে এগুলি খাঁটি দলিল —কিসের তা পরে বলছি। আমাদের মত যাঁদের বাঙলার নিকট অতীত সম্বন্ধে কৌতূহল আছে, তাঁরা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালার প্রকাশককে বাহবা দিতে বাধ্য। বাঙলার আদি গদ্য গ্রন্থগুলি খুঁজে বার করাও পরিশ্রমসাপেক্ষ। প্রতি লেখকের নাম ধাম কাল আবিষ্কারও সহজে করা যায় না। এ যুগে আমরা অধিকাংশ সাহিত্যিকরা অলস। Facts উদ্ধার করবার জন্য আমরা খাটতে প্রস্তুত নই। আমরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কাল নির্ণয় করতে ব্যস্ত—যদিচ সে কাল নির্ণয় করা অসম্ভব। তা ছাড়া যাঁরা পুরাতত্ত্ব নিয়ে মশগুল, তাঁরা কেউ কেউ আবিষ্কার করেন যে নিত্যানন্দের জন্মস্থান বীরভূমের একচাকা গ্রাম আর মহাভারতের একচক্র গ্রাম একই জায়গা। এই নাকি বিলেতি Orientalistদের মত। এ কথা শুনে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয়, উক্ত আবিষ্কারক কোন বিষয়ে অধিক অজ্ঞ;— মহাভারত সম্বন্ধে, না বিলেতি Orientalism সম্বন্ধে? অপর পক্ষে সজনীকান্ত ও ব্রজেন্দ্রনাথ যখন বলেন যে, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার উড়ে নন্, বাঙালী; আর তাঁর জন্ম মেদিনীপুরে; আর তিনি সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন নাটোরে; শেষটা কলকাতায় এসে প্রথমে Fort William কলেজের শিক্ষক হন, পরে জজ পণ্ডিত—তখন এসব fact আমরা মেনে নিতে বাধ্য। আমার বিশ্বাস ছিল যে, বাঙলা গদ্যের আদি লেখক রামমোহন রায়। তাঁর প্রথম পুস্তকের প্রথমেই তিনি বলেছেন যে, বাঙালীরা অন্বয় করতে শেখেনি, আর তার উদাহরণ দিয়েছেন "প্রত্যক্ষ কানুন"। যেকালে আইনের অনুবাদের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, সুতরাং রামমোহনের সাক্ষী আমি মেনে নিয়েছিলুম।

এখন অবগত হলুম যে, মৃত্যুঞ্জয়ের 'রাজাবলী' ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম ছাপা হয়। রামমোহন

এর পূর্ব্বে কোন বাঙলা পুস্তিকা লেখেন নি। আর 'রাজাবলী'র বাঙলা "প্রত্যক্ষ কানুনে"র অনুবাদের মত নয়।

'রাজাবলী' সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার আছে, সে কথা বলা বারান্তরে। 'রাজাবলী' অবশ্য একালের Text Book Committee স্কুলপাঠ্য পুস্তক বলে গ্রাহ্য করবেন না, কিন্তু তাতে এ পুস্তকের মূল্য কিছু কমে না।

বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' সম্বন্ধে আমি বহু পূর্ব্বে রাজশাহীর সাহিত্য-সম্মিলনে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছি, সুতরাং তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

তাঁর লেখা 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' পড়লুম। এ হচ্ছে রামমোহনের 'বেদান্ত গ্রন্থে'র উত্তর। এ গ্রন্থ আজও মন দিয়ে পড়া যায়, আর এর প্রধান গুণ—এতে রামমোহনের উপর গালিগালাজ নেই। পৌত্তলিকতার জন্য apology আছে, এবং সে apology শোনবার মত। রামমোহন রায় সে যুগের ধর্ম্ম-সংস্থাপনকারীদের সম্বন্ধে বিদ্রূপ করেছিলেন। 'পাষণ্ডপীড়ন' তারই জবাব। পুস্তিকার লেখক কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, কিন্তু এ জবাব লিখিয়েছিলেন পাথুরেঘাটার উমানন্দন বা নন্দলাল ঠাকুর। জোড়াসাঁকোর দ্বারিকানাথ ঠাকুর রামমোহন রায়ের বিশেষ অনুকূল ছিলেন। সুতরাং এ পুস্তক বোধহয় এ দুই পরিবারের জ্ঞাতি-কলহের এক পৃষ্ঠা। তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের শাস্ত্রজ্ঞান ছিল, এবং এ পুস্তকে তিনি বেশীর ভাগ তাঁর শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। এ পুস্তকে অনেক কটূক্তি আছে, কিন্তু খেউড় নেই ; যদিচ এ পণ্ডিতের বিচারে চাপান উতোর আছে।

'বেদান্ত চন্দ্রিকা' ও 'পাষণ্ডপীড়ন' পড়ে ধারণা হয় যে, গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে অনেক পণ্ডিত ছিলেন যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় ও শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। আর বাংলা ভাষা তাঁরা লিখতে পারতেন। একালে যাঁরা শাস্ত্রের বিধিনিষেধ অথবা দর্শন বিষয়ে বড় বড় প্রবন্ধ লেখেন, তাঁদের বিচারের চাইতে এই সব সেকেলে টুলো পণ্ডিতের বিচার নিরেশ নয়। এর থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, হিন্দু দর্শন ও হিন্দু ধর্ম্মের কথা সহজ বাঙলায় বলা যায়। এঁদের গদ্য যে সহজবোধ্য, তার কারণ বিলেতি শাস্ত্র পড়ে এঁদের মাথাও ঘুলিয়ে যায় নি, ভাষাও আধা-বিলেতি হয় নি। আমি আজ আর একখানি পুস্তিকার উল্লেখ করব। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক'। এই পুস্তিকাই প্রমাণ যে, স্ত্রীশিক্ষার কথা অনেক দিন আগে উঠেছে। পণ্ডিত মহাশয় স্কুল বুক সোসাইটির হেড পণ্ডিত ছিলেন। উক্ত সোসাইটির অর্থাভাববশতঃ তাঁকে কর্ম্মত্যাগ করে মুন্সেফ হতে হয়। স্কুল-মাষ্টার যে হাকিম হয়, তার দৃষ্টান্ত আজও আছে। পুস্তিকাখানি প্রকাশিত হয় ১৮২২ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ একশ বৎসরেরও আগে। সেকালের ব্রাহ্ম সমাজের 'বামাবোধিনী' পত্রিকার Motto—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নত:—" এ বিধি এই পুস্তিকায় পাওয়া যায়। আর খনা লীলাবতীকে আমরা আবিষ্কার করি নি, এই পূর্ব্বাচার্য্যেরা করেছিলেন এবং তাঁদের দোহাই দিয়েছেন,—আরও অনেক বিদুষীর। এমন কি তিনি বারেন্দ্রকন্যা রাণী ভবানী, রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণকন্যা "হঠী" বিদ্যালঙ্কার এবং কোটালিপাড় গ্রামের কোনও বৈদিক ব্রাহ্মণের স্ত্রী শ্যামাসুন্দরীর নামোল্লেখ করেছেন।

রাণী ভবানী যে নিরক্ষর ছিলেন না, তার প্রমাণ আমি স্বচক্ষে পেয়েছি। অনেক ব্রহ্মোত্তরের

দানপত্রের নীচে তাঁর স্বাক্ষর আমি নিজে দেখেছি। অক্ষর খুব বড় বড়—আর কালি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও টেঁকসই,—আজও তা একটুও জ্বলে যায়নি। সেকালে তারা কি দিয়ে কালি তৈরী করত? ভুষো কালি আর হীরেকষ দিয়ে?

এ পুস্তকে বলা হয়েছে যে, বেদে পুরাণে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কোনও নিষেধ নেই এবং তন্ত্রশাস্ত্রে তার বিধি আছে; তার উপরে খনা লীলাবতী প্রভৃতির নাম দেখানো হয়েছে। কিন্তু এসব কথা পুরুষদের বলা হয়েছে, মেয়েদের নয়। সেকালে মেয়েরা শিক্ষিত হতে আপত্তি করতেন, সে কারণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন নামে একটি অংশ জুড়ে দিয়েছেন। উক্ত কথোপকথন থেকে টের পাই যে, সেকালের মেয়েদের নাকি ভয় ছিল যে লেখাপড়া শিখলে তারা বিধবা হবে। একালে অবশ্য সে ভয় কারও নেই। বরং একালে ভয় এই যে, বেশী লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা নাকি সধবা হবে না।

এই কথোপকথন খাঁটি বাঙলায় লেখা, অর্থাৎ সে ভাষা Idiomএ ঠাসা। নমুনা স্বরূপ এ কথোপকথনের একটি প্যারা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। 'ক' অক্ষর যার গোমাংস, এমন একটি মেয়ে বলছেন—

"ওলো। তোর আপন কথাই পাঁচ কাহন।···এমন ঘোড়ার কামড় করিলে কি কায চলে।··· আগে তুলা দিয়া সহাই পাছে লোহা দিয়া বহাই।"

এর উত্তরে, যাঁর বর্ণ-পরিচয় হয়েছে তিনি বললেন—

"ওলো অবোধ ছুঁড়ি! ইহা জানিস্ না যে পিঁড়ায় জিনিলে পেঁড়োয় জিনা যায়।" আজকালকার উচ্চশিক্ষিতা মেয়েরা এ ভাষা কি বলতে পারেন, না বুঝতে পারেন? হিন্দুস্থানীরা যাকে বলে জেনানা বুলি, এখন তা লুপ্তপ্রায়।



অতিথি

(রঙ্গ-নাটিকা)

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

গল্পে যাঁদের অবতারণা করা হয়েছে

নীলকণ্ঠবাবু	...	...	বাড়ীর কর্ত্তা
অন্নপূর্ণা দেবী	...	...	তাঁর স্ত্রী
শুভা	...	...	তাঁর কন্যা
পটল	...	...	ছোট ছেলে
জীবনবাবু	...	...	অভ্যাগত
অলক	...	...	তাঁর পুত্র
গোবর্দ্ধন	...	...	চাকর

[গল্পের যবনিকা যেখানে উঠলো, সেটি হচ্ছে নীলকণ্ঠবাবুর বৈঠকখানা ঘর। এক দিকে তক্তপোষ—তার ওপর শীতলপাটি এবং গোটা দুই আধময়লা তাকিয়া, অন্য দিকে খান দুই কেঠো চেয়ার এবং একটি সাধারণ টেবিল। দেয়ালের গায়ে লণ্ঠন-কোম্পানীর একটি দিন-পঞ্জী আর ঠাকুর-দেবতার খান কয়েক পট। ঘরটি রাস্তার ওপর। ভেতরকার দরজাটি দিনের বেলা বন্ধ থেকে একে অন্তঃপুর থেকে স্বতন্ত্র করে রাখে, রাত্রি বেলা এটি যায় খুলে এবং ভেতরে বাইরে অকপট মিতালি ঘটে। সকালে সন্ধ্যায় টেবিল চেয়ারগুলি অধিকার করে ছেলে মেয়েরা মাস্টার মশায়ের কাছে পাঠ নেয়—আর তক্তপোষ জুড়ে বসেন কর্ত্তা, সেখান থেকে আলবোলা সেবন এবং শিক্ষক ছাত্রের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করতে থাকেন।

গ্রীষ্মের দুপুর। নীলকণ্ঠবাবুর ছোট ছেলে পটল ঘরের মেঝেয় লাট্টু ঘোরাচ্ছে। পটলের বয়স বছর এগারো, পরণে খাঁকির হাফপ্যাণ্ট, গায়ে ছিটের হাতকাটা সার্ট। যে আগন্তুকটি রাস্তার দিককার খোলা দরজা দিয়ে ঘরের ভেতরটি বারকতক সতর্ক ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করে সরাসরি এসে চেয়ারে বসেছেন তাঁর বয়স প্রায় পঞ্চান্ন হবে—গায়ে পাঞ্জাবী, পায়ে ফিতে-বাঁধা ক্যানভাসের জুতো—হাতে একটি বিবর্ণ ছাতা। তাঁর মুখে ক্লান্তির ছাপ সুস্পষ্ট। উভয়ের খানিক কথাবার্ত্তা হবার পর থেকে আমাদের আখ্যায়িকা আরম্ভ। এইখানে বলে রাখি আগন্তুকের নাম জীবনবাবু।]

জীবন। তাহলে তোমার বাবা বাড়ী নেই?

পটল। আজ্ঞে না। আফিসে গেছেন।

জীবন। আজকে ছুটি নেই?

পটল। ছুটি ছিল, কিন্তু কি দরকারী কাজ ছিল বলে বাবাকে যেতে হয়েছে।

জীবন। তাহলে আমি আসব সে কথা তিনি বলে গেছেন।

পটল। আজ্ঞে হ্যাঁ। বাবা বলে গেছেন, আপনি এলে যেন আপনার চান আর খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, তিনি পাঁচটার ভেতরই ফেরবেন।

জীবন। তা এখন বাড়ীতে কে আছে?

পটল। মা, আর দিদি, আর আমি, আর গোবর্দ্ধন চাকর।

জীবন। তোমার দাদারা ?

পটল। আমিই ত বড়—আমার ত দাদা নেই।

জীবন। ও বটে বটে, তাই তা তা তোমার কাকা টাকা···

পটল। এখানে ত কেউ থাকে না। মেজ কাকা থাকে পাটনায়, আর ছোট কাকা বরিশালে।

জীবন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কি যেন তাদের নাম ? কি বলে···

পটল। মেজ কাকার নাম হরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, আর ছোট কাকার নাম নরেন্দ্রনাথ···

জীবন। ঠিক ঠিক হরু আর নরু। ছোট বেলায় দেখেছি তাদের, এখন বোধ হয় বেশ বড় সড়ো হয়েছে।

পটল। হ্যাঁ, মেজকাকা প্রফেসারী করেন, ছোটকাকা করেন ওকালতী।

জীবন। বেশ বেশ। তা তোমার বাবার···কি বলে গিয়ে···

পটল। বাবার নাম ? ধীরেন্দ্র—

জীবন। হাঃ হাঃ হাঃ···জানি জানি খুব জানি। তোমার বাবা যে আমার বিশেষ বন্ধু গো।

পটল। জানি। বর্দ্ধমানে ত আপনার সঙ্গে বাবা পড়তেন।

জীবন। হ্যাঁ হ্যাঁ। এইত জানো দেখছি। তা একবার···

[অন্দর থেকে দরজায় ঘা এবং চাবির আওয়াজ এলো। অর্থাৎ নীলকণ্ঠবাবুর স্ত্রী পটলকে ডাকছেন—অতিথির সঙ্গে বৃথা বাক্যব্যয় না করে, তাঁর সৎকারের ব্যবস্থা আগে করবার জন্যে। পটল বাবার অনুপস্থিতিতে বড় ছেলেরূপে কর্ত্তৃত্ব করছিল, সে বিরক্ত হয়ে ভেতরে গেল। সেখানে মায়ের সঙ্গে তার কি কথাকার্ত্তা হ'ল, জীবনবাবু তা শুনতে পেলেন না—দরজার ব্যবধান এড়িয়ে শুধু এগিয়ে আসতে লাগলো একটা চাপা ফিসফাস।]

জীবন। [আপনা আপনি] কর্ত্তা ফিরবে পাঁচটায়, এখন বড় জোর আড়াইটে—ঢের সময় রয়েছে। কলকাতা বিষম জায়গা বাবা—পয়সা ফেললে এখানে যে কোন সময় যেখানে-সেখানে খাবার পাওয়া যায়, কিন্তু পায়খানার দরকার হলেই গিয়েছো আর কি। আঃ কি মুস্কিল। ছোঁড়াটা যে কিছুতেই ফেরে না দেখছি···

[পটলের পুনঃপ্রবেশ]

পটল। কাকাবাবু, মা বললেন, আপনি চানটান সেরে নিন—এক্ষুনি খাবার হয়ে যাবে। এতটা রাস্তা গাড়িতে এসেছেন···

জীবন। আরে রাম রাম। চান খাওয়া সব আমি গাড়িতেই সেরে এসেছি। ও নিয়ে তাঁকে ব্যস্ত হতে বারণ করো। হ্যাঁ, আমি একবার শুধু পায়খানায় যাবো—সেই ব্যবস্থাটা শীঘ্রী করে দাও ত বাবা।

পটল। আচ্ছা, আপনি বসুন—আমি ঠিক করে আসছি।

জীবন। [আপন মনে] যা ব্যাটা, শীগ্রী যা। নারায়ণ, নারায়ণ।

পটল। [দরজার ওপিঠ থেকে] আসুন কাকাবাবু—এই দিকটা দিয়ে চলে যান, ঐ চৌবাচ্চাটার পাশে ঐ যে···

[জীবনের প্রস্থান। নীলকণ্ঠবাবুর স্ত্রী অন্নপূর্ণার প্রবেশ]

অন্নপূর্ণা। সুবি, ও সুবি, সেলাই রেখে একবার এদিকে আয়। দিন রাত্রি শুধু ও নিয়ে থাকলেই চলবে ?

[মেয়ে শুভার প্রবেশ]

শুভা। কি বলছো ?

অন্নপূর্ণা। বঙ্কিমবাবু এসেছেন। বাথরুমে গেছেন—তুই এই ফাঁকে স্টোভটা ধরিয়ে চট করে খান আষ্টেক লুচি আর আলু বেগুন ভাজা করে ফেল দিকি। আমি গোবর্দ্ধনকে দিয়ে কিছু মিষ্টি আনিয়ে নিচ্ছি।

শুভা। আমি এখন পারবো না বাবু। আর আধঘণ্টার মধ্যেই অলকদা আসবে—আমরা বলে মেট্রোয় যাবো। তাই আমি তাড়াতাড়ি টেবিল ক্লথটা সেরে নিচ্ছি…এখন…

অন্নপূর্ণা। পোড়ার মুখো মেয়ে! ঘরের কোন কাজ করতে বললেই মুখ হাঁড়িপানা হয়। খালি মেট্রো, আর নভেল, আর অলকদা। বিয়ে-থাওয়া করে অলকের সঙ্গে বিদেয় হয়ে যা বাপু, আর জ্বালাতন আমার ভালো লাগে না।

শুভা। কেন, আমি করেছি কি, তাই শুধু শুধু বকছো ?

অন্নপূর্ণা। বকবো না ? জানিস বঙ্কিমবাবু কেন এসেছেন, আর তিনি কর্ত্তার কত বড় বন্ধু ? আমাদের দরকারে কাজ কর্ম্ম ফেলে বর্দ্ধমান থেকে ছুটে এসেছেন। ওঁর আদর যত্নের কোন ত্রুটি হলে, কর্ত্তা এসে আর কারুকে আস্ত রাখবেন না।

শুভা। অ্যাঁ! আজকে বলে টার্জ্জানের সেকেণ্ড পার্টটা আছে—অলকদা ল' কলেজ থেকে ফিরেই আমায় নিয়ে যাবেন কথা আছে, তা না, বসে বসে তোমার বঙ্কিমবাবুর লুচি ভাজিগে!

অন্নপূর্ণা। তা সে ত তিনটের পর। এ আর কতক্ষণের কাজ ? চটপট সেরে নে, নিয়ে যেখানে খুসী যা বাপু—আমি আর এখন পারছি নে।

শুভা। হ্যাঁ—এতগুলো কাজ করে, তারপর আবার জামা কাপড় বদলে যেতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

অন্নপূর্ণা। তাহলে যা, এখনি গিয়ে বসে থাকগে যা। লক্ষ্মীছাড়ী ধিঙ্গী কোথাকার!

শুভা। বাবারে বাবা, করছি গে। সব তাতেই আবার রাগ!

[শুভার প্রস্থান]

অন্নপূর্ণা। খোকন!

পটল। [দরজার ওপিঠ থেকে] কি মা ?

অন্নপূর্ণা। গোবর্দ্ধনকে কর্ত্তার ঘরে বিছানাটা তৈরি করে দিতে বলেছি। ওঁর মুখ-হাত ধোয়া হলে, একেবারে ওপরে নিয়ে যাবি—বুঝলি ? আর ভাখ, বিছানা হল কিনা, যদি হয়ে গিয়ে থাকে ত গোবরাকে নিচে আসতে বল—দোকানে যাবে।

পটল। আচ্ছা। কাকাবাবুকে কি তামাক সেজে দোব মা ?

অন্নপূর্ণা। দে না। ওঁর গড়গড়াটা ওপরে নিয়ে যেতে বল।

পটল। মা, আমায় সেই লটাইয়ের পয়সা ?

অন্নপূর্ণা। দোব দোব। আজ সন্ধ্যের সময় নিস, এখন যা। বাড়িতে লোক এসেছেন, আদর যত্ন করতে হয়। এই যে তোর বিছানা করা হয়েছে রে, তাহলে একবার দোকানে যা—দাঁড়া আসছি।

[অন্নপূর্ণার প্রস্থান]

পটল। বুঝেছিস, সেই ঝালঝাল আর নেবুর রস দেয়া। এনে দিদির হাতে লুকিয়ে দিবি—মা যেন জানে না, বুঝলি। পাছ দোর দিয়ে আসিস।

[আধ ঘণ্টার অবকাশ। ইতিমধ্যে জীবনবাবু বাথরুমকৃত্য শেষ করে সুস্থ হয়েছেন এবং দোকানের আনীত মিষ্টান্ন ও শুভা দেবী ভজ্জিত লুচি ও ভাজি সেবনান্তে পান মুখে নীলকণ্ঠবাবুর বিছানায় শুয়ে গুড়গুড়ি টানছেন। পটল তাঁর মাথার শিয়রে বসে পাকা চুল তুলছে এবং কাকা বাবুর সঙ্গে দিব্যি গল্প জমিয়ে তুলেছে। আর শুভা মাতৃআজ্ঞা পালনান্তে ক্ষুণ্ণমনে আয়নার সামে দাঁড়িয়ে সাজগোজ করছে—সায়া, সেমিজ, শাড়ী, ব্লাউজ, বস্ত্র পর্ব্বের সব কটা অঙ্গই শেষ হয়েছে, এখন বাকী চুলটা ঠিক করা, ঠোঁট, গাল, গলা ইত্যাদির অনুরঞ্জন এবং জুতো। ব্যস্ত দৃষ্টিতে সে বার বার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে, আর দ্রুত হাত চালাচ্ছে। ওপর তলা এবং নীচের তলার এই কর্ম্মচাঞ্চল্যের ফাঁকে অন্নপূর্ণা এসে আবার বিছানা নিয়েছেন—কলে জল আসতে এখনও একটু দেরী আছে, ঝিও আসে নি, সুতরাং বিশ্রামটা মারা যায় কেন ?

বাইরের ঘরে সহসা নীলকণ্ঠবাবুর আবির্ভাব হল। তিনি তক্তপোষে বসে হাঁক দিলেন, পটলা! সঙ্গে সঙ্গে হাজির হল গোবর্দ্ধন, উড়ে চাকর—নিটোল কালো চেহারা, গলায় মালা, ট্যাকে পানের বটুয়া, বয়স তেইশ চব্বিশ। নীলকণ্ঠবাবুর বয়স পঞ্চাশ পার হয়েছে, গায়ে চীনে কোট—পায়ে আলবার্ট স্যু, চোখে বাইফোকাল লেন্সের চশমা।]

নীলকণ্ঠ। ওরে তোর মা কোথায় ?

গোবর্দ্ধন। মা শুই আছেন।

নীলকণ্ঠ। একবার ডাক দিকি।

[গোবর্দ্ধনের প্রস্থান]

এখনই আবার ভ্যাজ ভ্যাজ আরম্ভ হবে। মেজাজ তো সপ্তমেই চড়ে আছে !

[অন্নপূর্ণার প্রবেশ]

অন্নপূর্ণা। কি হুকুম ? একটু শোবার জো নেই।

নীলকণ্ঠ। আরাম করেই শোও গে। বাঁকু আজ আসতে পারবে না—তার ছোট মেয়ের কলেরা হয়েছে, অফিসে গিয়েই টেলিগ্রাম পেলাম। তাই তাড়াতাড়ি খবরটা দিতে এলাম, নইলে আবার রান্নাবান্না করে ফেলবে।

অন্নপূর্ণা। বেশ করেছো।

নীলকণ্ঠ। আচ্ছা বিভ্রাট যাহোক। আমারই কপাল—নইলে যেমন করছি তাড়াতাড়ি, তেমনই একটা না একটা ব্যাগড়া পড়বে কেন ?—ভালোয় ভালোয় বেচারীর মেয়েটা সেরে গেলে হয়—এদিকেও আর সময় নেই, হঠাৎ দর পড়ে গেলেই ব্যবসার দফা রফা হয়ে যাবে।

অন্নপূর্ণা। [মৃদু হেসে] ন্যাকামি রেখে ওপরে যাও দিকি। ভদ্রলোক একা পড়ে আছেন, পটলা ভ্যান ভ্যান করে জ্বালাতন করছিল বলে তাকে নীচেয় বসিয়ে রেখেছি।

নীলকণ্ঠ। ভদ্রলোক ?

অন্নপূর্ণা। ভদ্রলোক কি ছোটলোক, তা তুমিই জানো। তোমারই বন্ধু।

নীলকণ্ঠ। কি বলছো পাগলের মতো ?

অন্নপূর্ণা। আমার তো সব কথাই পাগলের মতো। তোমার সেই বঙ্কিমবাবু না কোন যম এসেছেন, গিলে কুটে ওপরের ঘরে পড়ে আছেন—গিয়ে দেখো গে।

নীলকণ্ঠ। তার মানে কি ? বেলা আটটায় টেলিগ্রাম করেছে, আমি পেয়েছি এগারোটায়—এর মধ্যে সে বর্দ্ধমান থেকে এসে খেয়ে দেয়ে শুয়ে আছে, ব্যাপারটা কি ?

অন্নপূর্ণা। তা আমি কি করে জানবো ? ঠাট্টা রাখো বাপু, আমার বুক ঢিপ ঢিপ করছে, মাগো, ও আবার কি !

নীলকণ্ঠ। আরে এই তো টেলিগ্রাম—Last daughter's Cholera, can't go—Bankim.

অন্নপূর্ণা। তাহলে রসিকতা করেছেন আর কি।

নীলকণ্ঠ। কিন্তু রসিকতা করার মানুষ তো সে নয়—আর এমন ভয়ানক কথা নিয়ে রসিকতা।

অন্নপূর্ণা। তা বাবু ওঠোই না—গিয়ে দেখে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন কর গে।

নীলকণ্ঠ। তাই যাই—তুমি বলছো কি গো !

[নীলকণ্ঠের প্রস্থান]

অন্নপূর্ণা। সব তাতেই আবার আদিখ্যেতা। পনেরো দিন আগে থেকে আসবার কথা রয়েছে—ভদ্রলোক ঠিক সময়ে এসেওছেন, এখন তাই নিয়ে ঢং হচ্ছে। বুড়ো কালে এতও ভালো লাগে !

[যথারীতি কেতাদুরস্ত শুভার প্রবেশ]

শুভা। কি আশ্চর্য্য ! অলকদার কি একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই ? আর তো আছে মোটে দশ মিনিট—এর মধ্যে যাওয়াই বা হবে কি করে, টিকেটই বা কেনা হবে কখন ? শুধু শুধুই এত করে সাজ গোজ করলাম···আচ্ছা আসুক, তারপর দেখাচ্ছি মজাটা।

[পটলের প্রবেশ]

পটল। বেশ হয়েছে। আমায় নিয়ে যেতে বললাম, তা হল না। এখন যা না টার্জ্জান দেখ গে··· অলকদা একাই চলে গেছে, তোকে নিয়ে যাবে, না কচু !

শুভা। ভালো হচ্ছে না কিন্তু খোকন।

পটল। বা রে আমি কি করেছি ?

শুভা। তোকে টিপ্পনি কাটতে কেউ ডেকেছে ?

পটল। টিপ্পনি কাটলাম কোথায় ? আমি তো শুধু বলেছি অলকদার সঙ্গে তোর বিয়ে···

শুভা। হতভাগা কোথাকার !

[পটল দৌড়ে পালালো, তার পেছু পেছু ছুটলো শুভা]

[বিব্রত মুখে অন্নপূর্ণা এবং নীলকণ্ঠবাবুর প্রবেশ]

অন্নপূর্ণা। ওমা, সে আবার কি ?

নীলকণ্ঠ। হ্যাঁ। আমি বাঁকুকে চিনে নে ? আমার ছেলেবেলার বন্ধু—বছরে অন্ততঃ বিশ বার তার সঙ্গে আমার দেখা হয়—তার রং ধপধপে ফর্সা, এটা কালো মোষ—তার মাথায় কোঁকড়া চুল, এর মাথায় টাক—সে রোগা, আর এ কেঁদো মোটা। এ কেন সে হবে ?

অন্নপূর্ণা। তা কি করলে তুমি ?

নীলকণ্ঠ। উপস্থিত ও ঘরে ছেকল দিয়ে রেখেছি। ঘুমুচ্ছে ঘুমুক, তারপর যা হয় করবো।

অন্নপূর্ণা। সে আবার কি ? লোক জন ডাকো—ঘরের ভেতর একটা বাইরের বদমায়েস পোরা থাকবে !

নীলকণ্ঠ। থামো থামো। সব তাতেই উদ্ব্যস্ত হলে চলে না। আমি বাড়ী ছিলাম না, বাড়ীতে কোন ব্যাটাছেলে নেই—এর মধ্যে একটা বাইরের লোক এসে নাইছে, খাচ্ছে, ঘুমুচ্ছে, এসব শুনলে লোকে তোমায় কি বলবে জানো ?

অন্নপূর্ণা। কি ঘেন্নার কথা মা।

নীলকণ্ঠ। হ্যাঁ, লোকে সেই কথাই বলবে।

অন্নপূর্ণা। তাহলে কি করবে ? রাজ্যের কাজ পড়ে রয়েছে—ঘরে ঢোকার জো নেই !

নীলকণ্ঠ। দাঁড়াও অলক আসুক—সে ল' ট' পড়ছে, চালাক চতুর ছেলে, তার সঙ্গে পরামর্শ করে যাহোক করবো।

অন্নপূর্ণা। জানিনে বাবু।

[অলকের প্রবেশ। অলকের বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ—গোঁফ কামানো, লম্বা সিল্কের পাঞ্জাবী গায়ে, চোখে সোনার চশমা—ব্যাক ব্রাস করা চুল। মুখটি হাসি হাসি।]

নীলকণ্ঠ। এই যে এসো বাবা। তোমাকেই দরকার। মহা বিভ্রাটে পড়েছি, এখন যা হয় একটা মতলব বার করো দিকি।

অলক। কি হয়েছে ?

নীলকণ্ঠ। চলো, ভেতরে চলো, বলছি। এসো গো সব কথা অলককে বলো—তা হলে ও বুঝতে পারবে।

[সকলের প্রস্থান]

[শুভার প্রবেশ]

শুভা। বাবার সবতাতেই অনাছিষ্টি। বাইরের লোক আবার কখনো পরের বাড়ী ঢুকে নির্ভয়ে ঘুমুতে পারে ? হৈচৈ করে শুধু আমার সিনেমা দেখাটা মাটি করলেন। এলো অলকদা, তাকে টেনে নিয়ে গেলেন—পরামর্শ করতে। দরকার কি বাপু ? না হয় ধরেই নিন, এই বঙ্কিমবাবু। তাতে আর কি যেতো আসতো ?

পটল। দিদি, কি মজা হয়েছে জানিস ?

শুভা। জানি জানি, যা। যত সব বাজে··· দেখিস শেষে ঠিক হবে, ইনিই বঙ্কিমবাবু। মধ্যে থেকে কেবল আমার সিনেমা দেখাটা ভেস্তে গেল।

পটল। যা যা, আর সিনেমা দেখে না। বাড়ীতে বলে চোর ঢুকেছে, আর উনি সেজেগুজে সিনেমায় যাবেন।

নীলকণ্ঠ। [ভেতর থেকে] পটলা, এদিকে আয় ত।

[পটলের প্রস্থান]

শুভা। শেষ পর্য্যন্ত এরা কি করছে কে জানে! বেশ ত বাপু, যদি এ লোক না হয় তাড়িয়ে দিলেই হল—তা নিয়ে এত হট্টগোলে দরকার কি? শুধু শুধু সময় নষ্ট, আর অলকদাটাও যেন কি, হুজুগ পেলে হয়।

[প্রস্থান]

[নীলকণ্ঠ এবং অলকের প্রবেশ]

অলক। আপনি যান, তুলে নিয়ে আস্থন—আমি নীচেয় আছি।

নীলকণ্ঠ। সাহস হচ্ছে না যে।

অলক। কিচ্ছু ভয় নেই—বরং একগাছা লাঠি হাতে করে যান, আর আমিও একগাছা নিয়ে অপেক্ষা করি। তেমন তেমন দেখলে পিটিয়ে সোজা করে দিলেই হবে।

নীলকণ্ঠ। দাঁড়াও বাবা, আগে তদন্তটা করে নিই। কে জানে কি মতলবে এসে ঢুকছে, সঙ্গে কি হাতিয়ারপাতি আছে, তাও জানিনে! পটলা, এই পটলা!

[পটলের প্রবেশ]

হ্যাঁরে, তুই ভালো করে দেখেছিস তো, পিস্তল বন্দুক কিছু নেই টেই তো?

পটল। না বাবা! জামাটা খুলে হুকে রেখে গেঞ্জি গায়েই তো গেল—কোমরে কাপড়ের কষি ছিল, আর কিচ্ছু না।

নীলকণ্ঠ। কিন্তু জামার পকেটে, কিংবা ট্র্যাকে তো কিছু থাকতে পারে। তা তুই কি করে জানবি?

পটল। সে আমি জানিনে। কিন্তু নেই বাবা কিচ্ছু, তুমি বরং দেখগে—বেশ সুন্দর গল্প বলে বাবা, ও কি কখনো বন্দুক ছুঁড়তে পারে?

নীলকণ্ঠ। তুই তো ভারী মানুষ চিনিস! তা এক কাজ কর—রান্নাঘর থেকে তিনখানা চেলা কাঠ নিয়ে আয়, একখানা আমায় দে, একখানা গোবরাকে দে, একখানা তুই নে—চল তিনজনে একসঙ্গে ওপরে যাই, আর অলক নীচেয় থাকুক···কি বলো বাবাজী?

অলক। [মৃদু হেসে] তাই করুন।

[নীলকণ্ঠ এবং পটলের প্রস্থান]

[অলক জামার আস্তিন গুটালো, মালকোঁচা দিয়ে কাপড় পরলো, তারপর দরজার খিলটা খুলে নিয়ে সেটা কাঁধে ফেলে ঘরের মেঝেয় পায়চারি করতে লাগলো। ইতিমধ্যে শুভা এসে উপস্থিত। অলকের এই রূপান্তর দেখে সে হেসে লুটিয়ে পড়তে লাগলো।]

শুভা। সেলাম জমাদার সাহেব!

অলক। সেলাম বিবিসাহেবা। কি করবো বলো, তোমার বাবা যে কাণ্ডটি বাধালেন।

শুভা। যান, আপনি ভারী ইয়ে। বাবা আসার আগে এলে কি হত? তাহলে কোন্ কালেই চলে যাওয়া যেতো। তা না···

অলক। একটু বিশেষ কাজে দেরী হয়ে গেল। সত্যি সুবু, আমার দোষ হয়ে গিয়েছে।

শুভা। হ্যাঁ, দোষ হয়ে গিয়েছে! তা সাড়ে ছ'টার শো'তে যাওয়া হবে, না তাও হবে না?

অলক। নিশ্চয় হবে। জানো মা'র মত হয়েছে, কিন্তু মুস্কিল বাবাকে নিয়ে, তিনি যে ছেলের বিয়ে দিয়ে মোটা টাকা ঘরে তুলবার ফন্দী আঁটছেন কিনা।

শুভা। আমি তার কি জানি?

অলক। তোমাকে জানতে হবে না—যা করার আমিই করবো। একটা কোন কায়দায় না ফেলতে পারলে তো বাবাকে রাজী করানো যাবে না, তাই সেই ফিকিরে আছি—দেখা যাক কি হয়। হ্যাঁ, একটা মজা হয়েছে জানো, আচ্ছা যাক, সিনেমায় গিয়ে বলবো।

শুভা। আচ্ছা। আমি চায়ের জল বসিয়ে এসেছি—এখন চললাম। আপনি ততক্ষণ দারোগাগিরি সেরে নিন।

[প্রস্থান]

[নীলকণ্ঠবাবু, পটল এবং গোবর্দ্ধনের কাঠচেলা হাতে বীরদর্পে প্রবেশ। সঙ্গে কাঁচা ঘুমে উঠে আসা জীবনবাবু, কাপড়চোপড় অসামাল, ঘন ঘন হাই উঠছে, কিন্তু মুখে একটি কৌতুকের হাসি। এদের সাড়া পাবা মাত্র অলক মিলিটারী কায়দায় তড়াক করে খাড়া হয়ে দাঁড়ালো, আর হুঁড়কোটা কাঁধে তুলে নিল।]

নীলকণ্ঠ। ও সব কথা শুনতে চাইনে। আপনি কি জন্যে ভরা দুপুরে ভদ্দর লোকের বাড়ীতে ঢুকছেন, তাই শুনি। জানেন, আপনাকে···বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা পেয়েছেন।

অলক। [হঠাৎ তাকিয়ে] অ্যাঁ···বাবা?

জীবন। তুই···এখানে···কি সর্ব্বনাশ!

অলক। আমি যে এই বাড়ীতে পড়াই, ইনিই তো নীলকণ্ঠবাবু।

জীবন। রক্ষে হোক, আমি ভাবছিলাম বুঝি বাপব্যাটা দু'জনেই এক জালে···

নীলকণ্ঠ। ব্যাপার কি? বাবাজী, ইনি তোমার···

অলক। আজ্ঞে, আমার বাবা।

[আস্তে আস্তে খিলটি নামিয়ে রাখল, তারপর ভেতরে ঢুকে পড়লো। পটল এবং গোবর্দ্ধন পৃষ্ঠভঙ্গ দিল।)

নীলকণ্ঠ। কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে।

জীবন। ব্যাপার অতি সহজ। এসেছিলাম সিমলা ষ্ট্রীটে—বড্ড পায়খানার প্রয়োজন হয়ে পড়লো। কি করি, কাছে ভিতে কোন পার্ক নেই, চেনাশুনো লোক নেই, বেগতিক দেখে ঢুকেছিলাম আপনার এই ঘরে—ছোট ছেলেটি খেলা করছিল, ভেবেছিলাম তার কাছে কাকুতি-মিনতি করে একটা ব্যবস্থা করে নেবো, তা আমি ঢুকতেই ছেলেটি খুব অভ্যর্থনা করলে, বললে, বাবা

বলে গেছেন আপনি এলে যেন নাওয়া খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়—আর বললে, বাবা ফিরবেন পাঁচটায়। বুঝলাম কারুর আসার কথা আছে, তিনি আসেন নি—সুতরাং এই ফাঁকে কার্য্য সেরে সরে পড়বো ইচ্ছে ছিল। কিন্তু যে পরিমাণ জলযোগ এবং আদর যত্নের আয়োজন হল, তাতে বেসামাল হয়ে ঘুমিয়ে পড়ি···আর তাইতেই আপনি আসার আগে পালাতে পারি নি।

নীলকণ্ঠ। হাঃ হাঃ হাঃ! করেছেন ত বড় মন্দ নয়! যাকে বলে কমেডি অব এরার্স···তা ওরা কেউ ধরতেও পারলো না? পারবেই বা কি করে? আমার এক বন্ধুর আসার কথা ছিল—বাড়ীতে বলে গেছলাম, ওরা সেই জন্যে তৈরি ছিল। এদিকে সে আসতে পারলো না—অফিসে গিয়ে টেলিগ্রাম পেলাম, তাড়াতাড়ি বাড়ীতে খবর দিতে এসে শুনি সে এসেছে। বুঝুন তখন আমার অবস্থটা···তা না চিনে বড়ই···

জীবন। কিছু না, কিছু না। আমিও একটু রঙ্গ করেছি, তার উত্তরে আপনারাও একটু···

নীলকণ্ঠ। নইলে দেখুন অলককে আমরা ছেলের মতোই দেখি—আপনি তার বাবা, আপনি ত আমাদের আপনার জন।

জীবন। বটেই ত, বটেই ত। আপনাদের কথা রোজই শুনি। তা বেশ, আপনাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল—হঠাৎ আলাপ হয়ে গেল!

নীলকণ্ঠ। দেখুন আপনার সঙ্গে আরো নিকট আত্মীয়তা হবে বলেই দৈব এই যোগাযোগ ঘটালেন। নইলে ঠিক এক সঙ্গে এতগুলো জিনিষ ঘটলো কেন—বাঁকু আসতে পারলো না, আমাকে বেরুতে হল, আপনার পায়খানার প্রয়োজন হল! এ থেকে বিধাতার একটা গভীর উদ্দেশ্যের আভাষ পাচ্ছেন না আপনি?

জীবন। না ত।

নীলকণ্ঠ। আচ্ছা চলুন, ওপরে সব বুঝিয়ে বলছি। অনেক দিন থেকেই ভাবছি আপনার কাছে একবার যাবো, তা আর হয়েই ওঠে না! সত্যি বলতে কি, সাহসই পাইনি। আজ যখন যোগাযোগটা আপনা থেকে ঘটে গেল, তখন বুঝতে হবে বিধাতা নিজে থেকেই ব্যবস্থাটাকে এগিয়ে এনেছেন।

জীবন। আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছিনে মশাই।

নীলকণ্ঠ। চলুন, চা খেতে খেতে বলছি গে।

জীবন। ভোম্বল কোথায় গেল?

নীলকণ্ঠ। কে অলক? সে ঠিক আছে, তার কাকীমার সঙ্গে গল্প করছে বোধ হয়···আসুন আপনি ওপরে আসুন। ওরে ওপরে চা দে, তামাক দে।

জীবন। চলুন। কিন্তু বাড়ী ফেরবার দরকার ছিল—অনেকক্ষণ বেরিয়েছি।

নীলকণ্ঠ। আহা হা, যাবেনই ত। আমার বাড়ীতে কি আর থাকবেন? দৈব নিয়ে এসেছিল, নইলে কোন দিনই কি পায়ের ধুলো পড়তো।

জীবন। [মনে মনে] মার বাঁচলো, কিন্তু তার বদলে কপালে কি আছে কে জানে। নইলে এত খাতির করছে—ব্যাপার কি? পড়েছি প্যাঁচে, ঘাড় পাততেই হবে।

নীলকণ্ঠ। আসুন আসুন।

[উভয়ের প্রস্থান]

[অন্নপূর্ণা এবং পটলের প্রবেশ]

অন্নপূর্ণা। সত্যি ?

পটল। হ্যাঁ মা। সেই জন্যেই ত অলকদা পালালেন।

অন্নপূর্ণা। কি লজ্জার কথা। ভাগ্যি কেউ মারাধরা করে নি। তাই মানুষে বলে…তা না! আচ্ছা লোক যাহোক! তা এখন কি কথা হচ্ছে ?

পটল। জানি নে, তা একটু একটু শুনলাম, দিদির বিয়ের কথাটথাই আর কি…

অন্নপূর্ণা। মিন্সে মত করেছে তা হলে ? মধুসূদন মুখ তুলে চান—নইলে মেয়ের আমার খোয়ারের শেষ থাকবে না।

পটল। ইস, মত করবে না ? তাহলে ঠেঙিয়ে এক্ষুণি…

অন্নপূর্ণা। চুপ চুপ, গাধা ছেলে। ওকথা বলতে আছে ?

[গোবর্দ্ধনের প্রবেশ]

গোবর্দ্ধন। মা, বাবু ডাকিছেন ?

অন্নপূর্ণা। ওমা সে আবার কি ? আমি কোথায় যাবো ?

গোবর্দ্ধন। কি বিয়া ঘরের কথা হবো।

পটল। হ্যাঁ মা, চলো মা, বেশ মজা হবে।

অন্নপূর্ণা। তুই যা না বাপু—তুই ত আর মেয়েমানুষ নস।

[ওপর থেকে]

নীলকণ্ঠ। কৈ গো, এসো একবার। ওঁর ত আরো কাজকর্ম্ম আছে।

অন্নপূর্ণা। পারি না বাপু। চ খোকন, আমার সঙ্গে। নারায়ণ, নারায়ণ।

[তিন জনের প্রস্থান]

[অলক এবং শুভার প্রবেশ]

অলক। চলো। চটপট বেরিয়ে পড়ি, নইলে হয়ত ডাক পড়বে।

শুভা। ভালোই ত। সাম্নাসাম্নি কথা পাকা হয়ে যাবে।

অলক। য্যাঃ, তাই কখনো পারা যায় নাকি ?

শুভা। কেন, তখন যে বড় বলতেন, সত্যের জন্যে, বাপ হোক, মা হোক, ঈশ্বর হোক, কারুর বিরুদ্ধেই দাঁড়াতে আপনার ভয় নেই। এখন তবে সাম্নে যেতেই যে বড় সাহস হচ্ছে না।

অলক। মুখে বলা এক, কাজে করা আর।

শুভা। তা আমি জানতাম। তাই ভয়ে রাত দিন আমার বুক দুরদুর করতো।

অলক। এখন ভয় ভেঙেছে ?

শুভা। তা ভেঙেছে। কৈ চলুন···সন্ধ্যের শো'ও যদি দেখা না হয়, তাহলে কিন্তু আপনার সঙ্গে···

অলক। সুবু ?

শুভা। কি ?

অলক। আমার একটা কথা রাখবে বলো ?

শুভা। কি ?

অলক। আমাকে 'তুমি' বলবে।

শুভা। না, ভীষণ লজ্জা করে।

অলক। বেশ। রেখো না আমার কথা।

শুভা। রাগ করলেন ? আচ্ছা আচ্ছা তুমি···হল তো ? এবার চলা হোক।

[দুজনের প্রস্থান]

[নীলকণ্ঠবাবু, জীবনবাবু এবং অন্নপূর্ণা দেবীর আলোচনা একঘণ্টা আন্দাজ চললো। চা এবং মিষ্টান্ন সহযোগে আলোচনাটা অধিকতর মনোজ্ঞ হয়েছিল নিঃসন্দেহ। জীবনবাবুকে সঙ্গে নিয়ে তারপর উভয়ে নেমে এলেন যখন, তখন সন্ধ্যা হয় হয়।]

জীবন। আচ্ছা, আসি তাহলে। বেয়ান, একবার পায়ের ধুলো দেবেন যেন।

অন্নপূর্ণা। [সলজ্জভাবে ঘাড় হেঁট করে] যাবো।

নীলকণ্ঠ। আচ্ছা। আচ্ছা।

[জীবনবাবুর প্রস্থান]

যাক, কার্য্য উদ্ধার হল। এখন ভালোয় ভালোয় মামলা খতম করতে পারলে হয়।

অন্নপূর্ণা। কারে না পড়লে কঞ্জুস মিন্সে কখনো ঘাড় পাততো ভেবেছো ?

নীলকণ্ঠ। আরে সবই তাঁর ইচ্ছে—মুখের মধ্যে নইলে শিকার আপনা থেকে এসে পড়ে ? এই বাজারে অলকের মতো ছেলে···এক রকম বিনা খরচেই···। ও ভেবেছিল আমাদের ঠকাবে—কেমন চালটি খেললাম, বলো তো।

অন্নপূর্ণা। আমার মেয়েও তো বাপু ফেলনা নয়। ওরা কটা মেয়ে ও রকম পাবে······টাকা কিছু হয়ত পেতে পারে।

[তিনি ভেতরে চলে গেলেন। নীলকণ্ঠ আলো জেলে, রাস্তার দিককার দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।]



ফ্যান

শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপ না থাকা একটা বড় দুর্ভাগ্য এবং সে দুর্ভাগ্য আমাদের এই ক্ষুদ্র গল্পের নায়িকার পুরোমাত্রায় ছিল। লোকে তাকে দেখলে ঘৃণায় নাক সিঁটকাত। কিন্তু তাতে তাদের বড় দোষ দেওয়া যায় না, কারণ সুন্দরকে আদর আর অসুন্দরকে অনাদর মানবমনের চিরন্তন প্রকৃতি। কোনখানে যদি ইহার ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায় ত সে হচ্ছে মনের ওপর বুদ্ধির মুরুব্বিয়ানা। গোড়াতেই বলে রাখা ভাল, যার কথা লেখা হচ্ছে সে তোমার আমার মত মানুষ নয়—সামান্য একটি কুক্কুরী। গায়ের রংটা যে তার মুখ্যত কি ছিল, তা এখন জানবার উপায় নেই। কারণ কোন এক বর্ষীয়সী রমণী অসাবধানতাবশতই হোক বা বিদ্বেষবশতই হোক তার গায়ে একবার গরম ফ্যান ফেলে দেওয়ায় তার লোমগুলো যায় উঠে আর রংটা যায় ঝল্‌সে। নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এখন সে রংটা যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে তার সঙ্গে রামধনুর বর্ণসপ্তকের কোন সাম্য কষ্টকল্পনার সাহায্যেও আবিষ্কার করা দুষ্কর। পিটুলির সঙ্গে খানিকটা ভুসো ও খানিকটা চিটেগুড় মিশুলে যে রকম দেখতে হয় এ কতকটা সেই রকম।

কিন্তু কুৎসিত হ'লেও সে জীব। বাঁচবার অধিকার তার আছে এবং প্রাণীর সর্ব্ব প্রধান ধর্ম্ম—উদরধর্ম্ম—তার পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান, যার তাড়নায় সহস্র দুর্ব্যবহার মাথায় পেতে নিয়েও মানুষের দরজায় দয়ার প্রার্থী হ'য়ে তাকে দাঁড়াতেই হবে। কাজেই সে, যে গ্রামে জন্ম নিয়েছিল এবং যেখানে কোন গতিকে এতদিন কাটিয়ে আসছিল, সেখানকার লোকেরা তাকে তাড়িয়ে দিলে সে গ্রামান্তরে আবার মানুষের আশ্রয় খুঁজতেই বেরুল।

রাস্তা দিয়ে একখানা খড় বোঝাই গরুর গাড়ী যাচ্ছে দেখে সে তার পিছন পিছন চললো। দু'ধারেই খালি মাঠ আর মাঠ। মাঝে মাঝে বাব্‌লা গাছ। গরুর গাড়ীর চাকায় চাকায় আল ভাঙ্গা আঁকা বাঁকা মেঠো রাস্তা। হাওয়ায় রাস্তার ধুলো উড়ে গিয়ে কতক বা পড়ছে আশেপাশের গাছগুলোর পাতায় আর কতক বা গাড়ী চালকের নাকে মুখে। সারা দিনটা গাড়ীর পেছনে পেছনে এসে যখন সে একটা গ্রামে পৌঁছল তখন রাত্রি প্রথম যাম অতিক্রমোন্মুখ। গাঢ় অন্ধকারে গ্রামের পথ ঘাট আচ্ছন্ন, নিকটেই একটা মেটে বাড়ী দেখতে পেয়ে সে চোরের মত আস্তে আস্তে ঢুকে পড়ল সেখানে। পল্লীগ্রাম, সন্ধ্যার পরেই যে যার ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। বাড়ীটি নিস্তব্ধ নিঝুম। সে বাড়ীর ভেতরে ঢুকে একবার চারিদিক ঘুরে এলো। খিড়কির ঘাটের রাস্তায় খড়ের পালুইএর গায়ে একটা ছোট গর্ত্ত আছে। ঘর তৈরীর সময় মাটির দরকার হওয়ায় এর উৎপত্তি। পার্শ্বস্থিত প্রকাণ্ড চাল্‌তা গাছের একটা ডাল নুয়ে পড়ে স্থানটীকে দিয়েছিল প্রচুর ছায়া ও নির্জ্জনতা। এদিকে বাড়ীর বড় একটা কেউ আসত না। এই জায়গাটাই সে তার মাথা গুঁজে থাকার পক্ষে যথেষ্ট বলে ঠিক করলে। তা ত হ'ল। এখন খাবার কি হবে। গত পরশু বৈকালে সে একজনদের বাড়ীর হেঁসেল থেকে একখানা রুটী না কি নিয়ে পালিয়ে ঘোষেদের পুকুর পাড়ে গিয়ে সবে খেতে যাচ্ছিল

এমন সময় ঘোষ-গিন্নি দেখতে পেয়ে হৈ চৈ করে উঠে। পাড়ার দুরন্ত ছেলেগুলো তারপর তার কি নাকালটাই না করলে! সেই জন্যই ত তাকে না সে গ্রাম ছাড়তে হ'ল! তারপর থেকে এখনও পর্য্যন্ত সে কিছু খাবার জোটাতে পারেনি। ক্ষিদেয় পেট তার ভীষণ ধুঁকছিল। চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল। সে আর পারে না থাকতে। কিছু খাওয়া তার চাই-ই। রাত্রি অনেক হয়েছে। বাড়ীর লোকেরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে। সে বেরলো দেখতে যদি কিছু খাবার জিনিষের সন্ধান মেলাতে পারে। আনাচ, কানাচ, ছেঁছতলা, কুলুঙ্গি, জল রাখবার জায়গা, ঢেঁকশাল, গোয়াল, আঁস্তাকুড়, আবর্জ্জনার স্তূপ, ছেঁড়া নেকড়ার পুঁটলি, তৈলাক্ত একটা ভাঙ্গা ডেরকো, এমন কি বহু দিনের পরিত্যক্ত এক জোড়া ছেঁড়া জুতোও সে অনাঘ্রাত রাখেনি, যদি কোথাও তার ক্ষুন্নিবৃত্তির ইঙ্গিত মেলে। অবশেষে সে দেখতে পেলে গোয়াল ঘরের পেছনে একটা ছোট মাটির গামলায় একটু ভাতের ফ্যান রয়েছে। নাকের সমস্তটা সে গামলার ভিতর পুরে দিয়ে নিমেষের মধ্যে ফ্যানটুকু উদরসাৎ করলে, সে রাত্রে তাকে সেইটুকু মাত্র আহার্য্যেই সন্তুষ্ট থাকতে হ'ল। এর অধিক আর কিছুই সে জোটাতে পারলে না। সে তার পূর্ব্বনির্ব্বাচিত আশ্রয় স্থলটিতে গিয়ে শুয়ে পড়ল এবং শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়ল।

খুব সকালে উঠেই সে আর একবার তার নূতন পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচয়টা একটু নিবিড় ক'রে নেবার জন্যে যেমন বেরিয়েছে অমনি ভুলোর সঙ্গে তার চোখোচোখি। ভুলো এ বাড়ীর পোষা কুকুর। প্রকাণ্ড চেহারা, রংটা কটা ও হলদেতে মেশানো। কান দুটো লোটানো। ল্যাজের আধখানা কাটা। হঠাৎ এই অপরিচিত স্বজাতীয়টিকে দেখে ভুলো বিস্ময়বিজড়িত উষ্মার সহিত তার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু কি জানি কি মনে করে শত্রু ভাবে আক্রমণ না করে করে ফেল্‌লে ঠিক তার উল্টো। নবাগত কুকুরটির পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত সে তার নাসিকার দ্বারা একবার আঘ্রাণ করে নিলে, তারপর তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে নখে করে মাটি আঁচড়াতে আঁচড়াতে আনন্দ প্রকাশ করে জানিয়ে দিলে যে সে তার শত্রু নয়—মিত্র। অপর কুকুরটিও যেন সে কথা বুঝতে পেরে ল্যাজ নেড়ে ভুলোকে তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলে। এইরূপে আমাদের গল্পবর্ণিত কুক্কুরীটি তার নূতন আবাস স্থলে জীবনযাত্রা সুরু করলে। পূর্ব্বের নিদারুণ অভিজ্ঞতা তাকে যতদূর সম্ভব লোকের চক্ষু এড়িয়ে যেতে সচেতন করে দিত। তা হ'লেও একদিন সে লুকিয়ে গোয়াল ঘরের ভিতর ঢুকে গোবৎসের জন্য রক্ষিত ফ্যান পান করার সময়ে বাড়ির ঝি মোক্ষদা কর্তৃক দৃষ্ট হয়। মোক্ষদার অনতিমধুর সম্ভাষণে ও ততোধিক তাহার অমৈত্রী আচরণে সে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এ ঘটনায় তার একটা মস্ত লাভ হয়ে গেল। মোক্ষদার মুখে এই ব্যাপার শুনে, বাড়ীর মেয়েরা তাকে দেখলেই "ঐ ফ্যানখাগী আসছে" বলত। পরে এই "ফ্যানখাগী" নামটা তার অপভ্রংশে "ফ্যান"এ পরিণত হ'ল। অতঃপর আমরাও তাকে ফ্যান বলেই উল্লেখ করবো। এমনি করে ফ্যানের দিনগুলো সুখে ও দুঃখে কেটে যেতে লাগল। এ বাড়ীতে তার চেহারারও পরিবর্ত্তন হয়েছে। এখন আর সে দেখতে তত কুৎসিত নয়। এ কথাটা কিন্তু লক্ষ্য করে প্রথম এ বাড়ীর ছোট বউ। সে একদিন ফ্যানকে দেখিয়ে তার মেজজাকে বললে, "দেখ দিদি, এটার এখন কেমন ছিরি হয়েছে।" উত্তরে মেজ বউ বললে, "তাইত দেখছি—এর যে দশা তোরই

মতন।” ছোট বউ এই রকম উত্তরের আশা করেনি। কুকুরের অবস্থা যে তার মতন হ'তে পারে সে কথাটা সে তলিয়ে দেখেনি, তা হ'লে বোধ হয় সে কখনও এ রকম কথা পাড়তে যেতো না। ফ্যানের আগেকার সেই ভয় ভয় ভাবটা গেছে। আগে আগে সে বাড়ীর বাইরে বড় রাস্তার ওপরে যেতে সাহস করত না, এখন সে বড় রাস্তার ওপরে তো যায়ই এমন কি একদিন গ্রামের হাটতলাতেও গিয়েছিল। কিন্তু গিয়ে কি বিপদেই না পড়েছিল। একপাল কুকুর তাকে ঘিরে ছিঁড়ে ফেলবার যোগাড় করেছিল এবং তার অবস্থা নিতান্তই সঙ্গীন হয়ে পড়ত যদি না হঠাৎ ভুলো সেখানে এসে উপস্থিত হ'ত। ভুলোর সে গ্রামের সারমেয়-সমাজে প্রতিপত্তি ছিল খুব। সে তাদের এক রকম সর্দ্দার ছিল বললেই হয়। ভুলোর ভয়ে গ্রামের অপর কোন কুকুরই ফ্যানের উপর অত্যাচার করতে সাহস করত না। মোটের ওপর ফ্যান এখানে এসে এক রকম আছে মন্দ নয়। কিন্তু হায়, কেউ বলতে পারে না কোন দিনে কার ভাগ্যে কি লেখা আছে।

সে দিন গ্রামে যে ঘটনা ঘটল সে রকম ঘটনা এর পূর্ব্বে সেখানে কখনও ঘটে নি। প্রকাণ্ড জুতো পায়, গায়ে লাল রঙ্গের ফতুয়া, মাথায় লাল পাগড়ী এবং হাতে ৫।৬ ফুট লম্বা মাথার দিকটা লোহা দিয়ে বাঁধানো প্রকাণ্ড একটা লাঠি নিয়ে কাল মত এক দীর্ঘাকার লোক হাটতলায় দেখা দিল। আশ্চর্য্যের বিষয় গ্রামের যে সব বেকার কুকুরগুলো কোন অচেনা বা অদ্ভুত গোছের লোক দেখলে চীৎকার করে তাকে আক্রমণ করবার উপক্রমে নাস্তা-নাবুদ করে দেয়, সেই কুকুরের দল লোকটার পিছনে তো লাগেই নি, বরং একে দেখে কি যেন এক অজ্ঞাত ভয়ে তারা দূরে পালাবার জন্য সন্ত্রস্ত। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের ফ্যান এই লোকটার সামনে পড়ে গেল। তার মুখের দিকে একবার চেয়েই সে ভয়ে প্রাণপণে দৌড় দিল বাড়ীর দিকে। লোকটাও ছুটল তার পিছন পিছন। আর একটু হ'লেই ফ্যানের মাথায় তার লাঠির অগ্রভাগ সগৌরবে অবতীর্ণ হ'ত, কিন্তু ফ্যান দ্রুত বেগে বেড়ার নীচে দিয়ে একেবারে বাড়ীর অন্তঃপুরে ঢুকে পড়ায়—তা তার হয়ে উঠল না।

এই রূপে বিফলমনোরথ হয়ে লোকটা ঘুরে বাড়ীর সামনের দিকে আসতেই তার সঙ্গে গৃহস্বামী নড়ু ঘোষের দেখা। “কী খুড়ো, তুমি এখানে?” নড়ু জিজ্ঞাসা করলে তাকে। “জানইত সরকারী কাজ ভিন্ন আমি বেরুই না,”—উত্তর দিলে সে। এবং এ কথাও বললে যে, এ বাড়ীর ভিতর এই মাত্র যে মাদী কুকুরটা ঢুকেছে সেটা ক্ষ্যাপা। তাকে এখুনি বাড়ীর ভিতর থেকে বের করে দেওয়া হোক। নড়ু আশ্চর্য্য হয়ে পড়ল। ক্ষ্যাপা কুকুর! আবার তারই বাড়ীর মধ্যে! তবে কি ফ্যানটা একেবার ক্ষেপে গেছে! কি ভয়ানক কথা! না, এখুনি বিহিত করতে হবে এর। ছুটল সে বাড়ীর ভিতর হন্তদন্ত হয়ে। তার স্ত্রী তাকে ঐরকম ভাবে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করলে “কী হয়েছে তোমার? ও রকম করছো কেন?” নড়ু গম্ভীর গলায় উত্তর দিলে “কী হয়েছে?” কোথায় গেল তোমার সেই আহ্লাদী কুকুরটা? সেটা ক্ষেপে গেছে জান?” তার স্ত্রী অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে বললে “ক্ষেপে গেছে! সে ক্ষেপেছে, না তুমি ক্ষেপে গেছ? সে তো আমার পেছনেই বসে আছে।” সত্য সত্যই কুকুরটা ভয়ে কখনও যা সে করেনি তাই করে বসেছে। সে এ বাড়ীতে এসে পর্য্যন্ত ঘরের দাওয়ায় উঠতে কোন দিনই সাহস করেনি, কিন্তু আজ প্রাণের দায়ে যখন সে দৌড়ে এসে একেবারে যেখানে মেজ বৌ তার ঘরের সামনের দাওয়াটিতে মধ্যাহ্নভোজন সমাপনান্তে পা

ছড়িয়ে বিশ্রামের চেষ্টায় ছিল, সেইখানে প্রায় মেজ বৌএর কোলের কাছে, হাঁপাতে হাঁপাতে এসে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল। তার তৎকালীন অবস্থা দেখে মেজ বৌয়ের মনে দয়া হ'ল, তার বুঝতে বাকী রইল না যে, কোন ভীষণ অত্যাচারের তাড়নাই এই নিরীহ জীবটিকে এই দুঃসাহসিক কার্য্যে বাধ্য করেছে। নড়ু কুকুরটাকে তার স্ত্রীর পেছনে শুয়ে থাকতে দেখে একেবারে ভয়ে আঁৎকে চীৎকার করে বলে উঠল "মেজ বউ, মেজ বউ, শীগ্‌গির কুকুরটাকে তাড়িয়ে দাও, তাড়িয়ে দাও। হারু খুড়ো বলেছে ওটা ক্ষেপে গেছে। তার চেয়ে কি তুমি কুকুরের বিষয় বেশী জান? সরকার থেকে তাকে ক্ষ্যাপা কুকুর ধরার জন্যে রেখেছে। শীগ্‌গির—শীগ্‌গির তুমি ওখান থেকে সরে এসো।" নড়ু দাওয়ার নীচে দাঁড়িয়েই স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছে। কুকুরটার ভয়ে সে দাওয়ার উপরে উঠতে সাহস করছে না। তার স্ত্রী তার এই রকম অবস্থা দেখে না হেসে থাকতে পারলে না। সে বললে "কে সেই কুকুর-মারা হেরো বাগ্দীটা এসেছে বুঝি? আমার বাপের বাড়ীর গাঁয়ে তার বাড়ী, আমি আর তাকে চিনি না?" নড়ু গরম হয়ে বললে "তাতে হ'য়েছে কি?" তার বউ স্বাভাবিক স্বরে বললে 'দ্যাকো, না জেনে শুনে হ্যাঁদার মত চেঁচিও না বলছি। ওর বৌয়ের সঙ্গে আমার গঙ্গাজল মাসীর সই পাতান। আমি গঙ্গাজল মাসীর মুখে শুনেছি যে, তার কাছে হেরোর বউ গল্প করেছে যে মাসে তার সোয়ামী ক্ষ্যাপা কুকুর মারতে না পারে সে মাসে তাদের পেট চলে না। তা ফি মাসেই কি আর ক্ষ্যাপা কুকুর মেলে গা—ভাল কুকুর গুলোকেই কাজেই মারতে হয়। কী অন্যায় কথা—জলজ্যান্ত কুকুরগুলোকে মেরে ফ্যালা! ওসব লোকের মুখ দেখতে আছে?" এই বলে সে সত্য সত্যই কুকুরটাকে টেনে নিয়ে ঘরের মধ্যে পুরে দরজায় তালা লাগিয়ে দিলে। পাছে হারু বলে, লোকটা ও তার স্বামী কুকুরটাকে জোর করে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলে। স্ত্রীর এরূপ আচরণের পর নড়ু তাকে আর কিছু বলতে সাহস করলে না। সে তার স্ত্রীর স্বভাব ভাল রকমই জানে। সে বাইরে এসে হারুকে বললে "না খুড়ো, আমার স্ত্রী কুকুরটাকে ছেড়ে দিতে কিছুতেই রাজী হলো না।" কথাটা শুনে হারু অবশ্য মোটেই খুশী হ'ল না। সে নড়ুকে নানা রকমে বুঝাতে চেষ্টা করেও যখন পারলে না, তখন একটু রেগে বললে "জান, সরকারের হুকুম ক্ষ্যাপা কুকুর মারা। আমি সরকারী চাকর, আমার কাজে বাধা দেওয়া কি ঠিক? সরকারের কানে এ খবর পৌঁছুলে তোমায় থানায় তলব করতে পারে।" নড়ু তার মনের ভাবটা বুঝতে পেরে বললে "তবে আর তুমি রয়েছো কি করতে খুড়ো? নাও এখন তামাক খাও।" এই বলে নড়ু তার হুঁকো থেকে জ্বলন্ত ক'লকেটা নামিয়ে হারুর দিকে এগিয়ে দিলে। হারু কলকেটা তুলে নিয়ে তার যথোচিত সদ্ব্যবহার করবার সময় তার চক্ষু দুটি গিয়ে পড়ল নড়ুর উঠানের লাউমাচার ওপর। সেখানে নধর লাউগুলো ঝুলছে দেখে বললে "ভাইপো, তোমার ত খাসা লাউ হয়েছে। এবার আমি কিছুতেই লাউ গাছ করতে পারলুম না।" এ কথা শুনে ভাল লোক মাত্রেরই যা করা উচিত নড়ুও আমাদের তাই করলে। সে একটা লাউ ও কিছু লাউ শাক কেটে নিয়ে এসে হারুকে দিয়ে বললে "নাও খুড়ো, তুমি খেও।" এতক্ষণে হারুর মুখে যা সহজে কেউ দেখতে পায় না তাই দেখা দিল। সত্যি সত্যি হারু একগাল হেসে বললে "তা ভাইপো, বেশ! লাউটা আমি বড় ভালবাসি আর তোমার খুড়ী হচ্ছে লাউডগার যম। তা যাগ্‌গে তুমি কিছু ভেবো না—যাতে তোমায় থানায় টানায় না যেতে হয় আমি তার ব্যবস্থা

করব 'খন।" এইরূপে হারু সর্দ্দার তার সরকারী কর্ত্তব্য সম্পাদন ক'রে প্রফুল্ল চিত্তে প্রস্থান করল।

এই ঘটনার পর ২।৩ দিন ফ্যানকে বাড়ীর কেউ দেখতে পায়নি। মেজ বউ কুকুরটার কি হ'ল ভেবে বিষণ্ণ ও চিন্তিত হয়ে উঠছিল, এমন সময় তার ভাশুরপো কুড়ন এসে বললে "খুড়িমা খুড়িমা, শীগ্‌গির এস, শীগ্‌গির এস। তুমি ফ্যান কোথায় গেল ফ্যান কোথায় গেল ভেবে সারা হচ্ছ! ফ্যান এদিকে কি করেছে দেখবে এস।"

কুড়ন যাই বলুক ফ্যান এমন কিছু করেনি যাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু আছে। মেজ বৌ দেখলে গোয়ালের পিছনে একটা গলির মতন জায়গায় যেখানে আগে হাঁস থাকত সেখানে ফ্যান কুঁকড়ীশুঁকড়ী হয়ে শুয়ে আছে। তার কোলের কাছে একটা দুটো তিনটে, হাঁ তিনটেই ত কি সুন্দর ছানা! ছানাগুলি দেখতে ঠিক ভুলোর মত। ছানাগুলিকে দেখে মেজ বৌএর ইচ্ছা হ'ল তাদের বুকে করে নেয়, কিন্তু ফ্যান তাদের এমন করে কোলের মধ্যে নিয়ে মাই দিচ্ছে যে তার কোল থেকে ছানাগুলোকে কেড়ে নিতে মেজ বৌএর প্রাণ চাইলে না। সন্তানচ্যুতা জননীর যে কী বেদনা সে যে জানে। আজ চার মাস হ'ল তার বুক থেকে নিষ্ঠুর কাল তার সোনার শিশুটিকে ছিনিয়ে নিয়েছে—সে ব্যথা যে তার এখনও মেলায় নি!

মেজ বৌকে দেখে ফ্যান লজ্জায় যেন মরে গেল। সে মাথাটি নীচু করে কেবল আস্তে আস্তে ল্যাজ নাড়তে লাগল। মেজ বৌ অতি যত্নে ফ্যানের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগল।

শুধু মেজ বৌ কেন বাড়ীর ছোট বড় সকলেই এখন ফ্যানকে খুব যত্ন করতে আরম্ভ করেছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় তার মুখের কাছে খাবার এনে দেয়। তার গায়ে ঢাকা দেবার জন্য ছেঁড়া কাপড় ও পেতে শোবার চট জোগাড় করে দেওয়া হয়েছে। মোট কথা যাতে তার কোন কষ্ট না হয় সে দিকে সকলেই সচেষ্ট।

ফ্যান বোধ হয় ভাবে, অদৃষ্টের এ কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন! সে কিছু ঠিক করতে পারে না। সে মানুষ হ'লে হয়ত ভাবত যে, এ সম্মান তার না তার মাতৃত্বের।





সম্পাদকীয়

আজ ১৯শে অক্টোবর, বাঙলা ২রা কার্ত্তিক, সপ্তমী পূজার দিন।

এই তারিখ বিশেষ করে উল্লেখ করবার আমার একটি ব্যক্তিগত কারণ আছে।

আমাদের স্কুলকলেজের আসল উদ্দেশ্য নাকি আমাদের superstition নষ্ট করা। তাই যদি হয় ত ইংরাজী শিক্ষার ফল এ ক্ষেত্রে সিদ্ধ হয়েছে। আমি যথেষ্ট পরিমাণে superstition-মুক্ত হলেও, দু-একটি superstition-এর বশীভূত। তার মধ্যে একটি হচ্ছে যে, ১৭ই অক্টোবর তারিখে আমি একটু অসোয়াস্তি বোধ করি,—এমন একটি খবর পাবার ভয়ে, যা শুনে আমার মন খুসী হবে না।

এবার ঘটেছেও তাই।

দুদিন আগে বড়লাট তারস্বরে ঘোষণা করেছেন যে, ইংলণ্ড ভারতবাসীদের পলিটিকালি আর এক পাও এগোতে দেবে না। এ কথা শোনবার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলুম না।

প্রস্তুত ছিলুম না এই জন্য যে, ভেবেছিলুম আমাদের দেশের নেতাদের সঙ্গে বড়লাটের "গুফ্‌তগু"র ফলে কিছু সুফল ফলবে। লোকে আশা করেছিল যে, মহাত্মা গান্ধী দিল্লী থেকে স্বরাজের চাঁদ ধরে নিয়ে আসবেন;—কিন্তু লাভের মধ্যে তিনি আর তাঁর দলবল পেয়েছেন শুধু অর্দ্ধচন্দ্র। আমি গত মাসে বলেছিলুম যে, গান্ধীজি এ-ফেরা অন্ততঃ হাতের পাঁচ রাখবেন। কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছিলুম যে, কংগ্রেসের শুধু মুখ আছে, কোনও হাত নেই।

বড়লাটের মন্তব্য সম্বন্ধে দেশের লোকের মনোভাবের কথা কিছু বলব না; কেননা এমন কোন কথা বলতে পারিনে, যা আর পাঁচজনের কথার পুনরুক্তি হবে না। এ মন্তব্য শুধু নৈরাশ্যজনক নয়, এর ফলে অনেকের চোখের ছানি কেটে গিয়েছে। ইংলণ্ড আমাদের চোখের মধ্যে পলিটিকাল জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা পুরে দিয়েছে।

মহাত্মা গান্ধী বলেছেন যে, ইংলণ্ড আমাদের ডিমোক্রাসি কস্মিনকালেও দেবে না। কথাটা অপ্রিয় হলেও সত্য। ভাল কথা, Chamberlain কি ঘুণাক্ষরেও বলেছেন যে, তিনি ভারতবর্ষকে ডিমোক্রাসি দেবেন?—অর্থাৎ যে দেশে ডিমোক্রাসি নেই, সেই দেশে ডিমোক্রাসি প্রতিষ্ঠা করবার

জন্য কি তিনি প্রাণপণে জার্ম্মাণীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়েছেন?—এত বড় Idealist ইংলণ্ডের জনগণ নয়,—তাদের অধিনায়কও নন।

যে দেশে ডিমোক্রাসি আগে ছিল, সে দেশের ডিমোক্রাসি ধ্বংস করে জার্ম্মাণীর অধীন করবার অনুমতি তিনি ত সেদিনই দিয়েছেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা ত Hitler Munich Agreement এর ফলেই অবাধে হরণ করেছে।

ভারতবর্ষের অধীনতা ইংরাজী Imperialism-এর প্রধান সম্বল। সুতরাং তাকে মুক্তি দেওয়া সে Imperialism-কে মূলে হাবাৎ করা।

Chamberlain যে ডিমোক্রাসি রক্ষার কথা বলেছেন, সে হচ্ছে ইংলণ্ডের ডিমোক্রাসি, অপর কোন দেশের নয়। ফ্রান্স ইংলণ্ডের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, কেননা জার্ম্মাণী প্রবলপ্রতাপান্বিত হলে ফ্রান্সের আত্মরক্ষা করা দুঃসাধ্য হবে। দ্বিতীয়তঃ ফ্রান্স Communism ভয় করে, কারণ ফ্রান্সে বহু লোক এখন Communism-এর মতামত গ্রাহ্য করে।

ইংলণ্ডের ডিমোক্রাসির স্বরূপ এই যে, ইংলণ্ডের নিজের দেশের রাষ্ট্রতন্ত্র অপর সকল দেশের চাইতে বেশী Democratic এবং পররাষ্ট্র সম্বন্ধে Imperialist। Imperialism-এর অর্থ যাই হোক, Democracy নয়।

কিছুদিন থেকে বিদেশী ডিমোক্রাসি Totalitarian রাজপুরুষদের কোন কোন রাজ্যশাসন-প্রণালী গ্রাহ্য করেছে। কারণ শাসনকর্ত্তাদের প্রভুত্ব কায়েম করতে হলেই শাসিতদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ করা দরকার। এই কারণে ব্রিটিশ ডিমোক্রাসি দো-মনা। সুতরাং ভারতবর্ষকে ডিমোক্রাসির পথে অগ্রসর করতে ইংরাজ শাসনকর্ত্তারা যে ইতস্ততঃ করছেন, এতে আমি দুঃখিত হয়েছি, কিন্তু বিস্মিত হইনি। ইংরেজ যে উপায়ে ভারতবর্ষ করতলগত করেছেন, সেই একই উপায়ে তাকে হস্তগত রাখবেন। আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে, এ অবস্থায় আর পাঁচজনে যা বলছেন, আমিও তাই বলি। তবে তাঁদের কথার সঙ্গে আমার কথা যে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাবে, তা অবশ্য নয়।

কংগ্রেসের সরস্বতী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বলেছেন যে, ভারতবর্ষকে এই সঙ্কটের সময় স্বরাজ্য না দিয়ে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট পলিটিকাল সুবুদ্ধির পরিচয় দেননি। এ কথা ঠিক নয়। ইংরাজ রাজপুরুষদের আর যে বুদ্ধিরই অভাব থাকুক, পলিটিকাল বুদ্ধির অভাব নেই। প্রমাণ—আজকে অর্দ্ধেক পৃথিবী তাঁদের শাসনাধীন।

তবে না দেবার যে সব কারণে তাঁরা দেখিয়েছেন, সে সব কথায় তাঁরা সুবুদ্ধির পরিচয় দেন নি। আমরা ভারতবাসীরা অবশ্য নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। পৃথিবীর সব দেশেই ডিমোক্রাসির আদর্শ হচ্ছে, এই সব সম্প্রদায় থাকা সত্ত্বেও স্বদেশের লোককে পলিটিকাল হিসাবে এক করা। মানুষের যেমন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য আছে, তেমনি সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য আছে। এ সত্ত্বেও France ও ইংলণ্ডে Democracy আছে। সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি থেকে জাতিকে মুক্ত করাই Democracyর অন্যতম উদ্দেশ্য।

আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক অনৈক্য আছে, কিন্তু কবে যে মনের মিল হবে বলা অসম্ভব। একটি মানুষ ঠিক আর একটি মানুষের মত নয়;—কস্মিনকালেও ছিল না, কস্মিনকালে হবেও না।

এ কারণে যদি ভারতবাসীদের পক্ষে আত্মবশ হওয়া অসম্ভব হয় ত পলিটিকাল মুক্তির কথা আমাদের ছেড়ে দেওয়াই উচিত।

এ অনৈক্য অবশ্য বিরোধ নয়, কিন্তু এই সূত্রে বিরোধ সৃষ্টি করা অতি সহজ। আমরা যে ঐক্যের কল্পনা করি, তা এই অনৈক্যকে অঙ্গীকার করেই করি। কিন্তু এই অনৈক্যকে যদি মারাত্মক বিরোধ বলে ধরে নিই, তাহলে আমাদের পলিটিকাল ঐক্যের আদর্শ আকাশকুসুম মাত্র।

কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য থেকে আমরা মুক্ত নই। তা সত্ত্বেও বহু লোক সমাজ বলে একটা অনুষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। আর আমরাও বর্ত্তমানে একটি পলিটিকাল সমাজ গড়ে তুলতে চাচ্ছি। এ কথা ইংরাজ রাজপুরুষরা জানেন, এবং তাতে বাধা দেওয়াই তাঁদের অভিপ্রায়।

ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রীরা যা করেছেন, তার নাম রাজনীতি। মনে রাখবেন যে, আমাদের দেশেও নীতিশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র এক শাস্ত্র নয়। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন যে, Chamberlain-এর উক্তি স্পষ্ট নয়। স্পষ্ট কথা বলা কিন্তু পলিটিসিয়ানদের ধাতে নেই। বিশেষতঃ আজকের দিনে; কারণ রাজপুরুষরাও বিশ্বমানবের অনুমোদনের মুখাপেক্ষী। এর চেয়ে স্পষ্ট কথা বললে অপর জাতের কানে তা ভয়ঙ্কর বেসুরো লাগত। Hitler বর্ব্বরোচিত, সাফ সাফ কথা বলেই আজকে বিশ্বমানবের কাছে এত ঘৃণ্য হয়েছেন। হিটলার চান স্বাধীন দেশকে অধীন করতে, সুতরাং তিনি স্পষ্ট কথা বলতে বাধ্য। Chamberlain চান অধীন দেশকে অধীন রাখতে, সুতরাং তিনি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে সেকালের কথার পুনরুক্তি করাতে বাধ্য।

আমার বিশ্বাস Chamberlain-এর কথা যথেষ্ট স্পষ্ট; অস্পষ্টতা আছে শুধু আমাদের মনে।

আজ পূর্ণিমা, যদিচ পাঁজির হিসেবে কোজাগরী পূর্ণিমা গতকল্যের সঙ্গেই গত হয়েছে।

আজ কাগজে দেখছি যে, মহাত্মা গান্ধী স্পষ্ট করে বলেছেন যে, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের উক্তি যথেষ্ট স্পষ্ট। সে উক্তির নির্গলিতার্থ হচ্ছে "না"। অর্থাৎ কংগ্রেস যা চায়, ইংরাজ রাজমন্ত্রীরা তা দিতে পারে না।

মহাত্মা গান্ধী আরও বলেছেন যে, যার নাম Dominion Status, তারই নাম Independence। বাঢ়ং! তবে এ যুদ্ধ কখন শেষ হবে তা আমরাও জানিনে, ইংরাজরাও জানেন না। তাঁরাও যে জানেন না, তার প্রমাণ ইংরাজ দার্শনিক Joad সম্প্রতি লিখেছেন যে, "The mind operates in a vacuum of complete nescience."

শেষের কথা থাক্, ইংরাজ ও জার্ম্মাণে কি যুদ্ধ আরম্ভই হয়েছে? পোলাণ্ড অবশ্য ধ্বংস হয়েছে; এবং সে দেশের গর্ভে যে গুপ্তধন আছে (petrol) তা জার্ম্মাণী ও রুসিয়া ভাগাভাগি করে নিয়েছে। কিন্তু পোলাণ্ডের অধিবাসীদের কেউ রক্ষা করতে অগ্রসর হননি। যুদ্ধের যখন এই অবস্থা, তখন ভবিষ্যৎ শুধু জ্ঞানের নয়, কল্পনারও বহির্ভূত। তারপর ইংলণ্ডের শাসনকর্ত্তারা বলেছেন যে, ইতিমধ্যে ভারতবাসীরা যদি Majority ও Minority-র মিলনসাধন করেত পারে, তাহলে তাদের

Democracy দেওয়া যাবে। পলিটিক্‌স্ ভেদবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, অথচ হিন্দু মুসলমান পলিটিক্‌সের ক্ষেত্রে অভেদাত্মা হয়ে যাবে—এটা কি একটা অদ্ভুত কথা নয়?

যখন সমগ্র জাতির উপর দেশের শাসন-সংরক্ষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব বর্ত্তাবে, তখন এ-দুই দলের ভিতর Minority ও Majority-র বিরোধ থাক্‌বে না।—এই বিশ্বাসের উপরেই সকল দেশে Democracy দাঁড়িয়ে আছে।

সুতরাং Congress যে Council-এর মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করবার সংকল্প করেছেন—সেই সংকল্পই হচ্ছে কাজের কথা।

ইংলণ্ড বর্ত্তমানে ভারতবাসীদের moral support চান। কিন্তু রাজ্যশাসন হতে আলগা হওয়াতেই প্রমাণ হবে যে, কংগ্রেস সে moral support দিতে পারবে না; যদিও আমরা সকলেই হিটলারের ব্যবহারের সম্পূর্ণ বিরোধী।

যদি moral support-এর কোন অর্থ থাকে, Chamberlain-এর মন্ত্রিসভা এ ক্ষেত্রে তা লাভ করতে পারেন না।

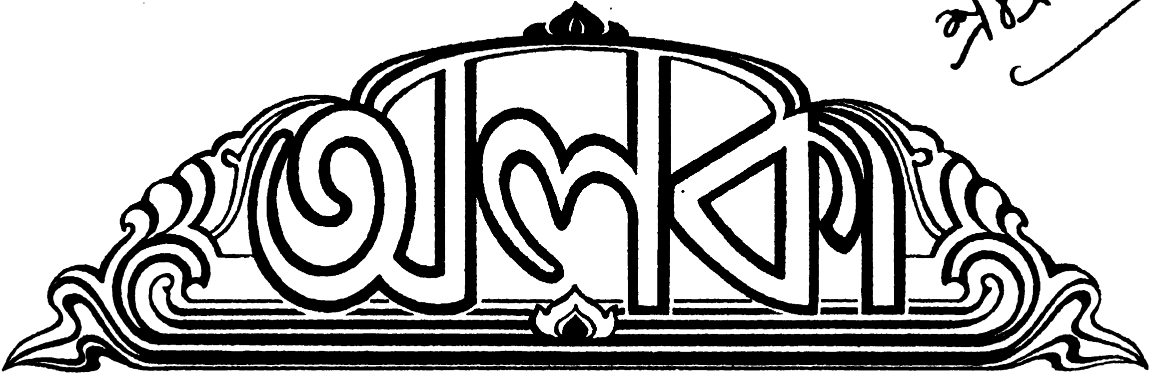
এখন আমাদের ভাগ্যবিধাতার কাছে আমাদের আরজি এই—

নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য ভাল নহে তাহা
আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে।
তুমি যে চাহনি চাও, সে চাহনি কোথা পাও
ভারত যেমত চাহে সেই মত চাও হে॥

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত
শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও
৩৬।১ এল্‌গিন রোড হইতে প্রকাশিত



পরিব্রাজক



দ্বিতীয় বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬ | তৃতীয় সংখ্যা

নারীর কর্তব্য

আন্নাকালী পাকড়াশি

পুরুষের পক্ষে সব তন্ত্রমন্ত্র মিছে,
মনু-পরাশরদের সাধ্য নাই টানে তারে পিছে।
বুদ্ধি মেনে চলা তার রোগ,
খাওয়া ছোঁওয়া সব তাতে তর্ক করে, বাধে গোলযোগ

মেয়েরা বাঁচাবে দেশ, দেশ যবে ছুটে যায় আগে।
হাই তুলে দুর্গা ব'লে যেন তারা শেষ রাতে জাগে;
খিড়কির ডোবাটাতে সোজা
ব'হে যেন নিয়ে আসে যত এঁটো বাসনের বোঝা;
মাজা ঘষা শেষ ক'রে আঙিনায় ছোটে,
ধড়ফ'ড়ে জ্যান্ত মাছ কোটে
দুই হাতে ল্যাজামুড়ো জাপটিয়ে ধরে
সুনিপুণ কবজির জোরে,
ছাই পেতে বঁটির উপরে চেপে ব'সে
কোমরে আঁচল বেঁধে ক'ষে।

কুটি কুটি বানায় ইঁচোড়,
চাকা চাকা করে থোড়
আঙুলে জড়ায় তার সুতো,

মোচাগুলো ঘস্ ঘস্ কেটে চলে দ্রুত ;
চালতারে
বিশ্লেষণ করে খরধারে।
বেগুন পটোল আলু খণ্ড খণ্ড হয় সে অগুন্তি।
তার পরে হাতা বেড়ি খুন্তি ;
তিন চার দফা রান্না সে
নানা ফরমাসে,
আপিসের, ইস্কুলের, পেট-রোগা রুগীর কোনোটা,
সিদ্ধ চাল, সরু চাল, ঢেঁকিছাঁটা কোনোটা বা মোটা।
যবে পাবে ছুটি
বেলা হবে আড়াইটা। বিড়ালকে দিয়ে কাঁটাকুটি
পান দোক্তা মুখে পুরে দিতে যাবে ঘুম,
ছেলেটা চেঁচায় যদি পিঠে কিল দেবে ধুমাধুম
বল্‌বে, বজ্জাত ভারি।
তার পরে রাত্রে হবে রুটি আর বাসি তরকারী।

জনার্দন ঠাকুরের
পানা পুকুরের
পাড়ের কাছটা ঢাকা কলমির শাকে।
গা ধুয়ে তাহারি এক ফাঁকে,
ঘড়া কাঁখে, গায়েতে জড়ায়ে ভিজে শাড়ি
ঘন ঘন হাত নাড়ি
খস্ খস্ শব্দ করা পাতায় বিছানো বাঁশবনে
রাম নাম জপি মনে মনে
ঘরে ফিরে যায় দ্রুতপায়ে
গোধূলির ছমছমে অন্ধকার ছায়ে।
সন্ধেবেলা বিধবা ননদী বসে ছাতে,
জপমালা ঘোরে হাতে।
বউ তার চুলের জটায়
চিরুনি আঁচড় দিয়ে কানে কানে কলঙ্ক রটায়
পাড়াপ্রতিবেশিনীর,—কোনো সূত্রে শুন্‌তে সে পেয়ে
হন্ত দন্ত আসে ধেয়ে

ও পাড়ার বোসগিন্নি ; চোখা চোখা বচন বানায়ে
স্বামীপুত্র-খাদনের আশা তারে যায় সে জানায়ে।

কাপড়ে জড়ানো পুঁথি কাঁখে
তিলক কাটিয়া নাকে
উপস্থিত আচার্যি মশায়,
গিন্নির মধ্যমপুত্র শনির দশায়,
আটক পড়েছে তার বিয়ে ;
তাহারি ব্যবস্থা নিয়ে
স্বস্ত্যয়নের ফর্দ মস্ত,
কর্তারে লুকিয়ে তারি খরচের হোলো বন্দোবস্ত।
এমনি কাটিয়ে যায় সনাতনী দিনগুলি যত
চাটুজ্জে মশার অনুমত,
কলহে ও নামজপে, ভবিষ্যৎ জামাতার খোঁজে,
নেশাখোর ব্রাহ্মণের ভোজে।
মেয়েরাও বই যদি নিতান্তই পড়ে
মন যেন একটু না নড়ে।
নূতন বই কি চাই ? নূতন পঞ্জিকাখানা কিনে
মাথায় ঠেকায়ে তারে প্রণাম করুক শুভদিনে।
আর আছে পাঁচালির ছড়া,
বুদ্ধিতে জড়াবে জোরে ন্যাশনাল কাল্‌চারের দড়া।
দুর্গতি দিয়েছে দেখা, বঙ্গনারী ধরেছে শেমিজ,
বি. এ, এম. এ. পাস ক'রে ছড়াইছে বীজ
যুক্তি-মানা ঘোর ম্লেচ্ছতার।
ধর্ম কর্ম হোলো ছারখার।
শীতলা মায়ীরে করে হেলা ;
বসন্তের টীকা নেয় ; গ্রহণের বেলা
গঙ্গাস্নানে পাপ নাশে
শুনিয়া মূর্খের মতো হাসে।
তবু আজো রক্ষা আছে, পবিত্র এ দেশে
অসংখ্য জন্মেছে মেয়ে পুরুষের বেশে।
মন্দির রাঙায় তারা জীবরক্তপাতে,
সে রক্তের ফোঁটা দেয় সন্তানের মাথে।

কিন্তু যবে ছাড়ে নাড়ী,
ভিড় ক'রে আসে দ্বারে ডাক্তারের গাড়ি।
অঞ্জলি ভরিয়া পূজা নেন সরস্বতী,
পরীক্ষা দেবার বেলা নোটবুক ছাড়া নেই গতি।
পুরুষের বিদ্যে নিয়ে কলেজে চলেছে যত নারী,
এই ফল তারি।
মেয়েদের বুদ্ধি নিয়ে পুরুষ যখন ঠাণ্ডা হবে,
দেশখানা রক্ষা পাবে তবে।

বুঝিনে একটা কথা, ভয়ের তাড়ায়
দিন দেখে তবে যেথা ঘরের বাহিরে পা বাড়ায়
সেই দেশে দেবতার কুপ্রথা অদ্ভুত,
সবচেয়ে অনাচারী সেথা যমদূত।
ভালো লগ্নে বাধা নেই, পাড়ায় পাড়ায় দেয় ডঙ্কা।
সব দেশ হ'তে সেথা বেড়ে চলে মরণের সংখ্যা।

বেস্পতিবারের বারবেলা
এ কাব্য হয়েছে লেখা, সামলাতে পারব কি ঠেলা।



রোহিণী

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

রোহিণী বলিল—মরিব না, মারিও না, চরণে না রাখ বিদায় দাও।

গোবিন্দলাল—দিই।

গোবিন্দলাল পিস্তল উঠাইয়া রোহিণীর ললাট লক্ষ্য করিলেন।

রোহিণী কাঁদিয়া উঠিল। বলিল—মারিও না, মারিও না। আমার নবীন বয়স, নূতন সুখ। আমি আর তোমায় দেখা দিব না, আর তোমার পথে আসিব না। এখনই যাইতেছি, আমায় মারিও না।

গোবিন্দলালের পিস্তলে খট্ করিয়া শব্দ হইল। রোহিণী গতপ্রাণা হইয়া ভূপতিতা হইল। ভৃত্যগণ আসিয়া দেখিল—বালকনখরবিচ্ছিন্ন পদ্মিনীবৎ রোহিণীর মৃতদেহ ভূমে লুটাইতেছে! গোবিন্দলাল কোথাও নাই।

একদিন বারুণীর জলে ডুব দিয়া গোবিন্দলাল যে রূপ উদ্ধার করিয়াছিলেন, আর তাহাকে গতপ্রাণ ভাবিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন—'মরি মরি! কেন তোমায় বিধাতা এত রূপ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন, এমন করিয়া তুমি চলিলে কেন?' রূপের পরম পূজারী কবি বঙ্কিমচন্দ্র সেই রূপকে যে ভাবে বিদায় দিলেন, তাহা রসিকসমাজেও বিতণ্ডার কারণ হইয়া রহিয়াছে। সেই 'তীব্র-জ্যোতির্ম্ময়ী, অনন্তপ্রভাশালিনী, প্রভাতশুক্রতারারূপিণী, রূপতরঙ্গিণী চঞ্চলা রোহিণী'র প্রতি কবির শেষ অর্ঘ্য ওই বীভৎস দৃশ্যের শেষ উপমাটির মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। বালকনখরবিচ্ছিন্ন পদ্মিনীবৎ রোহিণীর মৃতদেহ ভূমে লুটাইতেছে। পদ্ম লইয়া বালকের খেলা ফুরাইল, সে তাহাকে নখে ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া গেল। বালক কে? গোবিন্দলাল, না কবি স্বয়ং? রোহিণীর রূপপদ্মে প্রয়োজন ফুরাইল কাহার? অমন অনায়াসনির্ম্মম নখরে কে তাহাকে ছিন্ন করিয়া গেল?

প্রেমের পথ চিরকণ্টকাকীর্ণ। এই প্রেম বলিতে গৃহে গৃহে পল্লীতে পল্লীতে নগরে নগরে যে মানব-মানবী জোড়ে জোড়ে চিরদিন ঘর বাঁধিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, তাহাদের প্রেম বুঝায় না। কবির কাব্যে যে প্রেম যুগযুগান্তর ধরিয়া কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে, তাহারই কথা বুঝিতে হইবে। কাহার ঘরের সত্য খবর কে রাখে? কোন্ স্ত্রীরত্ন কোথা দুষ্কুলাদপি আহরিত হইয়া কোন্ প্রেমিকের অন্ধকার কুটীরে প্রকৃতই দীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছে তাহার পরিচয়ই বা কেমন করিয়া জানিব? আমরা জানি নিজের নিজের কথা, আর কবিরা গদ্যে পদ্যে যাহা কীর্ত্তন করিয়া আসিতেছেন। কবি নিজের চস্‌মা দিয়াই প্রেমের পানে চাহেন, আর তাহাকে যে ভাবে দেখেন তাহাই গান করেন। কবিমাত্রই সুন্দরের ভক্ত, সত্য অসত্য তাঁহার নিকট অবান্তর। যাহা তোমার আমার নিকট অসত্যরূপে প্রতিভাত হয়, কবি তাহাকে কল্পনা বলিলেই গোল মিটিয়া যায়। তিনি যাহা বলেন তাহা 'মিথ্যা নহে সত্য নহে, কেবল তাহা অরূপ অপরূপ।' সুতরাং সাহিত্যে আমরা প্রেমের যে পরিচয় পাই, যাহার পথ চিরকণ্টকিত, তাহা কতখানি বাস্তব, আর কতখানি

কবিজাতির উপনেত্রনির্ণীত সে বিচার নিষ্প্রয়োজন। সুন্দরের ভক্ত বলিয়াই সকল কবির চক্ষে একরূপ সাধারণ অঞ্জন আছে, যে জন্য তাঁহার দৃষ্টি অতি সহজে কালোকুৎসিতকে বর্জ্জন করিয়া কেবল রূপ খুঁজিয়া ফিরে। কি আধুনিক, কি সনাতন উভয় সাহিত্যেই আমরা দেখিব এই রূপের প্রতি কবিচিত্তের একান্ত আনুরক্তি। নরনারীর সহজাত মিলনাকাঙ্ক্ষার মধ্যেই প্রেমের বীজ নিহিত আছে, কিন্তু কবিকীর্ত্তনোপযোগী প্রেম রূপের আবহাওয়া না পাইলে অঙ্কুরিত হয় না। কাজেই আমরা কাব্যে সুরূপসুরূপার প্রেমের কাহিনী পাইয়া আসিতেছি। ইতরজনের ইহাতে ক্ষোভ করিয়া কোন লাভ নাই।

সুতরাং সাহিত্যের প্রেম—একমাত্র যে প্রেমের সহিত আমাদের ব্যাপক পরিচয় আছে—তাহা একান্তই রূপাশ্রিত। প্রেম সম্পর্কে রূপ একমাত্র কথা না বটে, কিন্তু তাহা গোড়ার কথা। সেই গোড়ার কথা দিয়াই 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'রও গোড়া পত্তন। ভ্রমর ছিল কালো, রোহিণী ছিল রূপসী, আর গোবিন্দলাল কার্ত্তিকের তুল্য। রূপের এই ত্রিস্রোতা বাঁকে বাঁকে বাঁকিয়া, আবর্ত্তে আবর্ত্তে পাক খাইয়া ও পঙ্কিল হইয়া যে সাহারার মরুবালুতে আপনাকে হারাইয়া ফেলিল তাহা প্রেমের সাগরসঙ্গম নহে। কবিকীর্ত্তিত প্রেমের পথও উপলসমাকীর্ণ, বহুবিঘ্নসঙ্কুল, এবং তাহার পরিণামও ত্যাগে ও বৈরাগ্যে মৃত্যুসাগরতীর্থে আত্মবিলোপ। কিন্তু নদীর পক্ষে সমুদ্র মৃত্যু হইলেও তাহার মহিমময় পরিণাম, আর মরুভূমি তাহার কলঙ্কিত আত্মহত্যা। 'চন্দ্রশেখরে' প্রেমের নদী সমুদ্রে মিশিয়াছিল, 'উইলে' রূপের নদী সাহারায় আত্মহত্যা করিল। যে রূপ না হইলে কবিজাতি প্রেমের কথা ভাবিতেই পারেন না, উভয়ত্রই সেই রূপ বর্ত্তমান ছিল, তথাপি পরিণাম এমন বিভিন্ন হইল কেন? প্রবীণ বয়সে, পাকা হাতে অমন রূপকের কবি—বালকোচিত ব্যবহারে রূপের পদ্মিনী রোহিণীকে নখরবিচ্ছিন্ন করিয়া ভূমিতে লুটাইয়া দিলেন কেন? বুড়া বয়সে বঙ্কিম কি রূপের প্রতি আস্থা হারাইয়াছিলেন? রূপ ও প্রেমকে কি তিনি পরস্পরনিরপেক্ষ পৃথক্ সত্ত্বা রূপে দেখিতে পাইয়াছিলেন? রোহিণী সমাজ-কলঙ্কিনী বলিয়াই কি অমন বীভৎস হত্যার দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেখাইয়া কবি সমাজবিধির জয়গান করিয়া গিয়াছেন? যে অবস্থার উদ্ভব করিয়া গোবিন্দলালের হাতে রোহিণীকে হত্যা করান হইয়াছে—সে অবস্থায় সমস্ত ব্যাপারটি বেশ স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয় নাই। কারণ প্রসাদপুরে রোহিণীর যে চিত্র আমরা দেখি—তাহাতে সে পাঠকচিত্তের সমস্ত সহানুভূতি হারায়। হরিদ্রা গ্রামে রোহিণী ছিল সুন্দরী বালবিধবা, ব্রহ্মানন্দ ভিন্ন অন্য কোন আকর্ষণের বস্তুও তাহার ছিল না। এ অবস্থায় সহানুভূতি তাহার সহজপ্রাপ্য। তাহার ব্যর্থ রূপ, বঞ্চিত যৌবন, সঙ্গীহীন জীবন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সমস্তই গভীর সহানুভূতির উদ্রেক করে। ঐ রূপ ও বুদ্ধি লইয়া সে যদি গৃহস্থবধূরূপে কাহারও ঘর করিবার সুযোগ পাইত তবে তাহার জীবনের পরিণাম অমন কলঙ্কিত ও নির্ম্মম হইত না, এইরূপ মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ভাগ্যবিড়ম্বিতা হরিদ্রা গ্রামের রোহিণীর সহিত পূর্ণকাম প্রসাদপুরের রোহিণীর আমরা বাহ্যত ও স্পষ্ট প্রভেদ লক্ষ্য করি। আমাদের ব্যথা এইখানেই,—হরিদ্রা গ্রামের রোহিণী কি প্রসাদপুরের রোহিণী হওয়া অনিবার্য্য ছিল? যে রোহিণী বারুণী পুষ্করিণীতে আপনার ব্যর্থ জীবন অনায়াসে শেষ করিয়াছিল—সে গোবিন্দলালের বিলাসকক্ষে কলঙ্কিত প্রাণের জন্য অমন লালায়িত হইল কেন? গোবিন্দলালের

প্রেম ও অনুগ্রহ চিরতরে হারাইয়াছে বুঝিবামাত্র সে কেন অমন করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—'আমার নবীন বয়স, নূতন সুখ, আমি এখনই চলিয়া যাইতেছি, আমায় মারিও না।' হরিদ্রা গ্রামের রোহিণীকে দেখিয়া মনে হইয়াছিল নির্ম্মম বিধাতা ও সমাজ যুক্তি করিয়া দরিদ্রা কিশোরীর অসামান্য রূপ, অতৃপ্ত যৌবন ও নানাসম্ভাবনাময় জীবনকে বলি লইবার ব্যবস্থা করিয়াছে, কবিপ্রতিভা তাহার সামান্য সামান্য ত্রুটি দেখাইলেও তাহার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। কিন্তু প্রসাদপুরে যখন তাহাকে পুনরায় পাইলাম তখন মনে হয় গোবিন্দলাল যেন বেশ্যালয়ে জীবনযাপন করিতেছেন। এই অবস্থা-বিপর্য্যয়ের বীজ কি রোহিণীর চরিত্রে লুকাইয়া ছিল, না ঘটনাপরম্পরায় তাহা অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল, অথবা গোবিন্দলালই হইল হেতু? ঘটনাপরম্পরায় যদি ইহা অনিবার্য্য হইয়া উঠিত, তবে তাহা পাঠকচিত্তে এমন আকস্মিক আঘাত জাগাইতে পারিত না। সুতরাং রোহিণী ও গোবিন্দলালের চরিত্রে ইহার মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে।

এই সব প্রশ্নের খুব সহজ মীমাংসা হইতেছে,—রোহিণী-গোবিন্দলালের প্রেম জন্মে নাই, রূপজ মোহের বশবর্ত্তী হইয়া সমস্ত সামাজিক বিধি ও কর্ত্তব্যপাশ ছিন্ন করিলে এইরূপ পরিণামই হয় এবং হওয়া উচিত। কিন্তু কবির অন্তর রূপকে তো কোন দিন প্রেমের সহিত সম্পর্কশূন্য করিয়া দেখে না। সুতরাং রূপজ মোহ একটা কথার কথা মাত্র। রূপ হইতে যাহা জন্মে তাহা যদি মোহ হইতে বাধ্য হয়, তবে প্রেমও মোহ। সুতরাং রূপজ মোহ বলিলে কোন কথাই বলা হইল না। দেখিতে হইবে এই রূপের মোহ কেন প্রেমে উন্নীত হইল না? প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল-রোহিণী কেন অসামাজিক ভাবেও প্রেমনীড় রচনা না করিয়া অমন কলঙ্কিত আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া তুলিল,—যে আবহাওয়ায় সেই বীভৎস হত্যার দৃশ্যও স্বাভাবিক হইয়া উঠিল।

গোবিন্দলালকে আমরা শিক্ষিত, উন্নতচিত্ত, স্বভাবকোমল, প্রীতিপরায়ণ, সুন্দর, সম্ভ্রান্ত যুবকরূপে প্রথমে দেখিতে পাই। কোন ছিদ্রপথে শনি প্রবেশ করিয়া তাহাকে দুইটি স্ত্রীহত্যার পাতকে কলঙ্কিত করিল ইহা ভাবিয়া দেখিলে আমাদের এই নিষ্ঠুর সত্য স্বীকার করিতে হইবে যে, কালো ভ্রমরের সহিত বিবাহই তাহার কাল হইয়াছিল। গোবিন্দলাল ভ্রমরকে ভালবাসিতে পারে নাই,—ভ্রমর ছিল কালো। ভ্রমর গোবিন্দলালকে প্রাণ ভরিয়াই ভালবাসিয়াছিল; সেখানে তো কোন বাধা ছিল না—গোবিন্দলাল ছিল কার্ত্তিকের তুল্য। কিন্তু কবি নানা ইঙ্গিতে বলিয়াছেন যে, গোবিন্দলাল নিজে না জানিলেও তাহার অন্তর ভ্রমরকে কোন দিন পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। ভ্রমর যদি কালো না হইয়া সুন্দরী হইত তবে গোবিন্দলালের যে শিক্ষা দীক্ষা সম্ভ্রমবোধ ছিল, তাহাতে রোহিণীর সহিত তাহার গৃহত্যাগ করিতে হইত না। রূপ যে প্রেমের কতখানি তাহাই বুঝাইবার জন্য 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ভ্রমর কালো রূপ লইয়া দেখা দিয়াছে। হাস্যময় মাধুর্য্য, সরল নিষ্ঠা, অপূর্ব্ব শ্রী, এমন কি ঐকান্তিক প্রেম, সমস্তই ভাসিয়া গেল—ভ্রমর সুন্দরী নয় বলিয়া। এই নিদারুণ কথা ভ্রমরের অন্তরও জানিত।

ভোমরা বলিল—ক্ষীরি, রোহিণী পোড়ারমুখীর কাছে এখনই একবার যাইতে পারিবি?

ক্ষীরি বলিল—পারব না কেন? কি বলতে হবে?

ভোমরা বলিল—আমার নাম করিয়া বলিয়া আয় যে তিনি বললেন—তুমি মর। বারুণী পুকুরে, সন্ধ্যাবেলায় কলসী গলায় দিয়ে।—বুঝেছিস ?

ক্ষীরি বলিল—আচ্ছা।

গোবিন্দলাল বলিলেন—ছি ভোমরা !

ভোমরা বলিল—ভাবিও না। সে মরিবে না। যে তোমায় দেখিয়া মাজিয়াছে, সে কি মরিতে পারে ?

ভ্রমর জানিত 'রূপ দেখিয়া মজা' কাহাকে বলে, তাই তাহার প্রেম এমন জোরের কথা বলিতে পারিয়াছিল।

আর গোবিন্দলাল বারুণী পুকুর হইতে রোহিণীকে উদ্ধার করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলে ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিল—

আজি এত রাত্রি পর্য্যন্ত বাগানে ছিলে কেন ?

গোবিন্দলাল বলিলেন—আর এক দিন বলিব ভ্রমর। আজ নহে।

ভ্রমর—আজ নহে কেন ?

গোবিন্দলাল—তুমি এখন বালিকা, সে কথা বালিকার শুনিয়া কাজ নাই।

ভ্রমর—কালি কি আমি বুড়া হইব ?

গোবিন্দলাল—কালও বলিব না—দুই বৎসর পরে বলিব। এখন আর জিজ্ঞাসা করিও না ভ্রমর।

ভ্রমরের প্রেমে যে জোর ছিল—গোবিন্দলালের রূপ—গোবিন্দলালের প্রেমে সে জোর ছিল না। তাই লুকোচুরি করিতে হইল। কালো রোহিণীর ওষ্ঠাধরে ফুৎকার দিয়া জীবন সঞ্চার করার পর তাহার প্রেমনিবেদন শুনিয়া সুন্দরী ভোমরার কাছে ফিরিলে গোবিন্দলালকে কোন কথাই চাপিতে হইত না; রহস্যের মধ্য দিয়াই দাম্পত্যমিলন আরও মধুর হইয়া উঠিত। কিন্তু গোবিন্দলালের তখন পূর্ণযৌবন, রূপতৃষ্ণা অত্যন্ত তীব্র। ভ্রমর হইতে সে তৃষ্ণা নিবারিত হয় নাই। নিদাঘের নীল মেঘমালার মত রোহিণীর রূপ ওই চাতকের লোচনপথে উদিত হইল—প্রথম বর্ষার মেঘদর্শনে চঞ্চলা ময়ূরীর মত গোবিন্দলালের মন রোহিণীর রূপ দেখিয়া নাচিয়া উঠিল। গোবিন্দলাল তাহা মনে মনে বুঝিয়া মনে মনে শপথ করিয়া স্থির করিলেন—মরিতে হয় মরিব, কিন্তু তথাপি ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী বা কৃতঘ্ন হইব না।

প্রেম যৌবনের ধর্ম্ম। বুড়োবুড়ির প্রেম হাসির গানে চলিলেও, তাহা কাব্যের উপাদান নহে। যাহা হইতে যৌবনের তৃষ্ণা নিবারিত হয় নাই তাহার প্রতি যে প্রেমও জন্মে নাই ইহা সুস্পষ্ট। মেঘের সহিত চাতকের বা ময়ূরের সম্পর্ক কবিপ্রসিদ্ধি হইলেও তাহা তথাকথিত রূপজ মোহের প্রসিদ্ধিমাত্র নহে। ভ্রমরের প্রতি অবিশ্বাসী বা কৃতঘ্ন না হওয়ার কথা কর্ত্তব্যবোধের কথামাত্র, প্রেমের কথা নহে।

গোবিন্দলাল ভ্রমরের নিকট সমস্তই পাইয়াছিল, কেবল রূপ পায় নাই, তাই সে রূপের পানে ছুটিয়া গেল। রূপের অভাবে তাহার প্রেম প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই, সুতরাং সে রূপের দ্বারে প্রেম

ভিক্ষা করিতে গেল; রোহিণীর হাতে আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিল। "রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্য, রাজার অধিক সম্পদ, অকলঙ্ক চরিত্র, অত্যাজ্য ধর্ম্ম, সুখে অতৃপ্তি—দুঃখে অমৃত ভ্রমর"—সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া সে রোহিণীর শরণ লইল। প্রসাদপুরে যে রোহিণীকে আমরা দেখিয়াছি সে তাহার সম্পূর্ণ অযোগ্য। কিন্তু হরিদ্রাগ্রামের রোহিণীও কি গোবিন্দলালের—কলঙ্কিত হইলেও—এই সর্ব্বস্বত্যাগের যোগ্যা ছিল? এই কথার বিচার করিতে পারিলেই রোহিণীর প্রতি কবি অবিচার করিয়াছেন কি না বুঝা যাইবে।

রোহিণীকে আমরা প্রথম যখন দেখি তখন "তাহার যৌবন পরিপূর্ণ—রূপ উছলিয়া পড়িতেছিল। সে অল্প বয়সে বিধবা। কিন্তু বৈধব্যের অনুপযোগী অনেকগুলি দোষ তাহার ছিল। দোষ, সে কালাপেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পানও বুঝি খাইত।" এমনি সময় একদিন—

"রোহিণী রূপসী ঠন্ ঠন্ করিয়া ডালের হাঁড়িতে কাঠি দিতেছিল, দূরে একটা বিড়াল থাবা পাতিয়া বসিয়াছিল, পশুজাতি রমণীদের বিদ্যুদ্দাম কটাক্ষে শিহরে কি না দেখিবার জন্য তাহার উপর মধ্যে মধ্যে বিষপূর্ণ কটাক্ষ করিতেছিল। এমন সময়ে হরলালবাবু ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। রোহিণী ডালের কাটি ফেলিয়া দিয়া হাত ধুইয়া মাথায় কাপড় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নখে নখ খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিল—বড় কাকা কখন এলেন?

হরলাল বলিল—কাল এসেছি। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

রোহিণী শিহরিল।"

যে বালবিধবার প্রতি সহানুভূতি জাগানোই কবির অভিপ্রেত হইবে তাহাকে এইভাবে উপস্থাপিত করা সঙ্গত হইত না। কাব্যজগতে যে সহানুভূতি তাহার সহজপ্রাপ্য ছিল—কালাপেড়ে ধুতি পরিয়া, বিড়ালের প্রতি বিষপূর্ণ বিদ্যুদ্দাম কটাক্ষের পরখ করিয়া, নখে নখ খুঁটিয়া, ও হরলালের কথায় অকারণ শিহরিয়া সে সহানুভূতি হইতে প্রথমেই সে অনেকাংশে বঞ্চিত হইল। অতৃপ্ত রূপ যৌবনের অন্তরে যে বুভুক্ষু হৃদয় থাকে তাহা চিরদিনই রসিকসমাজের অন্তরকে স্পর্শ করে। তাহার সহিত যদি আদর্শ নিষ্ঠার এমন কি আচারনিষ্ঠারও যোগ হয় তবে তাহা অধিকতর মর্ম্মস্পর্শী হয়। নিষ্ঠাহীনতার বীজ মাথায় ধরিয়া রোহিণীচরিত্র আমাদের চোখের সম্মুখে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। বীজ দেখিয়াই ফল অনুমান করিতে হয়।

তাহার পর হরলাল কবে রোহিণীর মানরক্ষা করিয়াছিল সেই কথা স্মরণ করাইয়া প্রতিদানে একটি কাজ করিতে অনুরোধ করিলেন।

"রোহিণী উত্তর দিল—কি বলুন, আমি প্রাণ দিয়াও আপনার উপকার করিব।

হরলাল—কর না কর, একথা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করিও না।

রোহিণী—প্রাণ থাকিতে নয়।

হরলাল—দিব্য কর।

রোহিণী দিব্য করিল।

কৃষ্ণকান্তের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া রোহিণী দৃঢ়ভাবে তাহার সেই শপথ রক্ষা করিলেও গোবিন্দলাল যখন নিভৃতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তখন সে অনায়াসে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া

দিল। প্রাণ তাহার তখনও ছিল; কিন্তু সে যে গোবিন্দলালকে ভালবাসিয়াছে সেই কথা সবিস্তারে গোবিন্দলালকে না বলিলে তখন তাহার প্রাণ যায়। চিত্তের দৃঢ়তার অভাব তাহার ছিল না। কিন্তু যেখানেই যৌবনবুভুক্ষার প্রশ্ন উঠে সেখানেই সে অনায়াসে নিষ্ঠাহীন হয়।

তাহার দুই দিন পূর্ব্বেই সে হরলালের বিবাহিত পত্নী হইবার ইঙ্গিত পাইবামাত্র আসল উইল বদল করিয়া জাল উইল রাখিয়া আসিবার মত দুষ্কার্য্যে স্বীকৃতা হইয়াছিল। হরলালকে রোহিণী ভালই চিনিত। তথাপি হরলালের বিবাহিত পত্নীরূপে আপনার ব্যর্থ জীবনকে কথঞ্চিৎ সার্থক করিবার আশাতেই সে ঐ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিল। হরলাল যখন বিবাহে অস্বীকৃত হইল; তখন মর্ম্মাহত রোহিণী বারুণী পুষ্করিণীতে জল আনিতে গিয়া কুহুরবের উন্মাদনস্বরে আর গোবিন্দলালের মনোমোহন রূপে মুগ্ধ ও ব্যথিতচিত্তে কলসী জলে ভাসাইয়া দিয়া কাঁদিতে বসিল। এইখানে কবি বিফল যৌবনের মর্ম্মব্যথা একান্ত দরদের সহিত চিত্রিত করিয়াছেন।

'আবার কুহুঃ কুহুঃ কুহুঃ। রোহিণী চাহিয়া দেখিল—সুনীল, নির্ম্মল, অনন্ত গগন—নিঃশব্দ অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুরবাঁধা। দেখিল—নবপ্রস্ফুটিত আম্রমুকুল—কাঞ্চনগৌর, স্তরে স্তরে শ্যামলপত্রে বিমিশ্রিত, শীতল সুগন্ধপরিপূর্ণ; কেবল মধুমক্ষিকা বা ভ্রমরের গুন্‌গুনে শব্দিত, অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুরবাঁধা। দেখিল—সরোবরতীরে গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যান, তাহাতে ফুল ফুটিয়াছে, ঝাঁকে ঝাঁকে, লাখে লাখে, স্তবকে স্তবকে; কেহ শ্বেত, কেহ রক্ত, কেহ পীত, কেহ নীল, কোথাও মৌমাছি, কোথাও ভ্রমর,—সেই কুহুরবের সহিত সুরবাঁধা। বাতাসের সঙ্গে তাহার গন্ধ আসিতেছে—ঐ পঞ্চমে বাঁধা সুরে। আর সেই কুসুমিত কুঞ্জবনের ছায়াতলে দাঁড়াইয়া—গোবিন্দলাল নিজে। তাঁহার অতি নিবিড় কৃষ্ণকুঞ্চিত কেশদাম চক্র ধরিয়া তাঁহার চম্পকরাজিনির্ম্মিত স্কন্ধোপরে পড়িয়াছে, কুসুমিত বৃক্ষাধিক সুন্দর সেই উন্নতদেহের উপর এক কুসুমিত লতার শাখা আসিয়া দুলিতেছে—কি সুর মিলিল! এও সেই কুহুরবের সঙ্গে পঞ্চমে বাঁধা। কোকিল আবার এক অশোকের উপর হইতে ডাকিল কু—উ। রোহিণী কলসী জলে ভাসাইয়া দিয়া কাঁদিতে বসিল।

এইখানে রোহিণীর সকল ত্রুটি বিস্মৃত হইয়া আমাদের তাহার সহিত কাঁদিতে ইচ্ছা করে। কুসুমিত বৃক্ষাধিক সুন্দর গোবিন্দলালের দেহের উপর কুসুমিত লতা দুলিতেছে; আর ততোধিক কুসুমিত দেহবল্লী নিরপরাধে সোপানে বসিয়া কাঁদিতেছে। সুরের ঐক্যতানে বেসুরা বাজিল। তাই রোহিণী কাঁদিতেছে দেখিয়া গোবিন্দলালের হৃদয়ও কাঁদিল। তিনি প্রকৃতির স্পষ্টাক্ষর পড়িলেন। দেখিলেন সব সুন্দর—কেবল নির্দ্দয়তা অসুন্দর। সৃষ্টি করুণাময়ী, মনুষ্য অকরুণ। রোহিণীকে বলিলেন—তোমার যদি কোন বিষয়ে কষ্ট থাকে, তবে আজি হউক, কালি হউক আমাকে জানাইও। রোহিণী প্রথমে চুপ করিয়া ছিল, এইবার কথা কহিল। বলিল—একদিন বলিব, আজ নহে একদিন তোমাকে আমার কথা শুনিতে হইবে।

গোবিন্দলাল স্বীকৃত হইয়া গৃহাভিমুখে গেলেন। অনন্ত সৌন্দর্য্যশালিনী প্রকৃতির অন্তঃপুরে যে ব্যথিত ও ব্যর্থ রমণীহৃদয় বিবশা হইয়া কাঁদিতেছিল, সে গোবিন্দলালের করুণার স্পর্শ পাইবামাত্র বাস্তবজীবনে ফিরিয়া আসিল। রোহিণী মুহূর্ত্তে তাহার বিহ্বলতা সারিয়া লইয়া আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিল। গোবিন্দলালের নিকট তাহার কি 'কথা', তাহা কোন দিন বলা

যাইবে কি না, সে সব বিষয় তখনও সে কিছুই স্থির করিতে পারে নাই। কিন্তু বুভুক্ষু হৃদয়ের ক্ষুন্নিবারণের কোন সুযোগ সে আর ত্যাগ করিতে চাহে না। যে হরলালকে সে বলিয়াছিল, কর্ত্তার সমস্ত বিষয় দিলেও ও কাজ করিতে পারিব না—করিবার হইত ত আপনার কথাতেই করিতাম—সেই হরলালের নিকট হইতে বিধবাবিবাহের ইঙ্গিত পাইবামাত্র সে বলিয়াছিল—কাগজখানা না হয় রাখিয়া যান, দেখি কি করিতে পারি।

হরলাল কর্তৃক তাহার আশাভঙ্গের পরদিন সে বসন্তপিকের কুহুস্বর ও গোবিন্দলালের রূপ এক সুরে বাঁধা দেখিয়া বিহ্বল হইয়া কাঁদিতে বসিল। সে যদি সেই বিহ্বলতার স্রোতে আপনাকে নিরুপায়ভাবে ভাসাইয়া দিত, তবে আমাদের নব জাগ্রত সহানুভূতি ও সমস্ত বাধাবন্ধন ভুলিয়া তাহার সহিত ভাসিয়া চলিত। কিন্তু গোবিন্দলালের কথায় অনুকম্পার সুর শুনিবামাত্র সে আপনার হাতে হাল ধরিল। একান্ত চাতুর্য্যের সহিত তাহাকে অনির্দ্দিষ্টভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করিয়া রাখিল—একদিন গোবিন্দলালকে তাহার কথা শুনিতে হইবে। আমরা বুঝিলাম বাহির হইতে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও অন্তর হইতে ব্যর্থতার বেদনা তাহাকে যতই ব্যথিত ও বিহ্বল করুক, যৌবনবুভুক্ষা মিটাইবার সুযোগ হেলায় হারাইবার মেয়ে সে নয়। কি উইলচুরি কি হৃদয়চুরি উভয় ক্ষেত্রেই তাহার বুদ্ধি সমান খেলে। "সেই অবধি নিত্য কলসীকক্ষে রোহিণী বারুণী পুষ্করিণীতে জল আনিতে যায়, নিত্য কোকিল ডাকে, নিত্য সেই গোবিন্দলালকে পুষ্পকাননমধ্যে দেখিতে পায়।"

তাহার পর উইল বদলের ব্যাপার। "হরলালের লোভে রোহিণী গোবিন্দলালের যে গুরুতর অনিষ্ট সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তৎপ্রতিকারার্থ—বিশেষ ব্যাকুলা হইয়াও সে খুল্লতাতের রক্ষানুরোধে কিছুই করিতে পারিল না।" কিন্তু রোহিণী পূর্ব্বেই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল—'জাল উইল চালান হইবে না।' হরলালের প্রতি পূর্ব্বকার 'লোভ' তখন দারুণ ঘৃণা ও প্রতিশোধস্পৃহায় পরিণত হইয়াছে। হরলালের 'লোভেই' তাহার নিরুদ্ধ যৌবন প্রথম সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সে সংক্ষোভ হরলালে প্রতিহত হইবামাত্র আপনার নূতন পথ খুঁজিতেছিল। তাই এই প্রশ্ন—"এই রোহিণী গোবিন্দলালকে বালককাল হইতে দেখিতেছে—কখনও তাহার প্রতি রোহিণীর চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই। আজি হঠাৎ এমন ভাবে আকৃষ্ট হইল কেন?" কবি বলিয়াছেন, এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর তিনি জানেন না। এ প্রশ্নের উত্তর কঠিন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সকল কারণের মূলে আছে, হরলালের ইতর ইঙ্গিতে রোহিণী তখন আপনার ক্ষুধার রুদ্র পরিচয় লাভ করিয়াছে, হরলালদ্বারা প্রত্যাখাত হইবার পরদিনই গোবিন্দলালের সহিত সাক্ষাৎ। এখন গোবিন্দলালকেই তাহার চাই। নচেৎ প্রাণ যায়। তাহার উপর গোবিন্দলালকে পাইলে চায় না কে? সুতরাং রোহিণী সিদ্ধান্ত করিল গোবিন্দলালের গুরুতর অনিষ্টসাধক জাল উইল বদল করিয়া গোপনে আসল উইল রাখিয়া আসিবে। গোবিন্দলালের প্রতি প্রকৃত প্রেমপরায়ণা হইলেও অবশ্য এই পথই তাহার পথ।

জাল উইল বদল করিতে গিয়া রোহিণী ধরা পড়িল। কৃষ্ণকান্ত রায়ের প্রকাশ্য দরবারে, নায়েব গোমস্তা কারকুন মুহুরী তহশীলদার, আমিন পাইক প্রজার "সম্মুখে অধোবদনা অবগুণ্ঠনবতী রোহিণী।" এমন সময় গোবিন্দলাল প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন,—

কি হয়েছে জ্যেঠামশায় !

তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া, রোহিণী অবগুণ্ঠন ঈষৎ মুক্ত করিয়া তাঁহার প্রতি ক্ষণিক কটাক্ষ করিল। কৃষ্ণকান্ত তাহার কথার কি উত্তর করিলেন, তৎপ্রতি গোবিন্দলাল বিশেষ মনোযোগ করিতে পারিলেন না। ভাবিলেন সেই কটাক্ষের অর্থ কি ? শেষ সিদ্ধান্ত করিলেন "এ কাতর কটাক্ষের অর্থ—ভিক্ষা।"

রোহিণী গোবিন্দলালকে ভালবাসিয়াছে, কিন্তু গোবিন্দলাল তখনও রোহিণীর প্রতি আসক্ত নহেন। সুতরাং রোহিণীর 'ক্ষণিক কটাক্ষ' লইয়া তিনি গোলে পড়িলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন যে "কটাক্ষের অর্থ—ভিক্ষা। আর্ত্তের ভিক্ষা আর কি ? বিপদ হইতে উদ্ধার।" কিন্তু রোহিণীর আর্ত্তি যে আদিরসসঞ্জাত তাহা গোবিন্দলাল তাহাকে অন্তঃপুরে আনিবার পর জানিতে পারিলেন। রোহিণীর নিকট বারুণীতীরে গোবিন্দলাল যে বাক্য দান করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করাইয়া প্রতিপালনহিসাবে—রোহিণী চাহিল—"একবার আমায় ছাড়িয়া দিন, কাঁদিয়া আসি। তাহার পর যদি আমি বাঁচিয়া থাকি, তবে না হয়, আমার মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া, দেশ ছাড়া করিয়া দিবেন। আমি বিষ পাইলে খাইতাম, কিন্তু সে আপনার বাড়ীতে নহে।"

"গোবিন্দলাল বুঝিলেন। দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় রোহিণীর হৃদয় দেখিতে পাইলেন। বুঝিলেন—যে মন্ত্রে ভ্রমর মুগ্ধ, এ ভুজঙ্গীও সে মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছে।"

যে কথা প্রাণ থাকিতে কাহাকেও বলিবে না, বলিয়া হরলালের কাছে দিব্য করিয়াছিল—সেই কথা গোবিন্দলালকে বলিয়া, এবং গোবিন্দলাল বারুণীতীরে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা আশাতীতরূপে প্রতিপালন করাইয়া 'কলঙ্কে বন্ধনে রোহিণীর প্রথম প্রণয় সম্ভাষণ শেষ হইল। রোহিণী সজল নয়নে গোবিন্দলালকে দেখিতে দেখিতে ভ্রমরের অনুসন্ধানে গেল।'

গোবিন্দলালের কাছে রোহিণী কথা দিয়া আসিয়াছে—মুক্তি পাইলে সে কলিকাতা চলিয়া যাইবে। গোবিন্দলাল জ্যেষ্ঠতাতের নিকট হইতে তাহার মুক্তি আদায় করিয়া আনিল ; কিন্তু রোহিণী কহিতে লাগিল—

"এ হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িয়া তাহার যাওয়া হইবে না। না দেখিলে সে মরিয়া যাইবে। তাহার স্ফীত হৃত অপরিমিত প্রেমপরিপূর্ণ হৃদয় থামিল না। কখনও ভাবিল—গরল খাই ; কখনও ভাবিল গোবিন্দলালের পদপ্রান্তে পড়িয়া অন্তঃকরণ মুক্ত করিয়া সকল কথা বলি ; কখনও ভাবিল পলাইয়া যাই। কখনও ভাবিল বারুণীতে ডুবিয়া মরি। কখনও ভাবিল ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া গোবিন্দলালকে কাড়িয়া লইয়া দেশান্তরে পলাইয়া যাই।" কিন্তু শুধুই ভাবিবার মেয়ে সে নয় ; কাঁদিতে কাঁদিতে গোবিন্দলালকে জানাইয়া আসিল যে, সে কলিকাতায় যাইতে পারিবে না।

আত্মহত্যা করি, কি গোবিন্দলালকে কাড়িয়া লইয়া দেশান্তরে পলাইয়া যাই, এই উভয় সমস্যার মধ্যে তাহার চিত্ত যখন দোলায়মান, তখন ভ্রমরের নিকট হইতে উপদেশ আসিল—বারুণীতে ডুবিয়া মর। গোবিন্দলালের দয়া, সহানুভূতি সে পাইয়াছে, কিন্তু আসক্তির কোন লক্ষণ সে দেখে নাই। তখন সে এই ব্যর্থ জীবন শেষ করিয়া দেওয়ার সঙ্কল্প করিল, ভ্রমরের উপদেশের মধ্যে গোবিন্দলালের ইঙ্গিতও জড়িত ছিল কি না তাহা রোহিণী জানে না ; কারণ গোবিন্দলালও তাহাকে

পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন—'রোহিণী, মৃত্যুই তোমার বোধ হয় ভাল।' সুতরাং আর দ্বিধা না করিয়া সে বারুণীতে ডুবিতে গেল। গোবিন্দলাল ঠিকই বলিয়াছিলেন তাহার মরাই ভাল ছিল। সে দিন মরিলে সে তাহাদের পূর্ণ সহানুভূতির পাত্রী হইয়া মরিতে পারিত। সে যখন বারুণীর 'অন্ধকার জলতল আলো করিয়া' শুইয়া ছিল তখনই তাহার রূপের চরম সার্থকতা। যে নিষ্ঠার অভাবে তাহার রূপ রূপই রহিয়া গেল, সে নিষ্ঠার আর যাচাই হইতে পারিত না। কিন্তু গোবিন্দলাল তাহা উঠাইলেন, নিজে ডুবিতে ও তাহাকে গভীরতর পাথারে ডুবাইতে। গোবিন্দলাল যখন "সেই ফুল্লরক্ত কুসুমকান্তি অধরযুগলে ফুল্লরক্ত কুসুমকান্তি অধরযুগল স্থাপিত করিয়া রোহিণীর মুখে ফুৎকার দিলেন" তখনই রোহিণীর প্রেমের পুণ্য মুহূর্ত্ত আসিল ও চলিয়া গেল। 'গোবিন্দলালের হস্তপ্রদত্ত মৃত-সঞ্জীবনীসুরা পান করিয়া রোহিণী বাঁচিল।' কিন্তু সেই সমস্ত হইতে তাহার প্রেম মরিল। সে যে কাহারও প্রেমের যোগ্যা, সে প্রমাণ আমরা আর সমস্ত পুস্তকের মধ্যে কোথাও প্রাপ্ত হই না। বাঁচিবার পর রোহিণী গোবিন্দলালকে বলিয়াছিল—"চিরকাল ধরিয়া দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে রাত্রি দিন মরার অপেক্ষা একেবারে মরা ভাল। রাত্রিকালে দারুণ তৃষ্ণায় হৃদয় পুড়িতেছে, সম্মুখে শীতল জল, কিন্তু ইহজন্মে সে জল স্পর্শ করিতে পারিব না। আশাও নাই।" আশা থাকিলে সে মরিত না।

রোহিণীর যখন দেশ ছাড়াও হইল না, মরণেও বাধা ঘটিল, তখন গোবিন্দলালই দেশত্যাগ করিয়া আপনার পত্নীনিষ্ঠার পরীক্ষা করিতে ব্রতী হইলেন। স্থির করিলেন মরিতে হয় মরিব, কিন্তু ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী হইব না।

রোহিণী হরিদ্রা গ্রামে রহিয়া গেল। গোবিন্দলালকে দেখিতে পাইবে না বলিয়া সে কলিকাতায় যাইতে চাহে নাই; এখন দেখিতে পায় না। গ্রামে বসিয়া চোর অপবাদ সহ্য করা সে প্রথমে অসম্ভব মনে করিয়াছিল, তাহাও এখন সহিয়া গিয়াছে। গোবিন্দলাল তাহাকে বাঁচাইলে সে বলিয়াছিল—'এবার না হয় তোমার চক্ষে পড়িয়াছিলাম বলিয়া তুমি রক্ষা করিয়াছ; ফিরেবার যাহাতে তোমার চক্ষে না পড়ি, সে যত্ন করিব।' কিন্তু সে যত্ন সে আর করিল না। গোবিন্দলালের গৃহত্যাগে তাহার বুঝি আশা জাগিয়াছিল। গোবিন্দলাল সম্পর্কে তাহার দুরপনেয় কলঙ্ক রটিয়া গিয়াছে, তাহার প্রতিক্রিয়ায় সে স্থির করিল ভ্রমরকে একবার হাড়ে হাড়ে জ্বালাইয়া যাইব। সে কতকগুলি গিল্টির গহনা সংগ্রহ করিয়া ভ্রমরকে দেখাইয়া আসিল যে গোবিন্দলাল তাহাকে এই সমস্ত দিয়াছেন। কলঙ্কে তাহার কোন ভয় নাই। গোবিন্দলালকে কাড়িয়া লইয়া দেশান্তরে পলাইয়া যাওয়ার কল্পনাও সে বারুণীতে ডুবিয়া মরার পূর্ব্বে করিয়াছিল।

এতক্ষণ যাহার পরিচয় গ্রহণ করিতেছি সে হরিদ্রা গ্রামেরই রোহিণী। সেই পরিচয়ের মধ্যেই দেখিতেছি—"রোহিণী না পারে, এমন কাজ নাই।" 'এমন কাজ নাই' ইহার অর্থ শুধু দুঃসাহসিক কাজ নয়, হীন কাজও বটে। গিল্টির গহনা দেখাইয়া আসার সম্পর্কে কবি তাহার এই পরিচয় দিয়াছেন। ইহার সহিত মিলাইয়া দেখিতে হইবে—হরলালের প্রতি লোভ, উইল চুরি, উইল বদল, হরলালের নিকট দিব্য করা, আবার তাহা না রাখা; গোবিন্দলালের প্রতি আসক্তি ও প্রগল্ভার ন্যায় আত্মনিবেদন, ভ্রমরের নিকট হইতে তাহাকে কাড়িয়া লইয়া পলায়নের কল্পনা, নৈরাশ্যে আত্মহত্যা করা ও আশার সঞ্চারে ভ্রমরের প্রতি নির্য্যাতন চেষ্টা। মাত্র রূপসী রমণীর বালবৈধব্যে এত ত্রুটির

ক্ষালন হয় না। সকল অপবিত্রতা ধুইয়া ফেলিয়া আমাদের সহজ সহানুভূতিকে আকর্ষণ করিতে পারে একমাত্র প্রেম। রোহিণী সেই সুযোগ পাইয়াছিল—সে তাহার কিরূপ সদ্ব্যবহার করে ইহারই উপর তাহার পরিণাম নির্ভর করিবে।

গোবিন্দলাল রোহিণীকে লইয়া আত্মগোপন করিল। রোহিণীর রূপে আকৃষ্ট হইয়া সে তাহার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিল। রোহিণীর তখন ত্যাগ করিবার মত এমন কিছু ছিল না যাহাতে তাহার প্রতি কোন সহানুভূতি আসিতে পারে। রোহিণী যাহা আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে তাহার প্রায় সমস্তই পাইয়াছিল। গোবিন্দলালকে পাওয়া বড় ভাগ্যের কথা। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সেই গোবিন্দলাল আপনাকে তাহার হাতে সমর্পণ করিয়া অজ্ঞাতবাস গ্রহণ করিল।

রোহিণীর অসীম রূপ ছিল, সুতরাং প্রেমের চাবিকাটি তাহার হাতে। গোবিন্দলাল রূপ চাহিয়াছিল, অর্থাৎ রূপবতী প্রেয়সী চাহিয়াছিল। তাহার পূর্ব্বপ্রেমে যে অভাব ছিল রোহিণীর কাছে তাহার পূরণ হইবে এই ভাবিয়াই সে পতঙ্গের মত ঝাঁপ দিল। কিন্তু রূপ হইতে প্রেমে উত্তীর্ণ হইতে হইলে নিষ্ঠার সেতু পার হইতে হয়। প্রেম অর্থ রূপনিষ্ঠা। রূপ তাহার ভিত্তি, কিন্তু নিষ্ঠা তাহার গঠন। রোহিণীর চরিত্রে পূর্ব্বাপর সেই নিষ্ঠার অভাব দেখিয়া আসিতেছি তাই গোবিন্দলালের আসক্তি 'রূপজ মোহে' আসিয়া থামিয়া গেল। রোহিণী তাহার অনুগৃহীতা হইয়াই রহিল। সমাজে রক্ষিতার কোন স্থান না থাকিতে পারে, কিন্তু সাহিত্যে ও দরদী হৃদয়ে তাহার আসন নিম্নস্তরে নহে। বরং প্রেমের প্রকৃত পরখ করিতে সাহিত্য চিরদিন অসামাজিক প্রেমকেই উচ্চ স্থান দিয়া আসিয়াছে। রোহিণীর স্থান সমাজে ছিল না, কিন্তু সাহিত্যলোকেও তাহাকে অপাংক্তেয় করিবার জন্য শেষে হত্যারূপ অমন বীভৎস দৃশ্যের অবতারণা করিতে হইল। তাহার কারণ রোহিণী রূপবতী হইয়াও নিরতিশয় নিষ্ঠাহীনা। গোবিন্দলালের অন্তরে ভ্রমরের স্মৃতি বাধা স্বরূপ বর্ত্তমান ছিল ইহা নিশ্চয়, কিন্তু রোহিণীই সে বাধা অনেকাংশে অপসারিত করিতে পারিত—যদি তাহার গোবিন্দলালের প্রতি নিষ্ঠা থাকিত। রোহিণীর দিক হইতে গোবিন্দলালে অনন্যচিত্ত হইবার কোন বাধা ছিল না। কিন্তু অনন্যচিত্ততা তাহার স্বভাবের ধর্ম্ম নহে। ভ্রমরের ছিল নিষ্ঠা, ছিল না রূপ। রোহিণীর আছে রূপ, নাই নিষ্ঠা। গোবিন্দলাল ভ্রমরকে ভালবাসিয়া নিষ্ঠার পরিবর্ত্তে নিষ্ঠাই দিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন। আর রোহিণীকে ভালবাসিয়া রূপের বদলে রূপের অতিরিক্ত কিছুই দিতে পারিলেন না। কোন ক্ষেত্রেই সেই প্রেমের উদ্ভব হইল না, যাহার বেদী রূপে, গঠন নিষ্ঠায়; রূপনিষ্ঠার সমন্বয়ে যাহা ধর্ম্ম ও সমাজকে গ্রাহ্য করিয়া অথবা তুচ্ছ করিয়া, ভোগে হউক ত্যাগে হউক আপনাকে মহীয়ান করিয়া তুলে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' কবি বলিতে চাহেন যে, প্রকৃত প্রেমের প্রসার ও পরিণতি দেখিতে হইলে ভ্রমরেও হয় না রোহিণীতেও হয় না। রূপ ও নিষ্ঠা উভয়ের সংযোগ হইলে প্রেমের পূর্ণ প্রকাশ দেখিতে পাইব।

প্রসাদপুরের রোহিণীর বীজ হরিদ্রাপুরের রোহিণীর মধ্যেই ছিল, ইহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। কিন্তু প্রসাদপুরের রোহিণীরও একটু বিশদ পরিচয় আবশ্যক।

নিশাকরকে দেখিয়াই রোহিণী ভাবিল—দেখিতে সুপুরুষ;—গোবিন্দলালের চেয়ে? না তা নয়। কিন্তু মুখ চোখ। আ মরি! কি মুখ!

হরলালে রোহিণী 'লোভ' করিয়াছিল। নিশাকরে তাহার 'লোভ' হইল। মধ্যে গোবিন্দলালের উপরও যে তাহার 'লোভ' হইয়াছিল, ইহাই স্বাভাবিক। রূপ লোভেরই বস্তু, এ লোভে দোষ কিছু নাই। কিন্তু লোভ হইতে যদি নিষ্ঠা না জাগে, তবেই তাহা স্বৈরাচার। রোহিণী জন্মাবধি স্বৈরাচারিণী ছিল ইহাই বুঝিতে হইবে। বৈধব্য না ঘটিলেও সে যে কি করিত তাহার স্থিরতা নাই।

তাহার পর গোবিন্দলালের গৃহিণীরূপে বাস করিবার সময় তাহার সাধারণ আচার ব্যবহারের পরিচয় আমরা ভৃত্য সোনার মুখে কিছু পাই। নিশাকরের কাছে সোনা বলিতেছে—'মুনিব মন্দ নয়, কিন্তু মুনিব ঠাকরুণ বড় হারামজাদা।' নিশাকরের প্রস্তাবে রাজি হইয়া সোনা বলিল, 'আমি এখনই যাইতেছি, ও পাপ ম'লেই বাঁচি।' রোহিণীর প্রতি তাহার ভৃত্যের এমনই শ্রদ্ধা!

ভৃত্য রূপো কাছে আসিলে রোহিণী তাহাকে কানে কানে বলিল "যা বলি, তা পারিবি? বাবুকে সকল কথা লুকাইতে হইবে। যাহা করিবি তাহা যদি বাবু কিছু না জানিতে পারেন তবে তোকে পাঁচ টাকা বখশিস দিব।" রূপো স্বীকৃত হইলে রোহিণী তাহার মারফৎ নিশাকরের সহিত গোপন মিলনের ব্যবস্থা করিল। বলিল "বাবুটি যদি বসিতে না চায়, তবে কাকুতি মিনতি করিস।" এমন ইতর প্রবৃত্তি তাহার বৈধব্যব্যথাসঞ্জাত নহে; এই হীন শিক্ষা সে ব্রহ্মানন্দের কাছে পায় নাই, গোবিন্দলালের সাহচর্য্যেও তাহা অর্জ্জিত নহে। ইহার মূল তাহার রক্তে ছিল। তাই আমরা দেখিয়াছি,—হরলালকে দেখিয়াই সে 'নখে নখ খুঁটিতে খুঁটিতে' দাঁড়াইয়া তাহার সম্বোধনে 'শিহরিয়া' উঠিয়াছিল! কৃষ্ণকান্ত রায়ের প্রকাশ্য দরবারে অমন দুর্দ্দিনেও ঘোমটার মধ্য হইতে গোবিন্দলালের প্রতি ক্ষণিক কটাক্ষ ক্ষেপণ করিয়াছিল, ভ্রমরকে গিল্টির গহনা দেখাইয়া আসিয়াছিল।

এমন কামিনীকে সমাজ যদি বা সহ্য, এমন কি ক্ষমা করিয়াও চলে, কিন্তু কবি ও রসিক সম্প্রদায় প্রেমই যাহাদের উপজীব্য, তাহারা কোন দিন ক্ষমা করিতে পারে না। তাই গোবিন্দলালের গুলিতে রোহিণীকে মরিতে হইল। কারণ যে রূপ বলিতে কবিরা পাগল হইয়া উঠে, যাহাকে কবি-হৃদয় প্রেমের বেদী বলিয়া তৃপ্তি পায়, রোহিণীর অঙ্গে সে রূপের অবমাননা ঘটিল। পদ্ম চয়ন করিয়া যদি তাহাতে বিষ্ঠাগন্ধ পাই তবে তৎক্ষণাৎ সে ফুল পদদলিত করিলে কোন অরসিক অপবাদ দেয় না।

আর ভ্রমর অপরাজিতা ধীরে ধীরে শুকাইয়া উঠিল। রূপ তাহার ছিল না, ছিল নিষ্ঠা। নানা ঘাতপ্রতিঘাতে, অপমানে, অত্যাচারে, অবিচারে, বেদনায় সে তাহার নিষ্ঠায় অবিচলিত ছিল। ক্ষোভে অভিমানে মাঝে মাঝে ভুল করিয়াছিল; কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যও সে তাহার নিষ্ঠা হারায় নাই। প্রেম সে পায় নাই, জীবিত থাকিলেও পাইত না, কারণ রূপের অভাবে সে পূর্ণপ্রেমের অধিকারিণী নহে। কবিদের রসশাস্ত্রে বুঝি এইরূপই লেখা আছে। ভ্রমরের মৃত্যুর বার বৎসর পরে গোবিন্দলাল বলিতেছেন "ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা মধুর, ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা পবিত্র আমি তাহা পাইয়াছি। আমি শান্তি পাইয়াছি।" তথাপি ভ্রমরের অনির্ব্বাণ নিষ্ঠার প্রদীপ তাহাকে প্রগাঢ় অন্ধকারের মধ্যেও পথ দেখাইয়া দিয়াছিল। তাই তাহার শেষ দিনে তাহার অত বড় স্পর্দ্ধার কথা রক্ষা করিতে গোবিন্দলালকেই আসিতে হইল। সে বলিয়াছিল "তুমি আবার আসিবে। আবার ভ্রমর বলিয়া

ডাকিবে। যদি একথা নিষ্ফল হয়, তবে দেবতা মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, ভ্রমর অসতী।” কবির অন্তর, কাব্যের পাতা ও পাঠকের চক্ষু তাহার জন্য সমান অশ্রুসিক্ত হইয়া রহিল।

কৃষ্ণকান্তের উইলে কবি দেখাইতে চাহিয়াছেন রূপ ও নিষ্ঠা লইয়া নরনারীর প্রেম। তাই ভ্রমরকে রূপহীন নিষ্ঠার ও রোহিণীকে নিষ্ঠাহীন রূপের প্রতীক করিয়া গড়িতে হইল। রূপহীন নিষ্ঠা ঘরে ঘরে, কবিরা তাহাকে প্রেম বলিতে চাহেন না। আর নিষ্ঠাহীন রূপ বাজারে সুলভ, কিন্তু তাহার সাহায্য লইয়া যে উপন্যাস রচিত হইতে পারিত, বঙ্কিমচন্দ্র সে উপন্যাস লিখেন নাই। সেই জন্যই আমাদের সহানুভূতি ও গল্পের আকর্ষণ বজায় রাখিয়া এমন রূপসী বালবিধবাকে নিষ্ঠাহীন রূপের প্রতীক করিতে হইল। মনুষ্যহৃদয়ের পরম রহস্য ও গভীর ট্রাজেডি রূপ পাইল—গোবিন্দলালের প্রেমতৃষ্ণায়। ভ্রমরে প্রেমের মূল আছে, ফুল নাই। গোবিন্দলাল ছুটিয়া গেল রোহিণীর কাছে। সেখানে গিয়া দেখিল ফুল আছে—কিন্তু মূলের অভাবে তাহা আকাশকুসুম। মানবহৃদয় সেই অপ্রাপ্য নন্দনতরুর সন্ধানে চিরদিন ছুটিয়াছে—যাহা মূল হইতে সঞ্জীবনরস সংগ্রহ করিয়া অম্লান ফলে ফুলে চিরশোভিত হইয়া থাকিবে—যে তরুর নাম সে রাখিয়াছে—প্রেম। রোহিণীর রূপ ও ভ্রমরের নিষ্ঠা একত্র দেখিবার স্বপ্ন বুঝি তাহার সফল হইবার নহে, তাই গোবিন্দলাল মরীচিকার পিছু পিছু ছুটিয়া নৈরাশ্যের ও বৈরাগ্যের অনন্ত বালুরাশির মধ্যে আপনাকে হারাইয়া বলিতেছে—“এইবার আমি সেই বস্তু পাইয়াছি যাহা প্রেম অপেক্ষা মহৎ, আমি শান্তি পাইয়াছি।”

হয়ত ইহা সত্য, হয়ত ইহা আত্মবঞ্চনামাত্র; কিন্তু কাব্যজগতে উভয়ই সমান ট্র্যাজেডি। ‘কৃষ্ণকান্তের উইলে’ সেই ট্র্যাজেডি রূপ পাইয়াছে।



প্রাথমিক ও আনুষঙ্গিক ইতিহাস

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

যুগপৎ বিবাহিত ও অবিবাহিত মেয়ের প্রেমে পড়িয়া নৈতিক অবনতির অজুহাতে সমীর রায়ের চাকরি গেল। ঘটনাটির প্রাথমিক ইতিহাস এইরূপ। সমীরের কয়েকটি কবিতা এককালীন দ্বাদশবর্ষীয়া কুমারী ও ষোড়শী নববধূর নিকট পাওয়া যায়। কবিতায় 'কিশোরী', 'প্রিয়া' ইত্যাদি ছিল এবং চুম্বনের দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছাও প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রাপ্তিকালে দ্বাদশী কাঁদিয়া ফেলে এবং ষোড়শী ব্লাউসের অন্তরালে বুকের মধ্যে লুকায়। বলা বাহুল্য প্রাথমিক ইতিহাস সমীর রায়ের অনুকূল হয় নাই।

কবিতা লিখিয়া এত অল্পে চাকরি মফঃস্বলেও যায় না, যদি না এসিষ্টাণ্ট হেডমাষ্টার হরিহর মিশ্রের মনস্তত্ত্ব পিছনে থাকিত। দুই বৎসর যাবৎ হরিহর দেবদেবীর সহস্র নাম ওষ্ঠাগ্রে ও গীতা পকেটে রাখিয়া দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া আছেন। সমীর যেদিন তাঁহার উপস্থিতি সত্ত্বেও নদীবক্ষে ছাত্রদের সমীপে শ্যামাসঙ্গীত না গাহিয়া স্বরচিত—

"এত চাই
তাই ভুলে যাই
মনে রাখো কি রাখো না"—

গানটি করে, হরিহর ভাবেন অবিবাহিত যুবকের এরূপ গান পিনালকোডের আমলে আসিতে কি বাধা ছিল? বাড়ীতে অবিরাম পূজার্চ্চনা ও শাসন থাকিতে তাঁহার নয় বৎসরের মেয়ে পার্ব্বতী 'সবার রঙে' গানটির 'প্রিয়' কথাটিতে এত আবেগ ঢালে কেন বুঝিতে না পারায় তিনি শঙ্কিত। সম্প্রতি স্ত্রীর কাছে শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' আখ্যায়িকার মর্ম্মার্থ অবগত হইয়া পার্ব্বতী নামটায় এক অনির্দ্দেশ্য সন্দেহ ঘনীভূত হইতেছে। ইহার পর যদি সমীর রায়ের কবিতা দুহিতার হস্তে পড়ে, পরিণাম কি হইবে ভাবিতেই তিনি শিহরিয়া উঠেন।

কিন্তু আর এক কারণে ব্যাপারটা দস্তুরমত সাইকলজিকাল হইয়া পড়ে। সমীর কাব্যোৎকর্ষের জন্য সাইকলজি পড়িয়া আবিষ্কার করে যে বালকেরা পাঠে অধিকক্ষণ অখণ্ড মনোযোগ দিতে পারে না। সেহেতু পঁয়তাল্লিশ মিনিট পিরিয়ডের প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর সে ছেলেদের দুই মিনিট ফিস্‌ফিস্ করিয়া কথা কহিতে দিত। ফিস্‌ফিস্‌টা ছাত্রেরা সোৎসাহে একদিন মক্স করায় ধ্বনিবিজ্ঞান অনুযায়ী তাহা হরিহর মিশ্রের কানে পৌঁছায়। তিনি সমীরকে প্রশ্ন করিলে সে সাইকলজির বই লাইব্রেরী হইতে লইয়া আসে। হরিহর ইংরাজ জাতিকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন এবং সাইকলজি পড়েন নাই, সুতরাং রাগটা সেবার কোন মতে চাপিয়া যান।

সমীরের চাকরি হরিহরের ধ্বংসমূলক প্রচেষ্টা হইতে এতাবৎকাল রক্ষা পাইয়াছিল হেডমাষ্টার সঞ্জীব চক্রবর্ত্তীর সুবিবেচনা ও সহৃদয়তায়। সাইকলজিকাল পরীক্ষায় তিনি ভীত হইবার পাত্র নহেন,

কারণ তিনি ফ্রয়েড পড়িয়াছিলেন। ছাত্রদের মাঝে মাঝে কথা কহিবার অবরুদ্ধ বাসনার মুক্তিদান আবশ্যক, বালকদের মেঘাচ্ছন্ন মুখ দেখিয়া তিনিও ইহা বহুবার ক্লাসে অনুভব করিয়াছেন। পূজার সময় একটি অভিনয় স্কুলে তিনি করিতে দিতেন হরিহরের প্রচণ্ড বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও। ছাত্রপ্রমুখাৎ কাননবালা ও গ্রেটা গার্বোর রূপলাবণ্যের আলোচনা শুনিয়া বুঝিয়াছিলেন এ যুগে সিনেমা ও রেডিয়ো হইতে স্কুল বাঁচাইতে হইলে অভিনয় ও কো-এডুকেশনের প্রয়োজন আছে। কো-এডুকেশনটা অবরুদ্ধ বাসনার মধ্যে পোষণ করিয়া অভিনয়ের সর্ব্ববিধ ভার সমীরের উপর বরাবর ন্যস্ত রাখিতেন। সমীরের আকর্ষণ তাঁহার কাছে গুরুতম ছিল সে অভিনেতা বলিয়া। যৌবনে সঞ্জীব পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে এক প্লেতে একটি লাইন "হরি বল গন্ধর্ব্ব মণ্ডল" বলিবার জন্য ছাতা ও লণ্ঠন সমেত এক মাইল হাঁটিয়া যাইতেন। এক মাস রিহার্সালের পর কিরূপে ফুটলাইটের সামনে মুখ ফসকাইয়া "গর্ব্বান্ধ মণ্ডল" বলিয়া ফেলিলেন, সে বিহ্বল মুহূর্ত্তের কথা আজও তাঁহার স্মরণ আছে।

কিন্তু সমীর কবিতা লিখিতে গেল কেন? হরিহর মিশ্র প্রাথমিক ইতিহাস শুনিয়া এরূপ সাংঘাতিক গম্ভীর হইয়া পড়িলেন, যে সঞ্জীব চক্রবর্ত্তী আনুষঙ্গিক ইতিহাসের কোনও অনুসন্ধান করা শ্রেয় মনে করেন নাই। যা দিনকাল, আনুষঙ্গিকে কি বাহির হইবে বিধাতাই জানেন। তাহার পর হরিহর প্রাদেশিক হিন্দুসভার সম্পাদক, শেষ পর্য্যন্ত অভিভাবকদের কাছে কি লাগাইবেন কে বলিতে পারে? এতদিন সমীর ও হরিহরের সমন্বয় করিয়া স্কুল চালান কবিতার ধাক্কায় এক নিমেষে ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

সমীর স্বপক্ষ বা পরপক্ষ সমর্থনে কোন কথা বলে নাই। সে জানিত কবিতা লেখার কৈফিয়ৎ দিতে যাওয়া বৃথা এবং পরপক্ষের অর্থাৎ তাহার তথাকথিত প্রেমাস্পদাদের সে কখনও চাক্ষুষ দেখে নাই। অভিযুক্ত নারীপক্ষের অভিভাবকরা ব্যাপারটা অবশ্য পরে সবই বুঝিয়াছিলেন কারণ দ্বাদশী ভ্রাতার টেবিলে রচনার খাতার মধ্যে সমীরের অনবধানতাবশতঃ কবিতাগুলি পায় এবং সেগুলি কাড়িয়া লইবার পর তাহার বৈমনস্য বা বিরহের লক্ষণ কিছু দেখা যায় নাই। নববিবাহিতা ষোড়শী কলিকাতায় সিনেমালালিত হওয়ার কারণে এবং বাড়ীতে অক্লান্ত 'রাধেশ্যামে'র আবৃত্তি হেতু মরিয়া হয় এবং দ্বাদশীর নিকট কবিতা চাহিয়া লইয়া সেগুলি নকল করে। পিতৃদত্ত যৌতুকের বলে সে স্বামীকে শাসাইলে প্রকৃত ব্যাপার পতির হৃদয়ঙ্গম হয় এবং একটি গ্রামোফোন ও কিছু অতি আধুনিক বাংলা গান বাড়ীতে আসে। কিন্তু প্রাথমিক ইতিহাসে এসব ধরা পড়ে নাই, সুতরাং চাকরি গেল এবং এ যাত্রা সঞ্জীব চক্রবর্ত্তীও ধাক্কা সামলাইতে পারিলেন না।

সমীর মানুষটা নার্ভাস আর চিকিৎসাশাস্ত্রে নার্ভাস লোকেরা চালাক হয় এইরূপই লেখে। কিন্তু বাহিরে স্নায়ুদৌর্ব্বল্য প্রকটিত হয় ইহা কেহই চাহে না। সে যে ভয় পাইয়াছে তাহা চাপিতে গিয়া সমীর বাড়ীতে "কেলেঙ্কারি এণ্ড কোং" নামে এক ক্লাব প্রতিষ্ঠা করিল এবং একটি সাইনবোর্ড টাঙ্গাইতেও ভুলিল না। নিয়মাবলীতে দেখা গেল রহিয়াছে—"সর্ব্ববিধ কেলেঙ্কারির প্রতিবিধান করিবার জন্য "কেলেঙ্কারি এণ্ড কোং" প্রতিষ্ঠিত হইল। কেলেঙ্কারির প্রাথমিক ইতিহাস ও আনুষঙ্গিক বৈজ্ঞানিক আলোচনা দ্বারা রোগের নিদান ধরা পড়িলে কেলেঙ্কারির নিষ্পত্তিতে সুবিধা হইবে। দুই পয়সা আগাম দিলে সভ্যবৃন্দ চা পান করিতে পারিবেন, কারণ ধারে চা পানও অন্যতম কেলেঙ্কারি।"

সাইনবোর্ডে দৃষ্টি পড়িলে হরিহর কেলেঙ্কারি কথাটা আইন অনুসারে কতটা অশ্লীল চিন্তা করেন, কিন্তু ঠিক ইংরাজি প্রতিশব্দ না পাওয়াতে বুঝিতে পারেন নাই।

শশাঙ্ক দাশগুপ্ত বিলাতে ব্যারিষ্টারি পাস করিতে গিয়া ম্লেচ্ছকন্যাদের প্রতি বিজাতীয় অভিলাষ স্ফুট করেন। তদবধি তাঁহাকে স্যুট ছাড়া ধুতি কেহ পরিতে দেখে নাই। একদিন কেলেঙ্কারি কোম্পানিতে প্রাতঃকালে এস. দাশগুপ্ত উপস্থিত হইয়া সমীরকে ডাকিয়া পাঠান। সমীরের রিহার্সালে তিনি আসিয়া মধ্যে মধ্যে অভিনয়ের বিলাতী কায়দাগুলির তালিম দিতেন। এই শিল্পান্ধ সহরে এক সমীরের সহিত শিল্পসূত্রের আলোচনা চলে বলিয়া তাঁহার কাছে সমীরের কদর ছিল।

সমীরের রাত্রিবাস লুঙ্গি ত্যাগ করিয়া দর্শনযোগ্য হইতে কিছু দেরী হইল। সাইনবোর্ডটি দেখিয়া দাশগুপ্ত ভাবিলেন কেলেঙ্কারি তো যথেষ্ট হইয়াছে, বিজ্ঞাপন লটকাইবার কি প্রয়োজন ছিল? কিন্তু নিয়মাবলীতে চায়ের দাম আগাম দাবী করিতে তিনি খুসী হইলেন, কারণ তাঁহার গৃহে চা পরিপাটি তৈয়ারি হইত বলিয়া পাড়ার অর্দ্ধেক লোক সান্ধ্য চা-পর্ব্ব সেখানেই সম্পাদন করিতেন। কিন্তু সে কথা যাক, এই হরিহর মিশ্রকে তিনি আন্তরিক অপছন্দ করিতেন। তাঁহার মধ্যম পুত্র ক্লাসে খাদ্যের মধ্যে মুরগীর মাংস উত্তম বলাতে হরিহর বালককে যে চপেটাঘাত করেন, সে জ্বালা তিনি আজও ভুলিতে পারেন না।

সমীর আসিলে বলিলেন "আমার দুই ছেলের একটা মাষ্টার রাখব কিছুকাল ভাবছি, তা তোমার তো এখন সময় আছে, কাজটা নিতে পার। একটু গল্পস্বল্পও মাঝে মধ্যে করা যাবে। শ'র 'পিগ্‌ম্যালিয়ন' দেখে এলাম, তোমার সঙ্গে সিনেমা নিয়ে কিছু জরুরি কথা আছে। আর দেখ আমার মেয়ে প্রমীলা পনর'য় পড়ল, সে পড়ার ঘরে এলে তোমার কবিতা তাকে দিয়ো না। দিলে যে কিছু হবে এমন নয়, কারণ তুমি যা লিখবে তার দশগুণ সে সিনেমাতে দেখে। তা নয়, তোমার কবিতা সম্বন্ধে আমার একটা বিশেষ আপত্তি আছে। কোথাও ছন্দ রাখলেও তুমি পয়ার একেবারে বাদ দেও। এক কালে আমি কবিতা লিখতুম, কিন্তু কেবল পয়ারে। একটা কবিতায় লিখেছি:

"আসিল একদা বঙ্গে প্রবল জোয়ার,
সকলি ভাসিয়া গেল রহিল পয়ার"—

প্রমীলাকে তোমার কাছে গান শেখাবে ভেবেছিলাম কিন্তু বর্ত্তমানে মানসিক বিপর্য্যয়ে সম্ভবতঃ তুমি এক ঘণ্টার জায়গায় দুঘণ্টা তার কাছে থাকবে এবং পনর মিনিট অন্তর সাইকলজিকাল ফিস্‌ফিস্ করবে, সুতরাং এখন নয় ওটা থাক।"

সাম্প্রতিক অর্থকষ্টে সমীর অতিক্লেশে নাগরিকা কিশোরীদের মুখপাত কবিবার দুর্নিবার ইচ্ছা দমন করিয়া টিউসনিটা লইল এবং প্রমীলা যদি সামনে আসে চোখ ফিরাইয়া তৎক্ষণাৎ পুস্তকে সন্নিবেশ করিবে এরূপ সংকল্প করিতেও ভুলিল না।

কিন্তু যে ঘটনায় অপরাধের সূত্রপাত থাকিলেও থাকিতে পারিত সে কাহিনী আমরা এতক্ষণ বলি নাই। গত পূজায় অভিনয়ের টিকিট বিক্রয় করিতে রমেশ মৈত্রের বাড়ী গিয়া সমীর এক কলেজে-পড়া মেয়ের কাছে বিলক্ষণ তিরস্কৃত হয়। সুমিতা দর্শনে এম. এ. পড়ে, মফঃস্বলের স্কুল-মাষ্টারকে স্বভাবতই অবজ্ঞা করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য নাই, কিন্তু বকুনি দিবে কেন? সমীর না হয়

টিকিট বিক্রয় করিতে গিয়া বলে "স্কুলের দরিদ্র ছাত্রদের ফণ্ডে কিছু অর্থের ব্যবস্থার জন্য এই অভিনয়। খরচ আমরা চাঁদা করিয়া তুলি, সুতরাং লব্ধ অর্থ সমস্তই সাহায্যে ব্যয় হয়।" ইহাতে সুমিতা মৈত্র রাগিয়া যায় কেন এবং কেনই বা বলে "সংসারে চারিদিকে এত অভাব দৈন্য, আপনাদের অভিনয় করিতে লজ্জা করে না?" সে না হয় রুখিয়া বলিয়াছিল "পৃথিবীতে দারিদ্র্যের মধ্যেই অভিনয়ের উদ্ভব হইয়াছে।" তাহার উত্তরে সে মহিলা রক্তিম হইয়া আরম্ভ করেন "তাই বলে এই দৈন্য, কুলি বস্তি আর ড্রেন মেনে নিতে হবে? উপদেশে কিছু হবে না। আবেষ্টন নিজেই বদলায়, সে কোন আইডিয়ার তোয়াক্কা রাখে না। আবেষ্টনই সত্য, আইডিয়াগুলি তার প্রতিচ্ছবি মাত্র। এক পরিণতি থেকে অন্য পরিণতিতে আবেষ্টন অলঙ্ঘ্য নিয়মে চলে, সে কোন বাধা মানে না।" সাইকলজি পড়া থাকিলেও টিকিট বিক্রয়ের সময় আবেষ্টন ও আইডিয়ার আলোচনায় দিশেহারা সমীর চুপ করিয়া গেল।

সমীর রায়কে সুমিত্রা চিনিত, কিন্তু কলিকাতায় বেশী থাকার কারণে ভাল রকম পরিচয় ছিল না। চারিদিকে এত দৈন্য, তাহার মাঝখানে এই লোকটি অভিনয়, গান ও কাব্যের স্রোতে প্রমোদে ভাসিয়া চলিয়াছে ভাবিলেই তাহার গা জ্বালা করিত, কথাবার্ত্তায় আজ সেই আক্রোশ প্রশ্রয় পাইল, অবশ্য দুইটা টিকিট কিনিবার পর।

বকুনি খাইয়া সমীর রাগ করিতে চেষ্টা করিয়াও পারিল না। কেমন যে তাহাকে সুমিত্রার রোষদৃপ্ত নেত্র ও অধর আকর্ষণ করিতে লাগিল। দাশগুপ্ত সাহেবের আশঙ্কা মিথ্যা ছিল না কারণ বালিকা বয়সে সুমিত্রা সমীরকে একটু এড়াইয়া চলিত, কিন্তু চোখে চোখ পড়িলেই অপ্রস্তুত বোধ করিত একথা সমীরের মনে পড়িল। আজ তো টিকিট কিনিয়া তাহাকে বিদায় দিতে পারিত, খামোকা এতগুলি চোখা চোখা বাক্যবাণ বর্ষণ করিতে গেল কেন? সে ঠিক করিল, ইহার উত্তর দিতে হইবে, কিন্তু কিছু পড়াশুনা দরকার।

সমীর জানালা দিয়া একবার পাশের ড্রেনের দিকে চাহিল। যেদিন দুর্গন্ধ নিতান্ত বাহির হয়, সেদিন জানালা বন্ধ করে, নতুবা ড্রেনের কথা মনেও থাকে না। তার চেয়ে অতীতের নানা সুগন্ধ এবং বর্ত্তমানে সুমিত্রার পরিচ্ছদে সেন্টের সুবাস তাহাকে আকুল করিয়াছে। কুলিবস্তির দিকে তাকাইলে তাহার কেবল ফুক্কন সর্দ্দারের মেয়ে সোনিয়ার ঢলঢলে মুখখানি মনে পড়ে। পৃথিবীতে কি দুঃখ উড়াইয়া দিয়া সুখের কল্পনা চলে? তবে পরিবর্ত্তন আসে এবং এক ড্রেনের বদলে অন্য ড্রেনের সৃষ্টি হয় এই যা।

গরমের ছুটিতে সুমিতা মৈত্রের নামে এক পত্র যায়। রমেশবাবু কন্যার চিঠিপত্র ইদানীং খুলিতেন না, খামের ঠিকানায় লোকাল থাকাতে তিনি খুলিয়া নিম্নলিখিত পত্র পান।—

মাননীয়াসু,

গত পূজার সময় টিকিট বিক্রয় করিতে গিয়াছিলাম। অনর্থক গায়ে পড়িয়া আপনি গুটিকয়েক শক্ত কথা শুনাইয়া দিলেন। আমি তখনই উত্তর দিব ভাবিয়াছিলাম কিন্তু আবেষ্টন ও আইডিয়া সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না বলিয়া পারি নাই। কিছু পড়িয়া ও ভাবিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি তাহা পেশ করিলাম।

প্রথমতঃ আবেষ্টন স্বীকার করিলে ব্যক্তিগত আইডিয়া অস্বীকার করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। আইডিয়াকে যদি আবেষ্টনের প্রতিচ্ছবি বলা যায়, আবেষ্টনকেও আইডিয়ার প্রতিচ্ছবি বলিতে লজিক অনুযায়ী কোন বাধা আছে কি? যেদিন হইতে মানুষ কথা কহিতে শিখিয়াছে সেইদিন হইতে আইডিয়ার সম্যক্ আবির্ভাব। প্রত্যেকটি কথা একটি বিচ্ছিন্ন আইডিয়া ছাড়া অন্য কিছু নয়। পশুরও আইডিয়া নাই তাহা নহে কারণ তাহারও ভাষা আছে। পারিপার্শ্বিকের সহিত সে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া সেটা তত স্পষ্ট নহে। প্যাভলভের কুকুরের কথা ভাবুন, ঘণ্টা বাজাইলে আহার আসিত বলিয়া তাহার লালানিঃসরণ হইত। যেদিন ঘণ্টা বাজিল অথচ আহার আসিল না, সেদিন কি লালানিঃসরণের পশ্চাতে আহারের স্মৃতি তথা আইডিয়া ছিল না? আবেষ্টনই যদি সব করে তবে আপনার সে মর্ম্মান্তিক লেকচারের কি প্রয়োজন ছিল? বক্তৃতাটি কি কতকগুলি আইডিয়ার সমষ্টি নয়?

দ্বিতীয়তঃ আপনার নিয়ম অনুযায়ী কোন আবেষ্টনই চরম ও স্থায়ী নয়। তাহাই যদি হয় তবে এক বিশেষ আবেষ্টন লইয়া এত আস্ফালন ও মারামারি কেন?

আমার কথা এই যে দারিদ্র্যের দূরীকরণ কর্ত্তব্য, কিন্তু ভুল থিয়োরি বর্জ্জনীয়। আশা করি এ পত্র পাইয়া আপনি কিছু মনে করিবেন না। আপনার বকুনির পরে আমি এতটা ভাবিয়াছি। যেহেতু আপনি এম. এ. পড়িতেছেন এবং আমি বি. এ. পাস, সেহেতু আপনার নিকট শিক্ষা করিতে আমি বাধ্য। ইতি

সমীর রায়

রমেশ মৈত্র সুমিতাকে ডাকিয়া বলিলেন "সমীরকে কি বলেছিলি সুমিতা, দেখ কি লিখেছে।" সুমিতা নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সহিত "ওঃ সমীর, সে আবার কি লিখবে" বলিয়া চিঠিতে একবার চোখ বুলাইল এবং পিতার সহিত কিছু কথাবার্ত্তার পর সেটি লইয়া যাইতে ভুলিল না। রমেশ মৈত্র একমাত্র মেয়ের সম্বন্ধে ক্রমেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিলেন। তাঁহার বিশ্বহিতৈষিণী মেয়ে কোন পুরুষবিশেষের শুভার্থিনী হইলে তিনি আশ্বস্ত বোধ করিতেন।

আর এক পূজা ঘুরিয়া আসিল। স্কুলের অভিনয়ে সমীরকে ডাকিতে আসিলে সে যায় নাই; প্রতিশোধ লইবার জন্য নয়, আসলে তাহার মন ভাল ছিল না। সমীর যে নির্দ্দোষ হেডমাষ্টারের নিকট ধীরে ধীরে তাহা প্রতিভাত হইয়া উঠিল। হরিহর মিশ্রের আনুষঙ্গিক ইতিহাসে জানা যায়—সাইকলজি পাঠ করিবার পর তিনি এক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে উপনিষদ ও গীতা এতদিন শুধু না বুঝিয়া তিনি আবৃত্তি করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং স্কুলে যাইবার আভাস সমীর পাইল কিন্তু গেল না। সত্য ও মিথ্যা কলঙ্কে এবং আর্থিক দৈন্যে সে যেন কি রকম গম্ভীর হইয়া পড়িতেছিল।

শরতের সকালে আরবার পূজায় আনন্দ, উৎসাহের কথা মনে হয়। তাহার সঙ্গে একটি তরুণীর অকারণ ভর্ৎসনাও কি জড়িত ছিল না? এমনি চিন্তার মধ্যে দূর হইতে সমীর দেখে রমেশ মৈত্র তাহার বাড়ীর দিকেই আসিতেছেন। সে প্রমাদ গণিল, সুমিতাকে চিঠি লেখার পর হইতে তাহার স্বস্তি ছিল না। এই পৃথিবীতে পিতা, পতি ও পাহারাওয়ালা ত্র্যহস্পর্শের ন্যায় প্রেমের

প্রতিকূলে বিরাজমান, সেখানে সুমিতাকে চিঠি লেখাটা দণ্ডবিধির দখলে আসিলেও আসিতে পারে—এমন একটা আশঙ্কা তাহার চেতনার অন্তরালে ছিল।

কিন্তু রমেশ মৈত্র আসিয়া "কেলেঙ্কারি এণ্ড কোং"র স্বত্বাধিকারীকে মিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন "সুমিতা তোমার কাছে গান শিখতে চায়, তুমি আজ বিকেলে এসে তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বোলো" বলিয়া প্রাতর্ভ্রমণে চলিয়া গেলেন।

সুমিতা গান শিখিবে এ সম্ভাবনা তাহার মনে হয় নাই। সুমিতা ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য মানে না, ইহারা বিদেশের ধার করা সুরে কোরাসে গান করে বলিয়া বেসুরা গাহিবে বলিয়াই তাহার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু তাহার বর্ত্তমান আর্থিক নৈরাজ্যে এত সূক্ষ্ম বিচারের স্থান ছিল না।

প্রাথমিক ইতিহাসে সুমিতার সঙ্গীত শিখিবার কথা কিন্তু আনুষঙ্গিক ইতিহাসে দেখা যায় সে শিখিল আর কিছু। তাহার জন্য সমীরের কোন অখ্যাতি হয় নাই, সে এখন মনের সুখে দাম্পত্য কলহে নিবিষ্ট, কারণ প্রেমের এই দিকটাই তাহাকে আকর্ষণ করিত। অভিনবত্বের মধ্যে স্ত্রীর সহধর্ম্মী হইবার জন্য এম. এ. পড়িতে সুরু করিয়াছে।

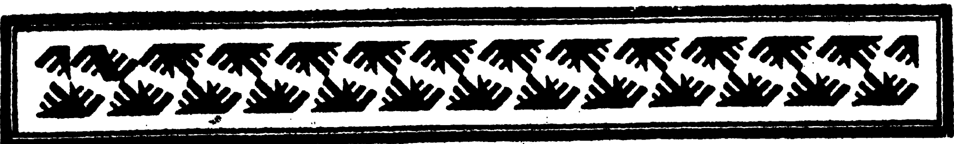
"কেলেঙ্কারি এণ্ড কোং" উঠিয়া গেল। নিম্নলিখিত কারণটি পুরাতন নিয়মাবলীর নীচে কিছুদিন দেখা গিয়াছিল:—"ব্যক্তিগত একটি কেলেঙ্কারির নিষ্পত্তি হওয়ায় "কেলেঙ্কারি এণ্ড কোং" লুপ্ত হইল, কারণ কেলেঙ্কারি ব্যাপারটা নিজস্ব, কেহ অন্যের কেলেঙ্কারির প্রতিবিধান করিতে পারে না। বলা বাহুল্য ইহার সমাধানে প্রাথমিক ইতিহাসের সহিত আনুষঙ্গিক ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি ফলপ্রদ। সত্বাধিকারীর গৃহে চা পানের নিমিত্ত আর পয়সা লাগিবে না।"

অতি-আধুনিক কবির পত্র

শ্রীক্ষিতীশ রায়

বীণা যদি আজ হাতুড়ি কাস্তে হয়
আমাদের মত নবনারদের হাতে,
দোহাই বন্ধু, কোরো না তাহাতে ভয়
বদল যে হয় বিবর্ত্তনের সাথে।
ঢেঁকি যে হয় নি এই মনে ভেবো ঢের
বন্যার আজ স্বর্গেতে ধান ভানে,
চুঙকিঙে তাই চীনেরা পেতেছে টের,
নারদবাহন বদলেছে তার মানে।
অনেক কিছুই বদলালো কলিকালে—
বৈশ্যেরা নিল রাজনীতিকের পেশা,
আমরাও চলি মার্ক্স লেনিনের চালে
লেখনী মোদের মুটে মজহুর ঘেঁষা।
আহারে বিহারে আভিজাত চাল রাখি,
মনে মনে মোরা প্রোলেটেরিয়েট সেরা।
ঘাম আর ধুলো যত্নে এড়িয়ে থাকি,
অ্যাভিনিউ পথে জেনো আমাদের ডেরা।
পূজামরসুমে মধুপুরে যাই চ'লে,
গ্রীষ্মে পাহাড়ে অথবা গোপালপুরে,
শুধু এই ভেবে—অসুখ বিসুখ হলে
বাঙালী পাঠক মরিবে যে মাথা খুঁড়ে।

'ফিরপো'-লঞ্চে হপ্তায় দুইবার
কাসানোভা-বারে কিছু বা বীয়ার টানি
এটা হ'লো ভাই আমাদের কবিতার
নহিলে না হয় স্বল্প অন্নপানি।
অডেনের মত নাই বা গেলাম স্পেনে,
পিতার তবিলে থাক না অঙ্ক ভারী,
পাখার তলায় মোটা তাকিয়াটা টেনে
সারা দুনিয়ার করি যে খবরদারী।
স্বাধীন প্রেমের আমরা সমঝদার
হৃদয়ে গভীর পরকীয়া সম্প্রীতি,
ঘরণীরে কভু করি না ঘরের বার,
দূরেরে নিকট করা আমাদের রীতি।
ইংরিজি প'ড়ে করেছি যে পাশ এম. এ.
এলিয়ট জেনো আমাদের ধ্রুবতারা,
অনর্থকের অর্থ বিচারি ঘেমে,
পৌণ্ডেরে বলি সকল কবির সেরা।
আমরা সবাই প্রগতিবাদের চেলা
নূতন যুগের আমরা ভগ্নদূত,
ভাষাকে কোরেছি কমা-কোলেনের খেলা,
অরসিকজনা তারে কয় অদ্ভুত।
ছন্দেরে মোরা কোরেছি যে পরিহার
লেখনীতে জেনো আসে না কখনো মিল,
ভাঙা গদ্যেতে বহে কাব্যের ভার
আচমকা মারি কটু বাক্যের কীল।
রবি ঠাকুরের যুগ যে ফুরালো কবে
বুর্জোয়া কলা মরেছে সে কোন দিন
আমরা চেঁচাই কাংস্য-কঠিন রবে
আমরা বাজাই কেনেস্তারার টিন।
ধাপার মাঠেতে কল্পবিহার করি,
আঁস্তাকুড়েতে মানসের বিচরণ
ডিকেডেন্ট জেনো সাধের সোনার তরী—
—সত্যম্ শিব সুন্দর আরাধন।
চন্দ্রালোকের সোনাটাবধির কান,
রাগরাগিণীতে পায়না কো ভাই মানে,
অবনবাবুর লিরিক তুলির গান
কলাবিৎ মোর সম্বিতে নাহি টানে।
উসকাই মন কিম্ভূত কথা পেড়ে
উল্টো বুঝিয়ে লাগাই লোকের তাক,
নিদেন পক্ষে অশ্লীল দিই ঝেড়ে
নিরীহ পাঠক যাতে হয় নির্বাক।
পুকুরের ধারে দেখি পাইনের বন,
স্বপ্নেতে দেখি ডৌসন-সাইনারা
মোনালিসা ভাই হরণ কোরেছে মন,
আর্টেমিসেতে চিত্ত যে হায় হারা।
উপনিষদের নামগুলো গালভরা,
ঢোকাই আমরা কবিতার মাঝে মাঝে,
অমরকোষের যতেক বাছাই করা
দুরূহ শব্দ খাটাই কাব্যকাজে।
এমত অনেক কলকৌশল করি
অতি আধুনিক লভিয়াছি নাম জেনো;
শুনিবে তালিকা বারেক ধৈর্য্য ধরি,
জানি হে তোমার সময় নাহিকো হেন।
অতএব ইতি, বাকী কথা থাক বাকী
বারান্তরেতে কহিব তোমারে সবি,
পষ্টারিটির গভীর গহনে থাকি
আমরা নবীন ছন্দোবিহীন কবি।



প্রাগ্‌মতবাদ

(Pragmatism)

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ঠিক্ বছর খানেক আগে 'amateur' কথাটার একটা বাংলা প্রতিশব্দ তৈরি করার দায়ে পড়েছিলাম। 'অমাচর' কথাটা মনে এসেছিল, 'parasite'='পরাশ্রিত' এই তর্জমার নকলে। কিন্তু কবিবরের তর্জমাগুলিতে ধ্বনি ও অর্থের যে-যাথাতথ্য বজায় থাকে, বক্ষ্যমান তর্জমাতে তার আত্যন্তিক অভাব দেখে তা আর উচ্চারণ করা যায় নি সেবারে। এবারে দেখলুম, অন্তত একটা ব্যাপারে। amature=অমাচার-ই। সে কোন্ ব্যাপার?—ধর্ম ও দর্শনের মাঝামাঝি যে একটা বৈঠকী কথাবার্তার সংগে পরিচয় না ঘ'টে এ-দেশে দু' পা চলবার জো নাই, সেই ব্যাপার। যারা শুধু সংসার করে, মানে কি না—যারা যেমনটি যা আছে তাকে ঠিক তেমনটি জেনে ক্ষুধাতৃষ্ণার তাগিদ মেটাতে মেটাতে চলে, তারা যে আঁধারে বাস করে, তাদের চেয়ে গাঢ়তর অন্ধকারে প্রবেশ তাঁরা যে কেমন করে করেন যাঁরা 'বিদ্যায়' রত হন, তা বিলিয়ম জেমস্‌এর এক তরুণ গ্র্যাডুএট ছাত্র গুরুর মতবাদকে সংক্ষেপে বলতে গিয়ে বলেছিলেন এইরূপ :

স্ট্রীট থেকে যা-ই এক দর্শনের ক্লাসরুমে পা দি, অমি ধরে' নি যে জগতটাকে পেছনে ফেলে এলাম, আর যে-জগতে ঢুকে পড়লাম, এ দুই একেবারে আলাহিদা। এই দুইএর একের সঙ্গে আরের কোনও যোগ-ই নাই : দু'টোকে এক-ই কালের মনের মধ্যে জায়গা দেওয়া-ই চলে না। স্ট্রীটএর যে জগৎ তা বহু-র দ্বারা এমন ভর্‌তি যে কল্পনা তার 'বেড়' পায় না, তা জটিল, ঘোলা, ব্যথাতুর। ও-ধারে দর্শনের অধ্যাপক যে জগতে আমাকে নিয়ে আসেন তা সরল, পরিষ্কার, উদার। বাস্তব জগতের গণ্ডগোল ওখানে একেবারে নাই। এর স্থাপত্য একেবারে ক্লাসিক। প্রজ্ঞার মূল সূত্রগুলির দ্বারা এর আয়তন সুঠাম, এর অংশগুলি লজিকের শিমেণ্ট দিয়ে গাঁথা।... পর্বতশিরে উজ্জ্বল মর্মর-হর্ম্য আর কি।

মোদ্দা, ওটা এ-জগতের কোনও ব্যাখ্যা-ই নয় : পরন্তু এ-জগৎ থেকে পালিয়ে লুকোবার একটা আশ্রয়।

'অমাচর' আর একটা বিপদে পড়েন : হঠাৎ দেখতে পান তাঁর রথটি দুই ভয়াবহ সেনার ঠিক্ মাঝখানটিতে স্থাপিত :

তত্ত্ববাদী	তথ্যবাদী
ভাববাদী	জড়বাদী
"ভালো-সবই-ভালো"-বাদী	নিখিলমন্দবাদী
ধর্ম-ওয়ালা	ধর্মের-ধার-না-ধারা
স্বাধীনকর্ত্তৃত্ববাদী	অদৃষ্টবাদী
অদ্বৈতবাদী	বহু-বাদী
একরোখা-বাদী	সংশয়বাদী

ঠিক এই জায়গায় প্রাগমাটিস্‌ট এসে পড়েন। ইতালীয় প্রাগমাটিস্‌ট 'পাপিনী' যেমন বলেছেন, সমস্ত মতবাদের মধ্যে প্রাগমাটিস্‌ম্ তা একটা হোটেলের মধ্যে করিডোরটি যা। করিডোর্ থেকে অসংখ্য কুঠরী বেরিয়ে পড়ছে। কোনও কুঠরীতে দেখ একজন বসে' নিরীশ্বরবাদের উপর গ্রন্থ-রচনায় নিরত ; ঠিক পরের কোঠাতে-ই দেখ একজন হাঁটু গেড়ে বিশ্বাস এবং বল যাচ্‌ঞা করছেন ; তৃতীয় কামরায় কেমিস্‌ট্ কিম্ ইতি কিম্ ইতি করে' গলদ্‌ঘর্ম্ম হচ্ছেন। চতুর্থ প্রকোষ্ঠে ভাববাদী-মেটাফীজিক্স ও পঞ্চমে মেটাফীজিক্সের অসম্ভাব্যতা প্রমাণিত হচ্ছে। কিন্তু সব ভাই করিডোর্‌কে স্বীকার করছেন ; নিজ নিজ কোঠায় ঢুকতে হ'লে বা কোঠা থেকে বেরোতে হ'লে সব মিঞাকেই এই করিডোর্ দিয়েই যেতে আসতে হবে। আর বরাবর-ই তা হয়েছে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে শুধু, Mr. Charles Peirce এর একটা নামকরণ করেছেন—পরিচিত 'প্রাক্‌টিকাল' কথাটার মূল ধাতু থেকে ["How to Make Our Ideas Clear",—"Popular Science monthly", for January, 1878.]

এখন প্রাগ্‌মাটিস্‌ম্-এর যদি একটা বাংলা শব্দের দরকার হয়, তবে না হয় একে 'প্রাগ্‌মতবাদ' বলা যাক্—কেন না, এটা একটা 'মতবাদ' ততটা নয়, যতটা একটা মেথড্-মাত্র। 'মতবাদ' যেন একটা ঘর যেখানে পৌঁছে জিজ্ঞাসু মন বলে, ব্যস্, এই ত তথ্যপুঞ্জকে গোলাজাত করা গেল, চুকে গেল। কিন্তু গোলাঘরের পর ঢেঁকিঘর থাকতে পারে, তারও পরে হাঁড়িশাল থাকার সম্ভব। গোলাঘরে পৌঁছার পূর্বে মাড়াইখানা হয়ে' আসতে হয়েছে ; আর মাড়াই-এর ওখানে পৌঁছবার পূর্বে কাস্তের সংগে দেখা হয়েছিল তথ্যপুঞ্জের। সর্বাদৌ পক্বশীর্ষ তথ্যেরা তাদের অসংখ্যতাতে ঢেউ খাচ্ছিল—অম্নি একটা একটা থিওরি দিয়ে তাদেরে আঁটি বেঁধে ফেললুম। কাস্তের কাজ ফুরিয়ে গেল, তারপরে এল ঢেঁকির কাজ। এক সময়ে ঢেঁকির কাজও ফুরোয়, তখন আসে হাঁড়ির কাজ।

আমি চাঁদপুর থেকে যখন কল্‌কাতায় যেতে চাই, তখন প্রথমে চাঁদপুর ঘাট থেকে স্টীমারে চাপি—কেন না গোয়ালন্দ পর্যন্ত ঢেউ-এর যে অসংখ্য তথ্য আছে সেইগুলির প্রতিটির সংগে আলাহিদা আলাহিদা লড়াই করে' করে' যেতে হ'লে কল্‌কাতায় পৌঁছোতে পারি না : কল্‌কাতায় কাজ আছে কি না। আমি ত 'প্রাক্‌টিকাল ম্যান্'। এমন কি গান্ধি-হেন "ষ্টীমার'-কে-ও মুদ্রাযন্ত্রের শরণ নিতে হয়েছিল—প্রতি বাড়িতে গিয়ে চরকার খবর বলে' আসতে হ'লে কাল্পনিক মুনি-ঋষিদের বয়ঃক্রম পেলেও তাঁর কুলোত কি ?

সেই যে স্ফটিকতত্ত্ববিদ্ ব্র্যাগ্ বলেছিলেন, বৈজ্ঞানিককে কখনো এ-থিওরি, কখনো ও-থিওরি ব্যবহার করতে যে দেখা যায়, তা শুধু টেবিল-নির্মাতাকে কখনো করাত কখনো বাঁটালি হাতে নিতে যে জন্যে দেখা যায় সে-জন্যে, তার মানে কি ছিল ? গাছকে যখন তক্তায় পরিণত করতে হবে তখন করাতই চাই। এই হচ্ছে করণ-বাদ (Instrumentalism : Dewey, Chicago)—প্রাগ্‌মতবাদের প্রথম পাদ। যে কেউ জীবজগতের বিবর্তনের তত্ত্বটা মন দিয়ে অনুধাবন করেছে, সে-ই দেখেছে, আমাদের অভিজ্ঞতায় এক অংশের সংগে আর এক অংশের যোগ ঘটাতে, শ্রম লাঘব করতে এক একটা "বাদ" কেমন সাহায্য করে। শুধু, "বাদ"-গুলি এক একটা ইষ্টিশন নয় যেখানে আমরা কায়েমি স্বত্বে জমি নিয়ে বসে' যাই, কিন্তু এরা যেন যান-বাহনের সামিল।

কেন না, সকলেই জানে, এমন একটা অভিনব তথ্য হঠাৎ বাহির হ'য়ে পড়ে (যেমন রেডিয়ম), যাতে অনেক দিনের পুরাতন মতবাদের আশ্রয় হঠাৎ টুটে যায়। অথচ একেবারে টুটে যেতে দিতে আমাদের প্রকৃতির মধ্যে বাধা আছে। তাই করি কি না—পুরাতন রাশি রাশি মতের উপর সর্বাপেক্ষা কম ঘা দেয়, পুরাতনের ধারাবাহিকতাকে সর্বাপেক্ষা বেশি বজায় রাখে—এমন একটা মধ্যবর্তী মত আমাদের বাহির করতে হয়। একটা জিনিস যে আমার খাদ্য তা কি করে' জানি?—সেটাকে মুখে পূরলে যদি আমার এই পুরাতন দেহ 'ওয়াক্' শব্দে সেটাকে হয় যে পথে এসেছিল সেই পথে ফেরত না পাঠায় বা অপর পথে…। একটা জিনিস সত্য যে, তা কি করে' জানি?—পূর্বে আমি যা যা জানতাম আর এখন এই যে নূতন এক তথ্য এল—এই দুইএর মধ্যে কি না এ একটা সন্তোষজনক সন্ধি ঘটিয়ে দেয়, তাই বলি এ সত্য।—যখন 'খাদ্য খাদ্য' করি, তখন যে বিশেষণ পদটি অনবরত উহ্য রাখি, তা হচ্ছে 'মানবীয়'। তেম্নি যখন 'সত্য সত্য' করি, তখন প্রকৃত প্রস্তাবে যা বোঝাতে চাই তা হচ্ছে 'মানবীয় সত্য'। (Humanism : Schiller, Oxford), সত্যের এই ক্রমিক-বাদ প্রাগ্‌মতবাদের দ্বিতীয় পাদ।

চুম্বক কি দাঁড়াল?—তাই সত্য যা বিশ্বাস করলে ভাল হয়। 'ভাল' কি রকম?—স্পষ্ট সুনির্দেশ্য কারণে যা ভাল। তার মানে কি এই যে, যা আমাদের বিশ্বাস করা উচিত, তাই সত্য?—হাঁ। তবে কি না এই নূতন বিশ্বাস এমন হওয়া চাই যাতে আমাদের জীবনের অপর গুরুতর কল্যাণের ব্যাঘাত না ঘটে। অপর যা কিছু আগে জানতাম, তার সঙ্গে নূতন বিশ্বাসের একটা সম্যক্ বোঝাপড়া (ঝটিতি) হয়ে যাওয়া চাই।

বিলকুল নূতন যে তথ্য যা পুরাতন সংস্থিতির পক্ষে মারাত্মক, তা যেন একটা কোপ্ যা গাছের গায়ে মারা হয়েছে। অম্নি গাছ cambium-এর দ্বারা নূতন সংঘাতকে যা হয় একটা করে' নেয়। মানুষও সেই রকম, পুরাতন মতবাদ যা নিয়ে সে অনেক দিন নিশ্চিন্ত ছিল তার পক্ষে মারাত্মক যে নূতন তথ্য তার যা হয় একটা বিলি করে' ফেলে। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মসমাজ, আর্য্যসমাজ, প্রার্থনাসমাজ প্রভৃতি শী. এফ্. এণ্ড্রুজ প্রমুখ পাদ্রীর মতে এই ভাবে উদ্‌ভূত হয়েছে: খৃষ্ট সেই নূতন তথ্য যা পুরাতন অচলায়তনের স্থিরা শান্তির পক্ষে মারাত্মক ছিল। এটা দৃষ্টান্ত মাত্র।

আমাদের জ্ঞান যে টুক্‌রো টুক্‌রো খবরের সমষ্টি বলে' আমরা খামোকা গ্লানি পোষণ করছিলাম বিলিয়ম জেম্‌স্ বলেন, সে গ্লানির কোনও অবসর নেই। তাঁর ভাষায়, আমাদের জ্ঞান যে বেড়ে চলে, তা grease spotsএর বৃদ্ধির প্রোশেস্-এ [ছুলি যেমন করে' বাড়ে: যদিও এ-দীনের উদ্‌ভাবিত বর্ষাগমে ফাঁকে ফাঁকে ডুবে-না-যাওয়া-জমি-দ্বারা-বিচ্ছিন্ন টুক্‌রো টুক্‌রো জল-দলের ক্রমিক বৃদ্ধির উপমাটা এর চেয়ে ভদ্রতর ছিল যে, তা দুর্বিনয়-বাদেই বলা চলে হয়ত।] কারণ সহজ: দুই মহতী চমূর ডান দিকের দলের দিকেই রয়েছে ঝোঁকটি প্রাগ্‌মাটিস্ট-এর। সোজা গদ্যে, জেম্‌স্ একজন Empiricist. এখন এম্‌পিরিশিস্ট একটি মাত্র অস্ত্রকে জানেন: তা হচ্ছে simple enumeration. কতগুলো ঘটনার সংগে কতগুলো ঘটনা যাচ্ছে দেখা যায়; তা টুকে রাখা-ই তার কাজ; আর কাজ—অপেক্ষা করা। তার উল্‌টো পথ হল কোনও Empyrean এক থেকে যাত্রা সুরু করে' টুক্‌রো তথ্যকে সেই স্বর্গীয় আলোতে উদ্‌ভাসিত দেখা, যে-আলো আমরা স্ট্রীটের জগতে কখনো দেখি নি।

এই পথের পথিকদের চোখে-ই ভবার্ণবে হাংগর নেই : ষ্ট্রীট-এ কাঁকর নেই : বিশ্বে-ও বেকার নেই। ["তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে যত দূরে আমি যাই, কোথাও গ্রাহ, কোথা কংকর, কোথা হে বেকার নাই॥" যদি থাকে-ও, তবে তারা আছে শুধু সমগ্র একের মহিমার বৃদ্ধির জন্যে-ই। "মাগো এ বেকার ডুবে যদি যায়, তোমার মহিমা কিছু বাড়িবে কি তায়?"—এই হচ্ছে এঁদের প্রশ্ন।] পক্ষান্তরে, প্রাগ্‌মাটিস্‌ট গোড়ায়ই কোনও অখণ্ড সুষমা থেকে রওনা না হওয়াতে 'স ইহ নানেব পশ্যতি' কিন্তু তাই জন্যে তাঁর প্রস্তাব এ নয় যে, তিনি অতএব মৃত্যু থেকে মৃত্যুতে প্রবেশ করবেন; বরং তাঁর প্রস্তাব, যে-সুষমা যে-কল্যাণ তিনি দেখতে পেলেন না, সেই সুষমা সেই কল্যাণকে তিনি সৃষ্টি করবেন। এই জন্যেই প্রাগ্‌মাটিস্‌ট আবার *Meliorist.* ঐ অখণ্ড ঐক্যের সুষমাকে বলা বাহুল্য দার্শনিক মহলে "Absolute" এই একটি পথেঘাটে-শ্রুত অভিধায় অভিহিত করা হয়। প্রাগ্‌মাটিস্‌ট উক্ত Absoluteকে চেনেন না : ও-রকম সুষমাময় জগৎকে তিনি "block universe" বলে ঠাট্টা করেছেন। সে জগতে ফ্রী উইল-এর প্রব্লেমটি বড়ো সংকটাপন্ন অবস্থায় রয়েছে। যদি যা কিছু আমি করি তা নিয়তির বশে করি, তবে সেই স্বয়ংসম্পূর্ণ সুষমাময় জগতে আমি অকল্যাণ করি কি রকমে? আর যদি যা কিছু আমি করি, আমার স্বাধীন ইচ্ছায় করি, এমত হয়, তবে আমি এমন কিছু করি যা বিলকুল অভিনব, যা প্রাক্তনঘটনাপরম্পরার শেষ শৃংখল নয় : স্বয়ংসম্পূর্ণ সুষমাময় জগতে যদি আমার পক্ষে একেবারে অভিনব কিছু করার সম্ভাবনা-ই থাকল, তবে সেই সম্পূর্ণ জগতে এই অভিনব ঘটনাটার কমতি ছিল—আর তাহলে সেই কমতি টুকু নিয়ে সে জগৎ সম্পূর্ণ ছিল কি রকমে? আমি সাড়ে চারটার সময়ে যে সম্যক নয়া কাণ্ডটি করলাম, চারটা উনত্রিশ মিনিট উনষাট সেকেণ্ডের সময়ে আমি সেই আমি ছিলাম কি?···

ডায়ালেক্‌টিক ঘটিত যে আলোচনাটা এখন অল্পবিস্তর পরিচিতির পাল্লায় এসে পড়েছে, তার অন্তর্নিহিত ত্রুটি এই যে, আমাদের মন যেহেতু ত্রিবিক্রম, মানে কি না Pindaric Ode-এর চালে চলা এর অভ্যাস, অতএব, স্থির করা হয়েছে, যে সমগ্র বিশ্বকে-ও সেই চালে চলতে হবে—অতি সুষ্ঠু তার লজিক্যাল চাল। এ ভবার্ণব এখন পর্যন্ত ঠিক যে-জায়গায় আছে, প্রাগ্‌মাটিস্‌ট সেখানে তার সেই সর্বাংগসম্পূর্ণ সৌষ্ঠবটি একেবারেই দেখতে পান না। সে সৌষ্ঠব হয়ত ভাবীকালে আছে : এবং সে সৌষ্ঠব ভাবীকালে-ও থাক্‌বে কি থাক্‌বে না, তা নির্ভর করচে, রাম শ্যাম যদু রহিম ডিক্ হ্যারি তুমি এবং আমি আজ সে সৌষ্ঠব আমদানির জন্যে কি করচি, কি করচি না, তার উপর। চুম্বক এই যে, আমরা যে জগৎকে পেয়েছি তা নানাখানা, "ছিত্তিছান"—এই বিবিধতা থেকে আমরা আপন চেষ্টায় ঐক্যে পৌঁছব—Paradiseকে regain করব, এমন নয়, সৃষ্টি করে প্রথম gain করব।

এই position-টিকে Bosanquet পাটীগণিতের দ্বারা বুঝিয়েছেন—যদিও তাঁর অভিসন্ধি এটাকে খণ্ডন করা। "৭+৫=১২" এই হচ্ছে তাঁর "The Meeting of Extremes in Contemporary Philosophy" নামক বইএর এক অধ্যায়ের শিরোনামা। তর্কটা এই যে, টুক্‌রো টুক্‌রো ব্যাপারকে পেয়েছি—চেষ্টা করে সমগ্রতাতে পৌঁছব। [State-গুলো পেয়েছিলাম; পরে United States-এ পৌঁছেছিলাম। "সাম্রাজ্যকে পেয়েছিলাম, পরে সুবায় সুবায় ভাগ করেছিলাম"—এর

উল্‌টো।] ইতোমধ্যে "এক" নামক ব্যাপারটি বিবিধ অসংখ্যতা অপেক্ষা জাঁকাল হতে গেল কেন? তেত্রিশ কোটি নামক সংখ্যাটির, "১"-নামক সংখ্যাটির কাছে লজ্জিত থাকারই বা দরকার কোথায়? এও আসল তর্ক নয়। "আশু কহি আর" এই যে সাতে আর পাঁচে যোগ কর্‌লে যে বারো হয়, এই propositionটির মধ্যে একটা ক্যাঁকড়া আছে। এই proposition-টি ঘোষণা করার সময়ে, হয় তুমি এক নতুন সংবাদ বলেছ, নয় তো পুরোনো কথা কপচিয়েছ। যদি নতুন সংবাদ বলে থাক, তবে তা absurd [প্রকৃত নতুন সংবাদের নমুনা: ২ + ২ = ৫] আর যদি পুরোনো সংবাদ বলে থাক, তবে তা petitio principii. Bosanquet বলতে চান, একটু ভাবলেই দেখতে পাওয়া যায়, সংবাদটি পুরোনো হলেও নতুন। সমগ্র "বারো"কে পাঁচ ও সাত-এ ভেঙে গিয়ে ফের বারো হতে হয়েছে। অর্থাৎ যা 'পরম' তাই 'চরম'। স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রাথমিক অথচ শাশ্বত (বা কালাতীত) সমগ্রতা অথবা আত্মচেষ্টা-লব্ধ সম্ভাবনীয় ভবিষ্যৎ সমগ্রতা—ওটাকে একটা tense-এর ঝগড়ার মত দেখাচ্ছে। এই হ'ল খানিক টিপ্পনী। খৃষ্ট একবার বলছেন: "The Kingdom of God is within you", আবার বলছেন, (কেন না, এরকম উল্‌টোপাল্‌টা উপদেশ দেওয়া তাঁর রেওয়াজ): "Seek ye first the Kingdom of God". যেটা গোড়া থেকে ছিল সেটাকে আবার পাওয়াই কি ইতিহাস নয়?—গান্ধীজি দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন: আজ বৃষ্টি হ'ল কেন? উত্তর: বর্ষা কি না, তাই। জেম্‌স্‌ বলতে চান, ঘন ঘন বৃষ্টির পসলাকে আলাদা আলাদা টুকরো টুকরো লাভ করে ছিলাম প্রথমে। দ্বিতীয়ত, তাদের একুনে নিয়ে বর্ষা, বা আরো সমারোহের সংগে, প্রাবৃট এই আখ্যা দিয়েছিলুম। এই আখ্যাটি দান ক'রে, তৃতীয় পাদক্ষেপে, ঠিক্‌ করলাম, প্রাবৃট নামক এক বিপুল সত্ত্ব আছে ["ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে…ঘন যৌবনা বরষা"] তিনি কি না আসছেন, তাই আজ বৃষ্টি হল।

"বুঝ, ভাই, যে জ্ঞান সন্ধান।" এখন বোঝা সহজ, '-th'-অন্ত 'truth'-কে কেমন করে জেম্‌স্‌ '-th'-অন্ত 'wealth' এবং 'health'-এর সমপর্য্যায়ে ফেলেছেন।

করাতের গুঁড়ো কি খাদ্য? সংপ্রতি নয়, কিন্তু তাকে খাদ্য করে' তুললেই খাদ্য হবে।

কোনটা আমার সত্য?—যেটা আমার জীবনের দরকারে লাগবে। এখন বোঝা সহজ, যুগপৎ রিলিজন্‌, সায়েন্‌শ ও ফিলসফি কি কারণে প্রাগ্‌মাটিস্‌ম্‌-এর অভ্যুদয়ে আঁৎকেছেন।

কিন্তু অন্তত 'রিলিজন্‌বালা'র না আঁৎকালেও চলত। রিলিজনিস্ট কি বলেন?—"যেখানেই যাই নাক'," ঈজিচেয়ার আমার জন্যে পাতা থাকে। জেম্‌স্‌ স্পষ্ট বলেছেন, জীবনে ও-'holiday'-রও দরকার গভীর। অতএব ওটাও সত্য। সমস্তই "ফলেন পরিচীয়তে"; সেইটাই verity যেটা verified হয়।

বারংবার "জীবনের দরকার"-এর উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু এ মত তাই বলে' Utilitarianism নামক আর এক বিখ্যাত মতবাদের নামান্তর নয়—যদিও তার সংগেও এর যোগ আছে,—আর কোন মতবাদের সংগেই বা প্রাগ্‌মাটিস্‌ম্‌-এর কোথাও না কোথাও যোগ নেই?—বরঞ্চ Bergson'র বক্তব্যের সংগে এর সম্পর্ক আছে, অতি গভীর: হয়ত বা সেই সম্পর্কই রয়েছে, অধমর্ণের সঙ্গে উত্তমর্ণের যে সম্পর্ক আছে। অতএব, আজকে যেকালে, অমুক কবির উপর ব্যার্গস'র প্রভাব, অমুক

কাব্যে ব্যর্গসঁর সুর প্রভৃতি কথা বৈঠকী আলাপে কপিলপাতঞ্জলাদির শূন্য জায়গা দখল করার উপক্রম করছে, সেকালে একবার জেম্‌স্‌এর সংগে চেনা করাটা মন্দ কি ? প্রকাশ থাকে, যে, এ বিশ্ব শেষ পর্য্যন্ত চিন্ময়, আর এ বিশ্ব শেষ পর্য্যন্ত মৃণ্ময়, এই যে দুই প্রতিপক্ষ 'বাদ' আছে, এ দুইকে একমাত্র সম্ভবপর উপায়ে ব্যর্গসঁ মিলিয়েছেন—তা হচ্ছে মৃৎ ও চিৎকে একেবারে আলাদা করে' নিয়ে : অথচ Dualism-এর চোরাবালিতে পা না দিয়ে। বাইরে যে বস্তু আছে সে সেখানে আছে, আর আমার ইন্দ্রিয়ের মধ্যে তার রেজিস্টরি চলছে—এই যে দুই প্রান্তে দু'টি ঘটনা আছে বলে মনে করা হয়, এর থেকেই যত রকম বেরকমের Idealism ও Realism-এর সূত্রপাত, এবং "thing-in-itself" প্রভৃতি আশ্চর্য্য কথার উদ্ভব। ব্যর্গসঁ দেখালেন, আমার চোখ টেবিলকে যে দেখছে সেই দেখাটা অক্ষিতারকার মধ্যেই ঘটছে এমন মনে করার হেতুই এই, যে, আমরা একটা অখণ্ডনীয় প্রশেসকে খণ্ড খণ্ড করে' নিচ্চি—খণ্ড খণ্ড করাই আমাদের অভ্যাস। টেবিলের উপর আলোরশ্মির প্রতিফলন এই এক টুকরো, সেই রশ্মির আমার চোখ পর্য্যন্ত পৌঁছন এই আর এক টুকরো, সেখানে রেজিস্টরি এই আর এক টুকরো। আসলে টেবিল থেকে অক্ষিতারকা পর্য্যন্ত যা কিছু ঘটচে তা একই আস্ত ঘটনা। Zeno'র প্যারাডক্স-এর ভিত্তিই এইখানে ছিল, যে, একটা প্রশেস যা এক ও অখণ্ডনীয়, তাকে টুকরো টুকরো করা হয়েছিল। যাই infinitesimal-এ ভাগ করা হয়ে গেল রাস্তাকে ও কালকে, অমনি গ্রীশের দ্রুতগামী বীর আর কচ্ছপের নাগাল পেলেন না। অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে কাল ও রাস্তা আস্ত পদার্থ। আমার action-ই আমার যে জগৎ actual তা আমাকে দেয়। আমার মগজে যত জিনিসের রেজিস্টরি হয়েচে, তার মধ্যে আমার দেহও আছে—যেমন টেবিল, বেরাল ও নদী আছে। আমার দেহটিও যে টেবিল, বেরাল ও নদীর সমপর্য্যায়ভুক্ত তা খেয়াল করার আমার অবসর হয়নি, কেন না, এটার পা খসানো আর টেবিলের পায়া খসানোটা অবিকল একরূপ বোধ করি না বলে'। আমার দেহ হচ্ছে সেই সূচ্যগ্র যা জগৎ-রেকর্ডের গায়ে বিদ্ধ হয়ে চলে' চলে' আমার-জগৎ-গৎ বাজাচ্চে। আমার কাছে যখন এসপ্লানেডের ওখানে কোনও আপিশের বর্ণনা করা হয়, তখন এই রকমে সেকথা বলা হয় : "ঐ যে ধর্মতলার মোড় দিয়ে গিয়ে অমুক বাড়ি বাঁয়ে রেখে একটু এগিয়ে তালগাছটার সামনের সেই যে—।" অম্নি আমি আমার এই দেহটিকে এই বহরিয়া থেকেই ঐ মোড় দিয়ে মোড় ঘুরিয়ে ঐ রকমে এগিয়ে নিয়ে বাস এসে পড়লে আবার পেছিয়ে সেই তালগাছটার ওখানে খাড়া করলেই দেখি (যদিও এই পশ্চিমের বাড়ির পশ্চিমের ঘরেই থাকি)—সম্মুখেতে প্রসারিত, বৎস, জাতীয় কল্যাণ। (এই হচ্ছে স্মৃতির রহস্য) "জীবনের দরকার"বাদ কি এ হতে অনেক ফারাক ?

অম্নি বলা হবে, আমি যখন একটা stanza মনে আনতে চেষ্টা করছি, তখন ?—কে না পরীক্ষার হলে এই অভিজ্ঞতার সংগে পরিচিত হয়েছে, যে, stanza বা যুদ্ধের তারিখ মনে আনবার সংকট-মুহূর্তে আমি সেই হল থেকে মনোময় রথে আমার "লিংগ" শরীরকে আমার পড়বার টেবিলে নিয়ে গিয়ে সেই বইএর পাতাটি মনোময় হাতে ওলটাই—আমার প্রথম চেষ্টা হয় বইএর পাতার top bottom বা middle কোথায় কাঙ্ক্ষিত date বা stanza-টি আছে তা মনে আনতে, সংগে একথা মনে আনতে, বই খুলে ডাইনের page-এ তাকে পাব কি বাঁয়ের page-এ তাকে পাব ? আইডিয়া

এই : এখানে আমার দেহ ও তার কোনো action, involved আছে। কোনও শব্দের বানান মনে আনবার জন্যে, আঙুল দিয়ে হয় শূন্যে বা টেবিলে সেই শব্দটা একবার লিখে ফেলা যে মহা সহায়ক এ কে না জানে ?

একটা অবস্থার মধ্যে পড়লে সে অবস্থায় বাঁচবার জন্য কি করা আবশ্যক, দেহকে কি ভাবে চালিয়ে কি ভাবে কোথায় স্থাপন করা দরকার, তা যদি প্রতিবারে উদ্ভাবন করে' নিতে হয়, তবে আর জান টেঁকে না। অতএব, স্মৃতি। 'নাম' হচ্ছে সেই লাল ফিতে যার দ্বারা পুরাতন অভিজ্ঞতার কাগজগুলোকে 'ফাইল' করা হয়েছে। 'মংগলকান্দি' বললে একটি গ্রাম বোঝায়। কোনও ব্যক্তির পক্ষে এ নামটি অসংখ্য অভিজ্ঞতার একটি বাণ্ডিল—একটি কদলীর কাঁদি যেন—সে মর্তমানই হোক, কি আঁটিয়া কলার কাঁদিই হোক। কিন্তু যখন বলা যায় 'লণ্ডন', তখন আমাদের অনেকেরই এ সম্বন্ধে এই রকম কোনও স্মৃতি নেই, যে, ওখানে দেহকে নিয়ে গিয়ে দিগ্‌বিদিকে চালনা করেছিলাম বা বিশেষ বিশেষ অবস্থায় স্থাপন করেছিলাম। ও সম্বন্ধে কোনও অতীত অভিজ্ঞতা আমাদের চিত্তে মুদ্রিত নেই। তবু লণ্ডন সত্য। যেমন 'চেক' মুদ্রা না হ'লেও সত্য। কেন সত্য ? না, ওর দ্বারা কাজ চালাতে পারি। এখন যদি আবার সমুদ্রযাত্রা বন্ধ হয়, তবে আজ থেকে তিন চার পুরুষ পরে যে-সকল বাঙালী হিন্দু বাঙলা মাসিকে লণ্ডনের টোপোগ্রাফি সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখবেন, সেগুলো-ও হয়ত মিথ্যা হবে না—Currency যখন inflated (?), তখন-ও কাজ চলে' না যায় যে তা নয়, যেমন বংগীয় ধর্মপ্রসংগ ঐরকম ভাবে চলে' যায়। কিন্তু ঘটনা আর একটু সংগীন হয়ে ওঠার সম্ভব। Archbishop Trench কেবল মাত্র শব্দতত্ত্ব দ্বারা প্রমাণ করেছেন, অন্তত মানবেতিহাসে devolution ঘটে' থাকার প্রমাণ দেদার। একজন বাঙালী খৃষ্টান ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একবার শোনা গিয়েছিল, যে, সাঁওতালীদের ভাষা অন্তত সাক্ষ্য দেয়, যে, তারা সভ্য অবস্থা থেকে অসভ্য অবস্থায় নেমেছে। কোনও কোনও অসভ্য-জাতীয়দের ভাষায় এমন কতগুলো শব্দ পাওয়া যায়, বাঙলায় যেমন 'তুরীয়', 'বিভুচৈতন্য' বা 'অচিন্ত্য ভেদাভেদ' পাওয়া যায়। কোনও অসভ্য-গণ যখন 'আতাহোকন্' বলে, তখন হয়ত এমন একটা কথা বলে যা কোনও পুরাকালে নির্গুণ বা সগুণ কোনও ব্রহ্মকে বোঝাত'—আজ ঐ শব্দটি তাদের ব্যবহারে একেবারে শূন্যগর্ভ। যেমন এমন একটা কাগজমুদ্রা যার পশ্চাতে কোথাও কোনও আনুপাতিক মূল্যের স্বর্ণ জমা নেই। এ স্বর্ণ হচ্ছে অভিজ্ঞতার স্বর্ণ। প্রাগ্‌মাটিস্‌ম্‌এর আর যা-ই ত্রুটী থাক না থাক, 'অভিজ্ঞতা'র ওপরে এই যে emphasis, এই হচ্ছে এর এক বড় কাজ।

আচ্ছা, এটা কোন অভিজ্ঞতা ? :—

"বংশীগানামৃতধাম, লাবণ্যামৃতজন্মস্থান
যে না দেখে সে চাঁদবদন।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ুক তার মুণ্ডে বাজ
সে নয়ন রহে কি কারণ॥
...অমৃতের তরংগিণী,
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।

কাণাকড়ি ছিদ্র সম, জানিহ সে শ্রবণ,
তার জন্ম হৈল অকারণে।

* * *

তার স্বাদু যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেক-জিহ্বা সম।

* * *

হেন…গন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান॥
…কোটি চন্দ্র সুশীতল
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি,
তার স্পর্শ নাহি যার, সে যাউক ছারখার,
সেই বপু লৌহসম জানি॥"

সমস্যাটার চেহারা এই: এই যে অভিজ্ঞতা, এটা কি আমরা 'create' করি, না 'discover' করি। যদি শুধু 'create' করি (এবং তা create করা সম্ভব, এবং এ জানে না কে, যে, আমরা যা কিছু invent করেছি তাতে কাজ চলে' যায় বলে'ই তা আবার patent করেছি), তা হ'লেও সে যে মিথ্যা তা নয়। জড়বিজ্ঞান যেখানে এসে পেঁাছেচে, তাতে, কি যে আমরা construct করেছি, আর কি যে গোড়া থেকে আমাদের সৃষ্টি-নিরপেক্ষ-ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, এবং আমরা যখন সবান্ধবে মুছে যাব তখনও ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে, তা বলা দায় হয়ে উঠেচে। কিন্তু আমাদের সমস্ত "আত্মা" (ইনি লেখকের নিকট অসভ্যের 'আতাহোকন্-বৎ) প্রাক্-কথিত অভিজ্ঞতাটাকে কলম্বস্ যে ভাবে আমেরিকাকে পেয়েছিলেন, সে ভাবে পেতে ইচ্ছুক। বর্তমান লেখকের পক্ষে এটা বিশ্বাস করা অত্যন্ত সহজ, যে, অরণ্যমধ্যে ধ্রুব শ্রান্ত হয়ে ক্রোড়ধৃত হয়েছিলেন। বার্ণার্ডশ-এর পক্ষেও বিশ্বাস করা শক্ত হয় নি, যে, সেণ্ট্ জোয়ান্ বাণী শুনেছিলেন। মনোবিকলন ও-ঘটনাটার ব্যাকরণ দিতে পারে, এবং যে কোনো ফোর্থ্ ক্লাসের ছোকরা জানে, একটা কিছু'র ব্যাকরণ বলাই তার শেষ কথা বলা নয়। বর্তমান লেখকের পক্ষে একথাও মানা সহজ, যে, দেবতাগণ সংস্কৃতে এবং ফেরেস্তাগণ আরবীতেই কথা বলেন, যদি তাঁদের একে অন্যের স্বাস্থ্য-সমাচার পুছবার দরকার উপস্থিত হয়: আর এ কথা সেই মনোভাব থেকেও বলা হচ্ছে না, যে স্পিরিট্‌এ প্যাক্ট প্রভৃতি দলিল প্রস্তুত হয়। সেই স্পিরিট থেকে বলা হচ্ছে, যে স্পিরিট-এ রবীন্দ্রনাথ কানাডায় ঘোষণা করেছিলেন, যে, তিনি তাঁর নাছোড়বান্দা কোনও গল্পশুশ্রূষু ক্ষুদে আত্মীয়ের জন্য মুখে মুখে যে বাঘের কথা বলেছিলেন যাকে শেষ পর্যন্ত আর কি করবেন ঠিক করতে না পেরে সাবান মাখাতে হয়েছিল, সে অসম্ভব সাবানের দ্বারা 'ম্রক্ষিত' সেই অসম্ভব শার্দূল বিধির জন্তুশালায় চিরতরে 'সঞ্চিত' হয়ে গেছে: সে অবাস্তব নয়, তবে তার রি-আলিটি আলিপুরের রি-আলিটি থেকে স্বতন্ত্র 'order'-এর এই মাত্র। অন্তত, তাঁর নাতি বা নাৎনী শ্রোতাটির পক্ষে সত্য ছিল যে, তাহা আমাদেরও কাছে স্পষ্ট। এখন সেই নাতি বা নাৎনী যদি কখনও কোনও দিন চিড়িয়াখানায় বা জংগলে সেই শার্দূলকে সনাক্ত করতে

চায়, তবে তার যে তাদৃশ ঔৎসুক্য, আমাদেরও সত্য সম্বন্ধে সেই ঔৎসুক্যটি থাকল। গল্পের বিদূষক practical jokes-এর দণ্ড-স্বরূপ গ্রাবাদেশে খড়ের ঘা খেয়েছিল, তাতেই তার কাজ চলে' গিয়েছিল—আর কুঠারের দরকার হয় নি—এ মানি। কিন্তু, কাজ চলুক, খড় কি কুঠার। প্রাগ্‌মাটিস্ট যে-ঈশ্বরকে মানেন, সে-ঈশ্বরে আমাদের সকলের চলবে কি? অনেক auto-erotic আছেন, যাঁদের এরোটিক অভিজ্ঞতা অপর যে কোনও কিসিমের প্রেমপিপাসুর সমানই। কিন্তু তার OBJECT?

অরণ্য

শ্রীগৌরগোপাল মুখোপাধ্যায়

পাতা-ঝরাণোর বেলা এলো আজ
ঘনালো অস্ত বসন্তের
রঙের আগুন পুড়ে কালো অঙ্গার।
চিল-ওড়া এই বিবাগী দ্বিপ্রহরে
কাল-স্রোতনার থেমে-আসা কম্পন
চকিত হাওয়ার উন্মাদ ঘূরণীতে
চমকি' চমকি' উঠে—
মৃত্যুর সুচিকেন্দ্রতে এসে স্পন্দিত হ'ল যেন
ভুলে-যাওয়া কতো দুঃসহ ভালোবাসা
বোবা বেদনার ভিড়-করা সমারোহ।
পিঙ্গল-পীত-পাণ্ডুর-পাতাছাওয়া
ছায়াহীন আজ তৃণহীন বনভূমি
কতো স্বপনের রচিল চৈত্রচিতা।
সাবধানে চলো, চলি।

ভুলেছ কি সখি সেই সেদিনের কথা
ঢেউলিয়া মনে জোয়ার বসন্তের
রিক্ত শাখায় কিশলয়-সমারোহ
বনাগ্রচূড়া বর্ণ-দীপান্বিতা?

চুম্বনে তব মহুয়ামুকুলমোহ
তনু-সৌরভ শালমঞ্জরী-ছোঁওয়া
কামনার তাপে কবোষ্ণ করতল
অতল চোখের সাড়াজাগানিয়া চাওয়া।
অলকপ্রপাত কেতনের মতো ওড়ে
শীকরের কণা তপ্ত কপোলে লাগে
কম্পন জাগে দুরু দুরু হিয়ামাঝে
কাঁপে ক্রন্দসী প্রলাপ-গুঞ্জরণে।
ক্ষণবিন্দুতে স্তম্ভিত মহাকাল
অনাদি অনন্তে পৃথ্বী ধ্বনিত হয়
ভুলিব না কভু বাতুল প্রতিজ্ঞায়
হানে অজানিতে বিস্মৃতি-পারিজাত।

আজ চলে গেছ দূরে।
বীতপত্র অরণ্যের পঞ্জর মর্ম্মরি'
স্মৃতির সহসা শিহরণে
অস্তিত্বের ব্যথাবাষ্প কাঁপে আজ উদাস দুপুরে।
নগ্ন ঐ শিমূলশিখায় ঘনাইল রক্তিম আভাস॥

পশু

শ্রীসুশীল জানা

বাঁধটা নদীর ধারে নয়—যেন চরের ক'টি প্রাণীর মনের ওপর দিয়ে চলে গিয়েচে। বর্ষার ভরা নদী পরিপূর্ণ জোয়ারে দিক্‌চিহ্নহীন জলরাশি নিয়ে বাঁধের গায়ে এসে যখন ঘা মারে তখন সে ঘা প্রতিধ্বনি তোলে সকলের বুকের মধ্যে। নিতান্ত শিশুর চোখও শংকায় কালো হ'য়ে ওঠে; গেল বুঝি বাঁধ ভেঙে—স্রোতের বেগে ঘর-বাড়ী, মাঠভরা কচি ধানের অনাগত স্বপ্ন, জীবিকা-জীবন জলোচ্ছ্বাসে সব কোথায় নিয়ে যাবে ভাসিয়ে—নিরুপায় অসহায় জোড়া জোড়া চোখ কল্পনাও ক'রতে পারে না।

রূপসী খালের মুখে মাছ পড়ে খুব—বিহারীর তাতে চলে যায়। কিন্তু চরই যদি ভেসে যায়—তা হ'লে আর চলে কি ক'রে! বিহারীর দুশ্চিন্তাটা সেই জন্যে।

বিহারী ব'ললে, অন্য কোথাও চলে যাবো ভাবচি। ভয়ে ভয়ে কতদিন আর থাকা যায়! অসহায় চোখ মেলে নদীর দিকে তাকিয়ে রইল বিহারী অন্ধকারে—ব'ললে, কিন্তু কোথায় যে যাই।... সরকারী বাঁধের কতদূরে গাঙ ছিল—এখন সেই বাঁধই বা গেল কোথায়, কোথায় গেল পুবচর—বাকী চরটুকুন আর কদিন! বাঁধের যে অবস্থা—

বিহারী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বাঁধের দিকে তাকাল। বাঁধটা সাপের মত এঁকে বেঁকে দূরে অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েচে। বাঁধ যেখানে ধ্বসে ভেঙে পড়েচে, বর্ষার জলে যেখানে গর্ত্ত হয়েছে গভীর—অন্ধকার সেখানে ঘন হয়ে আছে। সংস্কার অভাবে বাঁধের অবস্থা শোচনীয়। চরের মালিক এ চরের কোনো আর প্রত্যাশা রাখে না—কিন্তু মাথা গুন্‌তি ক'টি ঘর চাষীর দিন-রাত্রি এই ভাঙন চরের মাটির সংগে মিশে আছে মাটি হ'য়ে। বাঁধে তারাই মাটি ফেলে যা পারে আর হতাশ দৃষ্টি মেলে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে নদীর দিকে তাকায়। চরের মালিকের কর্মচারী আছে একজন—খাজনা আদায় করে আর থাকে সংস্কারহীন চুণবালি-খসা কাছারীবাড়ীতে।

মাটির ঢেলা একটা পড়েছিল সুমুখে—আর বিহারীর পায়ের কাছে বাঁধের ওপরে ছোট একটা গর্ত্ত। বিহারী একমনে মাটির ঢেলাটা দিয়ে গর্তটা বুজিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল। জোয়ারের জল বাঁধের নীচে এসে ছল ছল করছিল—বিহারীর হাত থেকে মাটির ঢেলাটা হঠাৎ গড়িয়ে গিয়ে জলে পড়ল। হতাশ বিহারী সেই দিকে তাকিয়ে রইল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে চন্দ্রর দিকে তাকাল। চন্দ্র চুপ ক'রে ব'সেছিল পাশে।

বিহারী বললে, তুই তো বাবুদের বাড়ীতে আছিস—হঠাৎ এমন দিনে ছোটবাবু এলো কেন জানিস? এবার বাঁধটার ভালো ব্যবস্থা কিছু করবে নাকি?

গুজবটা সেই রকমই বটে হঠাৎ নীলকান্তর আবির্ভাবে। শুনেচে চন্দ্র—মাথা নেড়ে সে সায় দিলে। চন্দ্র বোবা বটে কিন্তু কালা নয়।

বিহারী বললে, নিজের চোখেই দেখুক আমাদের অবস্থা। চর নয় তো—শ্মশান। বিহারী

চরের দিকে ফিরে তাকাল। বহু দূরে দূরে গুটি কয়েক কুঁড়ে ঘর ছড়ানো, লম্বা নারিকেল গাছের পাতায় পাণ্ডুর জ্যোৎস্না ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েচে, এখানে ওখানে হাবলী আর বন ঝাউয়ের জংগল—সমস্তটা কেমন অপূর্ণ, ধূ ধূ করচে—এর মাঝখানে কুঁড়ে ঘরগুলিকে কেমন যেন ভারী অসহায় দেখাচ্ছে, ভারী খাপছাড়া।

জোয়ারের জল বাঁধের ওপর থেকে ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছিল। কাকজ্যোৎস্নার রহস্যময় রাত্রি—আর সেই নিঃশব্দ আলো-আঁধারিতে বহুদূরব্যাপী পাণ্ডুর জলধারা, মাঝে মাঝে বহুদূরের হঠাৎ জলোচ্ছ্বাস তাকে যেন কোনো দুর্জ্ঞেয় শংকার গভীরতায় আরও রহস্যময় করে তুলেছে। বাঁধের বাইরে শূন্য চর ধূ ধূ করছে—কোথায় পোড়ো ঘরের ঢিপির মাটি মাথা উঁচু করে আছে—মাঝে মাঝে খাপছাড়া ভাবে এক একটা বাবলা গাছ বেঁকে দাঁড়িয়ে আছে—অন্ধকার সেখানে অদ্ভুত রকম গভীর। চন্দ্র নির্নিমেষে তাকিয়ে ছিল। এই নিঝ্‌ঝুম রাত্রির গভীর পরিবেশের মাঝখানে তার চোখের ওপরে, মনের ওপরে বহুদূর-বিস্মৃত অতীত আর নিরবয়ব ভবিষ্যৎ মুখর হয়ে উঠল। একদা তার শৈশবের শ্রী-সম্পদে ভরা স্মৃতিবিজড়িত পূর্বচর, বহু পরিচিত সুখ, বহু জন্ম আর বহু মৃত্যু দূর নদীর বুকে হু হু করে উঠল। হঠাৎ উদ্ভূত একটা অকারণ বেদনার আবেশে সমস্ত মন ভরে গেল চন্দ্র'র। এই গ্রাম্য চন্দ্র'র মনের মধ্যে রঙীন তুলি হাতে যে শিল্পী বহুদিন বহু ছবিই এঁকে এসেছে সে আজ বর্ণহীন পাণ্ডুর জ্যোৎস্নার ক্যান্‌ভাসে ছবি এঁকে চলল। দেয়ালে টাঙানো যেন কোন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর আঁকা কোন সুন্দর গ্রাম-প্রান্তের ছবি : তার মধ্যে যেন কোন জন্মান্তরের চেনা চেনা বহু সুখ দুঃখের পর্ণকুটিরগুলি, আকাশে উধাও পাখীগুলি, গাছপালা, তরংগায়িত জলে অস্তদিগন্তের তরললাল রঙটিও সুদূর গভীর জলতল থেকে তাকিয়ে আছে চন্দ্র'র দিকে। বর্তমানের সমস্ত উপস্থিতি সে ভুলে গেল। একটা নিরবশেষ জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে অবশিষ্ট গ্রামটুকুও কোথায় ডুবে গেল। অতল জলরাশির ওপরে তারাগুলি শুধু চেয়ে আছে। তারই মাঝখানে নিঃশব্দ অন্ধকার ভেঙে হয়ত কোন দিন দু-একটা হাটুরে নৌকা ছপ্‌ ছপ্‌ করে এই চরের ওপর দিয়েই দাঁড় বেয়ে চলে যাবে অথবা ঠিক এইখানটাতেই কোনো দিন যদি আবার চর জেগে ওঠে, শ্রী-সম্পদে নতুন কোনো গ্রাম গড়ে ওঠে—সেদিন এই পুরোনো চরের অসংখ্য স্মৃতিসুন্দর দিন তাদের মনের কোনোখানেই হয়তো থাকবে না—কোথায় তারা নিঃশেষে হারিয়ে যাবে ; নতুন ছেলে-মেয়েদের চোখে তখন নতুন চর, নতুন এক দিন। কেমন একটা মিষ্টি অথচ নিষ্ঠুর বেদনার আবেশে চন্দ্র ঘুমিয়ে পড়ল সেই বাঁধের ওপরেই।

বিহারীরও ঘুম আসছিল—একটা হাই তুলে উঠে বসলো সে। ইতিমধ্যে ভাটায় অনেকখানি জল কমে গিয়েছে। হঠাৎ চোখ পড়তে সভয়ে বিহারী উঠে দাঁড়াল। একটা মস্ত কুমীর তাদের দিকে মুখ করে কাদার উপর দিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসচে। বিহারী একবার চন্দ্র'র ব্যথাকাতর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকাল, তারপর একটু ইতস্তত করলে। তারপর বাঁধের নীচে নেমে সোজা রূপসী খালের দিকে চলে গেল। ভোরে নিশ্চয়ই চন্দ্রকে আর খুঁজে পাওয়া যাবেনা—মনে মনে ভাবলে বিহারী—মরুক চন্দ্র।

কিন্তু চন্দ্র মরল না। জেলেদের দল বাঁধের উপর দিয়ে রূপসী খালের দিকে যাচ্ছিল—তাদের চেঁচামেচিতে কুমীরটা জলে গিয়ে পড়ল, চন্দ্রও ঘুম ভেঙে উঠে বসল।

জেলেদের মধ্যে একজন বললে, খেত আজ তোকে কুমীরে। বাবুদের অতো বড় কাছারীবাড়ি সেখানে তোর শোবার জায়গা হয় না রে চন্দ্রা! আন্তরিক বিরক্ত হয়েই বললে, প্রায় দেখি তোকে বাঁধের ওপরে একলা এসে বসে থাকিস। খাবে একদিন তোকে কুমীরে।

চন্দ্র স্বধু হাসলে। জেলেদের সংগে খালের ধারে এসে পৌঁছল। রাত প্রায় তখন শেষ হয়ে এসেছে। ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি নামল।

মাছ ধরার জন্যে জেলেরা খালের মুখ জুড়ে জালের পর জাল পেতে গিয়েছে। জাল আর মাছ চৌকি দেওয়ার জন্যে তালপাতা ও সামান্য খড় দিয়ে খালের ধারে ধারে টঙ বেঁধেছে জেলেরা—ভেতরে দুজন মানুষ কোন রকমে শুয়ে থাকতে পারে। হঠাৎ বৃষ্টি নামতে চন্দ্র একটা টঙের ঝাঁপ তুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

ভেতরে বিহারী শুয়েছিল। ঝাঁপ তোলার শব্দে ঘুম ভেঙে গেলে তার, উঠে বসল সে। ঝাঁকড়া চুল দেখে চন্দ্রকে চিনল বিহারী, মুখে তার আর কোনো কথা জোগাল না—চুপ ক'রে ব'সে রইল। চন্দ্র অস্ফুটকণ্ঠে একটু হাসলে—সে হাসি যেন চাবুক কষাল বিহারীকে। ব'সে ব'সে সে উস্‌খুস্‌ ক'রতে লাগল—তারপর ম্লানকণ্ঠে বললে, বাইরে যাই চল চন্দ্র।

চন্দ্র কিন্তু চেপে বসল। আকাশের দিকে সে আঙুল তুলে দেখাল—বাইরে অন্ধকার ক'রে জল নেমেচে।

বিহারী আবার উস্‌খুস্‌ ক'রতে লাগল। হঠাৎ জোর ক'রে কথায় উৎসাহ টেনে ব'ললে, চল চল—হ্যাঃ, ও আবার বিষ্টি! চল, দেখি কি রকম মাছ পড়ল?

কিন্তু চন্দ্র ওঠবার কোনো লক্ষণ দেখাল না—বিহারী বৃথাই তাকে বার বার বাইরে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা ক'রতে লাগল। রাগ হ'লো তার চন্দ্রর ওপরে এবং রাগটা গিয়ে পড়ল ঘুমন্ত বাসির ওপরে। একটা পরপুরুষের সুমুখে বিশ্রী ভাবে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকতে লজ্জা করে না তার—এমনি বেহায়া বজ্জাত মেয়েমানুষ সে!...বিহারী বউএর চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলল এক ঝটকায়। বাসি উঠে ব'সে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। ভালো ক'রে ভোর তখনো হয় নি। তবু ক্রুদ্ধ বিহারী বাসিকে একটা ধাক্কা দিয়ে ব'ললে, কখন ভোর হ'য়ে গিয়েছে—তোর এখনো ঘুম!...

বিহারীকে হাতে ধরে টেনে আনলে চন্দ্র—হেসে খুসীতে পিঠ চাপড়ে দিলে তার। এতদিন বাসিকে ঘরে তালাবন্দ ক'রে বিহারী এখানে আসত মাছ চৌকি দিতে: চন্দ্র কতদিন এই অনুযোগ শুনেছে বাসির মুখে আর বিশ্রী অস্বস্তিতে সমস্ত মন তার ভরে গিয়েচে। চন্দ্রর এই দুর্বল স্থানটায় আঘাত দেওয়ার জন্যেই নিষ্ঠুর বিহারী বাসিকে কতকটা অকারণেই যেন নানা ভাবে ক'রেচে নির্যাতন। বোবা চন্দ্র বুঝেচে সব—অনেক কথা সে বলতে চেয়েচে বিহারীকে, কিন্তু বোবার ভাষা বোঝে না বিহারী; যন্ত্রণায় ছটফট ক'রেছে চন্দ্র। আজ বাসিকে বিহারী খালধার পর্যন্ত সংগে এনেছে দেখে খুসীতে ভরে গেল চন্দ্রর মন—মুহূর্তে বিহারীর বহুদিনের সমস্ত অপরাধ সে ক্ষমা ক'রে ফেলল। এমনি ক'রে ধীরে ধীরে একটি সুন্দর গৃহজীবন গড়ে তুলুক ওরা। চন্দ্র হাসি মুখে ভাবলে: বউকে এনেচে সংগে—পাছে জানতে পারে কেউ, তাই বিহারী তাকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে জন্যে টানাটানি করছিল।

চন্দ্রের হাসি দেখে বিহারী কিন্তু ক্রমশ গরম হ'য়ে উঠল রাগে, অপমানে। কে তার মত খালধার পর্যন্ত বৌকে সংগে ক'রে আনে! প্রকাশ্যে গম্ভীর হ'য়ে বললে, হাস্ চন্দ্র হাস্—আমার মত গরীব হ'লে বুঝতিস্, কেন এই খালধারে টঙের মধ্যে বৌকে নিয়ে মাথা গুঁজতে হয়েচে, কাল সন্ধ্যের ভারী জলটায় ঘরের পূব দেয়ালটা হঠাৎ ধ্বসে পড়ে গেল। পড়বে না—চালে খড় থাকলে তো? সারাটা রাত এই টঙের মধ্যে কি কষ্টে যে কাটিয়েছি দুজনে—সে ভগবান জানেন।

চন্দ্র ফের ফিক্ ক'রে হাসল। বিহারী চটে ব'ললে, বিশ্বাস হচ্ছে না—না?

বিশ্বাস না হওয়ারই কথা। বিহারীর ঘর দিব্যি খাড়া হ'য়ে আছে—কোনো পাশের দেয়ালই ধ্বসে পড়েনি : চন্দ্র আসবার সময় দেখে এসেচে।

চন্দ্রর ক্রমাগত হাসিতে বিহারীর আর ধৈর্য্য রইল না। তাকে আঘাত দেওয়ার জন্যে বিহারী তার পুরোনো পথ ধরলে। বাসি পেছনে চুপ ক'রে ব'সে ছিল—তাকেই দাঁত খিঁচিয়ে বিহারী বললে, বসে আছিস যে! একটু তামাক—সে কি আমাকেই সেজে খেতে হবে? বিহারী চড় তুললে বাসিকে মারবার জন্যে—চন্দ্র হাত ধরে ফেললে। বেচারী রুগ্ন বিহারী—চন্দ্রর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল মাছ কি রকম পড়েচে দেখতে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে জাল তুলে টঙের মধ্যে ফিরে এসে গুম্ হ'য়ে ব'সে রইল বিহারী। যে জাল তার খালের মুখের খানিকটা অংশ জুড়ে পাতা ছিল—সেটা ছিঁড়ে কুটি কুটি ক'রে দিয়ে গিয়েচে কে! বিহারীর শীর্ণ তোবড়ানো মুখে যেটুকু লালিত্য ছিল—শেষ রক্তবিন্দুটির সংগে কে যেন তা' নিংড়ে নিয়েচে।

ছেঁড়া জালটাকে হাত দিয়ে নাড়তে নাড়তে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিহারী ব'ললে এ ক'দিন সকলের চেয়ে আমারই মাছ পড়ছিল বেশী—হিংসেয় কে আমার সর্ব্বনাশ ক্'রে গেছে! এখন পেট চালাবো কি ক'রে?

অসহায় বিহারীর দিকে তাকিয়ে রইল চন্দ্র। এই লোকটা সত্যিই কি ক'রে এর পরে দুবেলা দুমুঠো খাওয়ার যোগাড় ক'রবে—সে ভেবে পেল না। চরের সব জমি ওর নদীতে গিয়েচে। অভাবে গরুগুলো আগেই বেচেছে। খাটবার শক্তি নেই—জালের ওপরে ভরসা ক'রে কোনো রকমে চালিয়ে আসচিল এতদিন—শেষে তাও গেল। আবার একটা নতুন জাল কিনতে বা তৈরী ক'রতে টাকা লাগবে তো—কিন্তু কোথায় পাবে ও টাকা?

বর্ষার খোরাকী ধান কেনার জন্যে তিনটে টাকা ট্যাঁকে গোঁজা ছিল চন্দ্রর। সেইটে সে বিহারীকে দিতে গেল। কিন্তু বিহারী সে টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিলে—ব'ললে, কে চায় তোর টাকা! বেরো তুই—খবর্দার আর আসিস্ নি, এই শেষবার সাবধান ক'রে দিচ্ছি।

চন্দ্র থতমতো খেয়ে বিহারীর দিকে তাকিয়ে রইল।

বিহারী তার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে ব'ললে, সত্যি বল্ দিকিন—তুই জাল ছিঁড়িস্ নি, আমার সর্বনাশ করিস্ নি?

হতভম্ব চন্দ্র সমস্ত অস্বীকার ক'রে আস্তে আস্তে মাথা নাড়লে। বিহারীও সংগে সংগে মাথা নেড়ে নেড়ে বললে, না—বুঝতে পারি নি কিছু আমি! বাসি তামাক সেজে এই সময়ে সুমুখে

আসতেই—হাতের কাছে যে বাঁশের গোড়াটা পড়েছিল—সেইটে নিয়ে বিহারী লাফিয়ে উঠল। চন্দ্র ধরে ফেললে তাকে।

বিহারী বললে, ছেড়ে দে তুই, ওই রাক্কসীই যতো নষ্টের গোড়া। আমার সর্ব্বনাশ ক'রে আবার তুই আমাকে টাকার লোভ দেখাস ?

গোলমাল চেঁচামেচিতে জেলেরা একে একে এসে জমা হয়েছিল। তাদের দিকে তাকিয়ে চন্দ্রকে দেখিয়ে বিহারী বললে, ঘুষ দিয়ে আমার মাথা কিনবে ! টাকা দে তোর ওই বাসিকে—যার জন্যে এই সর্ব্বনাশ ক'রলি আমার।

চন্দ্রকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বাসির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিহারী। ধূলিলুণ্ঠিত অর্দ্ধনগ্ন বাসি—সমস্ত শক্তি দিয়ে অসহায় আর্তনাদ করচে ; বিহারীর হাত পা ছোঁড়ার তবু বিরাম নেই। বাসির দিকে তাকিয়ে উপভোগ্য হাসি হাসতে লাগল ক'জন—কয়েকজন চন্দ্রের সংগে গিয়ে বিহারীকে টেনে আনলে। তারপর বিহারী টঙের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। গায়ের কাপড়-চোপড় গুছিয়ে বাসি এক পাশে দাঁড়িয়ে ফোঁপাতে লাগল।

মাটি থেকে টাকা তিনটে কুড়িয়ে নিয়ে চন্দ্র চলে যাচ্ছিল—বাসি হঠাৎ তার সুমুখে ছুটে এসে বললে, তুই যাস্‌নি চন্দ্রদা—আমাকে মেরে ফেলবে, তুই যাসনি, যাসনি।

চন্দ্র থমকে দাঁড়াল। নিরুপায় শান্ত দৃষ্টিতে সে তাকাল বাসির দিকে—তারপর পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

ভারাক্রান্ত মনে চন্দ্র নিরুদ্দেশ ভাবে এখানে ওখানে ঘুরে ঘুরে বেড়ালে। আজই সকালে এই কিছুক্ষণ আগে বিহারীর ওপরে চন্দ্রর যে মন প্রসন্নতায় ভরে উঠেছিল, এত ব্যাপারের পর তার আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। বাসির ওপরে বিহারীর অনেক দিনের অনেক নির্য্যাতনের যন্ত্রণা আজ নতুন ক'রে জেগে উঠল আবার। নিজেকে তার ভারী অসহায় মনে হয়—ভারী একা। আজ তার চেয়েও বাসিকে বেশী অসহায় ব'লে মনে হলো। একটা ঠাণ্ডা করুণা হুহু ক'রে উঠল। বাসির বাপ মা তাদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলি নিয়ে অন্য কোন চরে চলে গিয়েছে—এখানে বাসি ভারী একা। চন্দ্র ঘরের দিকে ফিরল। ঘরে ঢুকে রান্নাঘরের দিকে তাকাতেই সে থমকে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে বাসি কখন এসে সোজা রান্নাঘরে ঢুকে দুধের ঘটিতে চুমুক দিতে সুরু করচে। তারপর জল ঢেলে কমতিটুকু পূরণ ক'রতে যখন সে ব্যস্ত, তখন তার ত্রিসীমানা থেকে চন্দ্র যেমনি নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে সরে পড়েচে।

কিন্তু পালাবার সুবিধে হলো না। যার ভয়েই সে পালাবার চেষ্টা করছিল—সেই বৌদি'ই পড়ল তার সুমুখে। ব্যাকুল আগ্রহে ফিরে তাকাল ঘরের দিকে চন্দ্র : এই মুহূর্তেই বাসি যদি রান্নাঘর থেকে কর্পূরের মতো উবে যেত। আজ একটা বিশ্রী কাণ্ড না ঘটে যায় না। বিব্রত চন্দ্র পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা ক'রলে। চন্দ্রের বৌদি' এই সোনা বাসিকে কোনো রকমে সহ্য ক'রতে পারে না—খুব ভালো ক'রে জানে চন্দ্র।

পালাচ্ছ যে। ছোটবাবুর চাকরী ক'রে বাবু হ'য়ে গেছ দেখচি একেবারে—লাটসাহেব। সোনা ভারী মিষ্টি হাসি হাসে—বললে, চল—দু'পার পথ নয়—ঘরে একবার দেখা দিয়ে যেতে

পার না। রোজ ভাবি আসবে। সোনা মুখ নীচু ক'রে বললে, বিহারীর বাড়ীতে নিত্যি দু'বেলা যেতে পার—আর—

গভীর অনুযোগের আন্তরিকতায় সোনা চুপ ক'রে গেল, কথার মাঝখানে কিন্তু তবু সে নীরবেই বললে অনেক। চন্দ্র কিন্তু পালাতে পারলে বাঁচে। ঠিক সেই সময়ে বাসি এল। সোনা তাকাল একবার চন্দ্রের দিকে তারপর বাসির দিকে—সে দৃষ্টিতে ঘৃণা আর বিদ্বেষ ধারাল হ'য়ে উঠল। সোনা যেন বুঝল—চন্দ্র আর বাসি কোথায় গিয়েছিল—কোথা থেকে তারা আসচে, চন্দ্রর ব্যস্ততা আর তার এড়িয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টার অর্থও যেন সে বুঝল। কিন্তু ওরা পরস্পর কথা বলে না—তবু ঝগড়া করে মাঝে মাঝে। বাসি নিঃশব্দে চলে গেল পাশ দিয়ে, সোনার দিকে একবারও সে তাকাল না। সোনা কিন্তু সাপের মত অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল তার দিকে। তারপর সে ফিরে তাকাল মুহূর্তের জন্য চন্দ্রর দিকে। মুখ নীচু ক'রে বললে, চল…ঘরে যাবে না…

চন্দ্র স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল।

সোনা বললে তেমনি মুখ নীচু করে, তোমার দাদা আজ সকালে কেশরগাঁয়ে গেছে…সেই কাল ফিরবে। রাত্রে কামিনীর মা শুতে আসতে পারবে না…তার মেয়ের জ্বর…

চন্দ্র এগিয়ে গেল এবার পাশ কাটিয়ে, হাতের ইঙ্গিতে জানিয়ে গেল : সে আবার ফিরে আসবে।

সোনা নিঃশব্দ হাসিতে হঠাৎ ঝলমল ক'রে উঠল, বললে, বেহালাটা সঙ্গে আনবে।

কেমন যেন খোসামোদের মত শোনাল সোনার কথাগুলো। কিন্তু চন্দ্র বেহালা বাজায় ভাল। যাত্রার দলে বাজায় সে। ছিপছিপে ঋজু দেহ চন্দ্রর, মাথায় লম্বা কোঁকড়ান চুল। চোখে মুখে, সর্বাংগ জুড়ে কোথায় যেন খানিকটা ঔদাসীন্য অসাধারণত্ব আছে…যা লোভী ক'রে তোলে, আকর্ষণ করে। যাকে ভয় করে সোনা—অথচ দূরে ঠেলে রাখা যায় না, ভাল্লোলাগে…খুব ভালোলাগে। বোবা চন্দ্র লোকটার বেহালা কথা বলে…সে কথা ব্যথাকাতর, রহস্যময় ; অনেক যেন বোঝা যায়… আবার কিছুই যেন বোঝা যায় না। সোনা শোনে : সমস্ত অংগ-প্রত্যংগের গ্রন্থিগুলো যেন হঠাৎ কিসের আবেশে আলগা হ'য়ে হ'য়ে যায়। মুখ নীচু ক'রে ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করে সে : বোবা লোকটা হঠাৎ কি যেন কথা কয়ে উঠবে।

সোনাকে এড়িয়ে চন্দ্র খানিক দূরে এসে দেখল : বাসি দাঁড়িয়ে আছে দূরে—একটা নারিকেল গাছের আড়ালে। তাকেই খুঁজতে খুঁজতে নিশ্চয়ই এসেছিল বাসি—তারই অপেক্ষা করছে নিশ্চয়ই। কিন্তু ফিরে তাকিয়ে পেছনে দেখল চন্দ্র, সোনা কুটিল দৃষ্টিতে তখনো তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাঠে নেমে সে হাঁটতে লাগল—পথ ধরে যেতে আর সাহস হলো না।

ফিরে এসে চন্দ্র ছোটবাবু নীলকান্তর খানিকটা অনুযোগ শুনলো রাত থেকে এপর্যন্ত উধাও হওয়ার জন্যে। নীলকান্ত তখনও বিছানায় অসহায় ভাবে শুয়ে আছে। চা খাওয়া, মুখ ধোয়া, দাড়ি কামানো সব বন্ধ চন্দ্রর জন্যে। ছোটবাবু লোক ভালো—ছোকরা মানুষ, কলেজে পড়ে—

ছুটিতে চরে বেড়াতে এসেছে। বোবা চন্দ্র চাকরী ক'রে খুসী—খারাপ ব্যবহার করে না নীলকান্ত। চন্দ্র কাজে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ল।

বাসি এখানেও এলো। একে একে বলতে লাগল সে, চন্দ্রর চলে আসার পর বিহারী আবার কি ভাবে মেরেছে তাকে।

ছোটবাবু মুখ ধুতে গিয়েছে—ফিরে এসে দাড়ি কামাবে, চা খাবে। চন্দ্র গরম জল তৈরী করতে ব্যস্ত। নির্বিকার ভাবে সে মুখ ফিরিয়ে নিজের কাজেই ভোর হয়ে রইল—হ্যাঁ কতকটা জোর করে বৈ কি। নিরুপায় চন্দ্র যেন বোঝাতে চায়—বিহারী যদি তার স্ত্রীকে মারেই তাতে কি হাত আছে তার! ওর মধ্যে চন্দ্র আর নেই।

কিন্তু বাসি এ অবহেলা সইলে না—ফুঁপিয়ে উঠল সে। উত্তেজনায় হঠাৎ গায়ের কাপড় সে খুলে ফেললে—বললে, এই ছ্যাখ—কি রকম করে মেরেছে। হাঁটুর কাপড় তুলে দেখাল সে, এই ছ্যাখ—এই ছ্যাখ। পেট ভরে দুটি খেতে দেবে না, ঘরে বন্ধ করে রেখে যাবে—আমি আর পারি না—পারি না চন্দ্রদা'। এবার ডুবে মরব আমি।

বাসি ফোঁপাতে লাগল, নগ্ন দেহ কেঁপে কেঁপে উঠল প্রহারের লম্বা সরু লাল দাগগুলো নিয়ে। চন্দ্র বিব্রত হয়ে তাকিয়ে রইল। কেউ যদি এসে পড়ে ঠিক এই সময়ে! চন্দ্র চঞ্চল হয়ে উঠল। হাত নেড়ে, চোখের ইংগিতে বাসিকে সে চলে যেতে বললে।

কিন্তু বাসি বললে, আমি যাবো না—তোর কাছ থেকে আমি এক পা নড়ব না। আমাকে আবার মারবে। আমি যাবো না তোর কাছ থেকে—

এমন সময় নীলকান্তর গলা শোনা গেল খুব কাছে, চন্দ্র, জল গরম হলো রে?

আতংকিত চন্দ্র নিজের হাতেই ব্যস্ত হয়ে বাসির গায়ে কাপড় জড়িয়ে দিল। উনুন নিভে গিয়েছিল—ফুঁ দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে।

নীলকান্ত রান্নাঘরের দরজার সুমুখে এসে থমকে দাঁড়াল। বাসিকে দেখে এবং জলে ভেজা চোখ দেখে এখানকার কর্মচারীর মুখ থেকে শোনা চন্দ্র ও বাসি ঘটিত ব্যাপারটা মনে পড়ে গেল তার হঠাৎ। হাসি মুখে আন্দাজে বললে, এই বিহারীর বৌ না কি রে চন্দ্র?

চন্দ্র মাথা নেড়ে সায় দিলে।

—বাঃ, দিব্যি বৌ তো বিহারীর।

রুক্ষ চুল বাসির, সরু চুলের গুটি কয়েক গোছা এসে পড়েছে গালে আর কপালে—নির্য্যাতন-ক্লান্ত মুখটি সুন্দর বাসির, মুখের নির্বোধ গ্রাম্য চতুরতার ভাবটি আকর্ষণ করে। ওরা খুব গরীব—নীলকান্ত শুনেছে।

নীলকান্ত বললে আবার, আমার সব কাজ একা তো তুই পেরে উঠিস নে চন্দ্র। ওকে বল না, যদি থাকে। এক জন ঝিয়েরও তো দরকার আছে।

চন্দ্র ভারী খুসী হলো নিষ্ঠুর বিহারীর হাত থেকে বাসিকে রক্ষা করবার একটা পথ পেয়ে। সে শুধু হাসি মুখে তাকাল নীলকান্তর দিকে। নীলকান্ত বিরক্ত হয়ে বললে, তুই ব্যাটা আবার বোবা। আচ্ছা, আমি বিহারীর সংগেই কথা কইব এখন।

নীলকান্ত চলে গেল। যাওয়ার সময়ে চোখাচোখি হ'ল বাসির সংগে। নীলকান্ত নিঃশব্দে হাসল। বাসির মুখ আমেরিকান আপেলের মতো লাল হয়ে উঠল। বাসি দাঁড়িয়ে রইল মুখ নীচু করে। কেবলি তার মনে হতে লাগল: নীলকান্ত লোক ভাল নয়। কিন্তু খেতে পাবে পেট ভরে সে, দিন-রাত্রি পড়ে পড়ে মার খেতে হবে না।

তারপর দিন থেকে কাজে ভর্তি হয়ে গেল বাসি।

স্বয়ং নীলকান্তর প্রস্তাবে তারই সুমুখে ভীরু বিহারীর রাজী হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। জোর করে খুসী হয়ে সে ভীষণ কষ্ট থেকে উদ্ধার পেল বলে নিজের সৌভাগ্যোদয় সম্বন্ধে নীলকান্তর কাছে ভারী আনন্দের দু-একটা কথা উচ্চারণ করেছিল বটে, কিন্তু মনের মধ্যে সে বিষধর হয়ে রইল। বুঝল এ চন্দ্ররই কারসাজী, ভেতরে ভেতরে সে অন্য কোথাও—যে কোন চরে চলে যাওয়ার জন্যে উৎসুক হয়ে রইল, খোঁজ খবর নিতে লাগল।

বাসির সুন্দর রঙীন সাড়ী এলো। তারপর হঠাৎ চা খাওয়া ভয়ানক রকম বেড়ে গেল নীলকান্তর। চন্দ্র ভালো চা তৈরী করতে পারে না আর বাসি ক'রে ফেলে তেতো—তবু নীলকান্ত বলে, বাঃ—আ···। ভারী তৃপ্তি নীলকান্তর, তা হলেও অনবরত সে চা খেতে পারে না। হাতে কাজ নেই বাসির, কারণ নীলকান্তর ঘরের মধ্যেই খুঁটিনাটি কাজ করতে হয় তাকে। সে সব শেষ করতে কতক্ষণই বা যায়। পা বাড়াল বাসি নীচে যাওয়ার জন্যে। আর চোখে দেখল নীলকান্ত—তারপর নাকে অদ্ভুত একটা শব্দ করলে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে শুয়োরের মতো—বললে, স্যুটকেশে রুমাল আছে—বের করে দাও তো একটা। এইখানেই তোমার এতকাজ—বুঝলে, আমি আবার এমন অসহায় মানুষ—হাত পা থাকতেও নেই। নীচে তোমার যাওয়ার দরকার নেই। বাসির আর যাওয়া হয় না।

আর ওপরে চন্দ্রর আসা নিষেধ। কড়া হুকুম নীলকান্তর। বাসির সংগে মুখোমুখি আর দেখা হয় না চন্দ্রর। তবু হঠাৎ কখনো চোখাচোখি হয়—তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নেয় চন্দ্র, নিষ্পলক স্তব্ধ চোখে বাসি তাকিয়ে থাকে। নীলকান্তর চোখের সুমুখ থেকে, এই ঘর ছেড়ে ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হয় তার। তার জীবনের চারপাশ ঘিরে কেমন যেন একটা নতুন অপরিচিত পরিবেশ ঘন হয়ে আসছে—ভয় করে তার। নীলকান্ত লোকটা যত রাজ্যের দামী পোষাক পরে সাজান পুতুলের মত এক ভাবে কি করে ঘরের মধ্যে থাকে—সে ভেবে পায় না। ভয় করে বাসির বাবু নীলকান্তকে। নিজের কাপড়চোপড়গুলোকেও তার দামী মনে হয়—ভারী সন্তর্পণে সে পরে। মনে হয়—সেগুলো তার নিজের নয়। ক্ষতি হলে জবাব দিতে হবে। পরলেও হয়ত হঠাৎ কখন বকে বসবে নীলকান্ত। আর চন্দ্র সরে গিয়েছে অনেক দূরে।

খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিমছাম থাকে নীলকান্ত। হঠাৎ তার একি খেয়াল, চন্দ্রকে ছিন্ন মলিন বেশে থাকতে হবে আর সেই বেশে ডাকবে হঠাৎ কখনো সখনো তাকে নীলকান্ত তার নিষিদ্ধ ঘরে: চন্দ্র ভেবে পায় না এর অর্থ। রঙীন সাড়ী পরা বাসির সুমুখে আর সাজানো পুতুল ওই নীলকান্তর সুমুখে নিজেকে ভারী দীন মলিন মনে হয়। সংকুচিত হয়ে তবু তাকে যেতে হয়

নীলকান্তর ঘরে। নীলকান্ত কিন্তু ভারী খুসী হয় যেন। আজকাল নীলকান্তর মেজাজের হদিস পায় না সে।

সেদিন সন্ধ্যের দিকে বর্ষা নামলো ঘনঘোর হয়ে। কেমন ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীত লাগছিল চন্দ্রর। নীলকান্তরই একটা জামা গায়ে দিল সে। তারপর হঠাৎ সেদিন ডাকলো নীলকান্ত তাকে তার ঘরে। জামা পরা চন্দ্র ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো আজ কতকটা খুসী মনে। জামাটা ছেঁড়া নয়, হোক পুরোনো—নীলকান্তরই তো।

নীলকান্ত আপাদমস্তক তাকে দেখে জ্বলে উঠল। কর্কশ কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, এ জামা তুই পেলি কোথায়? এ তো আমি বিহারীকে দিয়েছিলাম।

চন্দ্র বাসির দিকে তাকাল। বাসি স্তব্ধ চোখে তাকাল নীলকান্তর দিকে। ভয়ে ভয়ে বললে সে, ওকে আমি দিয়েছিলাম।

নীলকান্ত বুঝল; বাসির হাতে দেওয়া বিহারীর জন্যে যে সিল্কের জামা দিয়েছিল সে—সেটা বিহারীকে না দিয়ে চন্দ্রকেই দিয়েচে বাসি। মুহূর্তে মাথার মধ্যে তার আগুন জ্বলে উঠল। তবু সে বাসির দিকে তাকিয়ে হেসে ভারী মিষ্টি করে বললে, বেশ করেচ। ভারী গরীব—খেতে পায় না, ভালো জামা পরবে কোত্থেকে। বেশ করেছ।—নীলকান্ত মুহূর্তে যেন সাজঘর থেকে রূপ বদলে এলো।

কিন্তু একটা ক্রুদ্ধ পশু বুকের মধ্যে গর্জন করচে নীলকান্তর। নীলকান্ত ফিরে তাকাল চন্দ্রর দিকে কঠিন চোখে। কাণ ধরে হিড় হিড় করে টেনে আনলে তার। দাঁতে দাঁত চেপে বললে, আজ সকালে বৈঠকখানায় বসেছিলাম—আমার চটি জোড়া সেইখানে ছেড়ে এসেছিলাম, সেটা কি সেইখানে থাকবে। রাস্কেল—শূয়ারকা বাচ্চা! খেয়াল আছে—টমি কুকুরটা একপাটি মুখে করে নিয়ে গিয়েছিল?

চন্দ্রর গালে সজোরে পড়ল চড়। ভীরু বাসি তাড়াতাড়ি মখমলের এক জোড়া চটি নীলকান্তর সুমুখে এনে রাখলো।

কিন্তু ক্ষিপ্ত ক্রুদ্ধ নীলকান্তর সেদিকে খেয়াল নেই। সে চায়নি, চন্দ্র খোঁজ করে চটি জোড়াটা গুছিয়ে রেখে যাক। নীলকান্ত একটানে চন্দ্রর গায়ের জামা ছিঁড়ে দিলে। লাথি মেরে সেটা দূরে সরিয়ে দিলে। উত্তেজনায় তারপর কাঁপতে কাঁপতে নিজের স্যুটকেশ থেকে নীলকান্ত একতাড়া নোট টেনে বের করলে। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললে, বেরো তুই—এক্ষুনি মাইনে মিটিয়ে দিচ্ছি তোর। এই নে—এই নে—এই নে—কত টাকা চাই তোর?

পাঁচ টাকা মাইনে চন্দ্রর, কিন্তু নীলকান্ত দশ টাকার নোটগুলো তার দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগল। তারপর ঘাড় ধরে বের করে দিলে ঘর থেকে তাকে। নিজেও বেরিয়ে গেল সে। হলে পায়চারী করতে লাগল নীলকান্ত। বাসির সুমুখে আর তার ছড়ানো ঐশ্বর্য্যের মাঝখানে শীর্ণ মলিন বোবা চন্দ্রকে পায়ে মাড়িয়ে যেতে ভারী তৃপ্তি পায় সে, আনন্দ হয় তার।

কিন্তু নীলকান্ত কেবল তৃপ্তিই পায় না, আনন্দই পায় না। মস্ত বড় নিঝ্‌ঝুম বাড়ীটার কোন এক কোণে চন্দ্রর বেহালা গুমরে গুমরে উঠচে অন্ধকারে। নীলকান্ত ঘুমুতে পাচ্ছে না, সহ্য করতে পারছে না। বাসির প্রতিটি কম্প্র নিশ্বাস, দীর্ঘশ্বাস সে শুনচে। ওই তো বাসি সন্তর্পণে বিছানা

থেকে উঠে ঘর থেকে পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেল। নীলকান্ত অনুসরণ করলে। বাসি সিঁড়ি দিয়ে নামচে। কোথায় যাবে ও?

নীলকান্ত বাসিকে পাশ কাটিয়ে ঝড়ের বেগে নীচে নেমে গেল।

—এই চন্দ্রা, দোর খোল—দোর খোল—

বেহালা থেমে গেল চন্দ্রর। দরজা খুলে দাঁড়াল সে—হাতে বেহালা। নীলকান্ত তার হাত থেকে কেড়ে নিলে সেটা। একটা আছাড়ই যথেষ্ট, কিন্তু বার বার আছাড় দিয়ে বেহালাটা গুঁড়োতে লাগল নীলকান্ত। বেহালাটা যেন জীবন্ত একটা কিছু। তারপর চন্দ্রর দিকে পাথরের মতো দৃষ্টি তুলে বললে চাপা গলায়, কাল যেন আর দেখতে না হয়।

নীলকান্ত চলে গেল। চন্দ্র পাথরের মূর্তির মতো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। একটা হারিকেন জ্বলছিল চন্দ্রর ঘরে—সেই স্তিমিত আলোয় নিজের ঘরের দিকে সে একবার ফিরে তাকাল। তারপর এগিয়ে গেল অন্ধকার বারান্দা দিয়ে। সিঁড়ির কাছে এসে একবার সে থমকে দাঁড়াল। নীলকান্তর ঘরের দরজা বন্ধ—তবু ভেতর থেকে একটু করুণ আর্তনাদ যেন ছিটকে বেরিয়ে এলো। মনে হলো একটা ক্ষ্যাপা পশু ফোঁস ফোঁস করে সারা ঘরময় যেন পায়চারী করে বেড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে তাও আর শোনা গেল না। বর্ষার গভীর রাত্রি নিঝুম নিঃশব্দ হয়ে এলো আবার।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল চন্দ্র সেইখানে। তারপর হঠাৎ সে সচেতন হয়ে উঠল সিঁড়ির ওপরে খস্ খস্ শব্দ শুনে। কে যেন নেমে আসচে সিঁড়ি বেয়ে। চন্দ্র এগিয়ে গেল আবার অন্ধকারে। নিঃশব্দে দরজা খুলে সে বেরিয়ে যাচ্ছিল—হঠাৎ কাপড় ধরে পেছনে কে যেন টানলে। চন্দ্র ঘুরে দেখল বাসি। চন্দ্রর সর্বাংগ কঠিন হয়ে গেল—যাওয়ার জন্যে আবার সে ফিরে দাঁড়াল। কিন্তু বাসি ঘন হয়ে এলো ওর সর্বাংগে—দুটি হাত তার আগ্রহে নিবিড় হয়ে গেল। সে ফুঁপিয়ে বললে, এখানে আমি আর পারি না চন্দ্রদা—এখান থেকে নিয়ে চল আমাকে—আমি পারি না আর।

বিপুল ঘৃণায় বাসিকে দূরে ঠেলে দিলে চন্দ্র।

বাসি তবু তার পা চেপে ধরে বললে, তোর সংগে আমি যাবো—আমি যাবো—

সজোরে পা টেনে নিলে চন্দ্র। তারপর বেরিয়ে গেল সে—অন্ধকারে মিশে গেল। বাসির গুমরাণো কান্নায় ঘুম কারুরি ভাঙলো না। ওপরে তখন নীলকান্ত দিব্যি ঘুমোচ্ছে।

নির্বিকার নীলকান্ত পরম ঔদাসীন্যেই বললে, দূর দূর, ওই একটা বোবাকে দিয়ে কাজ চলে নাকি! আর তা ছাড়া—নীলকান্ত একটু থেমে বললে, দেখতে ভিজে বেড়াল কিন্তু মহা বদমাইস। বিহারী যে ওকে খুন করে নি এতদিন—তাই রক্ষে।

চন্দ্রর চাকরী যাওয়ার ইতিহাস ও ইংগিত শুনে ভয়ানক খুসী হলো বিহারী। মাথা গুনতি কটা লোক চরের—তাদের কাছে ব্যাপারটার নতুনত্ব দুদিনেই ফুরিয়ে গেল। তারা সুখীও হ'ল না —দুঃখিতও হ'ল না। চন্দ্রর চাকরী যাওয়ায় চন্দ্রর দাদা বৈকুণ্ঠ একটু ক্ষুণ্ণ হ'ল বটে—সোনা কিন্তু ভারী খুসী। ঘরে থাকুক চন্দ্র—ঘরের অনেক কাজ হবে—বলে বোঝালে সোনা।

কিন্তু চন্দ্র ঘরে থাকে না। সারাদিন সে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় কোথায়—আবার অনেক রাত্রি

পর্যন্ত। সকলে যখন ঘুমায় তখন সে পায়চারী করে বেড়ায় রাত্রে—যেন ছটফট করে। তারপর সেই গভীর রাত্রে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। ওই তো সেই তালগাছটা—বাসিকে মনে পড়ে চন্দ্রর, অনেক রাত্রির অপেক্ষমান বাসি। কিন্তু নীলকান্তর ঘরে ছাড়া বাসিকে আজ আর কোথাও সে ভাবতে পারে না। ছোট্ট বাসি—ঝাঁকড়া কটা চুল মাথায় সেই ছোট্ট বেলার বাসি—সেও নীলকান্তর ঘরে। মাঠে, ঘাটে, কোথাও কোন স্মৃতির সংগে বাসিকে মনে পড়ে না তার আর। ঘৃণায় নাকটা তার কুঁচকে যায়, বিকৃত হয় মুখ, সশব্দে সে থুতু ফেলে ঘুরে দাঁড়ায়।

রাত্রে হঠাৎ কোথায় বেরিয়ে যায় চন্দ্র, অদম্য কৌতূহল নিয়ে অনুসরণ করে এসেছিল সোনা। হঠাৎ চন্দ্র ঘুরে দাঁড়াতে সোনা কাঠের মতো দাঁড়িয়ে রইল। চন্দ্র এগিয়ে এলো তার দিকে। সোনা তাকাল চন্দ্রর দিকে। অদ্ভুত দৃষ্টি চন্দ্রর ভারী অসহায়, আকর্ষণী, যে দৃষ্টির কাছে বহুদিন ধরে সে নিজে অসহায় হয়ে গিয়েচে, যে দৃষ্টিতে সমস্ত অন্তর উতরোল হয়ে ছোটে। সোনা দেখল: দাঁতে দাঁত চাপছে চন্দ্র, গালের পেশী কঠিন হয়ে উঠল, হঠাৎ চোখের দৃষ্টি হলো কঠিন। বিশ্রী যন্ত্রণা একটা চাপছে যেন সে। হ্যাঁ, বিশ্রী যন্ত্রণা চন্দ্রর ; সেই বাসি নীলকান্তর ঘরে—কিছুই যদি না সে শুনত, কিছুই যদি না জানত। মনে মনে ভাবলে চন্দ্র: বাসিকে সে ভুলবে একেবারে ভুলে যাবে। অনেক কাজের মাঝখানে সে ডুবে যাবে অথবা অনেক দূরে কোথাও চলে যাবে। কিন্তু দূরে কোথাও যাওয়া হলো না চন্দ্রর। বর্ষার দিন, মাঠের কাজে ডুবে গেল সে। বাসি—কিছুই তার আর ভাববে না, শুনবে না, দেখবে না আর। কিন্তু একদিন তবু সে জন্তুর মতো অন্ধকারে নীলকান্ত জানালার তলে গিয়ে দাঁড়াল, অদম্য কৌতূহল নিয়ে বহুক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে রইল, পেঁচার মতো তাকিয়ে রইল অন্ধকারে জানালার দিকে।

সহসা একদিন শোনা গেল: বিহারী কোথায় কোন নতুন চরে চলে যাবে—সব ঠিকঠাক। চন্দ্র শুনে বিহারীকে বুকে জড়িয়ে ধরল। তাকে শূন্যে তুলে হাসলে চন্দ্র—আনন্দ-উচ্ছল হাসি। বাসি চলে যাবে বিহারীর সংগে ওই নীলকান্ত লোকটার কাছ থেকে—ভারী খুসী হলো চন্দ্র।

কিন্তু সে খুসী হওয়া তার সাময়িক। বহুদিনের বহু পরিচিত সেই অসহায় বাসি—সমস্ত চর জুড়ে বহু স্মৃতির সংগে সে জড়িয়ে আছে। বহুদিনের বহু ছোটছোট ঘটনার স্রোতে বাসি আবার এসে সুন্দর লোভনীয় হ'য়ে দাঁড়াল। নীলকান্তর ঘরে কদর্য্য বাসিকে তার আর মনেই পড়ল না। আজ বরং তার সমস্ত মন হু হু ক'রে উঠল। বাসি কোথায় কোন চরে চলে যাবে। তারপর দিনের পর দিন—কতদিন কেটে যাবে, এই গ্রামের পথে ঘাটে কোনও দিন তাকে আর দেখা যাবে না।

চন্দ্র একটা তালগাছের তলে দাঁড়িয়ে বহুক্ষণ নীলকান্তর ঘরের জানালার দিকে তাকিয়ে রইল। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হ'তে গাঢ়তর হ'লো। বাসিকে একবারও দেখা গেল না। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চন্দ্র ঘরের দিকে ফিরল। আজ তার মনে হ'লো—চোখের সমুখের মস্ত বড় পৃথিবীটা একটা বস্তুবর্ণহীন তুলির আঁচড়ে ধূ ধূ করচে ; আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন—কোথাও কিছু নেই। পৃথিবীর বহু দূর দূরান্তর চন্দ্রর মনের মাঝখানে ঘন হ'য়ে এলো, মন তার অনির্দিষ্ট নিঃসংগতায় হা হা ক'রে উঠল। সেও চলে যাবে অনেক দূরে কোথাও—মনে মনে ভাবলে চন্দ্র, অনেক দূরে অনেক দিন একা। মন তার ভারী হ'য়ে গেল। বহুদিন তার মনে হ'য়েচে—অনেক দূরে সে কোথাও চলে যাবে, বহুদিন

তার মন অকারণ অতৃপ্তিতায় ভরে গিয়েছে, হু হু ক'রে উঠেছে কি যেন পাওয়ার জন্যে। আজ বাসির চিন্তার স্রোত ধরে সেই সব অতৃপ্ত দুরাশার বেদনার্ত স্বপ্নের দল বিপুল বেগে ছুটে এলো—ভাসিয়ে নিয়ে গেল চন্দ্রকে।

সোনা সুমুখে এসে দাঁড়াল—তাকাল চন্দ্রর দিকে। চন্দ্রর চোখে সেই উদাসীন অসহায় দৃষ্টি। তারপর সেই চোখে জল দেখা গেল দু ফোঁটা। সোনা বোধ হয় আর নিজেকে সামলে রাখতে পারবে না। সোনা কাঁপচে—ওর চোখ কাচের মতো ঝকোমক্ ক'রে উঠল হঠাৎ। গলা দিয়ে স্বর বেরোল না তার—এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ার মতো সে যেন বললে, কি হ'য়েছে তোমার—কাঁদছ কেন?

অনেক কথা বলতে চাইল চন্দ্র—অনেক দিনের অনেক জমানো কথা, অনেক যন্ত্রণা, অনেক স্বপ্ন, অনেক কামনা। কিন্তু ঠোঁট দুটো শুধু তার একটু নড়ল। চন্দ্র চুপ ক'রে বসে রইল। সারা রাত্রি সে ঘুমুতে পারলে না। বাইরের অন্ধকার রাত্রির দিকে তাকিয়ে তার মনে হলো—পৃথিবীতে যেন কোথাও কিছু নেই। বৃষ্টি সুরু হলো—দূর থেকে ঝিঁঝিঁর মতো একটা ক্ষীণায়মান শব্দ কাণ পেতে শুনলে সে—শব্দ ক্রমশ স্পষ্ট হলো খুব কাছে, অন্ধকার রাত্রিভরে যেন কুয়াশার আবছা শাদা পাতলা পর্দা নামলো। ভাঙা বেহালাটার কথা মনে পড়ল—ভারী একটা করুণ পরিচিত সুর কোথায় কোন অদৃশ্যলোকে যেন গুণগুণ ক'রে উঠল। সেই সুরের সংগে সুর মিলিয়ে অনেক কথা মনে পড়ল তার—বাইরে বর্ষাস্তব্ধ রাত্রি—অনেক দিনের অনেক কথা মনে পড়ল তার। সে যদি গান গাইতে পারতো—ভাবলে চন্দ্র, তার জীবনের অনেক কথা, অনেক দুঃখ নিয়ে।

সকাল হলো।

সকালেই বেহারীর চর ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা—সব ঠিকঠাক। কিন্তু রাত থেকেই তার আর দেখা নেই। সারাদিন কেটে গেল, বর্ষার সন্ধ্যা আবার কালো হ'য়ে উঠল, নিঃশব্দ গ্রাম ঘুমিয়ে পড়ল। আবার এলো মেঘলা দিন। বিহারী কিন্তু এলো না। বাসিকে ওই নীলকান্তর কাছে ফেলে সে কি একাই তবে চলে গেল—চন্দ্র ভাবলে, কোনো কিছুই বুঝতে পারলে না। সকলের সংগে সেও সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মুখ চাওয়া-চাউয়ি ক'রলে।

নীলকান্ত বললে, যেদিন রাত থেকে বিহারী নিখোঁজ, সেদিন গভীর রাতে চন্দ্রা গাঙের ধার থেকে একা নাকি ফিরে আসছিল—কালী দেখেছে বললে। কে জানে, বিহারীকে দিয়েছে হয়ত গাঙে ঠেলে—বর্ষার দিন—

তবু যারা বিমূঢ় দৃষ্টিতে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে তাদের নীলকান্ত বোঝালে, কেন আর বুঝলিনে? বাসিকে নিয়ে চলে যাবে বিহারী—আহা বেচারী।

যে রাত্রে বিহারী উধাও, সে রাত্রিটা এখানে ওখানে ঘুরে ঘুরে কেটে গিয়েছে চন্দ্রর সত্যি। ফেরবার সময় বাঁধের ওপরে দূরে সে একটা নয়—দুটো অস্পষ্ট কালো মূর্তি দেখেছিল, তার মধ্যে একজন তবে কালী—ভাবলে চন্দ্র, আর একজন কে? সে কি নীলকান্ত! তাকে দেখে মূর্তি দুটো যেন হঠাৎ বাঁধের নীচে নেমে অন্ধকারে কোথায় মিশে গিয়েছিল। বিহারীকে তবে মেরে ফেলেছে ওরা! অসহায় বাসিকে মনে পড়ল আর নীলকান্তর কঠিন হিংস্র ক্রুদ্ধ মূর্তিটা চোখের সুমুখে ভেসে উঠল চন্দ্রর। তারপর আরও যখন শুনল: নীলকান্তর সংগে সহরে যাবে বাসি—নইলে থাকবে

কোথায় সে, তখন আগুন জ্বলে উঠল তার মাথায়। বিহারীর নিরুদ্দেশের সমস্ত দোষ আর দায়িত্ব সে নীরবেই গ্রহণ করতে বাধ্য হলো বটে, কিন্তু তার অন্তরের মধ্যে একটা হিংস্র পশু গর্জন ক'রে উঠল। সে জানে অনেক, দেখেছে অনেক···নীলকান্তর সমস্ত মতলব সে যেন বুঝে ফেলেছে···সমস্ত তার, চীৎকার ক'রে ব'লে উঠতে ইচ্ছে হলো কিন্তু সে বোবা। পর পর অনেক দিনের অনেক আঘাতের ক্ষত আজ নতুন ক'রে আবার টন্ টন্ ক'রে উঠল, ক্ষিপ্ত ক'রে দিলে তাকে। পাগলের মতো সে ছুটল নীলকান্তর কাছারী বাড়ীর দিকে।

সুমুখে নীলকান্তকে পেয়ে তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল চন্দ্র। আঁচড়ে কামড়ে একাকার করে দিলে। ধূলিলুণ্ঠিত নীলকান্তর আর্তনাদে যে যেখানে ছিল, ছুটে এল। চন্দ্রকে ছাড়িয়ে আনল সকলে, কিন্তু তাদের হাতের মুঠো ছাড়িয়ে বার বার সে ছুটে যেতে চাইলে নীলকান্তর দিকে। সকলে তাকে ধরে কাছারীর বাইরে নিয়ে এল।

নীলকান্ত চীৎকার করে বললে, ওকে বাঁধ—ওকে জেলে দেবো।

চন্দ্র এক ঝটকায় সকলের হাত ছাড়িয়ে আবার ছুটল নীলকান্তর দিকে। নীলকান্ত তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিলে।

সকলে আবার চন্দ্রকে ধরে তার ঘরের দিকে নিয়ে চলল। বয়োবৃদ্ধ অবিনাশ বোঝালে অনেক রকম, জেলের ভয় দেখালে। কিন্তু ঘরে এসে ছাড়া পেয়ে আবার ছুটল চন্দ্র নীলকান্তর কাছারীর দিকে ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো।

চরের কর্মচারী কালী বললে, বোধ হয় মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে ওর।

সোনা কাঁদ কাঁদ হ'য়ে বললে, কি হবে, ওই ছাখোনা!

চন্দ্র জানে অনেক, চন্দ্র দেখেছে অনেক, চন্দ্র বুঝেছে সব, সব বলবে সে। চন্দ্র নিরুদ্ধ নিরুপায় আক্রোশে চুল টানছে তখন, দাঁতে দাঁত চেপে আছে, দৃষ্টি কঠিন, স্থির।

সোনা বললে, ওই রকম আজ ক' রাত্রিই দেখচি।

নীলকান্ত এল, বললে, দরজাটা একবার খোল দিকিন, ওর পাগলামী বের করচি। জুতোর চোটে মুখ ছিঁড়ে দেবো না!

চন্দ্রকে ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে রাখা হয়েছিল। নীলকান্তকে দেখে সে জানালার দিকে সবেগে ছুটে এল। নীলকান্ত পিছিয়ে এল সভয়ে, বললে, মারবি নাকি রে।

কাঠের গরাদ দেওয়া জানালা। চন্দ্র জোরে ঝাঁকানি দিলে, দেয়ালের মাটি খসে পড়ল।

নীলকান্ত বুড়ো আঙুল তুলে দেখালে, বললে, কাঠের গরাদ, ভেঙে ফেলবে কবে ও। ওকে বেঁধে রাখ, খবর্দার ঘর খুলিসনে। তারপর পাগলা গারদে পাঠাবার ব্যবস্থা করচি আমি।

সোনাই কাঁছক আর বাসিই কাঁছক—মেয়েমানুষের কান্না নীলকান্ত কেয়ার করে না। মুখের কথা দিলেও তাদের—নীলকান্ত মনের কথা দেয় নি। কিন্তু কালী ব'ললে, ভালো হবে না ছোটবাবু—ওরা সব যেন সন্দেহ ক'রছে, ছোটলোক—চাষাভূষো সব, কোথায় কি ক'রে বসবে। জেল হোক, গারদ হোক—সহরে ফিরে গিয়ে ক'রবেন।

অগত্যা নীলকান্তর প্রস্তাবে কামার এসে একদিন হাতে লোহার বেড়ি পরিয়ে দিয়ে গেল চন্দ্রর। তবে দড়িতে ঘরে বাঁধা থাকুক চন্দ্র।

হঠাৎ জলোচ্ছ্বাসের শব্দে চরের ঘুমন্ত ক'টি প্রাণীর ঘুম ভেঙে গেল। আতংকিত কালো চোখ ঘষে বাঁধের দিকে তাকাল সকলে। কালো অন্ধকারে বাঁধটাকে দেখা যাচ্ছে আরও গভীর কালো রেখার মতো—শুধু এক জায়গায় সে রেখা মুছে গিয়েছে আবছা শাদা রেখায়, সেটা হু হু ক'রে বেড়ে এগিয়ে আসচে ক্রমশ। হাঁক-ডাকে আর আর্তনাদে নির্জন নিঃশব্দ রাত্রি হঠাৎ মুখরিত হ'য়ে উঠল। বাঁধ ভেঙে গিয়েচে। নীলকান্তর কাছারীবাড়ীটাই সব চেয়ে উঁচু। গোরু ছেলে মেয়ে নিয়ে সকলে ছুটল সেই দিকে।

নীলকান্ত ওপরে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দেখছিল—ব'ললে, চন্দ্রাকে ছেড়ে দিয়েছে নাকি!

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রলে। প্রাণ ভয়ে সকলে চলে এসেচে। চন্দ্র রয়ে গিয়েচে। সোনা ছুটল—বৈকুণ্ঠ ছুটল পেছনে পেছনে।

নীলকান্ত পেছনে থেকে চীৎকার ক'রে ব'ললে, না না—এখানে না। কালী ব'লে দে—এখানে তা হ'লে কারুরি জায়গা হবে না। বৈকুণ্ঠকে ডেকে ব'লে দে।

নীলকান্তর অভিব্যক্তি-শূন্য মুখের দিকে সকলে স্তব্ধ ভীরু চোখে তাকিয়ে রইল। বৈকুণ্ঠ আর সোনা ছুটতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। অন্ধকারে আবার ক'টি প্রাণী অসহায় চোখে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে।

কালী নীলকান্তকে ব'ললে, খালে নৌকা আছে—আপনি কেশরগাঁয়ের কাছারিতে চলে যান বাবু, তারপর সহরে—এখানে ক্রমশ জল বাড়বে।

—এরা? নীলকান্ত ঘরের দিকে তাকাল। গোরু, বাছুর, ছেলে মেয়ে ঠেসাঠেসি ক'রে সব একটা ঘরে। কেমন একটা বিশ্রী গন্ধ ঘরের মধ্যে। গোরুর মতো জোড়া জোড়া গভীর কালো চোখ তাকিয়ে আছে নীলকান্তর দিকে—লোভে সজল হ'য়ে ঝকোমক্ ক'রচে চারদিকে। একটা গোরু ফোঁস ফোঁস ক'রে নীলকান্তর গা শুকলে।

সব যাবে—পরে। তারপর গলা নামিয়ে ব'ললে কালী, কাল কি হবে কে জানে? আর সব নৌকায় ধরবে কেন? শেষ কালে ভরা নৌকা নিয়ে মাঝ পথে মরব নাকি!

তারপর নীলকান্তও কালীকে বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে কি পরামর্শ ক'রলে। কালী মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ঘরে ফিরে এলো—ব'ললে, অবিনাশ, রাখাল, তোরা চল। দাঁড়ি মাঝির দরকার আছে তো। ভালোয় ভালোয় বাবুকে পৌঁছে দিতে পারলে হয়। আর বৈকুণ্ঠ, তুইও চল—তুই না হ'লে চলবে না। আর সোনাও—সোনা কোথায়? সোনা, সোনা—

সোনা সেখানে কোথাও নেই। কালী একটা জানালা খুলে বাইরের দিকে তাকালে। সমস্ত চর জলে ভরে গিয়েচে। দুরন্ত বাতাসে বৃষ্টির জল ঢুকলো ঘরে, জলোচ্ছ্বাস স্পষ্ট হয়ে উঠল, গাছ-পালার আর্তনাদ তীব্র হয়ে উঠল। সোনাকে দেখা গেল না।

কালী জানালা বন্ধ করে দিয়ে বললে, আর দেরী করা তো যায় না বাবু।

রাস্তায় এক হাঁটু জল। বাতাসে আর জলের স্রোতে সুমুখে এগোনো যায় না। তারি মাঝখানে সোনা ছুটচে। সোনা ঘরের দাওয়ায় এসে উঠল। দাওয়ায় তখন সবে জল উঠেচে। জল বাড়চে ক্রমশ। চন্দ্রর ঘরের শিকল খুলে দিলে সে ছুটে গিয়ে। ক্ষিপ্ত চন্দ্র ঝাঁপিয়ে পড়ল সোনার ওপরে। তার মনে হলো, আবার কে যেন আরও কঠিন করে বাঁধতে এসেচে। তার ধারালো দাঁতে কাপড় ছিঁড়ল সোনার, তার এলোমেলো ক্ষ্যাপা ছুটো হাতের মাঝখানে নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলে সোনা। তার তীক্ষ্ণ ধারালো চকিত হাসিতে নিঃশব্দ অন্ধকার ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল।

সোনা বললে, বাঁধ ভেঙে গেছে—সব ডুবল বলে। সকলে কাছারীতে চলে গিয়েচে। একটু চুপ করে দাঁড়াও—দড়িটা খুলি।

সোনাকে ছেড়ে দিয়ে চন্দ্র থমকে গেল।

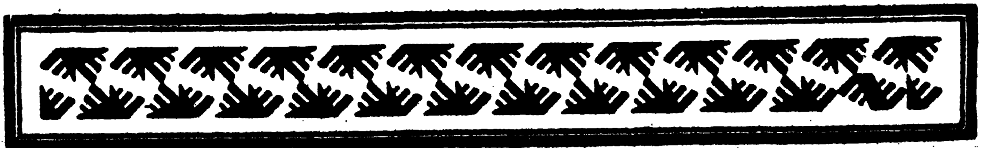
সোনা বললে, ছোটবাবু, বাসি কেশরগাঁয়ে যাচ্ছে—তারপর বোধ হয় কালই সহরে চলে যাবে। বানিয়ে বললে সোনা। তারপর আবার বললে, ওই তো—ওই যে ওদের নৌকার আলো—চলে যাচ্ছে।

ভারী শক্ত বাঁধন—অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। দাঁত দিয়ে সোনা দড়ির গাঁট খুলতে লাগল।

চন্দ্র খালের দিকে তাকিয়ে দেখল একবার। একটা আলো পশ্চিম মুখো ভেসে যাচ্ছে—জলে ছায়া কাঁপছে।

এক ঝটকায় সোনার হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিলে চন্দ্র। প্রাণপণ শক্তিতে হাত টানলে সে—কিন্তু লোহার বেড়ি থেকে হাত খুলল না। হাত কেটে রক্ত ঝরতে লাগল। একবার ফিরে তাকাল চন্দ্র—নৌকার আলোটা ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। নিশ্বাস বন্ধ করে শেষ বারের মতো সে আবার টানল হাত। তারপর হতাশ হয়ে জানালার কাছে ছুটে গেল। কাঠের গরাদ ধরে ঝাঁকানি দিলে—মট্ করে ভেঙে গেল একটা গরাদ—তারপর আবার একটা ধরলে চন্দ্র। কিন্তু শিথিল হাত সেটা আর ভাঙতে পারল না। দেয়াল ভেঙে ঝর্ ঝর্ করে মাটি ঝরে পড়ল। নিরুপায় ক্ষিপ্ত পশুর মত গোঙিয়ে উঠল চন্দ্র, অ-অ-অ—

তারপর চন্দ্র নির্নিমেষে তাকিয়ে রইল অনেক দূরের দিকে। বন-জংগলের আড়ালে নৌকার আলোটা কোথায় মিশে গেল—আর দেখা গেল না। চন্দ্রর চোখের কোণে ছুটি ফোঁটা জল নেমে এল। বাইরে নিরুদ্দেশ পাণ্ডুর জলরাশির মতো ছুটি ফোঁটা জল অন্ধকারেও স্পষ্ট ঝক্ ঝক্ করচে।



প্রতিযোগী

[বিখ্যাত রাশিয়ান্ গল্প-লেখক আইভান্ এস্. টুর্গেনিভ্-এর "The Singers" গল্পের অনুবাদ]

অনুবাদক—শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

কোলোটভ্কা গ্রামখানি এক সময়ে এক মহিলার ছিল; তাঁর আসল নাম সবাই ভুলে গিয়েছিল। তাঁ'কে সবাই জান্‌ত হাড় কৃপণ ব'লে—কারণ ঐ ছিল তাঁর স্বভাব। তারপরে, ইদানীং কোলোটভ্কা পিটার্সবর্গের এক জার্ম্মানের সম্পত্তি। একটি রুক্ষ পর্ব্বতের উপত্যকায় গ্রামখানি,—পর্ব্বতটি আবার মাঝামাঝি একটি গভীর খাদে দুভাগে বিভক্ত। দেখলে মনে হয়, পাহাড়টি যেন হাঁ ক'রে আছে—বর্ষায় আর তুষার পাতের ফলে খাদের গায়ে সব খাঁজ কাটা কাটা হয়েছে। গ্রামখানির রাস্তা পর্য্যন্ত এই খাদ এঁকে বেঁকে তাকে নির্দ্দয় ভাবে বিভক্ত করেছে—এর চেয়ে বরং নদী ভালো, কারণ নদীর উপর তবু সাঁকো বাঁধা যায়। খাদের পাশে যেখানে বালি আছে, সেখানে দেখা যায় কতকগুলি ছোট ছোট উইলো গাছ অতি সন্তর্পণে বেড়ে উঠেছে—খাদের গভীরতম তলদেশ শুষ্ক, তামার মত পিঙ্গলহরিদ্রাবর্ণ...সেখানে দেখা যায় কতকগুলি বড় বড় মেটে পাথরের চাঁই। এটা অস্বীকার করা যায় না যে, চারিদিকের দৃশ্য এবং অবস্থানের মধ্যে কোথাও আনন্দের লেশ মাত্র নেই...তবু প্রতিবেশী গ্রামগুলির লোক কোলোটভ্কার পথ বেশ ভালো ভাবেই চেনে; তারা সেখানে প্রায়ই যায়, এবং সেখানে যেতে তারা ভালোই বাসে।

খাদের একেবারে শীর্ষদেশে, যেখান থেকে খাদটি সরু হ'য়ে মাটির মধ্যে নেমে এসেছে, তা'রই কয়েক পা দূরে একখানি ছোট চতুষ্কোণ কুটীর। কুটীরখানি সম্পূর্ণ একেলা, আশে পাশে আর কোন কুটীর বা ঘরবাড়ী নেই। উপরটা খড় দিয়ে ছাওয়া, এবং একটি চিম্‌নি বা ধোঁয়া বার করে দেওয়ার নল আছে। একটি জানলা যেন একটি তীক্ষ্ণ চক্ষুর মত খাদের উপর সজাগ পাহারা দেয়, আর শীতের সন্ধ্যায় ভেতরে যখন আলো জ্বালা হয়, জান্‌লার ভেতর দিয়ে সে আলো শীতের অস্পষ্ট কুয়াসার মধ্যেও অনেক দূর থেকে দেখা যায়। আর এর মিটমিটে আলো পথের অনেক কৃষাণ পথিকের একমাত্র ভরসা। একখানি নীল কাষ্ঠফলক দরজার উপর আটকানো আছে; এই কুটীরখানি একটি সরাইখানা...এর নাম "স্বাগত বন্ধু।" মদ এখানে বিক্রয় হয় আর তা খুব সস্তাও নয়; কিন্তু আশে পাশে অন্য সরাইখানার চেয়ে এখানে লোক বেশী আসে। এর কারণ শুধু সরাইখানার মালিক নিকোলাই আইভ্যানিচ্, আর তার সমাগতদের প্রতি মধুর ব্যবহার।

নিকোলাই আইভ্যানিচ্ আজ প্রায় বিশ বছর ধরে কোলোটভ্কায় বাস করে আসছে। এক সময়ে সে ছিল ক্ষীণকায়, মাথায় চুল ছিল কোঁকড়ানো, যুবাপুরুষ, গালে ছিল গোলাপী আভা। এখন সে অসম্ভব রকম মোটা হয়েছে, মুখখানা হয়েছে ভারী, ছোট ছোট দুটি চোখ, ধূর্ত্ততামাখানো ভালো মানুষীর ভাব রয়েছে সে চোখে, কপালটা হয়েছে চকচকে আর তার ওপরে যেন লাইন টানা হয়েছে...এমনই সব রেখা। সাধারণ সরাইখানার মালিকদের মতই নিকোলাস আইভ্যানিচ্ খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কুটিল, সংসারী মানুষ। মানুষকে সন্তুষ্ট করাতে অথবা তাদের সঙ্গে গল্প করাতে তার

কোনো লোক-দেখানো ভাব নেই, তবু তা'র মানুষ অর্থাৎ ক্রেতাদের টান্‌বার বিদ্যাটা আছে জানা। তা'রাও সেই দোকানে শান্ত স্বভাব মোটাসোটা দোকানীর স্থির অথচ সজাগ তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে বসতে ভালোই বাসত। সাধারণ বুদ্ধিও ছিল তার খুবই, সে দেশের জমিদার, কৃষাণ এবং ব্যবসায়ীর জীবনের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন ছিল। কঠিন প্রশ্নের বা সমস্যার একটা সন্তোষজনক সমাধান করে দিতে পারত এবং সাবধানী, স্বার্থপর, আত্মম্ভরী মানুষের মত সব কিছুতেই দূরে দূরে থাকতে ভালোবাসত, কিন্তু প্রায়ই তার প্রিয় পরিচিত ক্রেতাদের কথাতে দুই একটা দূর ইসারা ইঙ্গিতে যেন কতকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদেরকে ঠিক পথের সন্ধান দিয়ে ফেলত। একজন রাশিয়ানের কাছে যা ঔৎসুক্যের বা আগ্রহের বস্তু—যেমন, ঘোড়া, গরু, ভেড়া, ছাগল, কাঠ, ইট, মাটির বাসন, উলের বা পশমের কাজ, চামড়ার ব্যবসা, গান বা নাচ—এ সব বিষয়েই তাকে একজন সমঝদার লোক বলে ধরা হ'ত। যখন তার কোনো ক্রেতা বা খরিদ্দার থাকত না, তখন সে তার কুটীরের দরজার সম্মুখে একটি বস্তার মত বসে থাকত—সরু সরু পা দুখানা মেলে দিয়ে, প্রত্যেক পথিকের সঙ্গে বন্ধুতাসূচক দৃষ্টি বিনিময় করত। সে তার জীবনে অনেক দেখেছে; ছোটখাটো ক্ষুদে জমিদারদের দল, যারা তার দোকানে মদ খেতে আসত সে দেখেছে তাদের—তারই সামনে দিয়ে তারা গেছে মিলিয়ে কাল-সাগরের বুদ্‌বুদের মত, চারিপাশে আশী মাইলের মধ্যে যা কিছু হয়েছে তা সে জানে। সে কখনো সে সব নিয়ে মাতামাতি করে না, খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সজাগ পুলিশ কর্ম্মচারী যে বিষয়ে সন্দেহ করে না, সে বিষয়ে সে যে কিছু জানে, এমন ভাব সে কখনো দেখায় না। সে নিজের মত নিজের মধ্যে রাখতে জানে, হাসে আর অনায়াসসুখে দিন কাটায়। তার প্রতিবেশীরা তাকে সম্মান করে। সিবিলিয়ান সাহেব সেচারপেটেস্কো—জেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ জমিদার যখনই তার ছোট কুটীরখানির পাশ দিয়ে যান, তখনই তিনি তাকে তাঁর সেলাম জানিয়ে যান। নিকোলাই আইভ্যানিচ্‌ একজন ক্ষমতাশালী লোক,—সে একদা এক বিখ্যাত ঘোড়া-চোরকে চোরাই ঘোড়া ফেরত দিতে বাধ্য করেছিল। ঘোড়াটি তার এক বন্ধুর। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের একদল কৃষাণের ভুল দেখিয়ে তাদের সে চৈতন্য এনেছিল, যখন তারা নতুন একজন ওভারসিয়ার নিয়োগে বিরক্ত এবং বিমুখ হয়েছিল। কেউ যেন মনে না করেন যে, সে ন্যায়বোধে অথবা প্রতিবেশীদের প্রতি প্রীতিবশত এই সব কাজ করে, তা নয়—সে এ সব তার নিজের আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্য নিখুঁত ভাবে বজায় রাখবার জন্যেই করে থাকে। নিকোলাই আইভ্যানিচ্‌ বিবাহিত এবং তার সন্তানাদি আছে। তার স্ত্রী—বেশ চতুর, তীক্ষ্ণ নাসা, খরদৃষ্টি, ব্যবসায়ী বংশের মেয়ে—তার স্বামীরই মত ইদানীং একটু মোটা হয়ে পড়েছে। নিকোলাস সব বিষয়েই স্ত্রীর পরামর্শানুসারে চলে আর সে তার ক্যাসবাক্সের চাবি নিজের কাছে রাখে। পাঁড় মাতালরা তাকে ডরায়, সেও তাদের দেখতে পারে না; তারা ও দোকানের ক্ষতিই করে, বেশীর ভাগ গোলমাল করে। যারা মদ খেতে এসে কোনো গোলমাল করে না, চুপচাপ থাকে, তাদেরকেই সে পছন্দ করে। নিকোলাই আইভ্যানিচের ছেলেরা এখনও ছোট, প্রথম চারটি মরে যায়—যারা রইল, তারা দেখতে বাপ মায়েরই মত। তাদের বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, সুকুমার, সুন্দর ছোট ছোট মুখগুলির দিকে চেয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। * * *

জুলাই মাসের এক অসহ্য গরমের দিনে ধীরে ধীরে পা চালিয়ে আমি কোলোটভ্‌কার খাদের

পাশ নিয়ে আমার কুকুরটিকে সঙ্গে নিয়ে "স্বাগত বন্ধু"র দিকে রওনা হ'লাম। শুষ্ক, দীর্ণ পৃথিবীর উপর নিষ্করুণভাবে অগ্নিকিরণ বর্ষণ করছে তখন প্রখর সূর্য্য—শ্বাসরোধী ধুলায় বাতাস ভারাক্রান্ত। কুচকুচে কালো কাক আর দাঁড়কাক তাদের ঠোঁট ফাঁক করে পথিকদের দিকে করুণ নয়নে তাকায়—যেন তারা কোনো কিছু চায়—কোনো দরদ বা সমবেদনা; শুধু চড়াইগুলো কাতর হয়নি—তা'রা তা'দের পাখার পালক ঝাড়তে ঝাড়তে যেন আরও বেশী রকম কিচির মিচির করে—বেড়ার ধারে পরস্পরে ঝগড়া করে অথবা দল বেঁধে ধুলিময় পথ থেকে উড়ে চলে যায়—শনের ক্ষেতের উপর ধূসর একখণ্ড মেঘের মধ্য দিয়ে। আমার তখন প্রখর পিপাসা—কাছাকাছি কোথাও জল নেই; কোলোটভ্‌কা এবং উপত্যকার অন্যান্য গ্রামে চাষীরা কোনো ঝর্‌ণা বা ইঁদারা না থাকায় ডোবা থেকে এক ধরণের পাৎলা কাদা জলের বদলে খেয়ে থাকে—সেই অসহনীয় পানীয়কে কেউ জল বলতেই পারে না। আমি নিকোলাই আইভ্যানিচের দোকানে এক গ্লাস বিয়ার বা তার বদলে এক গ্লাস দেশী মদ * চেয়ে নেব, এই রকম ভেবেছিলাম।

বছরের মধ্যে কোন সময়েই যে কোলোটভ্‌কার দৃশ্যবৈচিত্র্যে আনন্দ নেই—এ কথা স্বীকার্য্য। কিন্তু যখন জুলাই মাসের প্রখর উত্তপ্ত সূর্য্যের অকরুণ কিরণ এসে পড়ে পিঙ্গলবর্ণ আনত বাড়ীর ছাদের উপর, গভীর খাদের মধ্যে, বিশুষ্ক ধুলিমলিন ময়দানে—যেখানে রোগা রোগা লম্বা পা মুরগীগুলো হতাশভাবে ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়, প্রাচীন জমিদারবাড়ির ধ্বংসাবশেষের উপর, যা এখন একটা ফাঁকা, ধূসর, বিবর্ণ আসপেন কাঠের ফ্রেম মাত্র—যার জানালাগুলো গর্ত্তে পরিণত হ'য়েছে, আর তা'দের উপর হয়েছে নানাজাতীয় আগাছা পরগাছার জঙ্গল, আর সেই সব পুকুর-ডোবায় যার জল হ'য়ে উঠেছে কালো—যেন অগ্নিদগ্ধ, হাঁসের পালকে ঢাকা—কিনারে কিনারে আধশুকনো কাদা—আর তা'র ভেঙ্গেপড়া বাঁধের উপর, যেখানে ছাইয়ের মত পাঁশুটে, নরম কাদার উপর ভেড়ার পাল প্রচণ্ড গরমে হাঁপায়, নিঃশ্বাস নিতে পারে না, অসহায়ভাবে এক জায়গায় জড় হ'য়ে প'ড়ে থাকে, ক্লান্ত ধৈর্য্যে মাথা নত ক'রে প'ড়ে থাকে—যেন এই অসহনীয় গ্রীষ্ম কবে যাবে তা'রই প্রতীক্ষা করে—এই সব স্থানে যখন প্রখর রৌদ্রতাপ, তখনকার অবস্থা আরও বেশী ক'রে নৈরাশ্যজনক। ক্লান্ত, ধীর পদে আমি নিকোলাই আইভ্যানিচের বাড়ীর কাছাকাছি এলাম। গ্রামের ছোট ছোট ছেলেরা আমায় দেখে অবাক্ হ'ল (যেমন সাধারণত তা'রা হয়)—অবাক হ'য়ে তা'রা আমার দিকে পলকহীন, অর্থশূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল আর কুকুরগুলো বিরক্ত হ'য়ে, ক্রুদ্ধ হ'য়ে ভাঙাগলায় ভীষণ-ভাবে আমার দিকে চেয়ে ঘেউ ঘেউ করতে লাগ্‌ল। এত জোরে তা'রা চেঁচাতে লাগল, মনে হ'ল যেন তা'দের নাড়ীভুঁড়ি চেঁচানীর চোটে বেরিয়ে যাবে—শেষটায় তা'রা চেঁচাতে চেঁচতে প্রায় দমবন্ধ হ'ল এবং হাঁফাতে লাগল। এমন সময় অকস্মাৎ সেই সরাইখানার দরজার কাছে এক দীর্ঘাকার টুপি-পড়া, মোটা পশমের জামা গায়ে, কোমরের নীচ দিয়ে নীল রুমালের কোমরবন্ধ, একজন চাষীলোককে দেখা গেল। তা'কে কোনো বাড়ীর চাকর ব'লে মনে হ'ল; তা'র শীর্ণ, রেখাজর্জর মুখের উপরে কটা মোটা চুল এলোমেলো ভাবে এসে পড়েছে—সে তাড়াতাড়ি তার হাত নেড়ে কাকে

* Kvas

যেন ডাকছিল। বেশ বোঝা গেল তা'র হাত দুটো তা'র বশে নেই—বোঝা গেল যে, সে নিশ্চয়ই কোথাও মদ খেয়েছে।

সে একটু আয়াসে তা'র রোমবহুল চোখের ভুরু উপরের দিকে তুলে জড়িতস্বরে বলল, "এস, এস, চ'লে এস।"

"এস ব্লিস্কার্ড (বোধ হয় অন্ধ সে), চ'লে এস—আঃ, সত্যি বলতে কি, তুমি যেন হামাগুড়ি দিয়ে আসছ। এ বড় খারাপ ভাই, তোমার জন্যে তা'রা অপেক্ষা করছে ভেতরে, আর এখানে তুমি এত দেরী ক'রে আসছ। এস, এস।"

"এই যে আমি আসছি, আসছি। একটা কর্কশ, অসংলগ্ন কণ্ঠস্বর শোনা গেল। আর একখানা কুঁড়ে ঘরের পাশ থেকে একটি ছোট, বেঁটে, মোটা, খোঁড়া লোককে দেখা গেল। একটি পরিষ্কার ছিটের কোট পরেছে সে, তাতে তার অর্দ্ধেক শরীর ঢাকা—চোখের ভুরুর ঠিক ওপর পর্য্যন্ত ঢাকা একটা উঁচু টুপী—এতে তার গোলগাল প্রকাণ্ড মুখখানায় একটা ধূর্ত্ততা এবং রসরঙ্গপ্রীতির আভাস আছে বোঝা যায়। তার ছোট ছোট হরিদ্রাভ চোখ দুটি চারিদিকে চঞ্চল হয়ে ঘুরছিল, তার পাৎলা ঠোঁট দুখানিতে সকল সময়েই একটা চাপা হাসির আভাস, আর তা'র তীক্ষ্ণ দীর্ঘ নাসা সম্মুখে যেন ঝুঁকে পড়েছে।

"আমি যাই ভাই" ব'লে লোকটি সরাইখানার দিকে টলতে টলতে চলতে লাগল। আবার সে বলল: "আমাকে ডাকছ কেন? আমার জন্য কে অপেক্ষা করছে?"

পশমের কোট পরা লোকটি তিরস্কারের সুরে আবার তাকে বললে, "কেন তোমায় ডাকছি? তুমি একটা বোকা বাঁদর; ব্লিস্কার্ড, আমরা তোমাকে ডাকছি সরাইখানায় আসবার জন্যে, আর তুমি কি না জিজ্ঞাসা করছ 'কেন'। এখানে সব ভালো লোকরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে, তুর্কী যাস্কা, ওয়াইল্ড মাষ্টার, ঝিজড্রাই থেকে এসেছে ষ্টলওয়ালা: এক বোতল বিয়ার রয়েছে বাজি যে সেরা লোক সেরা গাইয়ে অবিশ্যি—তারই জন্যে—বুঝতে পেরেছ?"

ব্লিস্কার্ড বলে যাকে ডাকা হচ্ছিল সে বেশ উৎসাহের সঙ্গে বললে, "যাস্কা কি সত্য গাইবে? কিন্তু এ তোমার বাজে কথা নয় ত—গ্যাবলার?" গ্যাবলার বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে বললে "মোটেই বাজে কথা বলি নি। তুমি একটা পাগল কিনা তাই ও কথা বলছ। আমার মনে হয়, বাজি যখন আছে, তখন সে গান করবেই বুঝলে ব্লিস্কার্ড, তোমার মত গাধা কি দেশে মেলে?"

"আচ্ছা, এস গাধা।" পাল্টা উত্তর দিল ব্লিস্কার্ড। "তাহলে, অন্তত একটা চুমু দাও হে প্রেমময়।"—জড়িতস্বরে গ্যাবলার তার দুই বাহু প্রসারিত করে বললে।

"মাথা খারাপ তোমার। বেরোও তুমি।"—ব্লিস্কার্ড ঘৃণার সঙ্গে তাকে কনুয়ের একটা গুঁতো দিয়ে জবাব দিল। তারপরে দুজনেই নত হয়ে নীচু দরজা দিয়ে ভেতরে এল।

এই কথাবার্ত্তা শুনে আমার ভারি একটা কৌতূহল হল। আমি অনেকবারই শুনেছি যাস্কার নাম—তুর্কী যাস্কা—গুজব এই যে, যাস্কাই আশেপাশের সব গ্রামগুলির মধ্যে সেরা গাইয়ে। আর, আমার সম্মুখে মস্ত সুবিধা একজন ভালো গাইয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তার গান শুনতে পাওয়া যাবে। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলাম।

আমার পাঠকদের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় গ্রামের সরাইখানা ভালো ক'রে দেখবার সুবিধা সুযোগ পান নি; কিন্তু আমরা খেলোয়াড় মানুষ, আমরা সর্ব্বত্রই গিয়ে থাকি। সেগুলি খুব সাদাসিদাভাবে তৈরী—বাইরে থাকে একখানি কালো চাল, ভেতরের ঘরে থাকে ধোঁয়া বার ক'রে দেবার নল বা চিমনি। ঘরখানা মাঝামাঝি ভাগ করা—সেই আড়াল করা বা ভাগ করা দেওয়ালের ভিতর দিকে কোন খরিদ্দারই ঢুকতে পায় না। এই দেওয়ালে একটা বড় ফুটো করা আছে—ঠিক একটা প্রশস্ত ওক-কাঠের টেবলের উপরেই। এই টেবলেই মদের বোতল রাখা হয়—বা ক্রেতাদের সম্মুখে মদ বিক্রয় হয়। নানা আকারের শীলমোহর-করা বোতল সেলফে রাখা হয়—ঠিক সেই জানলা বা ফুটোর সামনেই। ঘরের ঠিক সম্মুখভাগেই ক্রেতাদের জন্য বেঞ্চি পাতা থাকে, দুটো কি তিনটে খালি পিপে প'ড়ে থাকে আর কোণে থাকে একটা টেবিল। গ্রামের সরাইখানাগুলো সাধারণত অন্ধকার আর তাদের কাঠের ফলক দেওয়া দেওয়ালে—অন্যান্য বাড়ীতে বা কুটীরে যে রকম সস্তা অথচ চোখ ঝলসানো ছাপ দেওয়া দেওয়া (নক্সা ইত্যাদি) না থাকলেই নয়—তা একেবারেই দেখতে পাওয়া যায় না। (গ্রামের কুটীরগুলি বা সরাইখানাগুলি বেশ সাদাসিদা অথচ মজবুত, এই বুঝতে হবে।)

আমি যখন সরাইখানাতে ('স্বাগত বন্ধুতে') গেলাম, তখনই সেখানে অনেক লোক জমা হয়েছে।

টেবিলের পিছনে তার নিজের জায়গাটিতে পার্টিশনের জানলাটা একেবারে আড়াল ক'রে একটা ডোরাকাটা সার্ট পরে দাঁড়িয়ে নিকোলাই আইভ্যানিচ। তার প্রকাণ্ড মুখখানায় তার স্বভাব-সুলভ অলস হাসির আভাস। এই অবস্থায় সে ব্লিস্কার্ড এবং গ্যাবলারের জন্যে দু গ্লাস মদ তার মোটা সাদা হাতে ক'রে ঢেলে দিল। ব্লিস্কার্ড আর গ্যাবলার তার একটু আগেই ঘরে এসেছে। তার পিছনে জানলার কাছে একটা কোণে তার তীক্ষ্ণদৃষ্টি পত্নীকে দেখা গেল। ঘরের ঠিক মাঝখানে তুর্কী ইয়াকোড্ (যাস্কা) দাঁড়িয়ে—তেইশ বছরের প্রিয়দর্শন ক্ষীণকায় যুবা নীল নান্‌কিনের লম্বাঝুল কোট গায়ে। তাকে দেখলে মনে হয়, সে বেশ চালাক-চতুর, যেন কোনো ফ্যাক্টরি বা কারখানাতে কাজ করে কিন্তু তাকে দেখলে, তার স্বাস্থ্য যে খুব ভালো, এ কথা বলা চলে না। তার রোগা মুখ, তার বড় বড় চঞ্চল নীল চোখ, তার তীক্ষ্ণ ঋজু নাসার সুকুমার অগ্রভাগ মৃদু নিঃশ্বাসে ঈষৎ কম্পমান, তার প্রশস্ত ললাটের পিছন দিকে ঈষৎ পিঙ্গল, বিবর্ণ কুঞ্চিত সুবিন্যস্ত কেশ, তার প্রস্ফুট, সুন্দর, ভাবময় ওষ্ঠ এবং তার সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল তার অনুরাগময় ভাবপ্রবণ প্রকৃতির পরিচয় দেয়। তখন তার ভয়ানক উত্তেজিত অবস্থা; তার দৃষ্টি তখন স্বাভাবিক নয়, তার নিশ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত, তার হাত দুখানি জ্বর হলে যেমন হয়, সেইরকম ভাবে কাঁপছে, আর তার তখন বাস্তবিকই যেন জ্বরভাব,—সেই উত্তেজনার উত্তাপ, যা—কোনো সমবেত দর্শক বা শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে বক্তৃতা দেবার বা গান গাইবার সময়ে সকলেই অনুভব করে। তার কাছে দাঁড়িয়ে একজন লোক, তার বয়স প্রায় চল্লিশ, তার চওড়া কাঁধ, চওড়া চোয়াল, নীচু কপাল, ক্ষীণপ্রভ তাতারী চোখ, ছোট বসা নাক, চতুষ্কোণ চিবুক, কুচকুচে কালো কড়া চুল। তার মুখ কালো—সীসে রঙ, পাণ্ডুর ওষ্ঠ দেখলে প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হয় সে বন্য, অসভ্য কিন্তু তার সমস্ত মুখমণ্ডলে একটা স্তব্ধ স্বপ্নবিহ্বলতা আছে—যা দেখলে

তাকে অসভ্য বলা চলে না। লোকটি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার একটি পেশীও যেন নড়ে না। সে তার চারিপাশে ধীরে ধীরে দৃষ্টি ফেলে—যেমন ক'রে তাকায় কাঁধে জোয়াল লাগানো বলদ। একরকম আঁটসাঁট পুরনো কোট গায়ে ঝকঝকে পিতলের বোতাম আর তার বিপুল স্কন্ধদেশে একটা পুরনো কালো সিল্কের রুমাল জড়ানো। এরই নাম ওয়াইল্ড মাষ্টার। তার ঠিক সামনেই গীর্জ্জার ছবিগুলির ঠিক নীচে পাতা বেঞ্চির উপরে যাস্কার প্রতিযোগী সেই কিজড্রাইএর ষ্টলওয়ালা। এই লোকটি ছোটখাট মোটাসোটা মজবুত গড়নের, বয়স প্রায় তিরিশ, বসন্তের দাগ শরীরে, মাথার চুলগুলো কোঁকড়ানো, বসা বাঁকানো নাক, সতেজ কটা চোখ, আর অল্প দাড়ি। সে তার চারিদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখছে, হাত দুটো রেখেছে নীচে—অন্যমনস্কভাবে পা দুটো দোলাচ্ছে, পা দিয়ে মাটিতে শব্দ করছে—পায়ে রয়েছে ধরগুলো-রঙানো একজোড়া বুট। ছাই রঙের ছিটের নতুন পালো কোট গায়ে, তাতে ভেলভেটের কলার, নীচে গাঢ় লাল রঙের সার্টের উপর তা বড় সুন্দর মানিয়েছে, বুকের উপর বোতামগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট। বিপরীত দিকের কোণে দরজার দক্ষিণে একটি চাষী লোক টেবিলের সামনে আছে বসে—একটা আঁটো মলিন পোষাকে। কাঁধের কাছটায় প্রকাণ্ড একটা ফুটো। সূর্য্যালোক ছোট ছোট দুটি জানালার ধূলি মলিন সার্শির ভিতর দিয়ে ক্ষীণ, পীতাভ রেখায় এসে পড়েছে, কিন্তু মনে হয় যে, ঘরের স্থায়ী স্বাভাবিক অন্ধকারের সঙ্গে সে আলোক যেন বৃথা সংগ্রাম করছে; তাতে ঘরের সব জিনিষই যেন অস্পষ্টভাবে অংশত সামান্য আলোকিত হ'য়ে উঠেছে। অন্য দিকে ঘরের ভিতরটা এমন ঠাণ্ডা যে, যেই আমি দরজার চৌকাঠ পার হয়েছি, অমনি বাইরের উত্তাপের একটা শ্বাসরোধী ভাব যেন আমার চারিপাশ থেকে একটা অসহ্য বস্ত্রভারের মত খসে গেল।

আমি দেখলাম, নিকোলাই আইভ্যানিচের খদ্দেররা আমার উপস্থিতিতে একটু যেন বিচলিত হল; কিন্তু যখন তারা দেখল যে, নিকোলাই আমাকে বন্ধুভাবে অভ্যর্থনা করল, তখন তারা নিশ্চিন্ত হল এবং আমার দিকে আর ফিরেও তাকাল না। আমি কিছু বিয়ার চাইলাম এবং ময়লা জামাপরা চাষী লোকটির কাছে এককোণে বসে পড়লাম।

অকস্মাৎ গলায় খানিকটা মদ ঢেলে দিয়ে এবং কথাবলার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী করে (যে অঙ্গভঙ্গী না করলে সে একটা কথাও উচ্চারণ করতে পারে না) গ্যাবলার শিস দিয়ে বললে, "ওহে, আচ্ছা ত, আমরা আর অপেক্ষা করি কেন? যদি আরম্ভই করতে হয়, এস আরম্ভ করা যাক। ওহে যাস্কা।" 'যাস্কা' ইয়াকোভের ডাক নাম।

নিকোলাই আইভ্যানিচ সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে সানন্দে বলল: "আরম্ভ করো, আরম্ভ করো।" ষ্টলওয়ালা বেশ শান্তস্বরে বিজ্ঞভাবে বললে, "যে করেই হোক, এস আরম্ভ করা যাক"—বলে আবার আত্মবিশ্বাসের হাসি হেসে বললে, "আমি প্রস্তুত।"

"আর আমিও প্রস্তুত।" বললে ইয়াকোভ, তার কণ্ঠস্বর উত্তেজনায় সতেজ। ব্লিস্কার্ড চেঁচিয়ে উঠে বললে, "আচ্ছা আরম্ভ করো হে ছোকরারা।" কিন্তু সকলেই একবাক্যে ইচ্ছা প্রকাশ করা সত্ত্বেও কেউই আরম্ভ করল না। ষ্টলওয়ালা বেঞ্চি ছেড়ে উঠলই না, তারা যেন সকলে কিসের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

ওয়াইল্ড মাষ্টার বিরক্ত হয়ে তীব্রকণ্ঠে বলল: "নাও, আরম্ভ করো।"

যাস্কা চমকে উঠল। ষ্টলওয়ালা তা'র গায়ের পোষাক টেনে নামিয়ে গলাটা একটু ঝেড়ে নিলে।

সে তা'র কণ্ঠস্বর একটু বদলে ওয়াইল্ড মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করলে, "কিন্তু কে প্রথম আরম্ভ করছে ?" ওয়াইল্ড মাষ্টার ঘরের ঠিক মাঝখানটিতে তা'র দুখানি বিরাট পা ফাঁক করে পাজামার পকেটে দুখানি মোটা হাত ঢুকিয়ে দিয়ে স্থির হয়ে তখনো আছে দাঁড়িয়ে।

"তুমি ভাই ষ্টলওয়ালা, তুমি আরম্ভ করবে।" গ্যাবলার তোৎলামির স্বরে বলল।

ওয়াইল্ড মাষ্টার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। গ্যাবলার একটা অস্পষ্ট শব্দ করল, কিছুই বুঝতে না পেরে ছাদের দিকে একবার তাকাল—কাঁধটা একবার হঠাৎ উঁচু করে তুলল, কিন্তু কিছুই বলল না।

ওয়াইলড মাষ্টার খুব জোর গলায় বললে: "ভাগ্য পরীক্ষা হোক, টেবিলে মদের পাত্তর রাখা হোক।"

নিকোলাই আইভ্যানিচ্ ঝুঁকে পড়ল, আর এক নিঃশ্বাসে বিয়ারের পাত্রটি মেঝে থেকে তুলে নিয়ে টেবিলের উপরে রাখল।

ওয়াইলড মাষ্টার ইয়াকোভের দিকে চেয়ে বললে: "এস।"

ইয়াকোভ পকেট হাতড়ে একটা হাফ পেনি বার করে দাঁত দিয়ে কামড়ে চিহ্ন করে রাখল। ষ্টলওয়ালা তার লম্বা কোটের আস্তিনের ভিতর থেকে একটা নতুন চামড়ার থলে টেনে বার করল। স্বেচ্ছায় থলের সুতোটা খুলে ফেলে হাতের উপর কতকগুলো ভাঙানি (সিকি দুয়ানি আধুলির মত ওদেশী মুদ্রা) ঢেলে ফেলে একটা নতুন হাফ পেনি তার থেকে বেছে নিল। গ্যাবলার তার ভাঙা বিশ্রী ময়লা টুপিটা পেতে ধরল। ইয়াকোভ্ তার হাফ পেনি তাতে ফেলে দিল, এবং ষ্টলওয়ালাও তার হাফ পেনিও তাতে ফেলে দিল।

ওয়াইলড মাষ্টার ব্লিস্কার্ডের দিকে চেয়ে বললে: "তুমি একটা তুলে নাও।"

ব্লিস্কার্ড প্রশান্ত হাসি হেসে টুপিটা দুহাত দিয়ে ধরে নাড়তে লাগল।

মুহূর্ত্তের মধ্যে একটা গভীর স্তব্ধতা এল চারিদিকে। হাফ পেনিগুলো অস্পষ্ট ভাবে টুন টুন করতে লাগল। আমি মন দিয়ে চারদিক তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। প্রত্যেক মুখে একটা তীব্র প্রতীক্ষার ভাব—ওয়াইলড মাষ্টার নিজেই অস্থির হয়ে উঠতে লাগল। আমার পাশে বসেছে সেই ময়লা জামা পরা চাষী লোকটি, তার গলাটা বাড়িয়ে কি হয় দেখবার জন্যে উৎসুক। ব্লিস্কার্ড এইবার টুপীর মধ্যে হাত পুরে ষ্টলওয়ালার হাফ পেনিটি বার করল। সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ইয়াকোভ্ একটু অপ্রস্তুত হ'ল আর ষ্টলওয়ালা তা'র চুলের উপর দিয়ে হাতখানা একবার বুলিয়ে নিল।

গ্যাবলার চেঁচিয়ে বললে, "এই তো, আমি ব'লেছি—তুমিই প্রথম আরম্ভ করবে। বলিনি কি ?"

"আচ্ছা, আচ্ছা, চেঁচামিচি ক'রো না"—ওয়াইলড মাষ্টার ঘৃণার সঙ্গে বলল। "আরম্ভ কর"—সে ষ্টলওয়ালার দিকে ইসারা ক'রে বলল।

"কি গান আমাকে গাইতে হবে?"—ষ্টলওয়ালা একটু ভীত ত্রস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করল। ব্লিস্কর্ড উত্তর করল: "যা তোমার পছন্দ, যা তুমি ভালো মনে করো, তাই গাও।"

নিকোলাই আইভ্যানিচ্ সানন্দে তা'র হাতখানা বুকের উপর বুলোতে বুলোতে বললে, "তুমি যা' পছন্দ করবে, তাই গাইবে নিশ্চয়ই। সে বিষয়ে তোমার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। যা ভালো মনে করো, তাই গাও। শুধু ভালো ক'রে গাওয়া চাই। পরে আমরা একটা ভালো রকম মতামত দেব।"

গ্যব্লার তা'র খালি গেলাসের প্রান্তভাগ চাটতে চাটতে বললে: "ভালো রকম মতামত হওয়া চাই অবিশ্যি!"

ষ্টলওয়ালা তা'র কোটের কলার নাড়তে নাড়তে বললে, "ভাই সব, একটু গলাটা ঝেড়ে নিতে দাও তোমরা!"

"না, না—কোনো বাজে কথা চলবে না, এস, আরম্ভ ক'রে দাও"—ওয়াইলড্ মাষ্টার আপত্তি জানিয়ে বলল।

ষ্টলওয়ালা এক মিনিট কি ভাবল, মাথা নাড়ল, তারপর একটু এগিয়ে এল। ইয়াকোভের দৃষ্টি কিন্তু তার ওপরে রয়েছে লেগে।

কিন্তু প্রতিযোগিতার বর্ণনা দেবার আগে আমার এই গল্পের প্রত্যেকটি চরিত্রের বিষয়ে কিছু কিছু বলা বোধ হয় অন্যায় হবে না। 'স্বাগত বন্ধু'তে সাক্ষাৎকালে তাদের মধ্যে কারো কারো জীবনের কথা আমার জানা হয়েছিল, অপর সকলের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি আমি পরে সংগ্রহ করেছিলাম।

গ্যাবলারকে নিয়েই আরম্ভ করা যাক। এই লোকটির আসল নাম হ'ল—এভ্গ্র্যাফ্ আইভ্যানোভিচ; কিন্তু চারিপাশের সকলেই তাকে গ্যাবলার ভিন্ন অন্য নামে ডাকত না। সে নিজেও নিজেকে গ্যাবলার ব'লে জানত। নামটি তাকে বড় সুন্দর মানিয়েছিল। তার ছোট ছোট সদাচঞ্চল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্গে বোধ হয় অন্য নাম বেশী খাপ খেত না। সে বিবাহ করে নি, তার শরীরও ছিল শীর্ণ, কারো বাড়ীতে চাকর-গিরি করাই ছিল তার পেশা, কিন্তু কোনো বাড়ীতেই সে বেশীদিন চাকরী করতে পারে নি—তার প্রভুরা তাকে তাড়িয়ে দিতে পারলেই বাঁচত; এইভাবে কোনো কাজ না থাকলেও, একটা আধপেনি রোজগার না ক'রেও অন্য লোকের ঘাড় ভেঙে প্রত্যহ সে মদ খেত। অনেক লোকের সঙ্গে ছিল তার পরিচয়—যারা তাকে মদ বা চা খাওয়াত—ত'ারা যে ত'ার কি গুণ দেখে তা'কে খাওয়াত, তা তারা নিজেরাও জানত না। কারণ, লোককে আনন্দ ত সে দিতেই পারত না, উপরন্তু সে তার অর্থহীন বাক্যস্রোতে, অসহনীয় অন্তরঙ্গতায়, মৃগী বা সন্ন্যাসরোগগ্রস্তের মত অঙ্গভঙ্গীতে আর অবিশ্রাম অস্বাভাবিক হাসিতে প্রত্যেককেই বিরক্ত করত। সে না পারত গান করতে, না পারত নাচতে। সে জীবনে কখনো বোধগম্য কথা বলে নি, সে কেবল বাজে বকত, প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলত, যাকে সত্যসত্যই 'গ্যাবলার' বলে, সে ছিল তাই। তবু চারিপাশে ত্রিরিশ মাইলের মধ্যে তাকে না হ'লে কোনো মদ বা পানীয়ের আড্ডা জমত না। সুতরাং লোকে তার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল এবং জেনে শুনে তার দুঃসঙ্গকে নিজেদের মধ্যে

খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। এ কথা সত্য যে, সবাই তাকে ঘৃণার চোখে দেখত। কিন্তু শুধু ওয়াইল্ড মাষ্টারই তার নির্ব্বোধ বাক্যস্রোত বা পাগলামির প্রকৃত ওষুধ জানত।

ব্লিস্কার্ড একেবারেই গ্যাবলারের মত না। তার ডাকনামও তাকে মানিয়েছিল—যদিও অন্য লোক যে ভাবে তাকায়, সেও ঠিক সেইভাবেই তাকায়—তবু তার 'ব্লিস্কার্ড' নাম তাকে মানিয়েছিল। এ কথা সবাই জানে যে, রাশিয়ার কৃষকরা ভালো ডাকনাম রাখতে পারে—এ ক্ষমতা বা গুণ তাদের আছে। এই লোকটির বিস্তৃত অতীত জীবনকাহিনী সংগ্রহ করবার চেষ্টা সত্ত্বেও, তার জীবনের অনেক কথা আমার কাছে অন্ধকারে রয়ে গেছে। অন্য লোকের কাছেও তা অন্ধকার হয়ে আছে। পণ্ডিত ব্যক্তিদের ভাষায়—বিস্মৃতির অন্ধকারে সমাহিত ঘটনা। আমি শুধু এই তথ্য জেনেছিলাম যে, সে এক সন্তানহীনা বৃদ্ধার অধীনে ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানী করেছে। তার উপর ভার দেওয়া ছিল তিনটি ঘোড়ার, সে সেই তিনটি ঘোড়া নিয়ে অন্তর্হিত হয়; এক বছর তার আর কোনো খোঁজ-খবর পাওয়া যায় না, তারপরে যাযাবর জীবনের অসুবিধা এবং দুঃখের অভিজ্ঞতায় নিজের অবস্থা বুঝতে পেরে সে তার প্রভুর কাছে আবার ফিরে গিয়ে তার ক্ষমা ভিক্ষা করল। তখন সে হয়েছে খোঁড়া। অল্প কয়েক বছরের মধ্যে সে তার আদর্শ চরিত্র বলে তার পূর্ব্ব অপরাধ লোকের মন থেকে দূর করল এবং প্রভুর অশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে তাঁর বিশেষ প্রীতিভাজন হ'ল এবং সে তার উপর তাঁ'র সম্পূর্ণ আস্থা অর্জ্জন করতে পেরেছিল এবং অবশেষে সে একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী হয়েছিল এবং প্রভুর মৃত্যুর পরে, সে কি উপায়ে জানি না, স্বাধীনতা লাভ করল। সে শেষটায় ব্যবসায়ীদের দলে ভর্ত্তি হয়েছিল। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে শাক-সব্জির ক্ষেত ভাড়া খাটিয়ে খাটিয়ে অর্থোপার্জ্জন ক'রে সে ক্রমশঃ বড় লোক হ'ল—এখন সে বেশ আরামে এবং সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটায়। জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা পেয়েছে সে—জানে সে জীবনে কোন্ দিকে সুবিধা সুযোগ মেলে। বিজ্ঞতাই তাকে পরিচালিত করত—ভালো বা খারাপ স্বভাব না। চারিদিকে নানা দরজায় সে ধাক্কা দিয়ে বেড়িয়েছে—মানুষকে বুঝেছে। আর তাদেরকে খাটিয়ে কি ভাবে নিজের সুবিধা করে নেওয়া যায়, তা সে জানে। ধূর্ত্ত খ্যাঁকশেয়ালের মত সে সাবধানী, উৎসাহী—যদিও সে বুড়ী দিদিমার মত গল্পপ্রিয়, তবু সে নিজের কথা কাউকে বলত না, কিন্তু অপরের মুখ দিয়ে ইচ্ছামত কথা বলিয়ে নেবার ক্ষমতা তার ছিল। সে যে বোকা এ প্রকার ভাণ সে করত না, যদিও তার মত বুদ্ধিমান চতুর লোক ও ব্যাপারটি ক'রে থাকে। কিন্তু এ রকম করলে, বোধ হয় সে কাউকে ঠকাতে পারত না। তার চোখজোড়ার মত অমন তীব্র তীক্ষ্ণ ছোট ছোট ধূর্ত্ত চোখ আমি ত আর কারো দেখিনি। 'ওরেল'-এ তার চোখকে 'মিটমিটে' তীক্ষ্ণদৃষ্টি চোখ বলত। চোখজোড়া দেখলে মনে হয়,—তা যে শুধু ফাঁকা তাকিয়ে আছে তা নয়, যার দিকে তার চোখ পড়েছে, তাকে যেন সে তার দৃষ্টি দিয়ে বিদ্ধ করেছে, তার সর্ব্বাঙ্গ যেন সে তার দৃষ্টি দিয়ে পরীক্ষা করছে। কোনো একটা ব্যাপার—যা হঠাৎ দেখলে মনে হয় এর ভেতরে জটিল কিছু নেই ব্লিস্কার্ড সেই ব্যাপারটা নিয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়ে দিচ্ছে, তা নিয়ে ভাবছে, আবার এমনও দেখা গিয়েছে যে ব্লিস্কার্ড সেই ব্যাপারটি নিষ্পন্ন করতে হঠাৎ কোনো কিছু না ভেবে এমন দুঃসাহসের কাজ ক'রে বসল, যা দেখে সবাই ভাবতে পারে ব্লিস্কার্ড এইবার বুঝি বা যায়। কিন্তু

নিশ্চিন্ত হওয়া গেল এই দেখে যে, ব্লিস্কার্ড তাতে সফলকাম হল—সবই তারপর ভালোভাবে চলতে থাকে। সে সৌভাগ্যশালী পুরুষ, এবং সে তার নিজের অদৃষ্টে বিশ্বাস করত—অমঙ্গলকে সে ডরাত। মোটামুটি ধরতে গেলে ব্লিস্কার্ড কুসংস্কারবাদী ছিল। তাকে কেউই ভালোবাসত না, কারণ কারো সঙ্গে তার বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কিছু ছিল না, কিন্তু লোকে তাকে সম্মান করত। তার সংসারে আপনার বলতে ছিল একটি মাত্র ছেলে—তাকে সে খুবই যত্ন করত। আর ওরকম বাবা যার, সে ছেলে নিশ্চয়ই পরে ভালো হবে, এ ধারণা সকলেরই ছিল। বুড়োরা প্রায়ই কাণাঘুষা করত, "ছোট ব্লিস্কার্ড" বড় হ'লে তার বাপেরই মত হ'বে। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় তাদের মাটির ঘরের দাওয়ায় ব'সে তারা এই নিয়ে আলোচনা করত, আর সবাই যে ও কথা বিশ্বাস করত—তা বলাই বাহুল্য মাত্র।

ষ্টলওয়ালা আর ইয়াকোভ সম্বন্ধে বেশী কিছু বলার দরকার নেই। ইয়াকোভকে 'তুর্কী' বলা হ'ত, কারণ তার মা ছিলেন তুরস্কদেশীয়া। যুদ্ধে তিনি বন্দী হন। নিজে সত্যকার শিল্পী ছিলেন, এক ব্যবসায়ীর কাগজের কারখানায় তিনি জলসরবরাহের কাজ করতেন। ষ্টলওয়ালার জীবন সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি নে। তাকে দেখে আমার বণিক-শ্রেণীর একজন পাকা সহুরে লোক ব'লে মনে হয়েছিল, যে কোনো বিষয়েই সে যেন অভিজ্ঞ এবং সুপটু। কিন্তু ওয়াইল্ড মাষ্টার সম্বন্ধে আরও বেশী কিছু বলা দরকার।

এই লোকটিকে দেখলেই এই ধারণা হবে যে কি দুর্দ্দম শক্তি, কি নিরেট পাষাণের মত ভারী। তার গড়নটাই ছিল বেখাপ্পা ধরণের, চাষাড়ে যাকে চলতি কথায় বলে। কিন্তু তার চারি পাশে ছিল একটা জিগীষুর তেজস্বিতা,—আর, আশ্চর্য্যের কথা এই যে, তার ভালুকের মত কুশ্রী আকৃতিতেও একটা নিজস্ব শ্রী-ছাঁদ যে একেবারেই ছিল না এমন নয়। বোধ হয় এই প্রসন্নতা বা শ্রী—তার আত্মশক্তিতে ধ্রুব বিশ্বাসের ফল। প্রথমেই বিচার করা যায় না, এই শক্তির অবতার বা হার্‌কিউলেস্‌কে কোন্ পর্য্যায়ে ফেলা যেতে পারে। তাকে কারো বাড়ীর চাকর বলা যেতে পারে না, ব্যবসায়ী সে নয়, বেকার, গরীব কেরাণীও সে নয়, সর্ব্বহারা ছোট জমিদারও সে নয়—যে শিকার করবে বা যুদ্ধে যোগ দেবে। বাস্তবিক সে ছিল আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। কেউই জানত না যে, সে কোথা থেকে এসেছে, এবং কিসের জন্যই বা আমাদের জেলাতে তা'র শুভাগমন হল। শোনা যায় যে, সে স্বাধীন রায়ৎদার বংশে জন্মেছে, আর কোনো এক সময়ে কোথাও সরকারী চাকুরীও সে করেছে, কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চয় করে কেউ কিছু বলতে পারে না। এমন কেউই ছিল না, যার কাছ থেকে তার সম্বন্ধে কিছু জানতে পারা যায়—অবশ্য তার কথা তার কাছে কে জানতে যাবে? সে ছিল অত্যন্ত বিষণ্ণ এবং অত্যন্ত নীরব মানুষ। কেউ জানত না কি করে তার দিন চলে। কোনো ব্যবসাই তার ছিল না, কারো সঙ্গে তার দেখা সাক্ষাৎ ছিল না, কারো সঙ্গে সে মিশতও না, তবু তার হাতে ছিল টাকা, সে টাকা কম হলেও, তার যে একেবারেই কিছু ছিল না এমন নয়; তার প্রকৃতিতে ক্লান্তি বা অবসন্নতা একেবারেই ছিল না, তাকে ক্লান্ত বা অবসন্ন বলাই যায় না। সে থাকত এমন ভাবে যে, তার পাশে কে আছে, সে বিষয়ে সে মোটেই সজাগ নয়, আর কারো কথা সে যে চিন্তা করে—এ কথা তাকে দেখে বোঝাই যেত না। ওয়াইল্ড মাষ্টার (এইটাই

তার ডাক নাম তার আসল নাম ছিল পেরিভ্লিসভ্) সমস্ত জেলায় অখণ্ড প্রতাপে বিরাজ করত। লোকে তার কথা আগ্রহের সঙ্গে শুনত; অথচ কাউকে কিছু আদেশ করার কোনো ক্ষমতা বা অধিকার তার ছিল না। আর যে লোকের সামান্য সংস্পর্শে সে এসেছে, তাকে সে তার অধিকার-বোধের বিন্দুমাত্র আভাসও দেখাত না। সে কথা বলত আর লোকে তা শুনে তাকে মান্য করত, তার বাধ্য হত। শক্তি যার আছে তার আপনা থেকেই একটা প্রভাব এসে পড়ে। সে একেবারেই মদ খেত না, মেয়েদের সঙ্গ তার ভালো লাগতো না, এ ছাড়া তার গান গাইবার ছিল প্রবল অনুরাগ। এই লোকটির সম্বন্ধে অনেকটাই ছিল রহস্যাবৃত। মনে হ'ত, তার ভেতরে নিঃশব্দে নিহিত আছে প্রচণ্ড শক্তি আর সে শক্তি যদি একবার জাগ্রত হয়, যদি একবার বন্ধনমুক্ত হয়, তাহলে তা তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করবে আর তার পাশে যা কিছু থাকবে তাও বিধ্বস্ত হবে—এ সম্বন্ধে যেন সে সজাগ ছিল। আমার মনে হয়, এই লোকটির জীবনে তেমন ঘটনা কখনো না কখনো ঘটেছে। সে নিজের চারিদিকে যে ধৈর্য্য এবং গাম্ভীর্য্যের বাঁধ দিয়েছে—একবার হয়ত সে জীবনে ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে এসেছে বলেই। আমাকে বিস্মিত করেছে তার মধ্যে দুটো জিনিষের সংমিশ্রণ—একটা সহজাত স্বভাবসুলভ হিংস্র ভীষণতা এবং ঠিক সমান সহজাত ঔদার্য্য। এ রকম বিপরীত ধর্ম্মের সংমিশ্রণ আমি আর অন্য কোনো মানুষের চরিত্রে দেখি নি।

তারপরে ত ষ্টলওয়ালা এগিয়ে এল, আর চোখদুটো অর্দ্ধমুদ্রিত করে গান আরম্ভ করল—একেবারে উঁচু সপ্তমে দিল সুর চড়িয়ে। তার গলা মিষ্ট এবং তার গান শুনতে ভালোই লাগে—তবু তা একটু মোটা। সে বনের পাপিয়ার মত তার গলার সুর নিয়ে কসরৎ করতে লাগল। ক্রমাগত মোচড় দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দ্রুততম সঞ্চারীতে, সুরের নানারকম কারু-সাধনার পরিচয় দিয়ে, কখনো উচ্চ কখনো নিম্ন তানে, বারে বারে সে তুলতে লাগলো সুর সপ্তমে, এবং বিশেষ যত্ন এবং চেষ্টা করে সেই উচ্চতম সপ্তম যেন সে দীর্ঘক্ষণ ধরে স্থায়ী করতে প্রয়াস পেল। তারপর সে খানিকটা থামে—তারপরেই যা হবার হোক এই রকম ভাবে সাহস করে আবার সপ্তমে তোলে। মাঝে মাঝে তার গলার কাঁপন বেশ সাহসের পরিচয় দেয়। মাঝে মাঝে তা শুনে হাসি আসে। সত্যকার গানের জহুরীকে তা নিশ্চয়ই তৃপ্তি এবং আনন্দ দেবে আর যদি কোনো জার্ম্মাণ তা শোনে তা হ'লে সে বেজায় চটে যাবে। সে কিন্তু একজন সত্যকারের রাশিয়ান। বেশ সুন্দর প্রাণবন্ত নাচের সুরে সে একখানা গান গাইল। তার নানা কারুকাজের ভেতর থেকে গানখানির যে শব্দগুলি আমি উদ্ধার করতে পেরেছি তা' এই—

"এক টুকরো ছোট্ট জমি, যুবতী,
তোমার জন্যে আমি চাষ করব,
আর তাতে তোমার জন্যে, যুবতী
ছোট্ট লাল ফুলের বীজ দেব ছড়িয়ে।"

সে গান গাইতে লাগল; সবাই শুনতে লাগল তার গান গভীর মনোযোগের সঙ্গে। সে যেন মনে মনে ভাবছে, তার গানের সমঝদার শুধু গাইয়ে যারা, তারাই—আর এই মনে করে সে তার শ্রেষ্ঠ গান গাইবার প্রাণপণ প্রয়াস করতে লাগল। আর, বাস্তবিকই আমাদের দেশের দিকে সবাই গান

ভালোও বাসে, গান গাইতেও জানে। ওরেলের বড় রাস্তার ধারে সারজিভস্কো গ্রামের লোকরা সমস্ত রাশিয়া মহাদেশে দোহারি-গান গাইবার জন্য বিখ্যাত। ষ্টলওয়ালা অনেকক্ষণ ধরে গান গাইতে লাগল—শ্রোতারা কিন্তু খুব বেশী বাহাবা দিল না। মাঝে মাঝে শ্রোতাদের ভেতর থেকে কোনও সাড়া সে পেল না। অবশেষে একখানা ভালো গান শেষ হলে—ওয়াইলড মাষ্টারও যা শুনে বিস্মিত না হয়ে পারে নি—গ্যাবলার সানন্দে না চেঁচিয়ে থাকতে পারল না। প্রত্যেকেই একটু সচকিত হয়ে উঠল। গ্যাবলার আর ব্লিস্কার্ড মৃদু নিম্নস্বরে আলোচনা করতে লাগল। শেষে সবিস্ময়ে বলে উঠলো "বাহবা বেশ হয়েছে; গাও, গাও আবার হোক একখানা!" নিকোলাই আইভ্যানিচ্ টেবিলের পিছন থেকে সম্মতিসূচক এ পাশ ও পাশ করে মাথা নাড়ছিল। শেষটায় গ্যাবলার তার পা দোলায়। পা দিয়ে মেঝেয় শব্দ করে। আর মাঝে মাঝে কাঁধ উঁচু করে। আর যাস্কার চোখ জ্বলন্ত কয়লার মত জ্বলতে লাগল, সব শরীর তার কাঁপতে লাগল যেন একটি পাতা, আর মাঝে মাঝে অত্যন্ত দুর্ব্বল ভীরু হাসি সে হাসতে লাগল। শুধু ওয়াইলড মাষ্টারের মুখভাবে কোনো পরিবর্ত্তন দেখা গেল না, পূর্ব্বেরই মত সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু ষ্টলওয়ালার দিকে স্থির নিবদ্ধ তার চোখ দুটোর দৃষ্টি যেন কিছু কোমল হয়ে এল—তবু তার ওষ্ঠের উপরে দেখা গেল ঘৃণার ভাব তখনো রয়েছে। সাধারণের কাছ থেকে একটা প্রশংসার সাড়া পেয়ে ষ্টলওয়ালার সাহস বেড়ে গেল,—সে তখন সুরের ঘূর্ণাবর্ত্ত সৃষ্টি করতে লাগল, আর এত দ্রুত কণ্ঠের কারুকাজ আরম্ভ করল, জিহ্বার এত ওলট-পালট হল, গলা নিয়ে এত দারুণ খেলা সে করল, যে যখন তার গানের শেষ কলিটি সে গাইল, তার শরীর তখন অবসন্ন হয়ে এলিয়ে পড়েছে, তখন জনতা সমবেত চীৎকারে যেন ভীষণ ভাবে উৎক্ষিপ্ত হয়ে তাকে অভ্যর্থনা করল। গ্যাবলার দৌড়ে গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরল, আর তার দীর্ঘ হাড় বার করা বাহু দিয়ে তাকে প্রায় শেষ করে দেবার উপক্রম করল। নিকোলাই আইভ্যানিচের তৈলাক্ত মুখে যেন একটা দীপ্তি ভেসে উঠল—আর সে যেন বয়সে অনেক ছোট হয়ে গেল। যাস্কা উন্মাদের মত চীৎকার করে বলল, "চমৎকার, চমৎকার!" আর আমার পাশে ময়লা জামা পরে যে চাষী লোকটি বসেছিল, সেও নিজেকে আর সামলাতে পারল না। টেবিলের উপর এক কিল মেরে সে বলল—"আহা, বেশ সুন্দর!" আর সে যেন খুব বড় একজন গানের সমঝদার, এমনি ভাবে একদিকে থুতু ফেলল।

গ্যাবলার চেঁচিয়ে বলল, "ওহে ভায়া, তুমি আমাদের আজ বেশ গান শুনিয়েছ, খাসা গান।" তখনো সে ক্লান্ত ষ্টলওয়ালাকে জড়িয়ে রয়েছে দুই হাত দিয়ে। "এ কথা আজ আর অস্বীকার করা চলে না—আমরা আজ বড় আনন্দ পেয়েছি। তোমারই জয়—বুঝলে ভায়া, তোমারই জয়। তোমাকে এর জন্যে বহু ধন্যবাদ, ও পাওর তোমারই। যাস্কা তোমার থেকে অনেক যোজন দূরে—ও পাত্তাই পাবে না তোমার কাছে। যোজন—একেবারে যাকে বলে বুঝলে ভায়া!" (আবার সে ষ্টলওয়ালাকে ধরলে চেপে বুকে)

ব্লিস্কার্ড বিরক্ত হয়ে বলল: "ওকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—তোমার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় আছে? ওকে বসিয়ে দাও ঐ বেঞ্চিতে। দেখছ না ও কত ক্লান্ত হয়েছে, তুমি এখনো ছেলেমানুষ, একেবারে ছেলেমানুষ। ভিজে পাতার মত ওর সঙ্গে সেঁটে রয়েছ কেন বলো দেখি?"

"আচ্ছা, তা হলে ও বসুক—আর আমি ওর সম্মানে এক পাত্তর খাই!"—এই বলে গ্যাবলার টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর ষ্টলওয়ালার দিকে ফিরে বলল: "তোমার খরচায় কিন্তু ভাই!"

ষ্টলওয়ালা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো—বেঞ্চিতে বসে টুপি থেকে একখণ্ড রুমাল বার করে মুখের ঘাম মুছতে লাগল, আর গ্যাবলার তৃষ্ণার্ত্তের মত তাড়াতাড়ি গ্লাস শেষ করে নাকের একটা শব্দ করে পাকা মাতালের মত একটা ক্লান্ত হতাশ্বাসের ভাব এনে চুপচাপ বসে রইল।

নিকোলাই আইভ্যানিচ আদর করে বলল: "তোমার গান চমৎকার ভায়া, চমৎকার! এখন তোমার পালা, যাস্কা, মোটেই ভয় পেয়ো না—আমরা দেখব, কে ভালো গায়! আমরা দেখব,—ষ্টলওয়ালা যদিও ভালো গায়—সত্যিই সে ভালো গায়!"

'বড় সুন্দর গায়'—নিকোলাই আইভ্যানিচের স্ত্রী বলল—বলে সে ইয়াকোভের দিকে মৃদু হেসে তাকাল।

আমার প্রতিবেশী মৃদু নিম্ন অথচ ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে বল্ল: "হ্যাঁ, বড় সুন্দর গায়"।

গ্যাবলার আবার বাঙ্‌নৈপুণ্য দেখিয়ে বলল: "অসভ্য বুনো জংলী কোথাকার!"—এই ব'লে কাঁধে ফুটো সেই চাষী লোকটার কাছে গিয়ে আঙুল দিয়ে তাকে দেখিয়ে তাকে অপমান করে বলতে লাগ্‌ল: "যাও, যাও—জংলী কোথাকার, বনের দেশ থেকে এসেছে এই দৈত্য, তুমি এখানে কেন হে?" হাসতে হাসতে চেঁচিয়ে বলল গ্যাবলার।

বেচারী চাষী অত্যন্ত লজ্জিত হ'ল। উঠে সে স'রে পড়বার চেষ্টায় ছিল, হঠাৎ ওয়াইলড মাষ্টারের বজ্রকঠিন কণ্ঠ শোনা গেল। দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে সে বলল: "হতভাগা পাজী গ্যাবলার কি বলে?"

গ্যাবলার মৃদু কণ্ঠে বলল: "কিছু না, আমি কিছুই করি নি—আমি শুধু—"

"ঐ যে, ঠিক হয়েছে, চুপ করে থাকো।" ওয়াইল্‌ড মাষ্টার কঠোর কণ্ঠে জবাব দিল। দিয়ে সে বলল: "ইয়াকোভ, এই বার তোমার পালা, তুমি এইবার আরম্ভ করো।"

ইয়াকোভ তা'র গলায় হাত দিল। "শোন ভাই সব, দেখ—দেখ, আমি কিছু জানি নে, সত্য বলছি, এই যে—"

"খুব হ'য়েছে পেছিয়ে যাও কেন? লজ্জিত হওয়া উচিত তোমার! যত দূর পারো গাইবে, তোমার গাইবার শক্তি আছে যখন।"

ওয়াইল্‌ড মাষ্টার খুব ভরসা ক'রে তাকিয়ে রইল। ইয়োকোভ এক মিনিট প্রায় স্থির হ'য়ে রইল। সে চারিদিকে তাকিয়ে তা'র হাত দিয়ে মুখ ঢাকল। সকলেরই দৃষ্টি তা'র দিকে নিবদ্ধ, বিশেষ করে ষ্টল্‌ওয়ালার, তার মুখে লেগেছিল একটু সামান্য অনিচ্ছাকৃত অস্বাচ্ছন্দ্য, সেটা তা'র সহজাত আত্ম-বিশ্বাসের ভাব থেকে অথবা তা'র বিজয়সাফল্য থেকে হ'তে পারে। সে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে এবং হাত দুটো রেখেছে পিছনে কিন্তু পূর্ব্বের মত পা দু'টো ফাঁক করে নি। অবশেষে যখন ইয়াকোভ তা'র মুখ থেকে হাত দুটো সরিয়ে ফেলল, তখন দেখা গেল তা মৃতের মত পাণ্ডুর; তার চোখ দুটো তা'দের আনত পল্মের ভিতর থেকে ঈষৎ ঝিক্ ঝিক্ করতে লাগল। সে

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে গান আরম্ভ করল। তা'র কণ্ঠের প্রথম সুর যা কানে এল, তা অতি অস্ফুট, আর অসম—মনে হল তা যেন তা'র বুকের ভিতর থেকে বেরুচ্ছে না, কিন্তু তা যেন এল বহুদূর থেকে জলের উপর দিয়ে বাতাসের উপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে—অকস্মাৎ ঘরে চলে এল ভাসতে ভাসতে। এই কম্পমান লঘু ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত সুর আমাদের সকলের মধ্যে একটা অদ্ভুত ভাবের আবেশ নিয়ে এল। আমরা পরস্পরের দিকে চাইতে লাগলাম আর নিকোলাই আইভ্যানিচের স্ত্রী যেন গানে খুব মন দিলেন ব'লে মনে হল। এই প্রথম তানের পরই এল আর একটি তান, এ স্বর দীর্ঘক্ষণস্থায়ী এবং সুস্পষ্ট কিন্তু তবু মনে হল তা যেন তখনো কাঁপছে—যেমন কাঁপে বীণার তার হঠাৎ যদি তাতে অন্যমনস্ক আঙুলের পরশন লাগে—যেমন তা কাঁপতে কাঁপতে সর্ব্বশেষে দ্রুততানে মিলিয়ে যায়। দ্বিতীয়ের পরই এল তৃতীয় এবং এইবারে ক্রমশঃ সুরের আগুন পড়ল ছড়িয়ে এবং স্বরগুলো মিলিত হয়ে একটি করুণ সুরলহরীতে, কলধ্বনিত হয়ে উঠলো। "সে মাঠে নেই একটিও ছোট পথ"—সে গাইল, আর তা আমাদের কানে অতি করুণ এবং মিষ্ট লাগল। আমি স্বীকার করতে বাধ্য, আমি কদাচিৎ শুনেছি সে রকম কণ্ঠস্বর, তা ঈষৎ ভাঙা ভাঙা আর তাকে খুব ভালো বলা চলে না, প্রথমে যেন মনে হয়, তাতে রয়েছে ঈষৎ অসুস্থ দেহমনের পরিচয়; কিন্তু একটু মন দিয়ে শুনলে মনে হয় তাতে আছে খাঁটি গভীর আবেগ, আছে যৌবন আর মিষ্টতা, আর আছে কতকটা মোহময়, অসাবধানী অথচ কারুণ্যময় নৈরাশ্য। আমার মনে হল সেই কণ্ঠস্বরের অন্তর্নিহিত সত্তায় স্পন্দিত এবং অনুরণিত হচ্ছে একটা অকৃত্রিমতা এবং ওজঃশক্তি—যে সত্তায় জড়িত বিজড়িত হয়ে আছে সমগ্র রাশিয়া দেশ, মনে হয় শ্রোতার অন্তরে তা সরল ভাবে অনুবিদ্ধ হবে, রাশিয়ার যা কিছু নিজস্ব সম্পদ তা সকলের মনে এই গানের এই কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে সরল সহজভাবে অনুপ্রবিষ্ট হবে। গীতলহরী—স্ফীত হয়ে প্রবাহিত হতে লাগল। ইয়াকোভ চরম উৎসাহে আত্মবিস্মৃত হল। এখন আর সে দুর্ব্বল নয়, সে তার শিল্পের উৎকর্ষে এবং উদ্‌ভাসনে নিজকে সমর্পণ করল, তার কণ্ঠস্বর আর কাঁপল না। কিন্তু তা মৃদু গতিতে স্পন্দমান হ'তে লাগল, কিন্তু তাতে তার অন্তরের আবেগের অনুরাগ, যা শ্রোতামাত্রের অন্তরকে তীরবৎ বিদ্ধ করে—এমন কিছু বুঝতে পারা গেল না। এইভাবে সে ক্রমশঃ তার গানে শক্তি এবং স্থৈর্য্য পেতে লাগল। আমার মনে আছে, একদা সূর্য্যাস্তবেলায় এক বিস্তীর্ণ বালুকাময় সমুদ্রতীরে, যখন সমুদ্রে জোয়ার আসে নি, এবং দূর থেকে সমুদ্রের গুরু গুরু গম্ভীর গর্জ্জন শুনতে পাওয়া যায়, আমি একটি বৃহৎ শ্বেতবর্ণ সামুদ্রিক 'গাল' পাখী দেখেছিলাম। সে স্থির হয়ে বসেছিল, অস্তমান সূর্য্যের রক্তিম আভার সম্মুখে সে তার কোমল অংশুকের মত বক্ষতল পেতেছিল। কেবল মাঝে মাঝে তার বিশাল পাখা প্রসারিত করে অতিপরিচিত সমুদ্রকে আর মজ্জমান বিবর্ণ হরিদ্রাভ সূর্য্যকে অভ্যর্থনা করছিল। ইয়োকোভের গান শুনবার সময় আমার এই দৃশ্য মনে পড়তে লাগল। সে গান গাইতে লাগল—তার যে কোনো প্রতিযোগী আছে, আর আমরা যে তার সামনে বসে আছি, এ কথা সে সম্পূর্ণ ভুলে গেল। সাহসী, সুদক্ষ সাঁতারু যেমন তরঙ্গের সাহায্যেই অগ্রসর হয়, তেমনি সে আমাদের নিঃশব্দ অথচ অনুরাগময় সহানুভূতির দ্বারা সমর্থিত বলে মনে হল। সে গাইতে লাগল, এবং তার কণ্ঠস্বরের প্রত্যেকটি শব্দে আমরা যেন আমাদের অত্যন্ত প্রিয় এবং একান্ত আত্মীয়ের মত কিছু অনুভব করতে লাগলাম—অনুভব করতে লাগলাম একটা

মহিমান্বিত বিস্তৃতি এবং মনের একটা সুদূর প্রসার (যাকে সময়ের এবং আয়তন-চেতনার দ্বারা ধরে রাখা যায় না, এমনি একটা কিছু)—মনে হতে লাগল, যেন অতি-পরিচিত 'ষ্টেপ' * আমাদের চোখের সম্মুখে উদ্ঘাটিত এবং উদ্ভাসিত হয়ে সীমাহীন দিক্‌চক্ররেখায় প্রসারিত হয়ে পড়ছে। আমার বুকে উদ্‌বেলিত হতে লাগল অশ্রুভার এবং চোখ বেয়ে তা ঝরে পড়বার উপক্রম করতে লাগল। হঠাৎ আমি চাপা কান্নার স্বরে চমকে উঠলাম; চারিদিকে তাকিয়ে দেখি, সরাইখানার মালিকের স্ত্রী কাঁদছে,—তার বক্ষস্থল জানলার সঙ্গে চেপে ধরেছে সে। ইয়াকোভ তার দিকে চকিত দৃষ্টি ফেলে আরও সুন্দর করে আরও মিষ্ট করে গাইতে লাগল। নিকোলাই আইভ্যানিচ নীচুদিকে তাকিয়ে রইল, ব্লিস্কার্ড ঘুরে দাঁড়িয়েছে; গ্যাবলার সম্পূর্ণ অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বোকার মত মুখখানা হাঁ করে আছে। এককোণে সেই গরীব চাষী লোকটি অতি মৃদুভাবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে এবং তার মাথাটি নাড়তে নাড়তে অতি করুণ অস্পষ্ট গুঞ্জন করছে। আর ওয়াইল্ড মাষ্টারের লৌহকঠিন মুখাকৃতিতে তার ঝুলেপড়া ভ্রূর নীচ থেকে ধীরে ধীরে একবিন্দু অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। ষ্টলওয়ালা তার হাত মুষ্টিবদ্ধ করে কপালের উপর তুলল—এবং একটুও নড়ল না। জানি নে—সাধারণের এইরকম উত্তেজিত ভাব কি ভাবে শেষ হত—যদি না ইয়াকোভ একটি তীব্র উচ্চ তানে তার গানের পরিসমাপ্তি ঘটাত—মনে হল তার গলা যেন হঠাৎ ভেঙে গেছে। কেউ চীৎকার করল না, কেউ একটু নড়ল না। সবাই যেন প্রতীক্ষা করে রইল এই দেখবার জন্যে যে, সে আবার গায় কি না। সে তার চোখ মেলে চাইল, আমাদের স্তব্ধতায় সে যেন বিস্মিত হয়েছে এমনিভাবে। অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টিতে আমাদের সবারই মুখের দিকে তাকিয়ে সে দেখে নিল এবং বুঝে নিল যে জয় তারই হয়েছে।

যাস্কার কাঁধে একখানি হাত রেখে ওয়াইল্ড মাষ্টার শুধু ডাকল: "যাস্কা" !—এর বেশী সে আর কিছু বলতে পারল না।

আমরা যেন প্রস্তরীভূত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ষ্টলওয়ালা ধীরে ধীরে উঠে ইয়াকোভের কাছে গেল।

"তুমি—তোমারই—তোমারই জয়,"—খুব চেষ্টা করে এই কথা কয়টি উচ্চারণ করে সে দ্রুতপদে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। তার দ্রুত সুবিবেচিত প্রস্থান যেন মন্ত্রজাল ছিন্ন করে দিল। আমরা তখুনি সানন্দে গুণ গুণ করে বন্ধুদের মধ্যে গল্প আরম্ভ করে দিলাম। গ্যাবলার ঘরের মধ্যে লাফাতে আরম্ভ করে দিল—তোৎলা তোৎলা কথা বলতে লাগল এবং মিলের পাখার মত হাত নাড়তে লাগল। ব্লিস্কার্ড ইয়াকোভের কাছে লাফিয়ে গিয়ে তাকে চুমো খেতে লাগল। নিকোলাই আইভ্যানিচ উঠে পড়ল এবং গম্ভীরভাবে জানিয়ে দিল যে, সে নিজে আর এক 'পাত্তর' বিয়ার উপহার দেবে। ওয়াইল্ড মাষ্টার হাসল একপ্রকার অদ্ভুত, সরল হাসি—যা আমি তার মুখে কোনো দিন দেখব বলে আশা করি নি। গরীব চাষী লোকটি—তার চোখ দুটো, গাল, নাক এবং দাড়ি জামার প্রান্তভাগ দিয়ে মুছতে মুছতে তার কোণটিতে বসে বলতে লাগল: "সুন্দর, দিব্যি ক'রে

* ষ্টেপ—য়ুরোপীয় রাশিয়ার দক্ষিণপূর্ব্বদিকে অতিবিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্রসমূহের নাম—কাস্পিয়ান এবং আরাল সমুদ্রের উপকূলস্থিত এই সমতলভূমি সাইবেরিয়ার নিম্নভূমি পর্য্যন্ত প্রসারিত।

বলছি—এত চমৎকার!" আর নিকোলাই আইভ্যানিচের স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে—তার চোখদুটো হয়েছে লাল, তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেল। ইয়াকোভ একটি শিশুর মত তার জয়ের আনন্দ উপভোগ করছিল, পরম সুখে তার সারা মুখ যেন রূপান্তরিত হয়েছে, তার চোখদুটো বিশেষ করে যেন জ্বলে জ্বলে উঠছে। তারা তাকে টানতে টানতে টেবিলের কাছে নিয়ে গেল। সে ক্রন্দনরত চাষী লোকটিকে কাছে ডাকল, আর সরাইখানার মালিকের ছোট ছেলেটিকে ষ্টলওয়ালার খোঁজে পাঠাল। কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না। উৎসব আরম্ভ হল :—'তোমাকে আমাদের কাছে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত গাইতে হবে'—তার হাত দুটো শূন্যে তুলে গ্যাবলার ঘোষণা করল।

ইয়াকোভকে আমি আর একবার দেখলাম তারপর আমি ঘর থেকে বেড়িয়ে গেলাম। ঘরে থাকবার ইচ্ছা আমার আর ছিল না—মনে আমি যে আনন্দ পেয়েছি, পাছে তা নষ্ট হয়ে যায়—এ আশঙ্কা আমার ছিল। কিন্তু বাইরে উত্তাপের প্রখরতা পূর্ব্বেরই মত অসহনীয়। ঠিক মাটির উপরে উত্তাপের যেন একটা মোটা ভারী স্তর ঝুলছে—এই রকম মনে হল। গাঢ় নীল আকাশে ছোট ছোট উজ্জ্বল অগ্নিকণা সূক্ষ্মতম কালো ধূলোর স্তরের ভেতর দিয়ে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। প্রত্যেক বস্তুটি নিশ্চল। তাপদগ্ধ শ্রান্ত প্রকৃতির এই গভীর স্তব্ধতায় একটা যেন নিরাশা এবং যন্ত্রণার ভাব। একটা বিচালির গাদার দিকে আমি চলতে লাগলাম, আর সেখানে গিয়ে—সদ্য-কাটা প্রায় শুকিয়ে এসেছে, এমন শুকনো ঘাসের উপর বসলাম। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমার ঘুম এলো না চোখে, অনেকক্ষণ ধরে ইয়াকোভের অপ্রতিরোধনীয় কণ্ঠস্বর আমার কাণে বাজতে লাগল। অবশেষে উত্তাপ এবং ক্লান্তি আবার ঘুরে এল—ফলে আমি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হলাম। যখন আমি জেগে উঠলাম, চারিদিক অন্ধকার—চারিপাশে ছড়ানো বিচালির বেশ একটা গন্ধ আসতে লাগল, শিশিরে একটু যেন ভিজে ভিজে মনে হল। অর্দ্ধেক খোলা ছাদের সুন্দর আলিসার ভিতর দিয়ে পাণ্ডুর নক্ষত্রগুলো অতি মৃদু মিট মিট করছে দেখলাম; আমি বাইরে বেরুলাম। সূর্য্যাস্তের বর্ণচ্ছটা অনেকক্ষণ হল মিলিয়ে গিয়েছে এবং তার শেষ চিহ্ন স্বরূপ দিগন্তে একটি অস্ফুট আলোর রেখা দেখা যায়। কিন্তু রাত্রির স্নিগ্ধ স্বচ্ছতাতেও উত্তাপের আভাস যেন সম্পূর্ণ যায় নি তখনো—হাওয়ায় যেন সূর্য্যের প্রখর উত্তাপের স্পর্শ তখনো আছে। খানিকটা শীতল হাওয়া যেন বুক ভরে পেতে ইচ্ছা করে। হাওয়ার লেশমাত্র নেই, মেঘের চিহ্নও নেই; চারিপাশের আকাশ নির্ম্মল, অন্ধকার হলেও তার স্বচ্ছতা বেশ অনুভব করা যায়—অসংখ্য অদৃশ্য-প্রায় নক্ষত্রের মৃদু আলো দেখতে পাওয়া যায়। গ্রামের পাশে সম্মুখে আলো মিট মিট করে জ্বলছে, কাছাকাছি কোনো আলোকোজ্জ্বল গুহার ভিতর থেকে একটা গোলমাল, একটা অসম্বন্ধ শব্দ উঠতে লাগল—তার মধ্যে আমার মনে হল যেন ইয়াকোভের কণ্ঠস্বর শুনলাম। মাঝে মাঝে সেখান থেকে উদ্দাম হাসির ধ্বনি শুনতে পাওয়া গেল। আমি সেই ঘরের ছোট জানালাটির কাছে সরে গেলাম। আর তার সার্সিতে মুখ রাখলাম—দেখলাম, অবসন্ন তবু বিচিত্র এবং উত্তেজিত এক দৃশ্য, সবাই মদ খেয়েছে, ইয়াকোভ তো খেয়েছেই, ছোট বড় যে যেখানে ছিল সবাই খেয়েছে। বুকটা খুলে ফেলে ইয়াকোভ একখানা বেঞ্চিতে বসে আছে আর মোটা ভাঙা গলায় নাচের সুরে একখানা অতি সাধারণ রাস্তার গান গাইছে, আর একটা তারের যন্ত্রে অত্যন্ত অলস এবং অন্যমনস্কের মত আঙুল বুলোচ্ছে। তার ভীষণ পাণ্ডুর মুখের উপরে গুচ্ছে গুচ্ছে এসে

পড়েছে ঘামে ভেজা চুল; ঘরের ঠিক মাঝখানে গ্যাবলার খালি গায়ে ময়লা জামা পরা চাষী লোকটির সম্মুখে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে—চাষী লোকটি পাশ ফিরে পড়ে আছে, পা দিয়ে মাটি আঁচড়াচ্ছে, তাও কষ্টে,—এলোমেলো দাড়ির মাঝখান থেকে অর্থহীন ভাবে দাঁত বার করে হাসছে। মাঝে মাঝে সে হাতখানা অতি কষ্টে তুলে এক পাশে ফেলে—আর বলে, "এই যায়।" তার মুখখানা হয়েছে বীভৎস, যত সে তার ভ্রূ দুটি টেনে তুলতে চায়, তার ভারি চোখের পাতা আর ওঠেই না, অস্পষ্ট, অদৃশ্যপ্রায়, হাস্যকর চোখ দুটোর ওপর পড়ে থাকে। তারই হয়েছে সত্যকারের নেশা—মনে ধরেছে যথার্থ মৌজ,—তখন তার সামনে দিয়ে যে কেউই যাক,—তার মুখের দিকে একবার সে তাকাবেই, আর নিশ্চয়ই সে বলবে—'সুখী হও ভাই সুখী হও!'

ব্লিস্কার্ড এক কোণে অত্যন্ত ঘৃণাভরে হাসছে—লাল যেন গলদা চিংড়ী, নাকের দুটো ফুটো যেন কত বড় হয়েছে, ফুলে উঠেছে যেন। কেবল নিকোলাই আইভ্যানিচ—সরাইখানার প্রকৃত মালিক সে, তার নিজের দায়িত্ব এবং কর্তব্য বোধে বাধ্য হয়ে সে তার নিজের গাম্ভীর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে। ঘরখানা নতুন নতুন মুখে ভরতি; কিন্তু ওয়াইলড মাষ্টারকে সেখানে কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না।

আমি দ্রুত পা চালিয়ে ফিরতে লাগলাম কোলোটভ্‌কার পাহাড় বেয়ে নীচে নামতে লাগলাম। এই পাহাড়ের পাদদেশে রয়েছে এক প্রশস্ত সমতল ভূমি—সন্ধ্যার রহস্যময় বর্ণতরঙ্গের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে সে যেন বিশালতর হয়ে উঠেছে—যেন সে আকাশের ঘনায়মান অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেছে। খাদের পাশের রাস্তা বেয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে আমি চলতে লাগলাম,—ঠিক সেই সময়ে সেই মাঠের কোনো দূরতম প্রান্ত থেকে কোনো বালকের স্বচ্ছ উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"অ্যান্‌ট্রপকা, অ্যান্‌ট্রপকা, আ-আ!" দুষ্টুমি করে চোখ দিয়ে জল বার হয়ে যায়, এমন ভাবে শেষের অংশে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর একটা টান দিয়ে সে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল।

কিছুক্ষণ সে চুপ করে রইল, আবার ফিরে চেঁচাতে লাগল। তার কণ্ঠস্বর ঈষৎ নিদ্রিত নিস্তব্ধ বায়ুস্তরে পরিষ্কার বেজে উঠল। সে প্রায় ত্রিশ বার ঐ অ্যান্‌ট্রপকা নাম ধরে ডাকল। অকস্মাৎ মাঠের সুদূরতম প্রান্ত থেকে—যেন আর কোনো একটা জগৎ থেকে আর একটা অস্ফুট ধ্বনি বালকের ডাকের উত্তর হয়ে যেন ভেসে এল।

"কি-ই-ই?"

বালকের কণ্ঠস্বর বিরক্তি আর উত্তেজনাময় আনন্দে ধ্বনিত হয়ে উঠল: "চলে এস এখানে, শয়তান, বনবাদাড়ের ভূত!"

অনেকক্ষণ পরে অপর ব্যক্তি উত্তর দিল, "কি জন্যে-এ?"

প্রথম কণ্ঠস্বর আবার তাড়াতাড়ি শোনা গেল—"দাদু তোমাকে উত্তম-মধ্যম দেবেন এখন, চলে এস!"

দ্বিতীয় কণ্ঠ এর পর নীরব হয়ে গেল। বালকটি আবার অ্যান্‌ট্রপকার নাম ধরে চীৎকার করতে লাগল। তার চীৎকার অস্ফুটতর হতে হতে আমার কাণে তখনো ভেসে আসতে লাগল। তখন একেবারে অন্ধকার হয়ে এসেছে, আর আমি তখন আমার গ্রামের পাশের বনটা ঘুরে এসেছি—কোলোট্‌ভকা থেকে তখন আমি তিন মাইল দূরে। 'অ্যান্‌ট্রপকা-আ-আ'—রাত্রির ছায়াচ্ছন্ন বায়ুস্তরে তখনো শোনা যেতে লাগল সেই ডাক।



চলন্তিকা

সম্বুদ্ধ

তিনকড়িদা ক্ষেপিয়া গিয়াছেন। তিনি কাহারও কথা শুনিবেন না, কাগজ বানাইবেনই। বৌদি কাঁদিতেছেন, বন্ধুবান্ধবেরা আক্ষেপ করিতেছেন। শত্রুরা হাসিতেছে। তিনকড়িদা টলিতেছেন না।

সকল চেষ্টা যখন ব্যর্থ হইল, বৌদি আসিয়া আমার কাছে কাঁদিয়া পড়িলেন। কহিলেন, তুমি বাঁচাও, আর কেহ পারিবে না। শেষে কি জেলে যাইবেন ?

আমি কহিলাম, চেষ্টা করিব। কিন্তু ইতিহাসটা বলুন তো ?

বৌদি কহিলেন, ইতিহাস একটা কুমড়াগাছ। আর গরুটাও বজ্জাত।

প্রতিবেশীর গরুতে কুমড়াগাছ খাইয়া গিয়াছে। গরুকে জব্দ করিতে হইবে। তাই তিনকড়িদা কাগজ বাহির করিবেন। কাগজে লিখিয়া গরুকে গালাগাল করিবেন।

তিনকড়িদা নিরীহ মানুষ। জানেন না, কাগজ বাহির করিয়া কোন ফলই হইবে না। গরুরা এদেশে কাগজ পড়ে না। গরুকে গালাগালি দিলে আজকাল সিডিশন হইবে কি না, সেটাও বিবেচ্য।

ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিলাম, বেশ আপনি বাড়ী যান। বিকালে দাদা বাড়ীতে থাকেন ?

বৌদি চক্ষু মুছিয়া কহিলেন, আমি আজ আটকাইয়া রাখিব। তুমি অবশ্য যাইও, আমার মাথা খাও।

যাইতে হইল না, তিনকড়িদা নিজেই আসিয়া হাজির হইলেন। চক্ষে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, ওষ্ঠে দৃঢ় সংকল্প, বগলে কাগজপত্রের তাড়া। তাড়াটা টেবিলে ফেলিয়া কহিলেন, এইগুলা একটু দেখিয়া দাও তো ভাই, স্কীমের একটা খসড়া করিয়া আনিলাম। কাগজ বাহির করিতেছি।

কহিলাম, শুনিয়াছি।

তিনকড়িদা কহিলেন, পড়িয়া দেখিও, এমন এডিটোরিয়াল বাংলাদেশে কেহ কোনদিন দেখে নাই।

আমি কহিলাম, বৃথা ভজাইতেছেন দাদা, আমি কিনিব না।

তিনকড়িদা কহিলেন, কিনিবে না অর্থ ?

—কিনিব না অর্থ, কিনিব না। কাগজ আমি পড়ি না।

তিনকড়িদা উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, অথচ নিজেকে সভ্য শিক্ষিত বলিয়া পরিচয় দাও? খবরের কাগজ যে নিয়মিত না পড়ে, তাহাকে মানুষই বলে না, তাহা জান? কেন পড় না?

আমি কহিলাম, মিথ্যা কথা শুনিতে ভাল লাগে না বলিয়া। মিথ্যা যদি প্রয়োজন হয়, নিজেই তো বানাইয়া লইতে পারি। পয়সা খরচ করিয়া পরের বমি গিলিবার দরকার?

তিনকড়িদা অকারণে খুশি হইয়া কহিলেন, তা বলিতে পার বটে। এ দেশের যা সব এডিটর এক এক জন। তবু দুই একটা কাজের লোক থাকে বলিয়াই—

আমি কহিলাম, আধটাও নয়। ও সকলেরই এক সুর।

তিনকড়িদা যেমন হঠাৎ খুশি হইয়াছিলেন, তেমনই আবার হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেলেন। মুখ কালো করিয়া কহিলেন, তাহার অর্থ, তুমি আমাকেও মিথ্যাবাদী বলিতেছ!

আমি কহিলাম, এখনও বলি নাই। কাগজ বাহির করিলে তখন বলিব।

তিনকড়িদা কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তারপর কহিলেন, তুমি!

আমি হাই তুলিয়া কহিলাম, সত্য কথা বলিব, তাহার আর আমি-তুমি কি!

তিনকড়িদা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন। তারপর অকস্মাৎ টেবিল হইতে কাগজপত্রের তাড়াটা তুলিয়া লইলেন। এক টানে সেটাকে দুই খণ্ড করিয়া ফাঁড়িয়া আমার মুখের উপরে ছুঁড়িয়া মারিলেন। তারপর আর ফিরিয়াও না তাকাইয়া তীরবেগে বাহির হইয়া গেলেন।

আমি টেবিলে পা তুলিয়া দিয়া সৃষ্টি-রহস্য ভাবিতে বসিলাম।

প্রাচীন কালের কথা। জীবজগৎ সৃষ্টি করা সারা হইয়াছে; এইবার মনুষ্য গড়িলেই কাজ শেষ হয়। বিধাতাপুরুষ ময়দা ঠাসিতেছিলেন।

শনিবারের বিকালবেলা, মন ছিল উচাটন—কোন্ ফাঁকে ময়দার তালের মধ্যে খানিকটা বাতাস ঢুকিয়া গেল। বিধাতা-পুরুষ তাহা লক্ষ্য করিলেন না। ঠাসা হইয়া গেলে তিনি ময়দার তালটাকে পাকাইয়া লম্বা করিলেন, তারপর তাহার এক প্রান্তে অল্প একটু জায়গা ছাড়িয়া, চাপ দিয়া মধ্যটা সরু করিয়া দিলেন। মানুষের দেহ আর মাথা তৈরি হইয়া গেল।

দৈবক্রমে চাপ দিবার সময় মধ্যের বাতাসটাও দুই ভাগ হইয়া গেল, এবং দুই দিকের পিণ্ড দুটাকে ফাঁপা করিয়া দিল। বড় ফাঁকটার নাম হইল পেট। ছোটটার নাম মস্তক। মানুষের ধারণা, সেটার মধ্যে মস্তিষ্ক নামক একপ্রকার বস্তু থাকে। কিন্তু ধারণাটা একেবারেই ভুল। মাথার মধ্যে খালি ফাঁক ভরা। যাহার মাথায় ফাঁক নাই, তাহাকে নিরেট বলে। সেটা গালাগাল।

*

উৎপত্তি এক হইলেও, প্রকৃতিতে দুইটা ফাঁকে অনেক তফাৎ। পেটের প্রবেশের পথ একটা, বাহির হইবার পথ বহু। তাই পেটের মধ্যে যাহা ঢোকে, তৎক্ষণাৎ আবার নানা পথ দিয়া বাহির হইয়া যায়; পেটের খাঁই আর ভরে না। মাথায় প্রবেশের পথ বহু, বাহির হইবার পথ প্রধানত একটা মাত্র—মুখ। তাহার উপর পেটে যাহা ঢোকে তাহা জড়পদার্থ, মাথায় যাহা ঢোকে তাহা

দেহহীন—কথা, ধারণা, আইডিয়া। তাহার থাকিতে জায়গা লাগে না এবং যত আইডিয়া যত দিক দিয়া মাথায় ঢোকে, সমস্তই সেখানে আঠার মত লেপ্টাইয়া জমিয়া থাকে।

আরও বড় বিপদ, পেটের মধ্যে গেলে বস্তু বা জীব মরিয়া যায়, আর বাড়ে না, কমেই। মাথার মধ্যে ঢুকিয়া আইডিয়ার বিস্তারের প্রবৃত্তি বাড়িয়া যায়। দুইটা ডিম বা দুইটা সন্দেশ পেটে গিয়া তিনটা হয় না। দুইটা আইডিয়া মাথায় ঢুকিলেই অমনি চক্রবৃদ্ধিহারে তাহার প্র-আইডিয়া উপ-আইডিয়া জন্মিতে থাকে।

*

মাথার মধ্যে যে ইন্‌কিউবেটর আছে বলিয়া আইডিয়ার এইরূপ বংশবৃদ্ধি হয়, তাহার নাম 'কল্পনা' বা 'বুদ্ধি'। কল্পনার বলে, যাহা আছে তাহা হইতে মানুষ যাহা ছিল না, তাহার সৃষ্টি করে। সাদা কথায় ইহার অর্থ, কল্পনার বলে মানুষ সত্য হইতে মিথ্যার সৃষ্টি করিতে পারে।

মানুষ 'বুদ্ধিমান' জীব। পশুর বুদ্ধি নাই। এইখানেই মানুষ পশুর চেয়ে বেশি শক্তি রাখে। মানুষ মিথ্যা কথা বলিতে পারে। পশুরা পারে না।

বস্তুত, প্রয়োজন মত যদি দুইটা মিথ্যা কথা বানাইয়া না বলা যায়, তবে বুদ্ধি থাকিবার কোন সার্থকতা নাই। কেবল মুখস্থ সত্যের আবৃত্তি মূর্খেও করিতে পারে। তাহার মধ্যে বুদ্ধির ক্ষমতার পরিচয় নাই। ময়না, টিয়া বা গ্রামোফোন-রেকর্ডকে কেহ বুদ্ধিমান বলিয়া মানে না। যাহা শেখে তাহার বেশি এক অক্ষরও বানাইয়া বলিতে পারে না বলিয়াই বুদ্ধির হাটে তাহাদের মূল্যও নাই। সত্যযুগের মানুষরা মূর্খ ছিল, মিথ্যা বলিতে পারিত না। আমরা পারি।

*

আহরণ ও বিবর্ধনের ফলে যে আইডিয়ার রাশি মাথার মধ্যে জমিয়া উঠে, তাহাকে বাহিরে প্রকাশ করিবার জন্য আমরা ব্যস্ত হই। বিশেষ করিয়া, যে আইডিয়াগুলা আমরা নিজেরা সৃষ্টি করিয়াছি, সেইগুলাকে। তাহাদের দেখিয়াই লোকে স্থির করিবে আমাদের কাহার বুদ্ধি কতটুকু। বুদ্ধির প্রমাণকে লোকচক্ষে প্রকট না করিয়া আমরা স্বস্তি পাই না। সেই জন্যই সত্য বলার চেয়ে মিথ্যা বলার নেশা আমাদের বেশি।

আইডিয়াকে অপরের কাছে প্রকাশ করার উপায়—ভাষা। কিন্তু কথা বলিয়া একসঙ্গে বেশি লোককে শুনানো যায় না। অগত্যা বুদ্ধি খাটাইয়া আমরা লেখা ছাপা ইত্যাদি বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছি, যেন বক্তব্য প্রচার করিতে কোন অসুবিধা না হয়।

*

ছাপার অক্ষরে বলার আর একটা মস্ত লাভ আছে। আমরা প্রত্যেকেই নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করি এবং অপরকে নিজের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান বলিয়া স্বীকার করি না। নিজের মিথ্যা কথা অপরকে শুনাইতে চাই, অপরের মিথ্যা কথা নিজে শুনিতে চাই না।

ছাপা হয় কলে। কল নির্জীব জড়পদার্থ। তাহার বুদ্ধি নাই। অতএব সে মিথ্যা কথাও বানাইতে পারে না। সুতরাং মানুষের ধারণা কলে যাহা ছাপা হইয়াছে, তাহার সকলখানিই সত্য। ছাপা পড়িতে আমাদের ভয় হয় না, জানি তাহার মধ্যে মিথ্যা থাকিবার উপায় নাই। নিজে যে মিথ্যাটুকু রচনা করিয়া ছাপিতে দিই, তাহার মধ্যে মিথ্যা আছে, কিন্তু সে সংবাদ অপরকে আমি

জানাইতে রাজি নই। আমি চাই, তাহারা ওটাকে সত্য বলিয়াই জানুক। মিথ্যা তাহার মধ্যে থাকিতে পারে, একথা আমরা আদৌ স্বীকার করি না।

স্বীকার করার দামও খুব বেশি নয়। সকলেরই যেখানে এক ব্যবসা, সেখানে ব্যবসার ফাঁকিটুকুকে ঘাঁটাইয়া তুলিতে কেহ চায় না। মাড়োয়ারিতে মাড়োয়ারিতে যেখানে বেচাকেনা, সেখানে 'ভেজাল' কথাটাই অশ্লীল।

*

ছাপার অক্ষরে যত রকম সৃষ্টি সম্ভব, তাহার মধ্যে দৈনিকপত্র সকলের চেয়ে সস্তা। লোকে পড়েও বেশি সেইটাই। তাহার কারণ দ্বিবিধ। নিজের মিথ্যা কথাটা কেমন অবলীলাক্রমে বলিলাম, তাহা চক্ষে দেখিয়া আমরা আনন্দ পাই; এবং পরের মিথ্যা কিছু ধরিয়া ফেলিতে পারি কি না, সেই মৃগয়ার বীভৎস উল্লাসে মাতিয়া উঠি। তাই আমরা নিজের কাগজও পড়ি, পরের কাগজও পড়ি।

*

সমাজে বহুলোক একত্রে বাস করে। একত্র যেখানে বহুর বাস, সেখানে পরস্পরকে কিছুটা সহিয়া যাইতে হয়, না হইলে চলে না। এই সহিয়া-যাওয়ার নাম Tolerance। সংবাদপত্রের জগতেও Tolerance আছে। মিথ্যা না বলিলেও চলে না—এটা জানা কথা। কিন্তু একটু রাখিয়া ঢাকিয়া বলিও; একেবারে মাত্রা ছাড়াইয়া যাইও না—এই হইল সে Tolerance-এর মূল কথা। সেই কথা মানিয়া চলি বলিয়াই এত সংবাদপত্র থাকা সত্ত্বেও সংসারে মোটামোটি শান্তি টিকিয়া থাকে।

*

কিন্তু যুদ্ধের সময় শান্তি বজায় রাখিবার তাগিদ নাই। বেশি মিথ্যা কথা বলিও না—এ নীতিবাক্যও তখন শিকায় উঠিয়া যায়। দুই পক্ষ এবং আরও বহু পক্ষ পরম উৎসাহে পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া একদিকে যেমন সীসা ও বাষ্পের মারণাস্ত্র ছুঁড়িতে থাকে, তেমনই ছুঁড়িতে থাকে মিথ্যা প্রচারের হলাহল।

শত্রুর গোলা হইতে আত্মরক্ষার জন্য আমরা দুর্গের আশ্রয় নিই। শত্রুর বিষবাষ্প হইতে নিজেকে বাঁচাই বাষ্পরোধক মুখোস পরিয়া। শত্রুর গালাগালি হইতে নিজেকে বাঁচাইবার উপায় কর্ণে আঙুল গোঁজা। তাই যুদ্ধ আরম্ভ হইলেই আমরা আইন করিয়া দিই, শত্রুপক্ষের প্রকাশিত বই বা খবরের কাগজ দেশে আসিতে পাইবে না, তাহাদের প্রচারিত বেতারবার্তা দেশের কেহ ধরিতে শুনিতে পারিবে না। নিজে চক্ষু বুজিয়া অপরকে মুখ ভ্যাংচানোই সুযুক্তি—তাহাকেও ভ্যাংচাইলাম, সে আমাকে যদিই বা পালটা ভেংচি কাটে তাহাও দেখিতে পাইলাম না।

*

শান্তির সময়ে সংবাদপত্রে সত্য মিথ্যা দুইটাই খানিক খানিক থাকে। সত্যটা পড়িয়া সংবাদ পাই, মিথ্যাটা পড়িয়া আনন্দ পাই।

দামও যেটা দিই, দিই দুইটার বাবদই। সংবাদপত্রের দাম দুই পয়সা বা চার পয়সা। তিন পয়সা কখনও হয় না। তাহার কারণ পয়সাটা যুগ্মসংখ্যা হইলে দুই ভাগে হিসাব করা সহজ—সত্য এক পয়সার বা দুই পয়সার; মিথ্যা এক পয়সার বা দুই পয়সার। তিন পয়সা বা পাঁচ পয়সা দাম

হইলে ক্রেতার আধলা ও পাইয়ের ভগ্নাংশ কষিতে হইত; এবং সেই বিপদ এড়াইবার জন্যই সে কাগজ কিনিত না।

সম্প্রতি এক পয়সা দামের কাগজ বাহির হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে সে কাগজ চলিতে পারে, যুদ্ধ থামিলেই কাগজও মারা পড়িবে। তাহার কারণ, যুদ্ধের সময় কাগজে সত্য মোটেই থাকে না, সবই মিথ্যা কথা লেখা হইতে থাকে। হিসাবও তাই সহজ হইয়া যায়। গোটা পয়সাটা দিয়াই মিথ্যা কেনা হইতেছে, ভগ্নাংশের ভয় নাই। যুদ্ধ শেষ হইলে মিথ্যা কথার উৎপাদন কমিবে, বাধ্য হইয়াই কিছু কিছু সত্য দিয়া গ্যালি ভরিতে হইবে।

*

জানি সবই, তবুও যুদ্ধের সময়েই আমরা খবরের কাগজ পড়ি। মিথ্যার মধ্যে যে রোমহর্ষণ ঔজ্জ্বল্য আছে, তাহার লোভে। কাগজওয়ালারাও ব্যবসায়ের খাতিরে প্রাণপণে মিথ্যা তৈয়ারির কারখানা চালাইতে থাকে। খেলাধুলা-স্পেশালিস্ট সিনেমা-স্পেশালিস্ট প্রভৃতির মত মিথ্যা-স্পেশালিস্টও কাগজেরা বহাল করে কি না, ঠিক জানি না। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে অন্তত উচিত—Business is business।

*

অবশ্য পড়িলেও, তাহার খবরের মূল্য সম্বন্ধে আমরা অন্ধ নই। অর্থনীতিতে বলে, কোন্ বস্তুর কদর কত তাহা বোঝা যায়, কি দামে সেটা কিনিতে আমরা রাজি, তাহা দিয়া। যে কাগজের এক পৃষ্ঠা রাত দশটায় চার পয়সা দিয়া কিনি, সেই পৃষ্ঠাটি এবং আরও এগারো পৃষ্ঠা, মোট বারো পৃষ্ঠা, কিনিতে পরদিন ভোর ছয়টায় দিই দুই পয়সা এবং তিন দিন পরে দুই পয়সায় যাহার আধসের কাগজ বিক্রি করিতে পারিলে ভাবি খুব জিতিলাম, তাহার কদর কতটুকু সকলেই বোঝে। তবুও সম্পাদকেরা লজ্জা পায় না; বরং ঢাক পিটাইয়া দুই পয়সায় বারো পৃষ্ঠা বলিয়া বিজ্ঞাপন দেয়। এটাই আশ্চর্য্য।

*

লজ্জা আমাদেরও পাওয়া উচিত, জানিয়া শুনিয়া সেই কাগজ কিনিয়া পড়ি বলিয়া। চা ও চুরুটের নেশার মতই ও নেশাটা আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়াইয়া যায়, চাহিয়াও তাহাকে ছাড়িতে পারি না।

*

একমাত্র ভরসার কথা, যুদ্ধের দোহাই দিয়া কাগজওয়ালারা দাম চড়াইয়াছে। দুই পয়সার কাগজ তিন পয়সা করিলেই খাইয়াছিল। কিনিতে হইতই। তাহা না করিয়া তাহারা কাগজের আকার কমাইয়াছে—আগে যেখানে দুই পয়সার দাম উশুল করিতে বারো পৃষ্ঠা রাবিশ পড়িতে হইত, এখন সেখানে আটপৃষ্ঠা পড়িয়াই নিস্তার পাইতেছি। এই সুবুদ্ধি যে দেবতা ইহাদের মাথায় দিয়াছেন, তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ।

এখন শুধু একমনে প্রার্থনা করিতেছি, যুদ্ধ আরও কিছুদিন চলুক, ইহাদের সুবুদ্ধিও বাড়ুক, কাগজের আকার আরও কমিতে কমিতে শেষে একেবারে zero হইয়া যাক। তখন আর ইচ্ছা থাকিলেও কাগজ কিনিতে পাইব না; এবং কাগজ কিনিতে না হইলে রোজ সন্ধ্যায় সেই দুই পয়সার করিয়া চানাচুর খাওয়া যাইবে।

বিপিনের সংসার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

যেদিন বিপিন বাড়ী যাইবার ঠিক করিয়াছে, সেদিন সকালে দত্ত মহাশয়ের মেয়ে শান্তি তাহাকে চণ্ডীমণ্ডপে জলখাবার দিতে আসিল। একখানা কাঁসিতে চালভাজা ও নারিকেল-কোরা, ইহাই জলখাবার। চা ইহারা বাঁধা নিয়মে খায় না, কচিৎ কখনো সর্দ্দি কাশি হইলে ঔষধ হিসাবে খাইয়া থাকে। সুতরাং মেয়েটি যখন জলখাবারের কাঁসি নামাইয়া সলজ্জ কুণ্ঠার সহিত বলিল, সে চা খাইবে কি না, বিপিন জিজ্ঞাসা করিল—চা হচ্চে ?

মেয়েটি মৃদুকণ্ঠে বলিল, যদি খান তো করে নিয়ে আসি।

—না শুধু আমার খাওয়ার জন্যে দরকার নেই।

—কেন দরকার নেই, নিয়ে আসচি।

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে এক পেয়ালা ধূমায়িত গরম চা আনিয়া দিল। দত্ত মহাশয়ের মেয়ে তাহার সহিত এত কথা ইহার পূর্ব্বে কখনো বলে নাই, যদিও আরও দু একবার তাহাকে জলখাবার দিতে আসিয়াছিল। বিপিন ইহাদের বাড়ীর আবরু কড়া বলিয়াই জানে।

মেয়েটি চা দিয়া তখনও দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া বিপিন ভাবিল পেয়ালা লইয়া যাইবার জন্যই সে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে ব্যগ্রভাবে গরম চায়ের পেয়ালায় প্রাণপণে চুমুকের পর চুমুক দিতে দেখিয়া মেয়েটি হঠাৎ হাসিয়া বলিল, অমন করে তাড়াতাড়ি অত গরম খাওয়ার দরকার কি ? আস্তে আস্তে খান—

বিপিন কথা বলিবার জন্যই বলিল, তুমি আর কত দিন আছ ?

—এ মাসটা আছি।

—ও।

—আপনি নাকি আজ বাড়ী যাবেন ?

—হ্যাঁ।

—ক'দিন থাকবেন ?

মেয়েটি যেন খুব আগ্রহের সহিত এই প্রশ্নটি করিতেছে বলিয়া বিপিনের মনে হইল। সে বলিল, দিন পনেরো হবে।

মেয়েটী হঠাৎ বলিয়া ফেলিল—অত দিন ?

পরক্ষণেই যেন কথাটা ও তাহার সুরটা ঢাকিয়া ফেলিবার জন্য বলিল—রুগীপত্তরও তো আছে আবার এদিকে—

—যদু ডাক্তার দেখবে আমার রুগী—একটা মোটে আছে।

—বাড়ীতে কে কে আছেন ?

—মা আছেন, আমার একটী বোন আর আমার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ।

—ভাই নেই ?

—একটী ছিল, অল্প দিন হোল মারা গিয়েচে।

—আপনার এখানে থাকতে খুব কষ্ট হয়, না ?

—নাঃ, কি কষ্ট ! বেশ আছি, তোমার বাবা যথেষ্ট স্নেহ করেন, বড় ভাল লোক।

—তবে আমাদের এখানেই থাকুন।

—আছিই তো। কোথায় আর যাবো ধরো—

—যদি আমাদের গাঁয়ে বাস করেন, আমি বাবাকে বলে আপনাকে জমি দেওয়াবো। আসবেন ?

বিপিন বিস্মিত হইল। কখনো এ মেয়েটি তাহার সম্মুখে এত দিন ভাল করিয়া কথাই কয় নাই—আজ এত কথায় তাহাকে পাইয়া বসিল কোথা হইতে ? বলিল—তা কি করে হয়, পৈতৃক বাড়ী রয়েচে সেখানে—

—কিন্তু ডাক্তারি তো এখানেই করতে হবে—

—সে তো বটেই।

—আপনি আজ বাড়ী যাবেন কখন ?

—খেয়েদেয়ে যাবো ছুপুরে।

—আমি চলে যাবার আগে আসবেন কিন্তু—

—ঠিক আসবো—নিশ্চয় আসবো—

মেয়েটি চায়ের পেয়ালা ও কাঁসি লইয়া চলিয়া গেল।

বিপিন ভাবিল, কেমন চমৎকার মেয়েটি ! মনে বেশ মায়া আছে। হবে না কেন, কি রকম বাপের মেয়ে ! দত্তমশায়ও চমৎকার মানুষ।

চা খাইয়া ডিস্‌পেন্‌সারিতে গিয়াই বিপিন যত্নু ডাক্তারের কাছে একখানি পত্র দিয়া একজন লোক পাঠাইয়া দিল—তাহার হাতের রোগীটী দেখিবার জন্য যত দিন সে না ফেরে। তাহার পর দোর বন্ধ করিয়া বাহির হইবে, এমন সময়ে দরজার এক পাশে মেঝের উপর একখানা খামের চিঠি পড়িয়া আছে দেখিয়া সেখানা তুলিয়া লইল। ইতিমধ্যে কখন পিওন আসিয়া চিঠিখানা বোধ হয় দরজার ফাঁক দিয়া ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে। খামখানার উপরকার হস্তাক্ষর দেখিয়া তাহার বুকের রক্ত যেন ছুলিয়া উঠিল। এ লেখা মানীর হাতের লেখার মত বলিয়া মনে হয় যেন ! বাড়ীর ঠিকানা ছিল, গ্রামের পোষ্টমাষ্টার সে ঠিকানা কাটিয়া এখানে পাঠাইয়াছে। নিশ্চয়ই মানীর চিঠি নয়—সে অসম্ভব ব্যাপার।

চিঠি খুলিয়া প্রথম ছুই চার ছত্র পড়িয়াও সে কিছু বুঝিতে পারিল না, নীচেয় নামটা একবার পড়িয়া লইতে গিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। মানীরই চিঠি ! মানী লিখিয়াছে ঃ—

আলিপুর

শ্রীচরণকমলেষু, সোমবার

বিপিনদা, কতদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি। কাল শেষ রাত্রে তোমাকে স্বপ্ন দেখেছি, যেন আমাদের বাড়ীর মাঝের ঘরের জানালার ধারে দাঁড়িয়ে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলচো। মন ভারি খারাপ হয়ে গেল, তাই এই চিঠি লিখছি তোমার বাড়ীর ঠিকানায়। পাবে কিনা জানিনে।

বিপিনদা, কত দিন সারারাত জেগেচি তোমার কথা ভেবে। সর্ব্বদা ভাবি, একটা কি যেন হারিয়েচি, আর কখনো পাবো না। যদি পলাশপাড়ার চাকুরী না ছাড়তে, তবে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো। আমি শ্বশুরবাড়ী এসে বাবার চিঠিতে জানলাম তুমি আর আমাদের ওখানে নেই। আমার কথা তুমি রাখলে না, আমি বলেছিলাম আমাকে না জানিয়ে চাকুরী ছেড়ে দিও না। কেনই বা রাখবে? আমার সত্যিই বড় জানতে ইচ্ছে করে, তুমি আমার জন্যে কখনও কোনো দিন এতটুকু ভাবো কি না। হয়তো ভুলে গিয়েচ এতদিনে। হয়তো আমার এ চিঠি পাবেই না, যদি পাও, আমার কথা একটু মনে কোরো বিপিনদা। তুমি আজকাল কি কর, জানতে বড় ইচ্ছে হয়।

আমার ঠিকানা দিলাম না, এ পত্রের উত্তর চাই না। কত বাধা জানো তো সবই। তুমি যদি আমায় একটুও মনে করো চিঠিখানা পেয়ে, তাতেই আমার সুখ। আমার প্রণাম নিও। আশীর্ব্বাদ কর, আর বেশী দিন না বাঁচি। ইতি

মানী

বিপিন চিঠিখানা পকেটে রাখিয়া ডিস্‌পেনসারির ভাঙা চেয়ারে বসিয়া পড়িল, একি অসম্ভব কাণ্ড সম্ভব হইয়া গেল। মানী তাহাকে চিঠি লিখিবে, একথা কখনও কি সে ভাবিয়াছিল? আর এ রকম চিঠি! এতখানি মনে রাখিয়াছে তাহাকে সে!

অনেক দিন পরেই বটে। মানীর সঙ্গে কতকাল দেখা হয় নাই। আজ এই চিঠিখানার ভিতর দিয়া এতকাল পরে বহুদূরের মানীর সহিত আবার দেখা হইল। এতদিন কি নিঃসঙ্গ মনে করিয়াছে নিজেকে—সে নিঃসঙ্গতা যেন হঠাৎ এক মুহূর্ত্তে দূর হইয়া গেল। মানী তাহার জন্য ভাবে, আর কি চাই সংসারে?

মানী লিখিয়াছে, সে কি করিতেছে জানিবার তাহার বড়ই আগ্রহ। যদি বলিবার সুবিধা থাকিত, তবে সে বলিত, মানী, কি করচি জানতে চেয়েচ, তুমি যে পথের সন্ধান আমায় দয়া করে দিয়েছিলে, সেই পথই ধরেচি। তোমার মুখ দিয়ে যে কথা বেরিয়েছিল, তাকে সার্থক করে তুলবো আমি প্রাণপণে। তুমি যদি এসে দেখতে, এখানে ডাক্তারিতে আমি কেমন নাম করেচি, তা হোলে কত আনন্দই পেতাম আজ। কিন্তু তা যে হবার নয়। কোনো রকমে যদি সে কথাটা জানাতে পারতাম।

বাড়ী ফিরিতেই দত্ত মহাশয়ের মেয়েটি তখনি আসিল। বলিল, উঃ কত বেলা হয়ে গেল, আপনি কখন আর রান্না করবেন, কখনই বা খাবেন আর কখনই বা বেরুবেন?

—এই এখুনি তাড়াতাড়ি নিচ্চি।

—তার চেয়ে এক কাজ করি না কেন? আমি দুধ জ্বাল দিয়ে এনে দিচ্চি, আর বাবার জন্তে সরু চিঁড়ে তোলা থাকে তাই এনে দিচ্চি। রান্নার হাঙ্গামা এখন আর করবেন না।

—তাই হবে এখন তবে।

—নেয়ে আসুন, তেল দিয়ে যাই।

মেয়েটির এই নূতন ধরণের যত্ন বিপিনের ভাল লাগিতেছিল। বিদেশে বিভুঁয়ে এমন যত্ন কে করে?

স্নান করিতে গেল নদীতে—ক্ষীণকায় নদী, স্থানীয় নাম মাৎলা, কচুরিপানার দামে বুজিয়া আছে। ওপারে বাঁশবন আর ফাঁকা মাঠ, এপারে নদীর ঘাটে যাইবার সুঁড়িপথের দুধারে কেলে কোঁড়া ও শাম্‌লা লতার ঝোপ। শাম্‌লা লতায় এ সময় ফুল ফোটে, ভারি সুগন্ধ বাতাসে। ওপারে বাঁশবনে কুকো পাখী ডাকিতেছে। ধোপাখালি কাছারী থাকিতে একজন প্রজা একজোড়া কুকো পাখী তাহাকে দিয়া গিয়াছিল, বেশ সুস্বাদু মাংস।

মাৎলা নদীর যতখানি কচুরিপানায় বুজিয়া গিয়াছে, ততখানি জুড়িয়া সবুজ দামের উপর নীলাভ বেগুনি রঙের ফুল ফুটিয়াছে বড় বড় ডাঁটায়—যতদুর দেখা যায়, ততদুর ফুল, কি চমৎকার দেখাইতেছে।

আজ যেন সবই সুন্দর লাগিতেছে চোখে। যে মানীর সঙ্গে জীবনে আর দেখা হইবে না, তারই হাতের লেখা চিঠিখানা। কি অপূর্ব্ব আনন্দ আর সান্ত্বনা বহন করিয়াই আনিয়াছে সেখানা আজ। সুপ্রভাত—কি অপূর্ব্ব সুপ্রভাত।

দত্ত মহাশয়ের মেয়ে একবার বাহিরের উঠানে আসিয়া বলিল—জায়গা করি?

—করো, আমি যাচ্চি।

মেয়েটি যত্ন করিয়া আসন পাতিয়া জায়গা করিয়াছে, শুধু একখানা আসন দেখিয়া বিপিন বলিল, দত্ত মহাশয় খাবেন না?

—বাবা বাড়ী নেই, ওপাড়ায় বেরুলেন। তা ছাড়া এখনও রান্না হয়নি, শুধু আপনার চিঁড়ে দুধের ফলার—তাই আপনাকে খাইয়ে দিই। এতটা পথ আবার যাবেন—

সে একটি বড় কাঁসিতে ভিজানো চিঁড়ে লইয়া আসিল। বলিল, আপনি নাইতে গেলেন দেখে আমি চিঁড়েতে জল দিইচি—সরু ধানের চিঁড়ে, বেশী ভিজলে একেবারে ভাতের মত হয়ে যায়—দাঁড়ান, দুধ নিয়ে আসি—

কত যত্নের সহিত সে কলা ছাড়াইয়া দিল, গুড়ের বাটি হইতে গুড় ঢালিয়া দিল।

বিপিন খাইতে আরম্ভ করিলে বলিল, তেঁতুলের ছড়া-আচার খাবেন! বেশ লাগবে চিঁড়ের ফলারে। বলিয়াই উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে চলিয়া গেল, আসিতে কিছু বিলম্ব হইতে লাগিল দেখিয়া বিপিন ভাবিল, বোধ হয় আচার ফুরাইয়া গিয়াছে—মেয়েটি জানিত না, লজ্জায় পড়িয়া গিয়াছে বেচারী।

কিন্তু প্রায় দশ মিনিট পরে সে একটা ছোট্ট পাথরের বাটিতে দু'তিন রকমের আচার আনিয়া সামনে রাখিয়া সলজ্জ কৈফিয়তের সুরে বলিল, আচারের হাঁড়ি, যে সে কাপড়ে তো ছোঁবার যো

নেই, দেরি হয়ে গেল। এই যে করমচার আচার, এ আমি আর বছর করে রেখে গিয়েছিলাম, বাবা খেতে বড় ভালবাসেন। দেখুন তো চেখে, ভাল আছে?

—বাঃ, বেশ আছে। তুমি আচার করতে জানো, বড় চমৎকার দেখচি যে—

মেয়েটি লাজুক হাসি হাসিয়া বলিল, এমন আর কি করতে জানি, মা থাকতে শিখিয়েছিলেন। শ্বশুরবাড়ীতে আমার শাশুড়ীও অনেক রকম আচার করতে জানেন। এঁচড়ের আচার পর্য্যন্ত।

—আর কি কি আচার জানো?

—আমের জানি, নেবুর জানি, নংকার জানি—

—নংকার আচার বড় চমৎকার হয়, একবার খেয়েছিলাম—

—চিঁড়ে আর ছুটো নেবেন?

—পাগল! পেট ভরে গিয়েচে, দুধ জ্বাল দেওয়া হয়েচে একেবারে ঘন ক্ষীর করে—

খাওয়া শেষ করিয়া বিপিন বাহিরে আসিল। ভাবিল, বেশ মেয়েটি। এমন দয়া শরীরে, এমন মমতা, যেন নিজের বোনটির মত বসে বসে খাওয়ালে।

মানীর কথা মনে পড়িল। মানী ও এই মেয়েটি যেন এক ছাঁচে ঢালাই, তবে প্রভেদও আছে, মানী মনে প্রেম জাগায় আর এ জাগায় স্নেহ ও শ্রদ্ধা।

কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি একটা নেকড়ায় জড়ানো গোটাকতক পান আনিয়া বিপিনের হাতে দিয়া বলিল, পান ক'টা নিয়ে যান, রদ্দুরে জলতেষ্টা পাবে। পথের জল খাবেন না কোথাও, কবে ফিরবেন?

বিপিন উঠানেই দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, আজ আর বাড়ী যাবো না ভাবচি।

মেয়েটি অবাক হইয়া বলিল, যাবেন না?

—না, তাই বেলা দেখছিলাম এখানে দাঁড়িয়ে। এত দেরিতে বেরুলে পথেই রাত হবে।

—তবে যাবেন না আজ। মিছিমিছি চিঁড়ে খেলেন কেন, কষ্ট পাবেন সারাদিন।

—ফাঁকি দিয়ে চিঁড়ের ফলার করে নিলাম। রোজ তো অদৃষ্টে এমন ফলার জোটে না—

মেয়েটি সলজ্জ হাসিয়া বলিল, তা কেন, ভালবাসেন চিঁড়ের ফলার? কালই আবার খাবেন। বিপিনের ভারি ভাল লাগিল মেয়েটির এই কথাটি। এই অল্পক্ষণের মধ্যে মেয়েটি তার সরস মন ও কথাবার্ত্তার গুণে বিপিনকে আকৃষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

মেয়েটি বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেলেও বিপিনের মনে হইতে লাগিল, আবার যদি সে আসে, তবে বেশ ভাল হয়। বিপিনের এ ধরণের মনের ভাব হয় নাই অনেক দিন।

কিন্তু বহুক্ষণ সে আসিল না। না আসুক, বিপিন আর জালে জড়াইবে না। কেহই শেষ পর্য্যন্ত টেঁকে না ওরা। কেবল নাড়া দিয়া যায় এই মাত্র। কষ্টও দিয়া যায় খুব। মানী যেমন গিয়াছে, এও তেমনি চলিয়া যাইবে। দরকার কি এই সব আলেয়ার পিছনে ছুটিয়া?

মানী আলেয়া বটে—কিন্তু তার আলো তাহার মত পথভ্রান্ত পথিককে পথ দেখাইয়াছে। খুবই কষ্ট হয় মানীর জন্ত, কিন্তু সেই কষ্টের মধ্যেও কি ব্যথাভরা অপূর্ব্ব আনন্দ আসে তাহার

মুখখানি, তাহার সেই সপ্রেম দৃষ্টি মনে করিলে। সর্ব্বদা তাহাকে দেখিতে পাইলে এ মনের ভাব থাকিত না, এ কথা এখন সে বোঝে।

দত্ত মহাশয় দিবানিদ্রা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া বসিলেন। বলিলেন, শান্তি বলছিল—আপনি বাড়ি যাবেন বলে শুধু ছুটি চিঁড়ে খেয়ে কষ্ট পাচ্ছেন সারাদিন—

—বলেছে বুঝি? কষ্টটা কি? না না—বেলা বেশী হোল বলে আর যেতে পারলাম না। আপনার মেয়ে বড় যত্ন করেছে ওবেলা। বড় ভাল মেয়েটি—

—যত্ন আর কি করবে? আপনারা ব্রাহ্মণ, আমরা আপনাদের সেবাযত্ন করব সে তো আমাদের ভাগ্যি। সে আর এমন বেশী কথা কি—

দত্ত মহাশয় সেকেলে ধরণের গোঁড়া হিন্দু, ব্রাহ্মণের উপর তাঁহার অসাধারণ ভক্তি, কাজেই কথাটা তিনি অন্যভাবে লইলেন। কিছুক্ষণ বসিয়া জমিজমাসংক্রান্ত গল্প করিবার পর বলিলেন, এখানে কিছু ধানের জমি করে দিই আপনাকে। জমি সস্তা এখানে। বছরের ভাতের ভাবনা দূর হবে। ডাক্তারির ব্যাপার হচ্ছে, যেখানে পসার সেখানে বাস।

দত্ত মহাশয় উঠিয়া চলিয়া গেলেন বাড়ির মধ্যেই। কিছুক্ষণ পরে দত্ত মহাশয়ের মেয়ে আসিয়া বলিল, বাবা বললেন, আপনি কিছু খেয়ে যান—

কি খাব এখন?

পরোটা ভেজেচি খানকতক, আপনি আর বাবা খাবেন—ভাত খান নি ওবেলা, খিদে পেয়েছে—

বিপিন স্বাস্থ্যবান যুবক, সত্যই তাহার ক্ষুধা পাইয়াছিল। এ সব ধরণের মেয়েমানুষে মনের কথা জানিতে পারে—মানীকে দিয়া সে দেখিয়াছে। অগত্যা সে বাড়ির ভিতর উঠিয়া গেল। মেয়েটি ওবেলার মত যত্ন করিয়া খাওয়াইল—কিন্তু খুব বেশী কথা বলিল না, বোধ হয় দত্ত মহাশয় আছেন বলিয়াই।

দত্ত মহাশয় বলিলেন, আপনার ওবেলা খাওয়া হয় নি বলে আমি ঘুম থেকে উঠেই দেখি আমার মেয়ে ময়দা মাখতে বসেছে। আমি তো বিকেলে কিছু খাইনে। বললাম, কি হবে রে ময়দা এখন? তাই বললে, ডাক্তারবাবু ওবেলা ভাত খান নি, ওঁর জন্যে খানকতক পরোটা ভাজব। আমি তো তাতেই জানলাম।

ইতিমধ্যে গ্লাসে করে একবার জল দিতে দত্ত মহাশয়ের মেয়ে আসিল। তাহার দিকে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া বিপিনের মন শ্রদ্ধায় ও স্নেহে পূর্ণ হইয়া গেল। মেয়েটি দেখিতে ভালই, মুখশ্রীও বেশ। এই নিঃসঙ্গ প্রবাস-জীবনে এমন একটি স্নেহপরায়ণা নারীর সান্নিধ্য পাওয়া সত্যই ভাগ্যের কথা।

বৈকালে সে নদীর ধার হইতে বেড়াইয়া আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়াছে, মেয়েটি আসিয়া বলিল, চা খাবেন? বারবার তাহাকে খাটাইতে বিপিনের কুণ্ঠা হইল। সে বলিল, না থাক। একটা পান বরং—

পান তো আনবই, চা-ও আনি। আপনি লজ্জা করেন কেন, চা তো আপনি খান—বললেই তৈরি করে দিই।

মিনিট কুড়ি পরে বিপিন চা খাইতে খাইতে মেয়েটির সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেছিল। অত্যন্ত ইচ্ছা হইতে লাগিল, ইহার কাছে মানীর কথা বলিবার জন্য। এর মন সহানুভূতিতে ভরা, এ তাহার মনের কষ্ট বুঝিবে। বলিয়াও সুখ।

ইচ্ছা হইল বলে—শোন শান্তি, তোমার মত একটি মেয়ের সঙ্গে আমার খুব আলাপ। সে আমাকে খুব ভালবাসে, তোমার মতই করুণাময়ী, মমতাময়ী সে। আজ তোমার সেবাযত্ন দেখে তার কথা কত মনে হচ্ছে জান শান্তি?

শান্তি বলিবে, বলুন না তার কথা বড় শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে—

তারপর ডাগর ডাগর সুন্দর চোখে আগ্রহভরা দৃষ্টি লইয়া শান্তি তাহার সামনে বসিয়া পড়িবে, আর সে মানীর সহিত তাহার বাল্যের পরিচয়ের কাহিনী হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার সহিত শেষ সাক্ষাতের দিন পর্য্যন্ত সব কথা বলিয়া যাইবে। বৈকাল উত্তীর্ণ হইয়া সন্ধ্যা নামিবে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া নামিবে জ্যোৎস্নারাত্রি, বাঁশবনের মাথায় জ্যোৎস্নালোকিত আকাশে দু'দশটা নক্ষত্র উঠিবে, গাছপালা হইতে টপ্ টপ্ করিয়া শিশির ঝরিয়া পড়িবে, রাত্রি ক্রমে গভীর হইবে, গ্রাম নিশুতি নিস্তব্ধ হইয়া যাইবে, ডোবার ধারের জগডুমুর গাছের খোড়লে রোজকার মত লক্ষ্মীপেঁচাটা ডাকিবে, তখনও শান্তি গালে হাত দিয়া তন্ময় হইয়া এই অপূর্ব্ব কাহিনী শুনিয়া যাইতেছে ও মাঝে মাঝে আর্দ্র চক্ষু আঁচল দিয়া মুছিতেছে, আর সে অনবরত বলিয়াই চলিয়াছে—তবুও হয়তো বলা শেষ হইবে না, হয়তো বা বলিতে বলিতে পূবে ফরসা হইয়া যাইবে, কাক কোকিল ডাকিয়া উঠিবে, ভোরের কুয়াসায় মাৎলার ধারের আম-শিমুলের বাগান অস্পষ্ট দেখাইবে, অথচ শান্তি উঠিবে না, শেষ পর্য্যন্ত ঠায় বসিয়া শুনিবে।

এ কথা বলা যায় কার কাছে? যে মন দিয়া শোনে, যে ভালবাসে, সহানুভূতি দেখায়—যার মনে স্নেহ আছে, দয়া আছে, মায়া আছে। সে বুঝিবে, অন্যে কি বুঝিবে?

তেমনি মেয়ে এই শান্তি।

কোন্ দূর নক্ষত্রের দেবলোক হইতে শান্তির মত মেয়েরা, মানীর মত মেয়েরা, পৃথিবীতে জন্ম নেয়?

চা খাওয়া হইয়া গেলে মেয়েটি পান আনিল। বলিল, কাল বাড়ী যাবেন সকাল সকাল, চিঁড়ে খান তো খাবেন, নয়তো সকালে নেয়ে এসে দুটো ভাত চড়িয়ে দেবেন।

—তুমি এখানে আর কতদিন থাকবে শান্তি?

—বললাম তো, এ মাসটা আছি।

—তুমি চলে গেলে আমার বড় খারাপ লাগবে—

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই কিন্তু বিপিনের মনে হইল, মেয়েটিকে এরূপ বলা উচিত হয় নাই। সে বিবাহিতা, এ সব ধরণের কথা বলা হয়, যখন পুরুষ নারীর মনে প্রেম জাগাইতে চায় বা নারীমনের মুকুলিত প্রেমকে ফুটাইতে চায়। বিবাহিতা মেয়ে, কাল শ্বশুরবাড়ী চলিয়া যাইবে—

প্রেম জাগিলে মেয়েটিই কষ্ট পাইবে। বিপিন আর ও পথে পা দিবে না। মেয়েটি বোধ হয় সহজ ভাবেই কথাটা গ্রহণ করিল, নতুবা তাহার চোখে লজ্জা ঘনাইয়া আসিত। মানীকে দিয়া বিপিন ইহা অনেকবার দেখিয়াছে।

সে সরল ভাবেই বলিল, কেন ?

বিপিন ততক্ষণে সামলাইয়া লইয়াছে। হাসিয়া বলিল—দুধ-চিঁড়ের ফলার ঘন ঘন জোগাড় হবে না।

বলিয়াই যেন পূর্ব্ব কথাটা পেটুক লোকের খেদোক্তি ছাড়া আর কিছুই নহে, প্রমাণ করিবার জন্য সে নিজেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অনেক সময় প্রেম আসে করুণা ও সহানুভূতির ছদ্মবেশে। দত্ত মহাশয়ের মেয়ে সরলা পল্লীবালা, লোককে খাওয়াইয়া মাখাইয়া সে হয়তো খুশি—একটা লোক কোন একটা বিশেষ জিনিষ খাইতে ভালবাসে, অথচ সে চলিয়া গেলে লোকটা তাহার প্রিয় সুখাদ্য হইতে বঞ্চিত হইবে, ইহা তাহার মনে সত্যকার করুণা জাগাইল।

সে মনে মনে ভাবিল, আহা, ডাক্তারবাবু, সরু ধানের চিঁড়ে খেতে এত ভালবাসেন! আমি চলে গেলে কে দেবে ? উনি যে মুখচোরা, কাউকে বলতেও পারবেন না!

মুখে বলিল, আমার শ্বশুরবাড়ী কনকশাল ধানের চিড়ে হয়, খুব ভাল সরু চিঁড়ে আর কি সুগন্ধ! চিঁড়ে ভেজালে গন্ধ ভুর ভুর করে ঘরে। আমাদের বাড়ীর চেয়েও ভাল। আমি গিয়ে আপনার জন্যে পাঠিয়ে দেবো।

বিপিন ভাবিল, তা দেবে তা জানি। তোমাদের আমি চিনি।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল দেখিয়া শান্তি দ্রুতপদে সন্ধ্যাপ্রদীপ দিতে গেল।

ক্রমশ



সংক্ষিপ্ত বাংলা ব্যাকরণ

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বড়দিনের সময় ভবানীপুর পোড়াবাজারে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, সে কংগ্রেসে বাঙ্গালী কংগ্রেস-ওয়ালাদের সঙ্গে অ-বাঙ্গালী কংগ্রেস-ওয়ালাদের মতভেদের সৃষ্টি হয়। বাঙ্গালীদের প্রস্তাবিত কতকগুলি resolution অপর প্রদেশের হুম্‌রো-চুম্‌রো পলিটিসিয়ানরা গ্রাহ্য করতে নারাজ হন। ফলে দু-দলে মহা তর্ক বেধে যায়। প্রকাশ্য কংগ্রেসে এ তর্কের মীমাংসা করা অসম্ভব বিবেচনায় উভয়পক্ষের মন্ত্রীর দল পরস্পরের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে কংগ্রেসের অন্দর-মহলে প্রবেশ করলেন। খানিকক্ষণ পর আমি তাঁদের মন্ত্রণা-মন্দিরে উপস্থিত হয়ে দেখি, আমার অগ্রজ আশুতোষ চৌধুরী, মদনমোহন মালবিয়া ও বালগঙ্গাধর তিলক, এই তিনজনে মিলে অনর্গল তর্ক করছেন। আর তাঁদের পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত। তিনি আমাকে ডেকে বললেন—ওদের তিন জনের তর্ক শোনো। এঁরা তর্ক করছেন grammar নিয়ে, কারণ এঁরা তিনজনেই ব্রাহ্মণ, আর ব্যাকরণের আলোচনা করাই এ জাতের চিরকেলে অভ্যাস। অবশ্য দত্ত মহাশয় এ মন্তব্য হাসিমুখেই করেছিলেন, সুতরাং তাঁর কথা শুনে আমিও ঈষৎ হাস্য করলুম।

২

সংস্কৃত ভাষায় যে অসংখ্য অপূর্ব্ব ব্যাকরণ আছে, তা আমরা সকলেই জানি,—অন্ততঃ মহা মহা বৈয়াকরণদের নাম জানি। পাণিনি পতঞ্জলির নাম কে না জানে? আর ব্যাকরণ-রচনা সুরু হয়েছে বহুকাল পূর্ব্বে। পাণিনি নাকি খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকের লোক, আর পতঞ্জলির বয়সও বড় কম নয়। ফলে হাজার আড়াই বৎসর ধ'রে আমরা ব্যাকরণের চর্চ্চা করছি।

৩

বৈয়াকরণদের পূর্ব্বপুরুষরা কি সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন?—বোধহয় না; কেননা জৈন বৈয়াকরণও ছিল, বৌদ্ধ বৈয়াকরণও ছিল। তা ছাড়া গোণিকাপুত্র ও গোলর্দ্দীয় নামক সে শাস্ত্রের দুটি পূর্ব্বাচার্য্য কি ব্রাহ্মণ ছিলেন? গোলর্দ্দ অবশ্য দেশের নাম। কিন্তু গোণিকা হচ্ছে সেই স্ত্রীলোক, যে ছালা বোনে। মা ছালা বুনছে, আর ছেলে ব্যাকরণের সূত্র বানাচ্ছে,—এ ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত লাগে। তা ছাড়া এঁরা উভয়েই ছিলেন কামশাস্ত্রে স্বনামধন্য পূর্ব্বাচার্য্য। ব্যাকরণের সূত্রের সঙ্গে কামসূত্রের যোগসূত্র কি?

৪

পাণিনির ব্যাকরণ সূত্রাত্মক মাত্র, অতএব সংক্ষিপ্ত। সূত্রকাররা দীর্ঘসূত্রতা-দোষে দুষ্ট নন। পতঞ্জলির ভাষ্য যে বিরাট, তার প্রমাণ তার নাম মহাভাষ্য। অবশ্য পতঞ্জলি বলেছেন, যার নাম সূত্র তার নামই ব্যাকরণ। তবে তার ব্যাখ্যা বিস্তৃত হয়। বোধহয় এই বচন অনুসারে—

"ইষ্টং হি বিদুষাং লোকে, সমাসব্যাস ভাষণং।"

৫

ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রয়োজন কি, এ প্রশ্ন সেকালের লোকও জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তার উত্তরে পতঞ্জলি বলেছেন—বেদরক্ষা অর্থাৎ বৈদিক মন্ত্র রক্ষা। পাণিনি অবশ্য বৈদিক ভাষার ব্যাকরণ লেখেন নি ;—লিখেছিলেন ভাষা ব্যাকরণ। সুতরাং সে ব্যাকরণ কি করে বেদরক্ষা করবে ?—আমার বিশ্বাস, বৈদিক ভাষা যখন লোকের মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়ে চোখের বিষয় হয়েছে অর্থাৎ যখন বৈদিক ভাষা লিখিত ভাষা হয়েছে, ও মৌখিক ভাষাই "ভাষা" হয়েছে, সেই সময়েই মৌখিক ভাষাকে বিধিবদ্ধ করবার জন্য তিনি ব্যাকরণ রচনা করেন।

৬

এই কারণেই উচ্চারণতত্ত্ব হচ্ছে ব্যাকরণের মূল তত্ত্ব। পতঞ্জলি বলেছেন যে, অসুররা যে সুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে হেরে গিয়েছিল, তার কারণ তারা "অরয় অরয়" না বলে "অলয় অলয়" বলে শত্রুদের সম্বোধন করেছিল। "র"র স্থানে আজও অনেকে "ল" বলে। জুতোর দাম জিজ্ঞাসা করলে চীনেরা three rupees না বলে অনেকে "থিলি লুপি" বলে। অপরপক্ষে জাপানীরা "ল"কে "র" বলে। সম্ভবতঃ এই কারণে জাপানীরা যুদ্ধে চীনেদের হারাচ্ছে। আমরা যদি "র" স্থানে "ল" বলি, তা হলে "রাজ" পাব না—শুধু 'লাজ'ই পাব।

৭

এ উত্তরে সেকালের সামাজিক লোক সন্তুষ্ট হন নি ; তাঁরা বলেছিলেন যে, ভাষা ব্যবহার করতে করতে আমরা ভাষা শিখব—ব্যাকরণের কি প্রয়োজন ? উত্তরে পতঞ্জলি বলেন, তোমাদের কথা ঠিক। তোমাদের ভাষা যাতে অশুদ্ধ না হয়, তার জন্য ভাষা প্রয়োগের নিয়ম শেখা কর্ত্তব্য। আমরা ক্ষিধে

পেলে খাই, কিন্তু কুকুরের মাংস খাইনে; কেননা ধর্ম্মশাস্ত্রে তার নিষেধ আছে। সেইরূপ শব্দের কোন্‌টি শুদ্ধ কোন্‌টি অশুদ্ধ, তা জানতে হলেও ব্যাকরণ শিক্ষার প্রয়োজন আছে।

৮

ছেলেবেলায় লোহারাম শিরোরত্নের শিশুবোধ ব্যাকরণে পড়েছি :

"যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে, বঙ্গভাষা শুদ্ধ করিয়া লিখিতে ও কহিতে পারা যায়—সেই শাস্ত্রের নাম ব্যাকরণ।" এ কথা পতঞ্জলির কথার পুনরুক্তি মাত্র। এই সব শিশুবোধ ব্যাকরণই সাধুভাষার পৃষ্ঠপোষক। এই definition যদি ঠিক হয়, তাহ'লে ভাষা সম্বন্ধে শুদ্ধিবাতিকগ্রস্ত লোকদের শুদ্ধভাষার জাত বাঁচাবার জন্য ব্যাকরণ শিক্ষার প্রয়োজন আছে,—এ কথা অবশ্যস্বীকার্য্য।

৯

আমরা যে অর্থে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ শব্দ বুঝি, পতঞ্জলি অবশ্য সে অর্থে ব্যবহার করেন নি। পাণিনি লিখেছিলেন ভাষার ব্যাকরণ। পতঞ্জলি তার ব্যাখ্যা করেছেন। এ ভাষা কোন্ ভাষা? বৈদিক নয়—লৌকিক ভাষা; যে ভাষাকে হনুমান বলেছেন সংস্কৃত। রামায়ণেই বোধহয় সংস্কৃত শব্দ সর্ব্বপ্রথম পাওয়া যায়। সে যাই হোক্, এ বিষয়ে আমি বাচালতা করতে প্রস্তুত নই। আমি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত নই; মহাভাষ্যের শুধু এখানে ওখানে পল্লবগ্রহণ করেছি, বাঙলা অনুবাদের সাহায্যে।

১০

কোন বাঙালী ব্রাহ্মণ সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেছেন বলে আমি জানি নে; সুতরাং আমরা মুখ খুললেই যে তার ভিতর থেকে সূত্র বেরোয়, দত্ত মহাশয়ের এ মত আমি গ্রাহ্য করতে পারিনে।

একখানি মাত্র সংস্কৃত ব্যাকরণ বাঙলায় আছে, যেটি বাঙালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের লেখা। অনন্তপার শব্দ-শাস্ত্র মন্থন করে বিদ্যাসাগর মহাশয় একটি অমূল্য রত্ন উদ্ধার করেছেন;—সে রত্নের নাম "উপক্রমণিকা"। এটি হচ্ছে ব্যাকরণশাস্ত্রের শিরোমণি। এর জুড়ি বই ভারতবর্ষের অপর কোন ভাষাতেই নেই। আমি একমাত্র উপক্রমণিকার উল্লেখ করলুম, কারণ সেটি হচ্ছে ব্যাকরণ শাস্ত্রের বর্ণ-পরিচয় প্রথম ভাগ; আর ব্যাকরণকৌমুদী হচ্ছে দ্বিতীয় ভাগ।

১১

আমাদের জাতের একটি বদনাম আছে। আমরা বাঙালীরা নাকি বেশী কথা কই, আমরা dumb millions নই। হতে পারে ভারতবর্ষের অপর জাতিরা সব কাজের লোক—শুধু আমরা

বাক্যবাগীশ। আমরা কথা কই বেশী বলে অবশ্য লিখিও বেশী। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কখনও বাঙলা ব্যাকরণ লেখেনও নি, পড়েনও নি। তা সত্ত্বেও চণ্ডীদাস থেকে ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত অনেকেই কাব্য ও পদাবলী লিখেছেন। আর ভারতচন্দ্র চমৎকার বাঙলা লিখেছেন। এর কারণ শ্রেষ্ঠ লেখকরাই ভাষা গড়ে তোলেন, বৈয়াকরণরা নয়। যদি কেউ বলে যে ভারতচন্দ্র বাঙলা ব্যাকরণ না পড়ুন, সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়েছিলেন; তাহলে স্বীকার করতেই হয় যে কলাপ অথবা মুগ্ধবোধ পড়ে চমৎকার বাঙলা লেখা যায়। রচনারীতি আয়ত্ত করতে হলে বাঙলা ব্যাকরণের কোন প্রয়োজন নেই।

১২

ইংরেজরা এ দেশে শুভাগমন করবার পর তাঁরাই বাংলা ব্যাকরণ সৃষ্টি করেছেন; অর্থাৎ সেই শাস্ত্র, "যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে, বঙ্গভাষা শুদ্ধ করিয়া লিখিতে ও কহিতে পারা যায়।" কিন্তু ইংরেজদের উদ্দেশ্য ছিল অন্যরূপ।

সর্ব্বপ্রথমে বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন হালহেড নামক সাহেব; কি উদ্দেশ্যে, তা তিনি নিজেই বলেছেন। তাঁর কথা এই:—

"বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং ফিরিঙ্গিনাম
উপকারার্থং ক্রিয়তে হালহেদংগ্রেজি।"

তারপর বঙ্গবটুনামং উপকারার্থ আমরা দেদার বাঙলা ব্যাকরণ রচনা করছি—পাণিনির ও ইংরাজীর পরিভাষা মিশিয়ে।

১৩

হালহেডের ব্যাকরণ আমি দেখিনি, কিন্তু এর পরই মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার "যুবক সাহেবজাতের কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিবার জন্য" সংক্ষিপ্ত বাঙলা ব্যাকরণ রচনা করেন। 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ কুসুম দ্রষ্টব্য।

যুবক সাহেব-জাতগণ এ সব কুসুম আঘ্রাণ করে কি শিক্ষা লাভ করেছিলেন, বলতে পারিনে। কারণ সংস্কৃত ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকলে এ কুসুমগুলিতে দন্তস্ফুট করা যায় না। ফুলে অবশ্য দাঁত বসানো হয় না। এ mixed metaphor তাই অচল, তবে কি বলতে চাই তা বুঝতে পারছেন। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় text book রচনা করেন নি, কতকগুলি lecture notes তৈরি করেছিলেন, যার ব্যাখ্যা তিনি নিজে মুখে করতেন। তাঁর ব্যাকরণ একরকম সূত্র মাত্র।

১৪

ভগবান পতঞ্জলি বলেছেন যে, ব্যাকরণের চারটি শিং, যথা—নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত; তিন চরণ—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান; দুটি মস্তক—নিত্য ও কার্য্য; সাতটি হস্ত—অর্থাৎ সাতটি

বিভক্তি; উপরন্তু ত্রিভাগে বদ্ধ—অর্থাৎ বক্ষোদেশে, শিরোদেশে ও কণ্ঠদেশে এই তিন অংশে বদ্ধ অর্থাৎ এই তিন স্থান অবলম্বন করে শব্দসমূহ উৎপন্ন হয়। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের উক্ত তিন চার পাতার ভিতর ব্যাকরণের এই চতুরঙ্গ আছে। তাছাড়া কর্ত্তৃবাচ্য কর্ম্মবাচ্য ভাববাচ্য প্রভৃতির ব্যাখ্যা আছে। আরও আছে যৌগিক যোগরূঢ় রূঢ়ী শব্দের ব্যাখ্যা—সেই সঙ্গে কৃৎ, তদ্ধিত, তিঙন্ত ও সুবন্ত শব্দের পরিচয়। তবে সংস্কৃত ব্যাকরণ যে বাঙলা ব্যাকরণ নয়, এ জ্ঞান তাঁর ছিল।

১৫

'প্রবোধ চন্দ্রিকা' বোধহয় রচিত হয়েছিল ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে; কিন্তু প্রথম ছাপা হয় বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের মৃত্যুর পর ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে। ইতিমধ্যে আর একখানি সংক্ষিপ্ত বাংলা ব্যাকরণ রচিত হয়,—রামমোহন রায়ের 'গৌড়ীয় ভাষা ব্যাকরণ'। পতঞ্জলি যেমন জানতেন যে, সংস্কৃত ভাষা মৌখিক ভাষা, বৈদিক ভাষা নয়; রামমোহন রায়ও তেমনি জানতেন যে, বাংলা ভাষা লৌকিক ভাষা, সংস্কৃত ভাষা নয়। তাঁর এ জ্ঞান ছিল যে, ব্যাকরণ-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, পদ ও বাক্যের গঠনের নিয়ম, বৈলক্ষণ্যের প্রণালী ও অন্বয়ের রীতি নির্দ্ধারণ করা অর্থাৎ structure-এর জ্ঞান লাভ করা। এই কথাই বৈজ্ঞানিক কথা।

১৬

অনেক বাঙলা শব্দ যেমন তদ্ভব, তৎসম নয়; 'গৌড়ীয় ভাষা ব্যাকরণ'ও তেমনি তদ্ভব ব্যাকরণ, যা তৎসম ব্যাকরণ থেকেই উদ্ভূত। সুতরাং বাঙলা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণেরই উত্তরাধিকারী। এর ফলে বাঙলা ব্যাকরণ কতকটা সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মের অধীন হতে বাধ্য। বাঙলা ব্যাকরণ মাত্রেই সংস্কৃত ব্যাকরণের ছাঁচে ঢালাই হয়ে থাকে। এ হিসেবে রামমোহন রায়ের ব্যাকরণও সংস্কৃত ব্যাকরণ, তবে অনেক প্রভেদও আছে; আর সেই প্রভেদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমাদের বৈয়াকরণদের কর্ত্তব্য। এই 'গৌড়ীয় ভাষা ব্যাকরণ'ই নূতন করে edit করলে ছাত্রদের যথার্থ উপযোগী ব্যাকরণ হয়। কারণ এর রচয়িতা হচ্ছেন অসাধারণ প্রতিভাবান। ছাত্রদের অধ্যয়নের জন্য এই ব্যাকরণই যথেষ্ট, তবে অধ্যাপকদের অধ্যাপনার জন্য encylopœdia-কল্প ব্যাকরণ দরকার হতে পারে।



রবীন্দ্র-পরিচয়

চতুর্থ দফা

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী

ঘরোয়া রকমের আলাপ প্রসঙ্গে যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে, সে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে খুব সহজে পাওয়া তাঁর অনেক বিস্মৃত দিনের কাহিনী, বর্ত্তমান কিম্বা বহমান কাল সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য এবং অনাগত কাল সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা। আলাপপ্রসঙ্গে তিনি এক একটি বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে এমন সব মর্ম্মস্পর্শী এবং ভাববার মতন কথা বলেন, যা লিখে রাখতে পারলে সাহিত্যে চিরকালের সম্পদ হয়ে থাকত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নানা উপলক্ষ্যে কখন কে আলাপ করেছেন, সে সব আলাপের দিন খন মাস সন তারিখ লিখে রাখা যে খুব একটা অসম্ভব ব্যাপার ছিল, সে কথা ঠিক নয়। কিন্তু সেটা করবার সুযোগ দুর্ভাগ্যক্রমে সব সময় হয়ে ওঠে না। যাক, তবু একথা সত্য যে, তাঁর অনেক দিনের অনেক কথাই মনে আছে,—আছে লুকিয়ে। সেই সব লুকানো স্মৃতি থেকে কিছু কিছু উদ্ধার করে এবং তার সঙ্গে, সম্প্রতি তাঁর কাছ থেকে যা শুনেছি, সেই সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ পাঠকবর্গকে উপহার দেব আজকের এই প্রবন্ধে।

এই সম্প্রতি পূজোর ছুটি শেষ হবার কয়েক দিন আগে স্বনামখ্যাত গল্পলেখক "বনফুল" তাঁর এক অধ্যাপক বন্ধুকে নিয়ে কবি-দর্শনে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। সকালবেলা, শীতের সূচনা হয়েছে, তখনো সাতটা বাজে নি। কবির "পুনশ্চ" নামক ঘরের দক্ষিণের বারান্দায়—কবি তখন তাঁর চা-খাওয়ার পালা শেষ করেছেন, এমন সময় বনফুল এবং তাঁর বন্ধুটি গিয়ে সেখানে উপস্থিত হতেই, কবি তাঁদের সাদর সম্ভাষণ জানালেন। তারপর সুরু হোলো আলাপ। রবীন্দ্রনাথের আলাপ-নীতির বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি, যাঁর সঙ্গে আলাপ করেন, অধিকাংশ সময়ে চেষ্টা করেন, সেই ভদ্র-লোকের বিদিত বিষয় নিয়ে কথাবার্ত্তা বল্‌বার। বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে তার বিচিত্র দিকের খোঁজ নেবার অনুসন্ধিৎসা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আছে অসাধারণ এবং সাহিত্যের বাইরের রাজ্যের—অথচ মানব-জগতের নিত্যপ্রয়োজনীয় বিষয়ের নানা রকমের তথ্যপূর্ণ গ্রন্থাদি পাঠ করবার আগ্রহ তাঁর প্রচুর এবং সেই সব গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়সমূহ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করবার তাঁর যোগ্যতা এবং কৌশল বিস্ময়কর। কাজেই "বনফুল" এবং তাঁর অধ্যাপক বন্ধুর সঙ্গে কবি সাহিত্য এবং শিক্ষা বিষয়েই আলাপ সুরু করে দিলেন,—একটানা একঘেয়ে রকমে নয়। আলাপের বিষয়টা মূলত ঘিরে রইল শিক্ষা এবং সাহিত্যকে, কিন্তু তার সঙ্গে পরিবেশন চলতে লাগল, চুটকী-চাটকী অন্যান্য দু-দশটা কথার, যে সব কথাকে ঐ প্রসঙ্গ থেকে বাদ দিলে, তার মূল্য থাকে না খুব বেশী,—কিন্তু সেইগুলিই তখনকার মতন পরম মূল্যবান হয়ে ওঠে, প্রসঙ্গের জায়গায় জায়গায় তাদের সংযোজনের কারুকার্য্যের জন্য। লাগসই এবং খাপ খাওয়া কথার সংযোজনাই এক একটি বিষয়প্রসঙ্গকে করে চিত্তাকর্ষক এবং মধুর। এই রকমে বিষয়প্রসঙ্গে আলাপ করবার কৌশলে রবীন্দ্রনাথ অদ্বিতীয়

কৌশলী। "বনফুল" শুধু যে গল্প লেখেন তা নয়, কবিতাও লেখেন। সেবিষয়ে কবি তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন, "তোমার কবিতায় বেশ জোর আছে, এসব দিকেও তোমার বেশ হাত আছে।" তারপর সেই অধ্যাপক মহাশয়ের দিকে ফিরে সুরু করে দিলেন শিক্ষাবিষয়ে কবি নিজে কি মনে করেন তাই নিয়ে আলোচনা। প্রসঙ্গটা উঠল, পূজোর ছুটিতে বেড়াবার কথা নিয়ে। বেড়িয়ে বেড়াবার মধ্যে দিয়ে মানুষ যে একটা জাগ্রত শিক্ষা লাভ করে সেই দিক্ থেকে কবি বল্‌লেন তাঁর কথা। যা বলেছিলেন তার মর্ম্ম এই যে, মানুষ ভাববার বিষয়, চিন্তা করবার বিষয়কে গ্রহণ করে মন দিয়ে,—সেই মন দিয়ে যে মন জাগ্রত, যে মন আনন্দে সতেজ। কাজেই যে এন্‌ভায়রণমেণ্টে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থায়, শিক্ষার্থীর মন হয় নির্জীব এবং কল্পনা হয় মৃত, সেই এন্‌ভায়রণমেণ্টে অর্থাৎ সেই একঘেয়ে, সেই বাঁধা পরিধির দ্বারা চৌহদ্দি টানা ক্লাস রুমের মধ্যে বসে পুস্তকের লিখিত বিষয়কে, শিক্ষার্থী স্বাভাবিক চিত্তে, স্বচ্ছন্দে মনের আনন্দে গ্রহণ করতে পারে না। সেই একঘেয়ে বদ্ধ ঘরের মধ্যের চারিদিকের দেয়াল-আঁটা সীমানা-মারা ক্লাস রুমের মধ্যে শিক্ষার্থীর অবস্থাটা হয় খাঁচার মধ্যে পাখীর মতন। ক্লাসের বাইরে এই সব ছুটির দিনগুলি-ই হচ্ছে সত্যিকারের শিক্ষা গ্রহণের দিন, যদি দিনগুলিকে লাগাতে পারা যায় শিক্ষাগ্রহণের কাজে। চলন্ত মনই আহরণ করতে পারে জ্ঞান, ঘুমন্ত মন ঘুমোতেই পারে। শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা, শিক্ষার্থীর মনকে করে দেয় নির্জীব, সে ব্যবস্থার মধ্যে বড় রকমের শিক্ষা দান সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গেই উঠে পড়ল, ভারতীয় তীর্থ পরিভ্রমণের উপকারিতার কথা। কবি আরো উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। বল্লেন, তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্য কি এবং কত রকমের সে নিয়ে হয়তো কত রকমের পরস্পরবিরোধী তর্ক এবং আলোচনা উঠতে পারে। কিন্তু তীর্থযাত্রা থেকে আমরা মানুষের মনের শিক্ষণীয় বিষয়ে পূর্ণ শিক্ষা পাবার পথে খুব বড় একটা সঙ্কেত পাই। এ সম্বন্ধে বহুদিন পূর্ব্বে কবি এই সব বিষয়েরই আলাপ প্রসঙ্গে কি বলেছিলেন তা স্মরণ করিয়ে দিতেই, কবি খুব একচোট হেসে উঠে বল্‌লেন, "হ্যাঁ বলেছি তো অনেক সময় অনেক কথা, কিন্তু আসল কাজে লাগছে কই"—এই বলে তীর্থযাত্রা বিষয়ে তিনি কি ভেবেছেন সেইটে বল্‌লেন। শিক্ষা-লাভ-বিষয়কে কেন্দ্র করেই তিনি যা বলেছিলেন তার সারমর্ম্মটা এই—ভারতবর্ষের পরিচয়কে ভারতবাসী হিন্দুর মনে সত্যি করে দেগে দেবার ব্যবস্থা ছিল তীর্থযাত্রার ব্যবস্থায়। তীর্থের স্থানগুলির স্থিতিও ভারতের চতুঃসীমানা জুড়ে। ভারতের ভৌগোলিক পরিধির সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য, তখনকার দিনে আজকের মতন ক্লাশ রুমে টাঙানো ম্যাপ ছিল না—ছিল তীর্থ-পথে হেঁটে ভারতের মাটির সঙ্গে সত্যিকারের যোগস্থাপনের ব্যবস্থা। একদিকে দেখতে পাওয়া যায় হিন্দুর সামাজিক ব্যবস্থায় হিন্দুদের মন, বিশেষ করে হিন্দু নারীদের মনকে একান্তভাবে করা হয়েছিল ঘরমুখী, এমন কি একেবারে ঘরের কোণমুখী। হয়তো সেটা প্রয়োজন ছিল, ঘরের আশ্রয়কে ঠিক রাখবার জন্যে মেয়েদের চিত্তের মধ্যে গৃহভাবের সঙ্কীর্ণতাই তাদের করেছিল সুখে দুঃখে গৃহিণী। সে রাজ্যে, তারা গড়েছিল একটা সীমাদুর্গ নানা ভাবের প্রাচীর দেওয়া সে কেল্লা, বাইরের বৃহত্তর জগতের সঙ্গে ছিল না তার সত্যিকারের যোগ। কিন্তু তীর্থ পরিভ্রমণের ব্যবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়, অন্য রকম। এ যেন গৃহমুখী সঙ্কীর্ণ মনকে ক্রমাগত বাইরে টেনে নিয়ে যাবার

ব্যবস্থা। কুনো মনকে বৃহত্তর প্রসারের মধ্যে আহ্বান। ঘরের পরিচয়ের সঙ্কীর্ণ পালা শেষ করে বাইরের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যেই যেন এই যাত্রা। এই যে বাইরের যাত্রা, এর মধ্যেই রয়েছে দুঃসাধ্যতা। কেন না সেকালে তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণের পথগুলি ছিল না সুগম, বরং ছিল ঠিক তার উল্টো, ছিল দুর্গম, পথ ছিল দুর্গম, পথে যেতে যাদের সঙ্গে হোতো দেখা তারাও ছিল অপরিচিত —তাদের চালচলনে ছিল নূতনত্ব। কাজেই ব্যাপারটা ছিল কঠিন, আজকালকার স্পেশাল ট্রেনে স্ফূর্ত্তি করে তীর্থদর্শনের রিক্রিয়েশনের মতন নয়। কিন্তু অত দুর্গমতাকে স্বীকার করে নিয়েই যাত্রীদল যেতো তীর্থে। কারণ চলায় যেমন শ্রম আছে, তেমনি আছে আনন্দ—সে আনন্দের মধ্যে ছিল নূতনকে জানবার আগ্রহ, বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজের স্থানকে খুঁজে বার করবার দুঃসাধ্য উৎসাহ। তীর্থপথে তীর্থযাত্রী এবং যাত্রিণীদের সুরু হোতো যে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, সেটার মধ্যে সুখ দুঃখের পরিমাণ কম ছিল না,—কিন্তু সবই তারা সহ্য করত নব চেতনার আনন্দে। সুতরাং তীর্থ দর্শনের এই প্রণালীর ভিতর দিয়ে তাদের চিত্তে তাদের প্রাণে, মনে, ধ্যানে, কল্পনায়, জ্ঞানে, সত্যি হয়ে উঠত সত্যিকার হিন্দু ভারতবর্ষ—এমনি করেই তাদের সঙ্গে ভারতের পরিচয় হোতো জীবন্ত। তাদের সেই ভারতকে চেনার প্রণালীটা হচ্ছে আজকের দিনে নব যুগে, শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে, ভবিষ্যতের আশা-স্থল যুবকদের প্রকৃতপক্ষে মানুষ করে তোলবার পক্ষে, একটা বড় সঙ্কেত। সেদিন সকালের দিকের আলাপ থামল এই পর্য্যন্ত বলে। তারপর সুরু হোলো কথাবার্ত্তা আবার অনুমান বেলা একটার পর, এই দেড়টা দুটোর সময়। এই সময় বলাইবাবু—অর্থাৎ "বনফুল" এবং তাঁর অধ্যাপক বন্ধুটি ঘরে ঢুকতেই কবি তাঁদের বসতে বলেই বললেন, সকালের আলাপ-প্রসঙ্গে আমি তখন থেকে ভাবছি তোমাদের শিক্ষা সম্বন্ধে আমার আইডিয়া বলি—অনেক বারই নানা রকমে এসব কথা পূর্ব্বে বলেছি। কিন্তু আবার বলতে দোষ নেই। আমার এই আইডিয়াকে কাজে সার্থক কোরে তোলবার মতন, আর্থিক সামর্থ্য, শারীরিক সামর্থ্য এবং বয়স কোনটাই আমার নেই। কিন্তু তোমরা এটা সম্বন্ধে চিন্তা করে দেখতে পার। এই কথা বলে কবি তীর্থ-পরিভ্রমণের ভিতরকার সার্থকতা সম্বন্ধে বললেন। সংক্ষেপে তার মর্ম্ম এই, তীর্থ-পরিভ্রমণের পথে যাবার আগে অবশ্য যাত্রীদল ঘরের থেকে বার হোতো, একটা বড় উদ্দেশ্য নিয়ে, বড় আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, একটা পুণ্য আদর্শের টানে। শুধু একটা বাহ্যিক পিক্‌নিক করার ছোট রকমের আনন্দ উপভোগের জন্য নয়। কাজেই তাদের সেই যাত্রায় যে পথে তারা চলেছিল, সে পথ কখনো উঠেছিল অত্যুচ্চ পর্ব্বতের শিখরে, কখনো সে পথ টেনেছিল তাদের সাগরের বুকে, কখনো সে পথ গিয়েছিল দারুণ উত্তাপময় মরু-প্রান্তরে। আর সেই পথের বাঁকে বাঁকে তাদের মন আর চোখ লাভ করেছিল নব নব বস্তুর পরিচয়। এক প্রদেশের সঙ্গে অন্য প্রদেশের সব রকম অবস্থার সঙ্গে হয়েছিল তাদের জানাশোনা সেই পথে এবং সেই পথের পান্থ-শালায় চলতি প্রাণের আনন্দে—চলতি প্রাণের দুঃসাধ্য সাধনায়। নব যুগের শিক্ষাজগতে আমাদের পা বাড়াতে হবে ঐ বড় আদর্শের পথে। আদর্শ সম্বন্ধে অনেকেরই ঘটে ভুল। আদর্শের চারিপাশে অনেক ছোটখাটো এমন আবর্জ্জনা থাকে, যা সর্ব্বদাই পরিহার্য্য। কিন্তু অনেক সময় দেখি তাই চলে আদর্শের নামে। সেটা ঠিক নয়, এই তীর্থ-

যাত্রার বিরাট আদর্শের চারিদিকে এমন অনেক অবাঞ্ছনীয়তা আছে যাকে কোন ক্রমেই প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। তার পরেই কবি বললেন, আচ্ছা ধর একটা স্কীম করা যাক, কয়েকজন শিক্ষক মিলে, বেশ বাছাই করা একদল ছেলে, (ধরাই যাক জন পঁচিশ) নিয়ে একটি কিম্বা দুটি বগি রেলগাড়ীর সঙ্গে লাগিয়ে, পাঁচ বছরের সময় সীমা করে বেরিয়ে পড়লে ভারত-ভ্রমণে। বিশেষ বিশেষ সহুরে জায়গায় প্রয়োজনমত যে ক'দিন থাকা দরকার থাকলে। এমনি কোরে সমস্তটা ভারতবর্ষ একরকম মোটামুটিভাবে তাদের ঘুরিয়ে নিলে। এই পাঁচ বছরের ভ্রমণের মধ্যে তারা কি শিক্ষা পাবে এবং কতটা অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করবে এইটেই আলোচনা করা যাক।" এর পর কবি যা বললেন, সেটার মর্ম্ম এই যে, এই ভ্রমণটা তো কেবল জিওগ্রাফির লাইন মাড়িয়ে যাওয়া নয়। এক একটি সহরে একটি জায়গায়, সেই সেই সহরের সেই সেই জায়গার ভৌগোলিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থা এবং লোকজনদের আচার ব্যবহার পোষাকপরিচ্ছদাদির বিভিন্নতার সঙ্গে ছেলেদের ঘটবে নিত্য নব পরিচয়। এই রকমের পরিচয়-জ্ঞানটাই সত্য। যে শিক্ষাপ্রণালী, মানুষের সঙ্গে মানুষকে ও বিভিন্ন দেশের সঙ্গে মানুষের জীবন্তভাবে পরিচয় না করিয়ে দেয়, সে শিক্ষাপ্রণালী খুব প্রশংসনীয় নয়। এই রকমে ভ্রমণকালে ট্রেনের ঐ চলন্ত গৃহে শিক্ষকেরা ঐ সব ছাত্রদের পুঁথির শিক্ষাও দেবেন এই ভ্রমণ-নীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ তাল মিলিয়ে। অর্থাৎ ছেলেদের চিত্তে অব্‌জারভেশনের শক্তিকে বাড়িয়ে দেবেন, গল্পচ্ছলে, তাদের ভ্রমণ-পথে দেখা শোনার বিষয়ে বিচিত্র প্রশ্ন ক'রে। এই রকম শিক্ষাদান কিম্বা শিক্ষা-চর্চ্চাতে ছেলেদের উপর মাষ্টারদের প্রভাবটা হয় সত্য। ভ্রাম্যমাণ গৃহে জীবন-যাত্রার উপযোগী সব রকম ব্যবস্থাই রাখা উচিত যতটা ঐ রকম অবস্থায় সম্ভব। শিশু যেমন করে বড় হয়, জ্ঞানের দিকে চিন্তার দিকে, প্রতিদিনের সহজ সুখে দুঃখে মেশানো জীবন যাত্রায়, তেমনি কোরে এই ভ্রাম্যমাণ গৃহে ছাত্রেরা নব নব প্রভাতে পাবে নব নব অভিজ্ঞতা, নব নব দৃশ্যের থেকে নব নব চিন্তা, প্রতিদিন তাদের মনের দরজায় ঘা দেবে নব চিন্তা, নব জ্ঞান, নব অভিজ্ঞতা। তাদের এই সাধনায় সঙ্গের শিক্ষকেরা পরিবেশন করবেন তাঁদের দেয়। বলা বাহুল্য, এই রকমের শিক্ষা-চর্চ্চায় কেবল যে ছাত্রেরাই হবে সফলকাম তা নয়, ছাত্রদের শিক্ষকদেরও হবে নিত্য নূতন জ্ঞান, নিত্য নূতন অভিজ্ঞতা। শিক্ষা ব্যাপারে গুরুশিষ্যের মধ্যে শ্রদ্ধা এবং প্রীতিরসে হওয়া উচিত একটা মধুর সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের রাজ্যে উভয়ের শিক্ষা অর্জ্জন ব্যাপারে দেওয়া-নেওয়ার সহযোগিতা।

কবির এই সব কথা শুনে "বনফুল" এবং সেই অধ্যাপক মহাশয় হোলেন মুগ্ধ। তাঁদের চেহারায় এই প্রস্তাবকে আন্তরিকভাবে অ্যাপ্রিশিয়েট করবার ভাব ফুটেছে দেখে, কবি আরো উৎসাহের সঙ্গে বললেন, "তোমরা ইচ্ছে করলে কি এই রকমের একটা এক্সপেরিমেণ্ট করতে পার না? এ রকম স্কীমের হয়তো প্র্যাকৃটিক্যাল খুঁটিনাটি ডিফিক্যালটি অনেক আছে, কিন্তু তোমরা সেগুলোকে তো কতকটা ঠিক করে নিতে পার। আমার কিন্তু এই রকম নীতিতে শিক্ষা-চর্চ্চার ইচ্ছে অনেকবার হয়েছে। কিন্তু কবি বলেই হোক কিম্বা যে কারণেই হোক, মনের মতন করে আজো সেটা কোরে উঠতে পারিনি, তোমরা একবার চেষ্টা করে দেখ না।"

এঁদের সঙ্গে, সেদিনের মতন শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা শেষ হোলো। তারপর সুরু হোলো

সাহিত্যালাপ। এই প্রসঙ্গে কথা উঠল বীরভূমের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছোটগল্প-লেখক শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা। কবি তাঁর ছোটগল্প লেখার হাতের খুবই প্রশংসা করলেন—বিশেষ করে প্রশংসা করলেন, 'জলসাঘর' এবং 'রাইকমলে'র। তারাশঙ্করবাবুর বড় উপন্যাস লেখবার প্রচেষ্টার কথা তুলে কবি বললেন, "এক একজনের হাত এক এক ধরণের লেখায় তার বৈশিষ্ট্যকে প্রমাণ করে। তারাশঙ্কর যে ধরণের লেখায় কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছেন, তাঁর উপন্যাস রচনার ধরণ সে রকমের নয়। এদিকে তারাশঙ্করের প্রতিভা কেমন, সেটা অপেক্ষা করে দেখতে হবে, এখন কোনো মন্তব্য দেওয়া কঠিন। তারাশঙ্করের লেখা আমি মনোযোগ দিয়েই পড়ি, কেননা, তাঁর লেখার বিষয়ের মধ্যে কৃত্রিমতা নেই। সহজভাবে দ্রষ্টব্য বিষয়কে দেখে তাকে সুন্দরভাবে পাঠকদের পরিবেশন করতে তারাশঙ্কর জানেন।" এর পর আবার উঠল কথা, আধুনিক কবিতা নিয়ে, সেই প্রসঙ্গে কবি বললেন, "গদ্যের চালে চলছে, কিম্বা মিলের চালে চলছে, কবিতা বিচারের সেটা বড় মাপকাঠি নয়। কবিতার বক্তব্য বিষয়টা রসে এবং অর্থে পাঠকের চিত্তকে স্পর্শ করছে কিনা পাঠককে, কবিতার স্পর্শ অনুভব করিয়ে দিচ্ছে কিনা সেটাই হচ্ছে আসল কথা।" এই আলাপ প্রসঙ্গে কবিকে স্মরণ করিয়ে দিলেম হাল ফ্যাসানের কবিতার প্রাদুর্ভাব হবার বহু পূর্ব্বে, কবিতার স্বরূপ বিচার-প্রসঙ্গে কবি এক বৈঠকে হাস্‌তে হাস্‌তে বলেছিলেন—সারি সারি কয়েকটি কম বেশী গরম লৌহদণ্ড সাজিয়ে রেখে তার পর একে একে সেগুলিকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে কোন্‌টির কত তাপ সেটা বুঝবার চেষ্টা যেখানে করা হয়, সেখানে তাপটা শুধু একমাত্র গ্রাহ্য বিষয় নয়। কারণ সকলের অনুভূতির এবং হস্তত্বকের স্পর্শকাতরতার স্ট্যাণ্ডার্ড এক রকমের নয়। কাজেই যে লৌহটা একজনের কাছে "হ্যাঁ, একটু গরম ঠেকছে," অন্যের কাছে সেইটেই হয়তো "তাই তো বেশ গরম"; কিন্তু যে লোহাটা একদম ডগডগে লাল হয়ে গরম হয়ে থাকে, সেটাকে স্পর্শ করা মাত্রই যে সেটাকে ছোঁয় সে তৎক্ষণাৎ বিন্দুমাত্র আর কোনো চিন্তা না কোরেই বুঝতে পারে লোহাটার গরম। অর্থাৎ সেই হাতে ছ্যাঁকা লাগা উত্তাপকে বুঝবার জন্য লৌহটিকে রয়ে-সয়ে টিপে-টুপে আস্তে ধীরে বিচার বিবেচনাপূর্ব্বক মন্তব্য দেবার সময় থাকে না,—তীব্র উত্তাপই স্পষ্ট রকমে বুঝিয়ে দেয় যে সেটা উত্তাপ। আসল কবিতার ধর্ম্ম তাই। সে পরের সার্টিফিকেট নিয়ে লোকের কাছে পরিচয় দেয় না, নিজের পরিচয় দেয় নিজের জোরে। তার সম্বন্ধে বিবেচনা কোরে কিছু কেউ বলবে, সে অপেক্ষা সে রাখে না। কবিতা বিচার সম্বন্ধে তাঁর পূর্ব্বমন্তব্য শুনে তিনি খুব একচোট হেসে উঠলেন। বললেন, "কথাটা ঠিকই বলেছিলেম। কিন্তু এ বিষয়টা ভালো করে লিখে বলতে হোলে অত সংক্ষেপে চলে না, কথায় বলার বৈঠকে অনেক বড় বিষয়কেও সংক্ষেপে এই রকমে বলে নেওয়া যায় এবং তাতে বক্তব্য বিষয়টাও সুস্পষ্ট হয়, কারণ গল্পের আসরে সব রকম কথার যে একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়, তার মধ্যে সংক্ষিপ্ত কথাও তার পরিপূর্ণ অর্থটা প্রকাশ করে নিতে পারে।"

এই আলাপ-আলোচনার ৩।৪ দিন পরেই উপস্থিত হলেন কবি-দর্শনে 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস। রবীন্দ্রনাথের বহু পুরাতন রচনা যা কবির ও অনেকেরই মনে-না-থাকার ঢাকনীর নীচে ঢাকা ছিল, সেইগুলিকে খুঁজেপেতে বার করার কাজে যাঁরা আত্মনিয়োগ

করেছেন, সজনীবাবু তাঁদের মধ্যে বিশেষ একজন। তিনি হাজির হলেন অনেকগুলি পুরোনো মাসিক পত্রিকা নিয়ে। সজনীবাবু অতি প্রাতেই কবির কাছে এসে কবিকে প্রণাম করে বসতেই কবি তাঁকে সস্নেহে বললেন "কি, অবশেষে এলে। আমি তো তোমার জন্যে কাল থেকে পথ চেয়ে আছি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামাঙ্কিত হলের দ্বার-উন্মোচন ব্যাপার নিয়ে এলে, ভালোই করলে। অনুরোধ এড়াতেও পারি না—আবার বয়সের জন্য কথা দিয়ে অনুরোধ রাখতেও পারি না। আরো বিপদ এই যে, দুএক জায়গায় অতি কষ্টে অনিবার্য্য কারণে অনুরোধ রাখলেও বিপদ, কারণ পাবলিকে তখন আমার বয়েস এবং অসামর্থ্যের বিষয় কিছুমাত্র চিন্তা এবং বিবেচনা না করে দাবী করেন যে, যে হেতু আমি 'সেখানে' গিয়েছিলেম, অতএব 'ওখানে' কেন যাব না। এসব কি বিপদ বল তো ?" সজনীবাবু বললেন, "সেটা আমরা বিশেষ করে জানি। আজ কেবল বিদ্যেসাগর মহাশয়ের স্মৃতি-রক্ষার কাজ নিয়ে আসি নি, এসেছি আপনার সাহিত্য-সংক্রান্ত ব্যাপারে।" কবি বললেন, "উত্তম, চা পান করে লাগা যাক্ ঐ কাজে।"

চা-পান করবার সময় কবির বাল্যকালের রচনা-প্রসঙ্গে সজনীবাবুর প্রশ্নোত্তরে কবি বললেন, "আমার বয়েস যখন সাত হবে সেই সময়, যতদূর মনে পড়ে, একটা ছেলেমানষী রকমের পদ্য রচনা করে ফেলেছিলুম। বিষয়টা ছিল—দূরে জলে ভাসমান একটি পদ্মকে সাঁতরে গিয়ে তুলে আনা। কবিতাটি বেশ লম্বা হয়েছিল—অক্ষয়বাবু ছিলেন আমার সেই শিশুকালের লেখার একজন সমঝদার। তিনি আমায় দিতেন খুব উৎসাহ। বেশ মনে পড়ে, সেই পদ্মের কবিতাটি তাঁর খুব ভালো লেগেছিল, তিনি সেটিকে নিয়ে গিয়ে অনেককে শুনিয়েছিলেন। তখন বুঝিনি, কেন তাঁর ঐ কবিতাটি অত ভালো লেগেছিল, এখন ভেবে মনে করতে পারছি, তাঁর ভালো লাগার কারণ কি ছিল। বয়সটা ছিল সাত, কাজেই বুঝতে পারো ওটা বিশেষ কিছুই হয়তো হয়নি। কিন্তু ওর ভিতরকার আইডিয়ার দিকটাই বোধ হয় অক্ষয়বাবুর ভালো লেগেছিল। সাঁতার দেবার চেষ্টায় বারবার জলের ঢেউ সামনের ফুলকে ক্রমাগত ঠেলে দিচ্ছিল দূরে, ফুলকে পাবার অতি ব্যস্তভাবটাই যে তাকে পাবার পথে বিঘ্ন ও কাম্য বস্তুকে লাভ করবার পথে অনেক সময় আগ্রহের অতিশয়তা যে বাধা স্বরূপ হয়ে ওঠে, এই প্রচ্ছন্ন আইডিয়াটাই বোধ করি অক্ষয়বাবুকে বিশেষ আনন্দ দিয়েছিল। ১১।১২ বছরের সময় ম্যাক্‌বেথের অনুবাদ করেছিলেম এবং সে বিষয়ে কোন রকম সঙ্কোচ ছিল না। শুধু কি অনুবাদ করা, সেই অনুবাদ নিয়ে সটান চলে গিয়েছিলেম বিদ্যেসাগর মহাশয়ের কাছে। তাঁকে পড়িয়ে শুনিয়েছিলেম। বাড়িতেও দাদারা যেমন আমাকে সাহিত্য-চর্চ্চায় আস্‌কারা দিতেন, বাইরেও তেমনি তৎকালীন গুরুস্থানীয় প্রধান সাহিত্যিকেরা আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখতেন। পরবর্ত্তীকালে আমার 'বউ-ঠাকুরাণীর হাট' পড়ে বঙ্কিমবাবু বিশেষ আনন্দ পেয়েছিলেন এবং আমাকে বিশেষ উৎসাহ দিয়ে তিনি একটি ইংরেজী চিঠি লিখেছিলেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। সে চিঠি হারিয়ে ফেল্লেন অক্ষয়বাবু। সে চিঠিটির জন্য আমার দুঃখ আজো যায়নি। তখনকার দিনে বঙ্কিমবাবুর মতন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের কাছ থেকে সত্যিকারের প্রশংসা-পত্র পাওয়া কম সৌভাগ্যের কথা ছিল না। বঙ্কিমবাবু আমার লেখা এবং গান দু-ই ভালোবাসতেন। একবার এক সভায়, সকলে ধরে পড়ল আমাকে

গান গাইবার জন্যে, আমি মনে মনে গাইতে নারাজ ছিলেম, সভাপতি ছিলেন বঙ্কিমবাবু, তাঁকে বল্লেম, আমাকে রক্ষে করুন এঁদের হাত থেকে। বঙ্কিমবাবু মৃদু হেসে বল্লেন, উপায় দেখচিনে, আমিও এখন এঁদেরি দলের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই গান গাইতে হলো।"

বিকেলে আসন্ন সন্ধ্যায় সজনীবাবুকে সঙ্গে করে পুনরায় কবির কাছে উপস্থিত হয়ে দেখি, কবি তাঁর "শ্যামলী" নামক মাটির কুটীরের দক্ষিণের ঘরে একটি ইজিচেয়ারে বসে আছেন, হাতে তাঁর একটি ছবি আঁকার কাগজ আর একটি ফাউন্‌টেন পেন। আমরা উপস্থিত হোতেই তিনি গল্প সুরু করে দিলেন নানা বিষয়ে। কিছুক্ষণ গল্প করেই বল্লেন, "এই দেখ গল্প করার ফাঁকে মাঝে মাঝে যে সময় পেয়েছি, তার সদ্ব্যবহার করেছি।" সেই কাগজে আঁকা একটি পক্ষীচঞ্চুর উপরে দণ্ডায়মান একটি অদ্ভুত জন্তু। আমরা তো হেসেই অস্থির। তিনি বল্লেন "তোমাকে সকালে দিয়েছি আধুনিক রসের একটি কবিতা আর এই নাও তারি চিত্র। এটাও একটা "অবদান"। অবদান বলছি এই জন্যে কারণ, আজকাল বাংলা দৈনিকে কতগুলি কথা, যেমন "অবদান" "পরিস্থিতি" "বাধ্যতামূলক শিক্ষা", "সাথে", "আপ্রাণ" ইত্যাদি বেশ চল হয়ে যাচ্ছে।" সজনীবাবু চিত্রটি উপহার পেয়ে বিশেষ আনন্দিত হলেন।

সেদিন সকাল থেকেই কবি ছিলেন বেশ আনন্দময় মেজাজে বা মুড-এ। সকাল বেলাতেই ভৃত্য মহাদেবকে বল্লেন লেখবার টেবিল দাও। সে যথারীতি অদূরবর্ত্তী টেবিলটি কাছে এগিয়ে দিয়ে তার উপর লেখবার সরঞ্জাম সাজিয়ে দিলে। কবি হঠাৎ বল্লেন "এ টেবিলে লিখবনা—আমার সেই, নূতন তৈরী করানো ডেস্কটা আনো। অবস্থা দেখে মনে হোলো, সেটা কোথায় আছে, তারা মনে করে উঠতে পার্‌ছেনা। কাজেই কবিকে বল্লেম, আপনি আজকের মতন এই টেবিলেই লেখার কাজ সেরে নিন—ওটা খুঁজে বার করতে দেখছি সময় নেবে। তিনি বল্লেন, "যত সময় লাগে লাগুক আমি সেই ডেস্ক চাই।" ব্যাপার বেগতিক দেখে, ভৃত্য মহাদেব এবং বনমালী আরো যে যেখানে ছিল সকলেই দৌড়ল অন্য বাড়ীর ঘরগুলিতে ডেস্ক খুঁজতে। যখন দেখলেন, কাছাকাছি কোন ভৃত্য নেই, বেশ একটু মুচকে হেসে বল্লেন "সত্যিকারের লেখার কাজ থাকলে কি এই সময় এমন একটা বিভ্রাট বাধাতুম। পাহাড় থেকে এসেছি, এখনো পর্য্যন্ত দেখছি এরা সব জিনিষ ভালো করে গুছোয় নি। চার পাঁচটি তো জুটেছে, কাজ যে কি তাও বুঝিনে। করুক না একটু দৌড়ঝাঁপ, শীতের সকালে এক্‌সর্‌সাইজ করুক। তাছাড়া একটা মজাও হবে, ঐ ডেস্কটি খুঁজে বার করে আমার কাছে সর্ব্বাগ্রে এনে উপস্থিত করার ক্রেডিট নেবার জন্য গ্যাখনা কী রকম জোরসে ওরা অনুসন্ধান কর্ত্তব্যে প্রবৃত্ত হবে, আছে তো ডেস্কটা ঐ বাড়িতে কোন একটা ঘরে—কিন্তু হৈ চৈ করে খুঁজে বার করবার কী ধুম! যিনি ডেস্ক এনে উপস্থিত করবেন, তাঁর বাহাদুরী আর মুখের উল্লাসের ভঙ্গী একটা দেখবার বিষয় হবে।" সত্যিকারের লেখাপড়ার বিশেষ কাজে যে দিন মন না দিতে চান, সেদিন এরকমের উপলক্ষ ঘটিয়ে তিনি ভৃত্যদের সঙ্গে যে সব রসিকতা করেন তা বেশ উপভোগ্য। তার আগের দিন সকালে তিনি তাঁর ভৃত্য বনমালীকে ডেকে বল্লেন, "তোমাকে একটা কথার জবাব দিতেই হবে"। সে বল্লে, "বলুন, জবাব নিশ্চয় দেব। কবি বল্লেন, "বেশ, ঘাসে শীতের দিনে শিশির কোত্থেকে আসে এটা তোমাকে

বলতে হবে। সে বল্লে "রাত্রে আকাশ থেকে শিশির পড়ে।" কবি বল্লেন "তা নয়, মাটি থেকে শিশির ওঠে।" বনমালী, তাঁর প্রিয় ভৃত্য, সে বেচারী বল্লে, "আমি তো জানি আকাশ থেকেই শিশির পড়ে, তা যদি না হ'য়ে মাটি থেকেই শিশির ওঠে তা ওঠুক, ক্ষতি নেই। কিন্তু ঘাস ভিজে থাকে, এটা কিন্তু সত্যি কথা।" কবি বেশ গম্ভীর ভাবে বল্লেন, "ওটা সত্যি কথা নয়, বোলপুরের মাঠে শিশিরে ঘাস ভিজে যায় না, ঘাসগুলো বেশ শুক্‌নো থাকে।" বেচারী বনমালী এবার বিপদে পড়ল, কি করে, মৃদু প্রতিবাদ জানাল। কবি বল্লেন, "ঘাস যে ভেজে না সে বিষয় ফণীবাবু (অধ্যাপক ফণিভূষণ অধিকারী) সাক্ষী আছেন।" এর পরে বনমালী চরম উত্তর দিল। সে বললে, "বড় বড় লোকেরা যা বলবেন তাই যখন সত্য, তখন আমার কথাটাই মিথ্যা হোক, তাতে আমার দুঃখ নেই, বড় লোকেরই মান থাক।" কবি বেশ উপভোগ করলেন ভৃত্যের জবাবগুলি। কবি-প্রসঙ্গের যৎকিঞ্চিৎ-এ আজ এই খানেই দাঁড়ি টানি।

'চত্বারঃ'

শ্রীকুসুম

বসে আছি খোলাডাঙার মাঠে,
 দেখছি জানোয়ারের বিচিত্র মেলা,
শিমুলগাছের ডালে ফিঙে নাচাচ্ছে তার পুচ্ছ
 কোকিলের কুহু আসছে ভেসে
যেন কোন সে স্বপ্নের দেশ থেকে।
 মাঠে চরছে একদল গরু,
 কি নিরীহ, নিরাশঙ্ক তাদের চাহনি!
ছোট ছোট অজ শিশুগুলি লাফিয়ে বেড়াচ্ছে
 আপন কুতূহলে আপনি মত্ত।
আর একধারে দেখি একদল বানর
 সভা জাঁকিয়ে বসেছে—
অনর্গল চলছে তাদের বক্তৃতা,
 হাত পাও নড়ছে তার সঙ্গে।
মনে পড়ে গেল বৈজ্ঞানিকের বাণী,
 সরে গেল চোখের ওপর থেকে অভিমানের যবনিকা,
দেখলাম মানুষের শৈশবের ইতিহাস—
ছেলেদের মেলা, চাষীর নির্লিপ্ত বেদনা
 কবিদের গান ও মোড়লের আস্ফালন।

দীনেশচন্দ্র সেন

শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেনের মৃত্যুতে বাঙ্‌লা ভাষা এবং সাহিত্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছে। বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনা ক'রে তিনি বাঙালী জাতির যে কল্যাণ সাধন ক'রেছেন, তা' বাঙালী এখনো হয়ত পুরোপুরি বুঝতে পারে নি। তবে ক্রমশ তা' সকলে বুঝবে।

আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্য যে সময় থেকে বাঙালীর মনে আসন গ্রহণ করল, তা'রও অনেক আগে যখন ছাপাখানা নেই, খবরের কাগজ নেই, যখন যাত্রার পাঁচালী-ছড়ার এবং গানের আসরে মানুষের পরস্পর দেখাশুনা এবং ভাব বিনিময় হ'ত, সে দিনের বাঙ্‌লা সাহিত্য এবং ভাষা কেমন ছিল—তা'র মধ্যে কোথায় লুকিয়ে আছে অতিপ্রচ্ছন্ন বাঙালীর প্রাচীন ইতিহাস, এ তথ্য দীনেশচন্দ্রের আগে বাঙালীর কাছে তেমন ক'রে কেউ খুলে বলে নি। বাঙালীর প্রাচীন দিনের জীবন, ভাষা, সাহিত্য এবং ইতিহাসের কথা বোধ হয় দীনেশচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম আমাদের শুনিয়েছেন। এ পথ তিনিই সর্ব্বপ্রথম দেখিয়েছেন। তারপরে আরও অনেকে আসছেন এবং আসবেন। এই জন্যে তাঁকে যে কত পরিশ্রম করতে হ'য়েছে, গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে হ'য়েছে, অজস্র প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ ক'রে সে সব থেকে ইতিহাস উদ্ধার ক'রতে হ'য়েছে,—এ কথা বোধ হয় তাঁ'র গ্রন্থগুলি যাঁ'রা পড়েছেন, তাঁ'রাই বুঝবেন। এ জন্য তিনি সমগ্র বাঙালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন।

তাঁ'র আজীবন পরিশ্রমের যোগ্য মর্য্যাদা তিনি পেয়েছিলেন। বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যের সম্পদ্ ও শ্রী তিনি বর্দ্ধন করেছেন। তাঁ'র অভাবে দেশ ও জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল। ভগবান তাঁ'র স্বর্গগত আত্মার শান্তিবিধান করুন।





পুস্তক-পরিচয়

'রবীন্দ্র-রচনাবলী'

রবীন্দ্রনাথের একখানি সমগ্র গ্রন্থাবলীর অভাব আমরা অনেকে অনেক দিন থেকেই বোধ করছি। অবশ্য তাঁর কবিতাবলীর দুই একখানি সংগ্রহ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয়েছে, যথা ৺সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশিত অধুনা দুষ্প্রাপ্য কাব্যগ্রন্থ, ৺মোহিতলাল সেনের সঙ্কলন এবং তারপর এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসের সংগৃহীত কাব্যাবলী। এর কোনটিকেই সম্পূর্ণ সংগ্রহ বলা যায় না। কারণ এতে তাঁর গদ্যরচনা বাদ পড়ে গিয়েছে। তাছাড়া এ দুই গ্রন্থ-প্রকাশের পরে রবীন্দ্রনাথ বহু কবিতা লিখেছেন।

বিশ্বভারতী গ্রন্থপ্রকাশক সমিতির অধ্যক্ষেরা যে তাঁর গদ্য-পদ্য সমস্ত লেখা একত্র করে প্রকাশ করবার সঙ্কল্প করেছেন, এর জন্য তাঁদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ দিতে বাধ্য। যে কবি আজ সত্তর বৎসর ধরে অবিরাম সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য যে বিরাট তা বলাই বাহুল্য। এই বিরাট সাহিত্য সংগ্রহ করা ও প্রকাশ করা সহজসাধ্য নয়; এর জন্য চাই বিপুল পরিশ্রম, একান্ত যত্ন এবং অক্লান্ত অধ্যবসায়। এই সৃষ্টি-প্রবাহের নিরবচ্ছিন্নতা ও প্রাচুর্য্য আমার মতে লোকোত্তর প্রতিভার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যসাহিত্যও বহুমুখী ও বহুপ্রকার। যে বিষয়েই তাঁর চোখ পড়েছে, সেই বিষয়ই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। একমাত্র তাঁর ভাষার কথা ধরতে গেলে আর সে ভাষার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য এবং ঐশ্বর্য্য হৃদয়ঙ্গম করতে হলে, তাঁর গদ্য-পদ্য উভয়েরই সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।

'রবীন্দ্র রচনাবলী'র প্রথম খণ্ড আমার হস্তগত হয়েছে। এ খণ্ডের কাগজ ভাল, ছাপা পরিষ্কার ও দাম কম। অক্ষর আর একটু বড় হলে আমি আরও খুসী হতুম, কারণ এখন আমার দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে এসেছে। আমি জানি যে, বাঙলা অক্ষর মাত্র চার পাঁচটি ছাঁচে ঢালা। সে অক্ষরের বৈচিত্র্য বড় বেশী নয়। আর এক কথা, সস্তা সংস্করণটিও সস্তায় বাঁধিয়ে দিলেই ভাল হত। কারণ কলকাতার বাইরে বাঙলাদেশে আর কোথায়ও দপ্তরিপাড়া নেই।

আমার আর একটি বক্তব্য আছে। যিনি অসংখ্য কবিতা লিখেছেন, তাঁর রচনার ভিতর ভাল মন্দ মাঝারি, এ তিন প্রকার লেখা থাকতে বাধ্য। সে কারণ বালক ও কিশোর রবীন্দ্রনাথের রচনা, তাঁর গ্রন্থাবলী থেকে বর্জ্জন করা ঠিক হয় নি। এ গ্রন্থ যদি anthology হত, তাহলে এরূপ ছাঁটকাট বাদ দেওয়া সঙ্গত হত। কিন্তু প্রকাশকরা যা করতে ব্রতী হয়েছেন তা ত selection নয়,

—রবীন্দ্রনাথের লেখার complete collection। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি, "মানুষ সামনের দিকে যেমন অগ্রসরণ করে, তেমনি অনুসরণ করে তার পিছনের, নইলে তার চলাই হয় না।" যাঁরা রবীন্দ্র-প্রতিভার অগ্রসরণ জানতে চান, তাঁদের পক্ষে সুরু থেকেই সুরু করা অনর্থক নয়। তাঁর রচিত নাবালক সাহিত্যেও এমন ছুচার ছত্রের সাক্ষাৎ নিশ্চয়ই মিলবে, যার থেকে আমরা প্রমাণ পাব যে রবীন্দ্রনাথ জন্মকবি।

আর এক কথা, রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীও একরকম সাহিত্য, আর সে সাহিত্যের স্থান অতি উচ্চে। এ কথা যে সত্য, তা যাঁরা তাঁর 'ছিন্ন-পত্র' পড়েছেন, তাঁরাই স্বীকার করবেন। আমার বিশ্বাস, এখনও তাঁর একাধিক সহস্র অপ্রকাশিত পত্র বাঙলাদেশে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। সে সব পত্র উদ্ধার করা অসম্ভব; কেন না, আমরা বাঙালীরা চিঠি হয় ছিঁড়ে ফেলি, নয় হারিয়ে ফেলি। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের বহু পত্র নষ্ট হয়েছে। তা সত্বেও বহু পত্র অবশিষ্ট আছে। বিশ্বভারতী প্রকাশক সমিতি যদি সেগুলি উদ্ধার করে প্রকাশ করেন, তাহলে উক্ত সমিতির অধ্যক্ষেরা বাঙালী সমাজের হস্তে একটি অমূল্য সম্পদ অর্পণ করবেন।

রবীন্দ্রনাথ একা যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, তার পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙালী সাহিত্যিকদের সকল লেখা একত্র করলেও তার তুল্যমূল্য হয় না,—না আকারে, না প্রকারে।

প্রমথ চৌধুরী





সম্পাদকীয়

আমি 'অলকা'র সম্পাদনার ভার নিয়ে অবধি মাসের পর মাস স্নুধু যুদ্ধের বিষয় আলোচনা করছি। এ লেখা আমার কপালের লেখা। আমি 'সবুজ পত্র' প্রকাশের পরেই, সে পত্রেও ক্রমান্বয়ে যুদ্ধের আলোচনা করতে বাধ্য হই, কারণ 'সবুজ পত্রে'র আবির্ভাবের পিঠ পিঠ ইউরোপের মহাযুদ্ধ স্নুরু হয়।

গত যুদ্ধের সঙ্গে আগামী যুদ্ধের একটা মস্ত প্রভেদ আছে। গত যুদ্ধ যে একদিন স্নুরু হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; কিন্তু হাল যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে কি হবে, তা আমরা আজও জানিনে। এই পর্য্যন্ত জানি যে, যুদ্ধ হব-হব করছে,—জার্ম্মান সৈন্য আর ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্য মুখোমুখী করে ন যথৌ ন তস্থৌ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। এর কারণ এ যুদ্ধ সম্মুখসমর হবে না,—হবে অন্তঃসলিলা এবং বিমানচারী।

এ যুদ্ধে প্রাণের ভয় সৈন্যদের চাইতে গৃহস্থদের বেশী। কখন কার মাথায় বোমা পড়বে, তা কেউ জানে না; আর কখন কোথায় জাহাজ ডুববে কেউ বলতে পারে না। বোমা আমাদের মাথায় আজও পড়ছে না, আর রাশিয়া যদি জার্ম্মাণীর সঙ্গে হাত না মেলায় ত কালও পড়বে না। তবে জাহাজ যে ডুবছে তা' জানি,—কেন না বিলেতি মালের দাম চড়ে গিয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এ যুগে মানুষে কি ঐহিক কি পারত্রিক সকলপ্রকার জ্ঞান, সংবাদ-পত্রের মারফতেই লাভ করে। বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে দেখছি সংবাদ-পত্রের আকার শীর্ণ হয়ে এসেছে—সেই সঙ্গে তার কণ্ঠও ক্ষীণ হয়ে পড়েছে।

দীর্ঘ সংবাদ-পত্র হ্রস্ব হয়ে পড়েছে, কাগজের অভাবে। কাগজ বিলেত থেকে আসে—জাহাজে চড়ে; আর এখন জাহাজ যখন-তখন যেখানে সেখানে ডুবছে। ভিজে কাগজে গরম গরম লেখা যায় না। বোধহয় একই কারণে সিগরেটের দাম বেড়েছে,—তার মোড়কের কাগজের অভাবে। এ অভাবটা আমি বেশী করে অনুভব করি। কারণ সংবাদ-পত্র একদিন না পেলেও চলে, কিন্তু সিগরেট না পেলে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়।

আর খবরের কাগজের বলবার কিছু নেই, কেন না ইউরোপের কোন খবর নেই। ইংলণ্ডের রাজপুরুষেরা মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন। তাঁরা খবর না দিলে আমরা খবর পাব কোথেকে? প্রতি দেশের খবরের কাগজ যে সে-দেশের শাসনকর্ত্তাদের কতদূর অধীন, তার প্রমাণ বিলেতি সংবাদ-পত্রেও দেখি কোন খবর নেই। এ যুদ্ধের রূপও দেখতে পাইনে, শব্দও শুনতে পাইনে।

আমি সেই সব বিলেতি কাগজ পড়ি, যে কাগজের মতামত আমার মনের সঙ্গে মেলে। পৃথিবীর সকল দেশেই এমন সব লোক আছে, যারা আমাদের সঙ্গে অশনে বসনে পৃথক হলেও মনে এক। আমরা পঙ্গু, তাই বলে অন্ধ নই; আর বিলেতেও এমন লোক আছে যারা অন্ধও নয়, পঙ্গুও নয়, মূকও নয়। এই শ্রেণীর লোকদের কথা গোঁয়ার্ত্তমি নয়। আমরা mild Hindu, কিন্তু বিলেতেও এমন অনেক লোক আছে, যারা mild হতে চাচ্ছে;—অর্থাৎ যারা নখদন্তের শক্তির উপাসক নয়। তাদের কথাই আমি বলতে চাচ্ছি।

আমরা স্বরাজ চেয়েছিলুম, কিন্তু তা' দিতে বিলেতের শাসন ও সংরক্ষণ কর্ত্তারা, নারাজ। এর ফলে আমাদের যে মনোভাব জন্মেছে, তার সঙ্গে বিলেতের মনোজগতের অনেক বড় লোকদের মনোভাব মিলে গিয়েছে, আর সে কথা তাঁরা মুখফুটে বলছেন। এঁদের কথা অবশ্য আমাদের মনঃপূত; তাই বলে বিলেতের রাজপুরুষদের কানে সে সব কথা যে ঢোকে না, তা নয়। আর তাঁদের এক কান দিয়ে ঢুকে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যায় না,—মনকে কিছু প্রভাবান্বিতও করে। বিলেতের সংবাদ-পত্র যেমন রাজপুরুষদের অধীন, বিলেতের রাজপুরুষরাও তেমনি অনেকটা সেখানকার সংবাদ-পত্রের অধীন। এ যোগাযোগ সাধন করেছে বিলেতের ডিমোক্রাসি। সে দেশের সংবাদ-পত্র রাজপুরুষদের বেপরোয়া হতে দেয় না।

আমাদের বর্ত্তমান মনোভাব ইংরেজ রাজপুরুষের কথার নীচে সই করবার মত নয়, কারণ আমাদের আশা ভঙ্গ হয়েছে। আর আমাদের মনের সম্বল কতকটা স্মৃতি আর অনেকটা আশা; আমাদের স্মৃতিও আশার বেনামী মাত্র।

'New Statesman' প্রভৃতি কাগজে দেখতে পাই, বহু ইংরেজ লেখক আমাদের সঙ্গে একমত। অবশ্য তাঁরা এ ব্যাপারটিকে একটু বড় করে দেখেন। ব্রিটিশ রাজমন্ত্রীদের দ্বারা আমরা যেখানে আছি সেখানেই আমাদের রাখা এ ক্ষেত্রে তাঁরা অসম্ভব বলে মনে করেন। তাঁদের মতে ইংরেজ রাজমন্ত্রীরাও যেখানে আছেন, সেখানেই থাকবেন না। এই যুদ্ধের ধাক্কায় তাঁরাও বিচলিত হতে বাধ্য; ইতিমধ্যে ইউরোপ ও আমেরিকার কাছে ইংলণ্ড অপদস্থ হতেও বাধ্য। এ যুদ্ধ democracyর নামে করা হচ্ছে, Imperialism-এর দোহাই দিয়ে নয়। ইংলণ্ডের Imperialism ইউরোপে কেউ কায়েম করতে উৎসুক নয়। যদিচ সকলেই জার্ম্মাণীর পরিপন্থী না হোক, হিট্‌লারিজ্‌ম্-এর ঘোর বিরোধী;—যেমন আমরাও। যে দেশের লোক পয়লা নম্বরের ওষুধ বানাতে পারে, সে দেশের লোককে বর্ব্বর বলতে আমরা কেউ প্রস্তুত নই; অপর পক্ষে হিটট্‌লারিজ্‌ম্ একটা মারাত্মক রোগ। সে যাই হোক, Bernard Shaw বলেছেন যে, Chamberlainএর কথায়বার্ত্তায় মনে হয় যেন জার্ম্মাণী পোলাণ্ডকে ধ্বংস করে নি, পোলাণ্ডই জার্ম্মাণীকে পকেটে পুরেছে।

আমি প্রথমেই বলেছি যে, ইউরোপে যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে কি হচ্ছে, অথবা হব-হব করছে, তা ঠিক বোঝা যায় না। এর কারণ বোধহয় ইউরোপে আসন্ন যুদ্ধের যে নেকড়ার আগুন ধোঁয়াচ্ছে, তা জ্বলে উঠলে ইউরোপকে যে ছারখার করবে, এ ভয় সে ভূভাগে সকলেই পায়। তাই এরকম লঙ্কাকাণ্ড কেউ চায় না ;—সম্ভবতঃ একমাত্র রাশিয়া ছাড়া। যাঁরা নিজের দেশকে ঢেলে সেজেছেন, তাঁরা পররাষ্ট্রকেও ঢেলে সাজতে পিছপাও নন। তবে রাশিয়া ভবিষ্যতে যে কি করবে, আজও কেউ তা বুঝতে পারছে না। Communismএর সঙ্গে Imperialismএর কি করে খাপ্ খায়?—Democracyর সঙ্গে Imperialismএর যেমন করে খাপ খায়।

ইউরোপের ভাবনা ইউরোপ ভাববে এখন। এক্ষেত্রে আমাদের সংকল্প কি? কংগ্রেসই আমাদের একমাত্র মুখপাত্র—সুতরাং কংগ্রেস কি সংকল্প করেছেন দেখা যাক্।

আমি গত আশ্বিন মাসের 'অলকা'য় লিখেছিলুম যে, এ ফেরাও মহাত্মা গান্ধী War profit করতে পারবেন না, কারণ ওরূপ profit করা তাঁর ধাতে নেই। সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধী সেই কথা একই ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

তবে আমাদের স্বরাজের কি হবে? তিনি বলেন—দৌত্যের দুয়োর খুলে রাখো, আবার প্রভুদের সঙ্গে আমরা সলা পরামর্শ করব। মহাত্মার মনে কোনও পূর্ণচ্ছেদ নেই—আছে সুধু "কমা"। তাঁর মতে এই কমা থেকে কমা পর্য্যন্ত যাওয়ার নামই হচ্ছে, স্বরাজ সাধনা।

ইতিমধ্যে আমরা করব কি? তিনি বলেন—চরকা কাটো ও খদ্দর বোনো। এর ফলে আমাদের নৈতিক বল বাড়বে আর নৈতিক বল বাড়লেই পূর্ণ স্বরাজ লাভ হবে।

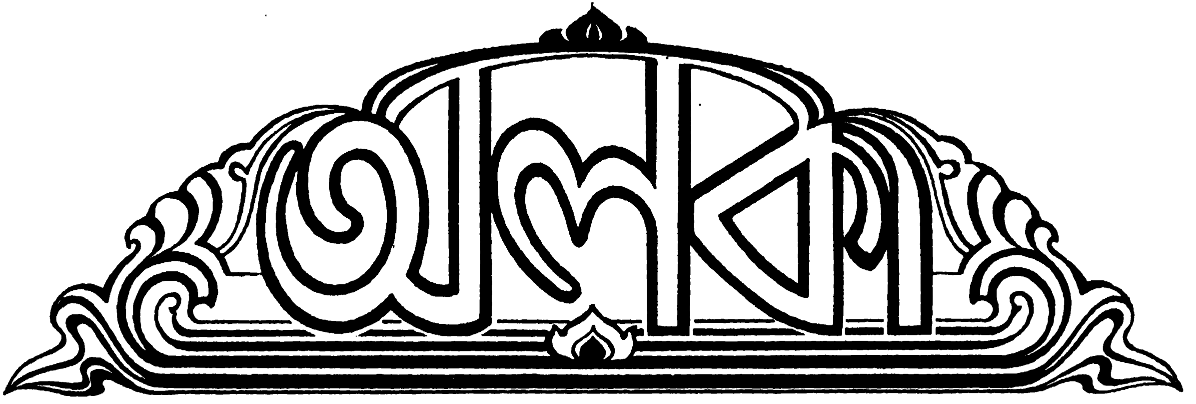
আমি কস্মিনকালেও এই চরকার মাহাত্ম্য বুঝতে পারি নি। তাই বহু পূর্ব্বে এ বিষয়ে বীরবল একটি রসিকতা করেছিলেন, যার পুনরুক্তি চলে। মহাত্মা গান্ধীও যখন একই কথা বলছেন, তখন আমরাও সে কথার একই ব্যাখ্যা করতে পারি। সে ব্যাখ্যা এই,—মহাত্মার আদেশ হচ্ছে "তাঁতি কুল ও বোষ্টম কুল দুইই রক্ষা করো।"

তারপর রবীন্দ্রনাথের কথা শোনা যাক্। তিনি সম্প্রতি বলেছেন, এ অবস্থার প্রতিকারের কোন উপায় নেই ;—চরকা কাটা নয়, মাকু ঠেলাও নয়। এ কথা আমার মতে স্পষ্ট সত্য।

কোন জাতের পক্ষে নিরুপায় হওয়ার চাইতে আর কি বড় tragedy হতে পারে? এর ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন, কেননা নিজেদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই এর অর্থ সকলের কাছেই প্রত্যক্ষ হবে। কংগ্রেস যেন এই tragedyকে comedy না করে তোলেন, এই আমাদের অনুরোধ।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত
শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও
৩৬।১ এল্‌গিন রোড হইতে প্রকাশি





দ্বিতীয় বর্ষ | পৌষ, ১৩৪৬ | চতুর্থ সংখ্যা

ছায়া-চম্পক

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

কার্ত্তিকের বেলা বেড়ে ওঠে,
মহানগরীর সৌধ-চূড়ে-চূড়ে।
শীর্ণ রাজপথে তীব্র হয় জনস্রোত ;
তা'রি তটে, বারান্দায় ঝুঁকে
দাঁড়ায়ে রয়েছি অকারণে।
খরতর জনস্রোতে
পড়েছে মনের ছায়া মোর।
অস্পষ্ট অস্থির ;—
তা'রি পানে চেয়ে আছি একান্ত একক।

সহসা ভাসিয়া এল গন্ধ কোথা হ'তে ?
আশুষ্ক চাঁপার গন্ধ যেন।
পল্লব-আড়ালে রহি' বৃন্তের বাঁধনে
যে চাঁপার সবে মাত্র ঘটেছে নির্বেদ ;
কণ্ঠলগ্ন মাল্যমাঝে জড়াজড়ি যে চাঁপারা
সহসা হারালো নিশিভোরে
আসঙ্গ-হরষ-লিপ্সা,
যাদের দক্ষিণে বামে
কুৎসিত সূতার বন্ধে ব্যবধান হয়েছে প্রকট,

সূচিবিদ্ধ পাণ্ডু বৃন্তে
ক্লান্ত দল পড়েছে এলায়ে,
সেই সে চাঁপার গন্ধ কোথা হ'তে এল !

পথে ত কোথাও নাই চাঁপা,
ঘরে নাই, আকাশে বাতাসে নাই চাঁপা,
কার্ত্তিকে গাঁথে না চাঁপা কোনো মালাকর
সাজাতে কবরী-কণ্ঠ,
মিটা'তে ফুলের ক্ষুধা ফুলদানিদের—
হেমন্তে ফুটে না চাঁপা কা'রো বাগিচায়
শুকা'তে শ্যামল বৃন্তে,
কিনি নাই কোনো দিন চাঁপার এসেন্স
তথাপি আসিছে গন্ধ আশুষ্ক চাঁপার—

চেয়ে দেখি নিম্নে জনস্রোতে
ভেঙে ভেঙে যায়, দুলে দুলে কাঁপে
আমারি মনের ছায়া অস্পষ্ট অস্থির—
সে ছায়ার মাঝে প্রতিবিম্বে পড়েছে উলটি'
ও কি ও চম্পক-তরু !
গাছভরা ম্লান পাতা শাখাভরা বিবর্ণ বিনত চাঁপা ফুল
ক্লান্ত কিশলয় স্তবকে স্তবকে নম্র—
দাঁড়ায়ে কাঁপিছে তরু জনস্রোত-তলে
কোন্ শ্যাম চৈতীচম্পা আমারি অন্তরে !
সহসা শুকায়ে গেল ডালে, মূলে, ফুলে
হেমন্তের হিমাঙ্গ হাওয়ায় !
তাহারি ছায়ার গন্ধ ভেসে এল আজ
আমার কায়ার মূলে ।

শীর্ণ পথে খরতোয় জনস্রোত ।
একা আমি দাঁড়াইয়া তটে ।
পদতলে কাঁপে ছায়া রসাতলমুখী—
অস্পষ্ট, অস্থির !—

আমার মনের আর শুষ্ক চম্পকের ।

রাজাবলী

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার যে বাংলা ভাষার প্রথম গদ্যলেখকদের অন্যতম, তা আমি জানতুম; কিন্তু তিনি যে আদি গদ্যলেখক, তা আমি জানতুম না। এর কারণ, তাঁর রচিত একমাত্র 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা'র সঙ্গে আমি পরিচিত ছিলুম।

সম্প্রতি (দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা সিরিজের) যে 'মৃত্যুঞ্জয়-গ্রন্থাবলী' প্রকাশিত হয়েছে, তার প্রসাদে অবগত হলুম যে, তিনি ১৮০২ খৃষ্টাব্দে 'বত্রিশ সিংহাসন' প্রকাশ করেন, তারপর ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে 'হিতোপদেশ' ও 'রাজাবলী' প্রকাশিত হয়।

১৮০২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আর কেউ গদ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন বলে অবগত নই।

পদকল্পতরুতে পড়েছি যে, চণ্ডিদাসের কাব্য গদ্যপদ্যসম্বলিত। কিন্তু তাঁর সুধু পদাবলীই রক্ষিত হয়েছে, গদ্যাবলী নয়। চণ্ডিদাস যে গদ্যও লিখেছিলেন, এ কথা আমি বিশ্বাস করি। কি কারণে তা বলছি। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের গদ্য যে সাবালক হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছে—এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। 'বত্রিশ সিংহাসন' ও 'হিতোপদেশ' হচ্ছে সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদ, সুতরাং এই দুই পুস্তকের ভাষা যে অনেকটা সংস্কৃত-ঘেঁসা হবে, সে তো ধরা কথা। কিন্তু এ ভাষাও আধ-আধ ভাষা নয়, এ গদ্যের গতিও অপ্রতিহত এবং স্পষ্ট। আমি সেকালে বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের গদ্যের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছি। 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র প্রথম ভাগের ভাষা একটু কটমট, এর কারণ এ অংশ এক হিসেবে সংস্কৃত ভাষার বিকারমাত্র; দণ্ডীর কাব্যাদর্শের ও সম্ভবত অন্যান্য সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থের কতক অংশের কথায় কথায় অনুবাদ। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় ভাগের ভাষা খাঁটি বাঙলা, এ বাঙলার স্ফূর্ত্তিও চমৎকার। এ গদ্যের একটি লম্বা নমুনা আমি আমার রাজশাহীর অভিভাষণে উদ্ধৃত করে দিই। সে অভিভাষণ আমার 'নানা কথায়' ছাপা আছে। পড়ে দেখবেন, এমন জ্যান্ত গদ্য আমরা কি আজ লিখতে পারি?—আমি পারিনে, কারণ আমি ইতিমধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষা লাভ করেছি। আর ইংরাজী syntax-এর নকল করতে গিয়ে লিখিত ভাষাকে আড়ষ্ট করেছি।

সে যাই হোক, 'রাজাবলী'র ভাষা আমাকে অবাক্ করেছে। 'রাজাবলী' ভারতবর্ষের উত্তরাপথের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—প্রথম হিন্দু-যুগের, তারপর মুসলমান যুগের, তারপর ইংরাজী যুগের ভূমিকার।

এই মুসলমান ও আদি ইংরাজী যুগের ইতিহাসে তিনি অসংখ্য ফার্সি ও আরবী কথা ব্যবহার করেছেন। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ফার্সিনবীশ ছিলেন না; বাঙালীর মুখে মুখে যে-সকল যাবনী কথা প্রচলিত ছিল, তাই তিনি ব্যবহার করেছিলেন। তিনি শব্দ সম্বন্ধে শুদ্ধিবাতিকগ্রস্ত ছিলেন না। সে বাতিক এখন আমাদের হয়েছে। আমি ইতিপূর্ব্বে শুদ্ধিবাতিকগ্রস্ত লেখকদের—ভারতচন্দ্রের এই কথা কটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছি,—

পড়িয়াছি যেইমত লিখিবারে পারি,
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি।
না রবে প্রসাদ-গুণ না হবে রসাল,
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল ॥

বিদ্যালঙ্কার মহাশয়েরও মত তাই। 'রাজাবলী'র আর কোন গুণ না থাকুক, প্রসাদ-গুণ আছে। ভাষার কথা এখন থাক। আমার লেখার ভাষা শিষ্ট-সমাজে কল্কে পায় না। প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক Comte-এর লেখা সম্বন্ধে ফরাসীরা বলেন যে, তিনি কাগজের বদলে সীসের পাতের উপর কালির বদলে আফিম দিয়ে লিখেছেন। আমার লেখার দোষ নাকি এই যে, আমি কাগজের উপরে কালি দিয়ে লিখি—অতএব সে লেখা অগ্রাহ্য। তাই তার স্বপক্ষে বার বার ওকালতি করবার লোভ সম্বরণ করতে পারিনে। একখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে এ বিষয়ে যে বিধি আছে, আমি তাই মেনে চলি। সে বিধিটি এই :—

নাত্যন্তং সংস্কৃত নৈবং নাত্যন্তং দেশভাষায়া।
কথাং গোষ্ঠীষু কথয়ংল্লোকে বহুমতোভবেদ্ ॥

কিন্তু যা আমাকে বিশেষ করে চমকে দিয়েছে—তা 'রাজাবলী'র ভাষা ততটা নয়, যতটা তার ঐতিহাসিক তথ্য। 'রাজাবলী' ছাপা হয়েছে ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে, কিন্তু লেখা হয়েছিল তার পূর্ব্বে। 'রাজাবলী' গ্রন্থের গোড়ার দিকে বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বলেছেন—"যে ২ রাজা ও পাদশাহ ও নবাব হইয়াছেন তাহাদের বিবরণ ১৮০০ আঠার শ য়িসবীয় (ইশবীয়) সনে গৌড়ীয় ভাষায় রচিত হইল।" বলা বাহুল্য যে য়িশবীয় সন ও খৃষ্টাব্দ একই সন। যাঁর নাম ইশা (Jesus), তাঁরই নাম খৃষ্ট (Christ)। তবে এই গ্রন্থ রচনার তারিখ সম্বন্ধে এক স্থলে উল্টো কথাও আছে।

১৮০০ সনে এত ঐতিহাসিক উপাদান তিনি কোথা হতে সংগ্রহ করলেন?—তাঁর নিজের কথাই শোনা যাক। "রাজাদের মধ্যে যাহারদের যে উপাখ্যান প্রসিদ্ধ পুস্তকাদিতে ও প্রামাণিক লোকেরদের প্রমুখাৎ পাওয়া গেল, সে সকল উপাখ্যান সমেত, যে সকল সম্রাট রাজারদের ও আর আর অবাস্তব সম্রাট রাজারদের প্রত্যেক বিবরণ সংপ্রতি লিখি।"

এখন ১৮০০ খৃষ্টাব্দে হিন্দুযুগের কি প্রসিদ্ধ পুস্তক ছিল?—পুরাণ উপাখ্যান ইত্যাদি। তথাস্তু। তিনি সেই প্রসিদ্ধ পুরাণেতিহাস থেকে এ যুগের ইতিহাস সংগ্রহ করেছেন। তাঁর রচিত এ যুগের ইতিহাস একরকম রূপকথা। সুতরাং এ যুগের কথা ছেড়ে দিলুম।

তারপর 'রাজাবলী'র মুসলমান যুগের ইতিহাস মোটামুটি ঠিক। ফার্সি ভাষায় এ যুগের অসংখ্য খণ্ড ইতিহাস আছে, কিন্তু বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বোধহয় ফার্সি জানতেন না। তিনি জানতেন সুধু বাংলা, সংস্কৃত ও মারাঠি ভাষা। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের ইতিহাস ইংরাজীতে লেখা হয়েছিল বলে আমি জানিনে—থাকলেও বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তার সাহায্য নিতে পারেন নি। আর আদি ইংরাজ আমলের কথা তো নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জানতেন।

যদি এ কথা সত্য হয় যে, বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ফার্সি ভাষা জানতেন না, তাহলে তিনি মুসলমান যুগের ইতিবৃত্ত কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন? প্রামাণিক লোকেদের প্রমুখাৎ? এরূপ প্রামাণিক

লোক এ যুগে পাওয়া যায় না—সেকালে হয়তো পাওয়া যেত। তিনি তৃতীয় পাণিপথ যুদ্ধের যে বিবরণ দিয়েছেন, তা যে সত্য তা আমরা একালে জানতে পেরেছি। এস্থলে সে বিবরণটি উদ্ধৃত করছি—

"১৮১৫ আঠার শ পনর সম্বতে ১১৬৪ এগার শ চৌষট্টি বাঙ্গালা সনে হিন্দু ও মুসলমানের অতিবড় এক যুদ্ধ হইয়াছিল তাহার বিবরণ এই।

মথুরাতে আবদালী সসৈন্যে আসিয়া কতলাম করিল তাহাতে অনেক ব্রাহ্মণ নষ্ট হইলেন। ইহাতে অবশিষ্ট ব্রাহ্মণেরা একত্র হইয়া পেশোয়া ও শাহু মহারাজের সাক্ষাৎ নিবেদন করিলেন হে মহারাজ আমরা মথুরাস্থ ব্রাহ্মণ আমারদের অনেক জ্ঞাতি ও বন্ধু ও পুত্র ও পৌত্র প্রভৃতিকে আবদালী নিরপরাধে নষ্ট করিল আপনি ব্রাহ্মণেরদের প্রিয়পাত্র অতএব আবদালীর বিহিত প্রতিকার করিয়া অবশিষ্ট ব্রাহ্মণেরদের রক্ষা করুন নতুবা আমরাও প্রাণ ত্যাগ করিব। ইহাতে পেশোয়া ও শাহু মহারাজ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া আপনি উঠিয়া ব্রাহ্মণেরদিগকে বসাইয়া নানাপ্রকার বাক্যকৌশলে ব্রাহ্মণেরদিগকে সান্ত্বনা করিয়া আপন সৈন্যেরদিগকে সসজ্জ হইতে আজ্ঞা দিলেন। সে সৈন্যেতে যে২ প্রধান সরদারেরা ছিল তাহারদের নাম এই। চিম্বাজীআপার পুত্র সদাশিবরাও ভাউ সাহেব এ অষ্ট প্রধানের মধ্যে মুখ্য প্রধান ছিল। আর বালারাও নানা সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বাসরাও ইহার এই যুদ্ধ সময়ে ২১ একুশ বৎসর বয়স ছিল। এবং এ চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় অতিবড় সুন্দর ও মহাবল পরাক্রম ছিল ও জনকোজি সিন্ধিয়া ও দত্তাজী সিন্ধিয়া ও এবরাহিম খাঁ গারদী ও হোলকর ও পট্টবর্দ্ধন ও হুজরাত ও রূখমাজী গায়কবাড় ইত্যাদি অনেক২ মহারাষ্ট্রীয় সরদারেরা আর অনেক হিন্দু রাজারাও ছিল। যবন পক্ষে আবদালী ও বাদশাহী অনেক ওমরা ও শুজাওদ্দৌলাপ্রভৃতি অনেক প্রধানেরা ছিল। এই উভয় পক্ষে অতিবড় যুদ্ধ হইল এ যুদ্ধে ৩০০০০০ তিনলক্ষ লোক মরে। বিশ্বাস-রায়ের কপালে গুলি লাগিল তাহাতেই বিশ্বাসরাও মরিল বিশ্বাসরাও এমন সুন্দর পুরুষ ছিল যে তাহার মরাতে বিপক্ষপক্ষীয় লোকেরাও শোকান্বিত হইল। সদাশিবরাও ভাউ সাহেব বিশ্বাসরায়ের মরণনিমিত্তক শোক ও লজ্জাতে এমুন অনুদ্দেশ হইল যে তাহার অদ্যাবধি উদ্দেশ হয় নাই। এইরূপে বিশ্বাসরায়ের মরাতে আর২ প্রধানেরা সকলেই যুদ্ধহইতে ক্ষান্ত হইল। আবদালী তএমুর শাহ নামে আপন পুত্রকে লাহোর প্রভৃতি দেশের অধিকারী করিয়া সেই দেশে রাখিয়া আপনি পেশোয়ার দেশে গেল। পরে মহারাষ্ট্রেরা ও শিক্ষেরা ও দিনাবেগ খাঁ ইহারা সকলে একত্র হইয়া তএমুর শাহের সহিত বড় যুদ্ধ করিয়া তাহাকে সে দেশহইতে উদস্ত করিয়া দিল তএমুর শাহ স্বদেশে পলাইল। মহারাষ্ট্রেরা কিছু দিন লাহোরপ্রভৃতি দেশ অধিকার করিল। পরে শিক্ষেরা মহারাষ্ট্রেরদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া আপনারা লাহোর ও মুলতান প্রভৃতি দেশ অধিকার করিল তদবধি লাহোর ও মুলতান প্রভৃতি দেশ শিক্ষেরদের অধিকার হইয়াছে। আর নাদরশাহী কতলামের পর দিল্লীর বাদশাহেরদের দিনে২ শৈথিল্য হওয়াতে মহারাষ্ট্রেরদের যে বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহারও কিঞ্চিৎ হ্রাস হইল। তার পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আলীগওহর বাদশাহ হইয়া আছেন তাঁহার জলুসী নাম শাহ আলম।"—'রাজাবলী' ১৭৪-৫ পৃঃ।

এ বিবরণ যে পনেরো আনা সত্য, তা আমরা নির্ভয়ে বলতে পারি; কেন না সম্প্রতি আবিষ্কৃত

দলিলপত্রে এ বিষয়ে সত্য উদ্ধার করতে পারি। শ্রীযুক্ত যত্নাথ সরকারের *Fall of the Mughal Empire* থেকে আমি প্রমাণগুলি উদ্ধার করব ; যদিচ সরকার মহাশয় এ বিষয়ে নিরপেক্ষ নন—কারণ তিনি মারাঠাদের প্রতি সদয় নন।

বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বলেছেন যে আবদালী মথুরার ব্রাহ্মণদের উপর যে পাশবিক অত্যাচার করেছিলেন, তার প্রতিশোধ নেবার জন্য মারাঠারা এ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। মথুরার ব্রাহ্মণরা যে পেশোয়ার কাছে আবেদন করেছিল, তার কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু আবদালী যে মথুরাবাসীদের উপর পাশবিক অত্যাচার করেছিল, তার প্রমাণ আছে। সরকার মহাশয় তাঁর গ্রন্থে কোন মুসলমান eye-witness-এর বীভৎস অত্যাচারের বর্ণনা তুলে দিয়েছেন। সমস্ত বর্ণনাটি উদ্ধৃত করতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়,—সে কারণ আমি কিয়দংশ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :—

"Every horseman had loaded up all his horses with plundered property and atop of it ridden the girl captives and the slaves. The severed heads were tied up in rags like bundles of grain and placed on the heads of the captives. Then the heads were stuck upon lances and taken to the gate of the chief minister for payment. It was an extraordinary display. Daily did this manner of slaughter and plundering proceed. And at night the shrieks of the women captives who were being ravished deafened the ears of people." (p. 724)

এই নমুনা থেকেই বুঝতে পারবেন আবদালীর অত্যাচার কিরূপ ভীষণ ছিল। আর এক কথা, সেকালের ভারতবর্ষের মুসলমানও এই ডুরাণীদের চাইতে ঢের বেশি সভ্য ছিল, আর তারাও ডুরাণীদের হিংস্র পশু জ্ঞান করত।

মনে রাখবেন, মথুরাবাসীরা ছিল non-combatant নিরীহ ব্রাহ্মণ—শত্রুপক্ষের সৈনিক নয়। সুতরাং এই পূতিগন্ধময় হত্যা ও বলাৎকারের সংবাদ পেয়ে শক্তিশালী হিন্দু-সম্প্রদায় যে আবদালীকে শাস্তি দেবার জন্য অগ্রসর হবেন, এটা অসম্ভব নয়। যুদ্ধ যে একমাত্র জমির জন্য হয় তা অবশ্য নয় ;—ধর্ম্মরক্ষার জন্যও হয়, নারীরক্ষার জন্যও হয়—বা হ'ত।

তারপর বিদ্যালঙ্কার মহাশয় মারাঠা সেনা-নায়কদের যে পরিচয় দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ। পাণিপথের যুদ্ধে বালাজি বাজিরাওয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বাস রাওএর মৃত্যুর যে বর্ণনা করেছেন, তাও সম্পূর্ণ সত্য ; আর যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর কোথায় কোথায় আঘাত লেগেছিল, তাও নির্ভুল। বিশ্বাস রাও ছিল সতেরো বৎসরের ছোক্‌রা আর পরম সুন্দর যুবক ; এবং বিদ্যালঙ্কার মহাশয় যে বলেন তার মৃত্যুতে দয়ামায়াহীন ডুরাণী সৈন্যরাও শোকাকুল হয়েছিল, এ কথাও সত্য। সরকার মহাশয় বলেন,—

"A youth of seventeen only, whose placid beauty in death was to extort the admiring cry even of the fierce Durrani soldiery, when his body was taken to their camp after the battle.....Though he was an Indian yet no man of such light complexion and beautiful shape had even come in their sight. His colour was that of the *champa* flower, his limbs well-formed his arms reaching

down to the knees. His eyes were half open, he seemed to be gently asleep." (p. 341)

বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের একটি কথা শুধু ভুল। তিনি লিখেছেন যে সদাশিব রাও ভাওএর যে কি হল, তা কেউ জানে না। তিনি পাণিপথ থেকে চলে যে কোথায় গিয়েছেন, তা অবিদিত। একথা কিন্তু সত্য নয়। উক্ত যুদ্ধক্ষেত্রেই তাঁর মৃত্যু হয়। এ ভুলের জন্য তাঁকে দোষী করা যায় না, কারণ বহুকাল লোকের বিশ্বাস ছিল যে ভাও সাহেবের পাণিপথে মৃত্যু হয় নি, তিনি সুধু অন্তর্দ্ধান হয়েছিলেন।

প্রসিদ্ধ নানাফড়নবীশ পাণিপথের রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সে যে আত্ম-জীবন-চরিত লেখেন, তাতে তিনিও ঐ একই কথা লিখেছেন।

আমি পাণিপথের যুদ্ধের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করলুম এই জন্যে যে, বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের বিবরণ পুরো ঐতিহাসিক। তারপর এ ঘটনাবলী তিনি কোনও প্রসিদ্ধ পুস্তক থেকে সংগ্রহ করতে পারেন নি। তবে কোন প্রামাণিক ব্যক্তির প্রমুখাৎ তিনি হয় তো এ সব কথা শুনেছিলেন।

এ ব্যাপারটা আমার কাছে একটি রহস্য রয়ে গিয়েছে। আশা করি আমাদের নব ঐতিহাসিকরা বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের ইতিহাসের sources আবিষ্কার করবেন।

আমার শেষ কথা এই যে, ভারতবর্ষের উত্তরাপথের ইতিহাসের প্রথম বাংলা পুস্তক বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের 'রাজাবলী'। আর এ ইতিহাস রচনা করবার জন্য তাঁর লজ্জিত হবার কোনও কারণ নেই।



ক্ষণকাল

শ্রীআশালতা সিংহ

বিজনবাবু বইয়ের পাতা হইতে মুখ না তুলিয়াই কহিলেন, আর কি, পুজোর বন্ধ তো এসে গেল, এবার কোথা যাবে মনে করেছ ?

অরুণিমা পাশের বাড়ীর সখীর নিকট হইতে প্যাটার্ণ দেখাইয়া লইয়া একটা নূতন ধরণের সোয়েটার স্বরু করিয়াছিল। ঘর গুণিতে গুণিতে সে কহিল, সিমলা, শিলং, দার্জ্জিলিং ওসব জায়গায় গিয়ে গিয়ে অরুচি ধরে গেছে বাপু, আর ভালো লাগে না।

ইহার পর স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কিছুকাল নিঃশব্দে নিজ নিজ কাজে রত থাকিলেন। অল্প কিছুকাল পর অরুণিমা হাই তুলিয়া পুনশ্চ কহিল, দেখ, তার চেয়ে এক কাজ কর না, এবার পুজোর বন্ধে চল দেশে যাই। শুনেছি সেখানে তোমাদের মস্ত বাড়ী, মস্ত বড় রাধাকৃষ্ণের মন্দির, আমার সে সব দেখা হয়নি। চাকরির জায়গাতেই ঘুরছি, চল এবার কিছুদিন থেকে দেখে আসা যাক।

বিজনবাবু এবার বই হইতে মুখ তুলিয়া কহিলেন, ও বাবা, এ সময়ে ওখানে ভীষণ ম্যালেরিয়া ! অদ্ভুত খেয়াল ত্যাগ কর।

অরুণিমা বলিল, চল না, একবার গিয়ে দেখা যাক। শরীর ভাল না থাকে চলে এলেই হবে। কেউ তো আর ধরে রাখবে না।

বিজনবাবু লোকটি সাদাসিধা ভালোমানুষ গোছের, স্ত্রীর বুদ্ধি এবং পরামর্শ লইয়া চলাই তাঁহার স্বভাব। নিজের মতে চলা তাঁহার কোনকালেই অভ্যাস নাই। অল্প সময়েই রাজী হইয়া গেলেন। বলিলেন, তুমি যা ভালো বোঝ, কর। সত্যিই তো দেশে ঘরদোর আছে, মাঝে মাঝে যাওয়া দরকার।

অরুণিমার বান্ধবী-মহলে কথাটা রাষ্ট্র হইতে দেরী হইল না। ইলা হাসিতে গিয়া গম্ভীর হইয়া কহিল, এই তো চাই। দার্জ্জিলিং কিংবা শিলং গিয়ে সময় ও পয়সা অপব্যয় না ক'রে তুমি এই যে বাংলাদেশের একটি অখ্যাতনামা পাড়াগাঁয়ে যেতে চাইছ, এটা কত বড়, কত উচ্চ জিনিষ তা বলে বোঝানো যায় না।

ছায়া উচ্ছ্বাসের আধিক্যে বেশি কিছু বলিতে পারিল না, শুধু বলিল, গ্লোরিয়াস !

অরুণিমা তখন দর্জ্জি ডাকাইয়া একটা বড় নেটের মশারির মাপ বুঝাইয়া দিতেছিল। এনোফিলিস্ মশার কামড় হইতে ম্যালেরিয়া হয় একথা তো আজকালকার পাঁচ বছরের ছেলেটিতেও জানে, তাই পল্লীভ্রমণের পূর্ব্বে সে তিন চারটা ভালো রকম মশারি সঙ্গে লইয়া যাইবার সংকল্প করিয়াছিল। বন্ধুনীদের মুগ্ধ স্মিত অভিনন্দনে তাহার নিজের মনের মাঝেও বেশ একটা ভাবের ঘোর আসিয়া লাগিল। মনে হইতে থাকিল, না জানি কী একটা মহনীয় কর্ত্তব্য, কী একটা দুঃসাধ্য ব্রত পালনে সে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

পূজার বন্ধের পরের দিন তাহারা পরিত্যক্ত পল্লীভবনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইল। নায়েব

গোমস্তাকে খবর দেওয়া ছিল, তাহারা সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের যতটুকু আয়োজন সম্ভব তাহা করিয়া রাখিয়াছিল। এবারে কার্ত্তিক মাসে পূজা। শরতের শিশিরস্নাত আকাশে কী নিবিড় শান্তি! নূতন জায়গায় আসিয়া ভালো ঘুম হয় নাই। ভোর রাত্রিতে অরুণিমার ঘুম হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেল, তখন পল্লীপথে খঞ্জনী বাজাইয়া কীর্ত্তনের প্রভাতীসুরে রামদাস টহল দিয়া ফিরিতেছিল, "রাই জাগো, রাই জাগো, শুকশারি বলে কত নিদ্রা যাও তুমি শ্যাম বঁধুর কোলে।" বাবাজীর গলাটি মিষ্ট, তাহার উপর শেষ রাত্রির করুণ ম্লান আলোর সহিত কীর্ত্তনের উদাস সুরটি মিলিয়াছিল ভালো। অরুণিমার বড় ভালো লাগিল। এমন সে কখনো অনুভব করে নাই। কলিকাতায় বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে না উঠিতে আটটা বাজিয়া যায়। ঘুম ভাঙ্গার পর হইতেই রাস্তার বিচিত্র শব্দপ্রবাহ, জনকোলাহল মনকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে। একটা অভ্যস্ত পুনরাবৃত্তিতে মন অসাড় হইয়া থাকে। কিন্তু এখানে পৃথিবীর এ কী রূপ! আকাশে শুকতারাটা তখনও দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে, পাতলা কুয়াশায় চারিদিক হিমাচ্ছন্ন। অখণ্ড নীরবতায় সমস্ত পৃথিবী যেন ধ্যানমগ্ন, প্রতীক্ষারত। আর এই নিঃশব্দতার বুক চিরিয়া কীর্ত্তনের সুরে টহল দিতে দিতে আপন মনে বাবাজী চলিয়া যাইতেছেন। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই মন্দিরে মঙ্গল আরতি সুরু হইল। সমস্ত কার্ত্তিক মাস ধরিয়া খুব ভোরে এমনই আরতি হয়। অরুণিমার খুব ভালো লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, কী সুন্দর বাংলাদেশের এই পাড়াগাঁ! পূজা, অর্চ্চনা, আরতি, কাঁসর ঘণ্টার সুমধুর ধ্বনি, কালো অতলস্পর্শী দীঘির জল, সবুজ মাঠ, নীল আকাশ, এ সমস্ত মিলিয়া মিশিয়া কী চমৎকার! আর ইহারই সহিত জড়াইয়া আছে বাংলাদেশের একান্ত নিজস্ব বস্তু বৈষ্ণব কবিতা। সে কত মান, অভিমান, বিরহ মিলন, পূজার আকূতি—ইহারই রন্ধ্রে রন্ধ্রে অপরিসীম মধু ছড়াইয়া দিতেছে!

খোলা জানালা দিয়া ভোরের আকাশের দিকে চাহিয়া অরুণিমার জীবনে আজ একটা প্রবল এবং আবেগশীল অনুভূতি জাগিতে লাগিল। কলিকাতার সমাজে এতদিন যাহাদের সহিত মেলামেশা করিয়াছে, চা খাইয়াছে, গল্পগুজব করিয়াছে, সিনেমা গিয়াছে, সাময়িক প্রসঙ্গ লইয়া আলাপ আলোচনা করিয়াছে, তাহাদের সুনিয়ন্ত্রিত সুনিয়মিত পরিধি ছাড়াইয়া এই যে আর একটা বৃহৎ জীবন অর্দ্ধস্ফুট অচেনা তটরেখার মত বিলীন হইয়া আছে, না জানি ইহার মধ্যে কী রহস্য, কী বারতা প্রচ্ছন্ন, জানিবার জন্য তাহার মনে একটা আগ্রহ উপস্থিত হইল।

ক্রমশঃ বেলা হইল। অনেক দিন পরে প্রভু এবং প্রভুগৃহিণী আসিয়াছেন, বর্দ্ধিষ্ণু প্রজারা একজন দুইজন করিয়া আসিতে লাগিল। হাতে তাহাদের সযত্নে আহরিত নানা উপহার দ্রব্য। তাহাদের আনা খাঁটি দুধে সেদিন সকালবেলাকার চায়ের রংটা লোভনীয় হইয়া উঠিল এবং কলিকাতা হইতে নীত দক্ষ পাচকের হাতে রুই মাছের মুড়ার আস্বাদনটাও চমৎকার হইল। কিন্তু বিজনবাবু এসব লক্ষ্যের মধ্যেও আনেন না। তাঁহার কাছে সিমলা শিলং মুসৌরি ডালহৌসিও যা, এই নিভৃত পল্লীপ্রান্তও তাই। সকাল হইতেই তিনি চা, খবরের কাগজ এবং বইয়ের গাদায় ডুবিয়া থাকেন। নিজের চারিদিকে পুঁথির পাতায় গড়া এমন একটি দুর্ভেদ্য জগৎ তিনি সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন যে, জীবন্ত মানুষের হাসিকান্না সেখানে পৌঁছায় না।

স্বামীকে চায়ের পেয়ালা এবং আহার্য্যের পাত্রটা দিয়া অরুণিমা তাহার উলের সেলাইটা লইয়া

বসিয়াছিল, বিজনবাবু গরম চায়ে চুমুক দিতে দিতে নবপ্রকাশিত একটা কন্টিনেণ্টাল্ নভেলে নিমগ্ন হইয়াছেন। পাশের ঘরে মাথায় অমনি একটু ঘোমটা দিয়া রায়েদের তরঙ্গিণীদিদি ও বাঁড়ুয্যে-বাড়ীর ছোট বউ উমাশশী উঁকিঝুঁকি মারিতেছিল। চোখে পড়ায় সেলাইটা হাতে লইয়া অরুণিমা উঠিয়া আসিল,—আসুন আপনারা। ওখানে দাঁড়িয়ে কেন! বসবার ঘরটা খুলে দিই, এসে বসুন।

অরুণিমার সুন্দর সুবেশ চেহারা, চোখের চশমা, পরণের দামি ধূসর রঙ্গের জরিপাড় শান্তিপুরী শাড়ী, তরঙ্গিণীদিদি অবাক মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। ঘোমটার আড়াল হইতে বাঁড়ুয্যে বাড়ীর বউ ফোঁস্ করিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। অল্প সময়ের মধ্যেই আলাপ জমিয়া উঠিল। অরুণিমা আগ্রহের সুরে কহিল, আপনাদের সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে আমার বড় ইচ্ছা করে। কলকাতার মেয়ে ব'লে আমাকে যেন দূরে দূরে রাখবেন না।

তরঙ্গিণীদিদি একেবারে গলিয়া গেলেন। এই সুন্দরী শিক্ষিতা ধনীবধূর সহিত কি উপায়ে একান্ত অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিবেন, এই চিন্তায় তিনি ব্যস্ত হইয়াছিলেন এখন একেবারে যো পাইয়া বসিলেন। ভাল করিয়া নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া কহিলেন, তাই আমরা পারি ভাই! এই তোমাকে তখন থেকেই অবাক হয়ে দেখছি, এত রূপ এত শিক্ষে তবু দেমাক অহঙ্কারের ছায়াটুকু অবধি নেই। তা যাবে ভাই আমার সঙ্গে? আমার ঐ আবার দেখ কি এক রোগ, যাকে ভালবেসে ফেলি তার সঙ্গে লৌকতা বলে আর কিছু রাখতে পারিনে। তোমার সঙ্গে কতক্ষণেরই বা আলাপ এরই মধ্যে তুমি বলে কথা বলছি। কত আর বয়েস হবে, আমার ছোট বোনের চেয়েও হয়তো ছোট। কিছু মনে করোনি তো ভাই?

অরুণিমা স্মিতহাস্যে কহিল, না না, এতো আমার ভাগ্য। যাব আমি আপনার সঙ্গে। আমার এদেশ সব ঘুরে দেখতে, সবারই সঙ্গে আলাপ করতে ভারি সাধ।

আঁচলের খুঁট হইতে পান ও খানিকটা দোক্তা বাহির করিয়া মুখে দিয়া তরঙ্গিণীদিদি কহিলেন, কি আছে ভাই আমাদের দেশে আর কিই বা আছে আমাদের যে তুমি আবার কষ্ট করে দেখবে।

অরুণিমা উঠিয়া কহিল, আপনারা একটু বসুন। চা খেয়ে যাবেন একটু। প্রথম দিনটায় এ'লেন, মিষ্টিমুখ ওই সঙ্গে করবেন।

প্রচুর জলযোগ এবং চা পান করিয়া তরঙ্গিণীদিদি বিজয়গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া অনেক মিষ্ট কথা ও অনেক মিষ্ট হাসি বিতরণ করিয়া বেলা প্রায় দশটার সময় বিদায় লইলেন।

বিজনবাবু পাশের ঘরে তখনও বই লইয়া মগ্ন ছিলেন। স্ত্রীর সঙ্গে চোখোচোখি হওয়ায় বলিলেন, বার্ট্রাণ্ড রাসেলের এই নতুন বইখানা পড়ে দেখ, কী সুন্দর বই! সত্যি কথা সত্যভাবে বলবার কী দুঃসাহসিক ভঙ্গী! পড়লে অবাক হয়ে যাবে। অরুণিমা বইখানার জন্য হাত বাড়াইতেছিল এমন সময় বারান্দায় কাহার ছায়া পড়িল। একটি মলিনবসনা দুলেদের মেয়ে গোটা দশ বারো ডিম ও একটা কলার মোচা লইয়া সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়াইয়াছিল। অরুণিমা বাহির হইয়া আসিতেই তাহার পায়ের কাছে সেগুলি নামাইয়া দিয়া গড় হইয়া প্রণাম করিল। অস্ফুটকণ্ঠে কহিল, আমি আপনাদের প্রজা বেটি মা। শুধু হাতে বাবুমাশায় আর রাণীমার কাছে ক্যামনে আসি মা তাই এই ক'টি এনেছি।

অরুণিমা মুখে যদিচ কহিল, এসব আবার কেন, তুমি গরীব মানুষ; কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহার ভারি ভালো লাগিল। এখানে অনেকের কাছে তাহার গৌরব ও গর্ব্ব, অনেকের হৃদয়ে এমন বিপুল আধিপত্য, সম্মুখে নিপতিত ঐ তুচ্ছ জিনিষ কয়েকটার মূল্য অনেক বাড়াইয়া তুলিল। দুলেদের মেয়েটা বিদায় লইয়া চলিয়া গেলে বিজনবাবু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, যত সব লো ক্লাস পিপ্‌ল (low class people) নিয়ে সারা সকাল বেলাটা কাটাচ্ছ। সময়ের এমন ভীষণ অপচয় সহ্য করো কেমন করে?

কিন্তু অরুণিমা সময়ের এই নিদারুণ অপব্যয়ের মাঝে কি জানি কি মোহ পাইল সে হাত বাড়াইয়া রাসেলের নূতন বইটা টানিয়া লইতে গিয়াও অন্যমনস্ক হইয়া শরতের নীল আকাশের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। দুলেদের মেয়েটি মাঠাকরুণের কাছে বসিয়া আপন ভাষায় অনর্গল যে সব গল্প করিয়া গিয়াছিল তাহার ভিতর হইতে একটি ছবি অরুণিমার মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিতেছিল। মাটির ঘরটি পরিষ্কার নিকানো মোছানো। উঠানে তাল পাতার চাটাইয়ে ধান শুকাইতেছে। দড়ির খাটে দুলে বৌর ছোট চারি মাসের ছেলেটা ঘুমাইতেছে। সজিনা গাছে দুই একটা বউল ফুটিতে সুরু করিয়াছে, চালের উপর লতাইয়া দেওয়া কুমড়ো গাছটা সতেজ সুচিক্কণ পত্রপল্লব মেলিয়া দিয়া রোদ পোহাইতেছে। খিড়কির ডোবায় শ্যাওলা ও দামের মাঝে হাঁসগুলি সাঁতার দিতেছে। আমগাছের ছায়ায় বসিয়া সেখানে পাড়ার বৌরা বাসন মাজিতেছে।

শীতের দিনে রৌদ্রপ্লাবিত প্রকৃতির মাঝে একটি অখণ্ড ছবি।

অরুণিমা হঠাৎ চমক ভাঙ্গিয়া নিজের কাছেই যেন নিজে লজ্জিত হইল। একজন শিক্ষিতা মহিলা হইয়া এসব কি তুচ্ছ অলস কল্পনায় সে সময়কে হত্যা করিতেছে।

তরঙ্গিণীদিদি সেদিন অরুণিমার বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়া যে আদর অভ্যর্থনা পাইয়াছিলেন, তাহা শাখাপল্লবিত করিয়া অচিরেই রাষ্ট্র করিতে লাগিলেন। সেদিন বিকালবেলায় আসিয়া কহিলেন, যাবে ভাই অরুণিমা, মজুমদার বাড়ীতে একবার বেড়াতে? তাদের বউটার বড় কষ্ট। কোথাও যেতে আসতে পায় না শ্বাশুড়ীর এমন শাসন। তোমার গল্প শুনে অবধি তোমাকে একবার দেখবার জন্য ছটফট করছে। অরুণিমা সহজেই রাজী হইয়া গেল। তরঙ্গিণী বলিলেন, তাহলে ভাই আজই চলো। এর পর ঠাকুরপো কলেজ বন্ধ বলে কাল পশু এসে পড়বে। পূজোর কাজকর্ম্মও প্রায় সবই এখন বাকী, আর হয়তো সময় পাব না।

একটা শ্যাওলা ঢাকা ডোবা একটা খড়ের পালুই ও রায়েদের খামার বাড়ীর পাশের রাস্তাটা অতিক্রম করিয়া তরঙ্গিণীদিদির সহিত অরুণিমা মজুমদার বাড়ীর খিড়কির দুয়ার গোড়ায় আসিয়া হাজির হইল। খিড়কির আশেপাশে চারিদিকে বাঁশ ঝাড় এবং তৎসন্নিকটে একটি ছোট ডোবা। একটি বধূ আবক্ষ ঘোমটা টানিয়া একরাশি পোড়া বাসন লইয়া মাজিতেছে। বয়স নিতান্ত কম। মুখখানি কচি কচি। তরঙ্গিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁ, বৌ তোমার শ্বাশুড়ী বাড়ী রয়েছেন তো? তেমনই ঘোমটাবৃত অবস্থায় মাথা হেলাইয়া বৌটি জানাইল, আছেন। কালো চোখে ঈষৎ কৌতূহল ভরিয়া ঘোমটার আড়াল হইতেই সে একবার অরুণিমার দিকে চাহিল। তরঙ্গিণীদিদি পরিচয় দিয়া

কহিলেন, মজুমদারের পুত্রবধূ। বাইশ তেইশ বছর বয়স, ছেলের মা। কিন্তু শাশুড়ীর ভয়ে এখনও যেন চোরের মত হয়ে আছে। দুবেলা বাসি পাট থেকে সুরু করে রাঁধাবাড়া সমস্ত খাটুনি ঐ বৌটির মাথার উপরে। এতখানি বেলা গেল এখনও বেচারী খায় নাই। ঐ সমস্ত বাসনের বোঝাটি ধুয়ে মেজে তবে খাবার সময় পাবে। তার আগে নয়। কর্ম্মনিরতা বধূকে পশ্চাতে ফেলিয়া অরুণিমা বাড়ীর ভিতর ঢুকিল। মজুমদার গৃহিণী সাড়া পাইয়া সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহাদের বাড়ীতে পূজা। তাই পূজার নৈবেদ্যর চাল বাছিতেছিলেন। হাতের কাজ রাখিয়া বলিলেন, বসো মা বসো। সহরের লেখাপড়া জানা কত বড়লোকের বৌ, কিন্তু এতটুকু দেমাক নেই। এই দেখ, মা আমার বেড়াতে এসেছেন। আমিও যাব যাব করি মা, কিন্তু অবসর কি পাই। বাড়ীতে পূজো, পূজোর সাত সতের খুঁটিনাটি সমস্ত কাজ বাকী পড়ে। এই দেখ না অবেলা অবধি বসে বসে চাল বাছতে বাছতে হাত ধরে গেল তবু সব এখন বাকী। কই গো বৌমা কোথায় গেলে একটা সতরঞ্চি কি আসনটাসন এনে পেতে দাও না।

বৌমা তখন সেই সবেমাত্র আবক্ষ ঘোমটা টানিয়া একরাশ বাসন লইয়া ঘাট হইতে আসিতেছিল। ধীরে রান্নাঘরের রোয়াকে বাসনগুলি নামাইয়া ভিজা কাপড়েই সে একখানি কম্বল আনিয়া পাতিয়া দিল।

রান্নাঘরের বারান্দায় বসিয়া সকলে গল্প করিতেছিলেন, উঁকি মারিয়া অরুণিমা দেখিল, ঘরের ভিতর অতি সঙ্কুচিত ভাবে একটি পিতলের থালায় মোটা চালের ভাত ও সামান্য উপকরণ লইয়া বৌটি আহারে বসিল।

বাইরে তখন গল্প জমিয়া উঠিয়াছে। মজুমদার গৃহিণী বলিতেছেন, ছেলে চাকরি করে বহরমপুরে, বাসা করেছে। বৌ নিয়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত। আজকালকার ছেলেদেরও যেমন লজ্জা সরমের বালাই নেই, বৌদের স্পর্দ্ধাও তেমনই মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। শুনেছ কখনো তরঙ্গিণী ঠাকুরঝি এমনতরো আশ্চয্যির কথা! গেরস্থ ঘরের বৌ নিয়ে যাব বললেই কি অমনি বৌ নিয়ে যাওয়া যায়? তেরদশীতে দিন হয়েছে যাবার। এদিকে কর্ত্তা জ্বরে পড়ে, আমার বাতের বেদনাটা আবার জানিয়েছে। বৌ গেলে ভাত জল করে কে?

তরঙ্গিণীদিদি একটু শুষ্ক হাসিয়া মজুমদার গৃহিণীর কথা সমর্থন করিলেন। কেবল এই কথাটা খুলিয়া বলিলেন না যে গত তিন বছর হইতে তাঁহার ছেলে ক্রমাগত চেষ্টা করিয়াও স্ত্রীকে কর্ম্মস্থানে লইয়া যাইতে পারিতেছে না। গল্পের ফাঁকে গৃহিণী একবার কর্কশ স্বরে ডাকিয়া বলিলেন, অ বউমা, বাড়ীতে মানুষ জন এসেছে, দুটো পানটানও কি সেজে দিতে পারোনা মা। সারাদিন ধরেই কি খাবে, খাওয়া আর ফুরোয় না! যেটি আমি না বলবো সেটি নিজের বুদ্ধিতে করুক দিকি।

অরুণিমা লক্ষ্য করিল বৌটি অপ্রতিভের মত তাড়াতাড়ি খাওয়া ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল এবং খিড়কির সেই পচা ডোবাটা হইতেই বোধ করি মুখ হাত ধুইয়া আসিয়া পান সাজিয়া লইয়া আসিল।

অরুণিমা স্নিগ্ধস্বরে কহিল, এত তাড়া কিসের ছিল ভাই? না হয় দুদণ্ড পরেই পান আনতে।

প্রত্যুত্তরে ঘোমটা ঢাকা মৌন অতল হইতে বউটি কালো চোখের ছল ছল দৃষ্টি দিয়া অরুণিমার দিকে চাহিল।

ওদিক হইতে শ্বাশুড়ী হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, না না, ওর সব কাজেই অমনি। আঠারো মাসে বছর।

পান দিয়া বউ চলিয়া গেল। তরঙ্গিণীদিদির সহিত গৃহিণী সুখদুঃখের কথায় মাতিয়া উঠিলেন। ঘরগুলি একবার ভালো করিয়া দেখিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া অরুণিমা উঠিয়া ওদিকে গেল। বাড়ীতে পুরুষরা কেহই নাই, সে স্বচ্ছন্দ মনে ঘুরিয়া ফিরিয়া সমস্ত দেখিতে পারে। গৃহিণী বলিয়া দিলেন, এ নিজেরই ঘর বলিয়া সে যেন মনে করে। সঙ্কোচের কোনই আবশ্যক নাই।

পশ্চিমের কুঠুরিটার সামনে দাঁড়াইয়া অরুণিমা দেখিল, বৌটি অতি সন্তর্পণে কি একটা জিনিষ যেন ঝাড়িয়া মুছিয়া পুরাণ কাপড়ে মুড়িয়া রাখিতেছে। কাছে গিয়া দাঁড়াইবামাত্র সে ভারি যেন অপ্রস্তুত হইয়া লজ্জা পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

অরুণিমা কৌতুকভরা স্বরে কহিল, তোমাদের ঘর বাড়ী দেখতে বেরিয়েচি, কিন্তু ও কি করছ ভাই?

বৌটি তাহার কাজ অসমাপ্ত রাখিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, দেখা গেল একটা ক্যালেণ্ডারের সস্তা দামের রাধাকৃষ্ণের ছবি সে অত মনোযোগের সহিত কাপড় মুড়িয়া রাখিতেছিল। মৃদুকণ্ঠে সে কহিল, ও কিছু না। উনি লিখেচেন এবার পুজোয় এসে নিয়ে যাবেন, তাই এই পটখানি বাক্সে গুছিয়ে রাখছিলাম। বাসায় টাঙ্গিয়ে রাখব। পটখানি বেশ দেখতে, নয় দিদি?······

বলিতে বলিতে সে লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল।

তখন বেলা গড়াইয়া আসিয়াছে, বিকাল বেলার অপরূপ করুণ রঙে চারিদিক রাঙিয়া উঠিয়াছে। ইহারই মাঝে এই সরলা পল্লীবধূটির তুচ্ছ সখ, অপ্রস্তুত হাসি, সামান্য একখানি পট লইয়া কত আকাঙ্ক্ষা, কত স্বপ্নের জাল বোনা, অনন্তের কোলে একটি শুভ্র টলটলে অশ্রুবিন্দুর মত অরুণিমার মনে গাঁথা হইয়া গেল। কলিকাতায় কত দীর্ঘদিন কত লোকের আনাগোনা, কত মেলামেশা, কত নূতন বই পড়া, কিন্তু সেই সমস্তর যবনিকা ছিন্ন করিয়া ক্ষণকালের জন্য জীবনের একটা নাম-না-জানা রূপ অরুণিমার মনে বিদ্যুতের মত ঝলকিত হইয়া গেল। জীবনের ব্যথিত পীড়িত মৌনতার অন্তরালে কত নামহীন আকাঙ্ক্ষা কত তুচ্ছ হাসিঅশ্রুকামনা মিশিয়া আছে, যাহার কথা আমরা সব সময় জানিতে পারি না বুঝিতে পারি না, ক্ষণকালের জন্য তাহারই স্পর্শ পাইয়া অরুণিমা স্তব্ধ ভারাক্রান্তের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

বৌটির সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ গল্পগুজব করিয়া বাড়ীতে যখন অরুণিমা ফিরিয়া আসিল, তখন বিজনবাবু আর এক দফা তাহাকে অনুযোগ করিয়া রাসেলের নতুন বইখানা পড়িতে বলিলেন। এবারেও কিন্তু বই হাতে করিয়া সে অন্যমনস্ক হইয়া গেল। বইয়ের চারিপাশ হইতে জীবন্ত জগতের কত নরনারীর দল তাহাদের সুখ-দুঃখ-আশা-আকাঙ্ক্ষার অশ্রুত কাহিনী লইয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। প্রতিদিনকার জীবনের চিরাভ্যস্ত পথে চলিতে চলিতে ক্ষণকালের জন্য অরুণিমা মানব-হৃদয়ের উত্তপ্ত হৃৎস্পন্দন কান পাতিয়া শুনিল। শুনিয়া ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ অভিভূত হইয়া হাতের কাজ ভুলিয়া চাহিয়া রহিল।

আদর্শ পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যে সযত্ন-স্মরণীয় বার্তা সর্বজনবিদিত, তারও পুনরুচ্চারণের উপলক্ষ্য বারংবার উপস্থিত হয়, যে মহাত্মা বিশ্বপরিচিত, বিশেষ অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হয় তাঁরও পরিচয়ের পুনরাবৃত্তির জন্যে। মানুষ আপন দুর্বল স্মৃতিকে বিশ্বাস করে না, মনোবৃত্তির তামসিকতায় স্বজাতির গৌরবের ঐশ্বর্য অনবধানে মলিন হয়ে যাবার আশঙ্কা ঘটে, ইতিহাসের এই অপচয় নিবারণের জন্যে সতর্কতা পুণ্যকর্মের অঙ্গ। কেননা কৃতজ্ঞতার দেয় ঋণ যে জাতি উপেক্ষা করে, বিধাতার বরলাভের সে অযোগ্য।

যে সকল অপ্রত্যাশিত দান শুভ দৈবক্রমে দেশ লাভ করে, সেগুলি স্থাবর নয়; তারা প্রাণবান, তারা গতিশীল, তাদের মহার্ঘ্যতা তাই নিয়ে। কিন্তু সেই কারণেই তারা নিরন্তর পরিণতির মুখে নিজের আদি পরিচয়কে ক্রমে অনতিগোচর ক'রে তোলে। উন্নতির ব্যবসায়ে মূলধনের প্রথম সম্বল ক্রমশই আপনার পরিমাণ ও প্রকৃতির পরিবর্তন এমন ক'রে ঘটাতে থাকে, যাতে ক'রে তার প্রথম রূপটি আবৃত হয়ে যায়, নইলে সেই বন্ধ্যা টাকাকে লাভের অঙ্কে গণ্য করাই যায় না।

সেইজন্যেই ইতিহাসের প্রথম দূরবর্তী দাক্ষিণ্যকে সুপ্রত্যক্ষ ক'রে রাখবার প্রয়োজন হয়। পরবর্তী রূপান্তরের সঙ্গে তুলনা ক'রে জানা চাই যে, নিরন্তর অভিব্যক্তির পথেই তার অমরতা, নির্বিকার জড়ত্বের বন্দিশালায় নয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলায় সাহিত্যভাষার সিংহদ্বার উদ্ঘাটন করেছিলেন। তার পূর্ব থেকেই এই তীর্থাভিমুখে পথখননের জন্যে বাঙালির মনে আহ্বান এসেছিল এবং তৎকালীন অনেকেই নানাদিক থেকে সে আহ্বান স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন। তাঁদের অসম্পূর্ণ চেষ্টা বিদ্যাসাগরের সাধনায় পূর্ণতার রূপ ধরেছে। ভাষার একটা প্রকাশ মননের দিকে এবং জ্ঞানের তথ্যসংগ্রহের দিকে, অর্থাৎ বিজ্ঞানে তত্ত্বজ্ঞানে ইতিহাসে; আর একটা প্রকাশ ভাবের বাহনরূপে রসসৃষ্টিতে। এই শেষোক্ত ভাষাকেই বিশেষ ক'রে বলা যায় সাহিত্যের ভাষা। বাংলায় এই ভাষাই দ্বিধাবিহীন মূর্তিতে প্রথম পরিস্ফুট হয়েছে বিদ্যাসাগরের লেখনীতে, তার সত্তায় শৈশব-যৌবনের দ্বন্দ্ব ঘুচে গিয়েছিল।

ভাষার অন্তরে একটা প্রকৃতিগত অভিরুচি আছে, সে-সম্বন্ধে যাঁদের আছে সহজ বোধশক্তি, ভাষাসৃষ্টি-কার্যে তাঁরা স্বতই এই রুচিকে বাঁচিয়ে চলেন, একে ক্ষুণ্ণ করেন না। সংস্কৃত শাস্ত্রে বিদ্যাসাগরের ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। এইজন্য বাংলা ভাষার নির্মাণকার্যে সংস্কৃত ভাষার ভাণ্ডার থেকে তিনি যথোচিত উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু উপকরণের ব্যবহারে তাঁর শিল্পীজনোচিত বেদনাবোধ ছিল। তাই তাঁর আহরিত সংস্কৃত শব্দের সবগুলিই বাংলা ভাষা সহজে গ্রহণ করেছে, আজ পর্যন্ত তার কোনোটিই অপ্রচলিত হয়ে যায়নি। বস্তুত পাণ্ডিত্য উদ্ধত হয়ে উঠে তাঁর সৃষ্টি-কার্যের ব্যাঘাত করতে পারেনি। এতেই তাঁর ক্ষমতার বিশেষ গৌরব। তিনি বাংলা ভাষার মূর্তি নির্মাণের সময় মর্যাদারক্ষার প্রতি দৃষ্টি রেখেছিলেন। মাইকেল মধুসূদন ধ্বনি-হিল্লোলের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিস্তর নূতন সংস্কৃত শব্দ অভিধান থেকে সংকলন করেছিলেন। অসামান্য কবিত্বশক্তি সত্ত্বেও



সেগুলি তাঁর নিজের কাব্যের অলংকৃতিরূপেই র'য়ে গেল, বাংলা ভাষার জৈব উপাদানরূপে স্বীকৃত হোলো না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দান বাংলা ভাষার প্রাণ-পদার্থের সঙ্গে চিরকালের মতো মিলে গেছে, কিছুই ব্যর্থ হয়নি।

শুধু তাই নয়। যে গদ্যভাষারীতির তিনি প্রবর্তন করেছেন, তার ছাঁদটি বাংলা ভাষায় সাহিত্য-রচনা-কার্যের ভূমিকা নির্মাণ ক'রে দিয়েছে। অথচ যদিও তাঁর সমসাময়িক ঈশ্বর গুপ্তের মতো রচয়িতার গদ্যভঙ্গীর অনুকরণে তখনকার অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যিক আপন রচনার ভিত গাঁথছিলেন, তবু সে আজ ইতিহাসের অনাদৃত নেপথ্যে অব্যবহৃত হয়ে প'ড়ে আছে। তাই আজ বিশেষ ক'রে মনে করিয়ে দেবার দিন এল যে, সৃষ্টিকর্তারূপে বিদ্যাসাগরের যে স্মরণীয়তা আজও বাংলা ভাষার মধ্যে সজীব শক্তিতে সঞ্চারিত, তাকে নানা নব নব পরিণতির অন্তরাল অতিক্রম ক'রে সম্মানের অর্ঘ্য নিবেদন করা বাঙালির নিত্যকৃত্যের মধ্যে যেন গণ্য হয়। সেই কর্তব্যপালনের সুযোগ ঘটাবার জন্যে বিদ্যাসাগরের জন্মপ্রদেশে এই যে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, সর্বসাধারণের উদ্দেশে আমি তার দ্বার উদ্‌ঘাটন করি। পুণ্যস্মৃতি বিদ্যাসাগরের সম্মাননার অনুষ্ঠানে আমাকে যে সম্মানের পদে আহ্বান করা হয়েছে, তার একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। কারণ এই সঙ্গে আমার স্মরণ করবার এই উপলক্ষ্য ঘটল যে, বঙ্গসাহিত্যে আমার কৃতিত্ব দেশের লোকে যদি স্বীকার ক'রে থাকেন, তবে আমি যেন স্বীকার করি, একদা তার দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

এখনো আমার সম্মাননিবেদন সম্পূর্ণ হয়নি। সব শেষের কথা উপসংহারে বলতে চাই। প্রাচীন আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশে বিদ্যাসাগরের জন্ম, তবু আপন বুদ্ধির দীপ্তিতে তাঁর মধ্যে ব্যক্ত হয়েছিল আনুষ্ঠানিকতার বন্ধনবিমুক্ত মন। সেই স্বাধীনচেতা তেজস্বী ব্রাহ্মণ যে অসামান্য পৌরুষের সঙ্গে সমাজের বিরুদ্ধতাকে একদা তাঁর সকরুণ হৃদয়ের আঘাতে ঠেলে দিয়ে উপেক্ষা করেছিলেন, অদম্য অধ্যবসায়ের সঙ্গে জয়ী করেছিলেন আপন শুভ সংকল্পকে, সেই তাঁর উত্তুঙ্গ মহত্ত্বের ইতিহাসকে সাধারণত তাঁর দেশের বহু লোক সসংকোচ নিঃশব্দে অতিক্রম ক'রে থাকেন। এ কথা ভুলে যান যে, আচারগত অভ্যস্ত মতের পার্থক্য বড়ো কথা নয়, কিন্তু যে দেশে অপরাজেয় নির্ভীক চারিত্রশক্তি সচরাচর দুর্লভ, সে দেশে নিষ্ঠুর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে ঈশ্বরচন্দ্রের নির্বিচল হিতব্রত-পালন সমাজের কাছে মহৎ প্রেরণা। তাঁর জীবনীতে দেখা গেছে, ক্ষতির আশঙ্কা উপেক্ষা ক'রে দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বারংবার আত্মসম্মান রক্ষা করেছেন, তেমনিই যে শ্রেয়োবুদ্ধির প্রবর্তনায় দণ্ডপাণি সমাজ-শাসনের কাছে তিনি মাথা নত করেননি, সেও কঠিন সংকটের বিপক্ষে তাঁর আত্মসম্মান রক্ষার মূল্যবান দৃষ্টান্ত। দীন দুঃখীকে তিনি অর্থদানের দ্বারা দয়া করেছেন, সে কথা তাঁর দেশের সকল লোক স্বীকার করে; কিন্তু অনাথা নারীদের প্রতি যে করুণায় তিনি সমাজের রুদ্ধ হৃদয়দ্বারে প্রবল শক্তিতে আঘাত করেছিলেন, তার শ্রেষ্ঠতা আরো অনেক বেশি, কেননা তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে কেবলমাত্র তাঁর ত্যাগশক্তি নয়, তাঁর বীরত্ব। তাই কামনা করি, আজ তাঁর যে কীর্তিকে লক্ষ্য ক'রে এই স্মৃতিসদনের দ্বার উন্মোচন করা হোলো, তার মধ্যে সর্বসমক্ষে সমুজ্জ্বল হয়ে থাক্ তাঁর মহা-পুরুষোচিত কারুণ্যের স্মৃতি। *

* ১৬ই ডিসেম্বর মেদিনীপুর সহরে বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন প্রসঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বাণী।

বিপিনের সংসার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেই দিনের ব্যাপারের পর থেকে পটল আর বীণার সঙ্গে দেখা করিবার চেষ্টা করে নাই। ইহাতে প্রথম প্রথম বীণা খুব স্বস্তি অনুভব করিল। কিন্তু সপ্তাহ যখন পক্ষে এবং পক্ষ যখন মাসে পরিবর্ত্তিত হইতে চলিল—পটলের টিকি কোনদিকে দেখা গেল না, তখন বীণার মনে হইল তাহার মনের এই যে নিরঙ্কুশ স্বস্তি, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সহজলভ্য জিনিস—বিধবা হইয়া পর্য্যন্ত এই বৈচিত্র্যহীন স্বস্তি সে বরাবর ইস্তকনাগাৎ পাইয়া আসিয়াছে—ইহার মধ্যে কিছু নূতনত্ব নাই। নূতনত্ব ও বৈচিত্র্য যাহার মধ্যে ছিল, তাহা তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে।

খুব অল্পদিনের জন্য—কতদিন? বছর দুই?—হাঁ, প্রায় দুই বছরের জন্য তাহার জীবনে এই অনাস্বাদিতপূর্ব্ব বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছিল। পটলদা তাহাদের বাড়িতে আসে—আসিত, মায়ের সঙ্গে কি বলাইয়ের সঙ্গে গল্প করিয়া হয়তো বা একটা পান কিংবা এক গ্লাস জল, কখনো বা দুইই, চাহিয়া খাইয়া চলিয়া যাইত।

মায়ের ডাকে বীণাই পান জল আনিয়া দিত—কেন না মনোরমা ঘরের বউ, স্বামীর বন্ধুস্থানীয় লোকের সম্মুখে বাহির হইবার নিয়ম তাহাদের সংসারে নাই।

হয়তো পান দিতে আসিয়া পটল দুই একটা কথা বলিত, বীণা জবাব দিত। হয়তো পটল এক আধটা ছোটখাটো গল্প করিত, বীণা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিত—ভাল লাগিত শুনিতে। হয়তো মা উঠিয়া যাইতেন সন্ধ্যাহ্নিক করিতে—বীণা ও পটল রোয়াকে পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিত।

ক্রমে পটলদা যেন একটু ঘন ঘন আসিতে আরম্ভ করিল। পটলের সাড়া পাইলে বীণারও যেন কি হয়। তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠে, রান্নাঘরে বউদিদির কাছে বসিয়া কুট্‌না কুটিতে কি তেঁতুল কাটিতে কি বাটনা বাটিতে আর ভাল লাগে না। ছুটিয়া গেলে কে কি মনে করিবে, ধীরে ধীরেই যাইত—অন্য ছুতায় যাইত।

—মা, আজ কি বেগুন পোড়াতে আছে? বউদিদি বলছিল, আমি বললাম, আজ বুধবার, দাঁড়াও, জিগ্যেস করে আসি।

—আচ্ছা মা, পাকানো সলতেগুলো কুলুঙ্গিতে রেখে দিইচি, তার কি একটাও নেই—তুমি নাও নি?

—তোমায় কলসীতে জল আনতে হবে না মা। বলো তো এখুনি আনি, আবার সন্ধ্যে হয়ে গেলে তখন—

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তারপর কে জানে আধঘণ্টা, কে জানে একঘণ্টা, সে আর পটলদা গল্পই করিতেছে, গল্পই করিতেছে। যতক্ষণ পটলদা বাড়িতে থাকিবে বীণা নড়িতে পারিত না সেখান হইতে।

ক্রমে পটলদা চাহিত একটু আড়ালে দেখা করিতে, বীণা তাহা বুঝিত।

বীণার কৌতূহল তখন বেশ বাড়িয়াছে, পুরুষমানুষ একা থাকিলে কি রকম কথাবার্ত্তা চলে? পটলদা মজার মজার কথা বলে বটে। বীণার হাসি পায়, আনন্দও হয়। মা উপস্থিত থাকিলে পটলদা এ ধরণের কথা বলে না। হয়তো বীণার শোনা উচিত নয় এসব কথা, কিন্তু লাগে মন্দ নয়।

তারপর গ্রামে কথা উঠিল, দাদা বাড়ি আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া বুঝাইলেন, বউদিদিই দাদার কানে উঠাইল এসব কথা, বলাই মারা গেল, পটলদা সন্ধ্যার সময় ছাদের পাশে বাগানে অন্ধকারে লুকাইয়া দেখা করিতে সুরু করিল, তাহাও একদিন বউদিদির চোখে গেল পড়িয়া—বীণার জীবনে সুখ নাই, আনন্দ নাই কোনদিক হইতে। একটুকু আলো আসিতে সবে আরম্ভ করিয়াছে যাই—অমনি সবাই মিলিয়া হৈ হৈ করিয়া জানালা সশব্দে বন্ধ করিয়া দিল।

সেদিন একাদশী।

বীণা সারাদিন মায়ের সঙ্গে নির্জ্জলা একাদশী করিয়া সন্ধ্যাবেলা মায়ের অনুরোধে একটু দুধ ও দুই একটা ফল খায়। একদিন ঘরে ফলের যোগাড় ছিল না—পাড়াগাঁয়ে থাকে না—মনোরমা বৈকালে বলিল, ও ঠাকুরঝি, মনুর মার কাছ থেকে এক পয়সা পাকা কলা নিয়ে এসো তো? আমি ঘাটে বলছি ওকে। গিয়ে নিয়ে এস।

বীণা এ পাড়ার সকলের বাড়িতেই একা যাতায়াত করে—ও পাড়ায় কখনও একা যায় না। মনুর মা থাকে এই পাড়ারই সর্ব্বশেষ প্রান্তে, মধ্যে পড়ে ছোট একটা আম বাগান, সেটা পূর্ব্বে ছিল বীণার বাবা বিনোদ মুখুয্যের নীলাম খরিদা সম্পত্তি, আবার ওপাড়ার শ্রীশ বাঁড়ুজ্জে বিপিনের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। একটি আমগাছের নাম 'সোনাতলী', বীণা ছেলেবেলায় এখানে আম কুড়াইতে আসিত—যখন তাহাদের নিজেদের বাগান ছিল। যাইতে যাইতে সে ভাবিল—কি চমৎকার আম. ছিল সোনাতলীর। কত বছর এ গাছের আম খাই নি—এবারে খুড়ীমাদের কাছ থেকে দুটো চেয়ে আনবো আমের সময়।

হঠাৎ সে দেখিল পটলদা বাগানের পথ দিয়া বাগানে ঢুকিতেছে। বীণার বুকের রক্ত যেন টল্ খাইয়া উঠিল। এখন সে কি করে? বাড়ী ফিরিয়া যাইবে? পটলদা তাহাকে দেখিতে পায় নাই—কারণ সে বাগানের কোণাকুণি পথটা বাহিয়া বোধ হয় মুচিপাড়ার দিকে যাইতেছে। পটলদার সঙ্গে কতকাল দেখা হয় নাই।

হঠাৎ বীণা নিজের অজ্ঞাতসারে ডাক দিল, ও পটলদা?

পটল চমকিয়া উঠিয়া চারিদিকে কেমন করিয়া চাহিতেছে দেখিয়া বীণার হাসি পাইল।

—এই যে, ও পটলদা!

পটল বিস্মিত ও আনন্দিত মুখে কাছে আসিল।

—তুমি? কোথায় যাচ্ছ?

—যেখানেই যাই। তুমি ভাল আছ?

—তাতে তোমার কি? আমি ম'রে গেলেই বা তোমার কি?

—বাজে বোক না পটলদা। ও সব কথা বলতে নেই।

—কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হোল।

বীণা চুপ করিয়া রহিল।

—আমার কথা একটুও ভাবতে বীণা? সত্যি বল।

—বলে লাভ কি পটলদা? যা হবার হয়ে গিয়েছে।

—আমিও তো সেই জন্যে আর যাই না। তোমার নামে কেউ কিছু বললে আমার ভাল লাগে না। তাই ভেবে দেখলাম, দেখা না করাই ভাল, কিন্তু তা বলে ভেবো না যে তোমায় ভুলে গিয়েছি।

বীণা কোন কথা বলিল না।

পটল বলিল, আচ্ছা বীণা, তুমি যেখানে যাচ্ছ যাও—আম-বাগানের মধ্যে কথা কইতে দেখলে কে কি ভাববে—যে আমাদের গাঁয়ের লোক—এসো তুমি—

—তুমি আজকাল সেই কোথায় চাকরী করতে সেখানে কর না?

—সে চাকরী গিয়েছে। এখন ব'সে আছি।

—কতদিন চাকরী নেই?

—প্রায় তিন মাস। সংসারের বড় টানাটানি চলেছে—তাই যাচ্ছি মুচিপাড়ায় রঘু মুচির কাছে কিছু খাজনা পাব—গিয়ে বলি, খাজনা না দিস তো দুখানা গুড়ই দে।

—আচ্ছা এসো পটলদা।

বীণা বাড়ি ফিরিয়া সারাদিন কেমন অন্যমনস্ক রহিল। পটলদার চাকুরী গিয়াছে। তাহার সংসারে বড় কষ্ট। ইচ্ছা হয়—কিন্তু সে ইচ্ছায় কি কাজ হইবে? ইচ্ছা থাকিলেও বীণার এক পয়সা দিয়াও সাহায্য করিবার সামর্থ্য নাই। তাহাকে কি পটলদা কিছু দিয়াছিল?

প্রথমে বীণা লইতে রাজি হয় নাই। বিধবা মানুষে সাবান কি করিবে? একশিশি গন্ধ তেল শেষ পর্য্যন্ত লইয়াছিল, লুকাইয়া লুকাইয়া নারিকেল তৈলের সঙ্গে মিশাইয়া একশিশি গন্ধতেল দুই তিন মাস চালাইয়া দিল।

এক আধটা সহানুভূতির কথা বলা উচিত ছিল। ভুল হইয়া গিয়াছে, অত তাড়াতাড়ি আম-বাগানের মধ্যে কি সব কথা মনে আসে? পটলদার সংসারটি নিতান্ত ছোট নয়, বেচারী চালাইতেছে কি করিয়া? আহা!

সন্ধ্যাবেলার দিকে মনোরমা নদীর ঘাট হইতে আসিল। ছেলেমেয়ে খাই খাই করিয়া জ্বালাতন করিতেছে, মনোরমা বলিল, ঠাকুরঝি, ওদের জন্যে একখোলা চাল ভেজে দাও না? ভাত হতে এখন অনেক দেরি। খাক, ততক্ষণ গুড় দিয়ে। মরছে খিদে খিদে করে।

বীণা বলিল, কোন চাল ভাজব বউদি? সেদিনকের সেই মোটা নাগরা আছে, দিব্যি ফোটে—তাই ভাজি, হ্যাঁ?

বীণার মা বলিলেন, আগে সন্ধ্যেটা দেখা না তোরা, অন্ধকার তো হয়ে গেল মা—আর কখন—

মনোরমা ভিজা কাপড় ছাড়িয়া ফর্সা কাপড় পরিয়া উঠানের তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে গিয়া হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, ও ঠাকুরঝি, আমায় কিসে কামড়াল, শীগগির এস—

বীণা রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া গেল, কি হল বউদি ?

সে রোয়াক হইতে উঠানে পা দিবার পূর্ব্বেই মনোরমা আবার চীৎকার করিয়া উঠিল, সাপ ! সাপ ! অজগর গোখরো—গোলার পিঁড়ির মধ্যে, ও মা, মার, ও ঠাকুরঝি—

বীণা ততক্ষণ ছুটিয়া মনোরমার কাছে গিয়া পৌঁছিয়াছে, কিন্তু সে কিছু দেখিতে পাইল না। মনোরমা উঠানে বসিয়া পড়িয়াছে, তাহার হাতের সন্ধ্যাপ্রদীপ ছিটকাইয়া উঠানে পড়িয়া তেল সলিতা ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

মনোরমা বলিল, আমার গা ঝিম্ ঝিম্ করছে ঠাকুরঝি—আমায় ধর।

বীণার মা বলিলেন, শীগগির কেষ্ট ঠাকুরপোকে ডাক, জীবনের মাকে ডাক, ওমা, আমার কি হ'ল গো, যা যা শীগগির যা, হে ঠাকুর, হে হরি, রক্ষে কর বাবা—

বীণা বলিল, চেঁচিও না মা, আমি ডেকে আনছি, এখানে তার আগে দুটো বাঁধন দিই, গামছখানা দাও—

মিনিট পনরো মধ্যে গাঁয়ে রাষ্ট্র হইয়া গেল বিপিনের বউকে সাপে কামড়াইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এপাড়া ওপাড়ার লোক ভাঙিয়া পড়িল বিপিনদের উঠানে। ভীম জেলে ভাল ওঝা, সে আসিয়া গাঁটুলি করিল, মন্ত্র পড়িল, ঝাঁড়ফুক চালাইল, মনোরমা অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে, তাহার মাথায় ঘড়া করিয়া জল ঢালা হইয়াছে, তাহার মাথার দীর্ঘ কেশরাশি জলে কাদায় লুটাইতেছে, সেদিকে তখন কাহারও লক্ষ্য করিবার অবকাশ ছিল না, রোগিণীর অবস্থা লইয়া সকলে ব্যস্ত।

কৃষ্ণলাল মুখুজ্জে বলিলেন, সতীশ ডাক্তারের কাছে কে গেল ? ও হরিপদ, তুমি একবার সাইকেলখানা নিয়ে ছোট।

পটলও আসিয়াছিল, সে ভাল সাইকেল চড়িতে জানে, বলিল, আমি যাচ্ছি কাকা। হরিপদ ভাই, তোমার সাইকেলখানা—

বীণা দেখা গেল খুব শক্ত মেয়ে। সে অমন বিপদে হাত পা হারায় নাই, ছুটাছুটি করিয়া কখনও জল, কখনও নুন, কখনও দড়ি আনিতেছে, সম্প্রতি বউদিদির মাথাটা উঠানে লুটাইতেছে দেখিয়া সে মাথা কোলে লইয়া শিয়রের কাছে আসিয়া বসিল।

বিপিন দুপুরের পূর্ব্বেই সোনাতনপুর হইতে রওনা হইয়া হাঁটিয়া আসিতেছিল, বেলা ছোট, আমরুলীর বাঁওড়ের কাছে আসিয়াই অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

বিড়ি নাই পকেটে, ফুরাইয়া গিয়াছে, পথের পাশেই শরৎ ঘোষের মুদির দোকান। এখনও প্রায় আধক্রোশ পথ বাকী তাহাদের গ্রামে পৌঁছিতে, বিড়ি কিনিতে সে দোকানে ঢুকিল। শরৎ বলিল, দাদাঠাকুর, এলেন নাকি আজ ? তামাক ইচ্ছে করুন—বসুন, বসুন।

—না আর তামাক খাব না সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে, এক পয়সার বিড়ি দাও আমায়।

—তা দিচ্ছি, দাদাঠাকুর বসুন না। তামাকটা খেয়ে যান, এতটা হেঁটে এলেন।

বিপিন তামাক খাইতে খাইতে বলিল, আখের গুড়ে এবার কেমন হ'ল শরৎ ?

—কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, দাদাঠাকুর। পুঁজিপাটা সব খেয়ে গেল—স' ন আনা মণ, কিনলাম, বেচলাম সাড়ে সাত, আট। সেদিন আর নেই দাদাঠাকুর, ডাহা লোকসান। তবে কি করি, লেখাপড়া তো শিখি নি আপনাদের মত। খাই কি ক'রে বলুন ?

—আইনদ্দি চাচার খবর জান ? ভাল আছে ?

—বেশ আছে, পরশু বেলতার মাঠে বিচুলি তুলতে গিয়ে দেখি বুড়ো দিব্যি খুঁটির মত ব'সে ধানের শাল পাহারা দিচ্ছে।

—আচ্ছা, আসি শরৎ।

—দাঁড়ান দাদাঠাকুর, পাকাটির মশাল আমার করাই আছে, একটা জ্বেলে নিয়ে যান—ওরে, নিয়ে আয় তো গোলার তলা থেকে একটা মশাল ! ক'দিন থাকবেন বাড়ি ?

—থাকব আর কই ? তিন চার দিনের বেশী—রুগীপত্তর ফেলে—

সদর রাস্তা দিয়া গেলে খুব ঘুর হয় বলিয়া সে গ্রামে ঢুকিয়াই নদীর ধারের রাস্তাটা ধরিল। এ দিকটা জনহীন, শুধু বৈঁচিবন, নিবিড় বাঁশবন ও আমবাগান। সন্ধ্যার পর বাঘের ভয়ে এ পথে বড় কেহ একটা হাঁটে না, যদিও বাঘ নাই, কিংবা কালেভদ্রে এক আধটা কেঁদ বাঘ বাহির হইবার জনশ্রুতি শোনা যায় মাত্র। সুতরাং বিপিনের সহিত কাহারও দেখা হইল না।

বাড়ির কাছাকাছি তাহাদের নিজেদের জমির সীমানায় ঘাটের পথের চালতা গাছটার তলায় যখন সে পৌঁছিয়াছে, তখন একটা গোলমাল ও কান্নার রব তাহার কানে গেল। কোন্‌দিক হইতে শব্দটা আসিতেছে সে ভাল ঠাহর করিতে পারিল না। একটু আশ্চর্য্য হইয়া চারিদিকে চাহিয়া শুনিল।

এ কি! তাহাদেরই বাড়ির দিক হইতে শব্দটা আসিতেছে না! তাহার বুকের ভিতরটা একমুহূর্ত্তে যেন ভয়ে অসাড় হইয়া গেল। কি হইয়াছে তাহাদের বাড়িতে? না—তাহাদের বাড়ি নয়, এ যেন কেষ্ট কাকাদের কিংবা পরাণ নাপিতের বাড়ির দিক হইতে—তাই হইবে, তাহাদের বাড়ি নয়। পরক্ষণেই সে দ্রুতপদে দুরু দুরু বক্ষে বাড়ির দিকে প্রায় ছুটিতে ছুটিতে চলিল।

আর কিছু দূর গিয়া বিপিনের আর কোনো সন্দেহ রহিল না। এ কান্নার রব যে তাহার মায়ের গলার! পাগলের মত ছুটিতে ছুটিতে সে বাড়ীর পিছনের পথে আসিতেই তাহাদের উঠানের ভিড় দেখিতে পাইল। তাহাকেও দুই চারজন দেখিয়াছিল—তাহারা ছুটিয়া আসিল তাহার দিকে। সর্ব্বাগ্রে ছুটিয়া আসিলেন কৃষ্ণলাল মুখুজ্জে।

—এসো এসো বিপিন, বড় বিপদ—এসো—

বিপিনের গলা দিয়া যেন কথা বাহির হইতেছে না, ভয়ে ও বিস্ময়ে সে কেমন হইয়া গিয়াছে। বলিল, কি—কি, কেষ্ট কাকা, ব্যাপার কি ?

ভিড়ের ভিতর হইতে বীণা কাঁদিয়া উঠিল, ও দাদা, শীগগির এসো, বৌদিদি যে আমাদের ছেড়ে চলে গেল গো!

মনোরমা ? মনোরমার কি হইয়াছে ? বিপিন ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা না করিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া ইহার উহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। দুইতিনজন হাত ধরিয়া তাহাকে লইয়া গেল।

কে একজন বলিয়া উঠিল, আহা, সতীলক্ষ্মী বউ বটে, স্বামীও একেবারে ঠিক সময়ে এসে হাজির—এদেরই বলে সতীলক্ষ্মী—

বিপিন গিয়া দেখিল উঠানে তুলসীতলার কাছেই মনোরমা মাটিতে শুইয়া। মাথার চুল মাটিতে লুটাইতেছে। সারাদেহ অসাড়, নিস্পন্দ।

বিপিন আর যেন দাঁড়াইতে পারিল না। বলিল, কি হয়েছে কেষ্ট কাকা ?

—সাপে কামড়েছিল। যাচ্ছিলেন বৌমা পিদিম দিতে নাকি তুলসীতলায়—

চার পাঁচজন লোক একসঙ্গে ঘটনাটা বলিতে গিয়া পরস্পরকে বাধা দিতে লাগিল। বিপিনের মা তাহাকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বীণা কাঁদিতে লাগিল।

বিপিন নাড়ী দেখিয়া বলিল, নাড়ী নেই বটে—কিন্তু কেষ্ট কাকা, এ মরে নি এখনও। বীণা, শীগগির জল গরম করে নিয়ে আয়—সতীশ ডাক্তারের কাছে একজন যা তো কেউ—

বলিতে বলিতে সতীশ ডাক্তারকে লইয়া পটল আসিয়া উপস্থিত হইল।

সতীশ ডাক্তার ও বিপিন দুইজনে কিছুক্ষণ দেখিল। বিপিন বলিল, আশা আছে বলে মনে হচ্ছে না কি ? ইথার ইন্ ক্লোরোফর্ম্ম দিয়ে দেখা যাক্ নাড়ী আসে কিনা—এ রকম রোগী আমি একটা দেখেছিলাম অবিকল এই লক্ষণ। এ মরে নি এখনও।

—ইথার ইন্ ক্লোরোফর্ম্ম দিয়ে কি হবে ? ছ্যাখো দিয়ে—

—এ মরে নি সতীশবাবু। কতকটা ভয়ে, কতকটা বিষের ক্রিয়ায় এমন হয়েছে—আমার মনে হয় গোখরো সাপ নয়—এ ঠিক শেকড়চাঁদা সাপ—এই রকম লক্ষণ সব প্রকাশ পায়। কেউ দেখেছিল সাপটা ?

বীণা বলিল, বউদিদি বলেছিল অজগর গোখরো সাপ—গোলার সিঁড়িতে ছিল—আমি কিছু দেখি নি অন্ধকারে—

সতীশ ডাক্তার বলিলেন, ও কিছু না, ভয়ে অনেক সময় ও রকম হয়। উনি ভয়ে তখন চারিদিকে গোখরো সাপ তো দেখবেনই। অন্ধকারে কি দেখতে কি দেখেছেন—ভাবলেন গোখরো সাপই হবে।

মনোরমাকে ধরাধরি করিয়া রোয়াকে লইয়া যাওয়া হইল।

অনেক রাত পর্য্যন্ত সতীশ ডাক্তার রহিল। পটল যথেষ্ট উপকার করিল, ছোটাছুটি করা, ইহাকে উহাকে ডাকাডাকি করা। রাত দুপুর পর্য্যন্ত সে বিপিনদের বাড়ীতেই রহিল। বিপদের সময় অন্য কথা মনে থাকে না—গরম জল আনিতে পটল কতবার রান্নাঘরে গেল—বীণা যেখানে একাই ছিল, ছেলেমেয়েদের ও দাদার জন্য রান্না না করিলে তাহারা খাইবে কি—ইহা ভাবিয়া। বীণার মা বউয়ের শিয়রে সন্ধ্যা হইতে বসিয়া আছেন আর হাপুস নয়নে কাঁদিতেছেন।

*

চারদিন পরে সে মনোরমাকে বলিল—কাল যাব গো, এসেছিলাম দুটো দিন থাকবো বলে—তুমি যে ভয় দেখিয়েছিলে তাতে দেরি হয়েই গেল এমনি—

মনোরমা হাসিয়া বলিল, ম'লেই বেশ হোত, না ?

—না না ওসব কথা বলতে নেই। ঘরের লক্ষ্মী মরতে যাবে কেন? ছিঃ!

মনোরমা একটু অবাক হইয়া স্বামীর দিকে চাহিল। এত আদরের কথা সে স্বামীর মুখে কতকাল শোনে নাই। ভাগ্যিস সাপে কামড়াইয়াছিল। উঃ—

মুখে বলিল, ছেলেমেয়ে দুটো ছোট ছোট—নয়তো আর কি? তোমায় রেখে যেতে পারা তো ভাগ্যির কথা গো।

বিপিন বলিল, আর আমার জন্যে বুঝি কিছু না?

মনোরমা হাসিল। সে গুছাইয়া কথা বলিতে পারে না কোনো কালেই, মনের মধ্যে কি আছে বুঝাইতে পারে না। সে বোঝে কাজকর্ম্ম, খাওয়ানো মাখানো, নিখুঁতভাবে সংসার চালানো। স্বামীকে সে ভালবাসে কি না বাসে, তা কি মুখে বলা যায়? ছেলেমেয়ের মা, এখন সে গিন্নিবান্নি মানুষ, অমন ইনাইয়া বিনাইয়া কথা বলা তাহার আসে না।

বলিল, না গো তা নয়। আমি মরে গেলে তুমি আর একটা বিয়ে করে সুখী হতে পারো—কিন্তু ওরা আর মা পাবে না।

বিপিন দুঃখিত হইল। সত্যই আজ যদি মনোরমা মারা যাইত! কখনো সে মনোরমাকে একটা মিষ্টি কথা কি ভালবাসার কথা বলিয়াছে? না পাইয়া না পাইয়া মনোরমার সহিয়া গিয়াছে। ও সব আর সে প্রত্যাশা করে না, পাইলে অবাক্ হইয়া যায়। মনে ভাবিল—আমার হাতে পড়ে ওর দুর্দ্দশার একশেষ হয়েছে। ভাল খাওয়া কি ভাল কাপড় একখানা কোনোদিন—বা কখনও কিছু দেখলেও না। সংসারের হাঁড়ি ঠেলে আর বাসন মেজে জীবনটা কাটলো ওর।

সে বলিল, হ্যাঁ, ভাল কথা। কাল দুটো ভাত সকালে সকালে যেন হয়। পিপলিপাড়া যাব কাল।

মনোরমা বলিল, তা কেন? কাল যেও না। বিদেশে থাকো, একদিন একটু পিটে-নাটা করি, সেখানে কে করে দিচ্ছে, খেয়ে যেও।

বিপিন জানে মনোরমা মিষ্টি কথা কহিতে জানে না বটে, কিন্তু এ সব দিকে তাহার খুব লক্ষ্য। কিন্তু তাহার থাকিবার উপায় নাই। মনোরমাকে বুঝাইয়া বলিল, হাতে রোগী আছে পিঠে খাইবার জন্য বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

হাসিয়া বলিল, যাবে আমার সঙ্গে সেখানে? চল পিঠে খাওয়ানোর লোক নিয়ে যাই—

মনোরমা বলিল, ওমা, আমি আবার বুড়োমাগী সংসার ফেলে গরুবাছুর ফেলে মা বীণা এদের রেখে তোমার সঙ্গে বাসায় যাবো কি করে?

যেন প্রস্তাবটা নিতান্তই আজগুবি।

মনোরমা বলিতে পারিত, চল তোমার সঙ্গেই যাই, তুমি যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাবো। তোমার কাছে আমার কেউ নয়।

বিপিনের খুব ভাল লাগিত তাহা হইলে।

বিপিন ভাবিল—মনোরমার শুধু সংসার, সংসার আর সংসার! ওই এক ধরণের মেয়েমানুষ—

পিপলিপাড়ায় পৌঁছিল প্রায় সন্ধ্যাবেলা। দত্ত মশায় বাড়ী নাই, আজ দিন দুই হইল বড়

ছেলের শ্বশুরবাড়ী কুমারপুরে গিয়াছেন কি কাজে। দত্ত মশায়ের ছেলে অবনী তাহাকে দেখিয়া বলিল, এই যে ডাক্তারবাবু! দুটো রুগী এসে ফিরে গিয়েছে কাল। এত দেরী হোল যে? হাত পা ধুয়ে বিশ্রাম করুন।

অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে শান্তি এক হাতে একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন ও অন্য হাতে একটা বাটিতে মুড়ি ও নারিকেল কোরা লইয়া আসিল। বাটিটা বিপিনের হাতে দিয়া হাসিমুখে বলিল, এত দেরি করলেন যে?

—উঃ সে আর বোলো না শান্তি। কি বিপদেই পড়ে গিয়েছিলাম!

শান্তি উদ্বিগ্ন মুখে বলিল, কি? কি?

—আমার স্ত্রীকে সাপে কামড়েছিল।

—সাপে! কি সাপ?

—রক্ষে যে জাত সাপ নয়, শেকড়চাঁদা বলেই আমার ধারণা। সে কি ঘটনা হোল শোনো— সেদিন তো এখান থেকে গেলাম সেই—

বলিয়া বিপিন সেদিনকার তাহার বাড়ী যাওয়ার পথে কান্নাকাটির রব শোনা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ব্যাপারটা আনুপূর্ব্বিক বলিয়া গেল, শান্তি অবাক হইয়া বসিয়া শুনিতে লাগিল।

বর্ণনা শেষ হইয়া গেলে শান্তি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, উঃ, ভগবান রক্ষে করেছেন। নইলে কি হোত আজ বলুন দিকি? মুড়ি খান, আমি চা নিয়ে আসি—কি বিপদেই পড়ে গিয়েছিলেন!

বড় ভাল লাগিল শান্তির এই সহানুভূতি। বিদেশে কে কাহার মুখের দিকে চায়? তবুও আজ এ মেয়েটি আছে বলিয়া তাহার কাছে মনের সুখদুঃখ বলিয়াও আনন্দ।

শান্তি চা আনিয়া দিল। বলিল, আজ আর রাঁধতে হবে না আপনাকে—আমাদের তো রান্না হবেই—ওই সঙ্গে আপনাকে দুখানা পরোটা ভেজে দিতে এমন কিছু ঝঞ্ঝাট হবে না।

—রোজ রোজ তোমাদের ওপর—

—ওসব কথা বলবেন না ডাক্তারবাবু। আপনি পর ভাবেন, কিন্তু আমি—

—না না, সে কথা না—পর ভাববো কেন শান্তি? তা হবে এখন—দিও এখন—

শান্তি খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গল্প করিল। কথা বলিয়া আনন্দ পাওয়া যায় ইহার সঙ্গে। বেশীর ভাগ কথা হইল মনোরমাকে লইয়াই। মনোরমার কথা আজ আসিবার সময় বিপিন সারাপথ ভাবিয়াছে। তাহার আকস্মিক মৃত্যুর সম্ভাবনাটা যতই মনে হইতেছে, বিপিনের মন ততই মনোরমার প্রতি স্নেহে ও সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিতেছে।

শান্তি বলিল, দেখাবেন একদিন বউদিদিকে?

—কি করে দেখাবো শান্তি! সে তো এখানে আসছে না।

—আমায় একদিন নিয়ে চলুন সেখানে।

—তুমি যাবে কি করে?

—আপনার সঙ্গে যাবো। গরুর গাড়ী একখানা না হয় দুটাকা ভাড়া নেবে।

—আমার সঙ্গে একা যাবে?

—কেন যাবো না ?

বিপিন আশ্চর্য্য হইল শান্তির নিঃসঙ্কোচ ভাব দেখিয়া। মেয়েটি শুধু সরলা নয়, ইহার মনে সাহস আছে। অবশ্য সে শান্তিকে সত্যই লইয়া যাইতেছে না, বহু বাধা তাহাতে, সে জানে। তবুও শান্তি যে নিঃসঙ্কোচে তাহার সহিত যাইতে চাহিল—ইহাতেই উহার মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

হঠাৎ শান্তি একটি ভারি ছেলেমানুষি প্রশ্ন করিল।

—আচ্ছা, পটলের ক্ষেতে মেয়েমানুষ যাওয়া বারণ কেন জানেন ?

—তা তো জানি না শান্তি। তবে শুনেছি বটে—

বিপিন কারণটা খুব ভাল রকমই জানে, সে পাড়াগাঁয়েরই ছেলে। কিন্তু শান্তির সামনে সে কথা বলিতে তাহার বাধিল।

শান্তি দুষ্টুমির হাসি হাসিয়া বলিল, আমি জানি। বলবো ? মেয়েমানুষ অযাত্রা, পটলের ক্ষেতে ঢুকলে পটল ফলবে না—তাই নয় ? আচ্ছা, মেয়েমানুষ কি সত্যই অযাত্রা ?

বিপিন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। বলিল, কে বলেছে ওসব কথা ? এ কথা তোমার মাথায় উঠলো কেন হঠাৎ ?

—না, কিছু না, এমনি মনে পড়ে গেল। আপনাদের গাঁয়ের দিকে এ নিয়ম আছে, না ?

—শুনেছি বটে, বললাম তো। বলে বটে। তবে মেয়েরা অযাত্রা এ কথা যে কেউ বলুক, আমি বিশ্বাস করি না। মেয়েরা অনেক উপকার করেছে আমার জীবনে। এই ধরো আমি তোমায় দিয়েই বলি—কেমন চিঁড়ের ফলার খাওয়ালে সেদিন—খেয়েদেয়ে নিন্দে করবো এমন মহাপাতকী আমি নই।

বলিয়া বিপিন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

শান্তি সলজ্জ হাসিমুখে বলিল, আপনার ওই এক কথা। যান।

—না, যাবো কেন, আমি অনেয্য কথা কি বলেছি বলো। তোমার যত্নের কথা যখন ভাবি শান্তি, তখন—সত্যিই বলচি—অমন খাওয়ানো অন্ততঃ—

—আচ্ছা, আচ্ছা থাক। আর আপনার ব্যাখ্যা করতে হবে না। আমি যাই, বউদিদি একা রান্না ঘরে—গিয়ে ময়দা মাখবো—

—একটা পান পাঠিয়ে দিও গিয়ে। পেয়ালাটা নিয়ে যাও।

—না থাকুক। আপনার পান নিয়ে আসি, পেয়ালা নিয়ে যাবো।

বিপিনের মনে একটি অদ্ভুত তৃপ্তি। এ ধরণের সেবা সে চায়—মানীই কেবল সে সাধ মিটাইয়াছিল কিছু দিন—আবার এই শান্তি কোথা হইতে আসিয়া জুটিয়াছে।

বেচারী মনোরমা এ ধরণটা জানে না। সেও সেবা করে, কিন্তু সে অন্য রকমের। তাহা পাইয়া এমন আনন্দ হয় না কেন ?

ক্রমশ

বিদেহী

শ্রীগৌরগোপাল মুখোপাধ্যায়

তব অঙ্গে শ্যামল যৌবন
মোর চিত্তে জরার তুষার
গানে তব ঝলিছে দীপক
বেহাগের মীড় হেথা কাঁপে।

তব নভে অরুণ-উদয়,
তৃতীয়ার চাঁদ হেথা ডোবে।
তব বন বসন্তে রাঙিল
পাতা মোর ঝরে ঝরে যায়।

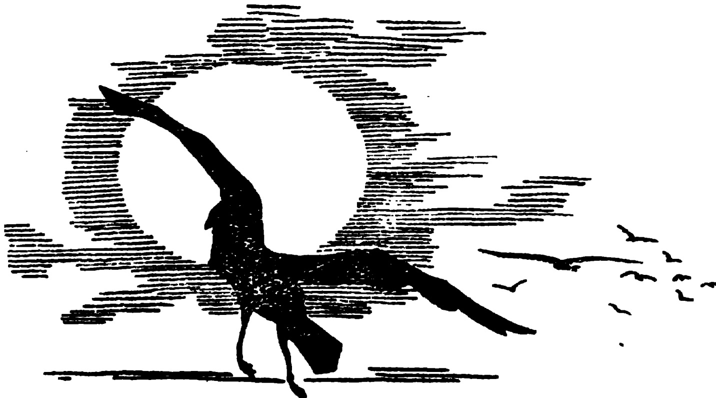
সেথা গাঙে জেগেছে জোয়ার
আকাশে কাশের বন কাঁপে—
তামসী এ অসঙ্গ বেলায়
ব্যথার সাগর গুমরিছে।

দীপ্যমান উত্তুঙ্গ কামনা
আগুন জ্বালাল মেঘে মেঘে—
সানু হেথা প্রচ্ছায়-সঘন
প্রদোষের ম্লান মায়া কাঁপে।

হেথা ঘর খোঁজে ভীরু আশা
ভীরু আশা নীড়হারা পাখী
দীপ্র তব মানসবলাকা
পাড়ি দিল নীল নিরুদ্দেশে।

তব দিঠি ধেয়ায় স্বপন
আদিগন্ত বাসনার সোনা—
মোর তরে ধূসর আকাশ
বিগতের ঊষর বিস্তৃতি।

সঁপি' দিনু চন্দনচিতায়
মৃত্যুহীন মহার্ঘ স্মরণ
রাখিলাম নিরিক্ত দেউলে
সুরভিত প্রান্তিম প্রণতি।



অন্ধকারে

(অ্যাণ্টন চেখভ্)

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মাঝারি আকারের একটা মাছি অ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট্ প্রকিউরেটর গাগিনের নাকের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। কিছু দেখিবার কৌতূহলে, না স্বাভাবিক চাপল্যবশতঃ, না অন্ধকারে পথ ভুলিয়া ঢুকিল জানি না; কিন্তু ঢুকিতেই বৈদেশিকের আগমনে সন্ত্রস্ত হইয়া নাসিকা প্রবল হাঁচি-দ্বারা প্রতিবাদ ঘোষণা করিল। গাগিনের সশব্দ হাঁচির চোটে সমস্ত বিছানাটা দুলিয়া উঠিল; খাটের স্প্রিংগুলি কিচ্‌কিচ্ করিয়া উঠিল, এবং গাগিনের সুন্দরী যুবতী স্ত্রী মারিয়া মিহালভ্‌না চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। জাগিয়া, একবার অন্ধকারের দিকে তাকাইল, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। পাঁচ মিনিট পরে আবার পাশ ফিরিল, এবং জোর করিয়া চোখ বুজিয়া রহিল, কিন্তু কিছুতেই ঘুমাইতে পারিল না। খানিকক্ষণ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, এপাশ ওপাশ করিয়া অবশেষে সে উঠিয়া পড়িল; গুঁড়ি মারিয়া স্বামীকে টপ্‌কাইয়া বিছানা হইতে নামিল এবং চটি পরিয়া জানালায় গিয়া দাঁড়াইল।

বাহিরে অন্ধকার। অস্পষ্ট গাছের সারি এবং আস্তাবলের ছাদ ছাড়া আর কিছুই নজরে আসে না। পূব দিকে সামান্য আলোকের আভাস ফুটিয়াছিল, তাহাও মেঘে ঢাকিয়া যাইতেছে। চারিদিক্ নিস্তব্ধ, ঘুমে আর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। রাত্রির নীরবতা ভঙ্গ করিয়াই যাহাকে চাকুরী করিতে হয়, সেই পাহারাওয়ালা পর্য্যন্ত আজ আর হাঁক দিতেছে না; বুনো পাখীরাও যেন সভয়ে চুপ করিয়া আছে।

মারিয়া মিহালভ্‌নাই প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করিল। জানালা দিয়া উঠানের দিকে চাহিয়া সে সহসা চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, ফুলবাগানে পাতাছাঁটা দীর্ঘ পপ্‌লার গাছগুলির মধ্য দিয়া একটি আব্‌ছায়া মূর্ত্তি ক্রমশঃ বাড়ীখানার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। প্রথমে ভাবিল, উহা গরু কিম্বা ঘোড়া হইবে, তারপর চোখ রগড়াইয়া ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিল, পরিষ্কার একটি মনুষ্যমূর্ত্তি।

মনে হইল, মানুষটি ক্রমে রান্নাঘরের জানালার কাছে গেল, যেন কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া মুহূর্ত্তকাল স্থির হইয়া দাঁড়াইল, তারপর জানালার চৌকাঠে এক পা তুলিয়া দিয়া ভিতরের অন্ধকারে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

চকিতের মধ্যে মনে হইল—চোর! ভয়ে সারা মুখ মৃতের মুখের মত ফ্যাকাসে হইয়া গেল।

কল্পনায় সে দেখিতে লাগিল, একটা ভয়ানক সিঁদেল-চোর,—এই পল্লী-অঞ্চলে যাহার নাম শুনিলে মেয়েরা শিহরিয়া ওঠে,—রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িল, সেখান হইতে খাবার ঘরে,—রূপার বাসনগুলি যেখানে থাকে থাকে সাজানো রহিয়াছে ঠিক তাহার সামনে,—তারপর এই শোবার ঘরে,—হাতে কুড়ুল—কি ভীষণ মূর্ত্তি দস্যুর! একে একে সমস্ত অলঙ্কারগুলি সে—আর ভাবিতে পারিল না, তাহার পা অবশ হইয়া আসিল, শির-দাঁড়া বাহিয়া যেন বিদ্যুতের তীব্র শিহরণ বহিয়া গেল।

স্বামীকে নাড়া দিয়া সে ভীতকণ্ঠে ডাকিল,—ভাসিল! বাসিল! ভাসিলি প্রোভোকিচ! হা ভগবান! এ-ও কি বেঁচে নেই?···ওঠো বাসিল, মিনতি করছি, ওঠো।

অ্যাসিসটান্ট প্রকিউরেটর জোরে নিঃশ্বাস লইয়া অস্ফুট, নিদ্রাজড়িতস্বরে উত্তর করিলেন, অ্যাঁ-া-া?

"ওঠো, ওঠো, শীগগির ওঠো, রান্নাঘরে চোর ঢুকেছে। আমি জানলা দিয়ে দেখলাম, কে যেন রান্নাঘরের জানলা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। তারপরেই ত' খাবারের ঘরে যাবে। বাসন কোসন, চামচ টামচ সব সেখানে রয়েছে! বাসিল, মাভ্‌রা ইয়াগোবভ্‌নার বাড়িতেও এমনি করেই চুরি হয়ে গেছে গতবছর।

"অ্যাঁ-া-া, কি-ি-ি?

"হা কপাল, এতক্ষণেও বুঝতে পারছ না? শোন, শোন। বলছিলাম যে, রান্নাঘরে একটা চোর ঢুকেছে। পেলাজিয়া ভয় পাবে, আর রূপোর বাসনগুলো সব খাবার ঘরের তাকের ওপর রয়েছে।"

"ও বাজে, বাজে কথা, সব আজগুবি।"

"নাঃ, অসহ্য! আমি এই বিষম বিপদে পড়ে তোমায় ডাকছি, আর তুমি কিনা দিব্যি আরামে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছ? তুমি কি চাও, ডাকাত এসে আমাদের খুন করে সব লুটে-পুটে নিয়ে যাক?

অ্যাসিস্‌টান্ট প্রকিউরেটর এইবার ধীরে ধীরে বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন, এবং সশব্দে হাই তুলিয়া আড়ামোড়া ভাঙিতে লাগিলেন। তারপর ঈষৎ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন, "মেয়েলোকগুলোর কাণ্ডই আলাদা। এদের জ্বালায় রাত্রেও একটু শান্তি নেই! মিছিমিছি এই রাত দুপুরে ঘুমটা ভেঙে দিলে?"

"না, না, বাসিল, সত্যিই আমি রান্নাঘরে লোক ঢুকতে দেখেছি।"

"হাঁ, ঢুকেছে ত' কি হয়েছে! ঢুকুক না। ও নিশ্চয়ই সেই দমকলের লোকটা, সেই পেলাজিয়ার পেয়ারের লোক।"

"অ্যাঁ, কি বললে?"

"বললাম যে পেলাজিয়ার পেয়ারের লোকটা তাকে দেখতে এসেছে।"

"সর্ব্বনাশ! চোরের চেয়েও যে সাংঘাতিক! এসব অনাচার আমি আমার বাড়িতে সহ্য করব না।"

"হাঃ-হাঃ-হাঃ! অনাচার! আমরা ত' সব ধর্ম্মপুত্তুর! অনাচার সহ্য করব না! কি ভয়ানক অনাচার! হেঃ-হেঃ-হেঃ! বড় বড় বাজে কথা ব'লে লাভ নেই, বুঝলে—বুড়ী-খুকী? পৃথিবীর সৃষ্টি থেকেই এ অনাচার চলে আসছে চিরকাল! আর—চলবেও চিরদিন! একটা রাঁধুনীর ভালবাসাও যদি না পায় তবে এ দমকলের মজুর বেচারি যাবে কোথায়?"

"না, না, বাসিল, তুমি আমাকে বুঝতে পারছ না! তুমি চেনো নি এখনও আমায়। এ আমি কখ্‌খনই হতে দেবো না আমার বাড়ীতে। তুমি যাও, ওকে এখখুনি চলে যেতে বলো। এখখুনি।

আর, পেলাজিয়াকে কালই আমি সাবধান করে দেবো। আমি, মরে গেলে যা খুসি করো, কিন্তু বেঁচে থাকতে এসব অনাচার আমার বাড়ীতে ঘটতে দেবো না কিছুতেই। যাও, তুমি বলে এসো—"

"দুত্তোর! যা খুসি করোগে তোমার মেয়েলী মাথা আর মেয়েলী মন নিয়ে। আমার কি দায় পড়েছে যাবার ?"

"বাসিল। এ আমি পারবো না সইতে। উঃ! আমার মাথা ঘুরছে।"

গাগিন বকিতে বকিতে চটি পরিলেন এবং আর একবার বিরক্তি প্রকাশ করিয়া রান্নাঘরের দিকে আগাইলেন। পিপার মধ্যেকার মত অন্ধকার চারিদিকে, অ্যাসিস্‌টেন্ট প্রকিউরেটর হাতড়াইয়া পথ খুঁজিতে খুঁজিতে চলিলেন। পরিচারিকার ঘরের কাছে যাইয়া তাহাকে ডাকিয়া জাগাইলেন।

"ভ্যাসিলিসা, তুমি যে রাত্রে আমার ড্রেসিং গাউনটা বুরুষ করতে নিয়েছিলে, সেটা কোথায় ?"

"আজ্ঞে ,আমি পেলাজিয়াকে বুরুষ করতে দিয়েছিলাম।"

"আঃ! কি যে কাণ্ড তোমাদের। জিনিষটা নিয়ে গেলে, আবার ঠিক জায়গায় রেখে দিতে হয় না ? বিনা ড্রেসিং গাউনেই আমার বেরুতে হবে দেখছি।"

রান্নাঘরের এক কোণে একটা বাক্সের উপর রাঁধুনী ঘুমাইতেছিল। তিনি সেখানে গিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে নাড়া দিয়া বলিলেন, "ঘুমোও নি ত' তবে আর ঘুমের ভান করে কেন পড়ে আছ পেলাজিয়া ? তোমার জানালা দিয়ে একটু আগে কে ঘরে ঢুকলো বলতো ?

"অ্যাঁ, অ্যাঁ—আজ্ঞে ? পেরণাম। জানালা দিয়ে ? সে কি ? কে ঢুকবে ?

"দেখ, ওসব লুকোচুরির চেষ্টা করে কোন লাভ হবে না, বুঝলে ? তোমার খাতিরের লোকটিকে বলে দিয়ো, সে যেন আর এখানে না আসে।"

"এ সব আপনি কি বলছেন, বাবু? আমার কি এটুকুনও বুদ্ধিশুদ্ধিও নেই ? একে তো সেই সকাল থেকে খেটে খেটে একটি মিনিট জিরোবার সময় পাই না, আবার রাত্তির বেলায় এই সব যা-তা কথা আমার শুনতে হবে ? চার রুবল তো মাইনে, চা-টুকু চিনিটুকু পর্য্যন্ত নিজের পয়সায় কিনে খাবো, গতর ভেঙে খাটবো, আর লাভ হবে এই বদনাম ? দোকানীর বাড়ীতে ছিলাম এর আগে, এমন অপমান তো আমায় সইতে হয় নি কোন দিন! পেলাজিয়ার কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল।

"থাক, থাক, নালিশ শুনতে চাই না আমি। লোকটাকে এখখুনি বার করে দাও, বুঝলে ?"

কাঁদো কাঁদো হইয়া পেলাজিয়া বলিল, "কি বলছেন আপনি বাবু ? আপনাদের লজ্জা পাওয়া উচিত। আপনারা শিক্ষিত, ভদ্রলোক, আমরা গরীব দুঃখী, খেটেখুটে কষ্টেসৃষ্টে দিনান্তে দুমুঠো খেতে পাই, তা বলেই কি আপনারা আমাদের এমনি ভাবছেন ? আমাদের অপমান করা সহজ। কেউ যে নেই আমাদের হয়ে বলবার, তাই।"

"থাক, থাক, থামো, থামো। তোমার গিন্নীমা আমায় পাঠিয়ে দিলেন দেখতে। না হলে জানলা দিয়ে তুমি হাতীই আনো, আর ঘোড়াই আনো,—তা আমার কি ?"

ত্রুটি স্বীকার করিয়া স্ত্রীর নিকট ফিরিয়া যাওয়া ছাড়া তাঁহার আর গত্যন্তর রহিল না। বলিলেন, "আচ্ছা, পেলাজিয়া, আমার ড্রেসিং গাউনটা তুমি বুরুষ করতে এনেছিলে, সেটা কোথায় ?"

"ওহো, মাফ করবেন, আমি ভুলে গেছি আপনার চেয়ারের উপর রেখে আসতে। উনুনের কাছে একটা পেরেকে ওটা টাঙানো আছে।"

গাগিন হাতড়াইয়া উনুনের পাশ হইতে ড্রেসিং গাউনটা লইলেন এবং পরিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

স্বামী বাহিরে গেলে মারিয়া মিহালভ্না শুইয়া সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। প্রথম মিনিট তিনেক কোন রকমে চুপ করিয়া কাটাইল, তারপর ক্রমেই অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল।

"উঃ। কতক্ষণ গেছেন!—বেটা থাকলে হয়, বদ্‌মায়েস বেটা! কিন্তু, কিন্তু, যদি ডাকাত হয়?" ভাবিতেই গা ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল। আবার কল্পনায় দেখিতে লাগিল—অন্ধকারে রান্নাঘরে তাহার স্বামীর মূর্ত্তি···কুড়ুলের আঘাত···নিঃশব্দ মৃত্যু···রক্তের নদী।

পাঁচ মিনিট কাটিয়া গেল···সাড়ে পাঁচ···ছয়। কপালে ঘাম দেখা দিল।

আর নয়! সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, "বাসিল, বাসিল!"

"কেন অমন চীৎকার করছ? খুন করছে না তো কেউ? এই তো আমি এখানে রয়েছি।" স্বামীর কণ্ঠস্বর ও পদশব্দ কানে আসিল। অ্যাসিস্‌টাণ্ট প্রকিউরেটর খাটের উপর উঠিয়া এক পাশে বসিলেন। বলিলেন, "কই, ওখানে তো কেউ নেই! তোমার যত আজগুবি কল্পনা। এইবার নির্ভয়ে ঘুমও দিকি নি। বোকা পেলাজিয়া তা'র গিন্নী-মার মতই ধর্ম্ম-ভীরু, তাকে দিয়ে কিচ্ছু ভয় নেই। কি ভীতু যে তুমি। কি···" ডেপুটি প্রকিউরেটর স্ত্রীকে ক্ষেপাইতে লাগিলেন। তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে, আর ঘুমাইবার ইচ্ছাও নাই। "বড্ড ভীতু তুমি।" বলিয়া তিনি আবার হাসিয়া উঠিলেন। "কাল বরং ডাক্তারের কাছে গিয়ে তোমার এই ভয়ের কথা ব'ল। তোমার স্নায়ু সব দুর্ব্বল হয়ে গেছে।"

স্ত্রী বলিল, "কেমন একটা আলকাতরার গন্ধ আসছে না? আলকাতরা বা অমনি একটা কিছু। পেঁয়াজ, বা কপির তরকারী!"

"হাঁ, গন্ধ একটা পাওয়া যাচ্ছে বটে। আমি ঘুমোই নি। দেখি, একটা আলো জ্বালি। দেশলাইটা কোথায়? আর, হাঁ, তোমাকে সেই আদালতের প্রকিউরেটরের ছবিটাও দেখাচ্ছি। কাল আসবার সময় তিনি সবাইকে তাঁর স্বাক্ষর দেওয়া এক একখানা ফটো আমাদের দিয়েছেন।"

গাগিন দেশলাই জ্বালিয়া প্রদীপ ধরাইলেন। কিন্তু ফটোগ্রাফখানা আনিবার জন্য পা বাড়াইতেই একটা অর্দ্ধস্ফুট চীৎকার শুনিতে পাইলেন। তাকাইয়া দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী বিস্ময়ে, ভয়ে, ক্রোধে অভিভূত হইয়া বড় বড় চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে। তিনি ফিরিয়া তাকাইতেই বিবর্ণ মুখে বলিল, "রান্নাঘরে গিয়ে তুমি তোমার ড্রেসিং গাউন পরেছিলে?"

"কেন?"

"নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ দিকিন।"

নিজের জামার দিকে তাকাইয়া ডেপুটি প্রকিউরেটর একটা অদ্ভুত অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিলেন।

তাঁহার গায়ে নিজের ড্রেসিংগাউন নয়, ফায়ারম্যানের ওভারকোট। এটা কি করিয়া তাঁহার গায়ে চড়িল? তিনি যখন এই সমস্যার মীমাংসায় ব্যাপৃত, তাঁহার স্ত্রীর কল্পনা তখন মনের পটে আর এক ছবি আঁকিতেছে, কি ভয়ানক! এও কি সম্ভব? অন্ধকার, বাহিরে নিস্তব্ধতা, ঘরের মধ্যে ফিসফিস শব্দ···আরও কত কি!

স্মরণ

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

১৩০৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কবির স্ত্রী-বিয়োগ ঘটে। 'স্মরণের' কবিতাগুলি পৌষ হইতে বসন্তকালের মধ্যে লিখিত। এমন একটি গুরুতর ঘটনার অব্যবহিত পরে লিখিত কাব্যখানি রস-বিচারের মাপকাঠিতে কোন্ পর্য্যায়ে পড়ে, ইহাকে কাব্যরূপে আলোচনা করিবার সময় তাহা দেখিতে চেষ্টা করিব। প্রথমে ইহার মধ্য দিয়া কি তত্ত্বরূপটি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা দেখা যাক্।

জীবনে সকলকেই এক একবার অত্যন্ত অতর্কিতভাবে মৃত্যুর সম্মুখে পড়িতে হয়, তখন ওই অনপসরণীয় যবনিকার নেপথ্যে বিরাজমান রহস্যটা আমাদের সমস্ত অস্তিত্বকে বিকল করিয়া ফেলে। মৃত্যুর সম্মুখে মুখোমুখী হইয়া মানুষের মনে সর্ব্বপ্রথম যে ভাব উদ্রিক্ত হয়, তাহা সন্দেহ, সংশয়, দ্বিধা।

এই বাষ্পশরীরী দানবটার সহিত বোঝাপড়া করিয়া লইতেই মানুষের অধিকাংশ শক্তি ক্ষয় হয়, অনেকেই যুদ্ধে পরাজিত হয়; বিজেতৃ দুচারজনের মুখে ক্ষীণ আশার বাণী উচ্চারিত হয় মাত্র।

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান কবি সংশয়ের দুরতিক্রম্য বৈতরণীটা অনায়াসে কেমন করিয়া পার হইয়া গিয়াছেন, তাহা চোখেই পড়ে না। বস্তুত তাঁহার কাব্যজীবনে, সংশয় বা দ্বিধার কোনো স্থান নাই। সমগ্র কাব্য-অধিকারের মধ্যে পাঁচ সাতটি কবিতায় সংশয়ের ক্ষীণ সুর শোনা যায়।

অতএব মৃত্যুর এই কাব্য আলোচনায় আমাদের পরিশ্রম প্রথমেই অনেকটা পরিমাণে লঘু হইয়া যায়। এই চির-অজ্ঞাত রাজ্যে বিদেশীকে সংশয়ের গোধূলি অতিক্রম করিতে হয় না—এ সেই উত্তর মেরুর তুষারপুরী মধ্যরাত্রির সূর্য্য যেখানে নিশীথের রহস্যকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে।

কাব্যখানির তিনটি প্রধান উপজীব্য; কবি, কবিপত্নী এবং কবি ও কবিপত্নীর মধ্যে সম্বন্ধটি। জীবনে যে প্রচ্ছন্ন ও অসমাপ্ত ছিল, মৃত্যুতে আজ সে পূর্ণতর ও প্রকাশিত হইয়া পড়িল। ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হইল?

প্রথমত দেখি জীবনের রঙ্গমঞ্চ হইতে অপসৃত প্রিয়জন আপনাকে বিশ্বের যাবতীয় সৌন্দর্য্যের মধ্যে আভাসিত করিয়া তুলিয়াছে।

"ঘরে মোর নাহি আর যে অমৃত রস
বিশ্বমাঝে পাই সেই হারানো পরশ।"

"সূর্য্যাস্তের স্বর্ণ মেঘস্তরে চেয়ে দেখি এক দৃষ্টে,—সেথা কোন্ করুণ অক্ষরে লিখিয়াছ সে জন্মের সায়াহ্নের হারানো কাহিনী।" দ্বিপ্রহরের পল্লব-মর্ম্মর তোমার দীর্ঘশ্বাস প্রচার করিতেছে, এবং আতপ্ত শীতের রৌদ্রে বহু শীত-মধ্যাহ্নের তোমার সুখের নিবিড়তা বিস্তারিত হইতেছে।

অতএব দেখা গেল, যে ব্যক্তিরূপ জীবনের সীমা অতিক্রম করিয়াছে, তাহা বিনষ্ট হয় নাই, বরঞ্চ সত্তা-রূপে বিশ্বের সৌন্দর্য্যমধ্যে আপনাকে সঞ্চারিত করিয়া দিয়া কবির চক্ষে ক্ষণে ক্ষণে

উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু ইহার চেয়েও বড় আশ্রয় সে লাভ করিয়াছে, নহিলে এক নশ্বরতা হইতে অপর নশ্বরতায় রূপলাভ করিয়া কি সান্ত্বনা!

প্রিয়জন শুধু বিশ্ব-সৌন্দর্য্যে নহে, বিশ্বজনের মধ্যে আশ্রয় লাভ করিয়াছে।

"তোমার কঙ্কণ
কোমল কল্যাণ প্রভা করেছে অর্পণ
সকল সতীর করে। স্নেহাতুর হিয়া
নিখিল নারীর চিত্তে গিয়েছে লাগিয়া।
সেই বিশ্বমূর্ত্তি তব আমারি অন্তরে
লক্ষ্মী সরস্বতী রূপে পূর্ণরূপ ধরে।"

দেখিলাম, প্রিয়জন বিশ্ব-সৌন্দর্য্য ও বিশ্বজনে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, কিন্তু ইহাও তো চরম আশ্রয় নয়। সেই আশ্রয়ে তাহাকে না দেখিতে পাইলে নিশ্চিন্ত হইতে পারি কই!

"রজনী তাহার হয়েছে প্রভাত,
তুমি তারে আজি লয়েছ হে নাথ,
তোমারি চরণে দিলাম সঁপিয়া
কৃতজ্ঞ উপহার।

* * *

তারে যাহা কিছু দেওয়া হয় নাই,
তারে যাহা কিছু সঁপিবারে চাই,
তোমারি পূজার থালায় ধরিনু
আজি সে প্রেমের হার।"

আজ তাহাকে বিশ্বনাথ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিবার উপায় নাই, কারণ—

"আজি বিশ্বদেবতার চরণ আশ্রয়ে
গৃহলক্ষ্মী দেখা দাও বিশ্বলক্ষ্মী হয়ে।"

এই চরম আশ্রয়ে তাহাকে আশ্রিত জানিয়া মনে খানিকটা সান্ত্বনা পাওয়া যায় বই কি!

এতক্ষণ দেখিলাম, কবি মৃত্যুতে যাহাকে হারাইয়াছিলেন, তাহাকে পূর্ণতরভাবে, স্বয়ংপ্রকাশ ভাবে বিশ্বপ্রকৃতিতে, বিশ্বজনে, এবং বিশ্বনাথের মধ্যে লাভ করিলেন। এবার দেখা যাক্, এই বিস্ময়কর অভিজ্ঞতায় কবির নিজের জীবনে কি পরিবর্ত্তন বা বিবর্ত্তন ঘটিল। যদি কিছু ঘটিয়া থাকে, তাহাকেও এই মৃত্যু-অভিজ্ঞতার একটা পরোক্ষ প্রভাব বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

এতক্ষণ দেখিলাম, মৃত্যুর দ্বারা কবিপত্নী পূর্ণতররূপে প্রকাশিত হইলেন। কিন্তু আরো বিস্ময় আছে, স্বয়ং কবিও পূর্ণতরভাবে নিজেকে অনুভব করিতে সমর্থ হইলেন। ইহা কিরূপে সম্ভব, না, এই একটি মৃত্যু দ্বারা তিনি মরণকে জীবনের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, এবং বিশ্ব ও বিশ্বনাথকে পত্নী-সত্তার মধ্যে সংহত দেখিলেন। এই অনুভূতিকে বুদ্ধির দিক হইতে পাওয়া কঠিন নহে, কবির পক্ষে তাহা পূর্ব্বেই ঘটিয়াছে; কিন্তু বুদ্ধি দ্বারা যাহা আয়ত্ত হয়—জীবনে

তাহাকে গ্রহণ করিবার সময় উপস্থিত হইলে দেখা যায়, কাজটি তত সহজ নয়। সমস্ত অস্তিত্ব বিদ্রোহ করিয়া উঠে, নয় সমগ্র জীবনের ভিত্তি একদণ্ডে ভাঙিয়া পড়িয়া করুণ দৃশ্য উদ্ঘাটিত করে, অবিশ্বাস নাস্তিকতা অবধারিত পরিণাম। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ইহার কোনটাই ঘটে নাই, বুদ্ধির সত্য জীবনের সত্যে পরিণত হইয়াছে। এই যে বিপুলতার বোধ, যাহাকে বিশ্ববোধ বলা যাইতে পারে, কবি সেই দিকে আরো এক পা অগ্রসর হইয়া গেলেন।

"আপনার মাঝে আমি করি অনুভব
পূর্ণতর আজি আমি।"

কেমন করিয়া, প্রথমত,

"তুমি মোর জীবনের মাঝে
মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী।

* * *

জীবনের দিক্‌চক্র-সীমা
লভিয়াছে অপূর্ব্ব মহিমা,
অশ্রু-ধৌত হৃদয় আকাশে
দেখা যায় দূর স্বর্গপুরী।"

অবশ্যই তিনি মৃত্যুকে কবির জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু সে মৃত্যু কি রকম?

"তুমি ওগো কল্যাণরূপিণী
মরণেরে করেছ মঙ্গল।"

এবং অবশেষে—

"তুমি মোর জীবন মরণ
বাঁধিয়াছ দুটি বাহু দিয়া।
প্রাণ তব করি অনাবৃত
মৃত্যু মাঝে মিলালে অমৃত,
মরণেরে জীবনের প্রিয়,
নিজ হাতে করিয়াছ, প্রিয়া।

* * *

জন্ম-মরণের মাঝখানে
নিস্তব্ধ রয়েছ দাঁড়াইয়া।"

একই বাহুপাশে কবির জীবন ও মৃত্যু বিধৃত হইয়া, তাহাদের খণ্ডতা ঘুচাইয়া, অখণ্ড এক ভাবে কবির নিকটে ধরা পড়িয়াছে।

কিন্তু শুধু মৃত্যু নহে, জগতে যে বিরাট জীবনধারা নিরন্তর প্রবাহিত, একটি অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র যাহার, আমাদের মধ্যে বিধৃত, সেই বিপুল বিশ্বজীবনকেও কবি আত্মীয় ভাবে লাভ করিলেন।

"বহুরে যা এক করে ; বিচিত্রেরে করে যে সরস ;
প্রভূতেরে করি' আনে নিজ ক্ষুদ্র তর্জ্জনীর বশ—"

এমন যে প্রেম, যে প্রেম ও পত্নীসত্তা এখানে অবশ্য একাত্ম, তাহার কল্যাণে কবির জীবন নূতন আভায় ও আভাসে পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। এবং জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্যের ও সেই সৌন্দর্য্যের অন্তর্নিহিত সত্তার ইঙ্গিত রমণীর, এই বিশিষ্ট রমণীর সৌন্দর্য্যে, জীবিতাবস্থায় নহে, মৃত্যুতে লাভ করিলেন।

জগতের অনন্ত রহস্য জীবনে আর কতটুকু প্রতিভাত হয়। দিবসের অবসান যেমন অন্ধকারের যবনিকা টানিয়া দিয়া বৃহত্তর আকাশের পটভূমিতে বিরাটতর অভিনয় আরম্ভ করে, জীবনের অবসানে, জ্ঞানের অগোচরে যে রহস্যময় নেপথ্যলীলা চলিতে থাকে, মৃত্যুর রঙ্গমঞ্চে তাহাও তেমনি ভাবে উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। সকলে তাহা দেখিবার জন্য প্রস্তুত থাকে না এই যা দুঃখ। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই সত্যের আবির্ভাব, কেবল দৃষ্টির অভাবে তাহা ধরা পড়িতে চায় না।

অনাহুত যে সব বসন্ত একদা বিস্মৃতির দিগন্তরে ম্লান হইয়া গিয়াছিল, সেদিনকার অস্ফুট চম্পক বকুল পুষ্পের দল আজ অশ্রুসিঞ্চিত নব গৌরবে ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। এবং এই উদার আকাশের প্রান্তশায়ী দিক্‌বলয়বিলীন ওই তালীবনের নীলিমায় তোমার চক্ষের চকিত চাহনি ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া উঠিতেছে। যে ঘরের ছিল, সে বিশ্বের হইয়াছে, তাই আজ তাহার সন্ধান একেবারে বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে।

"সে আজি বিশ্বের মাঝে মিশিছে পুলকে
সকল আনন্দে আর সকল আলোকে
সকল মঙ্গল সাথে।"

এতক্ষণ দেখা গেল, কবি ও কবিপত্নী উভয়েই মৃত্যুতে ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়া পূর্ণতর হইয়াছেন, কেবল কি তাঁহাদের মিলনই অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে।

"মিলন সম্পূর্ণ হ'ল আজি তব সনে
এ বিচ্ছেদ বেদনার নিবিড় বন্ধনে।
এসেছ একান্ত কাছে, ছাড়ি' দেশ কাল
হৃদয়ে মিশায়ে গেছ ভাঙিয়া আড়াল।"

যে ঘরের ছিল সে যে শুধু বিশ্বের হইয়াছে তাহা নহে, বাহিরের জন অন্তরের হইয়াছে। খণ্ডতা ও অসম্পূর্ণতার জন্য জীবনে উভয়ের মিলন বাধাহত ও অসম্পূর্ণ ছিল। মৃত্যুর দীক্ষার পূর্ণতায় সে বাধা দূর হইয়া দুই জনে একান্ত ভাবে, আন্তরিক ভাবে মিলিত হইতে পারিয়াছেন।

"মৃত্যুর নেপথ্য হ'তে আরবার এলে তুমি ফিরে
নূতন বধূর সাজে হৃদয়ের বিবাহ-মন্দিরে
নিঃশব্দ চরণ পাতে। ক্লান্ত জীবনের যত গ্লানি
ঘুচেছে মরণ-স্নানে। অপরূপ নব রূপখানি
লভিয়াছ এ বিশ্বের লক্ষ্মীর অক্ষয় কৃপা হ'তে।

* * * *

মরণের সিংহদ্বার দিয়া
সংসার হইতে তুমি অন্তরে পশিলে আসি' প্রিয়া।"

কিন্তু মরণোত্তর এই মিলন আবার কেন? ইহার উত্তর না দিয়া বরঞ্চ আরও একটা প্রশ্ন করা চলে—জীবনের মিলন-ই বা কেন? কবির মনেও এই প্রশ্ন জাগিতেছে—

"এ সংসারে একদিন নববধূবেশে
তুমি যে আমার পাশে দাঁড়াইলে এসে।

* * *

সে কি অদৃষ্টের খেলা, সে কি অকস্মাৎ!"

অকস্মাৎ নয়, অনাদি কালের নির্ব্বন্ধে যুগলের এই মিলন কি জন্য, না,

"দোঁহার মিলনে মোরা পূর্ণ হব দোঁহে।"

অনাদি কালের এই নির্ব্বন্ধের পূর্ণতার জন্য অনন্ত কালের প্রয়োজন—এক জীবনে তাহা কেমন করিয়া সম্ভব! কিন্তু এই মিলন-ই বা কেন? কবি বলেন—

"রচিতেছিলাম যাহা মোরা শ্রান্তিহারা
সাঙ্গ কে করিবে তাহা মোরা দোঁহে ছাড়া।"

যুগলের আত্মকেন্দ্রী মিলনের দ্বারা জীবনে দেবতার যে পূজা ব্যাহত হইয়াছে, মৃত্যুর মন্দিরে তাহা শেষ করিতে হইবে। সেই জন্যই অনাদি কালের এ মিলনের আয়োজন, তাহার সম্পূর্ণতাতেই ইহার সার্থকতা।

"যেথা মোর পূজাগৃহ নিভৃত মন্দিরে
সেথায় নীরবে এস দ্বার খুলি' ধীরে—
মঙ্গল কনক-ঘটে পুণ্যতীর্থ জল
সযত্নে ভরিয়া রাখ, পূজা-শতদল
স্বহস্তে তুলিয়া আন। সেথা দুই জনে
দেবতার সম্মুখেতে বসি একাসনে।"

কবির সমগ্র জীবনের লক্ষ্য ইহা-ই; মৃত্যুতে বুঝি বা ইহা ব্যাহত হয় এই আশঙ্কা ছিল, কিন্তু মৃত্যু-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতেই দেখিলেন, এ পূজার চরম-অর্ঘ্য জীবনে আহরিত হইবার নহে, কারণ জীবন নানা ক্ষুদ্রতায় খণ্ডিত; মৃত্যুতেই তাহা সম্ভব, কারণ মৃত্যুর নেপথ্যবিধানের কল্যাণে উভয়ে পূর্ণতর, উভয়ের মিলন পূর্ণতর। এই কাব্যের এক প্রান্তে বিচ্ছেদের শোক, অপর প্রান্তে মিলনের অশোক লোক। যাহা ছিল বস্তুত মৃত্যুর কাব্য, কবির দিব্যদৃষ্টির মাহাত্ম্যে তাহা নবীনতর জীবনের কাব্য হইয়া উঠিয়াছে।

২

বর্ত্তমান কাব্যখানি কাব্যাংশে হীন, দু' চারটি কবিতা ব্যতীত কোনটিই উচ্চশ্রেণীর নহে। ইহার জন্য কবির অন্তর্নিহিত কবি-প্রকৃতি দায়ী। কবিপত্নী অগ্রহায়ণ মাসে স্বর্গারোহণ করেন। পৌষ

হইতে চৈত্র মাসের মধ্যে 'স্মরণে'র কবিতাগুলি লিখিত। যতক্ষণ না একটি ঘটনা আমাদের জীবনকে অতিক্রম করিয়া কল্পনাকে আশ্রয় করে, ততক্ষণ তাহা কাব্যের বস্তু হইয়া উঠিতে পারে না। কাব্যের সামগ্রী দ্বিজ, তাহার প্রথম জন্ম জীবনে, দ্বিতীয় জন্ম কল্পনায়। এই দ্বিজত্বের জন্য কিছু সময় আবশ্যক। অবশ্য কোন্ ঘটনায় কতটা সময় লাগিবে, তাহা ঘটনার গুরুত্বের ও লেখকের প্রকৃতির উপরে নির্ভর করে। ঘটনা যত গুরুতর ভাবে লেখককে আন্দোলিত করে, জীবনকে অতিক্রম করিয়া কল্পনা-জগতে স্থায়িত্ব লাভ করিতে তত বেশি সময় লাগে। চাঁদের আলোয় বসিয়া চাঁদের আলোর কবিতা লেখা যাইতে পারে, কিন্তু বিপদ এই তাহা প্রায়ই কবিতা হয় না। চিতাগ্নির শিখা নিভিয়া যাইবার অনেক পরেই তবে কল্পনার শিখা উজ্জ্বল হইয়া ওঠে। এমন যে হয়, তাহার কারণ কাব্য জীবনের ছায়া নহে। কাব্য-জগৎ ও প্রত্যক্ষ-জগৎ সমান্তরাল ভাবে চলিয়াছে—একটা আর একটা হইতে মাল-মশলা আকর্ষণ করিয়া নূতন রূপ ও নূতন জীবন দান করিতেছে। এই সঞ্জীবনের জন্য সময় প্রয়োজন।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক এই সময়টুকু দেওয়া হয় নাই। সেইজন্য কবির গভীর শোক ও অনুভূতি সর্ব্বত্র কাব্য-জগতের সত্য হইয়া উঠিতে পারে নাই। কেন যে পারে না এবং এ ক্ষেত্রে পারে নাই, তাহার কারণ কাব্য কবির সমগ্র অস্তিত্বের সৃষ্টি, কিন্তু কোনো কারণে যদি এই অস্তিত্বের মধ্যে দ্বিধা থাকিয়া যায়, তবে কাব্যেও সেই ফাটলটি কোনো-না-কোনো আকারে থাকিয়া যাইবেই। একদিকে কবির হৃদয় শোক অনুভব করিতেছে, অন্য দিকে তাঁহার কল্পনা মূর্ত্তি গড়িতেছে, এই অবস্থায় সৃষ্ট শিল্পকার্য্যে কবির অস্তিত্ব সমগ্রভাবে আপনাকে নিয়োগ করিতে পারে না, এবং তাহা না পারায় দ্বিধাগ্রস্ত অস্তিত্বের সৃষ্ট শিল্প খণ্ডিত ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এখন এই প্রকার খণ্ডিত শিল্পে রস দানা বাঁধিতে পারে না, এবং অখণ্ড কবি-প্রকৃতির ছন্দ-স্পন্দ অত্যন্ত মন্দ ও বেতালাভাবে প্রকটিত হইতে থাকে।

কাব্যখানি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়, অধিকাংশ কবিতা উপরি-উক্ত কারণে পদে পদে নিতান্ত দ্বিধার সহিত চলিতেছে। জীবনের সত্যকে যতটুকু সময় দিলে কাব্যলোকের সত্য হইয়া উঠিতে পারিত, কবি যেন সেটুকু সময় দিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হইয়া অকালে ইহাদিগকে মানসিক গর্ভবাস হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আনিয়াছেন।



লিপিকা

নলিনী সেন

তোমার লিপিকা এলো হাতে
কালের প্রহর গণি নিশিদিন ঘন প্রতীক্ষাতে
কম্পমান এ বক্ষের তলে
উদ্বেল হৃদয়খানি পথ চেয়ে ছিল পলে পলে।
আসিল সে বহি' লয়ে নিখিলের পূর্ণপাত্র হ'তে
অফুরাণ সুধাধারা, রূপে রসে বিচিত্র সঙ্গীতে
বার বার দোলাইল মন
ভাষাহারা বেদনার মাঝে লাগে আনন্দ-স্পন্দন!
মনে হয় কোথা' রাখি এরে,
পরিপূর্ণ এ-দানের ভারে
ধরিয়া রাখিতে আর নারি আপনাকে
ছিন্ন করি' লিপিখানি বিলাইয়া দিই দিকে দিকে।
উড়ে যাক্ সমীরণ ভরে
ছায়াঘন কাননে প্রান্তরে,
আনন্দে ঝরিয়া যাক্ বিহঙ্গের কলকণ্ঠগীতে
সন্ধ্যায় প্রভাতে!
বসন্তের পুষ্পাকীর্ণ পথে
আনিলে কি মাধবীর কম্পমান বক্ষতল হ'তে
মধুরাতে সঙ্গোপন ভাষ!
আনিলে কি চম্পকের আকুলিত মদির সুবাস!
বল্লরীর ছন্দের দোলায়
যে প্রেমস্বপন কাঁপে, কিংশুকের আরক্ত আভায়,
যে আনন্দ ধরা দেয় প্রভাতের প্রথম আলোতে
না-বলা কি কথার ইঙ্গিতে
ধরা দেয় যামিনীর স্বপ্নময় জাগরণ সাথে
বেদনা ভরিয়া মাধুরীতে,
আষাঢ়ের ভরা সাঁঝে শ্রাবণের অশ্রান্ত বর্ষণে
মন মোর ভেসে যায় কল্পনার অমরার পানে
বিশ্বের সৌন্দর্য্যলোকে নিশিদিন ফিরে আহরিয়া
দুঃসহ আনন্দ-বেগে ক্ষণে ক্ষণে উঠে শিহরিয়া—
সে আনন্দ বন্দী করি' আখরের মায়ামন্ত্র-ফাঁদে
পাঠাইলে আজি এ প্রভাতে।

বল্লম

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কামারশালায় হাপর চলিতেছে; শ্বাস-রোগীর হৃৎপিণ্ডের মত দিনরাত শাঁ শাঁ করিয়া বাতাস টানে, নিষ্প্রভ হইয়া আসা কয়লার টুকরাগুলি এক মুহূর্ত্তে রক্তাক্ত তীক্ষ্ণ আগুনে ধক ধক করিয়া ওঠে, দু একটা সাপের মত বিসর্পিল শিখা হয়তো বা লক্ লক্ করিয়া খেলিয়া যায়। কামারশালার অপরিসর সংকীর্ণতা দিনের উজ্জ্বল বিস্তারের মাঝখানেই প্রায়ান্ধকার হইয়া থাকে, সেই বিস্তৃত ঘনছায়া আকস্মিক ভাবে একটা রক্ত আভায় দীপ্ত হইয়া ওঠে, খানিকটা অস্বাভাবিক অনুজ্জ্বল আলো যেন যদুপতির চোখমুখের উপর দিয়া হিংস্রভাবে পিছলাইয়া পড়ে।

কামারশালা: কিন্তু সোনারূপার ঔজ্জ্বল্য এখানে নাই। প্রত্যেক হাটবারের জন্য দা, বঁটি, ছুরি তৈরী করা, গরুর গাড়ীর চাকায় লোহার পাত পরাইয়া দেওয়া অথবা কখনো কখনো দু'চারখানা শড়কি-বল্লমের ফলা গড়িয়া তোলা, সাধারণত ইহাদের লইয়াই যদুপতির কারবার। টকটকে লাল জ্বলন্ত ইস্পাতের উপর ঝন্ ঝন্ করিয়া লোহার হাতুড়ির ঘা পড়িতে থাকে, চারিদিকে জোনাকির মত উড়িয়া উড়িয়া স্ফুলিঙ্গ পড়ে, কঠিন পেশীগুলি কঠিনতর হইয়া ওঠে এবং কপাল বাহিয়া টসটস করিয়া লবণাক্ত ঘামের বিন্দু নামিয়া আসে।

লোহা আর আগুন—ইহাদের স্পর্শে মানুষের মনও যেন ইহাদের মতই কঠিন নির্ম্মম হইয়া উঠিয়াছে। দৈনন্দিনের অসংখ্য খুঁটিনাটি সুখদুঃখ ইহাদের জীবন হইতে লোহার মত ঠন করিয়া আঘাত দিয়া ফিরিয়া যায়, আগুনের শিখার মতই অসংবৃত ইহাদের কামনা নিজের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া আত্মপ্রকাশ করে। স্বাভাবিক মানুষ এখানে আপনার সীমা হইতে খানিকটা দূরে সরিয়া গেছে—সম্মুখে বা পিছনে একথা কেহই নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি না।

কিন্তু একথা যদুপতির সম্বন্ধে সত্য নয়। লোকটা বাস্তবিকই অমায়িক। মুখে আপ্যায়নের মধুর হাসিটি লাগিয়াই আছে, যেন নিজের দীনতা লইয়া সে বাঁশের কঞ্চির মত থর থর করিয়া দুলিতেছে, নুইয়া পড়িবার এতটুকু অপেক্ষামাত্র।

—দা? হাঁ, তা প্রায় হয়ে গেছে কর্ত্তা। আপনার জিনিষ কি কখনো ফেলে রাখতে পারি? যেটুকু বাকী আছে, আজকেই খেটে তা শেষ ক'রে দেব। মা-ঠাকরুণকে বলবেন আর একটা দিন একটু কষ্ট করে চালাতে, কাল আমি—। না, না, আপনি আর আসবেন কেন, আমি নিজেই পৌঁছে দিয়ে আসব।

এমনি মানুষ যদুপতি। তা' ছাড়া হাতের কাজও তাহার নিন্দা করিবার মত নয়। লোহার কাজের জন্য এমনিতেই এ অঞ্চলটির খ্যাতি আছে, ইহার মধ্যে যদুপতি আবার বেশ খানিকটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া নিয়াছে। আর শুধু দা-বঁটিই নয়, ছোটখাট জিনিস, ছুরি-কাঁচি প্রভৃতি এমন নিপুণতার সঙ্গে সে গড়িয়া তোলে যে, সৌষ্ঠবে এবং কর্ম্মক্ষমতায় তাহারা বিদেশী আমদানির পাশে সমান আসন দাবী করিতে পারে।

লোকটির বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। ইহারই মধ্যে চুল ধূসর হইয়া আসিতেছে, মুখের উপর অনেকগুলি এলোমেলো রেখা পড়িয়াছে। লোহা পিটিয়া পিটিয়া পেশিমণ্ডিত কাল শরীর লোহার মতই কঠিন হইয়া গেছে।

আর খাটিতেও পারে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত অশ্রান্ত ভাবে হাপরের আগুন জ্বলিতে থাকে, পোড়া লোহা, স্যাঁৎসেঁতে মাটি আর হাপরের পুরাণো চামড়ার গন্ধে ঘরটা নেশাচ্ছন্ন হইয়া যায়। থাকিয়া থাকিয়া জ্বলিয়া ওঠা কয়লার আগুনে যদুপতির চোখমুখ রাঙা হইয়া ওঠে—গরমে ও পরিশ্রমে ললাটে ঘামের বিন্দু জমিয়া আসে।

ইহার পরেই চপলার আসিবার পালা।

আসিয়াই সে কঠোরভাবে প্রশ্ন করে, আজ আর নাইতে খেতে হবে, না সমস্তদিন ওই নিয়েই থাকবে বাবা ?

মেয়ে যেন বাপকে রীতিমত শাসন করিতেছে। যদুপতি মুহূর্ত্তে ওঠে চকিত হইয়া, উদ্যত হাতুড়িটা নামাইয়া রাখিয়া হয়তো বা সবিনয়েই বলিতে যায়, লক্ষ্মীটি, আর এইটুকু। আজকের মধ্যেই কাজটা শেষ না করতে পারলে যে কথার খেলাপ হয়ে যাবে।

—ওরকম কথার খেলাপ হ'ল তো বয়ে গেল। সমস্তটা দিন এ ভাবে খেটে খেটে তুমি মরে যাবে নাকি ?

—বাঃ রে, না খাটলে পয়সা আসবে কোত্থেকে ?

—ওঃ, ভারী পয়সা! চপলার কণ্ঠ আকস্মিক ভাবে পঞ্চম হইতে সপ্তমের চূড়ায় উঠিবার উপক্রম করে : যত সমস্ত হা-ঘরে খদ্দের নিয়েই না তোমার কারবার। একটা জিনিস খেটেপিটে তৈরী করে দিলে দাম আদায় করতে প্রাণান্ত! ছ'শো ছত্রিশবার করে হাঁটিয়ে মারবে, আজ নয় কাল নয় করে সুর তুলবে, ওদের জন্যে খেটে মরবার তোমার এমন কী মাথাব্যথা!

কথার তোড় একেবারে গলদঘর্ম বিপর্যস্ত করিয়া তোলে যদুপতিকে। তবু বিপন্নভাবে বলিবার চেষ্টা করে, আহা হা, ওরকম ভাবে বলতে নেই রে! গ্রামের সব বড় বড় ভদ্দরলোক, তাদের আশ্রয়ে আছি—

—চুলোয় যাক তোমার ভদ্দরলোক। খাটিয়ে নেবে আর পয়সা দেবে না, অমন সব ভদ্দর-লোকের মুখে নুড়ো জ্বেলে দিতে হয় না? কিন্তু তুমি এখন উঠবে কি না বল, নইলে আমি এক্ষুণি কুয়োতলা থেকে এক ঘড়া জল এনে ওই আগুনে ঢেলে দেব, বলে দিলাম কিন্তু একথা।

না উঠিয়া উপায় নাই। চপলার আদালতে কখনো আপীল চলিবে না। হাতের কাজটা তখনকার মত জলের মধ্যে ভিজাইয়া রাখিতে হয়।

—নাঃ, পয়সা দেয় না! তা' হ'লে এতদিন ধরে চলছে কেমন করে শুনি?

—যা চলা চলছে! গরম লোহা ডুবানোর সঙ্গে জলে যেমন আলোড়ন জাগে, তেমনি ভাবেই চপলার কণ্ঠ হঠাৎ টগবগ করিয়া ওঠে : কী করে যে চালাই, তা আমিই জানি। দিনরাত্তির বসে ঠুনঠুন ক'রে ওই লোহাই তো পিটে যাচ্ছ, ঘর-সংসারের খবর এতটুকুও রেখেছ কখনো? দেনায় দেনায় পাড়ায় তো চুল অবধি বিকিয়ে বসে আছি। কালকেই মটরের মা এসে তার পাঁচ আনা

পয়সার জন্যে যা নয় তাই বলে গেল। কী করব, মুখ ছোট হয়ে আছে, নইলে আঁশবটি দিয়ে কাটকী মাগীর নাকটা কেটে নিতুম!

চপলা যে ভাবে চেঁচাইতে সুরু করিয়াছে, তাহাতে পাড়া প্রায় জমিল বলিয়া। মেয়েটার গলা যেন বায়না করা, অগত্যা যদুপতি যুগপৎ বিব্রত ও বিরক্ত হইয়া ওঠে: নে, নে, হয়েছে বাপু, থাম। এই বেলা একটার সময় চেঁচিয়ে আর রাজ্যির—

কথাটাও আর শেষ করিতে হয় না।

—চেঁচাব না, একশোবার চেঁচাব। দশজনের দশকথা কান পেতে আমাকেই শুনতে হয়, তোমাকে নয় তো। আর, তুমিও তেমনি মানুষ! জিনিস গড়িয়ে দেবে, অথচ দাম চাইতে গেলে লজ্জায় তোমার মাথা কাটা যায়। ওদিকে মুখপোড়া ভদ্দরলোকেরা তিন বেলা মাছের মুড়ো গিলছে, আর আমাদের মতো গরীব দুঃখীর চার ছ আনা পয়সা ফেলে দিতেই যেন চোখ চড়ক গাছে চ'ড়ে যায়!

ভাগ্য ভালো, এমনি সময় রান্নাঘরের দিকে নজর পড়ে চপলার। কোন একটি অনধিকারী মার্জারের সন্দেহজনক গতিবিধি দেখিয়া তাহার মনোযোগ বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট হয়: নিলে, কোথাকার ভাগাড়ে হুলো এসে মাছের কানকোটা বুঝি নিয়ে গেল! দাঁড়া হতভাগা, মাছ খাওয়াচ্ছি তোকে—

একখানা চ্যালাকাঠ তুলিয়া লইয়া চপলা রান্নাঘরের দিকে ধাবিত হয় এবং তখনকার মতো একটা প্রচণ্ড স্বস্তির নিশ্বাস যদুপতির নাক মুখ দিয়া সশব্দেই বাহির হইয়া আসে।

কিন্তু দোষ চপলার নয়। চক্ষুলজ্জা অনেক সময়েই যেন সমস্ত শোভনতার মাত্রা ছাড়াইয়া যায় যদুপতির। বস্তুতান্ত্রিক পৃথিবীতে এই জাতীয় নিরীহ ভালমানুষদের লইয়া যে কারবার চলে না, একথা সবাই-ই জানে, যদুপতি নিজেও। কিন্তু জানাই তো আর সব নয়। মানুষের মনের গভীরতায় পরস্পরবিরোধী এত অসংখ্য চিন্তা এমন ভাবেই জড়াইয়া আছে যে অন্তরের অন্ধকারে সন্ধান করিতে গেলে অন্ধের মতো শুধু হাতড়াইয়া ফিরিতে হয়, প্রশ্নের উত্তর আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যে যে মুহূর্তে ও মনে মনে ক্রোধে এবং নিরাশায় রীতিমতো হিংস্র হইয়া উঠিয়াছে, হয়তো বা সেই মুহূর্তেই একটুখানি চরিতার্থ বিনয়ের হাসি হাসিয়া বলিয়া বসে, তাতে কি, তাতে কি, আপদ বিপদ তো মানুষের লেগেই আছে। যখন সুবিধে হয় তখনই দেবেন।

তোমার পয়সা অনেক দিন থেকেই পড়ে রয়েছে, গরীব মানুষ তুমি। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ, মামলা মোকর্দ্দমার ঝঞ্ঝাটে আর—

—না, না, সেকথা আপনি কেন ভাবছেন? ও আট আনা পয়সার জন্যে চিন্তার কী আছে? যখন হয় এক সময় দিলেই—

বলে বটে, কিন্তু যদুপতি নিজেই নিজের ব্যবহারকে মনের দিক হইতে এতটুকুও অনুমোদন করিতে পারে না। হরি চাটুয্যের কাছে এই আট আনা পয়সা যে একটা কানাকড়ির চাইতেও কম, সেকথা এই কুমারগঞ্জ গ্রামের ইতরভদ্রনির্বিশেষে সকলেই জানে, এবং যদুপতির যে প্রায় অর্ধাশনেই দিন কাটিতেছে, এ কথাও হরি চাটুয্যের অপেক্ষা কেউই বেশি করিয়া জানে না। অথচ বড়লোকদের

এইটাই বোধ হয় প্রথা। প্রত্যেক দিন পাওনাদারের দল তীর্থের কাকের মত দুয়ারে আসিয়া ভিড় না জমাইলে আভিজাত্যই বা ক্ষুণ্ণ হয় তাঁহাদের!

বিষণ্ণ চিন্তিত হইয়া যদুপতি ফিরিয়া আসে। এমন ভাবে সংসার চালানো অসম্ভব। গ্রামের চণ্ডীতলা ঘেরিয়া বুধবারের হাট বসিয়াছে। ভাবিয়াছিল, দু' চার আনা পয়সা আদায় করিতে পারিলেও কিছু তরিতরকারি কিনিয়া লইয়া যাইবে, চপলা তো কাল রাত্রেই কবুল জবাব দিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু প্রয়োজনটা একান্ত প্রবল হইলেও মুখ দিয়া সে কথা বাহির হইয়া আসিতে চাহিল না—কোনরকমে যেন নিজেকে তাগাদার অত্যন্ত লজ্জাকর অবস্থা হইতে মুক্ত করিয়া নতমুখে ফিরিয়া আসিল।

সত্যিই, এ ধরণের মানসিক দৌর্বল্য যেন ভূতের মতই ওর ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়া আছে, কিছুতেই নামিবে না। চপলা অসম্ভব মুখরা, ভূত ঝাড়িবার চেষ্টার ত্রুটি সে করে নাই, কিন্তু তাহারও তো একটা সীমা আছে। হতাশ হইয়া চপলা হাল ছাড়িয়া দিয়াছে।

এমনি একদিন নিস্ফল তাগাদার পর ক্ষুণ্ণ চিত্তে বাড়ি ফিরিয়াই যদুপতি দেখিল, হৃষীকেশ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

অভাব না হয় অজস্র পরিমাণেই থাকুক, কিন্তু যদুপতির জীবনে এইটাই করুণতম অধ্যায়। চপলা মেয়েটি অতিরিক্ত মুখরা হইলেও মাতৃহীনা এই সন্তানটিকে ও সমস্ত বুক দিয়াই নিবিড় ও গভীরভাবে ভালবাসিয়া আসিয়াছে। অনেক খরচপত্র এবং বিস্তর বাছাবাছি করিয়াই যদুপতি মেয়ের বিবাহ দিয়াছিল। কিন্তু পৃথিবীতে সকলেই নাকি নিজের কপাল আনে সঙ্গে করিয়া, কোন চেষ্টাতেই তাহার আর ব্যতিক্রম সম্ভব নয়।

সুতরাং, জামাই জুটিল হৃষীকেশ। দেখিতে শুনিতে ছেলেটি বেশ, সহরের একটা ইস্কুল হইতে বার কয়েক ম্যাট্রিকুলেশান দিয়া দিব্যি ঘাড় ছাঁটিতে শিখিয়াছিল। গলাটাও মোটামুটি মন্দ ছিল না, বেশ মিহি সুরে সিনেমার ভঙ্গীতে টান ধরিত:

"আমার পরা-আ-ণ যা-আ-রে চায়,
তারে না-আ-হি পায়—"

কিন্তু মুস্কিলের সূত্রপাতও হইল ওইখানেই। গ্রামের তালুকদারের বহিয়া যাওয়া ছেলে কেশব চাকলাদার এক সখের থিয়েটার পার্টি খুলিয়া পূর্ণোৎসাহে তাহার মহলা চালাইতেছিল। কালীপূজার দিন 'সংযুক্তা-হরণ' প্লে নামিবে, সমস্ত আয়োজন ঠিকঠাক, এমন সময় প্রতিবেশীর বাগান হইতে রাতারাতি নারিকেল চুরি করিতে গিয়া পতনে অথবা প্রহারে হাত পা ভাঙিয়া সংযুক্তা শয্যা গ্রহণ করিল।

মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল কেশবের। পৃথ্বীরাজের বীররসাত্মক পার্টটা আওড়াইতে আওড়াইতে হঠাৎ থামিয়া গিয়া ক্ষিপ্তস্বরে কহিল, রাস্কেল আমাকে ডোবালো!

দিকে দিকে লোক ছুটিল, তিন দিনের মধ্যে তৈরী করিয়া নেওয়া যায়, গ্রামে এমন নায়িকা সুলভ নয়। খুঁজিতে খুঁজিতে তাহারা দেখিতে পাইল, দীঘির জলে বঁড়শি ফেলিয়া বসিয়া হৃষীকেশ অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে ফাতনার দিকে চাহিয়া আছে এবং গুণ গুণ করিয়া গাহিতেছে:

"রূপকথারি রাজা এসে তুলে নিল পারুল ফুল,
সাতটি চাঁপা জেগে বলে—"

ব্যস্, আর দেখিতে হইল না। সাতটি চাঁপা জাগিয়া যে কি বলে, সে কথাও তখনকার মতোই চাপা রহিল। সকলে সমস্বরে বলিল, পেয়েছি—এবং পরক্ষণেই পাঁজাকোলা করিয়া হৃষীকেশকে তুলিয়া লইল। হৃষীকেশ হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল, ছাড়ো, ছাড়ো, ফাতনাতে ঠোকর দিয়েছে, কিন্তু তাহারা ছাড়িল না। ফাতনা জলের নীচে অদৃশ্য হইল, চ্যাং-দোলা অবস্থায় হৃষীকেশ সেদিকে একটা করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার আগেই তাহারা তাহাকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া উর্ধশ্বাসে পুরো এক মাইল পথ পার হইয়া গেল।

কালীপূজার দিন প্লে নামিল এবং সামান্য এই তিন দিনের রিহার্সালেই সংযুক্তার পার্ট সব চাইতে চমৎকার উৎরাইয়া গেল। কেশব পুরো এক বোতল তিরিশ টানিয়া দু' হাতে হৃষীকেশকে জড়াইয়া ধরিল,—মাইরি, এমন রত্ন কিনা অনাদরে পাঁদাড়ে প'ড়ে ছিল! একবার যখন তোমাকে পেয়েছি, তখন আর কিছুতেই ছাড়ছিনে, কেষ্ট বিনে ব্রজ যে অন্ধকার! নাও ভাই, টানো এক পাত্তর—

এক গ্লাস ধেনো সে কথার সঙ্গে সঙ্গেই হৃষীকেশের দিকে বাড়াইয়া দিল।

সত্যি, সেই যে জড়াইয়া ধরিয়াছিল, সেই হইতেই আর ছাড়িল না। থিয়েটার পার্টির সখ কবে মরিয়া নিঃশেষ হইয়া গেল, কেশবের অসামান্য প্রতিভা নানাদিকে প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিন্তু হৃষীকেশের সঙ্গে সম্পর্কটা তাহার রহিয়া গেল সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয়। সত্তরের ফিকে নেশা কবে জমাট হইয়া ষাটে উঠিল এবং ষাট আরো ঘন হইয়া প্রায় নির্জলা আগুনের মতো তীক্ষ্ণ অ্যাল্‌কহল তিরিশে আসিয়া পৌঁছিল। ঘাড়ের ছাঁটটা আরো তিন ইঞ্চি উর্ধে উঠিল, সম্মুখের চুলগুলি আসিল দু' ইঞ্চি পরিমাণে নামিয়া। সখের পাম্প্‌সু জোড়া নাগরায় রূপান্তরিত হইল, ফুলপাড় মিহি ধুতির কোঁচা পায়ের পাতা পর্যন্ত লুটাইতে লাগিল এবং ছিটের সার্ট কবে যে কলারওয়ালা ফিন্‌ফিনে পাঞ্জাবীতে পরিণত হইয়া গেল, সেটা কেউ ভালো করিয়া লক্ষ্যও করিতে পারিল না।

অতএব, সমস্ত অবস্থাটাই অবলীলাক্রমে অত্যন্ত সহজ হইয়া আসিল। একদিন রাত্রে গ্যালনখানিক মদ টানিয়া হৃষীকেশ ফিরিয়া আসিল, চপলাকে কষিয়া একটা লাথি মারিল এবং গয়নাপত্র যাহা কিছু ছিল কাড়িয়া লইয়া তাহাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিল। সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করিল, অমন প্যান্‌পেনে মেয়েমানুষ নিয়ে আমার চলবে না—বেরো আমার বাড়ী থেকে।

তাহার পর দীর্ঘ তিন বৎসরের আর কোনো ইতিহাস নাই। বিয়ের আগে যেমন চলিতেছিল, তেমনিই চলিতে লাগিল। শুধু নিঃশব্দে দিনের পর দিন বয়স বাড়িয়া চলিল, তাহার ছাপ তিন চারিটি সুস্পষ্ট রেখায় বিভক্ত হইয়া যদুপতির মুখে আসিয়া পড়িল এবং পরিবর্তনের ক্রম-প্রলেপ লাগিতে লাগিতে মনের ক্ষতটাও অনেকখানিই মিলাইয়া আসিল চপলার। অভাব অভিযোগ ও ছোটখাটো ভালোমন্দের উপলখণ্ডে আঘাত করিয়া করিয়া গতানুগতিক মন্থর জীবনধারা বহিয়া চলিল,—আবর্ত তাহার এত ক্ষীণ, কণ্ঠ তাহার এত মৃদু যে পারিপার্শ্বিকের জগতে তাহা এতটুকুও সাড়া তুলিতে পারিল না।

কিন্তু সেজন্য ক্ষোভ অবশ্য কোনো পক্ষেরই ছিল না। এই জীবনটাকে দু'জনেই সহজভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ আবার ধূমকেতুর মতো আসিয়া আবির্ভূত হইল হৃষীকেশ।

চপলা হাসিমুখে আসিয়া বলিল, বাবা, আমায় নিতে এসেছে।

লোহার বড় হাতুড়িটা দিয়াই কে যেন যদুপতির বুকের মধ্যে একটা ঘা মারিল ঠন্ করিয়া। ময়লা গামছাটা ফেলিয়া দিয়া ধপ্ করিয়া রোয়াকের উপরেই বসিয়া পড়িল, তারপর শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, এতদিন পরে কি মনে করে ?

চপলা মুখের উপরে লজ্জার হাসি টানিয়াই কহিল, বলছে, ভুল করেছে, আর কখনো এমন করবে না, নেশাটেশা সব ছেড়ে দিয়েছে।

কথাটা কিন্তু বিশ্বাস করা সহজ নয়। হৃষীকেশের সঙ্গে সম্পর্ক আর না থাকিলেও তাহার গুণগ্রাম ও নিত্য নূতন কীর্ত্তি-কলাপ প্রায়ই নানারকম কথা-কাহিনীতে পল্লবিত ও রঙীন হইয়া কানে আসিতেছিল। এত সহজেই তাহার এমন দৈবী উপায়ে পরিবর্তন হইয়া যাইবে, সেটা যেন সম্ভবপর মনে হইল না।

যদুপতি একবার ঠোঁট চাটিয়া বলিল, তুই বিশ্বেস করিস ওর কথায় ?

—সত্যিই এবার বোধ হয় মিথ্যে কথা বলছে না বাবা, মানুষের চোখমুখ দেখে তো বোঝা যায়। এসেই গাড়ি আনতে গেছে। তুমি কী বলো বাবা ?

এমন যে প্রখরা এবং মুখরা চপলা, এই মুহূর্তে সে কী কোমল হইয়াই না উঠিয়াছে! তাহাকে চেনা যায় না যেন। উদ্বিগ্ন ও মিনতিপূর্ণ বড় বড় চোখ মেলিয়া সে বাপের উত্তরের জন্য উৎসুকভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

যদুপতি স্থিরভাবে মেয়ের মুখের দিকে চাহিল, যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল, চপলার সমগ্র মনটাই কাচের মতো স্বচ্ছ হইয়া ওর দৃষ্টির সম্মুখে ধরা পড়িয়া গেছে। আত্ম-প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কীই বা ইহাকে বলা চলে। বিবাহিত-জীবনে চপলা বলিতে গেলে কিছুই পায় নাই, শুধু শূন্যতা, শুধু বেদনার সঞ্চয়ই সেখানে স্তরে স্তরে জমিয়া আছে। চিরকাল ধরিয়া যে কেবল হারাইয়াই আসিল, প্রাপ্তির সামান্যতম সম্ভাবনাটুকুকেও সে কোনোক্রমে অনাদরে দূরে সরাইয়া দিতে রাজী নয়। ফাঁকি তাহার মধ্যে যতটাই থাক না কেন, সে ফাঁক তাহার কাছে সহজে ধরা পড়িবে না, ধরা পড়িবার কথাও নয়। জীবন হইতে যতটুকু রস সে সংগ্রহ করিতে পারে, সেইটুকুই সে নিঃশেষে পান করিবে; সে রস যতখানিই জোলো হোক না কেন, তাহার ভালোমন্দ বিচার করিবার মতো সময় তাহার কোথায়।

কিন্তু উত্তরের জন্য চপলা প্রতীক্ষা করিতেছে। বার বার যদিবা মনে হইল, হৃষীকেশের এই ব্যবহারের মধ্যে ফাঁকি আছে, কিন্তু যদুপতি সে কথা কোনোমতেই বলিতে পারিল না, চিরন্তন চক্ষুলজ্জা যেন কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিয়াছে। বার কয়েক ইতস্তত করিয়া বলিয়া ফেলিল, তা বেশ তো। নিতে এসেছে যখন, যাওয়াই তো উচিত। নিজের ঘর-সংসার, বিষয়-সম্পত্তি এসব ফেলে কতদিন আর এমন দুঃখকষ্টের মধ্যে পড়ে থাকবি বল ?

এবার কিন্তু চপলার চোখ ছল ছল করিয়া আসিল।

—কিন্তু একা একা তোমার ভারী কষ্ট হবে, বাবা!

—আমার? যদুপতি এমন ভাবেই হাসিল যে সে হাসিটা কান্নার চাইতে কোনো অংশেই কম করুণ নয়।

বলিল, আমার আবার কষ্ট কি! যেমন চলছিল, তেমনিই বেশ চ'লে যাবে, একলা মানুষ তো।

কথার সঙ্গে সঙ্গেই ভারী একটা নিশ্বাস বুকের মধ্যে টানিয়া লইল।

বাহিরে একটা গরুর গাড়ি ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করিতে করিতে আসিয়া থামিল এবং নাগরা জুতা মস্ মস্ করিয়া হৃষীকেশ বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। কথার এবং কাজের মানুষ সে,—বেশি সময় নষ্ট করা তাহার অভ্যাসের বাহিরে।

চপলা প্রায় ভুলিয়া যাওয়া ঘোমটা টানিবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া অন্দরের দিকে পলায়ন করিল। হৃষীকেশ ঢিপ করিয়া একটা প্রণাম সারিয়া কহিল, ওদের নিতে এসেছি।

আর, অমনি ভক করিয়া মদের একটা সুস্পষ্ট গন্ধ যেন যদুপতির নাসারন্ধ্রে আসিয়া প্রবেশ করিল। সেই মুহূর্ত্তেই তীব্র প্রতিবাদে ওর মনটা চকিত হইয়া উঠিল, যদুপতি যেন অন্তরের মধ্য হইতে 'না—না' করিয়া প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিতে চাহিল।

কিন্তু আশ্চর্য্য, মুখ দিয়া এতটুকু প্রতিবাদ তো বাহির হইলই না, মুখের ভাবে কতটুকু যে পরিবর্ত্তন ঘটিল, তাহাও সন্দেহের বিষয়। বর্ণহীন, ভাবহীন ঘষা-কাচের মত চোখ দুইটা মেলিয়া সে শুধু বলিতে পারিল, বেশ।

দেখা গেল, কথাবার্ত্তার দিক দিয়া হৃষীকেশও বেশ সংযমী। ভালমন্দ, কুশলপ্রশ্নের আদান-প্রদান করিয়া সেও আর অহেতুক সময় নষ্ট করিতে চাহিল না। বলিল, আজ বিকেলেই তা হলে নিয়ে যাই, দেরি ক'রে আর কাজ কি!

যদুপতির মনে হইল, তাহার কথার মধ্যে বিনীত অনুতাপের চাইতে নিজের অধিকারের দাবীটাই যেন বাজিল বেশি করিয়া,—স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অধিকার।

সমগ্র অন্তরাত্মা আবার প্রতিবাদ করিয়া উঠিল এবং যদুপতি আবার বলিল, বেশ!

যাইবার আগে চপলা ঝর্‌ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। নিতান্ত নিঃসঙ্গ ও অসহায় বৃদ্ধ পিতার মুখের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণের জন্য নিজের প্রশ্নটা যেন গৌণ হইয়া আসিয়াছে।

কিন্তু হৃষীকেশের তাড়া একটু বেশি।

—আর তো দেরি করা যায় না। বেশি রাত হয়ে গেলে গাড়ী আর চলতে পারবে না। পরশুর বিষ্টিতে রাস্তায় যা কাদা হয়েছে, চাকা একবার বসে গেলে ঠেলে তোলা যাবে না আর। বেলা থাকতেই বেরিয়ে পড়া দরকার।

বাক্স বিছানা আগেই তুলিয়া ফেলা হইয়াছে, ওরা উঠিতেই গাড়ী চলিতে সুরু করিল। তারপর গ্রামের চিহ্ন ধীরে ধীরে পিছনে মিলাইয়া যাইতে লাগিল এবং চপলার চোখের জলও স্বাভাবিক ভাবেই শুকাইয়া আসিল।

হৃষীকেশ চিত হইয়া শুইয়া ছিল, এইবারে উঠিয়া বসিয়া ধীরে সুস্থে একটা বিড়ি ধরাইল।

—সত্যি চপলা, তুই ভারী সুন্দরী, না রে ?

চপলার মুখখানা লজ্জায় রাঙা হইয়া আসিল।

—হাঁ, সত্যি। কেশব তোকে দেখে ভারী পছন্দ করবে রে।

—তার মানে ?

হৃষীকেশ নীরবে বিড়িটা টানিতে লাগিল, উত্তর দিল না।

ওদিকে, পথের ধারে দাঁড়াইয়া যদুপতি বহুক্ষণ বিলীয়মান গাড়ির ধুলোর দিকে চাহিয়া রহিল। আত্রাইয়ের সাঁকোটা পার হইয়া, আম-বাগানের আড়ালে আড়ালে আঁকাবাঁকা পথে গাড়িটা ক্রমশ চোখের আড়ালে মিলাইয়া গেল—চাকার অস্পষ্ট শব্দটাও আর শুনিতে পাওয়া যায় না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যদুপতি কামারশালায় ফিরিয়া আসিল।

কয়েকদিন হইতেই বল্লমের একটা ফলা ও গড়িয়া তুলিতেছে, সেইটাকে শাণ দিবার জন্য অন্যমনস্কের মত ঘস্ ঘস্ করিয়া বালির মধ্যে ঘষিতে লাগিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, বাতি জ্বালিবার জন্য এতটুকু তাগিদও ও মনের দিক হইতে খুঁজিয়া পাইল না। অসীম শূন্যতায় সমস্ত বাড়িটা খাঁ খাঁ করিতেছে, এই সত্যটাই সব-চাইতে বড় করিয়া মনে হইতেছে যে চপলা নাই। রান্নাঘরে কাঁচা কাঠের ধোঁয়ায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া কেউ গর্‌গর্ করিয়া উঠিতেছে না, কাল কী রান্না হইবে, সে কথা লইয়া নালিশ জানাইবারও কেহ নাই। চপলা চলিয়া গিয়াছে।

আর সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়িল, চপলা সকালের এক কাঁসি ভাত-তরকারী বড় হাঁড়িটার মধ্যে ঢাকিয়া রাখিয়া গেছে, এ বেলা আর রাঁধিতে হইবে না।

কিন্তু বল্লমের ইস্পাতটা ভাল নয়। কাল এত করিয়া ঘষিয়া ঝক্‌ঝকে করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল, একদিনের মধ্যেই এমন বিশ্রী মর্‌চে পড়িয়া গেছে !

যদুপতি একনিষ্ঠভাবে ফলাটাকে ঘষিয়াই চলিল। অন্ধকারের মধ্যে উজ্জ্বল লোহাটা মাঝে মাঝে হাসিয়া উঠিতেছে।

আশঙ্কা কিন্তু সত্য হইয়া গেল যদুপতির। সুধু সত্যই নয়,—এমন মর্ম্মান্তিক নিষ্ঠুর রূপ লইয়াই আসিল যে, তাহার আঘাতে দেহমন একেবারে পক্ষাঘাতের বেদনায় অসাড় হইয়া গেল। কাঁদিবার মত সহজ অবস্থাটা অবধি নয়।

রাত্রে নাকি চপলার কলেরা হইয়াছিল। মাত্র দু'টি ঘণ্টার বেশি তাহাকে রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই। ভোর হইবার আগেই তাহার লাশ জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

কথাটা শুনিতে সহজ, কিন্তু তীক্ষ্ণ সন্দেহ ও অবিশ্বাসে চতুর্দিকের আকাশ-বাতাস ভারী হইয়া উঠিল। নানা রকমের কাহিনী লোকের মুখে মুখে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। চপলাকে যে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, সেটা এমন সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া নয়,—ইহার পশ্চাতে নাকি কেশবের কী একটা ইঙ্গিত ছিল। চপলা তাহাতে রাজী না হইয়া সোরগোল করিয়া লোক জমাইবার চেষ্টা করে, তাহার ফলে গলা টিপিয়া তাহার কণ্ঠ চিরদিনের মতো রোধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সকলে বলিল, থানায় যাও যদুপতি, পুলিশের গুঁতো লাগলেই সব কথা সুড়সুড় ক'রে বেরিয়ে পড়বে।

কিন্তু যদুপতি পুতুলের মতো নির্বাক ও চিত্রার্পিত হইয়াই বসিয়া রহিল। বেলা বাড়িয়া চলিল,—সামনে সর্পিল পথটা রৌদ্রের আলোয় যেন বাঁকা একখানা তলোয়ারের মতো জ্বলিতেছে, উত্তপ্ত খানিকটা বাতাস এক ঝলক ধূলাবালি উড়াইয়া ওর চোখে মুখে আসিয়া পড়িল।

যদুপতি আবার বল্লমের ফলাটাকে নামাইয়া আনিল।

রাত বেশ ঘন হইয়া আসিতেছে। শুক্লপক্ষের হালকা একখণ্ড চাঁদ মাঠের ওপারে গাছপালার অন্ধকার সীমান্ত-রেখার নীচে নামিয়া গেল, স্তরে স্তরে অন্ধকার দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তারার অনুজ্জ্বল অস্ফুট আলোয় পৃথিবী রহস্যমগ্ন।

পথের ধারে বড় একটা কাঠবাদাম গাছের আড়ালে অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে মিশাইয়া দিয়া যদুপতি দাঁড়াইয়া রহিল। কাঠবাদামের বড় বড় খসখসে পাতায় বাতাসের বিচিত্র মর্মর শব্দ; নীচেই ধানের ক্ষেতে জল জমিয়া আছে, আবদ্ধ জল, ভিজা ধান, মাটি এবং ঘাসের গন্ধ মৃদু হইয়া নাকে আসিতেছিল। পাশেই কোথাও বোধ হয় ধুতুরার ফুল ফুটিয়াছে।

কুটুম-বাড়ি গিয়াছে হৃষীকেশ,—কতক্ষণে সে ফিরিবে! সপ্তর্ষির জিজ্ঞাসা-বৃত্তটা আকাশে আবর্তিত হইতেছে, রাত বাড়িয়াই চলিয়াছে। হাতের বল্লমটা শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া যদুপতি পথের দিকে তাকাইয়া আছে।

বালুরঘাটের দিক হইতে দু'খানা মহিষের গাড়ি চাকার কর্কশ শব্দ করিতে করিতে চলিয়া গেল, তাহাদের আলো দূরে মিলাইয়া আসিল। হাটের ফেরত পাঁচ সাতজন লোক ধামা কাঁধে করিয়া গল্প করিতে করিতে আত্রাইয়ের সাঁকোটা পার হইয়া অন্ধকারের মধ্যে নামিয়া গেল। কাঠবাদামের ডালে ঘুম-ভাঙা একটা কাক চমকিয়া কা কা করিয়া ডাকিয়া উঠিল,—দূরে মাঠের মধ্যে আলেয়া জ্বলিতেছে। কিন্তু হৃষীকেশ এখনো আসিল না।

রাত আরো বাড়িতে লাগিল।

সাঁকোর ওপারে লণ্ঠনের আলো দেখা যায়,—হাঁ, স্পষ্ট বোঝা গেল, হৃষীকেশ আসিতেছে, একাই। গাছের আড়াল হইতে বাহির হইয়া যদুপতি পথের উপর আসিয়া দাঁড়াইল, হাতের মধ্যে বল্লমটা থর থর করিয়া কাঁপিতেছে,—উৎসুক উত্তেজনায় যেন নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতে চায়।

নিজের মনেই কী একটা গান গাহিতে গাহিতে হৃষীকেশ দ্রুতপদে আসিতেছে। সম্মুখে আসিতেই একেবারে মুখোমুখি হইয়া গেল দুজনের। লণ্ঠনের আলোয় হৃষীকেশ যদুপতিকে দেখিতে পাইল এবং তাহার চাইতেও স্পষ্ট করিয়া দেখিল তাহার হাতের বল্লমটাকে। ভীত আতঙ্কে শুষ্ক কণ্ঠে কহিল, আপনি এখানে?

আশ্চর্য্য, হৃষীকেশের সঙ্গে চোখোচোখি হইয়াই যদুপতি ভারী একটা সঙ্কোচ বোধ করিতেছে যেন। মনে হইল, এ ভাবে দেখাটা না হইলেই যেন ভাল হইত। আর দেখাই যদি হইয়া গেল,

তাহা হইলে যদুপতি হৃষীকেশের বুকের উপরে বল্লম তুলিবে কী করিয়া! একটা প্রবল সঙ্কুচিত লজ্জায় ওর অন্যান্য সমস্ত বৃত্তিগুলিই যেন অত্যন্ত বিস্ময়কর ভাবে স্তিমিত হইয়া আসিতেছে।

খানিকটা কৈফিয়তের ভঙ্গীতেই যেন লজ্জিত হাসি হাসিয়া বলিল, না, ছাগলটা রাত্রে আবার কোথায় হারিয়ে গেল কি না, তাই সেটাকে খুঁজতে—

—ওঃ! সংক্ষেপে সাক্ষাৎ-পর্বটা শেষ করিয়া হৃষীকেশ এক রকম অস্বাভাবিক ক্ষিপ্র গতিতে যেন ছুটিয়াই অদৃশ্য হইয়া গেল। বল্লম লইয়া মাঝরাত্রে ছাগল খুঁজিবার সত্যাসত্য সম্বন্ধে সংশয় জাগিলেও সেটাকে সে ঘাঁটাইতে সাহস করিল না।

আর, অন্ধকার পথের পাশে কাঠবাদাম গাছের নীচে যদুপতি স্তব্ধ হইয়া হৃষীকেশের লণ্ঠনের মিলাইয়া আসা আলোটার দিকে চাহিয়া রহিল। নষ্ট হইয়া গেল, একটা অতি মূল্যবান, বহু দুর্লভ সুযোগ এ ভাবে নষ্ট হইয়া গেল।

বল্লমের ইস্পাতটা ভাল নয়,—একটুতেই মর্চে ধরিয়া কেমন বিশ্রী হইয়া যায়!



প্রশ্ন

শ্রীকানাই সামন্ত

কাল দ্বিপ্রহরে অকালিক মেঘে মেত্বর হয়ে উঠল পশ্চিম আকাশ। দেখতে দেখতে হু-হু শব্দে ঝটিকা ছুটে এল ধূসরবসনা ভৈরবী। সমস্ত আকাশে বিজয়কেতনের মত উড্ডীন তার অঞ্চলের আবর্তাঘাতে ঘুরে ঘুরে উড়তে লাগল আয়ুশেষ বৎসরের মৃত আর মুমূর্ষু পত্রপুঞ্জ। হায়-হায় রব উঠল পথের দুধারে শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষের ব্যাকুল ডালপালায়। সব নিয়ে কলকাতা সহরের বুকের উপর 'প্রকাশ্য দিবালোকে' অবিস্মরণীয় এক কাণ্ড। জানিনে রয়টারের দূত বা অমৃতবাজারের নিজস্ব বার্তাবহ সমুপস্থিত ছিল কিনা কেউ। আমি বেরিয়ে পড়লাম তাড়াতাড়ি ছেঁড়া ছাতা সংগ্রহ করে অনাবশ্যক একখানা চিঠি ডাকে দেবার অছিলায়। মুখে চোখে ঝাপটা এসে লাগে দুরন্ত ঝড়ের। প্রবল আপত্তিতে তার ছাতা খুলে চলাই অসম্ভব; সামলাতে যাব, না শিক শুদ্ধ উল্টে যায় কেমন করে। অনেক পরে পরে আসে একখানা ট্রাম দূরের ধূলি কুহেলিকা থেকে মুক্ত হয়ে। বৈদ্যুতিক তারে দ্রুত এগিয়ে আসে একটানা একটা শিশ দেওয়া শব্দ। থামে না; নামে না কোন যাত্রী রুদ্ধশার্শী কক্ষ থেকে: বিনা সম্ভাষণে পাশ কেটে চলে যান বিদ্যুদ্গামিনী। ভিখারীদের কয়েকটা ছেলেকে অন্যদিন দেখি রাস্তার মোড়ে মোড়ে আবর্জনাকুণ্ডে খানাতল্লাসী করতে, রবিবারের সকালে মা-মাসি দাদা-খুড়োর সঙ্গে ভিক্ষাব্রতে বেরুতে, অথবা কদাচিৎ কোন সন্ধ্যায় ফুটপাতের উপর জটলা করে গল্প করতে আর অহেতু কৌতুকে ধূলোয় লুটোপুটি খেতে। তাদেরই কয়েকজন হুল্লোড় করছে পরস্পরের পিছনে ছুটে ছুটে; আস্ফালন করছে ঝড়ে কুড়িয়ে পাওয়া শুকনো ডাল, আছোলা কঞ্চি; ম্লানমূর্ত্তি মলিনবেশ রুক্ষজটা ভূতপ্রেত যেন তাণ্ডবিনী কালীর আনুষঙ্গে মেতেছে বীভৎস উৎসবে। দেখতে দেখতে কোথায় মিলিয়ে গেল। এদিকে কার বাগানবাড়ীতে নারিকেল, সুপারি আর পায়াভারি পামগাছের মহলে পড়েছে সাড়া। নুয়ে পড়েছে সুপারি, হেলে পড়ছে নারিকেল, ধৈর্য হারাচ্ছে স্বভাবগম্ভীর পাম। পুঞ্জপল্লবের ব্যাকুলতায় মনে হয় নৃত্যবেগে কবরী খুলে গেছে কাননকিন্নরীর; পূর্বাচল অভিমুখে সমস্ত তনুভঙ্গীকে উৎসুক করে গান গাইছে সে প্রগল্‌ভ মর্মরে। পশ্চিমের সেই প্রগাঢ় কজ্জলরাগপরিকীর্ণ ধূসরতায় এতক্ষণে আবৃত করেছে সমস্ত আকাশ: এল, ঐ বৃষ্টি এল। জানি আর না জানি সুর, গান জুড়ে দিই উচ্চকণ্ঠে:—

এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো!
বেদনায় যে বান ডেকেছে;
রোদনে যায় ভেসে গো!

আঃ, বাঁচলাম। এ মহানগরীতেও তবে প্রকৃতি বলে কেউ আছে। সবই আপিস আর আদালত, কলেজ আর কাউন্সিল, স্টক এক্সচেঞ্জ আর চাঁদনী চক নয়। এখানে এতই দ্রুত মানুষ চলে, এত দ্রুত কথা বলে, এমন নিক্তিতে ওজন করা হাসি হাসে সৌজন্যের, এমন ওয়াকিবহাল

বিশ্বসংসারের তাবৎ বিষয়ে আর অনবদ্য ভাবে ভাগ করে রেখেছে জীবনকে—ঘরে আর বাইরে, কাজে আর অবকাশে, সাংসারিক বিড়ম্বনায় আর পাইকেরী আমোদপ্রমোদে যে সন্দেহ হয়েছিল থেকে থেকে এ সবের বাইরেও কিছু থাকতে পারে কী করে। হয়তো নেই। অথচ আশৈশব পল্লীগ্রামে মানুষ, তাতে অলসপ্রকৃতি, তাতে আবার বহু বৎসর ধরে রবীন্দ্র-কাব্যের নেশায় বুঁদ। একটানা বৈচিত্র্যহীন এই জীবন নিয়ে আমার চলবে কেমন করে? বাঁচা গেল দুঃস্বপ্ন দূর হয়ে। এখানেও প্রভাত সন্ধ্যা হয় সূর্যচন্দ্রতারার উদয়াস্তক্রমে। ঋতুরমণীরা যথারীতি দূর শূন্যপথে যায় নিরন্ত পরিক্রমায়; স্পর্শপবন অলক্ষে এসে লাগে বুঝি অন্যমনস্ক সহরে। তাই শত অভিমান সত্ত্বেও নির্বাসিত কৃষ্ণচূড়াগুলি রক্তরাগে উৎসুক হয় একদিন চৈত্রে। বকুলে বকুলে অলক্ষ্য ফোটাঝরা অতর্কিত সুগন্ধে কারো না কারো মনোহরণ করে। অনাহূত কালবৈশাখী ক্ষিপ্র শ্যেনের মত বিদ্যুৎচঞ্চুতে ছিনিয়ে নেয় সহরের কাজের বেলাটাকে হঠাৎ কোথা থেকে এসে। নেই বটে কৃষিক্ষেত্র, নেই নদীসরোবর, অকারণ বর্ষা আসে তবু আকাশে; ঝর্ঝর বারিধারায় বিস্মৃতপ্রায় সঙ্গীতে স্থানে স্থানে বীণার মত ঝঙ্কৃত হয় শিরীষ সহকার শ্যামঝুরি। আগমনীর সুর হয়তো শোনা যায় না; বাসের প্রতীক্ষায় থাকতে থাকতেই চোখে পড়ে আকাশের অবিশ্বাস্য নীলিমা। অথবা যে রৌদ্রটি অদূরে পথে লুটিয়ে পড়েছে সমুচ্চ হর্ম্যাবলীর স্কন্ধ থেকে খসে, হেলায় পদদলিত করে যাচ্ছে যাত্রীজনতা, হঠাৎ কোনো কিশোরীর কানের দুলে আর কপোলবিলম্বী কেশগুচ্ছে ঝিকিয়ে উঠতেই লক্ষ্যগোচর হয়। অশ্রুত সানাই ছাপিয়ে ওঠে না, তখন ক্রয়বিক্রয় আনাগোনার অনন্ত কলরব?

মানুষের সীমাবদ্ধ জীবনের চতুর্দিকে এই যে অপরিসীম অবচনা প্রকৃতি, এ তো ছিল মনুষ্য সৃষ্টির বহু পূর্ব থেকেই। যুগে যুগে কবিরা গেয়েছে, শিল্পীরা এঁকেছে, ভাবুকেরা পেয়েছে উপলব্ধিতে—এরই অনন্ত রূপ, অনন্ত ভাব, অভিন্ন রসস্বরূপ। তবু আমাদের দেশে আর আমাদের যুগে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতে নিসর্গ ও নরের অমেয় মধুর অন্তরঙ্গ যে সম্বন্ধটি উদ্ভাসিত হয়েছে, সে যেন সম্ভব হয়নি অন্য কোনো যুগে অন্য কোনো মানুষের সাধনায়। কবি-অনুরাগের অঞ্জন প'রে কী চোখে দেখেছি জগৎ! কী অপরিসীম ভালো লেগেছে! জীবনের অন্য দুঃখ দৈন্য দ্বন্দ্ব হয়তো কিছুই কমেনি তাতে; তবু যখনই ঘর ছেড়ে বা'র হয়েছি পথে অথবা মুক্ত গবাক্ষপথেও চেয়েছি সামনে—হরিৎ শস্যক্ষেত্র, ধূম্রাভ পাহাড়, আরক্ত প্রান্তর, নীলাকাশ, শুভ্র মেঘ, সন্ধ্যাতারা, শুক্লনিশীথ, শাল তাল খর্জুর আর আবদ্ধ পল্বলের কলমিলতাটিও সান্ত্বনা দিয়েছে সকল বিচ্ছেদে বেদনায় আত্মগ্লানিতে। মনে হয়েছে, আমি থাকি আর না থাকি, সুখে বা দুঃখে থাকি, কিছুই এসে যায় না এই সুবিশাল সৃষ্টিতে; অনাদি অনন্তকাল ধরে থাকে তবু তার—সূর্যতারা, দিবারাত্রি, ঋতুপর্যায়, প্রতিক্ষণপ্রকাশিত চিরন্তন শোভা ও শাশ্বত মাধুরী। বিশ্বকাব্যে আমি একটা মুদ্রণ প্রমাদই বা হলাম, কত ক্ষুদ্র সে প্রমাদ, মার্জনা করতে কতক্ষণ! এতও ভাবতে হয় না; মার্জনা হয় অভাবিত আত্মবিস্মরণে। ক্ষণকালের জন্যেও তো হয়। অমনি পরম চমৎকৃত হয়ে দেখি—

নটরাজ নৃত্য করে নব নব সুন্দরের নাটে।

তাই প্রকৃতির এত রূপ, এত ভাব, এত বৈচিত্র্য, অদৃশ্য আনন্দতরঙ্গের নৃত্যময় নিত্য অভিঘাত—শূন্যে

জলে স্থলে। আমাকেও কোথায় নিয়ে যেতে চায় সে স্রোতের টান। দুলিয়ে দিতে চায় বর্ণগন্ধ-গানের বিচিত্র হিন্দোলে।

অন্যান্য ঋণের কথা বাদ দিলাম। শুধু এই যে উপলব্ধিটুকু পেয়েছি রবীন্দ্রকাব্য থেকে এ সৌভাগ্যের তো তুলনা নেই; ভাষা নেই নিখিল হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাবার। মুদ্রিত কাব্যেও শুধু নয়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সুর দিয়েছেন কথায় এবং গানে গানে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছেন 'সোনার বাংলা'র ভূতভবিষ্যৎব্যাপী চিত্তাকাশে। ভূমিস্পর্শবিরহিত ইন্দ্রধনুর মত যদিও তা সুন্দর, তবু তো নয় আশার আলোকের ক্ষণস্থায়ী মায়া। কবি সমস্ত জীবন নিয়োগ করেছেন এই সাধনাতে। কাব্যে দেখি সিদ্ধির রূপ; সাধনার রূপ দেখে ধন্য হয়েছি কবির সাধের আশ্রমে। আমি জানিনে, বুঝিনে, অন্য কোন্ আদর্শ দৈবতের দুর্লভ চরণচিহ্ন কামনা করেছে ঐ অরুণ মাটি। জেনেছি, বুঝেছি এইটুকু—রবীন্দ্রনাথ যে সত্য যে শান্তি যে আনন্দ লাভ করেছেন অপরিসীম অবচনা প্রকৃতি থেকে, প্রকৃতির মাঝখানে প্রকৃতিনাথ নটেশের নিত্য-নূতন লীলার অনুধ্যান থেকে, তারই রূপ দিতে চেয়েছেন পরম আগ্রহে ও দীর্ঘ জীবনের সাধনায় ওখানকার রসাল-শাল-আমলকী-মহুলের কাননে। এক দিকে যার সরোবর, শস্যক্ষেত্র, আঁকাবাঁকা নদী, তালখর্জুরের শ্রেণীর ভিতর দিয়ে গ্রামান্তরগামী ধূসর পথ; অন্য দিকে বালুকঙ্করের উত্তালতরঙ্গস্তব্ধ বিবিক্ত প্রান্তর, শুষ্ক তৃণ, নিঃসঙ্গ তরু, বহু দূর দিগন্তের গায়ে বনলেখার ঊর্ধ্বে বাষ্পলেখাবৎ শৈলশ্রেণী। কবিঋষির একাগ্র আহ্বানে দেশদেশান্তর থেকে এসেছে যারা নবজীবনের আনন্দ নিয়ে ঔৎসুক্য নিয়ে আশা নিয়ে রূপ দিতে চেয়েছেন তাদেরই দেহে মনে প্রাণে—প্রতিদিনের বৈতালিক সঙ্গীতে, তরুতলে ধূপছায়াখচিত পাঠাভ্যাসে, উপাসনায়, উৎসবে, ঋতুতে ঋতুতে নব নব নৃত্যে গানে। একটি বিশাল ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল প্রতিভা পড়েছে সমস্ত আশ্রমে—সকলের নর্মে, কর্মে, ভাবনায়। একটি অপরূপ ভাবরস ছুঁয়ে গেছে তাদের প্রাণ। যায়নি কি? বিশেষ করে দেখেছি ফাল্গুন পূর্ণিমায় আল্পনা-লিখিত আম্রকুঞ্জে শ্বেতশ্মশ্রু কবির সম্মুখে বীণাবেণু মৃদঙ্গের সুরে তালে নেচেছে যখন আশ্রমকন্যারা, মনে হয়েছ ওরা সব কবিরই ভাব, কথা, সুর—মূর্তিমতী। সেই মুহূর্তে আনন্দিতদৃষ্টি কবিও কি অনুভব করেননি ওদের স্বরচিত কবিতা ব'লে? তাই ভাবি। আর ভাবি, রবীন্দ্রসাধনার এক দিকের সিদ্ধি হল কবিতায় গানে যা রয়েছে—আর অবিনশ্বর অবিকৃত রূপে থাকবে; যুগযুগান্তরের জোয়ার ভাঁটার উপর প্রতিভাত দ্যুলোক কুসুমের মত জাগবে চিরকাল; মুছে যাবে না, আবর্তশান্ত সলিলে ফুটে উঠবে বারম্বার নূতন শোভায়। আরেক সিদ্ধি আমাদের জাতীয় জীবনে নিত্যনৈমিত্তিক আচারে আচরণে চেষ্টায়—সুখে দুঃখে—একটি অভিনব সৌন্দর্য্যবোধ ও গভীর প্রকৃতিপ্রীতির সঞ্চার। দুটি একই বস্তু। কিন্তু, ভিন্ন দুটি স্তরে। যা ছিল সর্বাঙ্গসুন্দর সমাহিত চিত্তের প্রসারিত ধ্যানাকাশে, থাকুক; নেমেও আসুক একটু তবু এই মাটির কোলে, ধমনী-ধাবিত রক্তের নিগূঢ় আন্দোলনে, ব্যক্তির বাস্তব জীবনে তথা সামাজিক মেলামেশায়। ভাবি, মানসধ্যানেরও পরবর্তী সোপানে অভীষ্টের এই পুণ্য অবতরণ কতটা সম্ভব হল আর কী পর্যন্ত তা স্থায়ী। জানি, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনকেও রচনা করেছেন কবিতার মত ক'রে। কিন্তু, সকলে তো রবীন্দ্রনাথ নয়।

তা তো নয়ই। এবং তাদের বাস্তব জীবন যে সমস্ত শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে গঠিত নিয়ন্ত্রিত ও অনিবার্য নিয়তি অভিমুখে ধাবিত, কবির এ রসতৃষা সৌন্দর্য দৃষ্টি ও প্রকৃতিপ্রেম তার একেবারেই বাইরে। দিনে দিনে জীবন যে আরো রুটিনসম্মত ও যন্ত্রশাসিত হয়ে উঠবে, তারই তো সম্ভাবনা দেখা যায় চতুর্দিকে। স্বৈর বা সমূহ শাসন যাই প্রবর্তিত হোক দেশে দেশে, জর্মণী বা রাশিয়া যে দেশেরই আদর্শে গড়ে উঠুক রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ভবিষ্যৎ, তাতে ক'রে ব্যক্তির জীবন সহজ আর সুন্দর হবে কি কোনো দিন? অবশ্য নিয়মিত হবে আইনের দ্বারা, সুবিধা ও শৃঙ্খলার একান্ত (?) প্রয়োজনের দ্বারা; কিন্তু, হবে কি স্বাধীন? এতদিন হয়নি কেন ভাবি; কিন্তু ভবিষ্যতে লোক-কল্যাণকৃৎ যে কোনো শাসকগোষ্ঠীর মন্ত্রণায় স্থির হতে তো পারে, প্রকৃতির এই যে আকাশবাতাস রৌদ্রবৃষ্টি গন্ধগান শ্যাম ও সুনীল শোভা যুগ যুগ ধরে এগুলির অপচয় ও অপব্যবহারই হয়েছে কেবল। এখন প্রয়োজন নির্মম সুব্যবস্থা। ফলে রাষ্ট্রের একটা বিপুল আয় হবে; মানুষের শৈথিল্য-প্রবণ মন প্রকৃতির ছলাকলায় আরো শিথিল হতে পারবে না; বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিশোধিত প্রাকৃতিক ছাঁকা সৌন্দর্য বা সুখে যেটুকু প্রজাসাধারণ গ্রহণ করবে, কোনো প্রকার রোগবীজাঙ্কুর সম্ভাবনা মাত্র থাকবে না তাতে; চির-অনিপুণ অব্যবস্থাময়ী প্রকৃতির ঐশ্বর্যভাণ্ডারের জমাখরচের খতিয়ানও একটা পাওয়া যাবে নির্ভুল ভাবে। জাগতিক জীবন অতীব গুরুতর বিষয়। বিজ্ঞান-মূলক পদ্ধতিতে বিচার করে না দেখলে নয়। এ'কে মায়া বলে উড়িয়ে দেওয়া যেমন সভ্যতাদ্রোহ, লীলা বলে অহেতু আনন্দিত হয়ে ওঠাও তেমনি পাপ। খুব সুবিবেচনা ও সুব্যবস্থা চাই। তা দুরূহও নয়। বাষ্পযান, বিমানপোত, শতঘ্নী, সহস্রঘ্নী, রাজ্য, সাম্রাজ্য, চলচ্চিত্র, বেতারবার্তা কী না করেছে মানুষ? আরো কী না করতে পারে?

সত্যই একথা বলা যায়, হঠাৎ যদি বেলা দশটায় গ্রামোফোনের আনুনাসিক স্বরেও বেজে ওঠে, 'আমার নয়ন ভুলানো এলে', মিথ্যে মন খারাপ হয়, একটুও আমাদের সময় থাকে না চোখে চোখে আলাপ করবার। দু'চার মিনিট বিলম্ব হলেই আপিসের মাইনে যায় কাটা। আর, জমিদার মহাজন ডাক্তার-উকিল দৈবজ্ঞ-পুরোহিত বাঁচিয়ে কত কষ্টেই যে আমাদের সংসার চালাতে হয়! লাভ কী তখন ঐ নয়ন ভুলানোর যথা তথা যখন তখন আবির্ভাবে? পেটও ভরে না। তারপর দ্যাখো কাল ঐ যে বৃষ্টিতে ভিজেছিলাম তারই ফলে আমার স্বাভাবিক শ্লেষ্মাটা আরো বেড়ে গেছে; নিউমোনিয়া হয়ে মারা পড়লে তো আর বাঁচব না। অতএব যা রয় সয় তাই ভালো। নিসর্গশোভা অনুশীলনের যোগ্য বটে। কিন্তু, তার জন্যে অর্থ সামর্থ্য ও সময়ের অত্যধিক অপব্যয় কি ভাল? চার আনায় টিকিট কেটে চিত্রায় বা বিজলীতে গিয়ে পটের উপর অনেক প্রাকৃতিক দৃশ্যই দেখা যায়, উপরন্তু অন্য আমোদ লাভ। আদি ও অকৃত্রিম প্রকৃতির জন্যেই যদি মন কেমন করে, প্রত্যেকের পকেট ও প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা হওয়া উচিত। অব্যবস্থা কেন? সমুদয় ক'লকাতা সহরের চৌতলা পাঁচতলা বাড়ীগুলোর মাথা থেকে মাত্র কয়েক বিঘৎ ছেড়ে ঢেকে দাও ঐ অপ্রয়োজনীয় আকাশটা কানাতে বা করোগেটের টিনে। ঘিরে দাও প্রত্যেক বৃক্ষবল্লরী। আচমকা যেন বেকুব দক্ষিণবায়ু ঢুকে বড়বাজার যাত্রীকেও বিভ্রান্ত না করে। হাঁ, ডাক্তারে যদি পরামর্শ দেন, অথবা কদাচিৎ হয়তো নিজেরই একটা সখ হল এবং প্রাচীরপঞ্জীতে দেখা গেল

একেবারে চৈত্রসংক্রান্তিতে পৌঁছে গেছে সম্বৎসরের রথ, আর সময় নেই, তবে তাড়াতাড়ি কোনো নিসর্গসম্ভোগ আপিসে (এ রকম মুহুর্মুহু সময়ে টিকিট কাটবার ফুকোরের মুখে ভিড় হবার সম্ভাবনা, তা হোক) একখানা টিকিট কেটে একটু দক্ষিণহাওয়া গায়ে লাগাতে দোষ কী! তবে সেই সঙ্গে শুক্লতিথির চাঁদ দেখতে হলে নগরাবরণীর উপরের একটা ঘুলঘুলি খোলবার জন্যে হয়তো একটা আনি বা দুয়ানি যথাস্থানে টিপে ধরতে হবে। অতিরিক্ত আরো কিছু অর্থ ব্যয় করে বেল যুঁই হাস্নুহানার গন্ধও মিলবে বিভিন্ন নলের মুখে। তারপর সাতটা পাঁচ মিনিটের বাস ধরে বাসায় ফিরে এসে গল্প করা—গৌরব করা বন্ধুবান্ধবমহলে যে আজ নগদ পাঁচ আনার বসন্তোৎসব করা গেছে। কম নয়। আরো কম হলেই বা ক্ষতি কী? হোমিওপ্যাথিক মতে যত অল্প যত আণবিক মাত্রায় সেবন করা যায় ততই তো হিতকর। ফলকথা, রৌদ্র হোক, বৃষ্টি হোক, বায়ু হোক, কৃত্রিম বা আসল পল্লবান্দোল বা পুষ্পশ্রী হোক আবালবৃদ্ধবনিতা যার যা চাই এক সেকেণ্ডের নোটিশে সেই তা পাবে; আয় বেড়ে যাবে সরকারের; এবং এক্ষেত্রে চাকুরীও তো পাবে অধুনা-বেকার লক্ষ লক্ষ যুবক। তা ছাড়া নিশ্চয়ই চতুর ও অধ্যবসায়ী মাড়োয়াড়ীরা সম্ভাবিতইন্দ্রধনু নীলাকাশ শরৎকৌমুদী বা বিদ্যুৎবিভা এ সবের উপর দুঃসাহসিক স্পেকুলেশন করে হঠাৎ-বাদশা আর হঠাৎ-ফতুর হতে পারবে। এমন একটা মনোহর ভবিষ্যৎ ভাবতেও অশ্রু-স্বেদ-রোমাঞ্চাদি সাত্ত্বিক বিকার ঘটে।

বিষয়ী মানুষ বিশ্বনাথকে ফাঁকি দিয়ে নিজেদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করেচে এ বিশ্বের জলস্থল। ঐ নীল শূন্য কেন বাকি থাকে? ওরই পানে ডানা মেলে ডালপালা মেলে আঁখি মেলে পাখী শাখী আর বাউল মানুষের নিরর্থক আকৃতিটুকু,—কেন তাকে হত্যা করা হয়নি? অল্পমাত্র বিষয়বুদ্ধির চালনায় আয় তো হতে পারে? কেন তবে গরাদের অবকাশে দেখতে পাচ্চি—মাঝে মাঝে ভুলি জেলের নয় জানলার গরাদ—দেখচি, ঐ নামহারা গাছের সবুজ, খোলার ছাদে বেলাশেষের রোদ, মেঘের কিনারে একটি জরির পাড় আর ক্ষুদ্র বিভক্ত হলেও আকাশের চিরন্তন অতলতা? কেন দেখতে দাও, হে মহানগরী, এ প্রশ্নের উত্তর আমি তোমার কাছে চাই।



গতির রূপ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

চলিয়াছে রেলগাড়ী,
পথ ঘাট যেন ছুটিয়া চলেছে—
চলেছে তরুর সারি।
এ যেন কাহার মন্ত্রের বল
অচঞ্চলকে করে চঞ্চল,
স্থাবর স্থাণুকে গতিশীল করে
বন্ধন অপসারি'।

২

গোধূলি স্বর্ণালোকে
ধান্যক্ষেত্রে কনকবন্যা
অপরূপ লাগে চোখে।
গতি-হিল্লোলে ভঙ্গিমাময়
পরিচিত দেয় নব পরিচয়,
জ্যোতি ও গতিতে রূপায়িত আজ
করিছে আনন্দকে।

৩

ছুটে ট্রেণ অবিরত
নদী ও তড়াগ মিলাইয়া যায়
রৌপ্য-রেখার মত।
বেণুর কুঞ্জ, আম্রকানন,
টেনে লয়ে যায় দৃষ্টি ও মন
ছিল এত রূপ, এত লাবণ্য
কোথায় লুক্কায়িত ?

৪

আনমনে ভাবি একা,
আকাশে চন্দ্র-তারকার মালা
গতিরই ত জ্যোতি লেখা।
চঞ্চল এই শোভার পরশ
আনে সুধা, করে ভুবন সরস,
ভাল-করে দেখা না হওয়াই হ'ল
সবচেয়ে ভাল দেখা।



হাঘরে

শ্রীঋষি দাস

গ্রামের সীমান্তে কয়েক ঘর শবরের বাস। পল্লীর অন্যান্য অপেক্ষাকৃত উচ্চবর্ণদের সহিত ইহাদের কোনও সম্বন্ধ নাই। ইহারা যেন আবর্জনা। বস্তিটির তিন দিকে মাঠ; শ'খানেক গজ দূরে সড়কের উপর অশথ গাছের তলায় একটা কুঁড়ে ঘর। এটা মহাদেব নন্দীর তাড়ির দোকান।

কাল হাঘরে-রা আসিয়াছে। ইহারা গেল বছরও আসিয়াছিল। সেই জমিতেই তাঁবু ফেলিয়াছে। দুচারটা গাধা, গোটাকয় কুকুর ও বানর ইহাদের সম্পত্তি। তবু তাহারা এই জনহীন মাঠখানিকে বেশ সজীব করিয়া তুলিয়াছে।

মহাদেব নন্দীর তাড়ির দোকান প্রায়ই মশগুল্ থাকে। শবর পাড়ার অধিকাংশ লোকই তাড়ি খায়। তাহার উপর হাঘরের দল আসিয়া বেচাকেনা আরো বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

সন্ধ্যা। একটা কালি-পড়া হ্যারিকেন মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে। যেন নিতান্ত অনিচ্ছায়। দোকানের সুমুখে বাঁশের খুঁটিতে দড়ি দিয়া বাঁধা লম্বা একটা তক্তা। বেঞ্চি বিশেষ। আসনটির উপর বসিয়া হ্যারিকেনের প্রেতায়িত আলোকে তিনজন থামিয়া থামিয়া ধীরে সুস্থে গেলাসে চুমুক দিতেছিল ও এক একবার কাহার সন্ধানে ঘরের মধ্যে তাকাইতেছিল। গেলাসের তাড়ি শেষ হইয়া গেল, তবুও সন্ধান শেষ হইল না।

আর এক এক গেলাস আসিল। তাহাও শেষ হইল, কিন্তু তবুও ঘরের মধ্য হইতে উদ্দিষ্ট বস্তুটি বাহিরে আসিল না। ট্যাঁকের পয়সাও ফুরাইয়া আসিয়াছিল। একজন লোক একেবারে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সে লাজের মাথা খাইয়া বলিল, 'আজ যে কুসীকে দেখছিনে বড় ?'

মহাদেব একটু হাসিয়া বলিল, 'কুসী তার মামাবাড়ী গেছে।'

তিনজনেরই মুখের উপর দিয়া একটা বিতৃষ্ণার ভাব খেলিয়া গেল। শেষের গেলাসের দামটা যেন জলে পড়িয়াছে!

মহাদেব মুখ টিপিয়া সকলের অলক্ষ্যে একটু হাসিল। কুসী তাহার বিধবা মেয়ে। নাম কুসুমবালা কি কুসুমকুমারী। তাহার দৌলতে দোকানে যে খদ্দেরের একটু বেশী আনাগোনা হয়, সে জ্ঞানটা মহাদেবের ছিল। মহাদেব তাই বিনা বাধায় তাহাকে দোকানে সকলের সুমুখে বাহির হইতে দিত। গাঁয়ে তাই কুসীরও দুর্নামের অবধি ছিল না। আজ কুসীকে না দেখিতে পাইয়া লোক তিনটি নিজেদের দুর্বুদ্ধিকে, মহাদেব নন্দীকে ও কুসীকে মনে মনে গালি দিতে দিতে পথে নামিয়া পড়িল।

লোক তিনটি চলিয়া গেলে মহাদেব দোকানের এক কোণে আবছা অন্ধকারের দিকে চাহিয়া বলিল, 'তোকে এক গেলাস দিব নাকি ?'

নিমাই সঙ্কুচিত গলায় উত্তর দিল, 'দাও এক গেলাস। তোমার পয়সাটা খুড়া, কাল কি পরশু ছিপ বিক্রী হ'লেই দিয়ে দিব।'

নিমাই আবার চুপ করিয়া গেল। তাহার চতুর্দিকে যেমন আবছা অন্ধকার, মনের ভিতরেও বুঝি তেমনি। মহাদেব এক গেলাস তাড়ি আনিয়া দিল। নিমাই নীরবে গেলাসটা নিঃশেষ করিয়া উঠিয়া পড়িল। নিমাই পথে নামিতে যাইতেছিল, হঠাৎ একটি মেয়ে আসিয়া বলিল, 'বউ কেমন আছে ?'

অন্ধকারে নিমাই দেখিতে পাইল না। কণ্ঠস্বর শুনিয়াও বুঝিতে পারিল না। বোকার মত জড়িত গলায় বলিল, 'ভাল।'

'চিনতে পারো নি, নয় ? আমি হাঘরেদের সুখী।'

সুখী আজন্ম বাংলাদেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেশ ভালো বাংলাই শিখিয়াছিল। নিমাই চিনিতে পারিয়া বলিল, 'তোদের তো কই দেখিনি ?'

'হ্যাঁ, মোরা আজ এসেছি। সই কেমন আছে ? সকালে দেখতে যাব ? ছেলে হয় নি ?

'না। কাল্লু কোথায় ?'

'তোমার সাঙাতের কথা বলতেছ ? সে ঘরে। তার তরেই তো তাড়ি কিনব। যাই, দেরী করলে আবার গাল দিবে।

কাল্লু সুখীর স্বামী।

সুখী একটা টিনের গেলাস লইয়া আসিয়াছিল। দোকান হইতে এক গেলাস তাড়ি লইয়াই ছুটিয়া চলিয়া গেল। নিমাই আবার নীরবে কি ভাবিতে ভাবিতে ঘরে ফিরিল।

ঘরে নিমাই-এর বউ দুলী ভাত রাঁধিতেছিল। নিমাই তাহাকে সুখীদের সংবাদটা দিল ও জাঁতায় আগুন ধরাইয়া ছিপ সেঁকিতে বসিল। নিমাই আজকাল বুঝিয়াছে যে, এক গেলাস তাড়ি খাইলে সত্য সত্যই গায়ে জোর আসে। আর সে রাত দুপুর পর্যন্ত ছিপের পর ছিপ সেঁকিতে পারে। তাই প্রতিদিন নিমাই লুকাইয়া লুকাইয়া তাড়ি খাইয়া আসে। দুলী তাহা জানে না। দুলীকে নিমাই ভালও বাসে যতো, ভয়ও করে ততো। কিন্তু সন্ধ্যার সময় তাড়ি না খাইলেও যেন তাহার চলে না। সারাদিনের হাড়-ভাঙা খাটুনির পর রাত্রে আবার কাজ করা একেবারে দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

রাত্রি দুপুর হইয়া গিয়াছে। নিমাই তখনও ছিপ সেঁকিতেছিল। নিমাই খায় নাই বলিয়া দুলীও এখনও খায় নাই। ঘুমে তাহার চোখ জড়াইয়া আসিতেছিল। সে বাহিরে গেল। দেখিল, জাঁতায় আগুনের ডালাগুলা দপ দপ করিতেছে। নিমাইয়ের চোখে ঘুম নাই, কোনও দিকে লক্ষ্য নাই, সে একটা ইস্পাতের নির্জীব যন্ত্রের মতো ছিপ সেঁকিয়া চলিয়াছে। তাহার ক্লান্ত ঘর্মাক্ত মুখে আগুনের লাল দীপ্তি প্রতিফলিত হইয়া মুখখানাকে আরও ভয়ঙ্কর করিয়া দিয়াছে। দুলী নীরবে স্বামীর দিকে এক নিমেষে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার স্বামীর কতো কষ্ট! এই ছিপের উপর তাহাদিগের সমস্ত আশাভরসা। তাও বাজার বড় মন্দা। সে তাহার স্বামীর দুশ্চিন্তার কথা জানে। দুলী আরো অনেকক্ষণ সেখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইল, পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আবার রান্নাঘরে পলাইয়া আসিল ও ভাতের হাঁড়ির পাশে বসিয়া বসিয়া ঘুমে ঢুলিতে লাগিল।

প্রায় তিন চার দিন কাটিয়া গিয়াছে। দুলী সেদিন সকালে স্বামীর পাশে আসিয়া বলিল, 'ভাত খাওয়ার কিচ্ছু নেই। বড়শীটা হাতে ক'রে যাও না, যদি মাছটাছ কিছু পাও।'

নিমাই বড়শী লইয়া মাছ ধরিতে বাহির হইল। নিমাই সারা বেলা ছিপ ফেলিয়া কোথাও কিছু পাইল না। অবশেষে তাহাদিগের ঘরের পিছনের পুকুরটাতে আসিয়া ছিপ ফেলিতে সুরু করিল। হঠাৎ পিছনে শুকনা পাতার মর্মর শুনিয়া নিমাই ফিরিয়া তাকাইল ও মুখ নত করিয়া লইল। কুসুম।

নিমাই পরে মাথা তুলিয়া বলিল, 'কি ?'

'বাবা তোমাকে এক্ষুণি ডাকতেছে।'

'কেন ?'

'ভারী দরকার। যাবে ত ?'

কুসুমের দুর্ণামের কথা নিমাইয়ের অজানা ছিল না। এই নির্জন পুকুরের ঝোপের ধারে এরকম ভাবে পাশাপাশি দাঁড়াইতেও নিমাইয়ের সারা দেহটা লজ্জায় শিহরিয়া উঠিল। কুসুম পলাইলেই সে যেন বাঁচে। কিন্তু কুসুম তবুও নড়ে না। সে বলিল, 'কি মাছ পড়ছে ?'

'কিছু না।'

নিমাই দুএক পা করিয়া দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। ইস্, দুলী যদি তাহাদিগকে এই অবস্থায় দেখিতে পায় সে কি ভাবিবে ? নিমাইকে দূরে সরিয়া যাইতে দেখিয়া কুসুম চলিয়া যাওয়ার উপক্রম করিল ও গলাটা উঁচাইয়া বলিল, 'যেয়ো কিন্তু। না গেলে ভারী অন্যায় হবে। সত্যি, অনেক দেবতার দিব্যি।'

কুসুম চলিয়া গেল। নিমাই যে ভয় করিতেছিল, ঠিক তাহাই হইল। দুলী ঘাটে স্নান করিতে আসিতেছিল, হঠাৎ তাহার স্বামীর সহিত একটা মেয়েকে এই নির্জনে কথা কহিতে দেখিয়া সে একটা সজনা গাছের গোড়ায় থমকিয়া দাঁড়াইল। কুসুমের শেষ কয়টা কথা দুলীর কানে গেল। তাহার সমস্ত দেহটা কাঁপিয়া উঠিল, রাগে ও অভিমানে। সে ঘাটে স্নান করিতে গেল না। ছুটিয়া ঘরে পলাইয়া আসিল। কিন্তু তবুও যেন সে তাহার স্বামীকে কোন রকমে অবিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। সে যাহা দেখিল, শুনিল, তাহা সব কি তবে মিথ্যা ? কিন্তু কেমন করিয়া হয় ? কেহ যদি তাহাকে এইটুকু বুঝাইয়া দিত, তাহার স্বামী নির্দোষ অকলঙ্ক। দুলী কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহার বুকের মধ্যটা একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় হাহাকার করিয়া মরিতে লাগিল।

নিমাই ঘরে ফিরিয়া বলিল, 'কিছু পাইনি বউ, যা ইচ্ছে তোর রান্না কর।' দুলী রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিল না। নিমাই দুলীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, 'একবার আসি।'

দুলী কিছুই উত্তর দিল না। রাগ ও অভিমান-উদ্বেলিত বুকখানাকে কোনরূপে চাপিয়া বসিয়া রহিল।

নিমাই মহাদেব নন্দীর দোকানের উদ্দেশে চলিল। মহাদেবকে তার ভারী ভয়। তাহার কথা না রাখিলে, সে নিশ্চয় ধার দেওয়া বন্ধ করিয়া দিবে।

মহাদেব নিমাইকে দেখিয়া বলিল, 'কুসী আর থামতে দেয়নি। হাতেও একটা কাণাকড়ি নেই যে'···মহাদেব হঠাৎ কথার মোড় ফিরাইয়া লইল, 'আর একটা কাপড় কিনতে হবে। কাল তো তোর ছিপ বিক্রি হোলো, দে গোটা দেড়েক টাকা, কাপড় একখানা কিনে দি।'

নিমাই ইহাই আশা করিয়াছিল, মহাদেব তাহাকে টাকা চাহিবে। নিমাই বলিল, 'আচ্ছা দিব।'

মহাদেব বলিল, 'হ্যাঁরে তুই আজ বাজার যাবি? যাস তো, কাপড়খানা তুই নিজেই কিনে আনিস বাবা, তাহ'লে আর আমি বুড়ামানুষ কষ্ট ক'রে যাইনি।'

নিমাই বলিল, 'আনব।'

কুসুম ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া বলিল, 'বেশ মিহি, চওড়া কাল পাড়...'

নিমাই কিছুই কহিল না। একটা ছায়ার মত ওখান হইতে সরিয়া গেল। ছিপ বেচিয়া সে মাত্র গোটাচারেক টাকা পাইয়াছিল। এমাসের খাওয়ার চাল পর্যন্ত ঘরে নাই। অথচ উপায় কি? নিমাইয়ের মুখের উপর দুশ্চিন্তার কাল ছায়াটা আরো কাল হইয়া ঘনাইয়া উঠিল। সেদিন সারা দুপুরটা দুলী ভাল করিয়া নিমাইয়ের সহিত কথা কহিল না। তাহাকে এড়াইয়া এড়াইয়া চলিল।

বিকালের দিকে নিমাই দুলীকে বলিল, 'বউ, একটা টাকা দে।'

নিমাই দুলীর কাছেই তাহার টাকাপয়সা সব রাখে। দুলী বলিল, টাকা কি হবে?'

ধার করিয়া তাড়ি খাইয়াছে, তাহা শুধিতে হইবে, নিমাই এ কথা দুলীকে বলিতে সাহস পাইল না। কি বলিবে হঠাৎ খুঁজিয়াও পাইল না। সংক্ষেপে বলিল, 'কাজ আছে।'

অন্যান্য দিন না জিজ্ঞাসা করিতে নিমাই সমস্ত কথাই দুলীকে বলিত, আজ জিজ্ঞাসা করিতেও সে স্পষ্ট করিয়া কিছুই কহিল না। দুলী আহত হইল। কিছুই কহিল না। নীরবে নিমাইয়ের হাতে একটা টাকা আনিয়া দিয়া পলাইয়া গেল। তাহার কান্না পাইতেছিল, সত্যই কি সে তাহার স্বামীর কাছে পর হইয়া গিয়াছে?

এই কয়দিন সুখী প্রায় প্রত্যহ একবার না একবার আসে। পরদিন সকালেও সে আসিয়া পৌঁছিল। সুখী লালপেড়ে একটা নূতন শাড়ী পরিয়াছে। সুখী দুলীর পাশে আসিয়া বলিল, 'কই, তোর কাপড় দেখি?'

দুলী বিস্মিত হইয়া বলিল, 'কাপড়?'

'ঢং করিসনি; কাল্লু বলল যে?'

'কি?'

'সাঙ্গাৎ তোর তরে কাপড় আনছে। দুজনে এক সাথে কিনছে। কাল ফুল পাড়।'

দুলী কিছুই বুঝিতে পারিল না, বলিল, 'দূর!'

কিন্তু পরমুহূর্তেই কতকগুলা বিষাক্ত চিন্তা তাহার মনের উপর দিয়া বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল। তাহার মুখখানি কাল ও গম্ভীর হইয়া উঠিল, সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, 'তুই যা ভাই, আমি নাইতে যাব।'

'এতো সকালে?'

'হ্যাঁ।'

দুলী আর কোনও কথা না কহিয়াই রান্নাঘরে ঢুকিয়া গেল। সুখী বাধ্য হইয়া বিদায় হইল। দুলী রান্নাঘরের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার স্বামী নিশ্চয় কুসুমের জন্য কাপড়

আনিয়াছে। এইজন্যই কাল টাকা চাহিবার সময় সে তাহার কথায় ভাল করিয়া উত্তর দিল না। ছুলীর চোখের সুমুখ হইতে যেন সমস্ত পৃথিবীটা মুছিয়া গিয়াছে। সে আরো কয়েক মুহূর্ত তেমনি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে কি করিবে না করিবে কিছুই খুঁজিয়া পাইল না।

আরো অনেকক্ষণ কাটিল। কুসী প্রায় এই সময় প্রতিদিন ঘাটে স্নান করিতে আসে। আজও নিশ্চয় আসিবে। তাহার স্বামী যদি তাহাকে সত্যই কাপড় কিনিয়া দেয়, তবে তাহা পরিয়া যে সে ঘাটে আসিবে, একথা বার বার ছুলীর মনে হইল। ছুলী ঘরে তালা দিয়া ঘাটের দিকে আসিল। কুসুমের স্নান শেষ হইয়া গিয়াছে। সে ঘাটের উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। ছুলী দেখিল, তাহার কাঁধে একটা নূতন কাপড়, কাল পাড়, কাপড়খানা সে এখনি কাচিয়াছে। ছুলীর আর অবিশ্বাস করিবার কিছুই রহিল না। সে যেন একটি মুহূর্তে জুয়াখেলায় সর্বস্ব হারিয়া গিয়াছে। কিছুই অনুভব করিবার মত ক্ষমতা তাহার ছিল না। সে ঘরে পলাইয়া আসিয়া খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বুকের মধ্যে কি একটা অব্যক্ত ও অননুভূত যন্ত্রণা হইতেছে। তাহার মনটা যেন বুকের মধ্য হইতে কণ্ঠ অবধি ফুলিয়া উঠিয়া কণ্ঠরোধ করিয়া দিয়াছে। সে বুঝি হাঁফ ছাড়িয়া কাঁদিতে পারিলেই বাঁচিত। কিন্তু কান্না আসিল না। বুকের মধ্যে যেন একটা পাথর বসিয়া গিয়াছে, তাহা সারাজীবন ধরিয়া বুকখানাকে নিষ্পেষিত করিয়া দিবে, কোনওদিন সরিবে না।

ছুলী একথা কাহাকেও বলিল না। এ যে তাহার নিজেরই গ্লানি, অপমান, পরাজয়, লজ্জা। নিমাইকেও কিছুই কহিল না। ছুলী সংসারের কাজকর্ম যেমন করিত তেমনি করিয়াই চলিল। কাজকর্ম লইয়াই তাহার যত ব্যস্ততা। সে নিমাইকে যতটা পারিল, এড়াইয়া চলিল। তাহার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিল না। কথার উত্তরে সহজে উত্তর দিল না। ছুলীর এই বিরক্তি নিমাইকে যথেষ্ট আঘাত করিল। এই দৈন্যপীড়িত জীবন, সুধু যুদ্ধ আর যুদ্ধ—শান্তি নাই, স্বস্তি নাই। ছুলীর কাছে থাকিয়া সে একটু আনন্দ পাইত, তাহাও নিঃশেষ হইয়া আসিল। কেন সে তাহার সহিত ভাল করিয়া কথা কয় না।···কেন সে তাহার উপর এমন বিরক্ত হয়?···কেন তাহার এই নিষ্ঠুর পরিবর্তন?···নিমাই বুঝিতে চাহিয়াও বুঝিতে পারিল না। ছুলীর এই পরিবর্তনে নিমাইএর বুকের ভিতরটা থেঁৎলাইয়া গেল। নিমাই বাধ্য হইয়া ঘর ছাড়িয়া পাড়ায় ও মহাদেবের তাড়ির দোকানে বাসা বাঁধিল। সারাদিন সে বাহিরে বাহিরে থাকে, রাত্রে দুপুরের আগে ঘরে ফিরে না।

এমনি করিয়া ইহাদের জীবনে একটা বেদনার কালো মেঘ ঘনাইয়া উঠিল।···

কয়েকদিন পরে সুখী বিকালের দিকে আসিয়া বলিল, 'আজ শেষ রাতে মোরা চলে যাব।'

'কোথায়?'

'তা কেমন ক'রে বলি? হাঘরে-দের কি কিছু ঠিক থাকে? দক্ষিণ দিকে যাব।'

ছুলী কিছুই কহিল না। দূর দিগ্‌বলয়ের দিকে উদাস চোখে চাহিয়া বসিয়া রহিল। সুখী একটু হাসিয়া কহিল, 'তুই বড় দুষ্টু।'

ছুলী জিজ্ঞাসু চোখে সুখীর মুখের দিকে চাহিল।

সুখী আবার একটু হাসিল, 'কাপড় দেখতে চাইলাম, দেখতে দিলে কি হতো? কাপড়টা খেয়ে যেত?'

দুলী চেষ্টাসত্ত্বেও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিতে পারিল না। সে আগের মতই দূরের দিকে চাহিয়া রহিল। সুখী বলিল, 'কি ভাবতেছিস ?'

দুলী কহিল, 'আমি তার কে যে সে মোর তরে কাপড় আনবে ?'

কণ্ঠস্বরে অভিমান ও বেদনার নিবিড়তা।

সুখী অবাক হইয়া বোকার মত বলিল, 'তবে কার তরে ?'

দুলীর চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া আসিল। সে আঁচলে মুখ মুছিয়া বলিল, 'আমি তার কেউ নয়, পর হ'য়ে গেছি। সারাদিন সে ঘরে থাকেনি, কত রাত ক'রে ফিরে।...'

সুখী ব্যাপারটা কতক পরিমাণে বুঝিল। সে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'তুই কাঁদিসনি বউ। মোরা কত ওষুদ জানি। একটা শিকড় দিলেই আবার উ ভাল হ'য়ে যাবে।'

দুলীর ব্যথার সমুদ্রে আনন্দের ঢেউ খেলিয়া গেল। তাহার ঠোঁট দুটি আশার ইঙ্গিতে ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল। সে বলিল, 'সত্যি এমন শিকড় তোদের আছে ? কুসীও বোধ হয় অকে ওষুদ কচ্ছে।...কখন ওষুদ দিবি, বল্। তোরা যে আবার চলে' যাবি ?'

সুখী বলিল, 'কাল্লু জবর ওষুদ জানে ; অকে জিগ্যেস ক'রে বলে' যাব।'

'কখন ?'

'এখন সে গাঁয়ে মাগতে গেছে। ফিরতে রাত হবে। ফিরলে তারপর ?'

দুলী আকুলভাবে সুখীর হাতদুটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'সত্যি দিবি তো, না হ'লে আমি বিষ খেয়ে মরব। তোর দিব্যি ক'রে কইছি সুখী, আমি বিষ খেয়ে মরব।'

'তুই কাঁদিস্‌নি। এ শিকড়ের গুণ ভারী, তোর ভয় নেই।'

সারা সন্ধ্যাটি দুলী সুখীর পথ চাহিয়া রহিল। তাহার কোনও কাজে মন বসিতেছে না। দুলী দুই চারিবার ঘর ও বাহির করিল। নিমাই এখনও ফিরে নাই। যত বিলম্ব হইতেছিল, দুলীর আর ধৈর্য থাকিতেছিল না। দুলী ঘর হইতে বাহির হইয়া মাঝে মাঝে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকার, চতুর্দিক অন্ধকার। তখনও চাঁদ উঠে নাই। দুলী সেই অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইল না। সে আবার হতাশ হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল ও রান্নাঘরে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এমনি করিয়া দুইঘণ্টা কাটিল। হঠাৎ কপাট খুলিবার শব্দে দুলী চকিত হইয়া রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিল। আবছা অন্ধকারে দুলী দেখিল কে যেন রান্নাঘরের দিকে আগাইয়া আসিতেছে। দুলী তাহাকে চিনিবার আগেই, সে ফিসফিস করিয়া বলিল, 'বউ, ইদিকে আয়।'

সুখী।...

দুলী অগাধ সমুদ্রে যেন একটা ভেলা পাইয়াছে। সে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, 'ওষুদ কই ?'

'আছে। আগে দোরে খিল দিয়ে আয়।'

দুলী দরজা বন্ধ করিয়া খিল দিয়া আসিল। সুখী আঁচল্ হইতে ইঞ্চিখানেক পরিমিত একটা মূল বাহির করিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, 'এই শিকড়টা খাবাতে হবে।'

দুলী সন্তর্পণে শিকড়টা হাতে লইল ও চাপাগলায় বলিল, 'কি ক'রে খাওয়াব ?'

'কেন, বেটে ডাল কি তরকারীর সঙ্গে।'

ঢুলী বলিল, 'আজই, কেমন ?'

'হ্যা, যখন ইচ্ছা।' সুখী তাহার গলাটাকে অপেক্ষাকৃত নীচু করিয়া বলিল, 'খবরদার, জানতে দিস্‌নি যেন। জানতে পারলে এর কিছু ফল হবেনি।'

ঢুলী সাবধানে শিকড়টা আঁচলে বাঁধিল। সুখী চাপাগলায় আরো অনেক উপদেশ দিতে লাগিল। ঢুলীর ভয় করিবার কিছুই নাই, এ ওষুধের গুণ ভারী, কত খারাপ লোক পর্য্যন্ত ভাল হইয়া গিয়াছে। ইত্যাদি।

ঠিক এই সময় হঠাৎ সদর দোরের শিকলটা ঝন্ ঝন্ করিয়া নড়িয়া উঠিল। কে যেন দোরটা ভাঙিয়া ফেলিতে চাহে। ঢুলী ও সুখী দু'জনেই আতঙ্কে শিহরিয়া রুদ্ধ কপাটটার দিকে চাহিল। বাহির হইতে বিকৃতকণ্ঠে সাড়া আসিল, 'দোর খুল।'

গলার শব্দ শুনিয়া বুঝিল যে নিমাই ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু নিমাইএর গলার এইরূপ অস্বাভাবিক স্বরে ঢুলী বিস্মিত হইল। সে তাড়াতাড়ি কপাট খুলিতে গেল। সুখী ঢুলীকে বাধা দিয়া চুপি চুপি বলিল, 'থাম, আমি পালাই। নাহলে, সব পণ্ড হবে যে ?'

সুখী খিড়কির দোরটা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। ঢুলী আসিয়া সদর দরজাটা খুলিয়া দিল। নিমাই এক ঝলকা ঝোড়ো হাওয়ার মত ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। ঢুলী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ভীত হইয়া উঠিল। নিমাইকে যেন ভূতে পাইয়াছে। অদ্ভুত তাহার চেহারা। নিমাই বিকৃত ও ক্রুদ্ধ গলায় বলিল, 'কে, ঘরে কে ?'

নিমাইএর কণ্ঠস্বরে ঢুলীর অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। সে স্বামীকে বশ করিবার জন্য সুখীর সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছিল, একথা সে কি করিয়া বলে ? তাহা ছাড়া ঢুলী নিমাইকে কখনও এভাবে দেখে নাই। সে ভীত কম্পিত গলায় বলিল, 'কেউ না।'

নিমাই দেখিল, খিড়কির দরজাটা খোলা পড়িয়া আছে। আর দরজা খুলিবার শব্দটাও সে পাইয়াছিল।

'কেউ না ?' নিমাই পাগলের মত দৃঢ় ও কঠিন হস্তে ঢুলীর ডান হাতখানা চাপিয়া ধরিল। 'তবে কার সঙ্গে তুই ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা কইছিলি পাজী মাগী ?'

নিমাইএর কণ্ঠস্বর ক্রোধে কাঁপিতেছিল। তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। ঢুলীর মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। নিমাইএর হাতের মধ্যে তাহার দুর্বল হাতখানা শিথিল হইয়া গেল। তাহার নিজেরও যেন কোনও সংজ্ঞা ছিল না। নিমাই আর কোনও কথা কহিবার আগেই ঢুলীর চুলে ধরিয়া সজোরে ঝাঁকানি দিল ও ধাক্কা দিয়া মাটির উপর ফেলিয়া উন্মত্তের মতো প্রহার করিতে সুরু করিল। ঢুলী মাটিতে পড়িয়া গোঁঙাইতে লাগিল। তাহার চীৎকার করিবার বা নিমাইকে বাধা দেওয়ার মত ক্ষমতা ছিল না। নিমাই অশ্রান্তভাবে চড়, কিল, লাথি যাহা পারিল, তাহা দিয়াই ঢুলীকে মারিয়া চলিল। সে আজ ঢুলীকে খুন করিবে। নিমাই মারিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল। ঢুলী তখনও গোঁঙাইতেছে। নিমাই হাঁপাইতে হাঁপাইতে রোষকম্পিত গলায় বলিল, 'শয়তান মাগী। ভিতরে ভিতরে এত। উঃ।'

নিমাই যেন আর্ত্তনাদ করিতেছে।

সে আর একটি মুহূর্তও সেখানে না দাঁড়াইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

এই একটু সময়ের মধ্যে যে কি ঘটিয়া গেল, তুলী তাহা তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছে না। এ যেন একটা দুঃস্বপ্ন! তুলী উঠিতে চেষ্টা করিল। তাহার সর্বাঙ্গে ব্যথা বোধ করিতেছে। গায়ের কাপড়খানা খুলিয়া গিয়াছিল। সে কাপড়খানা কোনও রকমে জড়াইয়া টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। তুলী গায়ের ব্যথা উপেক্ষা করিয়া ঘরের বাহিরে আসিল। দেখিল, তাহার স্বামী পাড়ার লোকজন ডাকিয়া লইয়া ঘরের দিকে আসিতেছে। পাড়ার মাতব্বর হইতে ছেলে মেয়ে সবাই। আলো, লোকজন, কথাবার্তা। তুলী অন্ধকারে ঘরের বাহিরে দেওয়ালের পাশে গিয়া লুকাইল।

নিমাই বলিতেছে, 'শয়তান মাগী, খুন করলেও শান্তি হোত!'

একজন বলিল, 'কোথা সে শালী, খুব ক'রে ঘাকয় দিছিস তো?' আর একজন বলিল, 'কে লোকটা বলত?'

নিমাই বলিল, 'ক্যামনে জানি! জানলে কি আর বেঁচে যায়? দা দিয়ে কেটে কুচিয়ে দিতাম।'

সকলে ঘরে ঢুকিয়া গেল।

তুলীর মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল। একটি মুহূর্তে এ কি হইয়া গেল? তুলী তাহার দুর্বল মাথাটাকে দেওয়ালে ঠেকাইয়া কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল:

'কোথা গেল মাগী?'

'কোথা যাবে আবার? খুঁজে বের কর শালীকে। লোকটার নাম জানলেই হোল, পাড়ার কেউ বোধ হয়।'

নিমাই বলিতেছে, 'আমি তাকে খুন করব। তবে আমার গায়ের জ্বালা মিটবে! পাজী মাগী!'

তুলীকে সকলে মিলিয়া খুঁজিতেছে। এতোগুলা লোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে কি বলিবে? তাহার স্বামীর এ অবিশ্বাস সে কেমন করিয়া ভাঙিতে পারে? সুখীর কথা বলিবে? তাহা কে বিশ্বাস করিবে? এতোগুলা লোকের সমুখে তাহার কথাগুলা স্রোতের টানে ঝরা পাতার মতোই ভাসিয়া যাইবে মাত্র।

'পালিয়েছে।'

'কোথা যাবে?'

নিমাই বলিল, 'থাক থাক, গেলেই আমি বাঁচি। ওকে আর ঘরে উঠতে দিব আমি? মরলেও না! অমন স্ত্রীর মুখ যদি দেখি তবে ত আমি বাপের ব্যাটা নয়।'

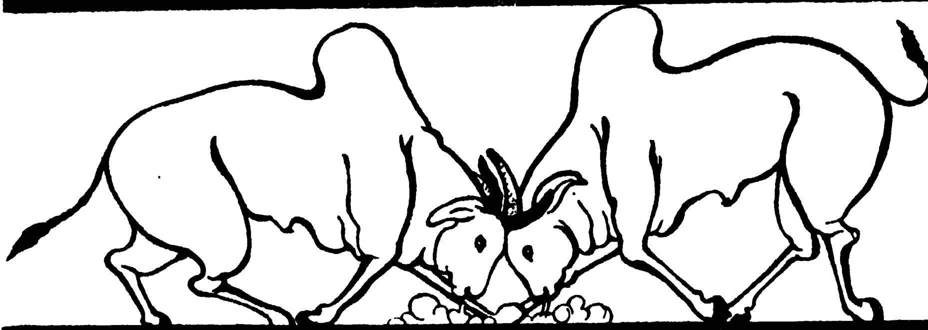
তুলীর চতুর্দিকটা ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সমস্ত জগৎটা অন্ধকার। তুলী কী করিবে? সে মেয়েমানুষ, একলা। এতোগুলা লোকের বিরুদ্ধে সে কি করিতে পারে? তাহার স্বামীর কাছে ফিরিবার মতো উপায় নাই। তাহা ছাড়া কাল পাড়াতেই বা মুখ দেখাইবে কি করিয়া? তুলী নিঃসহায়ের মত মাটিতে বসিয়া পড়িল। একি কলঙ্ক! একি অপবাদ! উঃ! মানুষের অজ্ঞতার বিরুদ্ধে মানুষের শক্তি কতটুকু?

এমনি ভাবে তুলী অনেকক্ষণ বসিয়া ছিল। হঠাৎ যেন তাহার নেশা ভাঙিল। তুলী দেখিল, সকলে চলিয়া গিয়াছে। নিমাই-এর কোনও সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। সমস্ত ঘরখানা মৃতের মত নিস্তব্ধ। পূবদিকে চাঁদ উঠিয়াছে। তাহারই ক্ষীণ আলোক চতুর্দিকে পড়িয়া একটা অবলোকের সৃষ্টি করিয়াছে। তুলী কি করিবে? কোথায় যাইবে? স্বামীর কাছে? কিন্তু এই অপবাদের বোঝা মাথায় লইয়া তাহার আর ফিরিবার কি উপায় আছে? তুলী সেখানে মাটিতেই তাহার উত্তপ্ত মাথাটা গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। তুলী অনেকক্ষণ কাঁদিল। তাহার ভাগ্য যখন সত্যই খারাপ, সে এ মুখ আর কোনও দিন তাহার স্বামীকে দেখাইবে না। আজ শেষ বিদায়। তুলী ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু কোথায় যাইবে সে? যেদিকে দুচোখ যায়? হঠাৎ তুলীর মনে পড়িল, কেন, তাহার সই আছে। সে তাহাদিগের সঙ্গেই যাইবে। তাহাদিগের মতোই ভিক্ষা করিয়া সারা জীবনটা কাটাইয়া দিবে। কিন্তু এই ঘরের মায়া ও এর সমস্ত অতীত যেন তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়াছে। তুলী আরো অনেকক্ষণ সেখানে পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিল। সপ্তমীর চাঁদ ধীরে ধীরে উপরে আসিল। রাত্রি আর খুব বেশী ছিল না। তুলী ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাঘরের তাঁবুর দিকে চলিল।

তুলী তাঁবুর ময়দানে আসিয়া দেখিল, সেখানে হাঘরেদের কোনো চিহ্নও নাই। তাহারা তাঁবু তুলিয়া শেষরাতেই চলিয়া গিয়াছে। সেই নির্জন ফাঁকা মাঠটাতে তুলী স্পন্দনহীন হইয়া কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া রহিল। চারিদিকের ধূসর মাঠ জ্যোৎস্নার ফিকে অস্বচ্ছ আলোয় প্রেতের মতো দেখাইতেছে।

তুলী নিজের অজানায় দু'এক পা করিয়া চলিতে লাগিল। সে কোথায় যাইতেছিল ঠিক নাই, কোথায় যাইবে জানে না। ইচ্ছাহীন, উদ্দেশ্যহীন। উপরে আকাশ, পায়ের তলায় পৃথিবী, এই তাহার আশ্রয়। সে স্বামী হারাইয়াছে, ঘর হারাইয়াছে, সব হারাইয়াছে। হাঘরেরও ঘর আছে, স্বামী আছে, স্নেহ আছে, মমতা আছে। কিন্তু তাহার যে কিছুই নাই! সে হাঘরেদেরও হাঘরে!

জড়িত পায়ে তুলী উদ্দেশ্যহীন ভাবে পথ চলিতে লাগিল।.....



প্রগতি-সাহিত্য

শ্রীশুভেন্দু ঘোষ

"The aesthetic activity can always agree with the practical, because expression is truth" (ক্রোচে), কিন্তু "There is no sense in pursuing a literary career as though one were operating a bombing plane" অর্থাৎ,

রসের বস্তু প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে ; তাই বলে, সাহিত্য-সৃষ্টিতে বোমারু বিমান চালানোর ভাব নিয়ে আসা ভুল।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ, বিশেষতঃ বিগত মহাসমরের পর হ'তে মানুষের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে একটা প্রচণ্ড বিপর্য্যয় দেখা দিয়েছে ; বিগত শতাব্দীর বার্ত্ত জীবনে যা পরম সত্য বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল, সেই ধনিকতন্ত্রের বনিয়াদ শিথিল হয়ে পড়েছে ; রুশিয়ায় তা বিধ্বস্ত হয়েছে ; অন্যত্র রাজশক্তির খুঁটির উপর ভর করে' টাল খেয়েও দাঁড়িয়ে আছে। বিগত শতাব্দীতে ধনিক-প্রধান গণতন্ত্রের মন্ত্রে মানুষ বশ মানত, এ যুগে তা লোকচক্ষে মর্য্যাদা হারিয়েছে।

বাস্তব জীবনের এমনি নানান অভিজ্ঞতা মানুষকে তার জীবনদর্শন বদলে ফেলতে বাধ্য করছে, তার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নূতন রূপ দিচ্ছে, তার রুচির পরিবর্ত্তন ঘটাচ্ছে, রসানুভূতির নূতন বিষয়-বস্তু উপস্থিত করছে। একটা নূতন জীবনের কখনো নিষ্প্রভ কখনো প্রোজ্জ্বল স্বপ্ন তাকে সম্মুখের দিকে ঠেলে চলেছে।

ধনিকতন্ত্র এখনও উন্মুলিত হয় নাই। বাঁচার তাগিদে সে পক্ষ হতে পুরানো জীবন-দর্শন, পুরানো ধরণ-ধারণ, পুরানো রুচি প্রভৃতি বজায় রাখার প্রবল প্রচেষ্টা চলেছে। স্বাভাবিক ভাবে সেটা সম্ভব নয়, তাই রাষ্ট্রিক ও আর্থিক প্রাধান্যের আশ্রয় নিয়ে, নূতনের জন্যে আইনের শৃঙ্খল তৈরী করে', শিক্ষা ও সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণ করে'।

জীর্ণতাকে জয় করে' জীবন তবু এগিয়ে চলেছে ; বর্ত্তমানের অনিশ্চয়তা ভেদ ক'রে নূতনের অঙ্গীকার ফুটে উঠছে ; মানুষের মনে নূতন আশা ও নূতন বিশ্বাসের সঞ্চার হচ্ছে। যে সাহিত্যে জীবনের এই জয়যাত্রা রূপায়িত, তারই নামকরণ হয়েছে প্রগতি সাহিত্য।

আমাদের দেশেও বাস্তব জীবনের অভিনব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে একটা নূতন সাহিত্য গড়ে উঠছে। নূতন ভাব ও চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তদুপযোগী 'আঙ্গিক' পরীক্ষিত হচ্ছে ; বিষয়-বস্তুতেও অভিনব রুচির পরিচয় মিলছে ; নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গী ও নূতন সমালোচনারীতি দেখা দিচ্ছে।

কিন্তু প্রগতি সাহিত্যের নামে যা কিছু চলছে, তাকেই খাঁটি জিনিষ মনে করলে ভুল হবে ; কারণ এর কতক আদৌ সাহিত্য নয়, কতকগুলির সর্ব্বাঙ্গে অতি-আধুনিকতার ছাপ থাকলেও, সেগুলিতে ফুটেছে আধুনিক যুগের প্রগতিটা নয়, পুরাণ যুগের উচ্ছিষ্ট বীভৎস বিকৃতিটা। প্রগতি সাহিত্যে সমাজের এই বিকৃতির দিক প্রতিফলিত হবে না, তা নয়। বিকৃতিও সত্য, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী সত্য সমাজের প্রাণশক্তির স্ফূর্ত্তি। জীবনের নিকষেই সত্যাসত্যের অন্তিম পরীক্ষা হতে

পারে, তাই বিকৃতিকে যখন বিকৃতি বলে চেনা যায় না, জীবনের 'প্রকৃতি'র ছদ্মবেশে সেটা যখন দেখা দেয়, তখন তার চেয়ে অসত্য আর কি হতে পারে ?

প্রগতি-সাহিত্যের লক্ষণ কি ? নিখিল-ভারত প্রগতি-লেখক-সঙ্ঘের প্রথম অধিবেশনে সভাপতির মঞ্চ হতে হিন্দী সাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ৺প্রেমচাঁদ যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাতে একটা সংজ্ঞার ইঙ্গিত আমরা পাই। তার এক জায়গায় আছে ঃ ভাবাবেগপূর্ণ সুকুমার সাহিত্য সৃষ্টি করে সময় নষ্ট করার মত পর্য্যাপ্ত অবকাশ আমাদের নাই। আমাদের কাছে সেই কলা-সৃষ্টিই কাম্য, যা গভীর ; যা কর্ম্মে প্রেরণা দেবে। এর সরল মর্ম্মার্থ ঃ প্রগতি-সাহিত্য হবে মুখ্যতঃ প্রোপাগাণ্ডা।

প্রগতি-সাহিত্য সম্বন্ধে আর একটা প্রচলিত মত হচ্ছে ঃ সেটা হবে গণসাহিত্য, এমন সাহিত্য "যা ব্যক্তি-চেতনাসম্ভূত নয়, সমাজবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত, তার জন্যে কবির চাই শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ, চাই ডায়ালেক্‌টিক্ দৃষ্টি, চাই ইতিহাসের অর্থনীতিমূলক ব্যাখ্যায় বিশ্বাস।" (আয়ুব, 'চতুরঙ্গ', আশ্বিন)। মুন্সী প্রেমচাঁদের সংজ্ঞাটি স্বীকার করে নিলে, আমাদের মান্‌তে হয়, সাহিত্যে প্রোপাগাণ্ডা সম্ভব। কথাটা বিচারের অপেক্ষা রাখে। মার্কিণ সমালোচক J. T. Ferrel প্রোপাগাণ্ডার যে সংজ্ঞা দিচ্ছেন তা এই ঃ "a method of conventionalising and epitomising thought and policy," অর্থাৎ, প্রোপাগাণ্ডা হচ্ছে মানুষের চিন্তা ও কর্ম্মনীতির স্কন্ধে জোয়াল চড়িয়ে সেগুলিকে কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত কোনো উদ্দেশ্য-ঘানির চার পাশে ঘোরানোর পদ্ধতি। সংজ্ঞাটা মানি বা না মানি, এটা অস্বীকার্য্য যে প্রোপাগাণ্ডার পিছনে থাকে সচেতন মনের বহু চিন্তা, বহু 'প্রত্যয়', বহু যুক্তিতর্ক। কিন্তু নন্দনশাস্ত্রের বিচারে, সাহিত্য হচ্ছে স্বতঃউৎসারিত রসানুভূতি, সাহিত্যিক তাকে রূপায়িত করেছেন। "Art is the expression of impression, not expression of expression" (ক্রোচে)। চারুকলা হচ্ছে অনুভূতির অভিব্যঞ্জনা, রূপায়িতের নয়। অবশ্য যা রূপায়িত হয়েছে, তাও উপলব্ধির বস্তু হতে পারে ; কিন্তু তার জন্যে সেটার চিত্তরসের জারকে দ্রবীভূত হয়ে পুনঃরূপায়ন প্রয়োজন। কাজেই, চারুকলার রাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভের পূর্ব্বে প্রোপাগাণ্ডাকে বিদেহী হয়ে রসোপলব্ধিতে পরিণত হতে হয়, তার প্রোপাগাণ্ডাত্ব নিঃশেষে খোয়াতে হয়। কথাটা আর একভাবে বোঝা যাক্। সাহিত্যের মনোবিকলন সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে আচার্য্য Jung তাঁর 'Modern Man in Search of a Soul' গ্রন্থের এক জায়গায় বলছেন "A great work of art is like a dream : for all its apparent obviousness, it does not explain itself and is never unequivocal. A dream never says : 'You ought', or 'this is the truth." মহৎ শিল্পমাত্রই স্বপ্নধর্মী ; আপাত-সুস্পষ্টতা তার যতই থাক, নিজেকে তা ব্যাখ্যা করে না ; কখনও তা একার্থক হয় না। স্বপ্ন যেমন বলে না ঃ "তোমার এটা করা উচিত," কি, "এইটা সত্য", মহৎ শিল্পও তেমনি যা আছে—সচেতন মনে হোক বা নির্জ্জান মনে হোক, বহিঃপ্রকৃতিতে হোক বা অন্তঃপ্রকৃতিতে হোক, অতীতের আত্মপ্রসারণে হোক বা ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় হোক, যা আছে সেইটুকুমাত্র প্রকাশ করে ; যা আছে তা নিয়ে কি করতে হবে তার কোনো নির্দেশ দেয় না। এই অর্থেই শিল্প উদ্দেশ্যহীন। "Art for art's sake" নীতির অর্থও এই। প্রোপাগাণ্ডা কখনও উদ্দেশ্যহীন হতে পারে না, কাজেই তা সাহিত্যও হতে পারে না।

দেখা গেল, সাহিত্য প্রগতির বাহন হতে পারে না; সহায়ক হতে পারে, তাও সব সময়ে প্রত্যক্ষভাবে নয়। বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির, জড়ের সঙ্গে মনের যে দ্বন্দ্ব, সেই দ্বন্দ্বে প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তিত করে মানুষ নিজেকে পরিবর্ত্তিত করে চলেছে; এই নিয়েই তার জীবন। এই দ্বন্দ্বের প্রয়োজনে এবং এরই প্রেরণায় চারুকলার সৃষ্টি। সমরের রুদ্ররসে সামরিক সঙ্গীতের আবিষ্কার; আবার সামরিক সঙ্গীতের তালে তালে মানুষের বুকে রুদ্ররস জেগে ওঠে। প্রকৃতির সঙ্গে দ্বন্দ্ব চালাবার জন্যে মানুষের অস্ত্রাগারে শিল্প একটা অস্ত্র। মহৎ শিল্পমাত্রের—মহৎ কেন, সত্যিকার শিল্পমাত্রের একটা গুণ হচ্ছে, তা ব্যক্তিকে, যে অভিজ্ঞতার স্তরে সে আর ব্যক্তিমাত্র নয়, যেখানে সে শুধু 'মানুষ', সেই স্তরে পৌঁছিয়ে দেয়, তার নিগূঢ় আদিম প্রাণশক্তিকে উদ্বোধিত করে'। এইখানেই শিল্পের পরমা সিদ্ধি। সাহিত্য এবং প্রগতি (রাষ্ট্রিক ও বার্ত্ত প্রগতি) ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে একই জীবনের সেবকহিসাবে পরস্পরের সহায়ক হ'তে পারে।

চারুকলার মধ্যে প্রোপাগাণ্ডা টেনে বাস্তব জীবনে 'কাজের' সুবিধা হয় কি না, এ সম্বন্ধে তর্কের ধূম্রজাল বিস্তার না ক'রে, কর্মে ও চিন্তায় যাঁরা বর্ত্তমানযুগের গুরু, তাঁদের দু' একজনের মত এখানে আলোচনা করা যেতে পারে। এঙ্গেলস্ বলছেন: সাহিত্যে রাষ্ট্রনৈতিক বিশ্বাস স্থান পেতে পারে, কিন্তু "The more the opinions of the author remain hidden, the better for the work of art"—লেখকের মতামত যত প্রচ্ছন্ন থাকবে, সাহিত্যের পক্ষে ততই মঙ্গল। Dr. Hook তাঁর Hegel to Marx গ্রন্থে মার্ক্সের মতটা এইভাবে প্রকাশ করেছেন: "Politics was relevant to art as subject matter, but it could not determine aesthetic taste or lay down the standards of significant expression"—রাজনীতি বিষয়বস্তু হিসাবে চারুকলায় প্রাসঙ্গিক হতে পারে, কিন্তু কান্তরুচিনির্দ্ধারণের বা সার্থক অভিব্যঞ্জনার কোন মাননির্দ্দেশের সামর্থ্য তার নাই। বিখ্যাত মার্ক্সীয় লেখক Ralph Fox তাঁর 'Novel and the People' গ্রন্থে সৎ-সাহিত্যের উদ্ভব সম্বন্ধে লিখ্ছেন: "What emerges is something that no one willed'—how exactly that sums up each great work of art"—প্রত্যেক উঁচুদরের চারুশিল্প সম্বন্ধে একটা ছোট কথা প্রযোজ্য: 'এটা কারও ইচ্ছায় সৃষ্টি হয় নি, আবির্ভূত হয়েছে।' এই উক্তিগুলো হ'তে এ সিদ্ধান্ত বোধহয় অবিধেয় নয় যে, রাজনৈতিক প্রগতির স্পৃহা যখন মানুষের চেতনা ছাপিয়ে তার চিত্তকে রসাপ্লুত করে, সেটা যখন মতামতের সঙ্কীর্ণতা ছাড়িয়ে মানবীয় অনুভূতির বিশালতায় জন্ম নেয়, জীবন্ত মানবীয় সত্য হয়ে ওঠে, সাহিত্যে তখন তার আত্মপ্রকাশ অবশ্যম্ভাবী; মতামতের অপরিপক্কতায় দেখা দিলে এ স্পৃহা সাহিত্যকে ক্ষুন্নই করে, সমৃদ্ধ করে না। শিল্প স্বয়ম্ভু বলে তাতে বিষয় নির্ব্বাচনের প্রশ্নও অবান্তর। তাছাড়া, মার্ক্স যেখানে গ্যেটের বিরুদ্ধে অন্ধ অভিযান চালানোর জন্যে তরুণ হেগেল-পন্থীদের ভৎর্সনা করছেন: "It is possible to distinguish between Goethe, the Philistine and Goethe, the poetic genius"—সঙ্কীর্ণচেতা গ্যেটে হতে মহাকবি গ্যেটেকে পৃথক করে দেখা সম্ভব, বা লেনিন যেখানে টলষ্টয়ের সাহিত্যকে "mirror of the revolution" আখ্যা দিচ্ছেন, সেখানে কি এই কথাটাই স্বীকৃত হচ্ছে না যে, ব্যাপক অনুভূতির সুন্দর অভিব্যক্তিহিসাবেই সাহিত্যের চরম মূল্য, আর সমগ্র সমাজের রূপ প্রকাশেই

তার সার্থকতা ? প্রগতি-সাহিত্যের নামে মানুষের রসানুভূতির ক্ষেত্রকে সীমিত করার অর্থ হয় না।

মানুষের আদিম প্রাণশক্তির উদ্বোধক ও আবিষ্কারক হিসেবে সমস্ত সত্যিকার সাহিত্যই প্রগতি-সাহিত্য, তা সেটা যে শ্রেণীর দৃষ্টিকোণ হতেই লেখা হোক না কেন। বর্ত্তমান সমাজে শিল্পী শ্রেণী-জীব, তার অনুভূতিও শ্রেণীরঞ্জিত হতে পারে ; কিন্তু "চারুকলায় কি শুধু শ্রেণীমতই ফোটে ? শ্রেণী-মতামতের রঙীন কাচের মধ্য দিয়ে বাস্তবের ছায়াপাত হয় না ? শ্রেণীগত মতামত কি অন্ধতা মাত্র, শ্রেণীস্বপ্ন কি সত্য নয় ? শ্রেণীগত সীমানার মধ্যে এখানেও কি বাস্তবজগতের স্বীকৃতি নাই ?" (F. Levin)

আমাদের বক্তব্য মোটামুটি এই দাঁড়াচ্ছে ঃ—সত্যিকার অনুভূতি ব্যতীত সাহিত্য হয় না, সুতরাং রাজনৈতিক মতামত যদি অনুভূতিতে রূপান্তরিত না হয়ে সরাসরি সাহিত্যে প্রবেশের চেষ্টা করে তবে অনর্থই ঘটে, অমন ক'রে প্রগতি-সাহিত্য সৃষ্টি করা চলে না। প্রগতি-সাহিত্যের কাজ সমাজের বৈপ্লবিক পরিবেষ্টনে মানবচিত্তে যে বিচিত্র রস উদ্ভূত হয়, তাকে রূপায়িত করা। এরূপ পরিবেশে যে অনুভূতির উদ্ভব, সেটা ব্যষ্টিগত না হ'য়ে সমষ্টিগত হওয়ার দরুণ প্রগতি-সাহিত্য অব্যর্থ ভাবে বাস্তবপ্রধান হয়ে ওঠে। "চারুকলার চরম নীতি হচ্ছে এই যে, তা আদিম প্রকৃতির অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত ভেদ করে, তার অন্তর্নিহিত শক্তিগুলিকে, তার নিয়ম ও ধারাগুলিকে আবিষ্কার করে ; তদ্‌যুগীয় জনগণকে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করে, জনগণের মধ্যে প্রকট আদিম শক্তিগুলির উৎস উদ্ঘাটিত ক'রে ধরে।" (রোলাঁ লিখিত 'লেনিন ও টলষ্টয়' প্রবন্ধ হ'তে উদ্ধৃত।) যে বিচিত্র 'সামগ্রিক' অনুভূতি মানুষকে বিপ্লবের অভিমুখে ঠেলে নিয়ে যায়, বাস্তব জীবনের প্রাত্যহিক ঘটনার মধ্যে সেগুলির রূপ প্রকাশ করতে গিয়ে প্রগতি-সাহিত্যকে পদে পদে বাস্তব জগতের উপর নির্ভর করতে হয় ; মানুষের চিন্তা, হৃদয়াবেগ প্রভৃতি এ সাহিত্যে সার্থকতা পায় বাস্তব জীবনের সংস্পর্শে। অনেকের একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, বাস্তবের, বিশেষ করে, কুৎসিত অথবা করুণ বাস্তবের একটা চিত্র ধরতে পারলেই সাহিত্য বাস্তব সাহিত্য হয়ে ওঠে, হয়তো বা প্রগতি সাহিত্যও হয়ে যায়। এঁদো গলি, ঘেয়ো কুকুর, কাঁকড়ার খুলি প্রভৃতির সঙ্গে দুঃস্থ, দীন মানুষের বীভৎস কাতরতার ছবি আঁকলেই সে সাহিত্য প্রগতি-সাহিত্য হয়ে ওঠে না। সকল সত্যিকার সাহিত্যের, বিশেষ করে প্রগতি-সাহিত্যের কাজ মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য বাধা-বিপত্তি দেখিয়েই ক্ষান্ত হয় না, এ সবের মধ্যেও মানুষের অজেয় আত্মার দুর্দ্দম অভিযানকে তা রূপ দেয় ; জীবনের জয়যাত্রার চিত্র আঁকে। সকল মহৎ সাহিত্যে যে উপলব্ধি রূপায়িত সে উপলব্ধি 'সামগ্রিক' (collective) মানুষের নির্জ্ঞান মনের ; এই জন্যেই তার শ্রেণী-চরিত্রকে সবচেয়ে বড় কথা মনে করা ভুল। এই করলে সকল মহৎ সাহিত্যকেই ব্যাপক অর্থে প্রগতি-সাহিত্য বলা চলে।

গ্রামপথ

শ্রীজয়ন্তনাথ রায়

সুদূর সুনীল আকাশের পানে
তুলিয়া ব্যাকুল আঁখি,
আমি গ্রামপথ, ধরণীর সাথে
নিজেরে লুটায়ে রাখি।
আমার রঙ্গীন বুকের উপরে
শত জন-স্রোত আসা যাওয়া করে,
সকালে ও সাঁঝে কত না গো-খুরে
ধূলি উড়ে থাকি' থাকি'।
আমি নিশ্চল পড়ে থাকি শুধু
ধূলির আবীর মাখি'॥

বৈশাখ আসে কঠোর কঠিন
আগুনের জয় গাহি'—
যা কিছু কোমল যা কিছু শ্যামল
পুড়ে হয়ে যায় ছাই।
ক্লান্ত কপোত তরুশাখা 'পরে
কী যন্ত্রণায় কেঁদে কেঁদে মরে
আমি একমনে বর্ষণ তরে
ঊর্দ্ধেতে রহি চাহি'
কবে যে ধরায় আষাঢ় নামিবে
বাদলের জয় গাহি'॥

আশ্বিন আসে আকাশ বাতাস
ভাসে আগমনী গানে।
বধূ ফিরে আসে স্বামীঘর হতে
জননীর গৃহপানে—
ঈষৎ সরায়ে পাল্কী দুয়ার
ব্যাকুল আঁখিতে হেরে চারিধার
ছেলেবেলাকার আমারেও তার
হয়ত বা পড়ে মনে—
সহসা আমারো বুক দুলে উঠে
অকারণ স্পন্দনে॥

বসন্ত আসে দু'হাতে ছড়ায়ে
মাধবীর মঞ্জরী,
নিমেষের মাঝে শ্যামল শোভায়
শূন্যেরে দেয় ভরি';
নবীন কুসুম ফুটি' থরে থরে
আপনার ভার সহিতে না পেরে
লুটায় আমার বক্ষের 'পরে
নিজেরে রিক্ত করি'।
ফাগের আবীর এ রঙ্গীন বুক
আরো দেয় রাঙ্গা করি'॥

বেলা পড়ে আসে জনপদ-বধূ
ঘাটে নিতে যায় জল।
প্রদোষের আলো বিছাইয়া দেয়
শ্যাম ছায়া-অঞ্চল।
আমি চেয়ে থাকি উৎসুক চিতে
কবে বধূ ফিরে যাবে এই পথে
চলিতে চলিতে ভরা ঘট হ'তে
উছলি' পড়িবে জল
মিটিবে আমার আকুল পিয়াসা
গণি তারি প্রতি পল॥

প্রভাতে যাহারা এই বুক 'পরে
করে আসি' ধূলা খেলা—
সন্ধ্যা না হ'তে কোথা' চলে যায়
ফুরালে তাদের মেলা !
সাথে যায় যত আপনার জন
আর্ত্ত বিলাপে ভরিয়া গগন
আমার এমন কিবা আছে ধন
দিব যা যাবার বেলা—
এক সম্বল আছে তা নীরবে
শুষ্ক অশ্রু ফেলা ॥

ওগো জানি জানি এই জীবনেরো
একদিন হবে শেষ,
এই রাঙ্গা বুকে বনানী করিবে
শ্যাম আঁখি-উন্মেষ
তবু এই বুকে যা'রা আসো যাও—
ক্ষণেক দাঁড়ায়ে শুধু শুনে যাও—
যদি কোন দিন স্মরণে জাগাও
অতীত স্মৃতির রেশ,
সে সাথে বারেক মোরেও স্মরিও
এই প্রার্থনা শেষ ॥

শান্তি-প্রার্থনা *

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একদিন যা'রা মেরেছিল তাঁ'রে গিয়ে,
রাজার দোহাই দিয়ে,
এ যুগে তা'রাই জন্ম নিয়েছে আজি
মন্দিরে তা'রা এসেছে ভক্ত সাজি' ;
ঘাতক সৈন্যে ডাকি'
মারো মারো উঠে হাঁকি'।
গর্জ্জনে মিশে পূজা-মন্ত্রের স্বর
মানব-পুত্র তীব্র ব্যথায় কহেন,—হে ঈশ্বর,
এ পান-পাত্র নিদারুণ বিষে ভরা
দূরে ফেলে দাও, দূরে ফেলে দাও ত্বরা ॥

---

* বর্ত্তমান বর্ষের খ্রীষ্টমাস দিবস উপলক্ষ্যে রচিত এই গানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বর্ত্তমান পৃথিবীর পুঞ্জীভূত তীব্র দুঃখসম্পর্কে তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন।—অঃ সঃ



চলন্তিকা

'সম্বুদ্ধ'

পুরাণের উপাখ্যান পড়িতেছিলাম।

অঙ্গদেশের রাজা কর্ণ। ধনের তাঁহার সীমা নাই, দানেরও তুলনা নাই। রাজদ্বারে অর্থী-প্রত্যর্থীর ভিড় লাগিয়াই আছে।

রাজার একটিমাত্র পুত্র, বৃষকেতু। বয়স তাহার অল্প; গালভরা নামটা নেহাৎই ভবিষ্যৎ চাহিয়া।

প্রভাতে রাজা বৃষকেতুকে লইয়া খেলিতেছেন, এক ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত। কহিল, মহারাজ, উপবাসী আছি। পারণ করিব।

রাজা কহিলেন, আপনার অনুগ্রহ। কি খাইবেন বলুন?

ব্রাহ্মণ কহিল, নরমাংস।

সে সময়ে সভ্যজাতিরা সকলেই নরমাংস ভক্ষণ ছাড়িয়াছে, কিন্তু ব্রাহ্মণদের মধ্যে তখনও ইহার প্রচলন ছিল। রাজা কহিলেন, বেশ, তাহাই খাওয়াইব।

পাকশালার অধ্যক্ষকে ডাকিতে লোক পাঠানো হইল। রাজা ব্রাহ্মণকে কহিলেন, বসুন। বৃষকেতুকে কহিলেন, প্রণাম কর।

ব্রাহ্মণ কহিল, খাসা ছেলেটি। আপনার পুত্র?

রাজা কহিলেন, আপনার শ্রীচরণাশীর্বাদে।

ব্রাহ্মণ কহিল, ইহাকে আমার বড় পছন্দ হইয়াছে। আমি অন্য মাংস খাইব না, ইহাকেই ভক্ষণ করিব।

রাজা হতবাক্ হইয়া গেলেন।

রাজভৃত্যেরা কহিল, মহারাজ, অনুমতি করুন, এটাকে ঘাড় ধরিয়া তাড়াইয়া দিই।

দিতে পারিলে ভাল হইত। কিন্তু রাজার মত হইল না। নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, না, ইনি অতিথি। তোমরা যাও।

সংবাদ পাইয়া রাণী পদ্মাবতী ছুটিয়া আসিলেন। কহিলেন, মহারাজ, এ কি শুনি?

রাজা কহিলেন, আমার অদৃষ্ট।

রাণী কহিলেন, অসম্ভব। আমি পুত্র দিব না।

রাজা কহিলেন, উপায় নাই, মহিষি। আমি পণে বদ্ধ।

বৃষকেতু কহিল, মা, আপত্তি করিও না। পিতা সত্য করিয়াছেন, সে সত্য যদি তিনি ভাঙেন আমি এমনিই আত্মহত্যা করিব। মিথ্যাচারীর পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না।

রাণী ছলছলচক্ষে কহিলেন, বাবা বৃষ !

বৃষকেতু কহিল, না মা।

কর্ণ সানন্দে পুত্রকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া কহিলেন, ধন্য আমি। বৎস, আমাকে আজ বড় আনন্দ তুমি দিলে। তোমার বুদ্ধি এইরূপ সরলগামী বলিয়াই আমি তোমাকে বৃষকেতু নাম দিয়াছিলাম। সার্থক আমার নামকরণ।

ব্রাহ্মণ কহিল, বৎস, তোমার সুবুদ্ধি দেখিয়া প্রীত হইলাম। তোমার খাতিরে আমি দাবির অর্ধেক মাপ করিয়া দিতেছি।

আশা-কম্পিত দৃষ্টিতে রাজা ও রাণী তাঁহার দিকে তাকাইলেন। ব্রাহ্মণ কহিল, মহারাজ, করাত আনুন। আপনার পুত্রের অর্ধেক আমি ছাড়িয়া দিলাম। করাত দিয়া পুত্রকে আপনারা সমান দুই অংশে চিরিয়া ভাগ করুন, আমি আধখানা মাত্র খাইব।

রাজা কহিলেন, লাভ নাই, বাকি আধখানা বাঁচিবে না। আপনি চুপ করুন, অনুগ্রহের ছলে আর আমাদের দগ্ধাইবেন না।

ব্রাহ্মণ কহিল, বাঁচিবে। আমি বলিতেছি বাঁচিবে। আপনি আর দেরি করিবেন না, করাত আনুন। আমার ক্ষুধা পাইয়াছে।

করাত আসিল। রাজা কহিলেন, আপনি কোন অর্ধেক খাইবেন ?

ব্রাহ্মণ কহিল, এখন বলিব না। বলিলে যদি আপনি একদিকে চাপিয়া করাত টানেন ? আগে চিরুন, তারপর।

করাত চলিল, বৃষকেতু সোজাসুজি দুই ভাগ হইয়া গেল। ব্রাহ্মণের লোলুপ দৃষ্টির স্পর্শে তাহার স্নায়ুকেন্দ্র অবশ হইয়া গিয়াছিল, ব্যথা বিশেষ টের পাইল না।

রাণী শেষ চেষ্টা করিয়া কহিলেন, আমি বাম অর্ধেক রাখিব। তাঁহার ভরসা, হৃৎপিণ্ডটা দেহের বামদিকে থাকে।

ধূর্ত ব্রাহ্মণ কহিল, হৃৎপিণ্ডই না খাইলাম তো খাইলাম কি। আমি বাম অর্ধেক খাইব।

রাজা কহিলেন, তাহাই ভাল, ডান হাতে মানুষ দান করে। আমরা ডান অর্ধেক রাখিতেছি।

বাম অর্ধেক লইয়া রাজা ও রাণী পাকশালায় প্রবেশ করিলেন। ডান অর্ধেক সেইখানে একপায়ে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার ক্ষতমুখ দিয়া রক্ত ঝরিতেছিল।

টাট্‌কা রক্তের ধারা দেখিয়া ব্রাহ্মণের লোভ হইল; দীর্ঘ জিহ্বা বাহির করিয়া সে সেই রক্তধারা চাটিয়া খাইতে লাগিল।

হিন্দু-শাস্ত্র বলে, গরুর সহিত ব্রাহ্মণের প্রায় সকল ব্যাপারেই মিল আছে; কেবল মুখেই দুয়ের মধ্যে অনৈক্য। গরুর মুখটা অপবিত্র। ব্রাহ্মণের মুখ অতি পবিত্র—সে মুখ হইতে নির্গত গালাগালির নাম অনুশাসন, থুতুর নাম অমৃত। সেই অমৃত লাগিয়া বৃষকেতুর ছিন্ন অঙ্গ আবার

গজাইয়া উঠিল। কর্ণ ও পদ্মাবতী যখন মাংস রাঁধিয়া লইয়া ফিরিলেন, তখন একটি আস্ত বৃষকেতু সোল্লাসে তাঁহাদের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

আখ্যায়িকা শেষ করিয়া পুরাণকার কহিলেন, এমন অদ্ভুত ব্যাপার পৃথিবীতে আর কখনও ঘটে নাই, ঘটিবে না। ডুম্বকমেষের বাৎসরিক মাংসোৎপত্তির মতই ইহা অলৌকিক।

*

অঙ্গরাজ কর্ণের কাহিনী সত্য হইতে পারে; কিন্তু এমন কাণ্ড আর ঘটে নাই, একথা সত্য নয়। ভাগাভাগি অঙ্গচ্ছেদন জগতে প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে, ঘটিবে।

আমাদের ফিলজফির প্রফেসর বলিতেন, পৃথিবীর সর্বত্র ফিলজফি ছড়াইয়া আছে, মানুষ শুধু তাহার সন্ধান রাখে না। পাণিনির ব্যাকরণ ফিলজফিতে ঠাসা; ইউক্লিডের জ্যামিতির মধ্যে ফিলজফির বড় বড় তত্ত্বের সন্ধান মেলে।

তখন তাঁহার কথা বুঝিতাম না। এখন মনে হয় যেন একটু একটু বুঝিতেছি। পাটীগণিতের মধ্যে ফিলজফির তত্ত্ব লুকানো থাকিতে পারে একথাটা কখনও মনে হয় নাই। এখন দেখি, সেখানেও ফিলজফি। যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ—এই পারম্পরিক ধারার মধ্যে পৃথিবীর ইতিহাসের মূল তথ্যটি নিহিত রহিয়াছে। ইহার অর্থ,—মানুষ প্রথমে ধন ও সম্পত্তি অর্জন করে, তারপর তাহার মধ্যের আবর্জনা বাদ দেয়, তারপর সেটার গুণ যখন বুঝিতে পারে তখন সেটাকে ভাগ করিয়া লয়। এই ভাগ করাই পৃথিবীর চরম ও পরম কথা; এবং ইহারই জন্য যত মারামারি।

*

মারামারির কথায় মনে পড়িল, বৃষকেতুর উপাখ্যানের পুনরাবৃত্তি বহুবার ঘটিয়াছে—গোটা ভারতবর্ষের ইতিহাসটাই ভাগাভাগির ইতিহাস।

একদা ভারতবর্ষ হিংস্র শ্বাপদ ও অনার্যসংকুল ছিল; তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। তারপর আর্যরা আসিলেন; পূর্ববর্তীদের তাড়াইয়া বাসস্থান গড়িলেন, তাহাদের হলস্পর্শে ভারতভূমি ফুলেফলে শস্যসম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। ভারতের যোগবিয়োগ সারা হইয়া গুণ প্রকাশিত হইল, এবার ভাগের পালা।

আর্যরা ইহার নাম দিয়াছিলেন ভারতবর্ষ। তারপর বহুকাল চলিয়া গেল; দীর্ঘকাল নিরাপদ বিলাসে যাপন করিয়া আর্যরা হীনবল হইয়া পড়িলেন; দেশের সম্ভ্রমরক্ষা ও বন্দনাগীতির ভার ক্ষত্রিয় চারণ হইতে কলাবিলাসী কবির হাতে গিয়া পড়িল। বন্দনীয়কে নারীরূপে না দেখিতে পাইলে তাহাদের কল্পনা খোলে না, অতএব 'ভারতবর্ষ' বেশ বদলাইয়া 'ভারতভূমি' হইয়া উঠিল; নেহাৎ সৌকর্য বজায় রাখিবার খাতিরে তাহাকে 'ভারতমাতা' বলা হইতে লাগিল।

বহু আর্যসন্তানে ভারতের কোল-কাঁক ভরিয়া দিয়া আর্যরা মরিয়া গেলেন। ভারতকে রক্ষা করিবার কেহ নাই, আর্যসন্তানরা নাবালক। সুযোগ বুঝিয়া মুসলমানরা আসিয়া ভারত অধিকার করিল।

আর্যসন্তানরা কাঁদিয়া কহিল, মা, এত শীঘ্র তুমি আমাদের পিতাদের ভুলিলে, এত সহজে আবার পত্যন্তর গ্রহণ করিবে?

মা জননী কহিলেন, বৎস, কি করিব, 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা' তোমাদেরই শাস্ত্রবচন।

আর্যসন্তানরা কহিল, কিন্তু তুমি তো বিধবা।

মাতা কহিলেন, বৎস, ভুলিয়া যাইতেছ, তোমাদের পিতৃপুরুষও আমার প্রথম স্বামী ছিলেন না। তাঁহাদের পূর্বে আমি দ্রাবিড়-ভোগ্যা ছিলাম ; আরও পূর্বে···

আর্যসন্তানরা কহিল, হউক। বিধবার বিবাহ নিষিদ্ধ। হিন্দুশাস্ত্রের ইহাই আদেশ।

মাতা কহিলেন, মুসলমানশাস্ত্রে বিধবা-বিবাহে নিষেধ নাই। আর বিধবা-বিবাহের নিষেধ বিধবার প্রতি নয়, তাহার আত্মীয়স্বজনের প্রতি। তাহারা যে ক্ষেত্রে মনে করিবে, ইহাতে তাহাদের সম্ভ্রমহানি হইতেছে, নিজেরাই বিবাহে প্রতিবন্ধক উপস্থিত করিবে। মুসলমান জোর করিয়া আমাকে বিবাহ করিতেছে ; তোমাদের যদি পছন্দ না হয়, বাহুবলে আমাকে রক্ষা কর, কাঁদিয়া কি হইবে ? আর্যসন্তানেরা আরও উচ্চরবে কাঁদিয়া কহিল, না মা, কাঁদিব কেন, কাঁদিতেছি না।

বলিয়া মাথায় হাত দিয়া পা ছড়াইয়া প্রাণপণ চীৎকার করিয়া কাঁদিতে বসিল। মুসলমান বিনা বাধায় ভারতের স্বামী হইয়া বসিল।

পাঠান আসিল, পাঠান গেল। মুঘল আসিল, মুঘলও গেল। রাখিয়া গেল এক ঝাঁক করিয়া ঔরস ও পোষ্য পুত্রকন্যা। তারপর ইংরেজ আসিয়াছে, ইংরেজের সন্তান সন্ততিও জন্মিয়াছে। হয়তো ইংরেজও যাইবে। তারপর কে আসিবে—জার্মান না জাপানী, তাহা লইয়া বাজি ধরা সুরু হইয়াছে।

ইতিমধ্যে ভাগের আর এক পদ্ধতি দেখা দিল। মুসলমান যখন ভারতের স্বামী, হিন্দুসন্তানেরা জ্বলিয়া মরিত। এখন হিন্দু ও মুসলমান দুজনেই জ্বলিতেছে। মা পরের অঙ্কশায়িনী হউন তাহাতে বিশেষ যায় আসে না—পাছে তাঁহার এ পক্ষের সন্তানেরা তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করে ইহাই তাহাদের ভয়। সেই ভয়ে তাহারা বলিয়া বসিল, আমরা পৃথক হইব।

সালিসি বসিল। মায়ের নাম ধরিয়া কাঁদিবার অধিকার কার কতটুকু, তাহার ভাগবাটোয়ারা হইয়া গেল। মায়ের কোল ও কাপড়ে কে কতটুকু মলত্যাগ করিতে পারিবে, তাহারও বাটোয়ারা হইয়া গেল।

কিন্তু ইহাতেও কুলাইল না। কচুগাছ কাটিতে কাটিতে ডাকাত হয়—অধিকার ও অংশ ভাগ করিতে করিতে ক্রমে মাকেই ভাগ করিয়া লইবার তাড়া পড়িল। হিন্দুরা শাস্ত্রবচন আওড়াইয়া কহিল, ভাগের মা গঙ্গা পায় না।

মুসলমানরা শিহরিয়া কহিল, ঘোরতর পৌত্তলিকতা। আমাদের ভাগে যেটুকু মা পড়িবে, সেটুকুকে অন্তত আমরা গঙ্গার ঘোলাজলে চুবাইতে দিব না, রীতিমত কবর দিব।

সংশয়ীরা কহিল, কিন্তু ভাগ করিতে গিয়া যদি মা মরিয়া যান ?

উৎসাহীরা কহিল, গেলেনই বা। জ্যান্ত হাতী দুহাজারে পাওয়া যায় ; মরা হাতী সওয়া লাখ। মা জীবিত কি মৃত থাকিলেন তাহাতে যায় আসে না, যেরূপে থাকিলে তাঁহাকে দিয়া অধিকতর ইকনমিক ভ্যালু পাওয়া যাইবে, সেটাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ রূপ। যে গরু বাঁচিয়া থাকিয়া দুধ দিতেছে না, অথচ মরিলে জুতা হইবে, তাহাকে মারিয়া ফেলাই সুযুক্তি।

হিন্দুরা লম্ফ দিয়া কহিল, গরু মাতার সমান, তাহাকে মারা চলে না।

মুসলমানরা কহিল, ঠিক তাই। মাতা গরুর সমান, কোরবানি করিলে পাপ নাই।

হিন্দুরা কহিল, অর্থাৎ ?

মুসলমানরা কহিল, অর্থাৎ তোমাদের ইকোয়েশনই মানিয়া লইলাম। মুসলমানী মতে ঐরূপ দাঁড়ায়।

হিন্দুরা পুনরপি কহিল, অর্থাৎ ?

মুসলমানরা কহিল, 'অর্থাৎ', কিছুই নাই। তোমাদের রীতি বাম হইতে দক্ষিণে পড়া। আমরা দক্ষিণ হইতে বামে পড়ি।

তোমার ইকোয়েশনটাকে লিখিয়া দেখ :

গরু = মা,

∴ তাহাকে মারা চলে না।

এইটাই উলটা দিক হইতে পড়িলে হইবে :

মা = গরু,

∴ তাহাকে কোরবানি করা চলে।

হিন্দুরা চক্ষু পাকাইয়া কহিল, তবে রে !

মুসলমানরা মুষ্টি পাকাইয়া কহিল, খবরদার !

লাগিল ঘুষাঘুষি। কলিকাতায়, ঢাকায়, কানপুরে, গয়ায়, করাচিতে।

কিল, ঘুষি ও নিষ্ঠীবন বর্ষণে কেহই কৃপণ নয়। কতক লাগিল পরস্পরের গায়ে, অধিকাংশই লাগিল মাতার নাকে মুখে। নাক বোঁচা, চক্ষু কানা হইয়া, কাপড়চোপড় ছিঁড়িয়া লণ্ডভণ্ড হইয়া তিনি একেবারে বিপর্যস্ত হইয়া গেলেন। কাতর হইয়া কহিলেন, ওরে, আমার বুড়া হাড়ে আর তো সয় না।

পুত্ররা গর্জন করিয়া কহিল, চুপ করিয়া থাক লক্ষ্মীছাড়ী। বার বার পতিগ্রহণ করিয়া তুইই তো জঞ্জাল বাধাইয়াছিস। না হইলে আমরা আসিতাম কোথা হইতে ?

মা কহিলেন, সে পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই ? তোরা আর আমাকে দগ্ধাইস না ; আমাকে একেবারে মারিয়া ফেল। ফেলিয়া হাড়মাংসগুলা যেমন খুশি ভাগবাটোয়ারা করিয়া নে, আমি নিষ্কৃতি পাই।

পুত্ররা কহিল, তাই ভাল।

বি-পিতাকে ডাকিয়া কহিল, তোমাকেই সালিশ মানিলাম। দাও তো মাটাকে ভাগ করিয়া।

তিনি কহিলেন, আহা-হা, সেটা কি ভাল দেখায় ! কেন, দখলি-স্বত্ব, অধিকার সমস্তই তো ভাগ করিয়া দিয়াছি, আবার ঝগড়া কিসের ?

মুসলমান ছোটছেলে, তাহার আব্দার বেশি। সে কহিল, ওসবের কর্ম নয়। আমার ভাগ আমি আলাদা করিয়া লইতে চাই, এজমালি কোলে আমি বসিব না।

হিন্দু বড়ছেলে, মায়ের সহিত তাহার সম্পর্ক বেশিদিনের। সে কহিল, কিন্তু সত্যই কি মাকে কাটিয়া ভাগ করিবে ?

মুসলমান কহিল, নিশ্চয়।

হিন্দু কহিল, কিন্তু মা যদি না বাঁচেন ?

মুসলমান কহিল, এত যদি দরদ লাগে, ভাগ ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া গেলেই তো পার।

হিন্দু কহিল, তাহা দিব না।

মুসলমান কহিল, অতএব ভাগও হইবে। মেলা চ্যাঁচাইও না, ভাগের হিসাব কর।

হিন্দু কহিল, মা ব্যথা পাইবেন না ?

মুসলমান কহিল, ব্যথা না দিয়া অস্ত্র করিবার ঔষধ আছে।

ইংরেজ বলিল, সার্জারির বিদ্যায় আমি ওস্তাদ, সেজন্য ভয় করিও না। এমন সুকৌশলে কাটিয়া দিব যে রোগী টেরও পাইবে না।

হিন্দু মুসলমান উভয়েই কহিল, সাধু সাধু।

সার্জের কোট পরিয়া ইংরেজ সার্জারি করিতে আসিল। সাবান দিয়া হাত ধুইল যেন ময়লা না লাগে; হাতে দস্তানা পরিল যেন আঙুলের ছাপ না পড়ে। ছুরি তুলিয়া কহিল, কোথায় কাটিব, বল ?

মুসলমান কহিল, আমি এখনও দুধ ছাড়ি নাই, কোলটা আমার। ইংরেজ কহিল, কোন্‌টুকু দেখাইয়া দাও।

মুসলমান দাগ দিয়া দেখাইয়া দিল। কহিল, এইটুকু এইটুকু। মাঝখান আর দুই প্রান্ত। মার কোলে আমি শুইয়া থাকিব, স্তন্য খাইব; বাঁ হাতে মা আমাকে ভাত খাওয়াইয়া দিবেন আর ডান হাতে আমার মাথা চুলকাইয়া দিবেন। বাকিটা যে খুশি লইতে পারে, এইটুকু আমার।

হিন্দু ক্ষেপিয়া কহিল, ইয়ারকি! স্তনদুগ্ধটুকু উনি লইবেন, হাত দুখানাও উঁহার ভাগে—আমি কি খাইব তাই শুনি ?

মুসলমান নির্বিকারচিত্তে কহিল, যা খুশি। ঘাস। লাথি।

হিন্দু আর একবার চক্ষু পাকাইয়া কহিল, তবে রে!

মুসলমান আর একবার মুষ্টি পাকাইয়া কহিল, খবরদার।

ইংরেজ ছুরি নামাইয়া কহিল, তোমরা মতি স্থির কর, আমি ততক্ষণ একটু সিগারেট খাই।

*

ইংরেজ সিগারেট খাইতেছে।

আমি ভাবিতেছি, ইহার শেষটা কি দাঁড়াইবে। ছুরি ওস্তাদের হাতেই পড়িয়াছে, কাটা নিখুঁত হইবে সন্দেহ নাই। কর্তিত অঙ্গ হইতে যে রক্তধারা ছুটিবে তাহা লেহন করিবার মত লোলুপ জিহ্বারও অভাব হইবে না। সেই জিহ্বায় যে লালার গ্রন্থি আছে তাহা কতদূর অমৃতক্ষরা, সেইটুকুই কেবল সংশয়।

বৃষকেতু বাঁচিয়াছিল। এইটুকুই অলৌকিকত্ব। অপারেশন হয়তো সাক্‌সেসফুল হইবে; লেহনের বিষ সহিয়া ভারত-বৃষটা বাঁচিবে কি ?

জ্যাঠামহাশয়

শ্রীঅমলেন্দু দাশগুপ্ত

সভাপতি মহাশয়,

জ্যাঠামশায় মরিয়াছেন। কেন মরিলেন? কথাটা তো একালের মধুসূদনই বলিয়াছেন—জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে? সেকালের মধুসূদনও এই ভয়ই দেখাইয়া গিয়াছেন—জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু, অর্থাৎ মোল্লার দৌড় মজিদ পর্য্যন্ত, যতই বাঁচ না কেন, বাঁচাটা শেষকালে ঐ মরা পর্য্যন্তই। কাজেই জ্যাঠামশায় মরিয়াছেন।

বাতিতে তেল থাকিতেও প্রদীপ নিবে, যথা দমকা হাওয়ায়। কিন্তু জ্যাঠামশায়ের বাতিতে তেল ফুরাইয়াছিল, তাই নিবিয়া গেলেন। কাঁচা ফলও মাটিতে পড়ে, যথা ঝড়ের ঝাপটায়। কিন্তু জ্যাঠামশায়ের বোঁটা পাকিয়া শুকাইয়া ছিল, তাই খসিয়া পড়িলেন। সংক্ষেপে, তিনি বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত অপমৃত্যু, হঠাৎমৃত্যু, দৈবমৃত্যু, খামকামৃত্যু ইত্যাদিকে এড়াইয়া অবশেষে জাতস্য-হি-ধ্রুবো-মৃত্যু বা জন্মিলে মরিতে হবে মৃত্যুই মরিয়াছেন। তিনি পাকা খেলোয়াড়ের ন্যায় অনেকক্ষণ ছুটিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, বাঁচাটাকে যথেষ্ট ও অনাবশ্যক দীর্ঘ করিবার কৌশল দেখাইয়া গিয়াছেন। নিজের শরীরের একই খোলের মধ্যে তিনি একটানা আশি বছর কাটাইয়া গেলেন, মোটেই ক্লান্ত হইলেন না—এর চেয়ে অধিক আশ্চর্য্যের কিছু আমার জানা নাই।

জ্যাঠামশায়ের দুটি শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। প্রথমটি—তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু সন্তান উৎপাদন করেন নাই। অবশ্য এ ত্রুটি তাঁর একমাত্র ভ্রাতা একাই সংশোধন করিয়া পোষাইয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয়টা—তিনি প্রচুর টাকা আয় করিয়াছিলেন, যাহা তাঁর জীবিতকালে তাঁর পূর্ব্বোক্ত ভ্রাতা সসন্তান ভোগ করিয়াছেন এবং অধুনা করিতেছেন। জ্যাঠামশায় তাঁর সাতটি ভ্রাতুষ্পুত্রকে বিদেশ হইতে, তাঁর ধারণামতে, শিক্ষিত ও কৃতী করিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও অষ্টমটীর কোন গতি হইল না বলিয়া তিনি আপশোষ করিতেন। কিন্তু যাইবার কালে রাগ করিয়া আমার নামে (আমিই সেই অশিক্ষিত, অকৃতী ও অগতি অষ্টম) একটা মোটা টাকা আলাদা করিয়া ব্যাঙ্কে রাখিয়া গিয়াছেন শুনিতে পাই।

প্রথম কীর্ত্তি—পুত্রোৎপাদন না করা, এজন্য তিনি প্রশংসনীয়। তিনি নিশ্চয় সহজিয়াপন্থী সিদ্ধ সাধক ছিলেন। তাই তাঁর জীবনের নাচে ভূষণের ধ্বনি হইল না, চীর নড়িল না এবং দ্রুতগতি চরণে মঞ্জীর বাজিতে পারিল না। তিনিই গীতার কর্ম্মী, ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি যোগের এ কৌশল তাঁর আয়ত্তে ছিল।

কিন্তু দ্বিতীয় কীর্ত্তি—অর্থ আয় ও সঞ্চয় করা, তাঁর বুদ্ধির পরিচয় নহে। দশজনের হইয়া একা খাটুনি এবং ঘরের খাইয়া বনের পশু খেদানো মূর্খদেরই কাজ। জ্যাঠামশায়কে বোকাই বলিব, যে অর্থ নিজের ভোগে লাগে না, সে অনর্থের জন্য দুর্ভোগ তিনি ভুগিয়াছেন। আয় বুঝিয়া ব্যয় নয়, ব্যয় বুঝিয়াই আয় বুদ্ধিমানদের কাজ।

জ্যাঠামশায়ের এই পারিবারিক স্মৃতি-সভায় জ্যাঠামশায়ের একমাত্র ভ্রাতাকে অর্থাৎ মাননীয় পিতৃদেবকে আপনারা সভাপতি করিয়াছেন।

তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন ন'ন, তাঁর সহধর্ম্মিণীকে মানে আমাদের মাতৃদেবীকে, তিনি এখানেই উপস্থিত আছেন, জিজ্ঞাসা করিলে আপনারা জানিতে পারিবেন। এ লইয়া ভদ্রমহিলার মনস্তাপ বরাবরই রহিয়া গিয়াছে, তিনি সভাপতিকে প্রায় বলিতেন—"তুমি খোকাকে (আমাকে) কেন দেখতে পার না বল ত? ওর সঙ্গে তুমি এরকম ব্যবহার কর কেন?" উত্তরে তত্ত্বকথা ফেরত তিনি পাইতেন যে, আদরে মস্তক চর্ব্বিত হয়, যে ইচ্ছা সভাপতির মোটেই নাই। কিন্তু এতখানি সংযম ও ভদ্রতা যেদিন তাঁর থাকিত না, সেদিন গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিতেন—"ওটা (মানে আমি) এল কোত্থেকে, বলতে পার? একটি আস্ত অকালকুষ্মাণ্ড। ও গুণ্ডা হবে দেখে নিও।"

অকালকুষ্মাণ্ডপ্রসবের কলঙ্কে ভদ্রমহিলা ম্রিয়মান হইয়া পড়িতেন এবং সেই অকাল ফল বিশেষের ভাবী পরিণামে রীতিমত ভয় পাইয়া যাইতেন। তবু ভাবিতে চেষ্টা করিতেন যে, ভদ্রলোকের কথা ঠিক নয়, কোনমতে সেই কথাটাই সভাপতিকে শুনাইয়া দিতেন—"তুমি ওকে দেখতে পার না, তাই—"

আমাকে তিনি খুব দেখিতে পারেন, একটু বেশীই দেখিতে পারেন, তাই এই ভীড়ের মধ্যেও তাঁর দৃষ্টি সি-আই-ডির মত আমার পিছু লাগিয়া আছে। আমাকেই প্রথম বক্তা বলিয়া ডাকিয়া কিছু বলিবার জন্য সুমিষ্ট ভাষায়, কুইনিন পিলের সুগার কোটিং-এর সংবাদ তিনি রাখেন, অনুরোধ করিয়াছেন। গভীর জলের মৎস্যগণ ধরা-ছোঁয়ার বাহিরেই থাকে এবং এখানেও থাকিয়াছেন। অথচ সভাপতিকে দেখিলে সাংখ্যের পুরুষকে মনে পড়ে, যে পুরুষে ক্রিয়া বা চাঞ্চল্য নাই।

কুইনিন পিল তবে গিলিতেই হইল।—

আই-এ পরীক্ষা দিলাম এবং ফেল করিলাম। এতবড় আনন্দ পিতাকে কোন সন্তান কোন দিন দিতে পারে নাই। ওটা অকালকুষ্মাণ্ড, ওর কিছুই হইবে না—ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া বক্তা মনে মনে শঙ্কিত ছিলেন, কিন্তু পুত্র তাহা সত্য ও যথার্থ প্রমাণ করিবার ভার নিজের উপর লওয়ায় সভাপতি-মশায় তেমনি মনে মনে আমার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন।

ভিতরের আনন্দটা ধামাচাপা দিয়া তিনি মুখ কালি করিয়া গৃহিণীর সম্মুখে উপস্থিত হন, বিস্তর দুঃখ প্রকাশ করেন। নিজের দুঃখটাকে পাখার বাতাসের মত ব্যবহার করিয়া গেলেন, ফলে যাঁর দুঃখ পাওয়া উচিত তাঁর মনঃকষ্ট আগুনের শিখা ও জ্বালা লইয়া দেখা দিল। নিজের সাফল্যে সভাপতি মুখ আরও কালি করিয়া জিজ্ঞাসা করেন—"ওর সম্বন্ধে কি করা যায় বল ত?" প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর ছিল, বলার ঢংটি নজর করিলেই দেখা যাইত যে, ওর সম্বন্ধে কিছুই করা যায় না, কারণ ওর কিছুই হইবে না।

ফেল নিজেই করিয়াছেন, এই প্রকার অপরাধী ভাব লইয়া মাতৃদেবী পিতার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। কাজেই সিদ্ধান্তে সায় দিলেন যে, জ্যাঠামশায়ের নিকট পত্র দেওয়া হইবে এবং পত্রে পরামর্শ প্রার্থনা করা হইবে। পত্ররচনার ভার সভাপতি নিজেই লইলেন, গৃহিণীকে অযথা কষ্ট দিতে তিনি প্রস্তুত নন।

যথাসময়ে পত্র গেল, পুত্রের ফেলের সংবাদ ও পরামর্শ প্রার্থনার জন্য দুটি লাইন অবশ্য খরচ হইয়াছিল। বাকী সবটাই একজনের চরিত্র-ব্যাখ্যানেই ব্যয় হইল।

যথাসময়ে পত্রের উত্তর আসিল, জ্যাঠামশায় লিখিলেন—"খোকাকে এখানে পাঠাইয়া দাও, এত গাধা মানুষ হইল, আর—" আরটা আর নাই শুনিলেন, বুঝিয়া লইয়াছেন বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু, এত গাধা বলিয়া জ্যাঠামশায় কি কোন ইঙ্গিত করিয়াছেন? জ্যাঠামশায়ের ভ্রাতা ও শিক্ষিত কৃতী ভ্রাতুষ্পুত্রদের এ বিষয়ে মতামত কি, জানিতে ইচ্ছা করি।

গাধাকে মানুষ করিতে নিজের হাতযশে বিশ্বাসী জ্যাঠামশায় তাঁর হাতটা আর একবার পরখ করিবার জন্য আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, এ শুভ সংবাদ মাতৃদেবীর নিকট পাইলাম। তিনি বলিলেন—"খোকা, একটু মন দিয়ে পড়াশুনা করিস। ইচ্ছে করলেই তুই তোর দাদাদের ছাড়িয়ে যেতে পারিস।"

তাহা কি বহুপূর্ব্বেই পারি নাই, কি মাননীয় পিতৃদেবকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছেন।

পিতৃদেব বলিলেন—"যাচ্ছ যাও, কিছু লাভ হবে বলে মনে হয় না। তবু চেষ্টা করে দেখ—"

ফল হইবে না জানিয়াও পণ্ডশ্রমের পরামর্শ দিলেন, পরম হিতৈষী পিতৃদেবের উপদেশ ও পায়ের ধুলা মাথায় লইলাম।

দাদারা বলিলেন—"যা, বেঁচে গেলি। এখানে থাকলেও যা একটু হোত, এখন তো পড়লি গিয়ে রাম-রাজত্বে।"

বৌদিরা বলিলেন—"থেকে কম জ্বালাও নি, তবু কাছে থাকলেই ভাল হোত। কদিন সব ফাঁকা ফাঁকা লাগবে।"

ছোটরা বলিল—"ছুটি পেলেই চলে আসবে কিন্তু।"

পিতা তাড়া দিয়া বলিলেন—"ষ্টীমার ফেল করবে নাকি? কেন দেরী করাচ্ছ?"

মাতা গাত্র হইতে হস্ত তুলিয়া লইয়া আবার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ ভৃত্য দীনুদা কহিলেন—"খোকা, তোমার খাবার টিফিনের বাক্সে দিয়ে দিয়েছি।"

একা আমিই কিছু বলিলাম না, মনে মনে ভাবিলাম যে, এত বড় পৃথিবীতে কি আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে পরীক্ষা দিয়া ফেল করিয়াছে!

খাইতে বসিয়া জ্যাঠামশায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"ফেল করলে কেন?"

বলিলাম—"পাশ করতে পারি নি।"

উত্তর শুনিয়া বড়মা (জ্যাঠাইমা), বৌদি ও বড় বৌদির বড় কন্যা এলারাণী (তখন তিনি সেকেণ্ড ক্লাসে পড়িতেন) হাসি চাপিলেন। সত্য কথাকে রসিকতা মনে করিতে মেয়েরাই জানে।

—"হুঁ, পাশ করতে পার নি! পড়াশুনা কিছু কর নি, তা বলবে না। প্রশ্ন বুঝি খুব কঠিন হয়েছিল?"

—"সবাই তাই বলে।"

—"বললেই হোল? তবে যারা পাশ করেছে, তারা ফেল করলে না কেন?"

যারা পাশ করিয়াছে, তারা ফেল করিল না কেন—এ কঠিন প্রশ্নের উত্তর তাড়াতাড়ি মাথায় আসিতেছিল না, তা ছাড়া এলারাণীর হাসি আমার অসুবিধার সৃষ্টি করিতেছিল।

কহিলাম—"তারা বোধ হয় ভাল লিখেছিল, তাই ফেল করে নি, পাশ করেছে।"

—"তবু সোজা কথাটা বলবে না যে, তারা পড়াশুনা করেছে, তাই ফেল করে নি। ব্যাপার বুঝলে ?" বলিয়া তিনি গৃহিণীর মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন।

—"সারদা বুঝি কোন খোঁজখবর নেয় না,—করে কি ?" সারদা মানে তাঁর ভ্রাতা, বর্ত্তমান সভার সভাপতিও আমাদের পিতৃদেব।

সুযোগ হাতছাড়া করিলাম না, কহিলাম—"মক্কেল নিয়েই থাকেন, কোন কিছুই দেখেন না।"

শুনিয়াই জ্যাঠামশায় থালা হইতে হাত উঠাইয়া লইলেন, বড়মাকে কহিলেন,—"কেন, তখন তো বিশ্বেস কর নি। এখন শুনলে তো ?"

হঠাৎ আক্রমণে বড়মা সরল মানুষের মত বোকা হইয়া গেলেন, কহিলেন—"আমি আবার কি অবিশ্বাস করলাম, ভাল—"

—"সব অবিশ্বাস করেছ, সারদার সম্বন্ধে কোন কথাই বিশ্বেস কর না। টাকা দিয়ে কি করবে, শুনি ? যাদের জন্য টাকা আয় করা, তাদের দিকেই যদি নজর না দেবে, তবে টাকার দরকারটা কি, বুঝিয়ে বল ত ? কোনটা আসল প্রয়োজন তাই বুঝলে না।"

অনুপস্থিত দেবরের প্রতিনিধি তিনি, তা ছাড়া অবিশ্বাসী বলিয়া ভর্ৎসনা পাইয়াছেন, বড়মা তাই উত্তর দিলেন—"তুমি বললেই শুনব ? সব দিকে তাঁর দৃষ্টি। তাঁর কত কড়া শাসন—তোমার মত নয়।

এ প্রতিবাদ আমার ভাল লাগিল না—"তুমি থামো ত বড়মা। তোমার ঠাকুরপো বলেই তুমি দোষ দেখতে পাও না।"

জ্যাঠামশায় আমাকে থামাইয়া দিলেন—"তুই থাম, আমি বলছি।" থামিয়া জ্যাঠামশায়কে বলিতে দিলাম। জ্যাঠামশায় বলিলেন—"মেয়েমানুষ কিনা, তাই ভাবলে খুব ভাল হচ্ছে এতে। কড়া শাসনে ছেলেমেয়েরা কখনও ভাল হয় শুনেছ ? ছেলেদের স্বাধীন ভাবে গড়ে উঠতে দিতে হয়, দেখ গে সাহেবদের। মানুষ তৈরী করা এত সোজা নয়, বুঝলে ? কড়া শাসনেই যদি ভাল ফল হয়, তবে পুলিশরাই সবচেয়ে বড় মাষ্টার, কি বল বৌমা ?"

যুক্তিতে গৃহিণীকে আহত করিয়া জ্যাঠামশায় সহাস্যমুখে বধূর দিকে ফিরিলেন।

বৌমা বলিলেন,—ইহারা কেন যে কথা বলিতে আসেন,—"ঠিকই বলেছেন। তবে বড়মার কথাটাও ঠিক, শাসন না থাকলে ছেলেমেয়েরা খারাপ হয়ে উঠতে পারে।"—আমার বৌদিটি এমন ভাবে নিক্তি ধরিলেন যে, দুই পাল্লা সমান ভারী দেখাইয়া দিলেন।

এবার আমার দিকে জ্যাঠামশায় ফিরিলেন—"সিনেমা দেখ, খেলা-ধূলা কর, আড্ডা দাও, কিছু বলব না—যদি পড়াশুনা কর। আমার রাগ ত দেখ নি—" বলিয়া আমরা যারা তাঁর রাগ দেখি নাই, তাদের দিক হইতে দৃষ্টি অন্য দিকে যাঁরা তাঁর রাগ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ; সেই বৌদি ও বড়মার দিকে ফিরাইলেন। তাঁহারা, বড়মা ও বৌদি, মুখ বুজিয়াও হাসিতে পারা যায় প্রমাণ করিতেছিলেন।

এলারাণী ভয় পাইয়া বলিল—“দাছু, তোমার আবার রাগ—” কথা শেষ করিতে পারিল না।

উত্তর আসিল—“নাই আবার! বুঝলে?” বলিয়া উঠিতে উঠিতে তিনি বড়মার মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়া লইলেন। এবং কহিলেন—“বুঝলে, সেদিন এক সাহেব—”

বড়মা থামাইয়া দিলেন—“সাহেব এখন থাক, আঁচাও গে আগে।”

—“দাছু, গল্পটা বলে যাও, সাহেব কি—”

বৌদি ধমক দিলেন—“নে, খেয়ে ওঠ।”

মাস কতক পরে।

বড়মার তত্ত্বাবধানে জলযোগ করিতেছিলাম ও ক্লান্ত হইয়া উঠিতেছিলাম। জ্যাঠামশায় আসিয়া চেয়ার টানিয়া বসিলেন এবং বসিয়াই কাজের কথা পাড়িলেন—“তুমি না কি দলে ঢুকেছ?”

বুঝিতে না পারিয়া বড়মার দিকে তাকাইলাম। জ্যাঠামশায়ও আমার পিছনে পিছনে তাড়া করিয়া নিজের দৃষ্টিটাকে সেখানে লইয়া পৌঁছাইলেন। কহিলেন—“পুলিশ সাহেব নিজে আমাকে ডেকে বলেছেন, ও বোমা-পিস্তলের দলে ঢুকেছে। ওকে সাবধান করে দিতে বললেন।”

দৃষ্টিটাকে বড়মার এলাকা হইতে সরাইয়া আনিয়া আমার উপর চড়াও করিলেন—“সাবধান করে দিচ্ছি, খবরদার, ও-সবের মধ্যে যাবে না।”

—“না আমি ও-সবের কিছুই জানিনে।”

—“না, জানেন না! সাহেব মিছে কথা বললেন?—বেশ, তোমার এখানে এত ছেলে আসে কেন শুনি? ভেবেছে, আমার চোখে কিছু পড়ে না?” শেষের অংশ পত্নীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা।

—“consult করে পড়লে সুবিধে হয় তাই আসে।”

—“না, আসতে পাবে না। consult করে পড়তে হলে তুমিই ওদের বাড়ীতে যাবে, ওরা আসবে না—বুঝলে?”

মাথা নাড়িয়া জানাইলাম যে, বুঝিয়াছি।

“সাবধান করে দিচ্ছি, ওদের মধ্যে গেছ কি বাড়ী থেকে সোজা তাড়িয়ে দেব। আমার রাগ তো দেখ নি—” বলিয়া উঠিয়া নিজের কাজের চলিয়া গেলেন, গমনভঙ্গীতে তাঁর না-দেখা রাগটার আভাস দিয়া গেলেন।

বৌদি এলাকে ধমক দিলেন—“কি বোকার মত হাসছিস!”

বড়মা প্রশ্ন করিতে যাইতেছিলেন, আগেই থামাইয়া দিলাম—“তুমি পাগল হয়েছ, আমি যাব ওদের সঙ্গে!”

—“দেখিস বাবা, সর্ব্বনাশ করিসনে।”

—“কি খেপেছ, বলছি যে আমি ওদের মধ্যে নেই। তবু দেখিস বাবা, সর্ব্বনাশ—”

এলা যোগ করিল—“সাবধান বাবা, রাগ তো দেখনি বাবা—”

—“থাম বাঁদরী—” দুজনেই হাসিয়া ফেলিলাম।

দ্বিতীয়বার পুলিশ সাহেব বোধ হয় খুব শাসাইয়া দিয়া থাকিবেন। বাড়ী ফিরিতেই বড়মার ঘরে ডাক পড়িল।

জ্যাঠামশায় বলিলেন—"তোমার এখানে থাকা চলবে না। পুলিশ সাহেব বলেছেন তোমাকে তাড়িয়ে দিতে।"

বড়মা জ্বলিয়া উঠিলেন—"শোন কথা। সাহেব বলেছে আর অমনি বাড়ীর ছেলেকে বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে?"

—"বেশ, জেলে যাক তবে।"

—"কেন, জেলে যাবে কি জন্য শুনি?"

—"তা আমি কি জানি? তিনি বললেন, এতদিন কোন রকমে ঠেকিয়ে রেখেছি, এখানে থাকলে বাধ্য হয়েই গ্রেপ্তার করতে হবে।"

—"কেন? ও কি খুন করেছে না ডাকাতি করেছে যে ধরবে? ধরলেই হোল—"

—"সাহেব পরামর্শ দিলেন, ওকে বিদেশে পাঠিয়ে দিতে, কটা বছর কাটিয়ে আসুক। আমি বলি, ও কিছুদিন হোষ্টেলে গিয়ে থাকুক, কেমন?"

কেমন রাজী হইলেন না, উত্তর দিলেন—"না। আমার সংসারে বাইরের লোকের কথা চলবে না, সে তুমিই হও আর তোমার সাহেবই হোক।"

বড়মার সঙ্গে সওয়ালজবাব শেষ করিয়া জ্যাঠামশায় আমাকে আক্রমণ করিলেন।

—"তোমাকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত।"

এলা কহিল, "কেন দাদু?" কণ্ঠস্বর শুনিয়া অতি কষ্টে হাসি আটকাইলাম।

—"কেন আবার কি? হোক না বিদেশী, রাজা তো? তার বিরুদ্ধে লাগতে যাও কোন আক্কেলে শুনি?—বেশ, মেনে নিলাম। পারবি ওদের ফোর্টের একখানা ইট খসাতে? মনে করেছ ইংরেজ তোমার টিকটিকির ডিম— না?"

—"আমি ওর মধ্যে নেই, যারা আছে তাদের বলুন গিয়ে।" জ্যাঠামশায় আশ্বস্ত হইলেন, কিন্তু কণ্ঠস্বর বদল করিলেন না।

কহিলেন, "তুমি ওদের মধ্যে নেই, সত্যি বলছ?"

—"সত্যি বলছি, আমি নেই।" দ্বিধাহীন উত্তর দিলাম।

—"বেশ। মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করবে। যদি শুনি যে ওদিকে গেছ, মনে রেখ, তোমার মুখদর্শনও আমি করব না। আমার রাগ তো দেখনি—"

সভাপতি মহাশয়, এর পরের ইতিহাস আপনি অবগত আছেন। একটা সপ্তাহ কাটিল না, পুলিশ সাহেব সদলবলে আসিলেন, জ্যাঠামশায়ের সম্মুখেই আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইলেন।

জ্যাঠামশায় বলিয়াছিলেন, "যাও, বেরিয়ে যাও। তোমার মুখদর্শন আমি জীবনে করব না। তুমি এতবড় মিথ্যাবাদী—"

আপনারা জানেন, তিনি তাঁহার কথা রাখিয়াছেন, আমার মুখদর্শন করেন নাই। আমি জেল হইতে বাহির হইবার আগেই তিনি মরিয়াছেন।

সভাপতিমশায়, আপনারা জানেন না, আপনার ভাই মরার আগে আমাকে এক চিঠি লিখিয়াছিলেন। বুড়া হাতের আঁকাবাঁকা অক্ষরে জানাইয়াছিলেন—"খোকা, তোমাকে আমি ক্ষমা করেছি। তোমাকে আমি মুক্তি দিলাম।"

প্রথম কথাটার অর্থ বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু শেষের দিকের কথাটা আজও আমার কাছে পরিষ্কার হয় নাই। তিনি কি বলিতে চাহিয়াছিলেন যে, মুখ না দেখাইবার দায়িত্ব হইতে আমাকে মুক্তি দিলেন, কিম্বা মিথ্যাবাদীর অপরাধ হইতে খালাস দিলেন? সভাপতিমশায়, অথবা তিনি নিজেই মুক্ত হইয়াছিলেন, যার জন্য আমাকে ক্ষমা করিতে পারিলেন। ভিতরে ভিতরে তিনি হয়তো সত্যই রাগী লোক ছিলেন, তাঁর রাগ তো দেখিনি, তাই এ বিষয়ে জ্যাঠামশায় সম্বন্ধে আপনাদের মতামত জানিতে ইচ্ছা করি।

সভাপতিমশায়! জ্যাঠামশায় মরিয়াছেন। আমি আপনাকে আপনার শোকে সমবেদনা জানাইতেছি।

ঐ টাকাটা প্রাপ্তিতে আশা করি আপনি কোন বাধা তৈরী করিবেন না। আমার বড় টাকার দরকার, বিশ্বাস করিবেন।

"—যখন আপনি যেমন, পর তেমন, এই কথা বুঝিব, যখন আপনার সুখ যেমন খুঁজিব, পরের সুখ তেমনি খুঁজিব, যখন আপনা হইতে পরকে ভিন্ন ভাবিব না, যখন আপনার অপেক্ষাও পরকে আপনার ভাবিব, যখন ক্রমশঃ আপনাকে ভুলিয়া গিয়া পরকে সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিতে পারিব, যখন পরেতে আপনাকে নিমজ্জিত রাখিতে পারিব, যখন আমার আত্মা এই বিশ্বব্যাপী বিশ্বময় হইবে, তখনই চিত্তশুদ্ধি হইবে। তাহা না হইলে ডোরকৌপীন ধারণ করিয়া সমস্ত সংসার পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক দ্বারে দ্বারে হরিনাম করিয়া ফিরিলে চিত্তশুদ্ধি হইবে না। পক্ষান্তরে, রাজসিংহাসনে হীরকমণ্ডিত হইয়া বসিয়াও যে রাজা জনৈক ভিক্ষুক প্রজার দুঃখ আপনার দুঃখের মত ভাবে, তাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে। যে ঋষি, বিশ্বামিত্রকে একটি গাভী দান করিতে পারিলেন না, তাঁহার চিত্তশুদ্ধি হয় নাই। যে রাজা অঙ্কগত কপোতের বিনিময়ে আপনার মাংস কাটিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারই চিত্তশুদ্ধি হইয়াছিল।"

—বঙ্কিমচন্দ্র

কণ্টিনেণ্ট

ডক্টর দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়,
এম. এস. সি., পি. এইচ. ডি., এফ. এল. এস., এফ. আর. এইচ. এস.

দু'বছর এডিনবরায় অধ্যয়ন করে দেশে ফেরবার আয়োজন করছিলাম। অনেকে বললেন কণ্টিনেণ্টটা ঘুরে যেতে, কারণ তা না হলে নাকি কৃষ্টির একটা অঙ্গ অসম্পূর্ণই থেকে যায়। সেটা সম্পূর্ণ করে আসতে যখন হিসেব করে দেখলাম এগার বার পাউণ্ড খরচ লাগবে, তখন ঢোক গিলে দেশেই ফিরে আসব ঠিক করলাম। বিলেতে যেমন দু'তিনটে বড় সহর দেখলে বাকী সহরগুলোর কল্পনা করা যায়, কণ্টিনেণ্টও সেই ধরণের হবে মনে হচ্ছিল। আমার অধ্যাপক সার উইলিয়াম স্মিথ বললেন "কণ্টিনেণ্ট দেখে যাচ্ছ তো ?" আমি উত্তরে বললাম যে, অনেক টাকার দরকার বলে সে ইচ্ছেটা পরিত্যাগ করেছি। তিনি কিছুতেই শুনলেন না। বললেন, "বেলজিয়াম, জার্ম্মানির বিশিষ্ট কয়েকটি জায়গা, সুইজার-ল্যাণ্ড, ইটালি এ সব দেখা বিশেষ দরকার। আবার ভারতবর্ষ থেকে ইউরোপে কবে আসতে পারবে কে জানে, অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, রাইন নদীর দুপাশে আঙ্গুরের ক্ষেত, রোমের প্রাচীন স্থাপত্য শিল্প, পম্পিয়াই-এর ধ্বংসাবলী এ সব না দেখে দেশে ফেরা উচিত নয়।" তার ওপর তিনি একটা ভূচিত্রাবলী আনিয়ে প্রত্যেকটা স্থান দেখাতে লাগলেন এবং সে সব জায়গার বিশেষত্ব এবং বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি বলতে লাগলেন। খরচও দু-তিন পাউণ্ড সস্তা হবে আশ্বাস দেওয়ায় ঠিক করলাম যে, মহাদেশটা দেখেই যাব। টাকার টানাটানি হলে বম্বে পৌঁছে টেলিগ্রাম করে বাড়ী থেকে টাকা আনিয়ে না হয় কলকাতা যাওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে। বাড়ীর ল্যাণ্ডলেডি দুঃখ করে বললেন, "তাইতো ডক্টর চ্যাটার্জ্জি, আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালটা সবচেয়ে ভাল সময় আর এই সময়েই আপনি চলে যাবেন ?" উত্তরে বললাম, "দেখুন, বৃটেন সর্ব্বদা যুদ্ধের ভয়ে অস্থির হয়ে আছে, তাছাড়া ডানজিগ নিয়ে একটা গোলমাল হয়ে কখন যুদ্ধ লেগে যায় ঠিক নেই, এ অবস্থায় দেশের ছেলে (বিশেষতঃ বাংলা দেশের ছেলে) দেশে ফিরে যাওয়াই ভাল নয় কি ?* আপনারা



Rhine নদীতীরে Bonn-Prominade :

* প্রবন্ধটি যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বে লিখিত।—অঃ সঃ

হয়তো সমস্ত গ্রীষ্মকালটা গ্যাসমাস্ক পরে বাড়ীর পেছনে মাটির সুড়ঙ্গের ভেতর বসে থাকবেন, আমি হয়তো সে সময়ে নাকে সরিষার তৈল দিয়ে ঘুমুতে পারব।" তিনি আর কিছু বললেন না। তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লণ্ডনে তিন চার দিন কাটিয়ে মে মাসের মাঝামাঝি কন্টিনেণ্টে পদার্পণ করলাম। ডোভার থেকে বেলজিয়ামের বন্দর অষ্টেণ্ড রওনা হলাম। ছোট জাহাজ, কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া, সমুদ্রটায় বড় বড় ঢেউ। তবু ভাল লাগছিল যে, দুটো বছর কাটিয়ে দেশে রওনা হচ্ছি এই ভেবে। আরো ভাল লাগছিল যে, ও দেশের অন্তঃসারশূন্য ভদ্রতার হাত থেকে রেহাই পেলাম মনে করে। কথায় কথায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা, হাঁচলে বা কাসলে সকলকার কাছে ক্ষমা চাওয়া আর ঘুম থেকে উঠে সবাইকে বলা "আহা কি সুন্দর সকাল," এই সমস্ত কৃত্রিম ভদ্রতার বুলি আওড়াতে আওড়াতে জীবনটা একপ্রকার খাপছাড়া হয়ে যাচ্ছিল। যেটা বিশেষ সুন্দর নয়, সেটাকে সুন্দর বলা এবং সেই সঙ্গে আনন্দের আতিশয্য মুখের হাবভাবে দেখান, যেটা খারাপ সেটাকে নানাপ্রকার মিষ্টিকথার ভিতর দিয়ে বেশ মোলায়েম ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া যে জিনিষটা খুব ভাল লাগছে না, এ সব সাহেবরা সত্যিই বেশ চমৎকারভাবে বলতে পারে। এ সমস্ত পাশ্চাত্য-কৃষ্টির একটা বিশিষ্টতা স্বীকার করি, কিন্তু আমাদের দেশের আবহাওয়ায় মানুষ হওয়া যে কোন লোকের কাছে এগুলো বেশীদিন ভাল লাগে না। আমার কোনদিনই ভাল লাগেনি, অথচ বাধ্য হয়ে "How nice, How beautiful. Is it not gorgeous ?" ইত্যাদি নানাপ্রকার আন্তরিকতা-হীন কতকগুলো কথা বলতে হয়েছে। এই সবের হাত থেকে শীগগিরই ছুটি পাব ভেবে বেশ ভাল লাগছিল।



Rolandsbogen, Siebengebrige এবং Badhonnef :

জাহাজ অষ্টেণ্ড পৌঁছতেই কাষ্টমের লোকেরা মালপত্র পরীক্ষা করে ছেড়ে দিলে। পাশেই ষ্টেশন, সেখান থেকে ব্রাসেল্‌সের ট্রেনে রওনা হলাম। ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর একটা কামরায় চুপ করে বসে বসে বাইরের দুধারে সমতল ভূমি, সবুজ মাঠগুলো, মাঝে মাঝে পপলার গাছ এইসব দেখছিলাম। বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ট্রেনে যাতায়াত করতে অনেকটা এই ধরণের দৃশ্য সাধারণতঃ দেখা যায়।

ব্রাসেল্‌সে নেমেই মনে হল সহরটা বড় নোংরা। তাছাড়া মোটরকার, ট্রাম সবই ডানদিক ঘেঁষে চলছে। বৃটেন ছাড়া ইউরোপের সমস্ত দেশেই এই নিয়ম, সকল ট্র্যাফিক "keep to the right"। প্রথম প্রথম খুবই অসুবিধে হয়েছে। দু তিন বার চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছি।

ব্রাসেল্‌সে কয়েক ঘণ্টা থেকেই ট্রেনে কলোঙ্ রওনা হলাম। সেখানে পৌঁছিবার আগে একটা ছোট ষ্টেশনে জার্ম্মানির সীমানায় গাড়ী থামিয়ে কাষ্টম পরীক্ষা হয়। প্রত্যেক লোক কত টাকা নিয়ে জার্ম্মানিতে প্রবেশ করে, এই ষ্টেশনে জার্ম্মান সরকারের লোকেরা সেটা একটা কাগজে জিজ্ঞাসা করে

লিখে দেয়। জার্ম্মানি থেকে বেরুবার আগে সেই কাগজ দেখিয়ে বেরুতে হবে। যত টাকা কাগজে লেখা থাকবে তার চেয়ে বেশী টাকা নিয়ে জার্ম্মানি থেকে বেরুতে দেয় না। ইহুদীরা যাতে কোনপ্রকারে টাকা না পায় সেই জন্যেই এই নিয়ম করা হয়েছে। যাই হোক সেখান থেকেই জার্ম্মানির হাবভাব ও আধুনিক আবহাওয়া লক্ষ্য করতে সুরু করলাম। সরকারী কর্ম্মচারীরা সকলেই মিলিটারি ড্রেস-পরিহিত। সকলকার হাতে একটা চওড়া লাল ফিতের ওপর স্বস্তিকা চিহ্ন, কাল সুতোয় এম্ব্রয়ডারি করা। সকলেই "হের হিটলার" বলে পরস্পরকে অভিনন্দন করছে। গুড মর্নিং বা গুড ইভ্‌নিং বলা একপ্রকার উঠে গেছে। আমিও জার্ম্মানিতে ঢুকে অনেককে "হের হিটলার" বলে প্রতি নমস্কার জানিয়েছি।



Rheinstein : Assmanshausen-এর নিকটে

কলোঙ্ পৌঁছতে বেশ রাত হল। রাত তখন প্রায় সাড়ে এগারটা। স্টেশন থেকে বেরিয়ে সামনের একটা হোটেলে উঠে পড়লাম। রাত্রিতে শোবার জন্যে একটা ঘর নিলাম তিন মার্ক দিয়ে। ঘরটি চমৎকার সাজান এবং বিছানা সব ঘরেই তৈরী থাকে। পরদিন সকালে উঠে সহরে খানিকটা বেড়িয়ে রাইন নদীর ঘাটে গেলাম এবং সেখান থেকে জাহাজে মাইন্‌স রওনা হলাম। রাইন উপত্যকা এবং তার পাশে ব্ল্যাকফরেষ্ট অতি রমণীয় বলে প্রসিদ্ধি আছে। জার্ম্মানির এই অংশটা বহু বিদেশীয় লোকেরা দেখতে আসে। জাহাজেও একদল সুইডেনের শিক্ষক উঠেছিলেন। তাঁরা নানাপ্রকার গান-বাজনা করছিলেন। আমি নেহাৎ একলা চুপ করে এককোণে বসে ছিলাম। যাত্রীদের বেশীর ভাগই জার্ম্মান। একটি তরুণী আমার সঙ্গে প্রথম আলাপ সুরু করলেন। জার্ম্মান ভাষায় কথাবার্ত্তা খানিকক্ষণ চলল। আমার জার্ম্মান ভাষা বেশী জানা ছিল না বলে অসুবিধে হচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, তরুণী সামান্য ইংরেজী জানেন। তিনি সুইজারল্যাণ্ডে কাজ করেন, সেখানে ফিরে যাচ্ছিলেন। রাইন নদীর দুধারের দৃশ্য বসে বসে দুজনে দেখছিলাম এবং মাঝে মাঝে পরস্পরের দেশের সম্বন্ধে নানা বিষয় আলোচনা চলছিল। দুধারে খাড়াই পাহাড়, মাঝে মাঝে ছোট ছোট সহর, তারই ভেতর দিয়ে রাইন নদী এঁকেবেঁকে গিয়েছে। দুধারে রেল-লাইন, মাঝে মাঝে ছোট ছোট রেলগাড়ী যাচ্ছিল। পাহাড়ের ওপর নানাস্থানে প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ বেশীর ভাগ স্থানে আঙ্গুরের ক্ষেত। দূরবীণ দিয়ে দেখে মনে হচ্ছিল, ছোট ছোট আঙ্গুর হয়েছে। সেখানে গ্রামের লোকেরা কাজ করছে। তাদের জামাকাপড় অনেকটা আমাদের দেশের নেপালীদের মত। এই সমস্ত সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতে রাইন নদীর ওপর দিয়ে সারাদিন জাহাজে চলে রাত প্রায় ৯টায় মাইন্‌সে এসে পৌঁছিলাম। সেখানে জাহাজ থেকে নেমে ট্রামে করে ষ্টেশনে এবং সেখান থেকে হাইডেল্‌বার্গ ট্রেনে রওনা হলাম। তার কাহিনী যথাসময়ে আপনাদের জানাবার ইচ্ছা রইল।



সম্পাদকীয়

ভাষার যে দুটি বাহন আছে, তা সকলেই জানেন ; একটি রসনা, অপরটি লেখনী।

লিখিত ভাষা যে মৌখিক ভাষা থেকেই উদ্ভূত, তাও সকলেই জানেন। যে ভাষা মুখে চলে না, শুধু লেখাতেই পাওয়া যায়, সেই ভাষাকেই মৃত ভাষা বলে।

মৃত ভাষার রূপগুণ অসামান্য হলেও, তার প্রধান দোষ হচ্ছে তা মৃত। এক দল পণ্ডিত আছেন যাঁরা মৃত ভাষাকে জীবন্ত ভাষা করতে চান, মৌখিক ভাষার গায়ে মৃত ভাষার কলম বসিয়ে ; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁরা কেউ মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র জানেন না।

কথোপকথনের ভাষাই মূল ভাষা, আর অদ্যাবধি সেইটিই মুখ্য ভাষা। আজ পর্য্যন্ত অনেক দেশে, বিশেষতঃ আমাদের দেশে নিরক্ষর লোকেরই সংখ্যা বেশী ; তাদেরও ভাষা আছে, আর সে ভাষা হচ্ছে কথোপকথনের ভাষা। লিখিত ভাষা থাকা আর না থাকা—তাদের পক্ষে দুই সমান।

আমরা—যারা লিখতে পড়তে জানি—আমাদের পক্ষে মৃত ভাষা হচ্ছে সুধু পড়বার ভাষা—লেখবার ভাষা নয়।

এ স্থলে যাঁরা শিষ্ট, অর্থাৎ যাঁদের বর্ণপরিচয় হয়েছে, তাঁরা অবশ্য অন্ধ হবার যতটা ভয় পান, কালা হবার ভয় ততটা পান না। কারণ পড়তে পারব না, এ দুর্গতির কথা মনে করতেও আমাদের আতঙ্ক উপস্থিত হয়।

এ অবস্থায় আমরা ভুলে যাই যে—

"ইহ শিষ্টানুশিষ্টানাং শিষ্টানামপি সর্ব্বথা
বাচামেব প্রসাদেন লোকযাত্রা প্রবর্ত্ততে"।

যার প্রসাদে লোকে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করে—সে হচ্ছে ভাষা। শিষ্ট-অশিষ্ট সকলেই—এ বিষয়ে ভাষার অধীন। মন আর ভাষা একই বস্তুর এ-পিঠ আর ও-পিঠ।

এখানে শিষ্টদের অর্থাৎ শিক্ষিত লোকদের কথা ছেড়ে দিলেও, সকল লোকে ভাষার সাহায্যেই মনোভাব প্রকাশ করে।

এই কথোপকথনের ভাষা থেকেই আমাদের ক্রিয়াকর্ম্ম সম্বন্ধে মতামত উদ্ভূত হয়।

ধরুন, যে যুদ্ধ হচ্ছে—অথচ হচ্ছে না—সে বিষয়ে যদিও আমরা লিখিত ভাষার মারফৎ কিছুই জানতে পাচ্ছিনে, তবুও সে সম্বন্ধে লোকের কথোপকথন বন্ধ হয় নি, আর একটি মতেরও সৃষ্টি হচ্ছে। লোকমতের উপর রাষ্ট্রতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ফরাসী সাহিত্যিক রুষো প্রথম করেন। তবে এই লোকমত সৃষ্ট হয় কি করে?—আমার বিশ্বাস, লোকসমাজের পাঁচজনের কথোপকথনের ফলে। লোকের কথোপকথন মন দিয়ে শুনলে বোঝা যায় যে, পাঁচজনের মত পাঁচরকম। এই পাঁচরকম মত ঠিক দিয়ে কি একমত পাওয়া যায়?—অবশ্য নয়।

এই কারণে রুষো বলেছেন যে, democracy-র ভিত্তি হচ্ছে general will—অর্থাৎ সকলের সামান্য ইচ্ছা।

এই সামান্য ইচ্ছা যে কি নয়, তা আমরা সকলেই জানি। এই ইচ্ছা ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ ইচ্ছা নয়—আর বহু বিশেষকে যোগ দিয়ে সামান্যকে পাওয়া যায় না।

এমন কি arithmetic-এর হিসাবে একে একে যোগ দিলে দুই হয়, এক হয় না।

এই সামান্য মতও সামান্য ইচ্ছে থেকে উদ্ভূত। সমান্য ইচ্ছে বস্তুটা কি, সে বিচার ইউরোপের মহা মহা দার্শনিকেরা করেছেন; এ স্থলে আমি তার পুনরুক্তি করব না। আমার বিশ্বাস লোকমত সৃষ্ট হয় কথোপকথনের ফলে। কি করে যে এই নানামতের যোগ হয়, তা অবশ্য জানিনে।

বর্ত্তমান যুদ্ধের কোনও খবর নেই, কিন্তু ঘরে ঘরে তার আলোচনা চলছে। ইস্কুলের ছেলে থেকে সুরু করে আমাদের বয়সের লোকও নিত্য এ বিষয়ে আলোচনা করছে।

গত যুদ্ধের সময় প্রায়ই একটি কথা শুনতে পেতুম। সে কথাটা এই—রামে মারলেও মরব, রাবণে মারলেও মরব। এই ছিল সেকালে ধনী সম্প্রদায়ের বুলি। অর্থাৎ জার্ম্মাণীই জিতুক, আর ইংলণ্ডই জিতুক, আমরা যেখানে আছি সেইখানেই থাকব—অর্থাৎ রামরাজ্যে। ইংলণ্ড যখন আমাদের জমিদার ও মহাজন করেছেন, তখন সমাজের এই সুব্যবস্থা জার্ম্মাণী লণ্ডভণ্ড করবে না।

কিন্তু এবার হিটলারের জয় কেউ কামনা করছেন না। কেননা, Kaiser ছিলেন রাজপুত্র, আর হিটলার ছিলেন রংমিস্ত্রী। তাছাড়া সে যুদ্ধে জার্ম্মাণী অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। এ যুদ্ধে জার্ম্মাণী রুষিয়ার আঁচল ধরেছে। আজ পর্য্যন্ত এমন কোনও কলকৌশল দেখাতে পারেনি, যাতে আমাদের মনে তাক্ লাগে। বিশেষতঃ আমাদের যখন কোনও ক্ষমতা নেই, তখন আমরা মামার জয় বলতে বাধ্য।

আমি একদিন ছোকরাদের দলে যুদ্ধ সম্বন্ধে মহা আলোচনা শুনতে পাই। সে আলোচনা আমি অবশ্য শুনতে বাধ্য হই। এ তর্কের মাথামুণ্ড আমি বুঝতে পারিনি—তবে একটি কথা এ কোলাহল ভেদ করে আমার কর্ণগোচর হচ্ছিল। সে কথাটি এই—রাসিয়াই নাকি এই যুদ্ধের হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা। আর রাসিয়ার নাকি আকারসদৃশ প্রজ্ঞা। রাসিয়া যে অতিকায় তা সকলেই জানে, অতএব তার জয় অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু এই নাবালকের দল dialectical materialismএর নামোল্লেখও করেনি। অপর পক্ষে শিক্ষক সমাজের অতএব শিক্ষিত সমাজের আলাপে ও সমাসটি উহ্য থাকে না। কারণ বর্ত্তমান

রাশিয়ায় জার্ম্মাণ দার্শনিক Marx কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত এই ধর্ম্মমতটি বিগ্রহবান হয়েছে। এ ধর্ম্মমতটি কি আমি জানিনে, আর সম্ভবতঃ আর কেউই জানেন না।

রাশিয়ার নূতন পলিটিক্যাল ধর্ম্মমতের নাম Communism। এ মতাবলম্বী লোক রাশিয়ার বাইরেও অনেক আছেন। অবশ্য তাঁরা Communismএর পথাবলম্বী নন। যদিচ জনৈক Marxist Communism সম্বন্ধে বলেন,—It is not a formula, not a doctrine, but a guide to action.

এই প্রফেসারের দল doctrineএরই ভক্ত। তাঁরা Communismএর বিধিনিষেধ পালন করেন না, করতেও প্রস্তুত নন। বিলেতে এ-জাতীয় অনেকে রাশিয়া জার্ম্মাণীর পৃষ্ঠপোষক হওয়ায় বিস্মিত হয়েছেন। এ দেশেও দু'চারজন তাঁদের অনুরূপ প্রফেসার আছেন। তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, Franco-Prussian যুদ্ধের প্রাক্কালে Marx ও Engel যে, manifesto বার করেন, তাতে জার্ম্মাণদের ফ্রান্স ধ্বংস করবার পরামর্শ দেন। কেন না ফ্রান্স ধ্বংস না হলে জার্ম্মাণ জাতি মনে এক হবে না। আর তারা মনে এক না হলে স্বদেশে Communism প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। অতএব পররাষ্ট্রের ও পরসম্প্রদায়ের বিনাশ সাধন Communismএর চিরকেলে মত। রুশিয়া আর যাই হোক, pacifist নয়। এ তন্ত্রের মূলমন্ত্র হচ্ছে Class war। তবে বিলেতে নাকি এমন লোক আছেন যাঁরা মনে করেন যে—If Stalin wants a league against Fascism he is right. If he wants a league with Fascism he is right (New Statesman)। এ দেশেও হয়ত এমন দু'চারজন এই জাতীয় রুশভক্ত থাকতে পারেন, যাঁদের মন ঐ একই ছাঁচে ঢালা। ভক্তি মাত্রই অহৈতুকী প্রীতি।

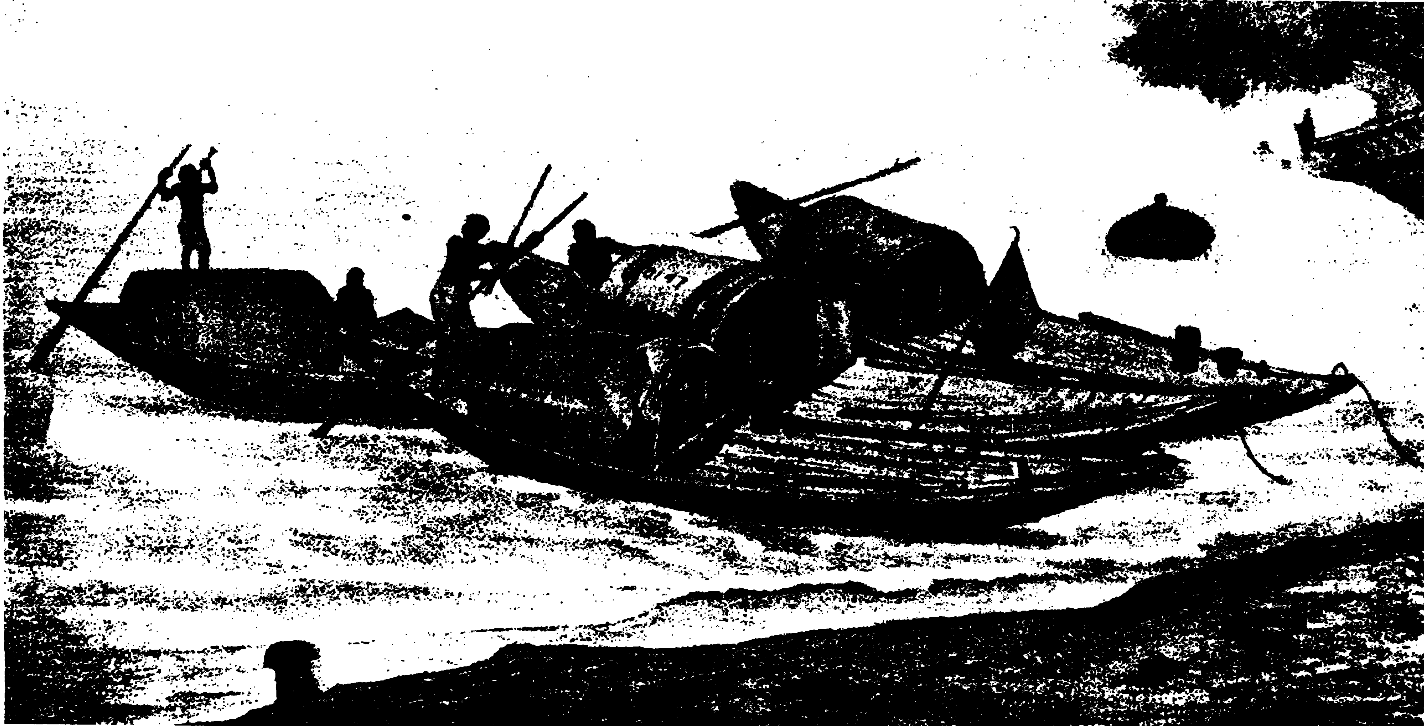
তবে এঁদের কথায় লোকমত গড়ে না; সে মত গড়ে পরস্পরের এলোমেলো কথায়বার্ত্তায়। লোকের কথোপকথনে যে বিক্ষিপ্ত gas জন্মায় তাকে যদি কেউ সংক্ষিপ্ত করতে পারে, তাহলেই তা লোকমত হয়ে আবির্ভূত হয়। এই লোকমত অনুসারে চল্‌বার পথ মহাপুরুষরা আবিষ্কার করে এবং দেখিয়ে দেয়।

ধ্যানধারণা করতে হলে শুনতে পাই আসনসিদ্ধ হওয়া চাই। কিন্তু লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করতে হলে চলা চাই। আমরা গাছের মত দাঁড়িয়ে খাদ্য-সংগ্রহ করতে পারিনে। আর চলতে হলে পায়ের সাহায্য চাই। বলা বাহুল্য পলিটিক্সও লোকমতেরই একটি অঙ্গ। আর চলি আমরা পা দিয়ে, মাথা দিয়ে নয়। সুতরাং পলিটিক্সের শতপথ থাকলে পঙ্গুর পক্ষে না থাকারই সামিল।

আমরা যে একমতাবলম্বী নই, এক পথাবলম্বীও নই, তার কারণ আমাদের মনোরাজ্যেও শত পথ আছে। তার উপরে য়ুরোপ থেকে আমদানী-করা নূতন নূতন মতও আমাদের মাথা ঘুলিয়ে দিচ্ছে। নানা মুনির নানা মত আমরা শুনতে পাই। কিন্তু তার একটিও সকল মন দিয়ে গ্রাহ্য করতে পারি নে। ফলে এক পথেও চলতে পারি নে। আমার মনে হয় আমরা যতদিন নিজমতরূপ একটা নূতন মত না গড়ে তুলতে পারি, ততদিন শুধু ইতস্ততঃ করব।

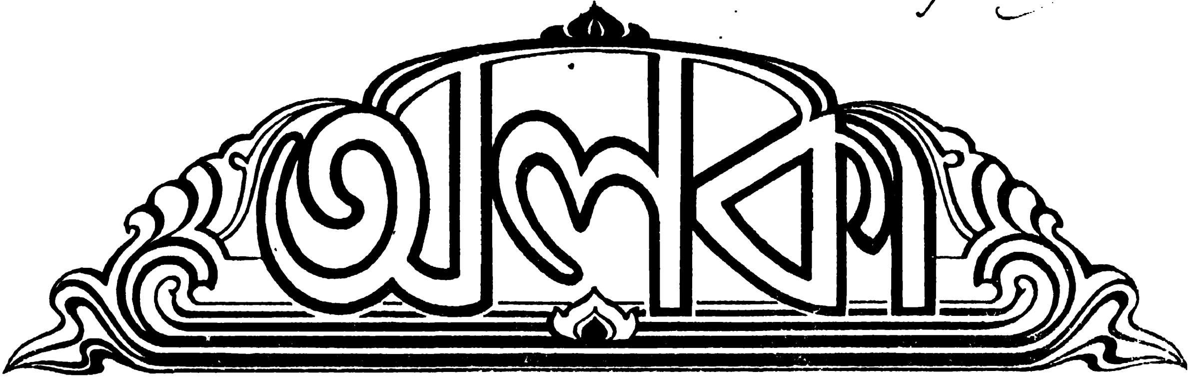
মত জিনিসটে প্রধানতঃ ভাষার কথা। কারণ যে মনোভাব কর্ম্মে প্রয়োগ করা যায় না, তা মতই নয়। যে মতের হয় সমুখে নয় পিছনে পথ না থাকে, সে মত আকাশে ঝোলে। Marxism হচ্ছে জার্ম্মাণ মত, কিন্তু রুশিয়া তাকে পথে পরিণত করেছে। আর সে কারণেই তা ভীষণ হয়ে উঠেছে। আমি আজকের দিনে এ মতের বিচার করব না; কেন না আমার বিশ্বাস Bolshevism dialectical materialismএর কথায় কথায় অনুবাদ নয়;—দরিদ্র Majorityর ধনী Minorityর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। তার আবির্ভাবের মূল পাওয়া যাবে সে দেশের জনগণের নিজেদের ভিতর কথাবার্ত্তায়। এই কারণে লেখা কথার চাইতে মুখের কথাকে বড় বলে মনে করি, যদিচ সে কথা illogical। আমি আমাদের শিক্ষিত সমাজের মনে শুধু নানারকম আলগা মত দেখতে পাই বলে অশিক্ষিত বহুর অন্তরে লোকমত জন্মাচ্ছে বলে কল্পনা করি, যদি চ যা logical এবং rational, তাই আমার বোধগম্য। লোকমত হচ্ছে একরকম subconcious মত।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত
শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও
৩৬।১ এলগিন রোড হইতে প্রকাশিত



গঙ্গাবক্ষে

শিল্পী—শ্রীসুশীল সেন



দ্বিতীয় বর্ষ { মাঘ, ১৩৪৬ } ৫ম সংখ্যা

ফিন্‌ল্যাণ্ড

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এতদিন পৃথিবীর কম-জানা দেশগুলির মধ্যে ফিন্‌ল্যাণ্ড ছিল একটি। আজ য়ুরোপে ইতিহাসের যে সব অগ্ন্যুৎপাত দেখা দিল, তার মধ্যে একটি প্রস্রবণ ঐ ছোট্ট দেশটিতে আপন কেন্দ্র আশ্রয় করেছে। তারই দহন জ্বালায় বিশ্বসমক্ষে ফিন্‌ল্যাণ্ড আজ হঠাৎ উদ্ভাসিত। এখন এর খবর বিশেষ করে জানার দরকার হোলো। সংগ্রহ করে দিচ্ছি।

হেল্‌সিঙ্কি ফিন্‌ল্যাণ্ডের একটি বিশিষ্ট রাজধানী, শোভাসৌষ্ঠবে অসামান্য। সোভিয়েটরা গোলাবর্ষণে সেটাকে প্রায় গুঁড়িয়ে দিলে। দক্ষিণ ফিন্‌ল্যাণ্ড বরফে আবৃত থাকে বৎসরে প্রায় একশো দিন। মধ্য প্রদেশে বরফ থাকে বৎসরের প্রায় অধিকাংশ সময়। ফিন্‌ল্যাণ্ডের নদী ও সরোবরগুলি বরফের আবরণ মোচন করে মার্চ ও এপ্রিলে।

এই দেশ এক সময়ে যখন রাশিয়ার জারের অধীনে ছিল তখন তার উন্নতি সাধন ছিল অত্যন্ত উপেক্ষিত,—ভারতীয় প্রজাদের মতোই অধিকাংশ লোক লেখাপড়ার কোনো ধার ধারত না। জারের শাসনের অবসানে কম্যুনিস্ট রাশিয়া যখন এই দেশকে স্বাধীনতা দিল তখন ফিন্‌রা আশ্চর্য উদ্যম ও বুদ্ধি প্রয়োগ ক'রে তাদের দেশকে য়ুরোপের মধ্যে সকলের চেয়ে প্রগতিশীল করতে প্রবৃত্ত হোলো। এখানকার লোকসংখ্যা চল্লিশ লক্ষর চেয়ে কম। আর একশো বছর পূর্বে ফিন্‌দের সংখ্যা ছিল দশ লক্ষ। বুদ্ধির এবং অধ্যবসায়ের জোরে কী রকম দুঃসাধ্য সাধন করা যায় তা এদেশে দেখা গেল।

অষ্টম খ্রীষ্ট শতকে এরা মধ্য য়ুরোপ থেকে ক্রমশ আদিম অধিবাসী ল্যাপদের উত্তরের দিকে ঠেলে দিয়ে এই বসতির অযোগ্য জলা দেশ দখল করে বসল। এ দেশের প্রায় শতকরা ৬৫ ভাগ জোলো ও বরফে ঢাকা। শতকরা কেবল সাত ভাগ জমি ছিল আবাদের যোগ্য। এ দেশে হ্রদের সংখ্যা ষাট হাজার। তাদের মাঝখানকার জমিগুলি অরণ্যে ঠাসা-ভরতি। ফিন্‌দের মত দরিদ্রজাত

ছাড়া আর কোনো জাত এখানে বাসস্থান কামনা করতে পারে ব'লে মনে করা যায় না। এই দেশের এক দিকে সুইডেন এক দিকে রাশিয়া। বহু শতাব্দী ধ'রে এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির এইখানেই ছিল দ্বন্দ্ব ক্ষেত্র। কখনো সুইডরা কখনো রাশিয়ানরা পালা ক'রে এ দেশ দীর্ঘ কাল ধ'রে দখল করে এসেছে। অবশেষে ১৯১৭ খ্রীষ্ট শতকের পর থেকে এরা স্বাধীনতা ভোগ করে আসছে।

বিশ বছরের কম সময় কাল ফিন্‌রা এই অফলা জমি ও দৌরাত্মপীড়িত প্রজাদের হাতে নিয়ে ভূমিকে সুফলা আর জনসাধারণকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চশিক্ষিত জাতিদের মধ্যে গণ্য করে তুলেছে। নিবিড় বনগুলি কাঠচালানি ব্যবসায়ে এবং কাগজ তৈরির উপযোগী কাঠের পিণ্ড বানাবার কারখানায় ভরে উঠল। আবাদী জমি অর্ধেক সংখ্যক প্রজার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। এই আবাদগুলি কৃষিক্ষেত্রের আদর্শ ব'লে বিখ্যাত। বহু সংখ্যক সরোবরের মাঝে মাঝে খাল কেটে কেটে বাণিজ্যের এবং লোক চলাচলের পথ করে দেওয়া হয়েছে। এই সরোবরগুলির ধারে ধারে ফিন্‌রা যে সব শহর বানিয়েছে সুচারু বাস্তু শিল্পের সেগুলি চূড়ান্ত নিদর্শন। সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, সংগীতে, ব্যায়াম ক্রীড়ায় ফিন্‌রা নামজাদা হয়েছে সমস্ত সভ্যদেশে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে যত লোক নিরক্ষর তার চেয়ে কম নিরক্ষর ফিন্‌ল্যাণ্ডে। এমন উন্নতি ঘটেছে বিশ বছরের মধ্যে। আত্মসম্মানলাভের জন্যে সমস্ত জাতের এই সার্থক সমবেত সাধনা ইতিহাসে এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত। ফিন্‌ল্যাণ্ডের রাষ্ট্রতন্ত্রে সর্বময়কর্তৃত্ব কোথাও নেই। বর্তমান প্রেসিডেণ্ট চাষীর ঘরের ছেলে, তাঁর নির্বাচন জনসাধারণের দ্বারা। ফিন্‌ল্যাণ্ডের বাণিজ্য-ব্যবসায় প্রায় সমস্তটাই সমবায় প্রণালীতে। তাই যখন য়ুরোপের প্রায় সর্বত্র ব্যবসায়ে মন্দা পড়েছিল ফিন্‌ল্যাণ্ডের বাণিজ্য কিছুমাত্র তলিয়ে যাবার লক্ষণ দেখায় নি।

ইতিমধ্যে তার দ্বারে ধাক্কা দিল রাশিয়া। ফিন্‌ল্যাণ্ডের দক্ষিণপূর্বপ্রান্ত রাশিয়ার লেনিনগ্রাড থেকে পনেরো মাইলের মধ্যে। ফিন্‌রা এই দিকটাতে খুব শক্ত কেল্লা বেঁধে রেখেছে। তার কামানের মুখগুলো রাশিয়ার পশ্চিম দুয়ারের দিকে উঁচিয়ে আছে। চল্লিশ লক্ষ মানুষ সতেরো কোটি মানুষের উপরে পাহারা দিচ্ছে।

আরো একটা বিরোধের কারণ আছে। ১৯২০ খ্রীষ্টশতকে লীগ্ অফ নেশন্‌স-কর্তৃক বাঁটোয়ারায় ফিন্‌ল্যাণ্ডের ভাগে পড়েছিল আলাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ। এই দ্বীপগুলি বল্‌টিক সমুদ্রের পথ খোলবার কুলুপ বললেই হয়। এখানে কেল্লাপত্তন রাশিয়া সইতে পারবে না।

সুইডেন ছাড়া য়ুরোপের অন্য সকল দেশের তুলনায় প্রজাদের মাথাগুণতির গড়পড়তায় এখানকার রেলপথ সবচেয়ে লম্বা। শুধু তাই নয় য়ুরোপের সব দেশের চেয়ে রেলের মাশুল এখানে সস্তা। এখানে সমবায় ভাণ্ডার আছে প্রায় গ্রামে গ্রামে। গোষ্ঠজাত সামগ্রী ডিম, মাখন, বাড়ি তৈরি, ফসল ক্ষেতের সার সংগ্রহ, চাষের যন্ত্রপাতি, খবরের কাগজের প্রচার তা ছাড়া অন্যান্য অনেক কারবার সমবেত প্রণালীতেই চলে। উত্তর য়ুরোপের সব চেয়ে বড়ো কাগজের কারখানা এই ছোটো দেশটিতে। তাতে বছরে সাতাশ কোটি মনের বেশি কাগজ তৈরি হয়। মনে রাখতে হবে এই অসামান্য শ্রীবৃদ্ধি চল্লিশ লক্ষ লোকের বিশ বছরের শক্তি প্রয়োগে ঘটেচে, আরো মনে রাখতে হবে, যে যুদ্ধের শেষ ফল কী হবে জানা নেই, কিন্তু আজ পর্যন্ত ওরা এক অতিকায় দানবকে হিমসিম খাইয়ে দিচ্ছে—রাশিয়া এই অসমকক্ষ দ্বন্দ্বে জিতলেও তার লজ্জা ঘুচবে না।

বাঁশরী

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

কি বেদনা জানায় বাঁশরী
কি ব্যথা গভীর!
আশ্বিনের তৃণদল শিশির-মসৃণ,
আশ্বিনের শেফালিকা সুখস্বপ্নলীন,
আশ্বিনের নভস্তল মেঘচিহ্নহীন,
আনন্দিত চিত্ত যে কবির।
কি বেদনা জানায় বাঁশরী
কি ব্যথা গভীর!

কিবা জাদু জানো রে বাঁশরী,
মায়ারসায়ন!
পরাও দুখের পায়ে হাসির নূপুর,
সুখেরে চমকি দেয় বিরহের সুর,
ঝড়ের মেঘের পাড়ে সঁপিলে মধুর
সোনা-গালা কত না বরণ!
কিবা জাদু জানো রে বাঁশরী
মায়ারসায়ন!

কি বেদনা জানায় বাঁশরী
কি ব্যথা গভীর!
ক্ষণস্বর্ণ শিশিরাশ্রু কি তার সম্বল?
বেদনা-অরুণ-বৃন্ত শেফালির দল,
আকাশে আনত কার নেত্র ছল ছল?
উন্মথিত চিত্ত যে কবির।
কি বেদনা জানায় বাঁশরী
কি ব্যথা গভীর।

কিবা জাদু জানো রে বাঁশরী
মায়া সুগভীর!
পরালে ধরার চোখে অধরা কাজল,
স্বরগের আঁখিপাতে ঘনালে বাদল,
চিত্ততলে ফুটাইলে সুরের কমল
আত্মহারা দোটানা কবির!
কিবা জাদু জানো রে বাঁশরী
মায়া সুগভীর।

অহল্যা পাষাণীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার তরফদার

'বিশ্বাস করুন বা না করুন' ভদ্রলোক বলিতে লাগিলেন 'আপনারা বিশ্বাস করুন বা না করুন, অহল্যা পাষাণীর একটা ইতিহাস আছে—হাঁ, একেবারে যাকে বলে খাঁটি ইতিহাস।'

ঘনায়মান সন্ধ্যার ধূসর আলোয় নিস্তব্ধ নদীতীরে চিতা জ্বলিতেছে। নদীর ওপারে পশ্চিম দিগন্তে পিঙ্গল রক্তিমা ; ওখানেও জ্বলিতেছে চিতা, দিনান্তের চিতা।

প্রত্যুত্তরে কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। আমরা কেবল একটু ঘনীভূত হইয়া বসিলাম।

'ওই বাড়ীটা ভাল করে বোধ হয় কোন দিন দেখেন নি। না দেখ্‌বারই কথা। আপনারা নতুন লোক। চারদিকেই আম কাঁঠালের বাগানে এমন ঘেরা ভাল ক'রে নিরীক্ষণ ক'রে না দেখলে ত নজরেই পড়ে না। কাল দিনের বেলায় সময় পান ত একবার ভাল ক'রে দেখবেন। লাল ইটের পাঁচীল দিয়ে ঘেরা। একদিকে ওই পাঁচীলের ওপর থেকেই দোতালা উঠে গেছে। ওই রকম লাল ইটের। কতদিন থেকে ওই ইটের পাঁজরে পাঁজরে গজিয়েছে সবুজ ছ্যাৎলা। হাত দিলে হাত পিছলে যায়। লালে আর সবুজে মিশে রংটা বেশ খোলতাই হয়েছে বলতে হবে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন গোটা বাড়ীটাই একখানি মাত্র পাথর কুঁদে তৈরী করেছে। আর সে পাথরের রংটাই একটা অশুভের সূচনা। মনে হয় যেন অনেক দিনের কি একটা অত্যন্ত ভীষণ অথচ অত্যন্ত গোপন ঘটনাকে ওই পাথরটা তার কুক্ষির মধ্যে লুকিয়ে রেখে শ্বাস রোধ ক'রে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।

ভিতর ও বাইরের একই চেহারা। ওই বাড়ীটারই কথা।

বাড়ীটা অনাদিনাথের—অনাদিনাথ চক্রবর্ত্তী। চলতি কথায় যাকে বলে মাটির মানুষ, অনাদিনাথ ছিলেন তাই। হাঁ, মাটির মানুষ এই কথাটাই বলতে হবে। কারণ, তিনি ঠিক কি রকমের লোক ছিলেন এ প্রশ্ন কেউ করে বসলে বড় মুস্কিলে পড়তে হয়। কেন না তাঁর শান্ত, বেঁটে খাট নাদুস-নুদুস চেহারা ও মৃদুস্বরে অত্যন্ত সাদাসিদে গোছের বাহুল্যবর্জ্জিত আলাপ এর মধ্যে বিশেষ কোন একটা উল্লেখযোগ্য রকমেরই অভাব ছিল। সুতরাং তাঁর কথা মনে করলে শুধু একটি মাত্র কথাই মনে আসে, সে হচ্ছে এই যে লোকটি বড় ভাল মানুষ ছিলেন। এখানকারই ইস্কুলে মাষ্টারী করতেন। মাষ্টারী না করলেও তাঁর চলত অবশ্য। কারণ, পৈত্রিক আমলের জমিজমা ত ছিলই, টাকাকড়িও কিছু ছিল। এবং সংসারে যখন মানুষও মাত্র দুটি, তখন অবস্থা বেশ স্বচ্ছলই বলতে হবে। কিন্তু সংসারে সবাই ত আর টাকার জন্যই কাজ করে না! সুতরাং অনাদিনাথ টাকার জন্য না হলেও কাজ করতেন—এবং সেটা ইস্কুল-মাষ্টারী।

মানদা এঁরই স্ত্রী। এবং এই ব্যাপারটাই আশ্চর্য্য। আশ্চর্য্য শুধু এই জন্য নয় যে মানদা অত্যন্ত সুন্দরী ও শিক্ষিতা, এবং অন্যান্য অনেক সদ্‌গুণের অধিকারিণী, যা পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের মধ্যে খুবই দুর্ল্লভ। না, অদ্ভুত সেজন্য নয়। যা সত্যি সত্যিই আশ্চর্য্য সে হচ্ছে ঐ দুটি মানুষের সম্বন্ধ।

ওরা স্বামী-স্ত্রী। ওদের দুটি বিভিন্ন জীবন একত্র গ্রথিত হয়ে চলেছে কিন্তু এই ঐক্য বাস্তবিক কোথায় সেটা গবেষণার জিনিষ। স্বামী-স্ত্রী একেবারে পরস্পরের বিপরীত। একজনের কোন বিশেষত্ব নেই, আর একজন তার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত বিশেষত্বে ভরা। স্বামী কথা কয় না, কইলেও নিতান্ত প্রয়োজনবোধে, স্ত্রীর মুখের কথা প্রয়োজন অপ্রয়োজন বিচার করে না। অনাদিনাথ কদাচিৎ হাসতেন, মানদার হাসিহীন মুখ অন্ততঃ তৎকালে কেউ কোনদিন দেখেছে বলে মনে পড়ে না। কথায়, গল্পে, হাসিতে, গানে সে যেন পাহাড়ী ঝরণার মত আপন আনন্দে অবাধ। তার খুসী গোপনে তার মনের একান্ত ছুঁয়ে যায় না। সে যখন আসে ফোয়ারার উচ্ছ্বাসে চারদিকে ফেটে পড়ে। তার আনন্দ শুধু তার নিজেকে নিয়ে নয়। নিজেকে নিয়ে, স্বামীকে নিয়ে, আশপাশের আরও অনেককে নিয়ে। এক কথায় তার জীবন ছিল প্রবল, প্রাণ ছিল প্রচুর। এই প্রাচুর্য্যের পাশে অনাদিনাথের স্বল্পস্রোত জীবনের নিরবয়ব সূক্ষ্মতা প্রায় সকলের দৃষ্টির আড়ালেই গিয়ে পড়েছিল।

তবু এদের দুজনের মধ্যে ভালবাসা ছিল। হাঁ, ভালবাসা ছিল, তা বলতেই হবে। বিয়ে হয়েছিল এদের খুব ছেলেবেলায়। সন্তানাদি কিছু হয় নি। কিন্তু তার জন্য কোন অভাব-বোধ এদের ছিল না। মানদা তার হাসি-খুসী, উচ্ছলতাময় প্রাণ-চাঞ্চল্যের মাঝখানে একটুখানি মমতাময় গাম্ভীর্য্য কোথায় গ'ড়ে রেখেছিল। সেই জায়গাটুকু অনাদিনাথের অধিকারে। এ সব ব্যাপার অবশ্য ঠিক বিশ্লেষণ করে কাউকে বোঝান যায় না। আর গেলেও অন্য কোন নাম এর দেওয়া যেত না। একে প্রেমই বলতে হবে। তবে, হয়ত এই প্রেমের রূপ আলাদা। কিন্তু এর পরিচয় আছে, এর প্রকাশও আছে। নিরীহ অনাদিনাথের তৈলচর্চ্চিত মসৃণ দেহের চাকচিক্যে এই অতি-সতর্ক স্নেহের পেলব সৌকুমার্য্য আত্মপ্রকাশ করত।

আর অনাদিনাথ? তাঁর কথা না বললেও চলে। মানুষ হাওয়া থেকেই তার প্রাণ-সম্পদ্ ভোগ করে,—ভেবে দেখতে গেলে কথাটা এই রকমই দাঁড়ায়। বাইরে থেকে ব্যাপারটা কিন্তু একেবারে আলাদা। ব্যবহারিক জীবনে মানুষ বাতাসকে ভোগ করে না, অভ্যাস করে। অনাদিনাথও অভ্যাস করেছিলেন। তাঁর জীবনে প্রয়োজনীয়ের বোধের পরিধি অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ বলেই হোক বা যাই হোক মানদার জন্য তাঁর মনে কোন স্বতন্ত্র চেতনা ছিল না। কিন্তু আমরা জানতাম—নিতান্ত আমরা বলেই জানতাম যে, তাঁর জীবনের আকাশে কেবল একটি সূর্য্য আলো দেয়; সে মানদা। তাঁর নধর-কান্তি শরীরের মধ্যে মন বলে যে যায়গাটা আছে, তার সবখানি জুড়ে মানদার চওড়া লালপাড় শাড়ীর আঁচলের ছায়া।

সুখী? হাঁ, এ রকম অবস্থায় সুখী ওদের বলতে হবে বৈ কি! এবং লোকেও তা বলত। এ গ্রামের মধ্যে ওদেরই সব চেয়ে সুখী দম্পতি ব'লে লোকে মনে মনে খানিকটা ঈর্ষাই করত। আর সত্যি কথা বলতে কি, অনাদিনাথকে একটু আধটু ঈর্ষা এ অঞ্চলের সব পুরুষমানুষই করত। এবং সেটা অন্যায়ও করত না। মানদার মত স্ত্রী—পঁচিশ পেরিয়ে গেলেও যার যৌবনে জোয়ারের উচ্ছ্বাস তখনও থামে নি, আর প্রাণের হাসি যার সেই জোয়ারের প্লাবনের ওপর পূর্ণিমার চাঁদের আলোর মত খেলা করছে, তাকে—কিন্তু, যাক্ সে কথা।

এই সময় মৃত্যুঞ্জয় এখানে আসে। এখানে মানে অবশ্য ওদেরই বাড়ীতে। মৃত্যুঞ্জয় সম্পর্কে অনাদিনাথের কি রকম ভাই হয়। মামাত' কি ঐ গোছের কিছু একটা। বছর পঁচিশ ছাব্বিশ বয়স তখন হবে। কলেজে পড়া আর ছাত্র-সাধারণের নৈতিক চরিত্রের অভিভাবকতা করতে করতে হঠাৎ তার একদিন খেয়াল হয় যে দেশ উদ্ধারটা অবশ্যকর্ত্তব্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। খেয়াল না ক্ষ্যাপামী বন্ধু-বান্ধবরা এইটা ভাল করে বুঝতে না বুঝতেই তার বছর দুই জেল হ'য়ে গেল। খালাস হওয়ার পর এইখানে আসে প্রচারের কাজে।

আশ্চর্য্য ছেলে এই মৃত্যুঞ্জয়। কতখানি আশ্চর্য্য, যে তাকে না দেখেছে তাকে বোঝান যায় না। বিরাট লম্বা জোয়ান। মাংসপেশীগুলা যেন তার লোহার তৈরী। অত বড় চওড়া বুক বাংলা দেশে দেখতে হ'লে খুঁজে হয়রাণ হ'তে হবে। অথচ এই পালোয়ানী চেহারার ওপর তার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ আর শান্ত প্রসন্ন মুখচ্ছবি মানুষের বিস্ময় ও সম্ভ্রমের বস্তু। বাস্তবিক পুরুষমানুষ যে কত সুন্দর হতে পারে, সে কথা মৃত্যুঞ্জয়কে দেখার আগে আমার কোন দিন ধারণা হয় নি। আর আশ্চর্য্য যা বললাম সে ছিল তার এই সৌন্দর্য্য। বিস্মিত হওয়ার, মুগ্ধ হওয়ার যদি কিছু থাকে ত এই। তার কোন ছবি দেখে বা খুব দূর থেকে তাকে দেখে কিছুতেই ধারণা করা যাবে না যে সে কত সুন্দর, এমন কি বলিষ্ঠ দেহ ছাড়া সে সৌন্দর্য্যের বিশেষ কোন উপাদান তার ছিল না তাই মনে হতে পারে। কিন্তু সেই সময় তাকে কাছে থেকে যারা দেখেছে তারা জানে সে কি ছিল। তার এই রূপের, এই মোহময় রূপের কোন ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। শুধু তার সামনে দাঁড়িয়ে তার দিকে চাইলে সহজে, অত্যন্ত সহজে জিনিষটা দেখতে পাওয়া যায় সে হচ্ছে তার দুটি চোখ। অদ্ভুত সেই চোখ; মনে হয় সেই চোখের অধিকারী যে অন্তরে তার কী এক মহাসাধনার দীপ জ্বলছে, সেই দীপের দুই চারটা বিচ্ছুরিত রশ্মি এসে পড়েছে ওর চোখে মুখে। ওকে দীপ্তি দিয়েছে। আর ওর মুখের হাসি, গলার সুর সব কিছুই সেই সাধনার সাক্ষী।

এই মৃত্যুঞ্জয় এল এইখানে স্বদেশী প্রচার করতে। এল অনাদিনাথের বাড়ীতে, মানদার বাড়ীতে। অনাদিনাথ তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করে নিলেন। মানদাও।

এ কাহিনী এইখানে শেষ করতে পারলে ভাল হোতো। কিন্তু ভালটাই সংসারে সব সময় হয় না। অন্ততঃ আমাদের ইচ্ছামত হয় না। কাজেই এ কাহিনীটি এখানে থামে নি। এগিয়ে চলেছে। অনেকদূর এগিয়ে চলেছে। আরও চলবে। কতদূর চলবে সেইটুকু আজও জানি না। যেটুকু জানি তা সংক্ষেপে বলছি।

মৃত্যুঞ্জয় এখানে আসার মাস ছয়েক পরে অনাদিনাথ একদিন নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেলেন। সবাই খুব অবাক হ'য়ে গেল, এবং অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রেও তাঁর সন্ধান পাওয়া গেল না। কিছুদিন পরে একখানি চিঠি এল। অনাদিনাথের চিঠি। তাতে লেখা ছিল "আমার কোন সন্ধান কেউ কোরো না। সংসারে আমার আসক্তি নেই। আমি বৈরাগ্য নিয়েছি। আর ফিরব না।"

এবং আরো বছরখানেক পরে কাশীর একটা বাড়ীতে একদিন সন্ধ্যাবেলা মৃত্যুঞ্জয় মানদার পায়ের ওপর প'ড়ে বললে, 'এবার আমায় মুক্তি দাও।'

মানদা যেন এটার জন্য খানিকটা প্রস্তুত ছিল, খুব অবাক হয় নি। একটু কঠিন হেসে সে বললে, "মুক্তি কি এতই সহজ জিনিষ বন্ধু ?"

মৃত্যুঞ্জয় মাটির দিকে চেয়ে তার আগের কথারই প্রতিধ্বনি করে বললে, "আমায় তুমি ছেড়ে দাও, মানু।"

মানদা বললে, "কারণটা জানতে পারি কি ?"

মৃত্যুঞ্জয় নিরুত্তর।

মানদা বললে, "বল ? কি তোমার অসুবিধা, কি তোমার দুঃখ ?"

মৃত্যুঞ্জয় বললে, "অসুবিধা নেই এইটাই দুঃখ। তা ছাড়া আর যা, তা কাউকে আমি বোঝাতে পারি নে।"

"আমাকে ?" মানদা বললে, "আমাকেও বুঝিয়ে বলতে পার না ? তোমার সুখের জন্য কি আমি করতে বাকী রেখেছি ? বলো, আরো কি করলে তুমি সুখী হও ? আরো কি চাও, বলো ?"

"কিন্তু এই সুখ ত আমি চাই নি।"

মানদা একটু চুপ করে থেকে পরে মুখ তুলে বললে, "কিন্তু কেন চাও নি ?"

মৃত্যুঞ্জয় বললে, "এর মধ্যে—এর মধ্যে কোন সৌন্দর্য্য নেই।"

মানদা তীক্ষ্ণ চোখে ওর মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কেন নেই, আমাকে বুঝিয়ে বলতে পারো ?"

মৃত্যুঞ্জয় বললে, "বলতে হয়ত পারি, কিন্তু তুমি বুঝবে না। তাই—সে থাক্।"

মানদা বললে, "না, থাকবে না, থাকলে চলবে না। একদিন ত তুমি আমাকে চেয়েছিলে, সেদিন ত থাক বল নি ? আর আজ শুধু শুধু আমাকে অসুন্দর বলে চলে যেতে তোমাকে আমি দেব ? কখনো না।"

মৃত্যুঞ্জয় বললে, "তোমাকে অসুন্দর ত বলি নি মানদা ?"

"বলনি ?" মানদা ওর কাছে স'রে এসে ওর একখানা হাত হাতের মধ্যে নিয়ে বললে, "বলনি ? আচ্ছা দেখত চেয়ে, আজও আমি তেমনি আছি ? তেমনি সুন্দর ?"

"হাঁ, তেমনি। বোধ হয় তার চেয়েও।"

"তবে ?"—এবার আর একটু কাছে সরে এসে ওর চোখের ওপরে চোখ রেখে বললে, "তবে আরও কি চাও ? আমি সুন্দর, তুমি সুন্দর এর বাইরে আর কি দেখার আছে ? এই দুই সৌন্দর্য্যের প্রদীপ জ্বালিয়ে আমরা পূজা করে চলেছি—দেহের পূজা। এ পূজা তুচ্ছ নয়, এ একটা উৎসব। আমাদের দেহ-দীপালির উৎসব। এর কবিতা—কবিতার চেয়েও সুন্দর। কেন চোখ বুজে থাক ? দেখ, দেখ চেয়ে।"—বলতে বলতে মুখটা আরও সরে এল।

হাত ছাড়িয়ে দু'পা পিছিয়ে গিয়ে মরীয়া হয়ে মৃত্যুঞ্জয় চেঁচিয়ে উঠল, "কিন্তু আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে এসেছে, আমি মরে যাচ্ছি।"

সেই আর্ত্তস্বর শুনে মানদা থমকে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ ওর দিকে চেয়ে চেয়ে পরে আস্তে আস্তে

বললে, "নেশা কেটে গেছে একেবারে? এখন তা হলে তুমি কি করতে চাও?" ওর সুরে কত কালের হতাশা যেন জমাট হয়ে উঠেছে। মানদা,—মানদা যেন কতদূর থেকে কথা বলছে!

মৃত্যুঞ্জয় আবার ওর পায়ের ওপর পড়ে বললে, "নিষ্ঠুর হয়ো না মানদা, আমি মুক্তি চাই। আমায় ছেড়ে দাও।"

মানদা সরে গেল না। সেইখানে দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল। চেয়ে চেয়ে হঠাৎ এক সময়ে সে হেসে উঠল। ভীষণ সেই হাসি। যেন অনেকদিন পরে বুক ভরে হাসবার মত কিছু সে দেখতে পেয়েছে। সে হাসি আর থামে না। মৃত্যুঞ্জয় অবাক হয়ে সেইখানে ব'সে রইল। অনেকক্ষণ পরে হাসি থামলে মানদা শীকারীর মত নিষ্ঠুর চোখে ওর দিকে চেয়ে বললে, "আমি ত আগেই বলেছি বন্ধু, মুক্তি চাইলেই পাওয়া যায় না। আজ যদি আমি তোমাকে মুক্তি দিইও তুমি তা' নিতে পারবে না। তা যদি পারতে তবে আমার পায়ে ধরে আজ তোমাকে মুক্তি চাইতে হোতো না।" এই বলে মানদা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একটু অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "মাপ করবেন, কিন্তু এ সব গোপন ব্যাপার আপনি জানলেন কি করে? আপনিই কি তবে—

"আরে না, না। আমি মৃত্যুঞ্জয় নই। তবে মৃত্যুঞ্জয় আমার বন্ধু। পরে একদিন মৃত্যুঞ্জয় মাতাল অবস্থায় আমাকে সব ঘটনা বলেছিল।"

জিজ্ঞাসা করিলাম "তারপর বলুন।"

ভদ্রলোক বলিতে লাগিলেন, "তারপর সে দিন সন্ধ্যাবেলা মৃত্যুঞ্জয়ের বিদ্রোহের চেষ্টা এই ভাবে ব্যর্থ করে দিয়ে মানদা নিশ্চিন্ত মনে শুতে চলে গেল। পরদিন সকালে উঠে কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়কে কোথাও দেখা গেল না। সে নিরুদ্দেশ।

অনেক খোঁজ করেও তার সন্ধান পাওয়া গেল না। আর মেয়েমানুষ কতই খোঁজ করবে? কিছুদিন পরে মানদা বাড়ী ফিরে এল। সে প্রায় বছর চারেক আগের কথা।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "শেষ?"

"শেষ? শেষ কি এর কোন দিন আছে? তবে হাঁ, একজনের দিক থেকে এ কাহিনীর অবসান হয়েছে বটে, কিন্তু সে তখন নয়। হয়েছে আজ, এই বিকেল বেলা। সে মৃত্যুঞ্জয়। ওই যার চিতা জ্বল্‌ছে।"

বলিলাম, "বলেন কি? এই আমরা যাঁকে নিয়ে এলাম—ইনিই মৃত্যুঞ্জয়? ইনি আবার এলেন কি করে?"

অদ্ভুত ভাবে একটু হেসে অনেকটা যেন আপন মনেই তিনি বললেন, "ওকে কি বলে ইংরেজীতে—হাঁ লোড্‌ষ্টোন্ লোড্‌ষ্টোন—শুধু ভার আছে যে তাই নয়, টানও আছে। বুকে চেপে পিশে মারে বটে, আবার দূরে থেকে কাছেও টানে। প্রাণহীন পাষাণের এই আকর্ষণ এড়ান কঠিন। মৃত্যুঞ্জয়ও বেশীদিন পারে নি। কয়েক মাস পরেই সে আবার ফিরে এসেছিল।"

তারপর চুপ করিয়া তিনি ওপারের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

বুদ্ধের কঠোর সাধনা

শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া

বুদ্ধের বুদ্ধত্ব সাধনা-লব্ধ সম্পদ্। জাতক গ্রন্থের বিবরণ-অনুসারে তাঁহার এই সাধনা বহু জন্ম-জন্মান্তরব্যাপী। প্রণিধান মুহূর্ত্ত হইতে বুদ্ধত্ব লাভ পর্য্যন্ত তাঁহার পূর্ব্বজীবন বিস্তৃত। এই পূর্ব্ব-জীবনে তিনি বোধিসত্ত্ব নামেই বিশেষিত। তিনি বুদ্ধত্ব লাভের সুদৃঢ় সঙ্কল্পের মুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া বহু শত জন্মে বিভিন্নভাবে দান, শীল, প্রভৃতি দশ কিংবা ছয় পারমিতা পূর্ণ করিয়া শেষজন্মে বুদ্ধত্বলাভের অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন। শেষজন্মেও তাঁহাকে কঠোর সাধনায় রত হইতে হইয়াছিল। তাঁহার বাণীসমূহের বিশেষত্ব এই যে, সমস্তই অনুভূত সত্য, কাহারও নিকট তাহা ধার করা বিদ্যা নয়। মহাভিনিষ্ক্রমণ বা সংসার পরিত্যাগের পূর্ব্বে শাক্য রাজকুমাররূপে বহু ভোগসুখে প্রতিপালিত এবং লিপ্ত হইয়া তিনি উহার অসারতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। পরে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, সন্ন্যাস গ্রহণের পর, তিনি রাজগৃহ হইতে উরুবেলায় (বর্ত্তমান বুদ্ধগয়ায়) গমন করিলেন। তৎসন্নিহিত শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে ছয় বৎসর দুষ্করচর্য্যা বা কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন নগ্নপ্রব্রজিত অচেলক বা আজীবিক রূপে। এই শ্রেণীর সাধকগণ চতুরঙ্গ ব্রহ্মচর্য্য পূর্ণ করিতেন, এই অর্থে তাঁহাদিগকে চতুরঙ্গী বা চৌরঙ্গী বলা যাইতে পারিত। পরম তপস্বিতা, পরম রুক্ষতা, পরম জুগুপ্সিতা এবং পরম প্রবিবিক্ততাই তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্য বা ধর্ম্মসাধনার চারি প্রধান অঙ্গ। এই কঠোর সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে না পারিয়া তিনি সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে, পূর্ব্ব-আচরিত আত্মনিগ্রহ নির্ব্বাণ-মুক্তি-লাভের প্রকৃত পথ নহে। অবশেষে এই ব্রত পরিহার করিয়া সেনানীগ্রাম দারিকা সুজাতা প্রদত্ত পায়সান্ন ভোজনের পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, জাগতিক ভোগবিলাস এবং সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের আত্মনিগ্রহের পথ পরিহার করিয়া মধ্যপথ অবলম্বন করিলে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। তাঁহার পূর্ব্বজীবনের কঠোর সাধনার বিষয় সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে পরবর্ত্তী বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে। গান্ধারে খোদিত কঙ্কালসার মূর্ত্তিতেও তাঁহার এই কঠোর সাধনার অপূর্ব্ব অবদান দেদীপ্যমান হইয়াছে। আমরা পরবর্ত্তী গ্রন্থসমূহের বিবরণ অথবা বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যের প্রমাণের উপর নির্ভর না করিয়া নিম্নে পালি মূল গ্রন্থের মধ্যম নিকায়ের অন্তর্গত মহাসিংহনাদ বা লোমহর্ষ সূত্র হইতে তাঁহার স্বপ্রদত্ত বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি। এই সূত্রে তিনি তাঁহার অগ্রশিষ্য স্থবির শারিপুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :—

আমি চতুরঙ্গসমন্বিত ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়াছি; আমি তপস্বী হইয়াছি,—পরম তপস্বী; আমি রুক্ষ হইয়াছি,—পরম রুক্ষ (কঠোর সাধক); জুগুপ্সী হইয়াছি,—পরম জুগুপ্সী; প্রবিবিক্ত হইয়াছি,—পরম প্রবিবিক্ত (পরম কেবলী)।

প্রথম, আমার তপস্বিতার স্বরূপ এই : আমি অচেলক (নগ্ন প্রব্রজিত), মুক্তাচারী, হস্তাবলেহী হইয়াছি। 'ভদন্ত! আসুন, ভিক্ষা গ্রহণ করুন' বলিলে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করি নাই। পূর্ব্ব হইতে কেহ অপেক্ষা করিয়া থাকিলে সে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করি নাই। আমার জন্য ভিক্ষান্ন প্রস্তুত হইয়াছে

বলিয়া জানাইলে তাহা গ্রহণ করি নাই। কোন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি নাই। কুম্ভীমুখ (পাত্রাভ্যন্তর) হইতে প্রদত্ত ভিক্ষা গ্রহণ করি নাই। 'কালোপিমুখ' (কটোরাভ্যন্তর) হইতে প্রদত্ত ভিক্ষা গ্রহণ করি নাই পাছে তাহা চামচের আঘাতে ব্যথা পায়। উনান মধ্যে রাখিয়া কেহ ভিক্ষা দিলে তাহা গ্রহণ করি নাই পাছে সে উনানে পড়িয়া যায়। মুষল মধ্যে রাখিয়া কেহ ভিক্ষা দিলে তাহা গ্রহণ করি নাই। যেখানে দুজন ভোজন করিতেছে, তন্মধ্যে একজনকে ভোজন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া ভিক্ষা দিতে হইলে ভিক্ষা গ্রহণ করি নাই পাছে তাহার আহার নষ্ট হয়। গর্ভবতী স্ত্রীলোক ভিক্ষা দিলে তাহা গ্রহণ করি নাই পাছে গর্ভস্থ সন্তান কষ্ট পায়। শিশুকে স্তন্য পান করাইবার সময় পাছে শিশুর কষ্ট হয় সেই জন্য ভিক্ষা গ্রহণ করি নাই। স্বামীসহবাসকালে স্ত্রীলোকের নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করি নাই পাছে তাহার রতিসুখে বিঘ্ন ঘটে। সৎকার্য্যের সময়[১] ভিক্ষা গ্রহণ করি নাই। যেখানে আহার পাইবে আশায় কুক্কুর দাঁড়াইয়া থাকে, যেখানে আহার-উদ্দেশে মক্ষিকা একত্র সঞ্চরণ করে, সেখানে ভিক্ষা গ্রহণ করি নাই। মৎস্য মাংস আহার করি নাই, সুরা, মৈরেয় ও মদ্য পান করি নাই। মাত্র এক গৃহ হইতে সংগৃহীত ভিক্ষান্ন হইতে এক গ্রাস ভোজন করিয়াছি, দুই গৃহ হইতে সংগৃহীত ভিক্ষান্ন হইতে মাত্র দুই গ্রাস ভোজন করিয়াছি,···সপ্ত গৃহ হইতে সংগৃহীত ভিক্ষান্ন হইতে মাত্র সাত গ্রাস ভোজন করিয়াছি। মাত্র একদত্তিতে (একবার প্রদত্ত পরিমিত দানে) দিন যাপন করিয়াছি, মাত্র দুই দত্তিতে দিন যাপন করিয়াছি···মাত্র সাত দত্তিতে দিন যাপন করিয়াছি, এক দিন অন্তর, দুই দিন অন্তর, তিন দিন অন্তর,···সপ্তাহ অন্তর আহার করিয়াছি।

এইরূপে এমন কি অর্দ্ধমাস অন্তর ভিক্ষান্ন ভোজনে নিরত হইয়া অবস্থান করিয়াছি। শাক-ভোজী, শ্যামাকভোজী, নীবারভোজী, দর্দ্দুরভোজী (পরিত্যক্ত চর্ম্মভোজী), শৈবালভোজী, কণভোজী, আচামভোজী, পিণ্যাকভোজী, তৃণভোজী, গোময়ভোজী, ফলমূলাহার কিংবা ভূপতিত ফলভোজী হইয়া দিন যাপন করিয়াছি। আমি শাণবাকৃচেল ধারণ করিয়াছি, মশানলব্ধ বস্ত্র ধারণ করিয়াছি, শবাচ্ছাদন ধারণ করিয়াছি, পাংশুকূল (পরিত্যক্ত নক্তক) ধারণ করিয়াছি, তিরীট (বল্কল) ধারণ করিয়াছি, অজিন (মৃগচর্ম্ম) ধারণ করিয়াছি, কুশচীর, বাকৃচীর (বল্কল), ফলকচীর (দারুচীবর) ধারণ করিয়াছি, কেশকম্বল ধারণ করিয়াছি, ব্যালকম্বল ধারণ করিয়াছি, উলূকপক্ষ (পালক নির্ম্মিত) বস্ত্র ধারণ করিয়াছি, কেশ শ্মশ্রুমণ্ডন-কার্য্যে নিরত হইয়াছি। উৎকুটিক হইয়া উৎভ্রষ্টিক হইয়া আসন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক উৎকুটিক সাধনে নিরত হইয়াছি। কণ্টকশায়ী হইয়া কণ্টকশয্যায় শয়ন করিয়াছি। দিবসে তিনবেলা উদক অবরোহণ (জলে অবতরণ) কার্য্যে নিরত হইয়াছি। এইরূপে বহুপ্রকার বহুবিধ কায়তাপন পরিতাপন অভ্যাসে নিযুক্ত হইয়া বিচরণ করিয়াছি।

শারিপুত্র! ইহাই আমার পক্ষে পূর্ব্বতপস্বিতা।

শারিপুত্র! ইহাই আমার পক্ষে রুক্ষতা (কঠোর সাধন)। বহুবৎসর ধরিয়া আমার দেহে ধূলাবালি সঞ্চিত হইয়া পাট বাঁধিয়াছে। শারিপুত্র! যেমন বহুবর্ষ ধরিয়া তিন্দুকস্থাণু রাশীকৃত ও পাট-পাট হয়, তেমন ভাবেই বহুবর্ষ ধরিয়া আমার অঙ্গে রজঃমল সঞ্চিত হইয়া পাট বাঁধিয়াছে। আমার এমনও মনে হয় নাই যে, আমি এই রজঃমল হস্তদ্বারা পরিমার্জ্জিত করিব, অপর কেহ আমার

১ দুর্ভিক্ষাদির সময় স্ব স্ব সম্প্রদায়ের সাধুগণের ভোজনের জন্য লোক রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে—

অঙ্গের এই রজঃমল হস্তদ্বারা পরিমার্জ্জিত করিবে তাহাও আমার মনে উদিত হয় নাই। শারিপুত্র! ইহাই আমার পক্ষে পূর্ব্বরুক্ষতা বা কঠোর সাধন।

শারিপুত্র! ইহাই আমার পক্ষে জুগুপ্সিতা। আমি স্মৃতিমান হইয়া সাবধানে চলাফেরা করিয়াছি, যাহাতে বিপাকে পড়িয়া আমার দ্বারা ক্ষুদ্র প্রাণীও আঘাত না পায়। সামান্য জলবিন্দুতেও আমার দয়া উপস্থাপিত ছিল! শারিপুত্র। ইহাই আমার পক্ষে পূর্ব্ব জুগুপ্সিতা (পাপে ঘৃণা)।

শারিপুত্র! ইহাই আমার পক্ষে প্রবিবিক্ততা (বিবেক-বৈরাগ্য সাধন)। আমি কোন এক অরণ্যায়তনে প্রবিষ্ট হইয়া বিচরণ করিয়াছি। যখনই কোন গোপবালককে, পশুপালককে তৃণাহরণ-কারীকে, কাষ্ঠাহরণকারীকে, অথবা বনে ফলমূলসন্ধানকারীকে (বনকর্ম্মীকে) দেখিয়াছি, আমি বন হইতে বনে, গহন হইতে গহনে নিম্ন হইতে নিম্নস্থলে, উচ্চ হইতে উচ্চস্থলে গিয়া পড়িয়াছি, যাহাতে তাহারা আমাকে দেখিতে না পায়, আমিও তাহাদিগকে দেখিতে না পাই। শারিপুত্র! যেমন অরণ্যচারী মৃগ মানুষকে দেখিয়া বন হইতে বনে, গহন হইতে গহনে, নিম্ন হইতে নিম্নস্থলে, উচ্চ হইতে উচ্চস্থলে ছুটিয়া যায় তেমন ভাবেই, শারিপুত্র! যখনই আমি কোন গোপবালককে, পশুপালককে, তৃণাহরণকারীকে, কাষ্ঠাহরণকারীকে, বনকর্ম্মীকে দেখিয়াছি, তখনই আমি বন হইতে বনে, গহন হইতে গহনে, নিম্ন হইতে নিম্নস্থলে, উচ্চ হইতে উচ্চস্থলে গিয়া পড়িয়াছি, যাহাতে তাহারা আমাকে দেখিতে না পায়, আমিও তাহাদিগকে দেখিতে না পাই।

শারিপুত্র! যখন গোষ্ঠ হইতে গাভী সকল চলিয়া গিয়াছে, গোপবালকগণও চলিয়া গিয়াছে, তখন হামাগুড়ি দিয়া তথায় যাইয়া স্তন্যপায়ী তরুণ বাছুরের গোময় আমি আহার করিয়াছি। শারিপুত্র! ভূপতিত হইবার পূর্ব্বেই স্বমলমূত্র গ্রহণ করিয়া আহার করিয়াছি। ইহাই আমার পক্ষে পূর্ব্বমহাবিকটভোজন।

শারিপুত্র। কখনও বা অপর কোন এক ভীষণ বনখণ্ডে প্রবেশ করিয়া বিচরণ করিয়াছি। সেই ভীষণ বনের ভীষণতা এই যে, যে কেহ অবীতরাগ হইয়া তাহাতে প্রবেশ করে, বহুল পরিমাণে তাহার রোমাঞ্চ উপস্থিত হয়।

শারিপুত্র! শীত ও হেমন্ত ঋতুতে, হিমপাত সময়ে, অন্তর-অষ্টকায় যে সকল বিভীষিকাপূর্ণ রাত্রি সে সকল রাত্রিতে সারারাত্রি উন্মুক্ত আকাশতলে এবং সারাদিন বনখণ্ডে বিচরণ করিয়াছি। গ্রীষ্মঋতুর শেষমাসে দিনে উন্মুক্ত আকাশতলে এবং রাত্রিতে বনখণ্ডে বিচরণ করিয়াছি। শারিপুত্র! সেই সময়ে আমার অন্তরে এই অশ্রুতপূর্ব্ব আশ্চর্য্য ভাবোদ্দীপক গাথা স্ফূর্ত্ত হইয়াছিল :—

তপ্ত, সিক্ত, একা আমি ভীষণ সে বনে।
নগ্ন অচেলচক মুনি আসীন আসনে
অগ্নি বিনা, মৌন ধ্যায়ী লক্ষ্যের সাধনে॥

শারিপুত্র! আমি শ্মশানে শবাস্থিকে উপাধান করিয়া শয়ন করিয়াছি। এমনও ঘটিয়াছে যে, গোপবালকগণ আমার নিকট আসিয়া অঙ্গে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিয়াছে, কর্ণকুহরে শলাকা প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে, অথচ আমি বিশেষভাবে জানি কখনও তাহাদের প্রতি আমি পাপচিত্ত উৎপাদন করি নাই। শারিপুত্র! ইহাই আমার পক্ষে পূর্ব্ব উপেক্ষা-বিহার।

শারিপুত্র! কতিপয় শ্রমণ ব্রাহ্মণ এই মতবাদী, এই দৃষ্টিসম্পন্ন আহার-সংযমে আত্মশুদ্ধি হয়, কুল (বদরী) মাত্র আহারে জীবন যাপন করিব, একথা বলিয়া তাঁহারা কুল ভক্ষণ করেন, কুলোদক পান করেন, বহুপ্রকারে বহুকুলে প্রস্তুত খাদ্য ভক্ষণ করেন। শারিপুত্র! আমি বিশেষরূপে জানি যে, আমি দিনে মাত্র একটি কুলে আহার শেষ করিয়াছি। শারিপুত্র! তোমার মনে হইতে পারে, তখন ভুক্ত কুলটি বুঝি অতি বৃহৎ ছিল। বিষয়টি এই ভাবে দেখিও না। এখন যেমন, তখনও কুলটি ঠিক এই আকারেই ছিল। শারিপুত্র! দিনে মাত্র একটি কুলে আহার শেষ করিতে গিয়া আমার দেহ অতিরিক্ত মাত্রায় ক্ষীণ হইয়াছিল, যেমন অশীতলতা অথবা কাললতা সন্ধিস্থানে মিলাইয়া মধ্যভাগে উন্নত অবনত হয় তেমন ভাবেই সেই অল্পাহারনিমিত্ত আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দুরবস্থা হইয়াছিল, উষ্ট্রপদের সংযোগস্থলের ন্যায় আমার গুহ্যদ্বার অবিশদ গর্ত্তসদৃশ হইয়াছিল। সেই অল্পাহারহেতু আমার পৃষ্ঠকণ্টক যষ্টিতে বেষ্টিত সূত্রাবলীর ন্যায় দেখিতে উন্নত-অবনত হইয়াছিল। যেমন জীর্ণ গৃহের বরগাগুলি উৎলগ্ন-বিলগ্ন (এলোমেলো) হয় তেমন অল্পাহারহেতু আমার বক্ষপঞ্জরগুলি উৎলগ্ন-বিলগ্ন হইয়াছিল। যেমন গভীর উদপানে (কূপে) উদকতারকা (উদকচন্দ্র, প্রতিবিম্ব) গভীর জলে প্রবিষ্ট হয়, তেমন সেই অল্পাহারহেতু অক্ষিকূপে অক্ষিতারকা গভীরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। যেমন তিক্ত অলাবু (করলা) কচি অবস্থায় ছিন্ন হইলে বাতাতপস্পর্শে সহসা সংম্লান হয় তেমন অল্পাহারহেতু আমার শিরচর্ম্ম বাতাতপস্পর্শে ম্লান হইয়াছিল। শারিপুত্র! সেই অল্পাহার-হেতু আমার উদরচর্ম্ম এমন ভাবে পৃষ্ঠকণ্টকে লীন হইয়াছিল যে উদরচর্ম্মে হস্তস্পর্শ করিলে পৃষ্ঠ-কণ্টক ধরিয়াছি বলিয়া মনে হইয়াছে, পৃষ্ঠকণ্টক স্পর্শ করিলে উদরচর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছি বলিয়া মনে হইয়াছে।

শারিপুত্র! মলমূত্র ত্যাগ করিতে গিয়া সে স্থানেই কুব্জ হইয়া ভূপতিত হইয়া পড়িয়াছি। শারিপুত্র! সেই অল্পাহার হেতু দেহ আশ্বস্থ করিতে গিয়া হস্তদ্বারা গাত্রে হাত বুলাইয়াছি,—গাত্রে হাত বুলাইতে গিয়া পচিতমূল লোমসমূহ অঙ্গ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে।

শারিপুত্র! কতিপয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এই মতবাদী, এই দৃষ্টিসম্পন্ন : সংসার-গতিতে (জন্মজন্মান্তর গ্রহণে) আত্মশুদ্ধি হয়। দীর্ঘকালের মধ্যে আমি যত সংসারে পূর্ব্বে পরিভ্রমণ করিয়াছি তন্মধ্যে শুদ্ধাবাস দেবলোক ব্যতীত অপর কোন লোকে জন্ম সুলভরূপ (সুখের আবাস) নহে। শারিপুত্র! শুদ্ধাবাস দেবলোকে জন্মলাভ করিলে পুনরায় এই মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিতে হয় না। কতিপয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এই মতবাদী, এই দৃষ্টিসম্পন্ন : পুনরুৎপত্তিতেই আত্মশুদ্ধি হয়। কিন্তু দীর্ঘকালের মধ্যে যত লোকে উৎপন্ন হইয়াছি, তন্মধ্যে শুদ্ধাবাস দেবলোক ব্যতীত অপর কোন লোকে উৎপত্তি সুলভরূপ (সুখের জন্ম) নহে। শারিপুত্র! শুদ্ধাবাসে উৎপন্ন হইলে পুনরায় এই মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিতে হয় না। কতিপয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এই মতবাদী, এই দৃষ্টিসম্পন্ন : বিভিন্ন ভবাবাসে জন্মগ্রহণ দ্বারা আত্মশুদ্ধি হয়। কিন্তু আমি দীর্ঘ-কালের মধ্যে যতগুলি ভবাবাসে পূর্ব্বে গমন করিয়াছি—তন্মধ্যে শুদ্ধাবাস দেবলোক ব্যতীত অপর কোন ভবাবাস সুলভরূপ নহে। শারিপুত্র! শুদ্ধাবাসে বাস করিতে পারিলে পুনরায় এই মর্ত্ত্যে আগমন করিতে হয় না।

কতিপয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এই মতবাদী, এই দৃষ্টিসম্পন্ন : বহু যজ্ঞ সম্পাদনে আত্মশুদ্ধি হয়। কিন্তু আমি দীর্ঘকালের মধ্যে রাজ্যাভিষিক্ত মুকুটপরিহিত ক্ষত্রিয়রূপে অথবা মহাশাল ব্রাহ্মণরূপে যত যজ্ঞ করিয়াছি তন্মধ্যে কোনটি সুলভরূপ (সুখদায়ক) নহে।

কতিপয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এই মতবাদী, এই দৃষ্টিসম্পন্ন : অগ্নি-পরিচর্য্যা (অগ্নিহোত্র) দ্বারা আত্মশুদ্ধি হয়। কিন্তু শারিপুত্র ! আমি দীর্ঘকালের মধ্যে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয়-রূপে অথবা মহাশাল ব্রাহ্মণরূপে পূর্ব্বে যতবার অগ্নি-পরিচর্য্যা করিয়াছি, তন্মধ্যে তাহার কোন বার সুলভরূপ (সুখদায়ক) হয় নাই।

শারিপুত্র ! কতিপয় শ্রমণ ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এই মতবাদী, এই দৃষ্টিসম্পন্ন : যদবধি কোন ব্যক্তি—তরুণ, যুবা, শিশু, কৃষ্ণকেশ, প্রথম বয়সে পূর্ণ-যৌবনসম্পন্ন থাকে, তদবধি তিনি পরমতীব্রপ্রজ্ঞাসম্পন্ন থাকেন। আর যখনই তিনি জরাজীর্ণ, বৃদ্ধ, বৃদ্ধজাতীয়, অধ্বগত, উপনীতবয়ঃ, অশীতিবর্ষবয়স্ক, নবতিবর্ষবয়স্ক, অথবা শতবর্ষবয়স্ক হন, তখন তিনি সেই প্রজ্ঞার তীব্রতা হারাইয়া বসেন। শারিপুত্র ! বিষয়টি এইরূপে দেখিবে না। আমিও তো এখন জীর্ণ, বৃদ্ধ, বয়স্ক, অধ্বগত, উপনীতবয়ঃ হইয়াছি,—এবং আমার বয়স হইতেছে অশীতি বৎসর ! আমার চারিজন শ্রাবক (উন্নত শিষ্য) আছেন, যাঁহাদের শতবর্ষ আয়ু, শতবর্ষ জীবন, অথচ তাঁহারা পরমগতি, স্মৃতি ও ধৃতি-সম্পন্ন এবং পরম ও তীব্রপ্রজ্ঞাসম্পন্ন। যেমন, শারিপুত্র ! দৃঢ়পণ, শিক্ষিত, সিদ্ধহস্ত এবং পারদর্শী ধনুগ্রাহী (ধনুর্ধারী) অল্লায়াসে লঘুকাণ্ডের দ্বারা তির্য্যকভাবে তালচ্ছায়া বিদ্ধ করেন, তেমন ভাবেই অধিক মাত্রায় স্মৃতিমান, গতিমান, মতিমান, ধৃতিমান এবং পরম তীব্র প্রজ্ঞাসম্পন্ন আমার এই শিষ্যগণ অশন, পান, খাদন ও আস্বাদন, মলমূত্রত্যাগ, নিদ্রা ও বিশ্রাম ব্যতীত অপর সব সময় আমাকে চারি-স্মৃতিউপস্থানের এক একটি বিষয় লইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন এবং আমিও জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর প্রদানে প্রশ্ন ব্যাখ্যা করি। তাঁহারা ব্যাখ্যাতকে ব্যাখ্যাতরূপে অবধারণ করিয়া তদ্বিষয়ে তদুপরি দ্বিতীয়বার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন না। শারিপুত্র ! তথাগতের ধর্ম্মদেশনা অপরিক্ষীণ, ধর্ম্ম-পদব্যঞ্জন অপরিক্ষীণ, প্রশ্নের উত্তরদানক্ষমতা অপরিক্ষীণ, শতবর্ষজীবী, শতবর্ষবয়স্ক, আমার সেই চারি শিষ্য শতবর্ষ পরে কালপ্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু শারিপুত্র ! তোমরা আমাকে মঞ্চোপরি বহন করিয়া গমন করিবে এ হেন অবস্থা আমার হইবে না, তথাগতের প্রজ্ঞার তীব্রতার ব্যতিক্রম হইবে না।

"মানুষ একেবারে অবসন্ন হইয়া কহিল, "দেবদূত, আমার প্রাণবায়ু বাহির করিয়া দেও। এই দেহ অচেতন ধূলি-কণায় মিশিয়া যাউক্। অসহ্য এ অনন্তের ভার ! এ জগতের শেষ কোথায় ?"

তখন দেবদূত কহিলেন, "তোমার সম্মুখে অন্ত নাই। ইহাতেই কি তুমি অবসন্ন হইয়াছ ? পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখ, এ জগতের আরম্ভ-ও নাই।"

শেষও নাই, আরম্ভও নাই।"

—আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

বঙ্গের নেতৃবৃন্দ

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

[আমার লেখা পুরোনো কাগজপত্রের মধ্যে একটি লেখা পেলুম, যেটি পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নি। আমি এখন যে সেটি প্রকাশ করতে উদ্যত হয়েছি, তার কারণ বহু বন্ধু-বান্ধব আমাকে আমার reminiscence লিখতে অনুরোধ করেন। যদি তা পরে কখন লিখি তাহলে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি তার অন্তর্ভূর্ত হবে। এ লেখার কোন তারিখ নেই কিন্তু অনুমান করছি যে, হয় ১৯১৯ কিম্বা ১৯২০তে এ কটি কথা লিখেছিলুম। অর্থাৎ যে কালে শ্রীযুক্ত মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী মহাত্মা ব'লে পরিচিত হন নি।]

১৯০২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেসের একটি অধিবেশন হয়। সেই সময় ৺ফিরোজ সা মেহেতা, শ্রীযুক্ত চিমনলাল সেতলওয়াড্ ও মিষ্টার কামা আমার আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই সূত্রে বোম্বাই প্রদেশের আরও কয়েকজন রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে, তাঁ'দের মধ্যে ৺গোপালকৃষ্ণ গোখলের নাম উল্লেখযোগ্য।

তখন বুয়ার-যুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে এবং সেই যুদ্ধজয়ের প্রসাদে ইংরেজের ইম্পিরিয়াল অহঙ্কার অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষের বড়লাট এবং ইম্পিরিয়ালিজমের অবতার লর্ড কার্জ্জন এই সুযোগে আমাদের উপর নানারূপ উপদ্রব করতে আরম্ভ করেছিলেন, এবং সেই সঙ্গে আমাদের বাক্যযন্ত্রণা দিতে কসুর করেন নি।

ফলে আমাদের দুর্দ্দশা ও পরাধীনতার বিষয় তিনি আমাদের সম্পূর্ণ সচেতন করে তুলেছিলেন। সত্য জিনিষটি ভারতবর্ষে কস্মিন কালেও ছিল না, বিলেত থেকে ইংরাজ সেই বস্তু এদেশে এনেছেন— এই কথায় আমরা বাঙ্গালীরা এতই অপমানিত মনে করি যে, এই লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার দায় থেকে কি করে অব্যাহতি লাভ করা যায়, সে বিষয়ে আমাদের ঘরে ঘরে দিবারাত্র কল্পনা জল্পনা চলত। এর থেকে পাঠকমাত্রেই বুঝতে পারবেন যে, সে সময়ে ইংরাজ-রাজের প্রতি আমাদের যে মনোভাব সজাগ হয়ে উঠেছিল তাকে ঠিক অনুরাগ বলা যায় না।

পূর্ব্বোক্ত বম্বের নেতারা সবাই ছিলেন, আজকের ভাষায় যাকে বলে মডারেট। এ ক্ষেত্রে আমার সঙ্গে তাঁদের মতের যে মিল হত না, সে বলাই অধিক।

যাঁরা আমার অতিথি ছিলেন তাঁদের সঙ্গে আমি অবশ্য বাক্‌যুদ্ধ করতুম না, ভদ্রতার খাতিরে। শ্রীযুক্ত ফিরোজ সা মেটা ও শ্রীযুক্ত কামা এই দুই পার্সি ভদ্রলোকের কথার আমি কখনই প্রতিবাদ করি নি। কেন না দু'ঘণ্টার আলাপেই বুঝতে পেরেছিলুম যে আমাদের মনের সঙ্গে তাঁদের মনের অনেকটা প্রভেদ আছে। দেখলুম, ভারতবর্ষের অতীত বলে যে একটা কাল ছিল, সে জ্ঞান তাঁদের নেই এবং থাকলেও সেই অতীতের প্রতি তাঁদের কোনরূপ শ্রদ্ধা নেই, কেন না সে অতীত তাঁদের পূর্ব্বপুরুষের হাতে গড়া জিনিষ নয়।

শ্রীযুক্ত চিমনলাল সেতলওয়াডের সঙ্গে অবশ্য দেশের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে

আলোচনা হত। তিনি আমার পলিটিকাল মতে সায় না দিলেও আমার কথা বুঝতে পারতেন, তা ছাড়া তাঁর বুদ্ধি এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, তাঁর সঙ্গে আলাপ করে সুখ ছিল।

এই সময়ে আমি আবিষ্কার করি যে বঙ্গে নেতাদের আর যাই গুণ থাক তাঁদের মনে idealism নামক ধর্ম্মটি মোটেই নেই। একমাত্র গোখলে সে ধর্ম্মে বঞ্চিত ছিলেন না। তিনি মার্‌হাট্টা হ'লেও স্বভাবে বাঙালী ছিলেন। এর পর বলা বাহুল্য যে আমার সঙ্গে তাঁর ধুন্ধুমার তর্ক হত। গত বিশ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে, আমার মনে এই ধারণা জন্মেছে যে ব্রাহ্মণ মাত্রেই ঘোর তার্কিক, তা তিনি বাঙ্গালীই হোন আর মাদ্রাজীই হোন, কাশ্মিরীই হোন আর মহারাষ্ট্রীই হোন। আমরা স্বজাতিরা পোনেরো মিনিট তর্ক করতে না করতে ভাষার তর্ক সুরু করে দিই, তার পর ব্যাকরণের চুলচেরা বিচার আরম্ভ করি। কংগ্রেসের বহু নেপথ্যশালায়—কংগ্রেসের resolution নিয়ে পরস্পরবিরোধী পক্ষ ব্রাহ্মণদের এহেন তর্ক আমি স্বকর্ণে শুনেছি। কংগ্রেসের প্রস্তাবকে শাস্ত্রবচন গণ্য করে তার টীকাভাষ্য নিয়ে আমরা স্বভাবতই কথা কাটাকাটি আরম্ভ করি। ন্যায় আমাদের রক্তে আছে। গোখ্‌লে মহোদয়ের সঙ্গে তর্কের ফল দাঁড়াল এই যে—তিনিও তাঁর মত ছাড়লেন না, আমিও আমার মত ছাড়লুম না।

তার পর তিনি একদিন শ্রীযুক্ত মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁর সাক্ষাৎ আমি প্রথমে কোথায় লাভ করি তা আমার দিব্য মনে আছে। সে স্থান হচ্ছে ১৯ নম্বর ষ্টোর রোড, বালীগঞ্জ। তবে কবে তা ঠিক মনে নেই। আমার বিশ্বাস ১৯০৩ সালের জানুয়ারি মাসে।

আমার সঙ্গে গান্ধী মহোদয়ের পরিচয় করিয়ে দেবার ভিতর গোখ্‌লে মহোদয়ের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বলতেন যে আমাদের মত লোকের পলিটিকাল মতামতের কোনই মূল্য নেই, কেন না স্বদেশের জন্য বা স্বজাতির জন্য আমাদের কোনরূপ শাস্তি ভোগ করতে হয় নি। মুখে এ কথার কোনও প্রতিবাদ না করলেও মনে এ কথা গ্রাহ্য করতে পারি নি। গুরু মহাশয়ের বেত পিঠে না পড়লে যে দুয়ে দুয়ে চার করবার অধিকার কারও জন্মায় না, এ বিশ্বাস আমার তখনও ছিল না, আজও নেই। আর মানুষে যাকে চিন্তা করা বলে, তা ঐ দুয়ে দুয়ে চার করবার কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি পেটন না খেয়েছে তার মতামতের যে কোনও মূল্য নেই—এ যুক্তি হচ্ছে একট প্রকাণ্ড fallacy বিলেতি ন্যায়ের ভাষায় যাকে বলে argumentum ad hominum।

গোখলে মহোদয় আমাকে গান্ধী মহোদয়ের মত শোনাতে চেয়েছিলেন এই কারণে যে, তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর উপর অত্যাচার দূর করবার প্রচেষ্টায়—সে দেশের গভর্ণমেন্টের হাতে যথেষ্ট শাস্তি ভোগ করেছিলেন। সংবাদপত্রের মারফৎ তাঁর কীর্ত্তি-কলাপ আমার সবই জানা ছিল এবং সেই কারণ তাঁর স্বজাতি-বাৎসল্যের প্রতি এবং সেই সঙ্গে তাঁর চরিত্রবলের প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল।

গোখলে মহোদয় আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমার মতামতের কথাও উল্লেখ করলেন। সে মতামত তাঁর কাছে একেবারেই অগ্রাহ্য হল। কেননা সেকালে ইংরাজ জাতির মহত্ত্বে তিনি অতিশয় শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, এবং দেখলুম যে তিনি সত্যসত্যই বিশ্বাস করেন যে,

একমাত্র আবেদন নিবেদনের প্রসাদেই আমরা আমাদের পলিটিকাল অবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারব। এ স্থলে পাঠকদের মনে করিয়ে দিই যে, সেকালে আমাদের রাজনীতিতে 'স্বরাজ্য' শব্দ জন্মগ্রহণ করে নি।

আমি চুপ করে রইলুম, কারণ আমি যখন তাঁর মত গ্রাহ্য করতে পারলুম না, তখন কিছু বলতে হলে তাঁর কথার প্রতিবাদ করতে হয়। প্রথম পরিচয়ে একটা সুরু করে দেওয়া, ভদ্রতার নিয়ম নয়; তা ছাড়া আমি স্পষ্টই দেখতে পেলুম যে গান্ধী মহোদয় তার্কিক শ্রেণীর লোক নন। আমি যদি তাঁর কথার প্রতিবাদ করতুম তা হলে খুব সম্ভবত তিনি কোনও প্রত্যুত্তর করতেন না, কেননা তিনি একান্ত মিতভাষী। তার পর যাঁরা হাতে কলমে কোনও কাজ করেছেন তাঁরা কথাকাটাকাটি করতে স্বভাবতঃই নারাজ। আমার সঙ্গে তাঁর মতে না মিলুক, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দিহান হলুম যে তিনি এদেশের রাজনৈতিক দলের ভিতর একজন অগ্রগণ্য কর্ম্মী। তিনি নিজের মত অনুসারে চলতে ও কাজ করতে যে তিলমাত্র দ্বিধা করবেন না, এ সত্য ঐ পাঁচ মিনিটের আলাপেই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

আজ আঠারো বৎসর আগে আমার মনে এই ধারণা হয়, যে বম্বের মডারেট নেতাদের মধ্যে সব চাইতে বেশি বুদ্ধিজীবী ছিমনলাল সেতলওয়াড; সব চাইতে বেশি Idealist গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে আর সব চাইতে বেশি চরিত্রবান লোক হচ্ছেন শ্রীযুক্ত মোহনচাঁদ গান্ধী। এ মত আমি আজ পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করবার কোনও কারণ দেখতে পাই নি, যদিচ এঁদের মধ্যে কারও শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে আমি পারি নি। এই তিন ব্যক্তিতে যদি এক ব্যক্তি হত, তা হলে আমি মুহূর্ত্তমাত্র দ্বিধা না ক'রে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতুম।

স্বপ্ন

শ্রীসুধীরচন্দ্র গুপ্ত

সূর্য্যদগ্ধ মরুভূমি,
যতদূর দৃষ্টি যায় বালুকাবিস্তার;
বিশীর্ণ কণ্টকীলতা
সে রুদ্র প্রান্তরতলে স্বপ্ন দেখে কা'র!
সে কি ভাবে, মুহূর্ত্তেকে
টুটিবে এ ক্ষণমিথ্যা তপ্ত মরীচির,
তাহারে পরশি' যা'বে
দক্ষিণ সমুদ্রচারী সজল সমীর!

অসূর্য্য সিন্ধুর তলে
নিরালোক, নিস্তরঙ্গ আঁধার প্রচ্ছায়—
ব্যর্থবর্ণ, মূক লতা
শান্ত ছন্দে স্বপ্নে বুঝি আন্দোলিছে কায়
তা'রো কি স্বপনে জাগে
দূরবর্ত্তী বালুকার দিগন্তবিথার,—
উজ্জ্বল মধ্যাহ্নসূর্য্যে
বন্ধহীন আলোকের অনন্ত উৎসার!

বিপিনের সংসার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন সকালে বিপিন রোদে পিঠ দিয়া বসিয়া ঔষধ বিক্রীর হিসাবের খাতা দেখিতেছে, এমন সময় শান্তি পিছন হইতে এক প্রকার চুপি চুপি আসিল—উদ্দেশ্য বোধ হয় বিপিনকে চমকাইয়া দেওয়া বা অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহার সাহচর্য্যের আনন্দ দান করা। উদ্দেশ্য খুব সুস্পষ্ট না হইলেও সে এমনি প্রায়ই করে আজকাল। বিপিনও শান্তির সঙ্গে মিলিতে মিশিতে পূর্ব্বের মত সঙ্কোচ বা জড়তা অনুভব করে না।

সামনে ছায়া পড়িতেই বিপিন পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল শান্তি হাসি মুখে দাঁড়াইয়া। বিপিন কিছু বলিবার পূর্ব্বে শান্তি বলিল—কি করচেন ?

বিপিন বলিল—এসো শান্তি, হিসেব দেখচি—

—একটা কথা বলতে এলাম, কাল চলে যাচ্চি এখান থেকে—

বিপিন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—কোথায় ? কোথায় যাবে !

শান্তি হাসিতে হাসিতে বলিল—বাঃ, কোথায় কি ! আমার যাবার জায়গা নেই ! এখানে কি চিরকাল থাকবো ? বলেচি তো সেদিন আপনাকে।

—ও ! শ্বশুর বাড়ী যাবে ?

—হুঁ, উনি আসবেন কাল সকালে।

বিপিন চুপ করিয়া রহিল। দু একটা কথা যাহা সে ঝোঁকের মুখে বলিতে যাইতেছিল চাপিয়া গেল। মেয়েদের ভালবাসা লইয়া সে আর নাড়াচাড়া করিবে না। যাহা হইয়াছে যথেষ্ট। শান্তি বিবাহিতা মেয়ে, তাহাকে সে কিছুই বলিবে না ওসব কথা। শেষ পর্য্যন্ত উভয় পক্ষই কষ্ট পায়। না, উহার মধ্যে আর নয়।

শান্তি যেন একটু দুঃখিত হইল। সে যাহা বিপিনের মুখে শুনিবার আশা করিয়াছিল তাহা না শুনিতে পাইয়া যেন নিরাশ হইয়াছে। বলিল—এখন আর অনেক দিন আসবো না—

বিপিন বলিল—কবে আসবে।

—তার কিছু কি ঠিক আছে ? তা বেশ, যখনই আসি, আসি আর নাই আসি, আপনার আর কি !

শান্তি এ ধরণের কথা কেন বলিতে আরম্ভ করিল হঠাৎ ! কি জবাব দিবে এ কথার সে ?

তবুও বিপিন বলিল—না, আমার কিছু নয়, আমার কিছু নয়, তোমায় বলেচে ! আমার খাওয়ার মজাটা তো সকলের আগে নষ্ট হোল।

—বৌদিদিদের বলে যাচ্চি, সে সবের জন্য কিছু কষ্ট হবে না আপনার। তা বলে আর কোনো কষ্ট রইল না তো ?

বলা চলিত এবং বলিতেও ইচ্ছা হইতেছিল, শান্তি তুমি চলে গেলে আমার এ জায়গা আর ভাল লাগবে না। দিনের মধ্যে সব সময় তোমার কথা মনে হবে। কেন আমায় আবার এ ভাবে জড়ালে শান্তি ? যদি চলেই যাবে, তবে কেন দুদিনের জন্য মায়া বাড়ানো ?

বিপিন সে ধরণের কথার ধার দিয়াও গেল না। বলিল—তা তোমাদের বাড়ী যত্ন যথেষ্টই পেয়ে আসচি, তোমাদের বাড়ীতে আশ্রয় না পেলে আমার এখানে ডাক্তারী করাই হোত না—

শান্তি মুখ ভার করিয়া বলিল—আপনার কেবল ওই সব কথা। কি করচি আমরা ? আপনি ব্রাহ্মণ, আমরা আপনাকে আশ্রয় দিইচি—অমন কথা বুঝি লোকে বলে ? সত্যি, বলবেন না আর ও কথা। বলতে নেই।

পরদিন শান্তির স্বামী আসিয়া তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল। বিপিন ডিস্‌পেন্‌শারি হইতে ফিরিয়া দুপুরে নিজের ছোট্ট চালায় রাঁধিতে বসিয়াছে, শান্তি সেখানে আসিয়া গলায় আঁচল দিয়া দুই পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—যাচ্চি।

—যাচ্চি বলতে নেই, বলতে হয় আসচি।

—যদি আর না-ই আসি ?

—বলতে নেই ও কথা। এসো, আসবে বৈ কি—

—বলচেন আসতে তো। তা হোলে আসবো, ঠিক আসবো। শান্তি কথা শেষ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, বিপিনের মনে হঠাৎ বড় করুণা ও সহানুভূতি জাগিল ইহার উপর। যাইবার সময় একটা কথা শুনিয়া যদি সে খুসি হয়, আনন্দ পায়। মুখের কথা তো, কেন এত কৃপণতা।

সে বলিল—তুমি চলে যাচ্চ, সত্যি, মনটা খারাপ হয়ে গেল বড্ড।

শান্তি বিদ্যুৎবেগে ফিরিয়া দাঁড়াইল, বিপিনের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া এক ধরণের অদ্ভুত ভঙ্গিতে বলিল—আপনার মন খারাপ হবে ? ছাই !

বিপিন অবাক হইয়া গেল শান্তির চমৎকার ফিরিবার ভঙ্গিটি দেখিয়া।

সে উত্তর দিল—ছাই না, সত্য সত্য বলচি।

শান্তি হাসিমুখে বলিল—আচ্ছা আসি।

কথা শেষ করিয়া সে আর দাঁড়াইল না।

পলকে প্রলয় ঘটাইয়া দিয়া গেল শান্তি। ইহাও ওই শান্ত মেয়েটির মধ্যে ছিল। বিপিন ভাবেও নাই কোন দিন। ওর এ অদ্ভুত নায়িকামূর্ত্তি এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল কেমন করিয়া ? মেয়েরা পারে—ওদের ক্ষমতার সীমা নাই। অবস্থাবিশেষে দশমহাবিদ্যার মত এক রূপ হইতে কটাক্ষে অন্য রূপ ধরিতে উহারাই পারে।

শান্তি চলিয়া গেলে গোটা বাড়ীটা ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল। রোজ সন্ধ্যার সময় শান্তি চা করিয়া আনিত সে ডাক্তারখানা হইতে ফিরিলেই। আজ সন্ধ্যায় আর কেহ আসিল না। দত্ত মহাশয়ের পুত্রবধূদের অত দায় পড়ে নাই। বিপিন নিজেই একটু চা করিয়া লইল। সংসারের ব্যাপারই এই, চিরদিন কেহ থাকে না। মানীকে দিয়াই সে জানে। জালে জড়াইব না বলিলেই কি না জড়াইয়া থাকা যায় ? কোথা হইতে আসিয়া যে জোটে।

সন্ধ্যায় চা পান শেষ করিয়া উনুনে হাঁড়ি চড়াইয়া বিপিন রান্নাঘরের বাহিরে আসিয়া খানিক বসিল। বেশ জ্যোৎস্না উঠিয়াছে—তিন চার দিন আগেও শান্তি এ সময়টা তাহাকে চা দিতে আসিয়া গল্প করিয়াছে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, রোজই করিত। আজ সত্যই ফাঁকা ঠেকিতেছে, কিছু ভাল লাগিতেছে না। নিজের মনের অবস্থা দেখিয়া সে নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। শান্তি তাহার কে ? কেউ নয়, দুদিনের আলাপ—এই তো কিছুদিন আগেও সে ভাবিত, মানীর মত ভালবাসা জীবনে আর কাহারও সঙ্গে কখনো হইবার নয়—হইবেও না। মানী ছাড়া আর কাহারও জন্য মন খারাপ হইতে পারে—এ কথা কিছুদিন পূর্ব্বেও কেহ বলিলে সে কি বিশ্বাস করিত ? এখন সে দেখিয়া বুঝিতেছে মনের ব্যাপার বড়ই বিচিত্র, কেহই বলিতে পারে না কোন্ পথে কখন তাহার গতি।

বৃদ্ধ দত্ত মহাশয় ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে আজকাল সন্ধ্যার পর বাহিরে আসেন না। আজ কি মনে করিয়া তিনি বিপিনের রান্নাঘরে আসিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া খানিক গল্পগুজব করিলেন। শান্তির কথাও একবার তুলিলেন, মেয়েটি আজ চলিয়া গেল। কন্যা-সন্তানের মত সেবা যত্ন কে করে, পুত্রবধূরাও তো আছে, তেমনটি আর কাহারও নিকট পাওয়া যায় না, ইত্যাদি।

—বিপিন বলিল শান্তি বড় ভাল মেয়েটি।

—অমন চমৎকার সেবা আর কারো কাছে পাইনে ডাক্তারবাবু। আমার এই বুড়ো বয়সে এক এক সময় সত্যই কষ্ট পাই সেবার অভাবে। কিন্তু ও এখানে থাকলে—আর ব্রাহ্মণের ওপর বড় ভক্তি। আপনার চাটুকু, জল খাবারটুকু ঠিক সময়ে সব দেওয়া, সেদিকে খুব নজর। বাড়িতে যদি কোন দিন ভাল কিছু খাবার তৈরি হয়েছে, তবে আগে আপনার জন্যে তুলে রেখে দিত।

দত্ত মহাশয় উঠিয়া গেলে বিপিন খাইতে বসিবার উদ্যোগ করিল। এ সময়টা দু একদিন শান্তি দালানের জানালায় দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিত, ও ডাক্তারবাবু, একটু দুধ আজ বেশী হয়েছে আমাদের, আপনার খাওয়া হয়েছে, না হয় নি ? নিয়ে আসবো ?

মানী গেল, শান্তি গেল। এই রকমই হয়। কেহই টিকিয়া থাকে না শেষ পর্য্যন্ত।

পরদিন সকালে ডাক্তারখানায় আসিল ভাসানপোতা মাইনর স্কুলের সেই বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী। বিপিন তাহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। শেষবার যখন তাহার সঙ্গে দেখা, তখন মানীদের বাড়ি সে চাকুরী করে, মানীর গল্প করিয়াছিল ইহার কাছে। বিশ্বেশ্বর আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিল, তাহার অদৃষ্টে এ পর্য্যন্ত কোনো নারীর প্রেম যোটে নাই। বিশ্বেশ্বর কি করিয়া জানিল সে পিপলিপাড়ার হাটতলায় ডাক্তারখানা খুলিয়াছে!

বিশ্বেশ্বর বলিল—আপনি খবর রাখেন না বিপিনবাবু, আমি আপনার সব খবর রাখি। আপনাদের গাঁয়ের কৃষ্ণ চক্কত্তির সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়—ভাসানপোতায় ওঁর বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েচেন না? তাঁর মুখেই আপনার সব কথা শুনেচি। তা আপনার কাছে এসেচি একটা বড় দরকারী কাজে। আপনাকে একটি রুগী দেখতে এক জায়গায় যেতে হবে।

বিপিন বলিল—কোথায় ?

—এখান থেকে ক্রোশ দুই হবে—জেয়ালা-বল্লভপুর।

—জেয়ালা-বল্লভপুর ? সে তো চাষা-গাঁ। সেখানকার লোককে আপনি জানলেন কি করে ? রুগী আপনার চেনা ?

বিশ্বেশ্বর কেমন যেন ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—হ্যাঁ, তা জানা বই কি। চলুন একটু শিগগির করে তা হোলে।

দুপুরের কিছু পূর্ব্বে দুজনে হাঁটিয়া উক্ত গ্রামে পৌঁছিল। বিপিন পুর্ব্বে এ গ্রামে কখনো আসে নাই, তবে জানিত জেয়ালার বিল এ অঞ্চলের খুব বড় বিল এবং গ্রামখানি বিলের পুর্ব্ব পাড়ে। বিলের মাছ ধরিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে এরূপ জেলে ও বাগ্দী এবং কয়েক ঘর মুসলমান ছাড়া এ গ্রামে কোনো উচ্চবর্ণের বাস নাই।

বিশ্বেশ্বর কিন্তু গ্রামের মধ্যে গেল না। বিলের উত্তর পাড়ে গ্রাম হইতে কিছু দূরে একটা বড় অশ্বত্থ গাছ। তাহার তলায় ছোট একটী চালাঘরের সামনে বিশ্বেশ্বর তাহাকে লইয়া গেল।

বিপিন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—রুগী এখানে না কি ?

—হ্যাঁ, আসুন ঘরের মধ্যে। সোজা চলুন, অন্য কেউ নেই।

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বিপিন দেখিল একটি স্ত্রীলোক, জাতিতে বাগ্দী কিংবা দুলে, ঘরের মেঝেতে পুরু বিচালির উপর ছেঁড়া কাঁথার বিছানায় শুইয়া আছে। স্ত্রীলোকটির বয়স চব্বিশ পঁচিশ হইবে, রং কালো, চুল রুক্ষ, হাতে কাচের চুড়ি, পরণে ময়লা শাড়ি। জ্বরের ঘোরে রোগিণী বিছানায় এপাশ ওপাশ করিতেছে।

বিপিন ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল—এর নিমোনিয়া হয়েচে—দুদিকই ধরেচে। খুব শক্ত রোগ। খুব সেবা যত্ন দরকার। বড্ড দেরীতে ডেকেচেন আমাকে—তবুও সারাতে পারি হয় তো কিন্তু এর লোক কই ? খুব ভাল নার্সিং চাই—নইলে—

বিশ্বেশ্বর হঠাৎ বিপিনের দুই হাত ধরিয়া কাঁদো কাঁদো সুরে বলিল—বিপিনবাবু, আপনাকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে রুগীকে—যে করেই হোক, আপনার হাতেই সব, আপনি দয়া করে—

বিপিন দস্তুরমত বিস্মিত হইল। বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তীর এত মাথাব্যথা কিসের তাহা ভাল বুঝিতে পারিল না। এ বাগ্দী মাগী মরে বাঁচে তা বিশ্বেশ্বরের কি ? ইহার আপন আত্মীয়-স্বজন কোথায় গেল ?

বিশ্বেশ্বর বলিল—চলুন গাছতলাটার ধারে মাদুরটা পেতে দি, ওখানটাতে বসুন—এ ঘরের মধ্যে—তামাক সাজবো ?

বিপিন গাছতলায় গিয়া বসিল। বিশ্বেশ্বর তামাক সাজিয়া আনিয়া হুঁকাটি বিপিনকে দিবার পুর্ব্বে মলিন জামার পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া বিপিনের হাতে দিতে গেল। বিপিন বলিল—আগে বলুন মেয়েটা কে—আপনি এর টাকা দিবেন কেন, এর লোকজন কোথায় ?

বিশ্বেশ্বর বলিল—কেন, আপনি শোনেন নি কোনো কথা ?

—না, কি কথা শুনবো ?

বিশ্বেশ্বর মাদুরের এক প্রান্তে বসিয়া পড়িল। বলিল—ওর নাম মতি। বাগদীদের মেয়ে বটে, কিন্তু অমন মানুষ আপনি আর দেখবেন না। ভাসানপোতায় ওর বাপের বাড়ী, অল্প বয়সে বিধবা

হয়। আপনি তো জানেন, আপনাকে বলেছিলাম মেয়েমানুষের ভালবাসা কি জীবনে কখনো জানিনি। কিন্তু এখন আর সে কথা বলতে পারি নে ডাক্তারবাবু। ও বাগ্‌দী হোক, দুলে হোক, ওই আমায় সে জিনিষ দিয়েচে—যা আমি কারু কাছে পাইনি কোনো দিন। তারপর সে অনেক কথা। ভাঁসানপোতা ইস্কুলের চাকুরীটী সেই জন্যে গেল। ওকে নিয়ে আমি এই জেয়ালা বল্লভপুরে এলাম। সামান্য কিছু টাকা পেয়েছিলাম ইস্কুলের প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের, তাতেই চলছিল। আর ও মাছ বেচে, কাঠ ভেঙে, শাক তুলে আর কিছু রোজগার করতো। তারপর পূজোর আগে আমি পড়লাম অসুখে। টাকাগুলো ব্যয় হয়ে গেল। ও কি করে আমায় বাঁচিয়ে তুলেছে সে অসুখ থেকে! তারপর এই রোজ সকালে ঠাণ্ডা বিলের জলে শাক তুলে তুলে এই অসুখটা বাধিয়েচে। এখন ওকে আপনি বাঁচান—এ সব কথা নিয়ে ভাসানপোতায় তো খুব রটনা—আমায় গালাগাল আর কুচ্ছো না করে তারা জল খায় না। তাই বলচি আপনি শোনেন নি কিছু?

বিপিন অবাক হইয়া বিশ্বেশ্বরের কথা শুনিতেছিল। এমন ঘটনা সে কখনো শোনে নাই। শুনিয়া তাহার সারা মন বিশ্বেশ্বরের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিল। ছি, ছি, ব্রাহ্মণ-সন্তান হইয়া শেষকালে কি না বাগ্‌দী মাগীর সঙ্গে—নাঃ, আজ কি পাপই করিয়াছিল সে, কাহার মুখ দেখিয়া না জানি উঠিয়াছিল!

সে বলিল—টাকা রাখুন, টাকা দিতে হবে না। কিন্তু দামী ওষুধ কিছু লাগবে। এ্যাণ্টিফ্লজিষ্টিন্ একটা কিনে আনুন, আমার কাছে নেই, লিখে দিচ্চি, আনিয়ে নিন। আর প্রেস্‌ক্রিপশন একটা করে দিই—শক্ত রোগ—

বিশ্বেশ্বর ব্যাকুল ভাবে বলিল—বাঁচবে তো ডাক্তারবাবু?

—নার্সিং চাই ভাল। আর পথ্যি—

বিশ্বেশ্বর বিপিনের হাতে ধরিয়া বলিল—ওষুধগুলো আপনি লিখে দিয়ে গেলে হবে না, আনিয়ে দিন। এ গাঁয়ের কোনো লোক আমার কথা শুনবে না। এই ঘটনার জন্যে সবাই—বুঝলেন না? কেউ উঁকি মেরে দেখে যায় না। আপনিই ভরসা, ডাক্তারবাবু।

বিপিন বিরক্ত হইল। ভাল বিপদে পড়িয়াছে সে! সে নিজে এখন সেই রাণাঘাট হইতে এ্যাণ্টিফ্লজিষ্টিন আনিতে যাইবে? টাকাই বা দিতেছে কে?

সে বলিল—আমার ডাক্তারখানায় যদি থাকতো তবে আলাদা কথা ছিল। আমার কাছে ও সব থাকে না। আপনি এক কাজ করুন, গরম খোলের পুলটিশ দিন। রাই সর্ষের খোল হোলে খুব ভাল হয়। তাও যদি না পান, গরম ভাতের পুলটিশ দিন। আর আমার ডাক্তারখানায় আসুন, ওষুধ দিচ্চি।

বিশ্বেশ্বর বিপিনের সঙ্গে আবার ডাক্তারখানায় আসিল। ডাক্তার হিসাবে বিপিন এ কথাও ভাবিল যে, ওই কঠিন রোগীর মুখে জল দিবার কেহই রহিল না কাছে, বিশ্বেশ্বর যাতায়াতে চার ক্রোশ হাঁটিয়া ঔষধ লইয়া যাইতে দুই ঘণ্টা তো নিশ্চয় লাগাইবে, এ সময়টা একা পড়িয়া থাকিবে ওই মেয়েটা?

পরক্ষণেই ভাবিল—তুমিও যেমন! তুলে বাগ্‌দী জাত, ওদের কঠিন জান্—ওদের ওই অভ্যেস।

বিশ্বেশ্বর কিন্তু সারাপথ মতি বাগ্‌দিনীর নানা গুণ ব্যাখ্যা করিতে করিতে চলিল। অমন মেয়ে হয় না, যেমন রূপ, তেমনি গুণ। বিশ্বেশ্বরের গত অসুখের সময় বুক দিয়া সেবা করিয়াছে—প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকা খরচ করিতে দেয় না, নিজে শাক পাতা তুলিয়া, ঘুনিতে মাছ ধরিয়া বেচিয়া যাহা আয় করে, তাহাতেই সংসার চালাইতে বলে। অমন ভালবাসা বিশ্বেশ্বর আর কখনো কাহারও কাছে পায় নাই।

হঠাৎ বিপিন বলিল—রাঁধে কে?

—ওই রাঁধে। আমি ওর হাতেই খাই—ঢাকবো কেন? যে আমায় অত ভালবাসে, তার হাতে খেতে আমার আপত্তি কি? ও আমার জন্যে কম ছেড়েচে? ওর বাবা ভাসানপোতা বাগদী পাড়ার মধ্যে মাতব্বর লোক, গোলায় ধান আছে, চাষী গেরস্থ। খাওয়া-পরার অভাব ছিল না। সে সব ছেড়ে আমার সঙ্গে এক কাপড়ে চলে এসেচে। আর এই কষ্ট এখানে—হিম জলে নেমে শাক তুলে রোজ চিংড়িঘাটায় বাজারে বিক্রি করে আসে—কাঠ ভাঙে, মাছ ধরে, ধান ভানে। এত কষ্ট ওর বাপের বাড়ী ওকে করতে হোত না—তাও কি পেট পুরে খেতে পায়? আর ওই তো ঘরের ছিরি দেখলেন—ইস্কুলের প্রভিডেণ্ট ফণ্ড থেকে পঞ্চান্নটি টাকা পেয়েছিলাম—তা আর আছে মোট বাইশটী টাকা—আর ঘরখানা করেছিলাম দশ টাকা খরচ করে, আমার অসুখের সময় ব্যয় হয়েছে বারো তেরো টাকা—আর বাকী টাকা বসে বসে খাচ্ছি আজ চার মাস—তাহোলে বুঝুন পেট ভরে খাওয়া জুটবে কোথা থেকে!

লোকটার জাত নাই। বাগ্‌দিনীর হাতের রান্নাও খায়। স্ত্রীলোকের ভালবাসার দায়ে কিনা শেষে জাতিকুল বিসর্জ্জন দিল!

ঔষধ লইয়া বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী চলিয়া গেল। যাইবার সময় বার বার বলিয়া গেল, কাল একবার বিপিন যেন অবশ্য করিয়া গিয়া রোগী দেখিয়া আসে।

বিপিন পরদিন একাই রোগী দেখিতে গেল। জেয়ালা পৌঁছিতে প্রায় বৈকাল হইয়া আসিল, সম্মুখে জ্যোৎস্না-রাত—এই ভরসাতেই দুপুরে আহারাদি করিয়া রওনা হইয়াছে। ঘরখানার সামনে গিয়া বিশ্বেশ্বরের নাম ধরিয়া ডাকাডাকি করিয়া উত্তর পাইল না। অগত্যা সে ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, ঘরের মধ্যে রোগিণী কাল যেমন ছিল, আজও তেমনি অঘোর অবস্থায় বিচালি ও ছেঁড়া কাঁথার বিছানায় শুইয়া আছে। বিশ্বেশ্বরের চিহ্ন নাই কোথাও। ব্যাপার কি, মেয়েটিকে এ অবস্থায় ফেলিয়া গেল কোথায়?

বিপিন বিছানার পাশে বসিয়া রোগিণীকে জিজ্ঞাসা করিল, কেমন আছ?

মেয়েটি চোখ মেলিয়া চাহিল। চোখ দুটি জবাফুলের মত লাল। অস্ফুট স্বরে বলিল, ভাল আছি।

বিপিন থার্ম্মিটার দিয়া দেখিল জ্বর প্রায় ১০৪°-র কাছাকাছি। সে জানে, রোগীরা প্রায়ই এ অবস্থায় বলে যে সে ভাল আছে। মাথায় জল দেওয়া দরকার, তাই বা কে দেয়?

সে জিজ্ঞাসা করিল—বিশ্বেশ্বর কোথায় ?

মেয়েটি বিপিনের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তাহার পর টানিয়া টানিয়া বলিল—অঁ্যা—অঁ্যা—

—বিশ্বেশ্বরবাবু কোথায়—বিশ্বেশ্বর ?

রোগিণী এবার বোধ হয় বুঝিতে পারিল। বলিল—ক'নে গিয়েচেন।

ইহাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করা নিরর্থক বুঝিয়া বিপিন একটা জলপাত্রের সন্ধানে ঘরের ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। এখনি ইহার মাথায় জল দেওয়া দরকার। এক কোণে একটা মেটে কলসীতে সম্ভবতঃ খাবার জল আছে, বিপিন সন্ধান করিয়া একখানা মানকচুর পাতা আনিয়া রোগিণীর মাথার কাছে পাতিয়া কলসীর জলটুকু সব উহার মাথায় ঢালিল। পরে বিল হইতে আরও জল আনিয়া আবার ঢালিল। বার কয়েক এরূপ করিবার পর রোগিণীর আচ্ছন্ন ভাব যেন খানিকটা কাটিল। বিপিন থার্ম্মমিটার দিয়া দেখিল, জ্বর কমিয়াছে। ডাক্তারি করিতে আসিয়া এ কি বিপদ ! এমন হাঙ্গামাতে তো সে কখনও পড়ে নাই।

হঠাৎ তাহার মনে পড়িল মানীর মুখখানা। এই সব দুঃখী, অসহায়, রোগার্ত্ত লোকদের ভাল করিবার জন্যই তো মানী তাহাকে ডাক্তারি পড়িতে বলিয়াছিল। মেয়েদের সেবা পাইয়া আসিয়াছে সে চিরকাল। ইহাকে ফেলিয়া গেলে মানীর, শান্তির, মনোরমার অপমান করা হইবে—কে যেন তাহার মনের মধ্যে বলিল। বিশ্বেশ্বর যদি ইহাকে ফেলিয়া পলাইয়া থাকে ! তবে এখন উপায় ?

সে আবার রোগিণীকে জিজ্ঞাসা করিল—বিশ্বেশ্বরবাবু কোথায় গিয়েছে জান ? কতক্ষণ গিয়েছে ?

মেয়েটি বলিল—জানিনে।

বিপিন আর এক কলসী জল আনিতে গেল। জেয়ালার বিস্তৃত বিলের উপর সূর্য্যাস্তের ঘন ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। দক্ষিণ পাড়ের তাল গাছের মাথায় এখনও রাঙা রোদ। দূর জলে পদ্মফুলের বনে পদ্মপাতা উলটিয়া আছে, যদিও এখন পদ্মফুল চোখে পড়ে না। বল্লভপুরের দিকে জেলেরা ডিঙি বাহিয়া মাছ ধরিতেছে। একদল জলপিপি ও পানকৌড়ি জলের ধারে শোলাগাছের বনে গুগ্‌লি খুঁজিতেছে। বিপিনের মনে কেমন এক অদ্ভুত ভাবের উদয় হইল। যদি বিশ্বেশ্বর ইহাকে ফেলিয়া পলাইয়াই থাকে, তবে তাহাকে থাকিতে হইবে এখানে সারারাত। মানীর মুখ, শান্তির মুখ মনে করিয়াই তাহাকে এই মেয়েটীর সেবা করিতে হইবে। অর্থ উপার্জ্জন করিলেই কি হয় ? তাহার বাবা বিনোদ চাটুয্যে কম পয়সা উপার্জ্জন করেন নাই—অসৎ উপায়ে উপার্জ্জিত পয়সা বলিয়াই টেকে নাই। কাহারও কোন উপকার হয় নাই তাহা দিয়া। কেবল সে প্রথম যৌবনে পিতার মৃত্যুর পর বদ্‌খেয়ালে সেগুলি ব্যয় করিয়াছিল।

ঘরে রোগীর পথ্য কিছু নাই। ডাব ও ছানার জল খাওয়ানো দরকার এরকম রোগীকে। কিছুই ব্যবস্থা নাই। বিপিন নিকটবর্ত্তী দুলেপাড়া হইতে একটি লোক ডাকিয়া আনিল। বলিল—গোটাকতক ডাব নিয়ে আসতে পারবে ? দাম দেবো।

লোকটা বলিল—বাবু, আপনাকে আমি চিনি। আপনি পিপলিপাড়ার ডাক্তারবাবু। দাম

আপনাকে দিতি হবে না। তবে বাবু, ডাব রাত্তিরে পাড়া যাবে না তো? তা আপনি কেন—সে বামুন ঠাকুর কোথায় গেল? দেখুন তো বাবু, মেয়েডারে টুইয়ে ঘরের বার করে নিয়ে এসে তিনি এখন পালালেন নাকি? এইডে কি ভদ্দরনোকের কাজ?

একপ্রহর রাত্রে বিশ্বেশ্বর আসিয়া হাজির হইল। সে ফেলিয়া পলায় নাই—চিংড়িঘাটার বাজার হইতে কিছু ফল, খৈল ও সাবু মিছরী কিনিতে গিয়াছিল। বিপিনকে দেখিয়া বলিল—আপনি এসেছেন? বড় কষ্ট দিলাম আপনাকে। আপনি বলে গেলেন খোলের পুলটিস্ দিতে, এখানে পেলাম না—তাই বাজারে গিয়াছিলাম এই সব জিনিসপত্র আনতে। কতক্ষণ এসেছেন?

দুজনে মিলিয়া সারারাত রোগীর সেবা করিল। সকালের দিকে বিপিন বলিল—আমি ডাক্তার-খানা খুলবো গিয়ে—বসুন আপনি—একে একা ফেলে কোথাও যাবেন না। আমি ওবেলা আবার আসব।

একটা অদ্ভুত আনন্দ লইয়া সে ফিরিল। এই সব পল্লী-অঞ্চলের যত অসহায়, দুঃস্থ লোকদের সাহায্য করিবার জন্যই যেন সে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে—এই রকমের একটা মনোভাব সারাপথ তাহাকে তাহার নিজের চোখে মহৎ ও উদার করিয়া চিত্রিত করিল।

আবার ওবেলা যাইতে হইবে। বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তীর নীচজাতীয়া প্রণয়িনীকে বাঁচাইয়া তুলিতে হইবে—দুজনেই ওরা নিতান্ত দুঃস্থ, অসহায়। যদি কখনো মানীর সঙ্গে দেখা হয়, তবে সে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কৃতজ্ঞতার সহিত বলিতে পারিবে—আমায় মানুষ করে দিয়েচ মানী। সেই গরীব, অসহায় মেয়েটির রোগশয্যার পাশে তুমিই আমার মনের মধ্যে ছিলে।

সেই দিনই রাত্রে বিশ্বেশ্বর চক্কত্তির ক্ষুদ্র খড়ের ঘরে বসিয়া সে বিশ্বেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা বিশ্বেশ্বর বাবু, আত্মীয়স্বজন ছাড়লেন এর জন্যে, চাকরীটা গেল, জেয়ালার বিলের ধারে এইভাবে রয়েছেন, এতে কষ্ট হয় না?

—কি আর কষ্ট! বেশ আছি, এখন যদি ও বেঁচে ওঠে তবে। ও আমায় যা দিয়েছে, আমার নিজের সমাজে বসে আমাকে তা কেউ দিয়েছে?

—দেয়নি মানে কি? বিয়ে করলেই তো পারতেন।

—আমার সাহস হয়নি ডাক্তারবাবু, সামান্য পণ্ডিতি করি—ভাবতাম সংসার চালাতে পারবো না। এ নিজের দিক মোটেই ভাবেনি বলেই আমার সঙ্গে চলে আসতে পেরেছে।

—শুধু তাই নয়, আপনি ব্রাহ্মণ, ও বাগ্‌দী। আপনাকে অন্য চোখেই দেখত, কারণ আপনি উচ্চবর্ণের। কি করে আপনি আলাপ করলেন এর সঙ্গে?

—আমাদের ইস্কুলের কাঁটাল গাছ ওর বাবা জমা রেখেছিল। তাই ও আসতো কাঁটাল পাড়তে। এই সূত্রে আলাপ। এখন ওর অসুখ—ওর চেহারা বেশ ভাল দেখতে, যদি বেঁচে ওঠে তবে দেখবেন ওর মুখের এমন একটা শ্রী আছে—

বিপিন অন্য কথা পাড়িল—সে নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই জানে, প্রণয়ীদের মুখে প্রণয়িনীদের রূপগুণের বর্ণনার আদিঅন্ত নাই। হইলই বা বাগদি বা দুলে। প্রেম মানুষকে কি অন্ধই করে!

বিশ্বেশ্বরের উপরে বিপিনের করুণা হইল। তাহার সারাজীবনের তৃষ্ণা—এ অবস্থায় পানা-পুকুরের জলও লোকে পান করে তৃষ্ণার ঘোরে। ইহারও হইয়াছে সেই দশা।

বিপিন বলিল—এর বাড়িতে আপনার লোকজনের কাছে খবর পাঠান। যদি ভাল মন্দ কিছু হয়, তারা আপনাকে দোষ দেবে। এরও তো ইচ্ছে হয় আপনার লোকের সঙ্গে দেখা করতে।

—তারা কেউ আসবে না। ওর বাবা অবস্থাপন্ন চাষী গেরস্থ। তারা বলেচে ওর মুখ দেখবে না আর।

অনেক রাত্রে বিপিন একবার জল তুলিতে গেল বিলে। ধপধপে জ্যোৎস্না চারিদিকে, অদ্ভুত শোভা স্তব্ধ গভীর নিশীথিনীর। পদ্মবনে রাত-জাগা সরাল পাখী ডাকিতেছে। দূরে বিলের ধারে জেলেদের মাছ চৌকি দেওয়ার কুঁড়ের কাছে কাঠকুটো জ্বালিয়া আগুন করিয়াছিল, এখন প্রায় নিভিয়া আসিতেছে। বিশ্বেশ্বরের দুর্ভাগ্য, হয়তো মেয়েটি আজ শেষরাত্রে কাবার হইবে। বিশ্বেশ্বরকে বিপিন সে কথা বলে নাই, জ্বর অতি দ্রুত নামিতেছে, ক্রাইসিস্ আসিয়া পড়িল, নাড়ীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। বিপিন যাহা করিবার করিয়াছে, আর করিবার উপযুক্ত তোড়জোড় নাই তাহার। বাঁচান যাইবে না।

এই স্তব্ধ রাত্রির সীমাহীন রহস্য তাহার মনকে অভিভূত করিল। বিপিন কখনো ও সব ভাবে না, তবুও মনে হইল, মেয়েটি আজ কোথায় কতদূরে চলিল, তখনো কি সে জাতে বাগ্‌দীই থাকিয়া যাইবে? উচ্চবর্ণের প্রতি প্রেমের দায়ে তাহার এই যে স্বার্থত্যাগ, ইহা কি সম্পূর্ণ বৃথা যাইবে? কোথাও কোনো পুষ্পমাল্য অপেক্ষা করিয়া নাই কি তাহার সাদর অভিনন্দনের জন্য?

মানী যদি থাকিত, এসব কথা তাহার সঙ্গে বলা চলিত। মানী সব বোঝে, সে বুদ্ধিমতী মেয়ে। শান্তি সেবাপরায়ণা বটে, কিন্তু তাহার শিক্ষা নাই, সে খাওয়াইতে জানে বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে কথা বলিয়া সে আনন্দ পাওয়া যায় না। মানী আজ কোথায়, কি ভাবে আছে? আর কখনো তাহার সঙ্গে দেখা হইবে না? যাক্, সে যেখানেই থাক, সে বাঁচিয়া আছে। নিমোনিয়ার ক্রাইসিস খড়্গ লইয়া বলি দিতে উদ্যত হয় নাই তাহাকে। সে বাঁচিয়া থাকুক। দেখিবার দরকার নাই। পৃথিবীর মাটি মানীর পায়ের স্পর্শ পায় যেন, মাটিতে মাটিতেও যেন যোগটা বজায় থাকে।

শেষরাত্রের চাঁদ-ডোবা অন্ধকারের মধ্যে এক দিকে বিপিন, অন্য দিকে বিশ্বেশ্বর ধরিয়া মৃত দেহকে কুটীরের বাহির করিল। বিলের চারিধারে ঘনীভূত কুয়াসা। শ্মশান বিলের ওপারে, প্রায় এক মাইল ঘুরিয়া যাইতে হয়। বিপিনের খাতিরে বল্লভপুরের বাগদীপাড়া হইতে দুজন লোক আসিল। বিপিন এবং বিশ্বেশ্বরও ধরিল। সৎকারের কোনো ত্রুটি না হয়, প্রেমের মান রাখা চাই, বিপিনের দৃষ্টি সে দিকে।

স্নান করিয়া যখন বিপিন ফিরিল, তখন বেলা প্রায় এগারোটা।

দত্ত মহাশয় বলিলেন, ও ডাক্তারবাবু, কোথায় ছিলেন কাল রাত্রে? রুগী ছিল? শান্তি যে আপনার জন্যে শ্বশুরবাড়ী থেকে ক'রকমের আচার পাঠিয়ে দিয়েচে। যে গাড়োয়ান গাড়ী নিয়ে গিয়েছিল, সে কাল রাত্রে ফিরে এসেচে কিনা—সেই গাড়ীতেই আপনার জন্যে এক হাঁড়ি আচার আলাদা করে—ব্রাহ্মণের ওপর বড্ড ভক্তি আমার মেয়ের—

বিপিন যেন শক্ত মাটি পাইল অনেকক্ষণ পরে। শান্তি আছে, সে স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, সে দেহমুক্ত জীবাত্মা নয়—শান্তি তাহাকে আচার পাঠাইয়াছে। আবার হয়তো একদিন আসিয়া হাজির হইবে, আবার চা করিয়া আনিয়া দিবে তাহার হাতে।

হতভাগ্য বিশ্বেশ্বর।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সে আবার বল্লভপুর গেল। বিশ্বেশ্বর কি অবস্থায় আছে একবার দেখা দরকার। গিয়া দেখিল, ঘরের দোর খোলা; বাহির হইতে উঁকি মারিয়া দেখিল, ঘরের মধ্যে বিশ্বেশ্বর ভাত চড়াইয়াছে।

বিশ্বেশ্বর বলিল, কে ?

বিপিন ঘরে ঢুকিয়া বলিল, আমি। এখন অবেলায় রাঁধচেন যে ?

বিশ্বেশ্বরকে দেখিয়া মনে হয় না, সে কোনো শোক পাইয়াছে। বলিল, আসুন ডাক্তারবাবু। সারাদিন খাওয়া হয় নি। ঘরদোর গোবর দিয়ে নিকিয়ে নিলাম—রুগীর ঘর, বুঝলেন না ? আবার নিয়ে এলাম এই সব করে, তখন বেলা তিনটে। তারপর এই ভাত চড়িয়েচি—এইবার ছুটো খাবো, বড় খিদে পেয়েচে।

বিপিন চাহিয়া দেখিল ঘরের কোথাও কোনো বিছানা নাই। যে ছেঁড়া কাঁথা ও বিচালির শয্যায় রোগিণী শুইয়া থাকিত, তাহা শবের সঙ্গে গিয়াছে, এখন এই ঠাণ্ডা রাত্রে বিশ্বেশ্বর শুইবে কিসে ? ওই একটি মাত্র বিছানাই সম্বল ছিল নাকি ?

বিশ্বেশ্বর ভাত নামাইয়া বড় একখানা কলার পাতায় ঢালিল। শুধু ছুটি বড় বড় করলা সিদ্ধ ছাড়া খাইবার অন্য কোনো উপকরণ নাই। তাহা দিয়াই সে যেমন গোগ্রাসে ভাত গিলিতে লাগিল, বিপিন বুঝিল, লোকটার সত্যই অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছিল বটে। বেচারী চাকুরীটা হারাইয়া বসিল প্রেমের দায়ে পড়িয়া, এখন খাইবেই বা কি, আর করিবেই বা কি। তাও এমন অদৃষ্ট, একুল ওকুল ছুকুলই গেল।

প্রথম যখন খাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন বিশ্বেশ্বর তত কথা বলে নাই, ছুটি করলা সিদ্ধের মধ্যে একটা করলা সিদ্ধ দিয়া আন্দাজ অর্দ্ধেক পরিমাণ ভাত খাওয়ার পরে বোধ হয় তাহার কিঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল। বিপিনের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, আজ দিনটা কি বিপদের মধ্যে দিয়েই কেটে গেল! এক একদিন অমন হয়। বড্ড খিদে পেয়েছিল, কিছু মনে করবেন না।

বিপিন বলিল, তা তো হোল, কিন্তু আপনি এখন শোবেন কিসে ? বিছানা তো নেই দেখচি।

—ও কিছু না, গায়ের কাপড়খানা আছে, বেশ মোটা, শীত ভাঙে খুব। আর ছু আঁটি বিচিলি চেয়ে আনবো এখন পাড়া থেকে।

—না চলুন, আমার ওখানে রাত্রে শুয়ে থাকবেন। এমন কষ্টে কি কেউ শুতে পারে ?

—না, না, কোনো দরকার নেই ডাক্তারবাবু। ও আবার কষ্ট কিসের ? ও সব কষ্টকে কষ্ট বলে ভাবিনে। দিব্যি শোবো এখন, একটু আগুন করবো ঘরে। তবে প্রথম দিনটা, হয়তো একটু ভয় ভয় করবে।

—আমি আপনার ঘরে থাকবো আজ আপনার সঙ্গে ?

—কোনো দরকার নেই। আপনি না হয় একদিন শুয়ে রইলেন, কিন্তু আমাকে সইয়ে নিতে হবে তো? সে তো এত ভালবাসতো আমায়, তার ভূত এসে আর আমার গলা টিপবে না। আচ্ছা, সত্যি ডাক্তারবাবু, কোথায় সে গেল, বলুন তো?

—নিন, আপনি খেয়ে নিন। ওসব কথা পরে হবে এখন।

বিশ্বেশ্বর খাওয়া শেষ করিয়া তামাক সাজিল। নিজে দু চার বার টানিয়া বিপিনের হাতে হুঁকাটি দিল। বিপিন প্রথম দিন ইতস্ততঃ করিয়াছিল, লোকটা বাগ্‌দিনীর হাতের রান্না খায়, ইহার জাত নাই, এ হুঁকায় তামাক খাইবে কি না। কিন্তু কেমন একটা করুণা ও সহানুভূতি তাহার মনে আশ্রয় লইয়াছে, সে যেমন ইহার প্রতি, তেমনি ছিল ইহার মৃতা প্রণয়িনীর প্রতি। সুতরাং এখন ওকথা তাহার আর মনেই ওঠে না।

বিপিন বলিল, এখন কি করবেন ভেবেচেন?

—একটা পাঠশালা করবো ভাবচি, এই জেয়ালা বল্লভপুরে অনেক নিকিরি আর জেলে-মালোর বাস। ওদের ছেলেপিলে নিয়ে একটা পাঠশালা খুললে চলবে না?

—ওদের সঙ্গে কথা হয়েচে কিছু?

—কথা এখনো তুলিনি কিছু। কাল একবার পাড়ার মধ্যে গিয়ে দু-এক জনের কাছে পাড়ি কথাটা।

বিপিন বুঝিল, ইহা নিতান্তই অস্থিত-পঞ্চকের ব্যাপার। কিছুই ঠিক নাই। কোথায় বা পাঠশালা, কোথায় বা ছাত্রদল! ইহার মস্তিষ্কে ছাড়া তাহাদের অস্তিত্ব নাই কোথাও।

—আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আপনি ভূত মানেন?

—না, যা কখনো দেখিনি, তা কি করে মানবো? ওসব আর ভেবে কি করবেন বলুন?

বিশ্বেশ্বর হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল। বিপিন অবাক হইয়া গেল, পুরুষমানুষ এভাবে কাঁদিতে পারে, তাহা সে নিজেকে দিয়া অন্ততঃ ধারণাই করিতে পারিল না। ভাল বিপদে ফেলিয়াছে তাহাকে এই বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত!

দুঃখও হইল। লোকটার লাগিয়াছে খুব! লাগিবারই কথা বটে। কে জানে, হয়তো মনের দিক দিয়া মানীর সঙ্গে তাহার যে সম্বন্ধ, মৃতার সহিত ইহারও সেই সম্বন্ধ ছিল! হতভাগ্য বিশ্বেশ্বরের প্রতি সে অবিচার করিতে চায় না।

ইহাকে একা এই শোকের মধ্যে ফেলিয়া যাইতে তাহার মন সরিল না। রাত্রিটা বিপিন রহিয়া গেল।

ক্রমশ

উচ্ছ্বাস

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

দেবতারা শুধু গভীরতা চান
উচ্ছ্বাস নাহি চান হে,
জলেরি মূল্য সাগর পাইবে
বৃথা কল্লোল গান হে।
আমরা মানুষ ভূমে করি বাস,
সব চেয়ে ভালবাসি উচ্ছ্বাস,
কথা চেয়ে স্বর, মধু চেয়ে বেশী
মাধুরীর দিকে টান হে।

২

গুরুগর্জ্জন, বিজলি ঝলস্
দেবত্ব দেয় মেঘকে,
জলোচ্ছ্বাসেই ডোবে বেলাভূমি
শোভা দেয় নদীবেগকে।
আসে বসন্ত, বর্ষা, শরৎ,
জীবনে নবীন যৌবনবৎ,
নূতন করিয়া রঞ্জিত করি'
ধূলামাখা এ আলেখ্যে।

৩

উচ্ছ্বাসে ভরা বিশ্বকাব্য
উচ্ছ্বাসে ভরা ধর্ম্ম,
প্রেম, প্রার্থনা, প্রেরণা, প্রতিভা
সবে জানে তার মর্ম্ম।
উন্মাদনাই বৃহৎ, মহৎ,
রচে অপূর্ব্ব ভাবের জগৎ,
মৃত্যুকে করে যন্ত্রণাহীন,
নিষ্কাম করে কর্ম্ম।

৪

উচ্ছ্বাসই গান গাওয়ায় কোকিলে,
কুসুমে শিখায় ফুটতে
হরিণে শিখায় নয়নভঙ্গী,—
পিয়ালের বনে ছুটতে।
পেখম ধরিয়া শিখীরে নাচায়,
চঞ্চল করে শুকেরে খাঁচায়,
ঝর্ণারে বলে সকালে বিকালে
উপলের বেড়া টুটতে।

৫

স্বরগ হইতে ভূতলে নামিতে
সেই ডাক দেয় গঙ্গায়,
মূকেরে বাচাল সে পারে করিতে
পঙ্গুরে গিরি লঙ্ঘায়।
সেই আসি' দেয় ঝুলনেতে দোল,
যমুনার জলে তোলে কল্লোল,
সেই ত আবীর কুমকুম এনে
জীর্ণ জীবন রঙ্গায়।

৬

কত যে বিল্বমঙ্গল গড়ে'
উদ্বেল করি চিত্ত,
ইঙ্গিতে তার কত 'লালাবাবু'
মাধুকরী করে নিত্য।
তার লাগি বীর শির দেয় তার,
সতী পতিসনে হয় অঙ্গার,
প্রব্রজ্যা লয় রাজা তারি লাগি
রচে সেই নব তীর্থ।

৭

উচ্ছ্বাসই ছোটে মেরুর কক্ষে
গিরির শিখরে চাপতে,
মরুর মাঝারে গুহার ভিতরে
দিবসযামিনী যাপতে।
সাগরে যে করে জোয়ার সৃষ্টি,
নয়নে যাহার সুধার দৃষ্টি,
সে চাঁদের ভাল আলো ফেলে যাব
গভীরতা কেন মাপতে?

তত্ত্বালাপ

শ্রীইন্দ্রসোম বর্মন্

সেদিন দারুণ গ্রীষ্মের দুপুরে বন্ধু 'চয়নিকা' হইতে 'হে-রুদ্র-বৈশাখ' আবৃত্তি করিতেছিলেন। বেশ ভালই করিতেছিলেন; কিন্তু বহুদিন কোনো তর্ক না হওয়ায় আমার কিছুই ভালো লাগিতেছিল না। বলিলাম, "ক্ষমা করো। কাব্য ছাড়িয়া একটু কাব্যতত্ত্ব আলোচনা করা যাক।"

বন্ধু একটি হাই তুলিলেন। ধীরে ধীরে চয়নিকা বন্ধ করিয়া কহিলেন, "বেশ তো।"

আমি কহিলাম, "দেখো, তোমাদের ঐ 'আর্ট ফর্ আর্ট্‌স্ সেক্' আমি কেমন যেন বুঝিতেই পারি না। আমার মনে হয় নানা উদ্দেশ্যে সাহিত্য রচিত হইয়া থাকে। যেমন ধর্মের জন্য, প্রেমের জন্য, স্বাধীনতার জন্য। এমন কি ধান্য রুপিতে ও দাড়ি কামাইতেও কাব্যশক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে।"

বন্ধু স্মিত-বিদ্রূপে কহিলেন, "যথা?"

মাথা চুলকাইয়া কহিলাম; "যথা—ঠিক মনে পড়িতেছে না; কিন্তু বোধ হয়, উক্ত দুই বিষয় সম্বন্ধে মনস্বিনী খনার কয়েকটি মনোহারিণী কবিতা আছে। তুমি দেখিয়া লইয়ো। এখন যা বলিতেছিলাম শোনো। আমার মতে উদ্দেশ্য ছাড়া সাহিত্য রচিত হইতে পারে না। সুস্থ প্রকৃতির মানুষেও বিনা উদ্দেশ্যে সাহিত্য পড়ে না। উদাহরণ দেওয়া যাক। আমার নিজের কথাই ধরো। আমি যখন পাপবোধ করি তখন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত খুলিয়া বসি; সেবার এক চৈত্রসন্ধ্যায় আমার ঘরে কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদারের 'বনলীলা' দেখিতে পাইয়া জ্যাঠামহাশয় পর্যাপ্ত উপদেশ-অন্তে তৎস্থানে অশ্বিনীবাবুর 'ভক্তিযোগ' রাখিয়া সেটি লইয়া চলিয়া গেলেন। সুতরাং দেখো, কাব্য এবং সাহিত্য, দুইই আমার কাছে প্রয়োজনের বস্তু। নিছক অপ্রয়োজনের আনন্দে কাব্য-উপভোগ আমার ধাতে নাই। বোধ করি কাহারও ধাতে থাকাও উচিত নয়। এখন তোমার বক্তব্য শোনাও।"

বন্ধু গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিলেন, "শুনাইতেছি। কিন্তু সাহিত্যের উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। তবুও লোকে কী জন্য প্রকৃত সাহিত্য পড়ে তাহার উত্তর দেওয়া হয়তো খুব কঠিন হইবে না। উত্তর দেওয়ার পূর্বে তোমাকে একটি প্রশ্ন করিব। ব্যাপারটি নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে। শিমূলতলায় সেবার পূজার ছুটিতে সকালে আমাদের কম্বাইণ্ড্-হ্যাণ্ড্ উঠানে বসিয়া আমাদের মধ্যাহ্নভোজের জন্য একটি ছাগশিশু জবাই করিতেছিল; এবং তাহারই অদূরে বসিয়া তুমি, তোমার পক্ষে যতোটা সম্ভব ততোটা ভাবাবিষ্ট হইয়া আবৃত্তি করিতেছিলে, 'He prayeth best who loveth best All Things both great and small।" তদবস্থায় তোমার সেই কাব্যসম্ভোগ তোমার কোন্ প্রয়োজন সাধন করিতেছিল বলিতে পারো কি?"

বন্ধুর মত কুচক্রী লোক খুব কমই দেখিয়াছি। সাবধানেই কহিলাম, "ভাবাবেগ জিনিষটা তোমাদের মত কবিগণের একচেটিয়া বটে, কিন্তু শপথ করিয়া বলিতে পারি, সেদিন আমি নিতান্ত 'অকারণ পুলকে' কোল্‌রিজের প্রাচীন নাবিকের গাথা হইতে উক্ত অংশটি আবৃত্তি করি নাই। উহা

আমার তদানীন্তন মনোভাবকেই প্রকাশের মুক্তি দিয়াছিল। আজও মনে পড়ে, সেইদিনকার দূর, নীল পাহাড়ে, শীতাভাস-রুক্ষ ঈষৎ পিঙ্গল ঘাসের শিশিরকণায়, স্বল্পপত্র শিউলির নিচে, ভীরু শালিখের চঞ্চলতায় আমার মনের মধ্যে কেমন করিয়া একটি বিশাল প্রেম জন্মলাভ করিল। জগতের ক্ষুদ্র বৃহৎ চেতন-অচেতন সকল প্রাণীকেই ভালোবাসিবার একটি সুমধুর ব্যাকুলতা আমার হৃদয়ে এক বেদনামিশ্র আনন্দের সঞ্চার করিতেছিল। দেখো, ঐরূপ হাসিও না; তোমার উদ্যত ফ্রয়েডীয় তত্ত্ববাণ আপাততঃ প্রতিসংহার করিলে কাহারো কিছু ক্ষতি হইবে না।"

বন্ধু লোভ-সংবরণ করিলেন। কহিলেন, "তুমি একটি জিনিষকে ভুলিয়া যাইতেছ; সেটি সেই নিরপরাধ ছাগশিশু। না,—তোমার সেইদিনকার বিশ্বমৈত্রীকে আমি ভান বলিতেছি না; কারণ তাহা আসলে বিশ্বমৈত্রীই নহে, তাহা কোনো মনোভাবই নহে; তাহা ভাবচ্ছবি। সূর্যবিম্ব যেমন সূর্য নয়, তেমনই ভাবচ্ছবি ভাব হইতে অনেক ভিন্ন। তাহা না হইলে তুমি সেদিন দুপুরে অমন তৃপ্তির সহিত ছাগশিশুটির সৎকার সমাধা করিতে না। এখন কহ, কোল্‌রিজের উক্ত পদের আবৃত্তি তোমার কোন্ প্রয়োজনে লাগিয়াছিল?"

আমি কহিলাম, "দেখো, অমন দার্শনিকের মত ভঙ্গি না করিলেও পার। তোমার 'ভাব ও ভাবচ্ছবি' রাখিয়া সোজা কথায় এসো। আমার সেদিনকার বৈশ্বমৈত্রীর প্রেরণায় যথেষ্ট জোর ছিল না স্বীকার করি; হইতে পারে উহা বিশ্বমৈত্রীই নহে; কিন্তু উহা অপর কোনো একটি তরুণ, কোমল, মধুর, অনভিব্যক্ত ভাব। তাহাকে আমি ভাবচ্ছবি বলিয়া স্বীকার করিব না। সকল ভাবই কর্মে পরিণত হয়, একথা সত্য; কিন্তু ভাবের ক্ষীণতায় কর্মেরও ক্ষীণতা আসে; কাজেই ভাবজন্মা কর্ম সব সময়েই সকলের লক্ষ্যগোচর না হইতে পারে। সুতরাং সেদিন প্রাতঃকালে যাহাতে আবিষ্ট হইয়া আমি কোল্‌রিজের উক্ত 'মা নিষাদ' শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছিলাম তাহা ভাবচ্ছবি নহে, ভাবই।"

বন্ধুর মুখ দেখিয়া মনে হইতেছিল, এবার তিনি অনেকগুলি মোক্ষম মারণাস্ত্র তূণীরাভ্যন্তরে পুরিয়া রাখিয়াছেন। সিংহনাদ নিতান্ত অশোভন বলিয়াই মৃদুহাস্যে শর বর্ষণ সুরু করিলেন, "হে নাস্তিক! তুমি কি আত্মার ঈক্ষণ-ধর্ম স্বীকার করো না? ক্রোচে এবং সুরেন্দ্র দাশগুপ্ত প্রভৃতি জ্ঞানবৃদ্ধগণের শুশ্রূষা করিলে জানিতে পারিতে যে, ভাব ও কর্মের মধ্যবর্তী এমন একটি অবস্থা আছে যেখানে ত্রিশঙ্কুবৎ অবস্থান করা যায়। সেই অবস্থার নাম রস, অথবা ক্রোচে যাহাকে বলিয়াছেন, স্বতঃউপলব্ধ বিস্ময় যাহা স্বয়ম্প্রকাশও বটে। * রস যে ভাব-কর্মের অনপেক্ষিত, কোলরিজের প্রাচীন নাবিকের গাথাটিই কি তাহার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ নয়? কোল্‌রিজ ঐ গাথায় কোনো উপদেশ দেন নাই। একটি স্বপ্নলোক সৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র, যেখানে দূর মেরুসমুদ্রে সুদীর্ঘবিক্রান্ত অন্ধকার তাহার একটি মাত্র চরণক্ষেপে অসীম সাগর এবং আকাশ অধিকার করে, যেখানে ডাকিনীর কুহকময় কটাহস্থ তৈলের মত নানাবর্ণবিচ্ছুরণে ভয়াবহ নিশীথসমুদ্র জ্বলিতে থাকে, যেখানে সিন্ধুক্রৌঞ্চঘাতী, নিঃসঙ্গ নাবিক আকণ্ঠপীত ভীতিরসে দেখিতে থাকে কৃষ্ণমেঘশিখরবিলগ্ন চন্দ্রকলার ম্লানালোকে তাহার মৃত সঙ্গিদল

* Intuition—Expression of Wonderment.

নীরব ক্ষেপনীপ্রক্ষেপে অনুদ্দেশসমুদ্রপথে যাত্রা করিয়াছে। স্বয়ং কবির মতে তোমার বিশ্বাস অবিশ্বাস এবং পাপপুণ্যের তুলাদণ্ড মুলতুবি রাখিয়া তোমার উচিত তোমার আত্মাকে তাহার জাদুরসের নিষ্ক্রিয় আধারস্বরূপ করিয়া তোলা। না পারিলে তোমার কাব্য-সম্ভোগে কোনো অধিকার নাই।"

স্বীকার করিতে লজ্জা নাই, কিঞ্চিৎ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। বন্ধুর শব্দকুহকের ঘোর কাটাইয়া উঠিয়া কহিলাম, "চমৎকার বলিয়াছে। তোমার বাক্যবিস্তারের নির্গলিতার্থ এই যে, শিমূলতলায় সেই স্মরণীয় প্রাতঃকালে আমি নিজের অজ্ঞাতসারেই ভাব ও কর্মের মধ্যাবস্থায় রসস্থ হইয়া ত্রিশঙ্কুবৎ আচরণ করিয়াছিলাম। আমি জনশ্রুতির প্রসাদে ক্রোচের তত্ত্ব কিছু অবগত আছি; এবং সংবাদপত্রের কল্যাণে সুরেন্দ্র দাশগুপ্তের কীর্তিকথাও শুনিয়াছি। এবং নাস্তিক্য ও আস্তিক্যের কোন্‌টি সদ্ধর্ম সে বিষয়ে এখনও মনঃস্থির করিতে পারি নাই। অতএব সর্বপ্রকার দার্শনিক কচকচি বাদ দিয়াই তোমাকে কিছু কহি, দয়া করিয়া অবধান করো। দেখো সুস্থ মানুষের রসস্থ হওয়া বন্ধ্যার পুত্রলাভের মত অসম্ভব ব্যাপার। যাহারা হয় তাহারা অসুস্থ; হইতে পারে এই অসুস্থতা আধুনিক পৃথিবীতে বিশেষ ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছে। উহা সংক্রামকও বটে; হয়তো সেদিন সকালে আমিও সংক্রামিত হইয়াছিলাম; কিন্তু উহা অসুস্থতাই, সুস্থের স্বভাবধর্ম নয়। অহিফেন এবং অন্যান্য মাদকদ্রব্যের ন্যায় ঔষধার্থেই শিল্পরস প্রযুক্ত হওয়া উচিত, নিষ্ফল মাদকতার জন্য নহে। প্রাচ্যদর্শনসম্মত চক্রগতিতেই হউক অথবা মার্কস-কথিত কম্বুরেখাতেই হউক বিশ্বব্যাপার যেহেতু চিরভ্রমণশীল, তখন শুধু শিল্পী অথবা রসিকের মনই যে ক্ষণিকের জন্যও স্থাণুত্ব লাভ করে, ইহা অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয়; ইহাকে মতিভ্রম কিংবা মায়াও বলিতে পারো। শিল্পী এবং রসিকের মন নানা কারণে অসুস্থ হইলেই এই মত পোষণ করে। সুতরাং সবিনয়ে নিবেদন করি, ক্রোচে-সুরেন্দ্রকথিত ঈক্ষা-তত্ত্বের সহিত তুমি দয়া করিয়া এটুকুও যোগ করিয়া লও যে, আত্মা কেবল ঈক্ষণ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকে না, ঈক্ষণের পরে চিন্তা এবং চিন্তার পরে কর্মও করিয়া থাকে, তাহার ঈক্ষণের মধ্যেও অতি সূক্ষ্মভাবে কর্মপ্রবৃত্তিটাও তিলের মধ্যে তৈলবৎ নিহিত রহিয়া গিয়াছে; অলক্ষ্যের খাতিরে সেটি উপেক্ষা করা সুবিধাজনক, কিন্তু মঙ্গলকর নহে।"

সহসা বন্ধুর মুখ দেখিয়া দয়া হইল; কিন্তু আপনাকে নিচ্ছিদ্র রাখিবার জন্য বলিয়া চলিলাম, "দেখো, সংবাদপত্র ও জনশ্রুতির উপর একান্ত নির্ভর করার ফলে, হয়তো ক্রোচে ও সুরেন্দ্র দাশগুপ্তের প্রতি অবিচার করিয়াছি; তাহা হইলেও আমার বক্তব্য বিশেষ অযৌক্তিক হয় নাই। আর শিল্পী ও রসিক জনের যে অসুস্থতার কথা বলিলাম, তাহা স্পষ্টতঃই এক বিশাল কার্যকারণশৃঙ্খলায় নিহিত; অতএব তাঁহাদেরও বিশেষ অপরাধ নাই। একটু বিশদ করিয়া বলি। প্রাচীন সমাজে দেখা যায়—শিল্পীরা সমাজ-সেবক; তখন তাঁহাদিগকে শিল্পসাধনা এবং শিল্পসাধনার কৈফিয়ৎ রচনা একসঙ্গেই করিতে হইত না। তাঁহাদের রচনানৈপুণ্যকেও তাঁহারা সমাজব্যবহারনিরপেক্ষ এক আশ্চর্য ঐশী শক্তি বলিয়া ভাবিতেন না। কিন্তু সভ্যতার বিবর্তনে যখন বহু শিল্পই সমাজের কাছে অপ্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল, অথচ আপনার শিল্পনৈপুণ্যের প্রতি শিল্পীর যে মোহ আছে তাহা কাটিল না, তখন অনাকাঙ্ক্ষিত শিল্পীদল ভাবিতে সুরু করিলেন, তাঁহাদের উপেক্ষিত শিল্পকলা বুঝি লোকব্যবহারের বহু উর্দ্ধে, তাহার সার্থকতা বুঝি তাহার নিজের মধ্যেই নিহিত; অতএব শিল্পের জন্যই শিল্প—এই

মতবাদ জন্মলাভ করিল। অধুনা জগতে এইরূপ কর্মহীন শিল্পীর সংখ্যা অল্প নহে। কালীঘাটের পটুয়ার দল যাহারা তোমার কলাকৈবল্যবাদী বন্ধুগণের মতে শিল্পীই নহে, তাহারা অত্যন্ত আশ্বস্তচিত্তে পট আঁকিয়া চলিয়াছে; তাহাদের বলিষ্ঠ স্থুল তুলিকা-রেখায় অতি অনায়াসেই কালী, দুর্গা, মহেশ্বর, গণপতি মূর্তিলাভ করিতেছেন, তথাকথিত রসজ্ঞানের বালাইবর্জিত অসংখ্য তীর্থযাত্রী ধর্মনিষ্ঠায় তাহা কিনিয়া লইতেছে। কিন্তু দেখো 'আসল' শিল্পীদের সকরুণ অবস্থা। সমাজ-বর্জিত রসের পাক-শালায় শিল্পীপাচকদল ভাবমুকুলিতনয়নে আপন আপন স্বর্গীয় পাক-নৈপুণ্যের তারিফ করিয়াই দিন যাপিতেছেন।"

বন্ধু চোখ বুঝিয়াই শুনিতেছিলেন। কথার শেষে টের পাইলাম, তিনি কিয়ৎকাল হইল নিদ্রামগ্ন।

উপহার

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী

বেদনার অশ্রুজলে বাক্যহীন ভাষে
যে কথা কহিয়া গেলে, বিদায়ের ক্ষণে,
সে কথা রাঙিয়া উঠে রক্তিম-উচ্ছ্বাসে
বেদন-মথিত মম মর্শ্মের নির্জ্জনে।
বাণী তার জেগে ওঠে দিগন্তের তীরে
দিনান্তের কালো মেঘে সমাপ্তির সুরে
মায়া তার ছায়া হয়ে তারপর-ও ফিরে-
আলো-আঁধারির ছলে বনতলে ঘুরে।

আজি গোধূলির ক্ষণে বন-পথ পাশে
শ্রান্ত তনু সম্বরিয়া ক্লান্ত দুটি চোখে
সঞ্চিত করিয়া রাখে স্মিত স্নিগ্ধহাসে,
বিমুক্ত কুন্তল পিঠে মায়াময়ী ও কে ?
তব নয়নের ভঙ্গী মাখা আঁখি তার—
পথের পাথেয় মোরে, দেয় উপহার।

সতীনাথ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সতীনাথ থিয়েটার করে। কমিকে তার খ্যাতির সীমা নাই। সিনেমার পর্দ্দাতেও তার কমিক-ছবি আবালবৃদ্ধবনিতাকে হাসিয়ে মশগুল্ করেছে। ছেলেমেয়েরা সতীনাথকে ভালোবাসে—তাদের সমবয়সী বন্ধুর মতো! সতীনাথের কমিক ছবি পর্দ্দায় পড়লে ছেলেমেয়েদের ঘরে ভুলিয়ে রাখা দায়!

সেদিন সকালে সতীনাথের নামে ডাকে এক চিঠি এসে হাজির। খামের ঠিকানা মেয়েলি হাতে লেখা! সতীনাথ বিবাহ করে নি,—একা থাকে—কোনো কূলে তার কেউ নেই! এ চিঠি কে লিখলে?

বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে খাম ছিঁড়ে সতীনাথ চিঠি পড়লো। চিঠিতে লেখা আছে—

সতীদা,

হঠাৎ আমার লেখা চিঠি পেয়ে তুমি অবাক হবে অনেকখানি জানি—আমি তা বুঝছি। বোধ হয় দশ বৎসর পরে আবার তোমার সামনে দাঁড়াচ্ছি।

বড় দায়ে পড়ে এ চিঠি লিখছি। দায়ের কথা বলি। আমার ছেলে রতুর বয়স ছ'বছর। জন্মাবধি কি তার রোগ, সে ভালো করে' চলতে পারে না। কত চিকিৎসা হয়েছে, কোনো উপায় হয়নি। সেজন্য আমাদের মনস্তাপের সীমা নেই!

ডাক্তারেরা বলে আসছেন, একটু ডাগর হলে অপারেশন করে' তাঁরা একবার শেষ চেষ্টা করবেন। তাঁরা বলছেন, অপারেশনে ভয় নেই। অপারেশন হলে ছেলে হাঁটবে, চলে বেড়াবে সহজ ভাবেই। আমার স্বামী বলেন, অপারেশন হোক! আমার ভয় করে। এই একটি ছেলে! অপারেশনের পর কি হবে, ভগবান জানেন! স্বামী বলেন, মানুষ হতে হবে ছেলেকে। আজন্ম পরের কাঁধে চড়ে বেড়িয়ে ও কোনোদিন সুখী হতে পারবে না!

নিরুপায় হয়ে অপারেশনের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। সামনের রবিবারে অপারেশন। মাঝে পাঁচটি দিন বাকী। ছেলে তোমার কমিক প্লে দেখে তোমাকে কি ভালোবাসে, তা আর কি লিখে জানাবো! সামনে তার জীবন-মরণ সমস্যা! কি চাই? তাকে জিজ্ঞাসা করছি বার বার। সে বলছে, সতীবাবুর সঙ্গে যদি গল্প করতে পাই, তাহলে অপারেশনে আমার কোনো ভয় হবে না, মা। দিনরাত ছেলের মুখে তোমার নাম, তোমার কথা। গ্রামোফোনে তোমার যত কমিক রেকর্ড আছে, তাকে সব কিনে দিয়েছি, দিনরাত তোমার রেকর্ড শুনছে! ছেলে বায়না নিয়েছে, সতীনাথবাবুকে দেখবো মা…! তাঁকে চিঠি লিখে একবারটি আনো! উনি ধমক দেন! উনি তো জানেন না, সতীনাথবাবু কে…তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় কতখানি!

তাই তোমাকে মায়ের মনের মিনতি জানাচ্ছি, যদি পূর্ব্বেই আমার এখানে আসতে পারো কৃতার্থ হবো। যদি ছেলেকে আর না ফিরে পাই, তার এ আশা মেটাতে পারলুম না তবে মনস্তাপের সীমা থাকবে না—আর তুমি কত আপনারজন! পারবে আসতে?

যদি আসো, আমার সঙ্গে ঐ কমিক-প্লের মারফৎ ছাড়া তোমার আর কোনো সম্পর্ক নেই—অন্য পরিচয় নেই, এমনিভাবে এসো।

তুমি জানো না, তুমি এলে কি স্বর্গ হাতে পাবো! আমার কথা মনে করে' না পারো, নিরীহ বেচারী ছেলেটার কথা মনে করে' আসতে পারবে না?

তোমার খ্যাতির কথা শুনি, মনে কি আনন্দ হয়, তা আমিই জানি!

আশা করি, ভালো আছ এবং তোমার দেখা পাবো।

নীরা

চিঠি পড়ে' খোলা জানালার মধ্য দিয়ে সতীনাথ চাইলো বাইরে আকাশের পানে। সকাল বেলার স্নিগ্ধ রৌদ্রকিরণে আকাশ ঝলমল করছে। সে আকাশের পটে চকিতে জেগে উঠলো অতীত দিনের সহস্র স্মৃতি···

একদিন পাশাপাশি নীরার সঙ্গে কি অন্তরঙ্গ ভাবেই না সময় কেটেছে। পল্লীর পথে ছুটোছুটি ঘাটে ঘাটে হাজার রকমের খেলা—নদীর জলে সাঁতার—দুরন্তপনা···

নীরাকে তার পিসি কত বকেছে,—ডাগর মেয়ে—লজ্জা করে না সোমত্ত ছেলের সঙ্গে পথে ঘাটে হল্লা করে' বেড়াস। নীরা জবাব দিত,—বেশ করি, বেড়াই···

নীরার মা বলতেন,—দুটিতে যেমন ভাব আর দুজনকে যেমন মানায়,—

নীরার পিসি ধমক দিত, বলতো—থামো বৌ কি আছে ওর বাপের! আমার ভাইঝিকে যে বিয়ে করবে, সে ওর জন্য তপস্যা করছে।

ননদের ভৎ'সনায় মায়ের কথা ঐখানেই থেমে যেতো।

নদীর ঘাটে, সন্ধ্যার সময় দুজনে গিয়ে বসতো···আকাশে চাঁদ—সে আলোর আশে-পাশে বাব্‌লা-ঝোপে অজস্র হলদে ফুলগুলোর পানে চেয়ে থাকতো! সতীনাথ গল্প বলতো···রাজার গল্প, রাজকন্যার গল্প···ভূতের গল্প। ভূতের গল্প শুনতে শুনতে ভয়ে নীরা একেবারে সতীনাথের বুকের কাছে ঘেঁষে এসে বসতো···তার মাথার চুলে নেবু তেলের গন্ধ···সতীনাথের মন প্রশস্ত হয়ে উঠতো···

সতীনাথ ডাকতো—নীরা···

ভূতের ভয়ে নীরার গা ছম্‌ ছম্‌ করতো—চোখের দৃষ্টি হতো একেবারে অবিচল। সে দৃষ্টি সতীনাথের বুকে নিবদ্ধ করে' নীরা বলতো—উ—সতীনাথ বলতো যদি ভূত আসে? নীরা আরও ঘেঁষে বসতো, বলতো, না ভাই, ওকি···অমন যদি ভয় দেখাও, তাহলে কখনো আর সন্ধ্যার পর তোমার কাছে আসবো না···তুমি ডাকলেও না···রাজা-রাজকন্যার গল্প শুনতে শুনতে সতীনাথ বলতো, তুমি যদি এই গল্পের রাজকন্যা হতে? গল্পের মাধুর্য্যে মুগ্ধমন নীরা বলতো,—আর তুমি হতে রাজপুত্তুর···তাহলে তোমার গলায় মালা দিতুম। সতীনাথ বলতো ও···যদি আমি রাজপুত্তুর হতুম, তাহলে গলায় মালা দিতে···না হলে নয়? এ কথা বলে সতীনাথ দুহাতে নীরাকে ঠেলে দিত, বলতো—যাও, সরে গিয়ে বসো। আমি তো রাজপুত্তুর নই···নীরা সরে বসতো সতীনাথের গা ঘেঁষে-ঘেঁষে; বসে বলতো—তাই বুঝি। বা রে, আমিও তো রাজকন্যা নই···। এ তো গল্পের কাজ হচ্ছে। হেসে সতীনাথ নীরাকে বুকের মধ্যে টেনে নিত।

কৈশোরের সে স্বপ্ন···রামধনুর মতো নানা রঙে বুকের আকাশে এখনো ঝল্‌মল্‌ করছে,—মেলায় নি তো!···

তারপর···একদিন সেই ভাঙ্গা মন্দিরের গায়ে লতানে গাছে সেই লাল লাল অজস্র ফুল! ফুল দেখে নীরা বললে,—আমায় পেড়ে দাও ঐ ফুল। তার বায়না শুনে সতীনাথ মন্দিরের ভাঙ্গা দেউলের ফাটলে-ফাটলে পা দিয়ে ঠেলে গিয়ে একেবারে সেই চূড়োর কাছে···কত ফুল পেড়ে নীচে ফেলতে লাগলো···নীরার কি সে হাসিখুসী! এবং সে হাসিখুসীতে ভুলে নামতে গিয়ে কোথায় পা রাখতে সতীনাথ কোথায় দিলে পা···অমনি দুম্ করে পড়লো মন্দিরের শান-বাঁধানো রোয়াকের উপর—পড়বামাত্র পৃথিবীর আলোবাতাস যেন উবে গিয়েছিল···দুটি চোখ তার মুদে গেল।

যখন চোখ মেলে চাইলো, দেখে বাড়ীর বিছানায় শুয়ে আছে···গলার কাছটা বাঁধা। শুনলে পড়ে গিয়ে কলারবোন্ ভেঙ্গে গেছে।

নীরা আসতো দেখতে··প্রথম-প্রথম প্রত্যহ দু' বার তিনবার চারবার করে···। ঘরে যখন কেউ থাকতো না, তখন নীরা বসতো তার বিছানায় তার পাশে—চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে চেয়ে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিত···নীরার দুচোখ জলে ভরে উঠতো, সজল মৃদু কণ্ঠে নীরা বলতো,—আমার জন্যেই তোমার এ-কষ্ট! সতীনাথ জবাব দিত না, আমার কুষ্ঠীর লিখন—ভটচার্য্যি মশায় বলছিলেন, ফাঁড়া ছিল। নীরা তাতে প্রবোধ মানতো না—বলতো—এর জন্যে তোমাকে আরো বেশী ভালবাসবো সতীদা···সত্যি, তোমাকে ছাড়া আর কাকেও আমি বিয়ে করবো না। হেসে সতীনাথ বলতো,—পাগলা! বিয়ে করা না করা সে তো ইচ্ছা নয়···বাড়ীর লোকে বিয়ে দেবে যে! দু' চোখে জল নীরা বলতো—বাড়ীর লোক দিক দিকিনি আর কারো সঙ্গে আমার বিয়ে—কখ্খনো তা হতে দেবো না।

একটি মাস সতীনাথ ছিল শয্যাগত···শেষের দিকে নীরার দর্শন দুর্লভ হলো। সতীনাথ বুঝলো, পিসি আসতে দেয় না···

তারপর যেদিন সতীনাথের ব্যাণ্ডেজ খোলা হলো, মা বললেন,—ওদের নীরার পাকা দেখা হবে কাল! সে কথায় সতীনাথ কেঁপে উঠছিল—মনে পড়লো, কত কষ্টে মাকে সে প্রশ্ন করেছিল,—কোথায় বিয়ে হচ্ছে? মা বললেন,—তা খুব বড় লোকের বাড়ী রে! ছেলের বাপের মস্ত ব্যবসা··· কলকাতায় পাঁচ ছ'খানা বাড়ী আছে···গাড়ী আছে। মেয়ে দেখে খুব পছন্দ হয়েছে···এক পয়সাও নেবে না।

সতীনাথ কোনো কথা বললো না···বিছানায় পড়ে রইলো।

ভেবেছিল, ব্যাণ্ডেজ খোলা হলে সে যেন মুক্তি পাবে এবং মুক্তি পাবামাত্র ছুটে যাবে নীরাদের বাড়ী নীরার কাছে। মায়ের কথা শুনে মনে হলো, কেন যে সেরে উঠলুম!

ব্যাণ্ডেজ খোলা হয়ে গেলেও সতীনাথ বাড়ীতে পড়ে রইলো। মা বললেন—একটু উঠে হেঁটে বেড়া রে—। সতীনাথ জবাব দিলে, বড্ড দুর্ব্বল মনে হয় মা। মাথা ঘোরে। যদি ফের মাথা ঘুরে পড়ে' যাই!

নিত্য পড়ে পড়ে সে ভাবতো, আজ নীরা বাসায় আসবে—এলে তাকে কনগ্রাচুলেট করবে সতীনাথ—

কিন্তু নীরা এলো না।···

ওদিকে একদিন সকালে শানাইয়ের সুরে ঘুম ভেঙ্গে সতীনাথ উঠলো গিয়ে নিজেদের ছাদে। ছাদ থেকে ওবাড়ী দেখা যায়···ছাদের উপর ম্যারাপ বাধা হয়েছে···বাড়ীর সামনে লাল-রঙে ছোপান কাপড় পরে লোকজন চলাচল করছে···সতীনাথ তখন চেয়ে রইল আকুল দৃষ্টি নিয়ে···ওবাড়ীর ছাদের পানে···নীরা একবার ছাদে উঠবে না।

নীরা উঠলো না···রোদ এদিকে মাথার উপর চড়চড় করে উঠলো। নিশ্বাস ফেলে সতীনাথ নীচে নেমে গেল।···

কি করে' ক'টা দিন তার কেটেছিল···আজো সে কথা মনে হলে বুকখানা টন্‌টন্ করে!···

তারপর বিয়ের দিন। ওবাড়ীতে সানাই বাজে···এ বাড়ীতে সতীনাথ দু' হাতে বুকখানাকে চেপে ধরে' বসে থাকে। বুকের মধ্যে যেন হাজার-হাজার মেশিন গান চলেছে···যেন তার বুক মাড়িয়ে লক্ষ লক্ষ নাজি চলেছে বীরদাপে অভিযানে···

বিকেলে রোদ পড়ে এলে সতীনাথ থাকতে পারলো না—মা গেছেন ও বাড়ীতে নেমন্তন্ন। বাড়ীতে কেউ ছিল না। সতীনাথ নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বেরিয়ে পড়লো খিড়কীর পথে···

দু'বাড়ীর মাঝখানে মস্ত একটা বাগান। বাগান দিয়ে সে এলো নীরাদের পুকুর ঘাটে। ঘাটের রোয়াকে বসে নীরা, নীরার সঙ্গে পাঁচ সাতটি মেয়ে তারি সমবয়সী, ক'জনে বসে হাসিগল্প করছিল।

সতীনাথের দিকে নীরার চোখ পড়লো, পড়বামাত্র সে যেন এতটুকু হয়ে গেল, তারপর চট করে উঠে নীরা প্রায় ছুটে তাদের বাড়ীর মধ্যে গেল চলে, রাগে সতীনাথের চোখ জ্বলে উঠলো। ভাবলে না হয় বিয়ে হচ্ছে বড়মানুষের ঘরে, তা বলে এত, আমাকে দেখামাত্র পালিয়ে যাওয়া হলো! কেন? আমি ভূত না বাঘ যে, তোমাকে খেয়ে ফেলবো?

আক্রোশে তপ্ত দেহমন নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে সতীনাথ চলে গেল—যে দিকে দু' চোখ যায়··· দূরে—বহু দূরে···

মনে পড়লো, সে রাত্রি বাড়ী গিয়েছিল···তখন দুটো বেজে গেছে। বিয়ে-বাড়ীর কোলাহল কলরব প্রায় কমে এসেছে···শুধু সামনে একরাশ এঁটোপাতা আর উচ্ছিষ্ট—সামনে গ্রামের কটা কুকুর এসে জটলা সুরু করেছে···

তার পর···

জীবনটাকে কোন্ পথ দিয়ে চালিয়ে ষ্টেজ আর ফিল্মষ্টুডিয়োয় এনে ফেলেছে। মা বহু সাধ্য-সাধনা করেছিলেন,—বিয়ে করবিনে রে সত্যি? হেসে সে মুখের কথায় জবাব দেছে,—না মা···সময় যা পড়েছে, কে এসে মোটরে বেড়াতে চাইবে, জুড়ি গাড়ি চাইবে, না দিতে পারলে হুট্-আউট করে দেবে—সে আমার সহ্য হবে না।—

সে মা আজ কোথায়!···

নীরা কেমন সংসার পেতে বসেছে···রাজার পুরী···সোনা রূপো হীরা-মণির জৌলুসে সে পুরী ঝলমল করছে···গল্পের রাজপুত্তুর এসে দাঁড়িয়েছিল নীরার দোরে এবং নীরা তারি গলায় মালা

দিয়েছে। স্বামী···ছেলে···বাড়ী গাড়ী···দাসদাসী—সুখের তার সীমা নেই! এত সুখের মধ্যে সতীনাথ ভেবেছিল, নীরা তাকে ভুলে গেছে···

হয়তো গিয়েছিল—আজ মনে পড়েছে ছেলের জন্য···তা'ও তার কমিকের দৌলতে।

ঠিক, তার জীবনটা তো ট্রাজেডি নয়···কমিক···কমিক···আগাগোড়া তার কমিক।—

এখন সে কি করবে? যাবে?···

নীরার সেই বিবাহ-রাত্রির কথা মনে পড়লো! অপমানের অত বড় আঘাত নীরা দিলে··· সেখানে তো পিসিমা ছিল না। তবে···?

কিন্তু না, সে যাবে! হাসিমুখে মাথা উঁচু করে' সে যাবে! নীরাকে জানিয়ে আসবে, তুমি তার গলায় মালা দাওনি বলে' সতীনাথের কোথাও সেজন্য বাধেনি···! তোমার আছে বাড়ী গাড়ী ধনদৌলত···তারো আছে খ্যাতি সম্পত্তি, তার ঐ ছ'বছরের রুগ্ন ছেলেও স্বীকার করে।

তা ছাড়া নীরা আজ চেয়েছে অনুগ্রহ···করুণা···সতীনাথের করুণার সে ভিখারিণী! সতীনাথ নীরার কাছে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দাঁড়ায় নি···মনে জাগলো অহঙ্কার···। সতীনাথ ভাবলো যাবো··· বিজয়ীর বেশে···নীরা যদি ভেবে থাকে, সে বিহনে সতীনাথের জীবন মরুভূমি হয়ে আছে···তাকে বুঝিয়ে দিয়ে আসবে, নীরার সে ধারণা ভুল, মস্ত ভুল।···

সেই দিনই সতীনাথ গেল নীরার গৃহে। চিঠিতে স্বামীর নাম ঠিকানা লেখা ছিল···জগদীশ রায়, ফার্ণ রোড, বালিগঞ্জ।

জগদীশ রায়ের সঙ্গে দেখা। সতীনাথ বললে—আমার নাম সতীনাথ। কমিক করি। আপনার স্ত্রী আমাকে আসার জন্য চিঠি লিখেছিলেন—

জগদীশ রায় বললেন—ও···নমস্কার। বসুন—আমাকে একবার বেরুতে হচ্ছে···বৈষয়িক কাজ। আমার স্ত্রীকে খবর দিচ্ছি···তাঁর সঙ্গে কথা কবেন।···

ভৃত্য গেল খবর দিতে। নীরা এলো।

জগদীশ রায় বললেন—সতীনাথবাবু এসেছেন। আমাকে বেরুতে হচ্ছে হুঙ্কারদাস গাড়োল-চাঁদের ফার্ম্মে···জরুরি দরকার। কথাবার্ত্তা কও, যা ব্যবস্থা করবার, করো···

জগদীশ রায় বেরিয়ে গেলেন।

একটা নিশ্বাস ফেলে নীরা বললে—দয়া হয়েছে তাহলে সতীদা—

গম্ভীর কণ্ঠে সতীনাথ বললে—দয়ার কথা নয়। মানে ছেলের অসুখ—

নীরা বললে—সে যে কি খুশী হবে! তাকে বলেছি, তোমার সতীনাথবাবুকে আসার জন্য চিঠি লিখেছি—! এসো ওপরে···

আর কোন কথা নয়।

নীরার সঙ্গে সতীনাথ এলো দোতালার ঘরে। বিছানায় বসে রয়েছে ছেলে রতু—

নীরা বললে,—কে বলো দিকিনি রতু?

সতীনাথের মুখের পানে চেয়ে ছ'চোখ বিস্ফারিত করে' রতু বললে—সতীনাথবাবু—

সতীনাথ বললে—ঠিক বলেছো! বা! আমাকে চিনলে কি করে' বলো তো?

রতু বললে—আপনার ছবি দেখেছি যে···

সতীনাথ বললে—হুঁ—। তোমার কি অসুখ করেছে বলো তো ?

রতু বললে—পায়ে অসুখ। আমি হাঁটতে পারি না···পায়ে জোর নেই—পা বাঁকা।

সতীনাথ বললে—এবারে ডাক্তারে পা সারিয়ে দেবেন বলেছেন ?

রতু বললে—হ্যাঁ···

রতুর সঙ্গে নিমেষে হলো ভাব। রতু বললে—আমাকে কমিক করা শেখাবেন ?

সতীনাথ বললে—শেখাবো···তুমি বড় হও !

নীরা বললে—চা এনে দি ?

সতীনাথ বললে—না···আমি এখন রতুবাবুর সঙ্গে গল্প করবো—

গল্প চললো—

সতীনাথ বলতে লাগলো রাজার গল্প, রাজপুত্তুর-রাজকন্যার গল্প···ভূতের গল্প···কৈশোরে যে গল্পগুলি সে নীরাকে শোনাতো, সেই সব গল্প—

রতু বললে—বা !—এ গল্প যে আমি জানি, মা বলেছে !

নীরা বসেছিল রতুর শয্যাপ্রান্তে—সতীনাথ চাইলো নীরার পানে—চকিত দৃষ্টি—নীরা যেন পাথরে খোদা মূর্ত্তি—তেমনি নিশ্চল নিস্পন্দ। একটা নিশ্বাস ফেলে সতীনাথ বললে—মায়ের কাছে শুনেছো এ গল্প ? ভারী আশ্চয্যি তো ! তোমার মা এ গল্প কেমন করে' জানলেন বল তো ?

রতু চাইলো নীরার পানে···বললে—কার কাছ থেকে এ গল্প তুমি শিখলে মা ?

নীরার সর্ব্বাঙ্গ দুলে উঠল—

রতু বললে—বল না···বা রে···

কোনমতে নীরা বললে—বইয়ের গল্প কিনা—সতীনাথবাবু যে বই পড়ে এ গল্প শিখেছেন, আমিও সেই বই পড়েছি—

রতু বললে—সতীনাথবাবু, কোন্ বই থেকে এ গল্প শিখেছেন, তুমি সেই বই পেলে কি করে' ? সতীনাথবাবু তোমাকে তো সে বইয়ের নাম বলেন নি—

মিনতিভরা দৃষ্টিতে নীরা চাইলো সতীনাথের পানে—সতীনাথ সে দৃষ্টি লক্ষ্য করলো। সতীনাথ বললে—গল্পের বই সব ছাপা থাকে কি না—দোকানে বিক্রী হয়—! তোমার মা কিনে পড়েছেন সে বই—

রতু বললে—আমাকে কেন তবে সেই বই কিনে দাও নি মা—বা রে—

কথায় কথায় সেদিন রতু বললে—আমি একদিন পড়ে গেছলুম সতীনাথবাবু—মোটর থেকে তখন আমি খুব ছোট ছিলুম। মা বলে, তখন আমার নাম হয় নি—মা আমাকে 'বেবি' বলে' ডাকতো !—তারপর থেকে পা কি হয়ে গেল—চলতে পারি না—এত বয়স হলো, তবু না !—

সতীনাথ বললে—হুঁ—

রতু বললে—আপনি কখনো পড়ে গিয়েছিলেন সতীনাথবাবু ?

সতীনাথ বললে—গিয়েছিলুম বৈ কি—

—গাড়ী থেকে ?

—না। মন্দির থেকে।

দু'চোখ কপালে তুলে রতু বললে—মন্দির থেকে কি করে' পড়ে গেলেন ? ঠাকুর দেখতে গিয়ে ?

—না—ফুল পাড়তে গিয়ে। মন্দিরের গায়ে লতানে গাছে অনেক ফুল ফুটে ছিল—লাল লাল ফুল—

রতু বললে—ফুল নিয়ে কি করতেন ?

সতীনাথ বললে—একটি মেয়ে বললে—ও ফুল পেড়ে দিতে হবে। তার কথায় ফুল পাড়তে উঠেছিলুম—অমনি পড়ে গেলুম।

উদ্বেগব্যাকুল কণ্ঠে রতু বললে—তারপর সে মেয়েটি কি করলে ?

সতীনাথ চাইলো নীরার পানে—নীরা কাঠ!

সতীনাথ বললে—সে আবার কি করবে!

—পালিয়ে গেল ?

—তা জানি না। পড়ে আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম।

—অনেক দিন বিছানায় শুয়েছিলেন ?

—ছিলুম বৈ কি।

—সে মেয়েটি সেবা করতে আসতো ?

সতীনাথ আবার চাইলো নীরার পানে—বললে—সেবা করবে কেন ? সে ছিল বড় লোক—মাঝে মাঝে দয়া করে' দেখতে আসতো। তাও বেশী দিন না—তার বিয়ে হয়ে গেল ঐ সময়ে কিনা, রাজা এলো বিয়ে করতে—

নীরা বসতে পারলো না—উঠে দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রতু বললে—তারপর ?

—তারপর

রাত তখন প্রায় বারোটা।

আহারাদির পর বারান্দায় একটি চেয়ারে বসে ছিল সতীনাথ—মাথার উপর আকাশে চাঁদ—জ্যোৎস্নার বন্যা ঝড়ে পড়েছে যেন পৃথিবীর বুকে···

সহসা পাশে মৃদু স্বরে ডাক—সতীদা!

সতীনাথ তাকালো, বললে—নীরা ?

হ্যাঁ।

নীরা চারিদিকে তাকালো। তারপর বললে, কাল অপারেশন্···আমার উপর রাগ রেখো না···আশীর্ব্বাদ করো।

সতীনাথ বললে—কে বললে, রাগ আছে ? তাহলে আসতুম না···আসতে পারতুম না—

নীরা বললে, তা জানি। আমাকে তুমি সত্যিকারের ভালোবাস। আমার কষ্ট হবে শুনে তুমি চুপ করে থাকতে পারবে না, আমি জানতুম, না জানলে তোমাকে চিঠি লেখার সাহস আমার হতো না।

সতীনাথের মনে বহু দিনকার পুঞ্জিত অভিমান মাথা তুলে দাঁড়াল, সতীনাথ বললে, তাই যদি তো এতদিন একখানা চিঠি লিখে খবর নিতে পারোনি কেন ?

নীরা কোনো জবাব দিলে না, চুপ করে রইলো।

সতীনাথ বললে, বলো ?

নিশ্বাস চেপে নীরা বললে, মেয়েমানুষ আমি, সে কথা তোমাকে বোঝাতে পারবো না। শুধু এইটুকু বলি, আমি এত ছোট হয়ে আছি যে তোমার সামনে মুখ তোলবার সামর্থ্য আমার নেই সতীদা। কিন্তু যত দোষ করে থাকি, আমাকে তুমি ক্ষমা করো।

সতীনাথ বললে—শুতে যাও, এখানে আমার সঙ্গে কথা কইছো—এটা ভালো দেখাবে না।

নীরা বললে—ভয় নেই। আমি মা—এ বাড়ীর সকলে তা জানে।

সতীনাথ বললে—আমার ঘুম পাচ্ছে নীরা, আমি শুতে চললুম।

—উনি জানেন না, তোমার সঙ্গে কোনোদিন আমার কোনো সম্পর্ক ছিল।

সতীনাথ বললে—জানি! উনি আজ আমার সঙ্গে দর করছিলেন—পেটের দায়ে কমিক করে' পয়সা রোজগার করি, তাই জিজ্ঞাসা করছিলেন, এখানে আসার জন্য কত টাকা দেবো ?

নিশ্বাস ফেলে নীরা বললে—তুমি কি বললে ?

—বললুম, আগে ছেলে সেরে উঠুক, দর-দস্তুর তখন করবেন। বললুম, পেশাদার হলেও আমি দাঁও কষতে শিখিনি।

অবিচল নেত্রে নীরা চেয়ে রইলো সতীনাথের পানে।

সতীনাথ বললে—তুমি ওঁকে বলেছো—মানে, উনি জানেন, একদিন আমরা পাশাপাশি বাস করতুম ? আমাকে তুমি জানো ?

—না।

—বুঝেছি,···এজন্য আমাকে ওঁর কাছে এত ছোট করেছো, তিনি যদি ভেবে থাকেন, আমি পেশাদার কমিক করি···ওঁর দোষ কি!

আর্ত্ত কণ্ঠে নীরা বললে—উপায় ছিল না, সতীদা। যদি সে কথা বলতুম···তোমাকে বোঝাতে পারবো না, কত দুঃখে বলতে পারিনি···! তোমাকে ছোট করে থাকি যদি, নিজেকে আরো কত ছোট করেছি সেজন্য···যদি বুঝতে পারতে···! তিনি আমাকে বলেছিলেন, তোমার সঙ্গে একটা দাম যেন ঠিক করি—শেষে যদি তুমি ভাবো, ফাঁকি দিলুম···কিন্তু ও কথা থাক···ঐ ছেলে আমার প্রাণ—তোমাকে পেয়ে সে কি আরাম পেয়েছে—আমার আর কোনো দুঃখ নেই! এখন শুধু এসেছিলুম তোমার আশীর্ব্বাদ চাইতে—ছেলেকে যেন ফিরে পাই—সতীদা। তুমি আশীর্ব্বাদ করো, তা হলে আমার কোনো ভয় থাকবে না।

সতীনাথ বললে—কোনো ভয় করো না। ডাক্তারকে আমি জিজ্ঞাসা করেছি—তোমাদের কাছে

সত্য কথা গোপন করলেও, আমি পেশাদার কমিক করে বেড়াই আমার কাছে তো মিথ্যা বলবেন না। বললেন অপারেশনে কোনো ভয় নেই।

—তোমার মুখে ফুলচন্নন পড়ুক, সতীদা।

—শোও গে নীরা।

যথাসময়ে অপারেশন হলো—উদ্বেগ, আতঙ্ক, সংশয়, ভয়—সে নিদারুণ মুহূর্ত্ত কাটলো।

তিন দিন পরে ডাক্তারেরা বললেন—নিরাপদ।

সতীনাথের বিদায়ের ক্ষণ এলো।

জগদীশ রায় ভদ্র লোক—বড় লোক! সতীনাথকে বহু ধন্যবাদ সহ চেক দিলেন—দু'হাজার টাকার চেক!

ব্যস্ত মানুষ—চেক দিয়ে কর্ত্তব্য সম্পাদন করে' জগদীশ বাবু চলে গেলেন তাঁর অফিসে।

আহারাদির পর সতীনাথের যাবার কথা।

নীরা এলো।

চেকখানা নীরার সামনে ধরে' সতীনাথ বললে—সব ভাল হলো শুধু এ-অপমানটুকু না ভোগ হতো যদি—

নীরা বললে—তুমি ভাবো, তোমার কথা আমার মনে জাগে নি। চেক রাখো, ফেলে যাও—আমার তাতে লাভ ক্ষতি হবে না, যাও যদি, ওঁকে ডেকে বলো, আমার কথা। বলো একদিন তোমার গা ছুঁয়ে তোমার বুকে মুখ রেখে যে সব কথা বলেছিলুম—

নীরার দু'চোখে জলরাশি—তার কণ্ঠ স্তব্ধ হলো।

সতীনাথ বললে—চুপ করো নীরা···আর কোনো কথা বলতে দেব না।

নীরা বললে—যা তোমার মনে আসে বলো। এ কথা আর কেউ শুনবে না! আমি শুনবো নিঃশব্দে তোমার কথা—তোমার ভর্ৎসনা।

সতীনাথ ভাবছিল, এ চেক ছিঁড়ে ফেলবো। জগদীশ রায় যা ভাবে, ভাবুক! নীরা চিরদিন নিজের দোষ-ত্রুটি-স্খালনে বেশ নিপুণ—সতীনাথ তা' জানে।

সতীনাথ চলে যাচ্ছিল।

নীরা বললে—কি করবে ও চেক?

—ছিঁড়ে ফেলবো। তারপর এ সম্বন্ধে তোমার যা খুশী, তোমার স্বামীকে তুমি বলতে পারো।

—বেশ, তাই করো। আমার ভাগ্যে যা হয়, হবে। সেজন্য তোমার চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই। সত্যি, আমি তো তোমার মুখ চাইনি কোনো দিন।

সতীনাথ এ কথার জবাব দিলে না, বললে—রতু কি করছে?

—ঘুমোচ্ছে।

—সে জেগে উঠলে তাকে বলো, কাল এসে তাকে দেখে যাব।

—বলবো! তুমি এখুনি যাচ্ছো?

—হ্যাঁ।

চেকখানা সঙ্গে নিয়ে যাওয়া এখন অসম্ভব? নিজে না রাখো, কোনো অনাথ-আশ্রমে দিয়ে দিয়ো।

সতীনাথ নিঃশব্দে চেয়ে রইলো নীরার পানে।

নীরা বললে—দয়া—করুণা···

সতীনাথ জবাব দিলে না।

নীরা বললে—জানি—কি তুমি ভাবছো—ভাবছো, ধনসম্পদ নিয়ে আমি রাজ-রাণী হয়ে বাস করছি···

বলতে বলতে নীরার স্বর বাষ্পবিজড়িত হলো—সেই বিজড়িত কণ্ঠে নীরা বললে,—আমি কি কষ্ট ভোগ করছি—মনের মধ্যে কি আগুন জ্বলছে সারাক্ষণ—বাঁচতে পারতুম না যদি ভগবান ঐ ছেলেটিকে না বুকে এনে দিতেন। তুমি পুরুষমানুষ তুমি বুঝবে না—মেয়েমানুষকে বুকে কতখানি আগুন জ্বালিয়ে রেখেও মুখে হাসির রেখা আঁকতে হয়—শুধু বিশ্বাস করো এর বেশী বলবার আর আমার কিছু নেই।

নীরার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছিল। কোনো মতে সতীনাথের পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হয়ে সে প্রণাম করল।

সতীনাথ বললে—আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মনের আগুন নিবে যাক—স্বামীপুত্র নিয়ে তুমি সুখী হও।

এ কথার পর সতীনাথ দাঁড়ালো না—দালান পার হয়ে সিঁড়ি বয়ে নীচে নেমে গেল।

নীরা বারান্দার রেলিঙে মুখ রেখে কাঁদছিলো—রতুর মানুষকরা দাসী গঙ্গা এসে বললে—কেঁদনা বৌদি—ঐ তো খোকা উঠেছে—কেমন খেলা করছে। বলছে, মাকে ডেকে দাও—মা আমাকে গল্প বলবে।

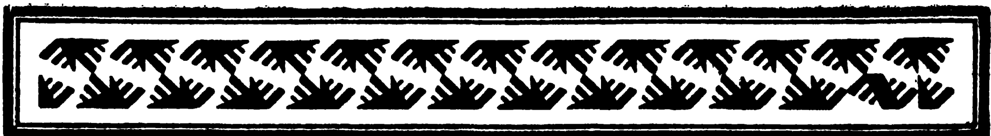
চোখের জল মুছে নীরা এলো রতুর কাছে।

রতু বললে—মামাবাবু চলে গেছেন মা? গঙ্গা বলছিল—

—মামাবাবু! নীরার স্বরে বিস্ময়!

হেসে রতু বললে, বা রে তুমি জানো না বুঝি! সতীনাথবাবু—উনিই তো আমাকে আজ সকালে বলছিলেন, আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড় তোমার মার চেয়েও বয়সে বড়—আমাকে সতীনাথবাবু বলোনা রতু—মামাবাবু বলে' ডেকো!

নীরা কোনো জবাব দিলে না—চোখের পিছনে অশ্রুরাশি আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে এলো!



শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম্

৺সুকুমার রায়চৌধুরী

['আবোল তাবোল' রচয়িতা স্বর্গীয় সুকুমার রায় চৌধুরীর নামের সঙ্গে আবালবৃদ্ধবনিতা পরিচিত। তাঁহার একটি অপ্রকাশিত নাটিকা আমরা এই সংখ্যায় আরম্ভ করিলাম।—অ. স.]

প্রথম দৃশ্য

হরেকানন্দ। দেখ্ জগাই, তুই বল্‌লে বিশ্বেস করবিনে।

সকলে। কেউ বিশ্বেস করবে না।

হরেকা। কাল থেকে মনটা আমার এমনি ওলটপালট করছে, সারারাত আর ঘুম হয়নি। দুপুরে একটু তন্দ্রার ভাব এয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ প্রশ্নটা তেড়ে উঠে মনের মধ্যে এমনি গুঁতো মারলে—

একজন। ওর একটা কবিরেজী ওষুধ আছে খুব ভাল—আয়াপানের শেকড় না বেটে—

হরেকা। দেখ্ বড় যে বেশী ওপরচালাকি কচ্ছিস্, এক কথায় সব কটার মুখ বন্ধ করে দিতে পারি—জানিস্? পরশু রাত্তিরে গুরুজি নিজে আমায় ডেকে নিয়ে যে সব ভেতরকার কথা বলেছেন, জানিস্?

বেহারী। হ্যাঁ রে পটলা, সত্যি নাকি?

একজন। কিসের? সব মিছে কথা।

বেহারী। এমন মিথ্যে কথা বল্‌তে পারে, ঐ হরেটা—ছিঃ ছিঃ—রাম, রাম।

গান

রাম কহ—ইয়ে রাম কহ
বল্‌বেন না আর মশাই গো, মানুষ নয় সব কষাই গো
তলে তলে যত সয়তানি—(রাম কহ)
এই কি'দের ভদ্রতা ঘ্যান্ ঘ্যান্ ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ সর্ব্বদা
ডুবে ডুবে জল খাও সব জানি—(রাম কহ)

হরেকা। প্রশ্ন যখন এয়েছে, জবাব তার আসবেই আসবে। তা, তোমাদের ধমকানি আর চোখ রাঙানি, হাসি ঠাট্টা আর এয়ার্কি, এসব বেশী দিন টিক্‌ছে না।

বিশ্বম্ভর। হ্যাঁ হে, তর্কটা কিসের একবার শুন্‌তে পাই কি? কিইবা প্রশ্ন হ'ল আর তা নিয়ে মামলাটাই বা কিসের? আচ্ছা হরিচরণ কি বল?

হরেকা। হরিচরণ?! দেখ্‌লি, আমায় হরিচরণ বল্‌ছে! 'হরিচরণ' কি মশাই?

বিশ্ব। তবে, ওরা যে 'হ'রে' 'হ'রে' বল্‌ছিল!—

হরেকা। হ'রে বল্লেই হরিচরণ? 'ক' বল্লেই কার্ত্তিকচন্দ্র?

জগাই। ওঁর নাম শ্রীহরেকোনন্দ—

বিশ্ব। হ'রে কানন গু—

হরেকা। আরে খেলে যা! তুমি কোথাকার মুখ্যু হে?

বিশ্ব। আজ্ঞে, ফরেশডাঙ্গার। আপনি?

হরেকা। দেখ, এই যে ছ্যাবলামি আর 'Don't Care' এসব ভাল নয়। কাউকে যদি নাই মানবে, তবে বাপু ইদিকে এসো টেসো না।

(হরেকানন্দের মৌনাবলম্বন—সাড়ম্বর)

বেহারী। (জনান্তিকে) দেখ্ পটলা—সিদিন রাত্তিরে একটা স্বপ্ন দেখেছিলুম—কদিন থেকে গুরুজিকে বলব বলব ভাবছি—কিন্তু ঐ হরেটার জন্য বলা হচ্ছে না, দেখলি না, সেদিন ঐ ফকীরের গল্পটা বলতেই কি রকম হেসে উঠল—গল্পটা জমতেই দিলে না।

বিশ্ব। হ্যাঁ, হ্যাঁ। ফকীরের স্বপ্নটা কি হয়েছিল?

একজন। আ মোলো যা! মশাই, আমরা আমরা কথা কইছি—আপনি মধ্যে থেকে অমনধারা করছেন কেন?

বিশ্ব। ও বাবা! এও দেখি ফোঁস করে! মশাই, আমার ঘাট হয়েছে—আপনাদের কথা আপনারা বলুন—আমার ওসব শুনে টুনে দরকার নেই—

গান

শুন্‌তে পারি নে রে শোনা হবে না—
এসব কথা শুনলে তোদের লাগবে মনে ধাঁধা।
কেউ বা বুঝে পুরাপুরি কেউ বা বুঝে আধা।
(কেউ বা বুঝে না)
কারে বা কই কিসের কথা, কই যে দফে দফে,
গাছের 'পরে কাঁঠাল দেখে তেল মেখে না গোঁফে—
(কাঁঠাল পাবে না)
একটি একটি কথায় যেন সদ্য দাগে কামান
মন-বসনের ময়লা ধুতে তত্ত্ব কথাই সাবান!
(সাবান পাবে না)
বেশ বলেছ ঢের বলেছ ওইখেনে দাও দাঁড়ি
হাটের মাঝে ভাঙবে কেন বিদ্যে-বোঝাই হাঁড়ি
(হাঁড়ি ভাঙবে না)

—আহা রাগ করেন কেন মশাই? আমি স্বপ্ন দেখিছি বইত নয়—আর সে স্বপ্নও এমন কিছু নয়! আমি দেখলুম, একটা অন্ধকার গর্তের মধ্যে এক সন্নিসি বসে বসে ঘড় ঘড় করে নাক ডাকাচ্ছে!

বিশ্ব। বলেন কি মশাই ? তারপর ?

একজন। বাস্! তারপর আর কি ? সে নাক ডাকছে তো ডাকছেই।

বিশ্ব। কি আশ্চর্য্য! আপনার গুরুজিকে জিজ্ঞাসা করবেন ত—

পটলা। হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা চেপে গেলে চলবে না দাদা—ওটা বলতে হবে—দেখিস, তখন হরেটার মুখ একেবারে this kind of small হ'য়ে যাবে।

বিশ্ব। হ্যাঁ বুঝলেন, বেশ একটু রংচং দিয়ে বলবেন।

বেহারী। আ মোলো যা! আমার স্বপ্ন আমার যেমন ইচ্ছা তেমন ক'রে বলব।

(গুরুজির শুভাগমন)

(হরেকানন্দ ও বেহারীলালের যুগপৎ কথা বলিবার চেষ্টা)

হরেকা। একটা প্রশ্ন এই কদিন থেকে—

বেহারী। সিদিন একটা স্বপ্ন দেখলুম—

হরেকা। একটু নিরিবিলি যে জিজ্ঞেস করব তার ত জো নেই—

বেহারী। তার জন্য দু'দিন থেকে আর সোয়াস্তি নেই—

হরেকা। তাই জগাইকে আমি বলছিলুম—

বেহারী। পটলা জানে আর এই ভদ্রলোকটি সাক্ষী আছেন—

হরেকা। আঃ, কথা বলতে দাও না—

বেহারী। কেন ওরকম করছ বল দেখি ?

গুরুজি। এত গোলমাল কিসের ?

বেহারী। আজ্ঞে, হরে বড় গোলমাল কচ্ছে—

হরে। বিলক্ষণ! দেখলেন মশাই—

বেহারী। হয়েছে কি, আমি একটা স্বপ্ন দেখেছিলুম—

বিশ্ব। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা সাক্ষী আছি।

বেহারী। আমি স্বপ্ন দেখলুম, অমাবস্যার রাত্তিরে একটা অন্ধকার গর্ত্তের মধ্যে ঢুকে আর বেরুবার পথ পাচ্ছিনে। ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় দেখি এক সন্নিসি—

পটলা। তার মাথায় এয়া বড় জটা—

বিশ্ব। তার গায়ে মাথায় ভস্মমাখা—তার উপর রক্ত চন্দনের ছিটে,—

বেহারী। (স্বগত) কি আপদ! স্বপ্ন দেখলুম আমি আর রং ফলাচ্ছেন ওঁরা! সন্নিসিকে খাতির টাতির ক'রে পথ জিজ্ঞেস করলুম—বললে বিশ্বেস করবেন না মশাই, সে কথার জবাবই দিলে না। ব'সে ঘড় ঘড়, ঘড় ঘড়, ক'রে নাকই ডাকছে, নাকই ডাকছে।

পটলা। সে নাকডাকানি এত অদ্ভুত ব্যাপার—নাক ডাকতে ডাকুতে সারে গামা পাধা নিসা—করে সুর খেলাচ্ছে।

বিশ্ব। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছ! আর সাতটে সুরের সঙ্গে সঙ্গে রামধনুর সাতটে রং একবার ইদিকে আসছে, একবার উদিকে যাচ্ছে।

বেহারী। সুরের সঙ্গে রঙের সঙ্গে না মিশে দেখতে দেখতে চারদিক সব ফরসা হয়ে উঠল—আমি ত' অবাক হ'য়ে হাঁ করে রইলুম।

বিশ্ব। যে বলে এটা বাজে স্বপ্ন, সে নাস্তিক।

গুরুজি। অতি সুন্দর, অতি সুন্দর! এ একেবারে ভেতরকার প্রশ্নে এসে ঠেকেছে—এতদিন বলব বলব করেও যে কথা বলা হয়নি, সেই কথার মূলে এসে ঘা দিয়েছে। বৎস হরেকানন্দ, তুমি স্বপ্নে যা দেখেছ, তা যথার্থই বটে।

বেহারী। ও ত স্বপ্ন দেখেনি—আমি দেখেছিলুম।

পটলা। হ্যাঁ, ওরা ত দেখেনি—আমরা দেখেছিলুম।

হরেকা। আমি ত এই বিষয়েই প্রশ্ন করব ভেবেছিলাম কিনা। ঐ যে ভেতরকার প্রশ্ন, যেটা ব'লে ব'লেও বলা হচ্ছে না, আমার প্রশ্নই হচ্ছে তাই।

গুরুজি। হ্যাঁ। তোমরা স্বপ্নে যা দেখেছ, তা যথার্থই বটে। শব্দই আলোক! শব্দই বিশ্ব, শব্দই সৃষ্টি, শব্দই সব। আর দেখ, সৃষ্টির আদিতে এক অনাহত শব্দ ছিল, আর কিছুই ছিল না। দেখ—প্রলয়ের শেষে যখন আর কিছু থাকবে না, তখনও শব্দ থাকবে। এই যে শব্দ, এ সেই শব্দ। যাবচ্চন্দ্রদিবাকর, যে শব্দের আর অন্ত নাই, মানুষ ঘাটে ঘাটে ধাপে ধাপে যুগের পর যুগ প্রশ্ন করতে করতে যার কিনারা পায়নি, সেই শব্দের তুমি নাগাল পেয়েছ। একে বলে অন্তর্দৃষ্টি। দেখ, শব্দকে তোমরা তাচ্ছিল্য করো না, এই শব্দকে চিন্‌তে পারেনি বলেই, এই আমি আসবার আগে, যে যা কিছু করতে চেয়েছে সব ব্যর্থ হ'য়ে গেছে। এই কথাটুকু বলবার জন্যই আমি এতদিন দেহ ধারণ ক'রে রয়েছি।

বিশ্ব। হ্যাঁ হাঁ, ঠিক বলেছেন! আমার মনের কথাটা টেনে বলেছেন। এ সংসার মায়াময়, সবই অনিত্য, দারাপুত্র পরিবার তুমি কার কে তোমার—সব দুদিন আছে দুদিন নেই। বুঝলেন কিনা? আমি ছেলেবেলায় একটা পদ্য লিখেছিলুম শুনবেন? কি না?

ভব পান্থবাসে এসে, কেঁদে কেঁদে হেসে হেসে,
ভুগে ভুগে কেশে কেশে, দেশে দেশে ভেসে ভেসে
কাছে কাছে ঘেঁষে ঘেঁষে, এত ভালবেসে বেসে
টাকা মেরে পালালি শেষে?

গুরু। বেদ বল, পুরাণ বল, স্মৃতি বল, শাস্ত্র বল, এসব কি? কতগুলো বাক্য, অর্থাৎ কতগুলো শব্দ—এই তো? এই যে সব শঙ্খ ঘণ্টা, মন্ত্র তন্ত্র, হ্রীং ক্লীং, ঝাড় ফুঁক, নাম জপ এসব কি? একি শব্দ নয়? সৃষ্টির গোড়াতে প্রাণ, কারণ, আকাশ সব মিলে যখন হব-হব কচ্ছিল, তখন যদি 'ওম্' শব্দ ক'রে প্রণব ধ্বনি না হ'ত, তবে সৃষ্টি হ'তে পারত? শব্দে সৃষ্টি, শব্দে স্থিতি, শব্দে প্রলয়। বেশী কথায় কাজ কি? বিষ্ণুর হাতে শঙ্খ কেন? শিবের মুখে বিষাণ কেন? হাতে তার ডমরু কেন? নারদ যখন স্বর্গে যায়, চলতে চলতে বীণা বাজায় কেন? এসব কি শব্দ নয়? আর অনাদিকাল হতে যে অনাহত শব্দ যোগীদের ধ্যান-কর্ণে ধ্বনিত হয়ে আসছে, সে কি শব্দ নয়? আর সেই কালিন্দির কূলে যমুনার তীরে শ্যামের যে বাঁশরী বেজেছিল,

সেও কি শব্দ নয়? এমনি ক'রে ভেবে দেখ, যা ভাববে তা-ই শব্দ—শাস্ত্রে বলেছে 'শব্দ ব্রহ্ম'—

বিশ্ব। আমাদের মতিলাল, সেবার যে ভুঁইপটকা বানিয়েছিল, উঃ—তার যে শব্দ: আমি ও বিষয়ে একটা কবিতা লিখেছি শুনবেন?

হরেকা। দেখ, গুরুজির সামনে এ রকম বেয়াদবি, এটা কি ভাল হচ্ছে?

বিশ্ব। ভালরে ভাল! ইনি বলছেন স্বপ্নের কথা—উনি তাঁর প্রশ্ন হাঁকছেন, এ-ও ফোঁড়ন দিচ্ছে—ও-ত ফোড়ন দিচ্ছে—আর আমি কথা কইলেই যত দোষ?

বেহারী। আহা, গুরুজি আছেন যে, তাঁকে ডিঙিয়ে কথা বলবে?

বিশ্ব। গুরুজির ন্যাজ ধরে ধরেই যে ঘুরতে হবে তার মানে কি?

জগাই। ন্যাজ বলেছে! গুরুজির ন্যাজ বলেছে!

পটলা। তুই থাম না, তোর ন্যাজ তো বলে নি—

গুরু। ওরে হতভাগা, শব্দ নিয়ে তোরা ছেলে খেলা করিস্—শব্দ যে কি জিনিস আজও তোরা বুঝলি নে। কিন্তু এখন বুঝবার সময় হয়েছে। এই নাও আমার শব্দসংহিতা—এইটে এখন পড়ে নিও। ওর মধ্যে আমি দেখিয়েছি এই যে—এক একটি শব্দ এক একটি চক্র, কেন না, শব্দ তার নিজের অর্থের মধ্যে আবদ্ধ থেকে ঘুরে বেড়ায়। তাই বলা হয়েছে অর্থ ই শব্দের বন্ধন। এই অর্থের বন্ধনটিকে ভেঙে চক্রের মুখ যদি খুলে দাও, তবেই সে মুক্ত গতি—spiral motion হ'য়ে কুণ্ডলীক্রমে উর্দ্ধমুখে উঠতে থাকে। অর্থের চাপ তখন থাকে না কি না! যে সঙ্কেত জানে সে ওই কুণ্ডলীর সাহায্যে করতে না পারে এমন কাজই নেই। তাই বলছি তোমরা প্রস্তুত হও—অমাবস্যার অন্ধকার রাত্তিরে সেই সঙ্কেতমন্ত্র দিয়ে তোমাদের দেখাব শব্দের কি শক্তি! রাতারাতি স্বর্গবরাবর পৌঁছে দেবে। পথ পথ করে সব ঘুরে বেড়ায়—কিন্তু শব্দ ছাড়া আর দ্বিতীয় উপায় নেই।

(শিষ্যগণের উচ্ছ্বাস ও গদগদ ভাব)

গান

তাই ফিরি তুমি আমি ধাঁধায় দিবস যামী
তাই ফিরে মহাজন পথে পথে অনুখন
অন্ধ আঁধারে মরে নামি'।
নিজ বেগে নিজ তালে শব্দ ফিরে দেশ কালে
আপনি পথিক পথ চালায় আপন রথ
ভুবন ঘেরিল পথ জালে।
প্রাণে প্রাণে এঁকে বেঁকে পথ যায় হেঁকে হেঁকে
আপনি পথিক পথ চালায় আপন রথ
সেই পথে চল আগে থেকে॥

[ধুম কীর্ত্তন]

গুরুজি। পূর্ব্বে ঋষিরা এই শব্দ-মার্গকে ধ'রে ধ'রেও ধরতে পারে নি। কেন? ঐ যে সন্নিসি অমাবস্যার অন্ধকার রাত্তিরে ঘড় ঘড় করে নাক ডাকাচ্ছিল। কেন ডাকাচ্ছিল? শব্দ-মার্গের সন্ধান পেয়েছে কিন্তু তার সঙ্কেতটুকু ধরতে পারে নি। ওরা যে ধরেছে সে সব শব্দের অর্থ নেই এবং ছিল না—ঢোঁড়া শব্দ। তা করলে তো চলবে না। জ্যান্ত জ্যান্ত শব্দ, যাদের চলৎশক্তি চাপা রয়েছে, ধরে ধরে মট্ মট্ ক'রে তাদের বিষদাঁত ভাঙ্‌তে হবে। অর্থের বিষ জমে জমে উঠতে থাকবে—আর ঘ্যাঁচ্ ঘ্যাঁচ্ করে তাকে কেটে ফেলব। এই জন্য তোমাদের ওই শব্দসংহিতা খানা পড়ে রাখতে বলছি।

(প্রস্থান)

(শিষ্যগণের "শব্দ সংহিতা" পাঠ)

শ্রীশ্রীগুরুপ্রসাদগুণে তত্ত্বদৃষ্টি লভি'
জগৎখানা ঠেকছে যেন শব্দে আঁকা ছবি,
শব্দ পিছে শব্দ জুড়ি চক্রে গাঁথি মায়া
বাক্য ফিরে ছদ্ম দেহে বিশ্ব তারি ছায়া।
চক্র মুখে মন্ত্র ঠুকে বাঁধন কর ঢিলা
শব্দ দিয়ে শব্দ কাট, এইত শব্দলীলা,
যাঁহা স্বর্গ তাঁহা মর্ত্ত্য তাঁহা পাতালপুরী
সত্য মিথ্যা একই মূর্ত্তি খেলছে লুকোচুরি।
ভাল মন্দ বিষম দ্বন্দ্ব কিছু না যায় বোঝা—
সহজ কথায় মোচড় দিয়ে বাঁকিয়ে করে সোজা।
ভক্ত বলেন "আদ্যিকালের সাদার নামই কালো
আঁধার ঘন জমাট হ'লে তারেই বলে আলো।"
শাস্ত্র বলে "সৃষ্টি মূলে শব্দ ছিল আদি—
জগৎস্রোতে জড়ের বাঁধন শব্দে রাখে বাঁধি।
বস্তুতত্ত্ব বদ্ধমায়া সদ্য পরিহরি
শব্দচক্রে ঘোরে বিশ্ব সূক্ষ্ম দেহ ধরি'।
শব্দ ব্রহ্মা শব্দ বিষ্ণু শব্দ সরস্বতী
বিশ্বযজ্ঞ-ধ্বংস-শেষে শব্দে মাত্র গতি॥"

রায় সাহেব

শ্রীপুলকেশ দে সরকার

রায় সাহেব বীরেন ব্যানার্জি। আই-বি ইন্সপেক্টর। তীক্ষ্ণধার বুদ্ধি, অদ্ভুত মেধা। কিন্তু বুদ্ধিই হউক আর মেধাই হউক, প্রয়োগ-নৈপুণ্য না দেখাইলে তাহার মূল্য নাই। মিঃ ব্যানার্জি তাহা প্রমাণ করিয়া রায় সাহেব খেতাব পাইয়াছেন। কিন্তু এই রাজসম্মান যেন তাহাকে ব্যঙ্গ করিবার জন্যই ওয়াচারের মত সর্বদা ঘুরিয়া ফিরে। রায় সাহেব! অথচ বর্জন করিবার উপায় নাই। বর্জনটায় নেহাৎ স্বদেশী ও বিদ্রোহের গন্ধ আছে, তাই ইন্সপেক্টর বি. ব্যানার্জি ইহাকে সাগ্রহে গিলিতে না পারিলেও কণ্ঠে রাখিয়া দিয়াছেন। সহকর্মচারীরা ছাড়ে না, 'রায় সাহেব' বলিয়াই ডাকে; উর্ধ্বতন কর্মচারীরাও ঐ নামেই আপ্যায়িত করেন। স্ত্রী রায় বাদে 'সাহেব' বলিয়া ডাকেন। রায় সাহেব নিঃসন্দেহে জানেন, আর কোথাও না হউক, স্ত্রীর মুখে এই সাহেব-ধ্বনি পরিপূর্ণ বিদ্রূপ। কেন না, এই খেতাবপ্রাপ্তির দুর্ভর ও অসহ্য ইতিহাসই স্ত্রীর আহ্বান ও উপস্থিতিতে বেশী করিয়া স্মরণ করাইয়া দেয়।

উনিশ-শ ত্রিশ সালের কথা। লবণ আন্দোলনের হল্লোড়ের মধ্যে বাংলাদেশে একটা মারাত্মক ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়া যায়। রিপোর্টে জানা যায় ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রস্থল কলিকাতার আহিরিটোলা। একপাল ছেলে-মেয়েকে গ্রেপ্তার ও হাজতস্থ করাইয়া মিঃ ব্যানার্জি সূত্র ধরিয়া মফস্বল টুর্ করিতে-ছিলেন এবং এত বড় একটা ব্যাপক কাণ্ড আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন বলিয়া যখন স্বাভাবিক আত্মপ্রসাদ ভোগ করিতেছিলেন তখন হঠাৎ তাঁহার কলিকাতায় ডাক পড়িল।

মিঃ বস্ওয়েল খুন হইয়াছেন। য়ুরোপীয়ান্ য়্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ বস্ওয়েল। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য ও চমৎকার ব্যাপার এই যে, সভাপতি মহাশয় রাত্রে টেরারিষ্টদের বিরুদ্ধে জেহাদ্ ঘোষণা করিতে একটি ইস্তাহারের খসড়া করিয়া সবে শেষ করিয়াছেন, ঠিক তেমন অবস্থায় হাতের কলম ধাক্কা খাইয়াছে। মিঃ বস্ওয়েল উপসংহার টানিতেছিলেন, Undeniably it is a campaign against European Association. Life and Business insecure. Wanted action—

গুলি হাতে লাগে নাই, বুকে লাগিয়াছে; কিন্তু থামিতে হাতটাই আগে থামিয়াছে। আহিরিটোলার ডেন্ তল্লাস করিয়া যে ইস্তাহার পাওয়া গিয়াছিল, মিঃ বস্ওয়েলের টেবিলেও তেমনি এক ইস্তাহার। পরম দুঃখের কারণ এই, আততায়ীকে ধরা যায় নাই।

সেই আততায়ীর অনুসন্ধানের ভার মিঃ ব্যানার্জি গ্রহণ করেন—কর্মকর্তারা তাহাই চান।

মিঃ ব্যানার্জি আপাততঃ সেই ইস্তাহারে আঙুলের ছাপ ও আর দুই একটি প্রয়োজনীয় জিনিস তুলিয়া লইলেন।

মিঃ ব্যানার্জি বাড়ী আসিলেন।

তাঁহার টেবিলের উপরে অনুরূপ একখানা ইস্তাহার। মিঃ ব্যানার্জি সেইখানাও ফাইল

করিলেন। বিচলিত হইলে চলিবে না। আফিসে ও নির্দ্দিষ্ট-স্থানে তল্লাসী করিতে অনেকটা সময় কাটিয়াছে। বেলা ১টা। অপ্রত্যাশিত আগমন—কিন্তু মিসেস্ ব্যানার্জি তাহাতে অভ্যস্ত।

একমাত্র ছেলে—কোমল বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই স্বামী-স্ত্রীর প্রথম সাক্ষাতে এই-ই একমাত্র প্রসঙ্গ।

মিঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, খোকা কলেজে বুঝি ?

মিসেস্ বলিলেন, না ঘুমোচ্ছে।

মিঃ জানিতে চাহিলেন, ঘুমোচ্ছে ? কেন ?

মিসেস বলিলেন, কাল গেছলো ন'টার শো'তে সিনেমা দেখতে, সকালে উঠতে কোরলো দেরী, দুপুরে নেয়ে খেয়ে বোললে, মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ কোরছে, আজ আর কলেজে যাব না, ম[illegible]া খেতেও পারে নি। বোললাম, না-ই বা গেলি একদিন।

মিঃ বলিলেন, বেশ কোরেছো। যে দিনকাল পড়েছে, সিনেমা-টিনেমার দিকে ঝোঁক ভালো। গাটা গরম নয় তো ?

মিসেস্ বলিলেন, না, সে আমি দেখেছি।

উভয়েই চুপ করিলেন। কিন্তু উভয়ের হৃদয়তন্ত্রীতে কিছুক্ষণ ধরিয়া একটা শব্দই ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। খোকা। খোকা। ঐ অতটুকু, তারপর এতটুকু, তারপর বড়—আরো বড়; আজ সে কলেজে পড়ে; সামান্য নয়, থার্ড ইয়ারে পড়ে। ভালো ছেলে। সবাই খুব তারিফ করেন। কিছুকালের জন্য মিঃ ব্যানার্জি ভুলিয়া গেলেন, আততায়ী ফেরার, মিঃ বস্ওয়েল হত, ফেরারীর অনুসন্ধান তাঁহাকেই করিতে হইবে। কিন্তু পুত্রের এই মসৃণ চিন্তা তাহার মস্তিষ্কের পরিশ্রান্তির উপর যেন সহজ আবেশ বুলাইয়া দিতে লাগিল; মিঃ ব্যানার্জি ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিলেন। পুতনা রাক্ষসী এলাইয়া শুইয়া আছে, তাহার বুকের উপর ছোট্ট শ্রীকৃষ্ণ খেলা করিতেছে; হঠাৎ পুতনা আর্তনাদ করিয়া উঠিল, কৃষ্ণ পুতনার মাই কামড়াইয়া ধরিয়াছে। পুতনা যখন একেবারে পড়িয়া গিয়াছে তখন দেখা গেল পতিত দেহটা পুতনার নহে, তাঁহার নিজের এবং ছোট্ট কৃষ্ণটা তাঁহাদেরই চোখের মণি—কোমল। মিঃ ব্যানার্জি হাসিয়া উঠিলেন। হাসির চোটে ঘুম ভাঙিয়া গেল।

মিসেস্ বলিলেন, তুমি জেগেছিলে না কি ? একটা পিঁপড়ে এমন কামড়েছে যে 'উঃ' করে উঠেছি, ভাবলাম তোমার ঘুম ভেঙে দিলাম। এখন দেখছি, তুমি জেগেই ছিলে—হাসছ।

মিঃ বলিলেন, না, এই মাত্র জাগছি। সত্যিই ঘুমিয়েছিলাম। একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম।

মিসেস্ উৎসুক হইয়া বলিলেন, স্বপ্ন ?

মিঃ বলিলেন, হ্যাঁ, ভারি মজার। আমি পুতনা আর কোমল কৃষ্ণ। কৃষ্ণ আমায় কামড়ে দিয়েছে।

মিসেস্ খুশী হইয়া বলিলেন, নাকি ?

মিঃ সায় দিয়া বলিলেন, পুতনাই বটে।

মিসেস্ বলিলেন, দিবাস্বপ্ন।

ষড়যন্ত্রে বহু ছেলে ধরা পড়িল। মেয়েরা ছাড়া পাইল না। ইহাদের সাহচর্যেই ব্যাপারটি এত ঘোরালো হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভালো একটি রাজসাক্ষী পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু আততায়ীর সন্ধান মিলিতেছে না। মিঃ বস্‌ওয়েলের হত্যার সহিত এই ষড়যন্ত্রকারীরা যে লিপ্ত আছে সে বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই; আর ইহাও স্থির যে, আততায়ীই ইস্তাহার-বিলিকারী। সকল আসামীর হাতের ছাপই মিলাইয়া দেখা গেল, কাহারও সহিত মিল নাই। যে যত বেশী নবাগত হইতেছে তাহার উপর জেরাও তত বেশী হইতেছে। কিন্তু ফল ফলিতেছে না। আসামীদের নোটবুক মারফত আর চারিটি ছেলের নাম পাওয়া যায়; তাহাদের নামে হুলিয়া হইয়াছে। দুইটি ছেলের পিতৃ-পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। কয়েকজনের কাছে পরীক্ষিৎ রায় নামটা পাওয়া যায়, কয়েকজনের কাছে দিলীপ বসু, অতুল ও ত্রিনেত্র এই তিনটি নাম পাওয়া যায়। রাজসাক্ষীও জানে না, ত্রিনেত্রের পদবী কি? মোট কথা, নামের সূত্র ধরিয়াও আততায়ীকে পাওয়া গেল না।

ইতিমধ্যে ইস্তাহার বিলি হইতেছে। স্কুলে, কলেজে, সভায়, সমিতিতে। পুলিশের লোক এই লইয়া নিজেদের ও জনসাধারণকে এমনই নাকাল করিতে লাগিল যে, কেহ আর সাহস করিয়া কোন প্রকার বিজ্ঞাপন পর্যন্ত নেয় না। সর্বত্র আতঙ্ক।

অবশেষে এক ইস্তাহার-বিলিকারী ধরা পড়িল। একটি কিশোর। কিশোর বলিয়াই সুন্দর, কিন্তু গরীব বলিয়াই কদাকার। রাজসাক্ষীর সম্মুখে দাঁড় করাইয়া মিঃ ব্যানার্জি বলিলেন, একে চেন?

রাজসাক্ষী বলিল, না।

মিঃ ব্যানার্জি বালকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম?

বালকটি জবাব দিল না।

মিঃ ব্যানার্জি হাসিলেন, বলিলেন, জেদ্‌ ছাড়—নাম বল।

বালক বলিতে চাহে না।

মিঃ ব্যানার্জি রোষমিশ্রিত হাসি হাসিলেন, রাজসাক্ষীকে দেখাইয়া বলিলেন, একে দেখছো? জেদ্‌ এরও ছিলো—কিহে, রাখতে পেরেছিলে?

রাজসাক্ষী বলিল, না, কৃতকর্মের জন্য আমি অনুতপ্ত। আমরা যে ভুলপথ—

—সোজাপথ দেখিয়ে দেবার জন্য বাইরে ত্রিনেত্র আছে—

মূক বালকটির এই কথায় মিঃ ব্যানার্জি স্তম্ভিত হইলেন ও রাজসাক্ষী ভীত হইল। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই মিঃ ব্যানার্জি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ত্রিনেত্র! ত্রিনেত্রকে তুমি জান?

বালক আর কথা কয় না। আর সে মুখ খুলিল না। মনে হইল, ইতিপূর্ব্বে আর কেহ কথা কহিয়াছে, এই বালকটি নিশ্চয়ই নহে।

কিন্তু মিঃ ব্যানার্জিকে ধন্যবাদ, অমুনয়কে কথা কহিতে হইয়াছে এবং সে বলিয়াছে, ত্রিনেত্রকে সে জানে, ত্রিনেত্র বাহিরে আছে—ত্রিনেত্র কলিকাতা শহরের সর্বত্র; অভিজাত শ্রেণীর মহলে সে যাতায়াত করে, সাহেবদের হোটেলে সে খায়। কিন্তু ত্রিনেত্রের আর কিছু সে জানে না।

ইহার পর মিঃ ব্যানার্জির আহার-নিদ্রা এক প্রকার বন্ধ হইয়া গেল। রুগ্ন, মলিন, অসম্ভব

দুর্বল অনুনয়কে সঙ্গে করিয়া প্রতিদিন মোটরে বেড়াইতে বাহির হন, অনুনয়-নির্দিষ্ট বাড়ী বহিয়া বিলি করা ইস্তাহার খুঁজিয়া ফেরেন ; হোটেলে হোটেলে খানা খান। অনুনয় তন্দ্রাহত আচ্ছন্নের মত অনুসরণ করে।

সন্ধ্যার চৌরঙ্গী। আলোর মেলা, তাহারই ফাঁকে ফাঁকে লজ্জিত অন্ধকার ;—সর্বোপরি, জনতার স্রোত—বিচিত্র পোষাক ও রূপ। মিঃ ব্যানার্জির গাড়ী কখনো দ্রুত যায় না। মৃতপ্রায় অনুনয় কি দেখিয়া হঠাৎ চকিত হইয়া উঠে ; অকস্মাৎ এই কম্পন লাগে মিঃ ব্যানার্জির গায় ; তিনি বলিয়া উঠেন, কি—বল ?

প্রত্যুত্তরে ক্লান্ত অনুনয়ের চোখ দিয়া জল পড়ে।

বহুপ্রকার কৌশলের পর অনুনয়ের নিস্তেজ দেহ হইতে শব্দিত হইল,—ত্রিনেত্র।

দেখ্‌লে ?

হ্যাঁ।

কোন্‌দিকে গেল ?—মিঃ ব্যানার্জি উৎসাহিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

অনুনয় বলিল, এই দিকে কোথায় মিলিয়ে গেল। অনুনয় ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

গাড়ী ড্যালহৌসি স্কোয়ারের দিকে ঘুরিল। সেই ধীর-মন্থর গতি। মিঃ ব্যানার্জি তীক্ষ্ণদৃষ্টির সার্চলাইট্‌ ফেলিয়া চলিয়াছেন। অনুনয়কে বলিলেন, খেয়াল রেখো। ত্রিনেত্রকে চাই। পেলেই পরের জাহাজে তোমার নির্ঘাত বিলাত যাত্রা—মস্ত পি, এইচ্‌, ডি, হোয়ে ফিরো। কেউ জানতে পারবে না।

একটা বড় হোটেলের পোর্টিকো—আলোকমালা আর রকমারি মদের বিজ্ঞাপন—ক্যাবারেট-ড্যান্সিং—প্রবেশপথ পার হইয়া সাহেবী-পোষাকে—

অনুনয় নড়িয়া উঠিল।

অতি-সজাগ মিঃ ব্যানার্জি বলিলেন, ত্রিনেত্র নয় তো ?

অনুনয় একটা অদ্ভুত তীব্র চীৎকার করিয়া উঠিয়া সংজ্ঞাহীন অবস্থায় লুটাইয়া পড়িল। মিঃ ব্যানার্জি সচকিত ড্রাইভারকে বলিলেন, রোকো।

* * *

ত্রিনেত্র ধরা পড়িল। একেবারে বমাল। বস্‌ওয়েলের বুকের আর আসামীর রিভলভারের কার্তুজে কি সহজ মিল। ইস্তাহারের ছাপ আর ইহার আঙুলের ছাপে অদ্ভুত সাদৃশ্য—পকেটে সেই ইস্তাহার—সুন্দর আর্ট-পেপারে ছাপা।

আসামী ত্রিনেত্র। ত্রিনেত্র নহে—কোমল বন্দ্যোপাধ্যায়।

মিঃ ব্যানার্জিকে ধন্যবাদ, এমন প্রশংসনীয় তদন্ত আর কেহ করে নাই, অকাট্য, নির্ভুল, নিখুঁত। বহু সাহেব অযাচিত ভাবে হাত ঝাঁকিয়া গেল। জজেরা পর্য্যন্ত খুসী হইলেন।

* * *

মিঃ ব্যানার্জি পুত্র হারাইলেন বটে, কিন্তু সরকারের ভাণ্ডারে যত প্রকার আশ্বস্তিকর পুরস্কার ছিল সমস্তই একটা স্তবকের মত মিঃ ব্যানার্জির হাতে আসিল।

ওয়েল, রায় সাহেব !

হ্যালো, রায় সাহেব !!

কন্‌গ্রাচুলেশন, রায় সাহেব !!!

* * *

কিন্তু পরম আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ত্রিনেত্র ওরফে কোমলের ফাঁসী পর্য্যন্ত ইস্তাহার-বিলি একদম স্থগিত ছিল। অকস্মাৎ ফাঁসীর পরমুহূর্ত্ত হইতেই যেন ইস্তাহার বিলি সুরু হইল। ত্রিনেত্র যেন মরিয়া বাঁচিল। আঙুলের ছাপ, ফোটো, সকল কিছু ব্যর্থ করিয়া ইস্তাহার-বিলি চলিতে লাগিল। রায় সাহেবের সম্মানে-দেওয়া চা-পার্টিতে, নিমন্ত্রণে, অফিসিয়াল ফাইলে পর্যন্ত !

মিঃ ব্যানার্জির আকস্মিক ভাগ্যোদয়ে যে সহকর্ম্মীরা খুশী হইতে পারে নাই, ব্যানার্জির পুত্র-শোকে সান্ত্বনালাভ করিয়াছিলেন মাত্র, তাহাদের সন্তুষ্টির পরিসীমা রহিল না। অনেকেই রায় সাহেবের সম্মুখে আসিয়া বিষয়টির অবতারণা করিয়া একাধারে অনেকগুলি বিস্ময়বোধক চিহ্ন টানিয়া যাইতেন। এ তো বড় আশ্চর্য্য, রায় সাহেব ! অদ্ভুত ! এ রকমটা কখ্‌খনো শুনিনি তো ! তবে কি আসল কাল্‌প্রিট আন্‌ট্রেস্‌ড্‌ ! য়্যামেজিং ! আমাদের অর্গ্যানিজেসনকে যে আউটউইট্‌ করল !

এই বিস্মিত পণ্ডিতেরাই আবার যাহাতে ইহার তদন্তের ভার মিঃ ব্যানার্জির উপরে পড়ে সে-জন্য উচ্চ কর্ত্তৃপক্ষীয়কে উস্কাইতে লাগিল। শুনিয়া শুনিয়া তাহাদেরও ধারণা হইয়া গেল, রায় সাহেবই একমাত্র উপযুক্ত লোক।

বড় সাহেব পর্যন্ত রায় সাহেবকে ডাকিয়া হাত ঝাঁকিলেন, পিঠ চাপড়াইলেন, বক্তৃতা দিলেন, টেবিলে ঘুষি মারিলেন, রায় সাহেবকে উত্তেজিত করিলেন।

বাড়ীতে আসিয়া বৈঠকখানার ঘরে বসিতেই প্যাডের উপর একখানা ইস্তাহার !

রায় সাহেব—মনের দিক হইতে অর্ধমৃত রায় সাহেব—একটা উদ্ভট ও অসম্ভব পরিকল্পনায় আবার চাঙ্গা হইয়া উঠিলেন। লজ্জায় কুণ্ঠায় স্ত্রীর সহিত বড় একটা দেখা সাক্ষাৎও আর হয় না। শোকাকুলা স্ত্রী—মিসেস্ রায় সাহেব—বাড়ীতে কোমলের ঘর বড় একটা ছাড়েন না বটে, কিন্তু সামাজিকতা রক্ষা করিতে রায় সাহেবের সঙ্গে যান এবং যোগ দেন, বাহিরের লোকে পুত্র-শোকাকুলার প্রগল্‌ভ আচরণ দেখিয়া অবাক হয়। আবার খেয়াল হইলে মিসেস্ একাও বাহির হইয়া যান; রায় সাহেব জানিতে পারিলেও বড় একটা বাধা দেন না, স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিবার তাঁহার কীই বা ছিল ?

কিন্তু এই ইস্তাহার-বিলি !

অত্যন্ত সুচতুর রায় সাহেবেরও বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া যায় বুঝি ! একটা স্থায়ী দুর্বলতায় ভর করিয়া রায় সাহেবের মনে হইল, হয়তো বা—হয়তো বা ফিঙ্গার-প্রিণ্টিং, দলিলপত্রাদি সমস্তই একটা প্রকাণ্ড ভুলের জাল মাত্র। আর হয়তো—

মনে একটা আশাও জাগিতে চাহিল; তেমনি হিংস্রতা। সেই নিষ্ঠুর গুপ্ত দুষ্কৃতকারীর টুঁটি ধরিয়া স্ত্রীর সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিলে বুঝি সকল কিছুর মীমাংসা হইয়া যায়। রায় সাহেব বর্তমান তদন্তে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। কর্মকর্তারা খুশী হইলেন।

ইস্তাহার-বিলি বন্ধ হয় না। ইহার সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র ক্রমশঃ পরিসর হইতে থাকে। সাধারণ

মিটিংয়ে পর্যন্ত বিলি হয়। হয়তো কোথাও এক গোছা পড়িয়া আছে, হয়তো কোথা হইতে অকস্মাৎ ঝরিয়া পড়ে। কিন্তু সকল ক্ষেত্র হইতেই এক রিপোর্ট আসে—মেয়ে-মহল হইতেই ইহার বিলি বেশী। প্রায় কেন, বোধ হয় সব।

রায় সাহেব চিন্তিত হইলেন, কিন্তু হঠাৎ মনে হইল ইহার চমৎকার একটি সমাধান আছে। বসিবার ঘরে তাহাই ভাবিতেছিলেন। মিসেস্ বাহির হইতে আসিতেছিলেন। অন্দরের দিকে সোজা তাঁহাকে যাইতে দেখিয়া রায় সাহেব বলিলেন, শোনো।

মিসেস্ ধীরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

রায় সাহেব বলিলেন, বোসো।

মিসেস্ বসিলেন। রায় সাহেব বলিলেন, তোমায় একটা কথা বোল্‌বো, মনে হোচ্ছে, কোথায় একটা প্রকাণ্ড ভুল হোয়েছে।

মিসেস্ জবাব দিলেন না। জানিতে চাহিলেন না কিসের ভুল।

রায় সাহেব বলিতে লাগিলেন, ইয়ে…এই ইস্তাহার-বিলি…

মিসেস্ উঠিলেন, বলিলেন, ও তোমার অফিসের কাজ…তোমার কাজ…

রায় সাহেব বলিলেন, না—না, এই বিলিটা, এই বিলিটার কথা বোল্‌ছিলাম…শুনছি…

টেলিফোনটা বাজিয়া উঠিল। মিসেস্ তুলিয়া লইলেন: হ্যালো…আমি মিসেস্…রায় সাহেবকে?…নাও কে ডাক্‌ছে দেখ, তা আমি চলি—

রায় সাহেব ইঙ্গিতে যাইতে মানা করিলেন। ফোনে কথা হইলে মিসেস্‌কে বলিলেন, এই মাত্র আবার রিপোর্ট পাচ্ছি, এলবার্ট হলের মিটিংয়ে মেয়েদের মধ্য থেকে…

মিসেস্ উষ্ণকণ্ঠে বলিলেন, এ সব অফিসিয়েল সিক্রেসি আমায় কেন? ছেলেটাকে…

রায় সাহেব মিনতি করিয়া বলিলেন, তোমার সাহায্য, তোমার সাহায্য…

আমার কি সাহায্য…

রায় সাহেব বলেলেন, সেই মেয়েটিকে ধরে' দিতে হবে। মনে হয়…

না—তীব্রকণ্ঠে বলিয়া মিসেস্ ভিতরে চলিয়া গেলেন। কিন্তু পাঁচ মিনিট কাটিয়া না যাইতেই আবার আসিয়া বলিলেন, আচ্ছা, নেক্সট-মিটিং, তোমায় রিং করবো।

* * *

লোক গিজ্ গিজ্ করিতেছে। 'নারীরক্ষা সমিতি'র মিটিং। টাউন হল উপ্‌চাইয়া পড়িতেছে। চারিদিকে ভীষণ নারীহরণ ও নারীধর্ষণ চলিতেছে—প্রকাশ্যে দিবালোকে। আবেদন-নিবেদন ব্যর্থ হইয়াছে। অত্যন্ত উদার ও মধ্যপন্থীদের উদ্যোগেই এই সভা। নালিশ, অভিমান, ক্ষুণ্ণ নারীত্বের উচ্ছ্বাস চাপা ব্যথার সুরে নন্দিত হইতে লাগিল; একটা প্রতিবাদের সুরও যেন সহসা বাজিয়া উঠিল। কে একজন বলিতেছেন: আসল কারণ তা নয়, এদেশে বিদেশী শাসন এদেশীয় নারীর ওপর অত্যাচার বা নির্যাতন বা শ্লীলতাহানির জন্য মোটেই ব্যস্ত নয়, এরা চায়—

সভাপতি বাধা দিলেন, কিন্তু শত বাধা বিঘ্ন দুই হাতে ঠেলিয়া আর একটি অদ্ভুত নারী ঝরণার মত, বৃষ্টির মত, শিলার মত কিং কাগজ বিলি করিতে লাগিল। শত কোলাহল ও উৎকণ্ঠার মধ্যে এই পাগলিনীকে যখন ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া রায় সাহেবের সম্মুখে হাজির করা হইল, তখন চারিদিক স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। কেবল উৎকণ্ঠিত বিস্মিত জনতা অস্ফুট উচ্চারণ করিতেছিল,—মিসেস্ ব্যানার্জি! মিসেস্ ব্যানার্জি!!

শিল্প ও তাহার সমস্যা

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

ভারতীয় শিল্পী এবং শিল্পামোদীদের ভিতর একটা প্রশ্ন জাগিয়াছে, শিল্প কোন্ পথে যাইবে? অনেক বৎসর যাবৎ এই প্রশ্নটি অনেকের চিন্তাকে আলোড়িত করিতেছে; মাসিকের দৈনিকের লেখায়, সভাসমিতির আলোচনায় অনেক তর্ক-বিতর্ক চলিয়াছে, কিন্তু তার সমাধান বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। বস্তুত এই প্রশ্নের উত্তর কোনো শিল্প-সমালোচক দিতে পারেন না। তাঁহারা তো জহুরী, তাঁহারা কেবল শিল্পসৃষ্টিকে জনসাধারণের কাছে পরিচিত করেন মাত্র; কিন্তু শিল্পীরাই কি অধুনা তাঁহাদের পথ স্থিরনির্দ্দিষ্ট করিতে পারিয়াছেন? তাঁহাদের দৃষ্টিই বোধ হয় সন্দিগ্ধ ভাবাপন্ন; গত ত্রিশ কি চল্লিশ বৎসর যে ধারায় ভারতীয় শিল্প চলিয়াছিল, পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, তাহাতে যেন একটা বিরতি বা ছেদ পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, অথবা সেই চল্লিশ বৎসরের ধারা যেন নূতন রূপ পরিগ্রহ করিতে চলিয়াছে।

সৃষ্টি চলমান। যাহা চলিতেছিল, তাহাই যদি চিরকাল চলিতে থাকে, অনুপ্রেরণার অভাবে তাহা উঠে পচিয়া। শিল্প জগতে "নো-চেঞ্জারের" স্থান নাই; শিল্প-ইতিহাস অনুধাবন করিলেই ইহার সত্যতা প্রতীয়মান হইবে। শিল্প-নীতি পরিবর্ত্তনশীল, এই যুক্তি যদি মানিয়া লই, তবে ইহা অবশ্য বলা চলে না যে, যে কোনো পরিবর্ত্তনই ভাল।

শিল্পসৃষ্টিতে একটা বিদ্রোহের ভাব আছে; প্রতিভাশালী শিল্পীর পর উন্মেষশালিনী সৃজনী শক্তি সততই ভাবপ্রকাশের নূতন পন্থা খুঁজিতে থাকে।

বাংলার নয়া শিল্প বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিদ্রোহের আকারেই দেখা দিয়াছিল; শিল্প-গুরু অবনীন্দ্রনাথ তদানীন্তন প্রচলিত অনুকরণশীল ভারতীয় শিল্পের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

তদানীন্তন প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে অবনীন্দ্রনাথকে তাঁহার গুটি কয়েক শিষ্য লইয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছিল; তিনি ভারতীয় নয়া শিল্পে আনিয়াছিলেন এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গি। এ সকল অনেক পুরাতন কথা। এই নূতন শিল্পীগোষ্ঠী ক্রমে ক্রমে সারা ভারতে যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহা সকলেরই জানা আছে। নানা সাময়িক-পত্রিকায়, গ্রন্থে এই নয়াগোষ্ঠীর পরিচয় এবং মতবাদ আলোচিত হইয়াছে।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে এই নূতন শিল্প আন্দোলনের সংস্রব আছে। কোনো একটা আন্দোলন শুধু একাকী আসিয়া উপস্থিত হয় না, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গতিতেই তাহার পরিণতি হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মনীষিগণ বাংলা ভাষায় নূতন আন্দোলন আনিয়াছিলেন, এবং তার এক নয়ারূপ দিয়াছিলেন। বাংলার চিত্রকলায় অনুরূপ আন্দোলন আসিয়াছে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে।

শুধু মতবাদের উপর নির্ভর করিয়া কোনো শিল্পসৃষ্টি টিকিয়া থাকিতে পারে না, নূতন সৃষ্টির

প্রেরণায় নূতন শিল্পীসঙ্ঘ বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিল। গুরু হইতে শিষ্যপরম্পরা অথবা চিত্র-প্রদর্শনী এবং মাসিক পত্রিকা এ সঙ্ঘের বাণী দেশ-দেশান্তরে বহন করিয়া লইয়াছে। ক্রমে ক্রমে এই সঙ্ঘের প্রেরণা গিয়াছে ফুরাইয়া, শিল্পীরা চলিয়াছে শুধু একটা বিশেষ মতবাদ অনুসরণ করিয়া; বিশেষ বিষয় অঙ্কনে শুধু তাহাদের আগ্রহ দেখা গিয়াছে। সেইজন্য ইহার আরম্ভ, পূর্ণ পরিণতি, decadence বা অধোগতি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দেখা দিয়াছে।

এই সঙ্ঘের পরিণতি যাহাই হইক, ভারতীয় সংস্কৃতির রসদ, ইহারা যে নানা ভাবে জুটাইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিছু চিত্র ইঁহারা নিশ্চয়ই ভারতীর রসভাণ্ডারে সংগ্রহ করিয়া



শিল্পী—শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত খোয়াই নদী কালিকলমের কাজ

রাখিয়াছেন। এই সকল চিত্র সম্বন্ধে কি কবির ভাষায় বলা যায় না, "গৌড়জন যাহে, আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি?"

এই সঙ্ঘের কোনো কোনো শিল্পী এখন নূতন পন্থা খুঁজিতে প্রয়াসী; পূর্ব্বে তাঁহারা যে ভাবে চিত্র আঁকিতেন, এখন আর সে ভাবে আঁকিতেছেন না। তাঁহাদের কাজে কোথাও কোথাও ভারতীয় চিত্রকলার নূতন পর্য্যায়ের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে।

অবনীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের প্রভাব কাটাইয়া শিল্পকে স্থাপন করিলেন ভারতভূমির চিত্ত-ক্ষেত্রে। জলরঙের কাজই তিনি বিশেষ করিয়া প্রচার করিলেন; তাঁহার ভাবধারা এবং অঙ্কন-রীতির বৈশিষ্ট্যে তৈলচিত্রের স্থান হয় নাই। অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কন-রীতির মৌলিকতা আছে; যদিও ইহা ভারতীয় রীতি বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে, ইহার ভিতর বিভিন্ন প্রথার সমাবেশ দেখা যায়। তিনি পরিকল্পনা বিশেষ করিয়া লইয়াছেন মোগল রীতি হইতে, কিন্তু তাঁহার অঙ্কন-রীতি মোগলরীতি হইতে পৃথক। কি মোগল বা রাজপুত পদ্ধতি উভয়ই আঁকা হইয়াছে টেম্পারা প্রথায়; কিন্তু তাঁহার জল-

রঙের সম্বন্ধ হয়ত, ভারতীয় হইতে বিলাতী জলরঙের সঙ্গে বেশী। তাঁহার কাজে যে chiaroscuro বা আলো-ছায়ার খেলা দেখা যায়, তাহা নিশ্চয়ই কোনো ভারতীয় স্কুলের সমধর্ম্মী নহে। তাঁহার রংয়ের এবং আলোছায়ার খেলা সম্পূর্ণ ইউরোপীয় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মোগলচিত্রে এই ধরণের আলোছায়ার খেলা কতকটা দেখা যায়; অষ্টাদশ শতাব্দীর মোগলচিত্র ইউরোপ দ্বারা প্রভাবান্বিত। মোগল দরবারের অনেক চিত্রকর ইউরোপীয় চিত্রের নকল করিয়াছিল, এবং ইউরোপীয় নীতি অনুযায়ী আলোছায়ার সম্পাত মক্স করিয়াছিল।

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকে জাপানী চিত্র,—বিশেষ করিয়া হোকুসাই ও হিরোসিগ প্রভৃতির রঙীন উড্‌কাটের চিত্র কম প্রভাবান্বিত করে নাই। তিনি নানা দেশ হইতে রীতি গ্রহণ করিলেও, তাহার ভিতরে নিজস্ব ছাপ দিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্টির প্রতিভা ছিল বলিয়াই শিষ্যদের নিজের কাছে আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন এবং স্কুল বা শিল্পীসঙ্ঘ গঠন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি যে শুধু ছবি আঁকিবার জন্যই একজন বড় আর্টিস্ট তাহা নহে, চতুর্দ্দিকে তিনি একটি মধুচক্র রচনা করিয়াছেন; যিনিই তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে যাহাই সৃষ্টি করুন না, অনেক শিল্পীর অধোগতির কারণ কি? কারণ আমার মনে হয়, জীবন এবং প্রকৃতির বিমুখতা; এই স্কুলের শিল্পীরা প্রকৃতিকে ত্যাগ করিয়া, কল্পনার উপরেই শুধু নির্ভর করিতেছেন। কোনো শিল্পী শক্তিলাভ করিতে পারেন না, যদি তিনি প্রকৃতি এবং জীবন হইতে প্রেরণা ও শক্তি লাভ না করেন। অক্ষম শিল্পীবৃন্দ, "প্রাচ্য চিত্রকলাপদ্ধতি" এই নামের আবরণে নিজেদের পরিচয়পত্র দিয়া তাঁহাদের কাজের সার্থকতা দেখাইতেছেন।

জাতীয় জীবনে মানুষের যেমন উত্থান পতন আছে, শিল্পেও তেমনি আছে। বালির নীচে লুক্কায়িত ফল্গুনদীর ধারার মত জীবন কোথায় লুক্কায়িত আছে কে জানে? কোথায় আবার সেই ধারা আত্মপ্রকাশ করিবে, কে বলিতে পারে?

যতদিন অবনীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত প্রাচ্য চিত্রকলা বা ভারতীয় চিত্রকলা বাংলার আসরে দেদীপ্যমান ছিল, ততদিন অন্য কোনো পদ্ধতি সুধীজনের সম্মুখে উজ্জ্বল ভাবে উপস্থাপিত হইতে পারে নাই। প্রাচ্য কলা-পরিষদ (ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ্ ওরিয়েণ্টাল আর্ট) এক সময় দেশবাসীর মন হরণ করিয়াছিল। সাহিত্যিক, কবি, সাংবাদিক, শিল্প-সমালোচক, সকল প্রকার শিক্ষিত লোকের ফ্যাশান ছিল—চিত্র প্রশংসা করা এবং সংগ্রহকারিগণ এই চিত্র সংগ্রহ করা গৌরবের বিষয় মনে করিতেন। শিল্পীদের এখন decadence সুরু হইয়াছে, এজন্য প্রাচ্য কলা-পরিষদের কার্য্যকলাপ আর সাধারণের গোচরীভূত হইতেছে না।

ইটালীর রেনেসাঁর পর যে চিত্র আসিল, তাহাকে বলা হয় decadent art. প্রাচ্য চিত্রকলার অভ্যুদয়কে অনেকে রেনেসাঁ আখ্যা দিয়া থাকেন সে জন্য ইহার উত্থান-পতনের সঙ্গে ইটালীর চিত্রকলার তুলনা আনা চলে।

এই প্রসঙ্গে ইটালীর রেনেসাঁর চিত্রকলার কথা একটু উল্লেখ করা যাক। ওল্‌ড মাস্টার হইতে আরম্ভ করিয়া ডাভিন্সি, মাইকেল এঞ্জেলো এবং রাফাএলে রেনেসাঁর পূর্ণ পরিণতি। প্রাচীন গ্রীক আখ্যান ও বাইবেল অবলম্বনে তাঁহারা চিত্র আঁকিয়াছেন। রেনেসাঁর পরের যুগে ইটালীতে

আরম্ভ হইল decadence, প্রায় তিন শতাব্দী ইটালীর রেনেসাঁ ইউরোপের চিত্রজগতে রাজত্ব করিয়াছে। রেনেসাঁর পরে শুধু চিত্রে নহে, অন্য বিষয়েও ইটালীর অধোগতি লক্ষিত হইবে।



কলসী কাঁখে—শিল্পী মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত—তুলির রেখায়

রেনেসাঁর পরের যুগে স্থাপত্যের নাম "বারোক" স্থাপত্য। অলঙ্কারবহুল এ স্থাপত্যে পূর্ব্বের গাম্ভীর্য্য ও আভিজাত্য নাই। বিলাসী নৃপতি এবং ধনী জমিদার শ্রেণীর জন্য এ স্থাপত্য ও চিত্র। প্রাচীন ক্লাসিক্স হইতে রেনেসাঁ যে প্রেরণা লাভ করিয়াছিল, ইটালীর অধোগতির যুগে ইতিহাসের স্তর ভেদ করিয়া সে প্রেরণা আর পৌঁছাইল না। রোমান কাথলিক চার্চ্চে ঘুণ ধরিয়া গিয়াছে। সেণ্ট ফ্রান্সিস আনিয়াছিলেন ইটালীতে নব জীবন, তাঁহার বিরাট জীবন শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, তাঁহার প্রভাব নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। মানুষের মন চার্চ্চের অত্যাচারে জর্জ্জরিত। গির্জ্জার প্রভাব শুধু ধর্ম্মক্ষেত্রেই নহে রাজনীতি ক্ষেত্রেও দমাইয়া রাখিয়াছিল। গির্জ্জার দেওয়াল ভাঙ্গিয়া মানুষের মন স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল। "রিফরমেশন" ইউরোপকে দিল সর্ব্ব ক্ষেত্রে মুক্তি।

আমাদের এখন একটা "প্রোটেস্টাণ্ট" মনোভাবের প্রয়োজন, যাহা সকল প্রকার 'কনভেনসন' বা সংস্কার ভাঙ্গিয়া চিত্রকে মুক্তি দিতে পারে।

উপসংহার

পূর্ব্বে প্রাচ্য কলা-পরিষদের বাৎসরিক প্রদর্শনী ছিল একমাত্র স্থান, যে স্থানে বহু চিত্রের একত্র সমাবেশ দেখা যাইত। অন্য প্রদর্শনী ছিল না বলিয়া এই পরিষদের চিত্রই ছিল একমাত্র আদর্শের মাপকাঠি। এখন বৎসর বৎসর দেখিতেছি, নানা প্রদর্শনীর উদ্ভব এবং নানা শৈলীর (স্টাইল) কাজ। জনসাধারণেরও চিত্রপ্রদর্শনী দেখার অভ্যাস অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। নানা প্রদর্শনীর অরণ্য হইতে ভাল চিত্র খুঁজিয়া বাহির করা এখন দুরূহ হইয়াছে। এক চিত্রের রীতি হইতে অন্য চিত্রের রীতি একেবারে পৃথক। কাহাকে ভাল বলি, এবং কাহাকে বলি মন্দ? পূর্ব্বে ছিল এক রীতি, সুতরাং চিত্রবিচার ছিল সহজ।

পূর্ব্ব পশ্চিমের দ্বন্দ্ব আমাদের শিল্পে যে দেখিয়াছি, তাহা এখনো সম্পূর্ণ মিটিয়া যায় নাই। প্রাচ্যশিল্পে তৈল চিত্র, এখনো আমাদের দেশে স্থায়ীরূপ লাভ করে নাই। প্রাচ্যশিল্প সম্বন্ধে বলা হয়, ইহা সনাতনপন্থী, এবং আধুনিক কালকে এই শিল্পে স্থান দেওয়া হয় না। আমাদের দেশে যাঁহারা ওয়েস্টার্ণ বা পাশ্চাত্য প্রথানুযায়ী চিত্র আঁকিয়া থাকেন, তাঁহারা যে সর্ব্বাংশে আধুনিক, এরূপ মনে করা যায় না। রিয়ালিস্টিক বা সাদৃশ্যানুযায়ী কোনো তৈলচিত্র হইলেই তাহা যে মডার্ণ বা আধুনিক হইবে, তাহা নহে। ভ্যানডাইক, রেমব্রাণ্ট ইউরোপের বড় শিল্পী, কিন্তু ইউরোপের আধুনিক স্কুলের শিল্পীরা তাঁহাদের অনুসরণ করেন না। আমাদের সকল পশ্চিমপন্থী শিল্পীরা যে আধুনিক শিল্পকে গ্রহণ করিয়াছেন এমন নহে। ইম্প্রেসনিস্ট—ম্যানে মোনে হইতে আরম্ভ করিয়া, গগ্যাঁ সেজান, ভ্যানগঘ্ প্রভৃতির চিত্রে যে পরিণতি দেখা যায় সেরূপ কিছু হদিস আমাদের প্রদর্শনীতে পাওয়া যায় কি?

আধুনিক চিত্রকলা প্রসঙ্গে বাংলার সাহিত্যের একটু তুলনা করা যাক। দেখিতে পাইব, বাংলার সাহিত্যে—বিশেষ করিয়া কথা-সাহিত্যে—উপন্যাস এবং ছোট-গল্প ইউরোপীয় গঠন অনুযায়ী। ভারতীয় প্রাচীন কথা-সাহিত্য হইল, কাদম্বরী, দশকুমারচরিত, হিতোপদেশ এবং পঞ্চতন্ত্র। এই আদর্শে এখন আর বাংলার কথা-সাহিত্য গঠিত হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি ইউরোপীয় আদর্শকে সম্পূর্ণ নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন। গল্পগুচ্ছ ও পল্লীসমাজ পড়িয়া কেহ এখন বলিবে না ইহা পশ্চিমের অনুকরণ;—ইহা সম্পূর্ণ ভারতীয় সৃষ্টি। কিন্তু ইহার অনুরূপ টেকনিক কখনো ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে মিলিবে না, বরং ইউরোপীয় সাহিত্যে মিলিতে পারে।

অবনীন্দ্রনাথের অভ্যুদয়কে মনীষী অরবিন্দ বন্দনা করিয়াছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টি হইতেও অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসৃষ্টি বৃহত্তর, এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। অবনীন্দ্রনাথকে শুধু শিল্পী হিসাবে গণ্য করিলে চলিবে না। তিনি একটা কালের force বা শক্তি। এখন তেমনি একটা শক্তির প্রয়োজন, যাহার ভিতর দিয়া ভারতীয় প্রকৃতি, জীবন এবং আদর্শ নবরূপ পরিগ্রহ করিবে।

ইউরোপের আধুনিক শিল্পে ভ্যানগঘের স্থান আজ সর্ব্বোচ্চে। ভ্যানগঘ্ শুধু একজন আধুনিক আর্টিস্ট নহেন; তাঁহার চিত্রের ভিতর দিয়া আধুনিক কালের আদর্শ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। বর্ত্তমান সাহিত্যে এবং চিন্তারাজ্যে টলস্টয়ের যে স্থান, চিত্রে ভ্যানগঘের সেই স্থান।

Post-অবনীন্দ্রনাথ অথবা অবনীন্দ্রোত্তর যুগে ভারতীয় শিল্পের নায়ক হইবেন কে? শিল্পগুরুর সিংহাসনে আজ কে বসিবেন? আধুনিক ভারতের আদর্শ কাহার চিত্রে আজ প্রকটিত হইবে?

শান্তিকামী

শ্রীকুমারেন্দ্র আচার্য্য

বৃদ্ধ সদানন্দবাবু আজীবন ডিপুটীগিরি করিয়া বৃদ্ধ বয়সে এমনই শান্তিপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন যে, ততটা শান্তি এবং নির্জ্জনতা এই কর্ম্মকোলাহলের সংসারে পাওয়া কঠিন। সুতরাং পরিবারবর্গের মধ্যে যাহারা নাকি অত্যন্ত আদরের সামগ্রী, তাহারাও তাঁহার কাছে সময় সময় মূর্ত্তিমান অশান্তি হইয়া দাঁড়ায়, এমন কি জীবনসঙ্গিনী গৃহিণী পর্য্যন্তও ভার হইয়া দাঁড়ান। বস্তুতঃ সংসারের অবশ্যম্ভাবী এতটুকু গোলমাল, চেঁচামেচি বা ঝকমারি সহ্য করিতে পারেন না, এমনি প্রকৃতি হইয়া গেছে।

এমনি সময় পুত্রবধূ একদিন, তাঁহার দুরন্ত ছেলেটিকে প্রহার করিলেন। সদানন্দবাবু অসমাপ্ত দিবানিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়া স্থির করিলেন, পশ্চিমে যাইবেন। জীবনের শেষ ক'টা দিন শান্তিতে কাটাইবেন—এই ইচ্ছা।

পুত্র অজয়কে বলিলেন, চুণারে যাবো ঠিক করেছি।

তল্পীতল্পা বাঁধা হইতে লাগিল। জামা, কাপড়, আসবাবপত্র, কয়েকখানা ধর্ম্মগ্রন্থ, ধর্ম্মচর্য্যার উপকরণ, যথা কোশাকুশী প্রভৃতি কিছুই বাদ পড়িল না।

সমগ্র অতীত জীবনের কর্ম্মকোলাহল আজও তাঁহার কাণে বেসুরা চীৎকারের মত লাগিয়া আছে। এতদিনে গঙ্গার নিস্তব্ধ তীর, বিন্ধ্য পর্ব্বতের গম্ভীর শান্তির মধ্যে আশ্রয় লাভ করিতে সমর্থ হইবেন, এই চিন্তার পুলকে তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসে।

কিন্তু একটু মুস্কিল আছে, হইলও।

পুত্রবধূ আসিয়া বলিলেন, আমি আপনার সঙ্গে যাবো।

বহুকালের ভৃত্য সঞ্জয় আসিয়া সজল চক্ষে নিবেদন করিল, আমাকেও নিয়ে চলুন বাবু।

মেজ মেয়ে খবর পাঠাইয়াছে তাহার অম্বলের অসুখ সারিতেছে না। চুণার নাকি অম্বল রোগীর পক্ষে স্বাস্থ্যকর জায়গা। সদানন্দবাবু গৃহিণীর মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, দেখছো ত? গৃহিণী বলিলেন, তাতে কি? ওরা কি তোমার পর? তোমার নাতি নাতনী, মেয়ে, দৌত্তুর—ওদের জন্যে কি তোমার একটুও মন কেমন করবে না?

বৃদ্ধ আগে ভাবিয়া দেখেন নাই। ঠিকই ত! সংসারে যে এতোগুলি প্রাণী তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার সহিত ওতঃপ্রোত ভাবে জড়াইয়া আছে, তাহাদের সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হইবার অলৌকিক শক্তি ত তাঁহার নাই! সদানন্দবাবু হাসিলেন। গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এই-ই হ'চ্ছে বৌদ্ধ মায়াবাদ।"

স্থির হইল, যাহারা যাইতে চায় চলুক। তবে এ ঝঞ্ঝাট? গৃহিণী বুঝাইয়া বলিলেন, সে আশঙ্কা নাই। তিনি শান্তির গ্যারান্টি দিতে প্রস্তুত।

সকালে উঠিয়া ভ্রমণ। বেলায় আসিয়া গঙ্গাস্নানের পর আহার। পরে বিশ্রাম। বিকালে

নির্জ্জন পাহাড়ে ভগবচ্চিন্তা। রাত্রে আহার। পরে শয়ন। এই দৈনন্দিন তালিকা। ইহার মধ্যে ঝঞ্ঝাটের প্রবেশপথ নাই।

চুণারে একখানা বড়ো বাড়ীর দোতলায় একখানা ছোটো নিরিবিলি ঘর সদানন্দবাবুর জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। পাশে একখানা ছোট কুঠরী তাঁহার পূজার ঘর।

অগ্নিপরিবেষ্টিত গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যেমন লোক নিশ্চিন্ত বোধ করে, চুণারে আসিয়া সদানন্দবাবু তেমনি আরাম অনুভব করিলেন। অতি প্রত্যুষে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া গঙ্গার তীরে গিয়া বসেন। বেলা হইলে স্নান সারিয়া আহারাদি করেন। বিকাল বেলা গঙ্গার তীরে যান, কখনো বা যে ঈষদুন্নত পাহাড়টী তাঁহার বাড়ীর উপর ছায়া বিস্তার করিয়া আছে, তাহার পাদদেশে গিয়া বসেন। পশ্চিমা গোয়ালিনীরা পাহাড় বাহিয়া দুধ বিক্রয় করিতে যায়, কৃষক-কন্যারা বখরী চালাইয়া লইয়া যায়—সদানন্দবাবু বসিয়া বসিয়া দেখেন।

কোলাহলমুখর সহর হইতে দূরে নির্জ্জন পল্লীতে বসিয়া নির্জ্জনতাপ্রিয় বৃদ্ধ পাহাড় পর্ব্বতের স্রষ্টাকে মনে মনে স্মরণ করেন।

ছোট নাতিটী বড়ো দৌরাত্ম্য করে। কোনোদিন দেখেন কোশার গঙ্গাবারি নিঃশেষ, কুশীটী নিরুদ্দেশ, শ্রীকৃষ্ণচরিত্র মসীলিপ্ত। সাধারণ অবস্থায় সকল পিতামহই পৌত্রের নিকট হইতে এইরূপ ব্যবহার সানন্দে সহ্য করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু সদানন্দবাবু বিরক্ত হন। কারণ জাগতিক মোহ বিনাশ করিবার জন্য মুদ্গর ধারণ করিয়াছেন।

একদিন বাড়ীর কোলাহলে তাঁহার আহ্নিক অসম্ভব হইয়া উঠিল। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, নীচে দালানে জন দুই প্রৌঢ়া তাঁহার গৃহিণীর সহিত অনর্গল কথা কহিতেছে, এবং কতকগুলি ছেলে-মেয়ে মহাকলরবে উঠানে খেলা করিতেছে।

বিরক্ত হইয়া সদানন্দবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, এরা কে?

গৃহিণী জবাব দিলেন, এঁরা চুণারে হাওয়া খেতে এসেছেন। বাড়ী ওতোরপাড়ার কাছে। ফোর্টের কাছে ওই বাড়ীটাতে থাকেন। আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন।

—কতোদিন থাকবেন?

—শীত কাটিয়ে যাবেন।

সদানন্দ ভাবিলেন, অতএব এইরূপ আলাপ পরিচয় এখনো কিছুদিন চলবে।

গৃহিণী সারটিফিকেট দিলেন, খুব আমুদে লোক।

সদানন্দবাবু জবাব দিলেন, ভালো।

তারপর পুত্রবধূ আসিয়া নিবেদন করিল, আমরা দুর্গাবাড়ী দেখতে যাবো।

—সে কোথায়?

—পাহাড়ের ভেতর দিকে। চমৎকার জায়গা নাকি। একজন সাধু থাকেন। তিনি আগে ডিপুটিগিরি করতেন।

—বেশ একদিন দেখে আসবো।

—ওঁরা যাচ্ছেন, ওঁদের সঙ্গে যাওয়া মন্দ হবে না।

সদানন্দবাবু বলিলেন, হৈ চৈ করে দেখতে গেলে লাভ শুধু হৈ-চৈ-ই হয়, দেখা কিছু হয় না। বেশ, ইচ্ছে হয় তোমরা যাও, আমি আর তোমার মা অন্য সময় দেখে আসবো।

গৃহিণী জানাইলেন, তিনি এঁদের সঙ্গে যাওয়া পাকাপাকি করিয়া ফেলিয়াছেন।

সকলে দুর্গাবাড়ী দেখিতে চলিয়া গেল। জনহীন ছায়াচ্ছন্ন বাড়ীতে বসিয়া বৃদ্ধ প্রাণ ভরিয়া নীরবতা উপভোগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বোধ হয়, একটা অপ্রত্যাশিত দুর্ভোগের অপেক্ষাতেই।

সন্ধ্যার পর সদলবলে পর্ব্বতাভিযাত্রীর দল ফিরিয়া আসিল, গৃহিণীকে বহন করিয়া।

পড়িয়া গিয়া গৃহিণী পা ভাঙ্গিয়াছেন।

কর্ত্তার মন ভাঙ্গিল। গৃহিণীর ভগ্ন পদ এবং নিজের ভগ্ন কপালের কথা ভাবিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। চুণারে ডাক্তার নাই। এক জনকে খুঁজিয়া বাহির করা হইল, কিন্তু ভাঙ্গা পায়ের কখনো চিকিৎসা করেন নাই বলিয়া রোগীকে এলাহাবাদ পাঠাইতে বলিলেন।

কর্ত্তা কলিকাতায় পুত্র অজয়কে চিঠি লিখিয়া দিলেন, তোমার মা পা ভাঙ্গিয়াছেন। তাই বলিয়া ব্যস্ত হইয়া আসিবার কোনো প্রয়োজন নাই।

আরো কিছুদিন কাটিয়া গেছে। ইতিমধ্যে সদানন্দবাবুর প্রবাস-সংসারে আরো যা-যা ঘটিয়া গেছে তা তাঁহার বহু-আকাঙ্খিত শান্তির ধারণা হইতে ন্যূন ত বটেই, অনেক ক্ষেত্রে বিপরীত পর্য্যন্ত।

পূজা আসিয়া গেছে। বাংলার সেই সংবাদ যুক্তপ্রদেশের এই নিভৃত পর্ব্বত-পল্লীতে পৌঁছিয়া গেছে। বাংলার শারদ আকাশের মত চুণারের আকাশও নীল, আলোকের ঐশ্বর্য্যও প্রচুর, খোট্টাদের রামলীলা উৎসবে চুণার পল্লীও মুখর।

সদানন্দবাবু বাঙ্গালীর সহজাত প্রবৃত্তিবশতঃ অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিলেন। সে আনন্দ আরো বাড়িল, যখন কলিকাতা হইতে চিঠি পাইলেন অজয় আসিতেছে। গৃহিণীও সম্প্রতি আরোগ্য লাভ করিয়া চুণারে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

ইহার দিন দুই পরে একদিন সকাল বেলা একটা হোল্ড্-অল ও সুটকেশ হাতে অজয় আসিয়া উপস্থিত হইল। অজয় যুবক, দীর্ঘাকৃতি ও বলিষ্ঠ চেহারা। মুখখানায় সৌজন্য ও সামাজিকতার ছাপ সুস্পষ্ট হইলেও দুরন্তপনার এবং প্রাণ-প্রাচুর্য্যের চিহ্নও বর্ত্তমান। এ বিষয়ে বোধ হয় বাপের বিপরীত বলিলেও চলে।

চুণারে পা দিয়াই এমনি হাঁকডাক, সোরগোল সুরু করিয়া দিল যে প্রবাসী বাঙ্গালী সম্প্রদায় সকলেই একটী বাঙ্গালী যুবকের আগমন-সংবাদ পাইল।

একদিন সন্ধ্যার সময় পাহাড়ের কাছে অজয় একলা পায়চারী করিতেছে, এমন সময় একজন ভদ্রলোক বাঙ্গালী, সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী, আসিয়া নমস্কার জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার নাম কি অজয়বাবু?

অজয় বলিল, হ্যাঁ। কেন বলুন ত'?

ভদ্রলোক বলিলেন, ওই একটি ভদ্রলোক আপনার নাম ব'লে দিলেন।

আমি একটু বিপদে প'ড়েছি মশাই। আমি এসে উঠেছি বিন্ধ্যাচলে। সকালবেলা এসেছিলাম চুণারে দুর্গাবাড়ী দেখতে। সন্ধ্যার আগে ফেরবার একখানা ট্রেন, তাও মিস করলাম। একেলা

হ'লে ভাবতাম না। সঙ্গে স্ত্রী রয়েছে। রাতটা থাকবার একটা ব্যবস্থা করে দিন। কাল সকালে বাড়ী চ'লে যাবো।

আরো দু' একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার পর অজয় নিজের বাড়ীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া জানাইয়া দিল যে, ওই বাড়ীতে আজ রাত্রি কাটাইবার স্থান স্থির হইয়া গেল।

এ ব্যবস্থায় সদানন্দবাবু কিন্তু তেমন খুসী হইতে পারিলেন না। গৃহিণীর কাছে পুত্রের বিরুদ্ধে এ বিষয়ে অনুযোগ করিলেন।

গৃহিণী জানাইলেন, উঁহারা অত্যন্ত ভদ্রলোক। তা ছাড়া বাঙ্গালী।

সদানন্দবাবু বলিলেন, বাঙ্গালী তা ত বুঝলাম, কিন্তু ওইটাই একটা উল্লেখযোগ্য পরিচয় নয়। ভারতবর্ষে আট কোটির কাছাকাছি বাঙ্গালী আছে।

গৃহিণী জবাব দিলেন, আট কোটি বাঙ্গালীই কিছু তোমার বাড়ীতে এসে উঠছে না। উঠেছেন মাত্র দু'জন, তাও এক রাত্তিরের জন্যে।

স্ত্রীর ওকালতীতে, অতিথিপরায়ণতার প্রতি অকৃত্রিম আনুরক্তি সত্ত্বেও, ভূতপূর্ব্ব ডিপুটী খুসী হইতে পারিলেন না। ভাবিলেন, তাঁহার অদৃষ্টে শান্তি নাই।

আহারাদি সমাপনান্তে ভদ্রলোকটী সদানন্দবাবুর কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অত্যন্ত মোলায়েম ভাষায় জানাইলেন।

তাঁহার স্ত্রী আধুনিকা, হয়ত বা শিক্ষিতাও হইবেন। নিস্পরের আশ্রয়-গ্রহণের যে সঙ্কোচ তা সুচারুরূপে কাটাইয়া, দাক্ষিণ্যটুকু প্রাথমিক কর্ত্তব্যে পরিণত করিয়া তুলিবার কৌশলটা যে তাঁহার জানা আছে, তা আর কেহ না বুঝুক, অভিজ্ঞ সদানন্দবাবু কয়েক ঘণ্টা লক্ষ্য করিয়াই বুঝিয়া ফেলিলেন। রাতারাতির ভিতর সদানন্দবাবুর স্ত্রী এবং অন্যান্য সকলকে যে কেমন করিয়া আত্মীয় করিয়া তুলিলেন, তা তাঁহার অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয়। শুধু তাই-ই নয়। পরদিন সকলকেই আগন্তুক দম্পতীকে বলিতে হইল, এসেছেন যখন আরো না হয় দু' একদিন থেকে যান।

তাঁহারা বিনা দ্বিধায় এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

পরদিন সকালে সদানন্দবাবু যখন দেখিলেন যে, ভদ্রলোকটী প্রাতর্ভ্রমণে চলিয়া গেলেন এবং ভদ্রমহিলাটী বেতের চেয়ারে বসিয়া শারদীয় সংখ্যার কি একটা মাসিক পাঠ করিতেছেন, তখন তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, ইঁহারা সকালের যাত্রাটা অন্ততঃ পিছাইয়া দিলেন। সন্ধ্যাবেলাও কোনো উদ্যোগ দৃষ্টিগোচর হইল না। মনে মনে অস্বস্তিবোধ করিলেও সদানন্দবাবু কিছু বলিতে পারিলেন না, কারণ জানিতেন, এ-সম্বন্ধে কোনো কথা বলিতে গেলে বিরুদ্ধতা আসিবে সর্ব্বপ্রথম তাঁহার গৃহিণীর-ই তরফ হইতে।

পরদিন বিকাল, আন্দাজ চারটার সময়, ভদ্রলোকটী সস্ত্রীক সদানন্দবাবুকে নমস্কার করিয়া জানাইলেন যে, তাঁহারা বিন্ধ্য পাহাড়ের ভিতর একটী সুরম্য জায়গা দেখিতে যাইতেছেন। আসিতে দেরী হইবে, সেজন্য যেন চিন্তা না করেন।

সন্ধ্যা হইয়া গেল। রাত্রি ন'টা বাজিল। তাঁহাদের উদ্দেশ নাই। সদানন্দ-গৃহিণী অনেক অপেক্ষা করিয়া করিয়া অবশেষে সদানন্দবাবুকে জানাইলেন, তাঁহারা চলিয়া গেছেন।

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সদানন্দবাবু বেশ বুঝিতে পারিলেন, তাঁহারা বিন্ধ্য পাহাড়ের দিকে অগস্ত্য-যাত্রা করিয়াছেন। তিনি মনে মনে স্বস্তি অনুভব করিলেন এবং তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিয়া কোনোরূপ চিন্তা করিলেন না।

গৃহিণী রাগ করিয়া বলিলেন, তোমার কাছে যদি কেউ এসে দু'দিন টেঁকতে পারে।

সদানন্দবাবুও রাগান্বিত হইয়া জবাব দিলেন, কাজেই।

পরদিন অতি প্রত্যুষে একজন দেশীয় ভদ্রলোক জন দুই সিপাহী সঙ্গে লইয়া আসিয়া সদানন্দবাবুকে প্রশ্ন করিলেন, যে লোকটী সস্ত্রীক কয়দিন এখানে আছেন তাঁহাদের দু'জনকেই চান।

সদানন্দবাবু শুষ্ককণ্ঠে জবাব দিলেন, গত রাত্রে তাঁহারা কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।

ভদ্রলোক একখানা কাগজ দেখাইয়া বলিলেন, তাঁদের গ্রেপ্তারী পরওয়ানা আছে।

সদানন্দবাবুর চক্ষু প্রায় স্থির হইয়া আসিল।

সদানন্দবাবু একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, অদৃষ্টও হাওড়া ষ্টেশন হইতে সঙ্গে আসিয়াছে। গৃহিণীকে সকল কথাই বলিলেন। স্থির করিলেন, এ বাড়ীটা ছাড়িয়া দিয়া পাহাড়ের পশ্চিম দিকের ওই ছোট নির্জ্জন বাংলোটা ভাড়া লইবেন। ওখানে লোকালয় নাই, অন্য কোনো বাঙ্গালীর উৎপাতও নাই। বাড়ীর সকলকে নিষেধ করিয়া দিলেন কারো সঙ্গে মেলামেশা করিতে। এই সপ্তাহটা কাটিলেই নূতন বাড়ী পরিষ্কার করিতে লোক নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

কলিকাতায় অজয়কে আর একবার স্মরণ করাইয়া দিয়া চিঠি লিখিলেন, খুব সাবধানে থাকিও। খবরদার—যার-তার সঙ্গে মেলামেশা করার মূঢ়তা তোমার আর যেন না হয়।

উত্তরে অজয় লিখিল, এখন হইতে সাবধান হইব। আপনি অবিলম্বে কলিকাতায় চলিয়া আসিবেন। চুণারের সেই আসামী ধরা পড়িয়াছে। পুলিশ হইতে আপনার নামে শমন হইয়াছে।

সদানন্দবাবু বেড়াইতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আর হাঁটিবার শক্তি রহিল না।

"জননী, আমার জন্মদিবসে তুমি রচেছিলে সেতু
আমার আঁধারে আলোকে, আমার অতীতে বর্ত্তমানে।
তুমি নাই তাই এত ব্যবধান আলোকে অন্ধকারে,
ব্যবধান মুখে তড়িৎ-তীব্রজ্বালা।
যেখানেই থাক জননী, আবার সেতু কর নির্ম্মাণ,
সহজ ব্যথায় আমারে প্রসব করো তুমি পরপারে।"

—সজনীকান্ত

বনবাসিনী উর্ব্বশী

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

তারার আলোয় চিনেছি তোমায়—চিনিনি তপনতাপে,
বনের বালিকা উর্ব্বশী তুমি ফিরিছ দেবতা-শাপে,
বনানীর মর্ম্মরে
তোমার অঙ্গে বল্কলবাস কাঁদিছে বিরহ-ভরে।
ঘন পল্লবপুঞ্জের ফাঁকে উঁকি দেয় কৌমুদী,—
নিলাজ চাঁদের লোলুপ আলোকে রয়েছ নয়ন মুদি',
রূপের সাগর-সম্ভবা ওগো, প্রেমিকের লোভনীয়া,
কবির মানসী প্রিয়া,
লজ্জাবতীর লজ্জাবরণ তোমার অঙ্গে কাঁপে
বনের বালিকা উর্ব্বশী তুমি ফিরিছ দেবতা-শাপে ॥

অমাতিমিরের বেদনারণ্যে নিভৃতে যে ফুল জাগে,
মর্ম্মের শ্বেত মৃণাল-মালায় সুগভীর অনুরাগে
সে রজনীগন্ধায়—
দেখেছি তোমার নির্ব্বাসনের ব্যথাতুর সন্ধ্যায়।
কুঞ্জবনের অঞ্জলি-ভরা যৌবন-ঘন রূপে
পলাশ-কোমল প্রজাপতি দল পাখা নাড়ে চুপে চুপে,
অশোক-রঙ্গীন পদপাতে তব শিহরায় বনবীথি
উঠে মর্ম্মর গীতি,
তনুর গন্ধে অন্ধ বাতাস বন্ধ্যা রজনী যাপে,
বনের বালিকা উর্ব্বশী তুমি ফিরিছ দেবতা-শাপে।

ঘুমায় পৃথিবী, ঘুমায় সমাজ, মদির সুপ্তিমাখা
গভীর রাত্রি, জোনাকী-আলোয় কাঁপে বনানীর শাখা ;
ছায়াময়ী তরুতলে
হে বনবাসিনী, আঁখিতে তোমার রাতের মণিকা জ্বলে।
আঁধারের অবগুণ্ঠনে তব ধ্যানের স্বপ্ন-রেখা,
মর্ম্মধূপের মায়া-বাষ্পের ধূসর বর্ণলেখা—
ছড়ায় নীরব শ্যামগম্ভীর সবুজারণ্যশাখে ;
অবোধ ঝিল্লি ডাকে,
কালপুরুষের নিরলস আঁখি স্বর্গ-মিনার হ'তে
বনের বালিকা, উর্ব্বশী, তব চেয়ে থাকে আশা-পথে।



চলন্তিকা

সম্বুদ্ধ

আমরা যুদ্ধে গিয়াছি।

সরকারী ইস্তাহার দেখিয়া বিশ্বাস করি নাই, কিন্তু খবরের কাগজেও যখন কোন প্রতিবাদ বাহির হইল না, তখন অবিশ্বাস করিবার আর পথ রহিল না। বোনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ধোবা কবে আসিবে রে ?

সে কহিল, পরশু।

আমি কহিলাম, এবার আসিলে আমার জন্য একটা মশারি কাচাইতে দিস। আর, ক'টা পাঞ্জাবি বানাইতে দিতেছি, সেগুলা না লইয়া যেন যায় না।

সে কহিল, কোথাও যাইতেছ ?

আমি কহিলাম, যাইতেছি যুদ্ধে।

সে কহিল, আচ্ছা।

বলিয়া ঘরের বাহিরে গেল, এবং তারপরই শুনিলাম সে চীৎকার করিয়া বলিতেছে, অ মা, চাল কম করিয়া লইও, দাদা যুদ্ধে যাইতেছে।

ডাক শুনিয়া পিসীমা ছুটিয়া আসিলেন; সংবাদ অবগত হইয়া উচ্চরোল তুলিয়া কহিলেন, আহা রে, কি হইয়াছে তোর যে এমন করিয়া অকালে যুদ্ধে যাইবি। আমি কহিলাম, যুদ্ধে যাইতেছি তাহার অকাল কি ? যুদ্ধে মানুষ আটাশ বছর বয়সেই যায়, আটাশি বছরে যায় না।

পিসীমা সাশ্রুনয়নে কহিলেন, কি তোর দুঃখ যে যুদ্ধে যাইবি।

আমি রাগ করিয়া কহিলাম, দুঃখ হইতে যাইবে কেন ? যুদ্ধে মানুষ যায় দুঃখের জন্য নয়; দুঃখ হইলে মানুষ বনে যায়।

পিসীমা কহিলেন, তবে ?

আমি কহিলাম, 'তবে' কিছু নাই। কর্তব্যের আহ্বান। উদ্ধত নাৎসিজ্‌মের স্পর্ধাস্ফীত পদভরে ধরিত্রীর ভারসাম্য বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে।

পিসীমা কহিলেন, বুঝিলাম না, সহজ করিয়া বল।

আমি কহিলাম, আর সহজ করিয়া বলা যায় না। না বোঝ তো চুপ করিয়া থাক। মেয়েদের মত কেবল কাঁদিও না।

পিসীমার মা ইতিমধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন, এত যে বলিয়াছি,

ছেলেমেয়েদের সময়ে বিবাহ দে, আর দেরি করিস না, তাহা কি তোর ভাইয়ের কানে যায়। বোন কহিল, ভাগ্যিস তুমি ছিলে, না হইলে কথাটা কে মনে করিত। পিসীমা, বাবাকে বলিও আর যেন দেরি করেন না। নহিলে শেষে দেখিবে আমিও একদিন যুদ্ধে চলিয়া গিয়াছি।

আমি কহিলাম, জ্যাঠামি করিস না। বিবাহ না হওয়ার সঙ্গে যুদ্ধে যাওয়ার কোন সম্পর্ক নাই—যুদ্ধ স্বয়ংবর-সভা নয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল, পাণিপথে যুদ্ধ হইয়াছে, ইউরোপের মহাযুদ্ধ হইয়াছে। কৌরব-পাণ্ডব, বাবরশা, কাইজার কেহই অবিবাহিত ছিলেন না। রাশিয়া ফিন্‌ল্যাণ্ড আক্রমণ করিয়াছে—সে কি তাহার বিবাহ হয় নাই বলিয়া?

সে কহিল, বলা যায় না। হিটলারের বৌ নাই। স্টালিনেরও না।

পিসীমা কহিলেন, হিটলার কারা? সেই যাহারা যুদ্ধ করে?

বোন কহিল, হাঁ। বৌ থাকিলে তাহাকে কিলাইতে পারিত; সেই হাত-সুড়সুড়িটা অন্যকে কিলাইয়া মিটাইতেছে।

আমি কহিলাম, হইয়াছে, তুই চুপ কর তো। বলিয়া তাহার বিনুনি ধরিয়া একটা হ্যাঁচ্‌কা কসাইলাম।

সে 'অঁ বৌদি' বলিয়া চ্যাঁচাইয়া উঠিল; তারপর কহিল, দেখিলে তো পিসীমা, আজ যদি আমি অন্য কোন বাড়ির বৌ হইতাম, ও এমন করিয়া আমাকে মারিতে পারিত? বা যদি আমার একটা বৌদি থাকিত, সে ওকে দুই থাপ্পড় দিয়া শায়েস্তা করিয়া দিত না? তুমিই বল।

বলিয়া মোচড় খাইয়া বিনুনি ছাড়াইয়া লইয়া পলাইয়া গেল।

পিসীমা এবং ঠাকুরমাও গেলেন। খানিক পরে বোন দূর হইতে চ্যাঁচাইয়া নিবেদন করিল, দাদা, পিসীমা বলিয়াছেন যুদ্ধে যাওয়া হইবে না। ধোবাবাড়ি কাপড় দেওয়া বন্ধ; দরজিকেও নিষেধ করিয়া পাঠাইতেছি।

আমার তখন জিদ চড়িয়া গিয়াছে; কহিলাম, কুছপরোয়া নাই, ছেঁড়া ময়লা জামা পরিয়াই যাইব।

শুনিয়া পিসীমা ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

*

ইঁহাদের কান্নার অর্থও নাই, বিরাম ও নাই, কেহ কিছু করিতে যাইতেছে শুনিলেই হইল—তৎক্ষণাৎ দুঃখের সাগর ও অশ্রুর উচ্ছ্বাস উথলিয়া উঠিবে। জগতে কেহ কোথাও কিছু না করুক, কেবল ইঁহাদের অঞ্চলের নিধি হইয়া—আঁচলে দেহ ঢাকিয়া কোলে টিকিয়া থাকুক, ইহাই ইঁহাদের কামনা, ইহারই নাম পিসীমাত্ব। হঠাৎ কখনও ভ্রমবশে যদি বা ইঁহারা স্বীকার করিয়া ফেলেন কোন একটা কাজ অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত, সেখানেও স্নেহাতুর মন সঙ্গে সঙ্গেই সতর্ক হইয়া উঠে; যে ভাষায় সে অনুষ্ঠানে অনুজ্ঞা জ্ঞাপন করেন তাহার অর্থ দাঁড়ায়, কাজটা হওয়া খুবই উচিত, সেটা নিষ্পন্ন করিতে লোকের যাইতেও হইবে—কেবল ব্যক্তিগত ভাইপোরা দূরে সরিয়া থাকিলেই ইঁহারা খুসি।

*

যুদ্ধের নামে পিসীমারা কান্নাকাটি সুরু করেন। কান্নার হেতুটা হয়তো বুঝি, কিন্তু আমরাই বা করিব কি! নিজে কারবার খুলিবার মত আমাদের সঙ্গতি নাই; অপরের কারবারে আমরা চাকরি পাই না। বিদ্যাচর্চা বা কলাচর্চা লইয়া যে থাকিব তাহারও অবসর নাই; সুযোগ ও সহায় উভয়েরই অভাব। মানুষের মধ্যে, দৈনন্দিন আহার ও আশ্রয় অন্বেষণের বাহিরেও একটা কর্ম-প্রেরণা থাকে। পণ্ডিতেরা ইহাকে বলেন—creative instinct; অপণ্ডিতেরা বলে—আদিখ্যেতা। ইহারই তাড়নায় মানুষ পৃথিবীতে স্বর্গ ও নরকের সৃজন করে। ভাগ্যদোষে মানুষ হইয়া জন্মিয়াছি, অতএব সেই প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যেও আছে। সুস্থ স্বাভাবিক রূপ লইয়া বিকশিত হইবার সুযোগ পায় না বলিয়াই সেই প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে মাথা খুঁড়িয়া ফিরিতেছে, আমাদের জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তাহার আকুতি ও আক্ষেপে আমরা বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছি। রক্তের যে লৌহকণিকা আহার্য জীর্ণ করার কাজে লাগিত, উদরে আহার্যের সন্ধান না পাইয়া সেই লৌহ আমাদের সর্বাঙ্গ ফুঁড়িয়া ব্রণের আকারে বাহির হইয়া আসিতেছে। আমাদের মন রুদ্ধশ্বাস, তাই আমাদের সমস্ত কর্ম সমস্ত চেতনার মধ্যেই ক্লিন্ন পঙ্কিলতা দেখা দিয়াছে—আমাদের দেশপ্রীতি দলাদলির বিষে জর্জর, আমাদের সাহিত্য কদর্যতার স্তুকারে দুর্গন্ধ, আমাদের নাট্যশালা কুৎসিত ভঙ্গি ও মুখভ্যাঙানির প্রদর্শনী।

*

একমাত্র ভরসার কথা, এই বিষ আমাদের দেহকে জর্জর করিলেও মনকে এখন পর্যন্ত অভিভূত করিতে পারে নাই—ইহার গ্লানি এখনও ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করি, করিয়া অধীর হইয়া উঠি। স্বাভাবিক জীবনে যে স্ফূর্তি আমাদের ভাগ্যে জুটিল না, তাহার সন্ধানে আমরা অস্বাভাবিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে যাইয়া পড়িতেও রাজি হইয়া যাই। বাস্তব জীবনে আমরা thrill-এর সন্ধান পাই না, thrill-এর অন্বেষণে আমরা ডিটেক্‌টিভ নভেল পড়ি; আইন ভাঙি; স্বদেশী-দলে নাম লেখাই।

*

এই thrill আরও ভাল জুটিত, যদি যুদ্ধে যাইবার পথ আমাদের খোলা থাকিত। তাহা নাই, এবং নাই বলিয়াই আমরা কল্পনায় যুদ্ধের সৃষ্টি করি, সেই কাল্পনিক যুদ্ধের কাল্পনিক অভিযানে পা ফেলিয়া চলিয়া তৃপ্ত হই।

*

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলাদেশ হইতে, এবং তাহারও মধ্যে বিশেষ করিয়া পূর্ববঙ্গ হইতে, অধিকসংখ্যক লোক এপর্যন্ত বিপ্লবী দলে যোগ দিয়াছে—। ইহার কারণ বাঙালীর দুঃসাহসিকতা নয়—ভারতের মধ্যে বাঙালীই সর্বাপেক্ষা সাহসী বা পরাক্রান্ত সমরকুশল জাতি নয়। তবুও সে এই দুর্গম বন্ধুর পথে পা বাড়াইয়াছে, তাহার কারণ তাহার কল্পনাবিলাসিতা। বাঙালী চিন্তা করে বেশি, তাহার স্নায়ুর স্পর্শাতুরতা বেশি; তাহার thrill-এর নেশা বেশি। বাংলাদেশে যেখানে বয়স্কাউট ব্রতচারী ও ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোর প্রভৃতি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেইখানেই বিপ্লবীদলে লোকসংগ্রহ অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে—বয়স্কাউট হইয়া ও ট্রেনিং কোর-এর সভ্য হইয়া ড্রিল করিয়াই যাহাদের thrill-এর কামনা পরিতৃপ্ত হয়, তাহারা আর বিপ্লবের অজ্ঞাত-

রহস্য পথে পা বাড়াইতে চায় নাই। বাঙালীদের যদি সৈন্যদলে ঢুকিবার পথ খোলা থাকিত, হয়তো বাংলাদেশে বিপ্লব-আন্দোলন এতটা সুসংহত হইতে পারিত না।

*

যুদ্ধযাত্রার মূলে একদিকে থাকে thrill, আরেকদিকে থাকে মানসিক তৃপ্তি—দুর্গতকে রক্ষা করিতে নিজের শক্তি ব্যয় করিলাম, এই চেতনা হইতে সেই তৃপ্তির জন্ম। ভাগ্যগুণে নিজেদের রক্ষা লইয়া আমাদের মাথা ঘামাইতে হয় না—পরাক্রান্ত ইংরেজ-রাজের কামানের সুশীতল ছায়ার আশ্রয়ে পরম নিঃসংশয় মনে আমাদের দিন কাটিতেছে।

আমার শয্যায় আমি নিশ্চিন্ত নির্ভরে ঘুমাইয়া থাকিতে পারি, দস্যুতস্কর যদিই আসে তাহাকে তাড়াইবার জন্য একজন সজাগ প্রহরী শিয়রে বসিয়া আছে—এই আশ্বস্তির মত সুখ আর কি আছে!

কিন্তু ইহার এক অসুবিধা, আত্মরক্ষার্থে যে সংগ্রাম, তাহার আনন্দ হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। সেই আনন্দ যদি বিকল্পে পাইতে চাই তবে অন্যত্র যেখানে কেহ আর্ত বিপন্ন আছে তাহার সহিত নিজেকে একস্বার্থ বলিয়া মনে করিতে হইবে, তাহার হইয়াই যুদ্ধ করিতে নামিতে হইবে। জার্মেনির আক্রমণ হইতে ফ্রান্সের সীমান্ত রক্ষা করিতে আমরা যুদ্ধ করিয়াছিলাম, ইংল্যাণ্ড আমাদের খাওয়া-পরার ভার লইয়াছিল। এবারেও জার্মেনি আছে; তাহার উপর রাশিয়া ফিন্‌ল্যাণ্ড কাড়িয়া লইতে চাহিতেছে। আমরা রাশিয়ার সহিত যুদ্ধ করিয়া ফিন্‌ল্যাণ্ডকে রক্ষা করিব। খাওয়া-পরার ভার ইংল্যাণ্ড লইবে—সেদিকেও চিন্তার কারণ নাই।

*

বিশেষ করিয়া, যখন যুদ্ধক্ষেত্রে বিলাসিতা নিষিদ্ধ। স্নো সেখানে আকাশ হইতেই বৃষ্টি হইবে, কামানের মুখে পাউডারের রাশি আমাদের গাত্রবর্ণকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত করিয়াই রঞ্জিত করিয়া দিবে। যুদ্ধক্ষেত্রে toil আছে, toilet-এর সমস্যা নাই।

তাহার বড় কারণ, সেখানে রূপ দেখিবার ও দেখাইবার অবসরের অভাব। যুদ্ধক্ষেত্রে নারীজাতি বড়-একটা থাকে না, এবং সৈনিকের পক্ষে আয়না দেখা গর্হিত অপরাধ। সেদিক দিয়া সৈনিকের ধর্ম সন্ন্যাসেরই অনুরূপ এবং এই নিয়ম সাধনায় সিদ্ধির পক্ষে অপরিহার্যও। তেল না মাখিয়া এবং জটাজুট-বিভূতি-ভূষিত হইয়া সন্ন্যাসীর যে বিকট রূপ দাঁড়ায় তাহা যদি সে নিজে দেখিতে পাইত, তবে আর তাহার তপস্যা করা হইত না, হাসিতে হাসিতেই তাহার নাড়িভুঁড়ি চৌচির হইয়া যাইত।

যুদ্ধেও তাই। দীর্ঘকাল রণক্ষেত্রে কাটাইবার ফলে মানুষের আকৃতি বদ্‌লাইয়া বদ্‌লাইয়া ক্রমে পশুর আকৃতি হইয়া যাইতেছে—আয়নাতে এই রূপ-পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া এরিখ্ মারিয়া রিমার্ক একদা শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। সেই শিহরণের প্রতিলিপি লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রীত হইয়াছে; এখনও সেই প্রতিলিপি দেখিয়া মানুষ আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া যাইতেছে। মনে আতঙ্ক ঢুকিলে যুদ্ধ করা যায় না; তাই আয়নার দিকে তাকানো সৈনিকের পক্ষে অবাঞ্ছনীয় আচরণ।

*

আমি যুদ্ধে যাইবার জন্য নাম লেখাইব স্থির করিয়াছি ; এখনও লেখানো হয় নাই। নামটা লেখানো হইলে সরকারি খরচে একপ্রস্থ সৈনিকের পোষাক পাইব। স্থির করিয়াছি, প্রথম দিন পোষাক পরিয়াই ডি. রতনের বাড়ী যাইয়া একখানা বড় ফটোগ্রাফ তোলাইব। ফটোর খরচের জন্য ডরাই না ; শুধু একটি আশঙ্কা মনে উঠিতেছে—ফটো দেখিয়া নিজেই না হাসিয়া ফেলি। নিজের বুট-বর্ম-হেলমেট-শোভিত কোমরে-তলোয়ার-ঝুলানো মূর্তি কল্পনা করিয়া এখনই হাসি পাইতেছে।

হাসি না পাইয়াও পারে না। প্রতিবেশী দুর্বৃত্তের উৎপীড়ন হইতে নিজের জীবন ও মাতা-ভগিনীর সম্মান রক্ষা করিবার শক্তি যাহাদের নাই, তাহারা চলিয়াছে জার্মেনির হাত হইতে ফ্রান্সকে, রাশিয়ার হাত হইতে ফিন্‌ল্যাণ্ডকে রক্ষা করিতে—ইহা দেখিয়া হাসি পাইবারই কথা।

অথচ কে জানে, হয়তো সত্যই ইহাতে হাসিবার কিছু নাই ; হয়তো আমি নিজে মূর্খ বলিয়াই আমার হাসি পাইতেছে। আত্মকেন্দ্রিক হইবার আমাদের অবসর নাই তাই আমরা বিশ্বকেন্দ্রিক—যাযাবরের অনির্দেশযাত্রার মত আমাদের কর্মপ্রচেষ্টাও ঘাটের অভাবে অপার সমুদ্রে ঘুরিয়া মরে। আমরা কবি হইবার আগেই বিশ্বকবি হই, ভ্রাতৃপ্রেম বুঝি না বলিয়া বিশ্বপ্রেমিক আখ্যা লাভ করি। বুদ্ধি যদি আমাদের কোথাও থাকে তবে আমরা বিশ্ববুদ্ধিমান ; এবং গাধাই যদি সত্য হই তবে আমরা বিশ্বগাধা।

*

কিন্তু আবার ভুল বলিলাম। দুই জনে যদি বিরোধ বাধে, তৃতীয়পক্ষ তৎক্ষণাৎ যাইয়া বিরোধ মিটাইয়া দিবে—ইহারই নাম ভ্রাতৃত্ব। জার্মেনি ও ফ্রান্সে লড়াই বাধিয়াছিল, ভারতের শিখেরা প্রাণ দিয়া সেই লড়াইয়ের অবসান করিয়াছে। জার্মানি ও চেকোস্লেভাকিয়ায় ঝগড়া লাগিল, ব্রিটেন মধ্যস্থ হইয়া ঝগড়া মিটাইল। আবার রাশিয়া ও ফিন্‌ল্যাণ্ডে গুঁতাগুঁতি লাগিয়াছে, জার্মেনি মধ্যস্থতা করিতে রাজি হইয়াছে। বিলাতি কাপড়ের ধাক্কায় আমাদের দেশি কল মারা যায় বলিয়া আমরা আর্তনাদ তুলিয়াছিলাম, জাপান স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদের চিন্তা ঘুচাইয়াছে—খোলা প্রাণে বলিয়া দিয়াছে, কিনিও না তোমরা বিলাতি কাপড়, যত চাও কাপড় আমিই তোমাকে যোগাইব। হিন্দু ও মুসলমান মারামারি করিয়া মরিতেছিলাম, ইংরেজ আসিয়া আমাদের রক্ষা করিয়াছে।

*

এইরূপে যেদিন অপরের দুর্গতিতে ব্যস্ত হইয়া উঠার প্রথা সমস্ত জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেইদিনই বিশ্বশান্তিরও সাক্ষাৎ মিলিবে। তখন ভারতের স্বাধীনতা লইয়া আর ইংরেজ ও ভারত-বাসীর মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিবে না, ওয়াশিংটনের মন্ত্রণাকক্ষে বসিয়া রাশিয়া ও ইটালি স্থির করিবে ভারত স্বাধীন হইবে কি না। তখন আইসল্যাণ্ড হইতে বেতারে বাণী পাঠাইয়া সাহারার সাইমুমকে শান্ত করা চলিবে ; ওআজিরিস্তানের পাঠানদের চিত্তশুদ্ধি কামনা করিয়া মেক্সিকোর অধিবাসীরা

প্রায়োপবেশন করিবে। ইউরোপের যুদ্ধে আমাদের যাত্রা সেই মহা-দিবসেরই নৈকট্য সূচনা করিতেছে।

*

একটা কথা শোনা যাইতেছে—ইউরোপের যুদ্ধ, ইংরেজের স্বার্থ, আমাদের তাহাতে কিসের মাথাব্যথা? ইংরেজের স্বার্থরক্ষায়, তাহার ইঙ্গিতে আমরা মরিতে রাজি নই, ইংরেজের সহিত সম্পর্ক আমরা রাখিব না; যুদ্ধও করিব না।

কিন্তু ইহা অদূরদর্শীর উক্তি। বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গ বলিয়াই ভারত পৃথিবীতে সম্মান পাইতেছে। সাম্রাজ্যের মধ্যে আছি বলিয়াই আমরা গর্ব করিয়া বলিতে পারিতেছি 'কাইজারের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হইয়াছিল,' 'অষ্ট্রেলিয়া আমাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত।' ইংরেজের সহিত যদি সম্পর্ক না রাখি, এই সাম্রাজ্যটাকে আমাদের বলিয়াও আর মনে করিতে পারিব না।

ভারতবর্ষ হইতে যে সৈন্যেরা যাইতেছে, ফ্রান্সের বন্দরে তাহারা সাগ্রহ অভিনন্দন পাইবে। বলদর্পিত জার্মেনি ও রাশিয়ার বিপক্ষে যুদ্ধ করিবার, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিবার গৌরব তাহাদের প্রাপ্য। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে যদি আমরা না থাকিতাম, তবে কি বিশ্বের সেবায় আত্ম-নিয়োগের এই দুর্লভ অবসর আমরা পাইতাম? কখনও না। তাহার চেয়েও বড় কথা, ইংরেজ না থাকিলে এমন করিয়া বিক্ষোভ প্রকাশ করিতাম কাহার উদ্দেশ্যে? ইংরেজ যদি না থাকিত, স্বদেশী আন্দোলন থাকিত না, বক্তৃতা ও হাততালি দিবার অবসর থাকিত না, শস্তায় ও সহজে 'দেশনেতা' হইবার সুযোগ থাকিত না, ছলে বলে কৌশলে সাত দিন জেল খাটিয়া 'হিরো' হইবার পথ খোলা থাকিত না।

অতএব, গাত্রদাহে যিনি যাহাই বলুন, আমরা এমন লাভজনক সম্পর্ক ছিন্ন করিতে রাজি নই।

এবং যুদ্ধেও আমরা যাইব। পিসীমা যত খুসি কাঁদুন, পিসীমার মাতৃদেবী হার্ট-ফেল করুন, পিসীমার ভ্রাতৃবধূ অন্নত্যাগ করুন, পিসীমার ভ্রাতা, পিসীমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে ত্যজ্যপুত্র করুন আমরা ঘাবড়াইব না। হাঁসের মধ্যে রাজহাঁস, মিস্ত্রির মধ্যে রাজমিস্ত্রি যেমন বড়, মাতৃভক্তি পিতৃভক্তি ইত্যাদি করিয়া যতপ্রকার ভক্তি আছে তাহার মধ্যে রাজভক্তিও সেইরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ।

অতএব আমি জামা বানাইবার এবং কাপড় ধোবাবাড়ি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছি। কাপুরুষেরা আমাকে যাহা খুসি বলিতে পারে।

আমি যুদ্ধে যাইবই। কেহ যদি সঙ্গে না যাইতে রাজি হয় তাহাতেও আমি ডরাই না; না পাই সঙ্গী, আমি একাই যাইব।



চয়ন

ছাত্রদের প্রতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[বিশ্বভারতী সম্মিলনী সভায় সভাপতির অভিভাষণ]

আমি যখন আশ্রমে ছাত্রদের আরো কাছাকাছি বাস করতুম, তখন তাঁদের কাঁচা বয়সের কাঁচা লেখার পরিচয় পাওয়া আমার পক্ষে ছিল সহজ। দুর্ভাগ্যক্রমে সে সুযোগ এখন আর আমার নেই। তোমাদের ভিতরে প্রবেশ করার শক্তি ও সময় আমার নেই, কিন্তু আজকের এই সভায় এসে তোমাদের চিন্তাধারার একটু পরিচয় পাওয়ার সুযোগ ঘটল।

তোমরা যে সব লেখা পড়লে, সেগুলো নানা বিচিত্র ধরণের রচনা। তার মধ্যে একটা জিনিস লক্ষ্য করলেম—তোমরা গল্প, কবিতা এবং বর্ণনাছলে যা কিছু লিখেছ তার প্রায় সব গুলিই রস-সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে।

তোমাদের রচনাতে একটা জিনিসের বড় অভাব—সে চিন্তার উপাদানের। আজ পৃথিবীতে নানা সমস্যা দুর্বার হয়ে উঠেছে, চারিদিকে প্রলয়-তাণ্ডবের গর্জন—এ অবস্থায় মন নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। মানুষের ভাগ্য যখন ঘটনা-সংঘাতে প্রবলভাবে নাড়া খেয়ে ওঠে, তখন ভাবী পরিণাম-চিন্তায় মন স্বভাবতই উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। কিন্তু সাধারণত এ সম্বন্ধে আমাদের ঔৎসুক্যের অভাব দেখতে পাই। মনে হয় তার একটা কারণ, আমরা অদৃষ্টবাদী—সংসারের অনেকখানি দায়িত্ব দৈবের হাতে সমর্পণ ক'রে নিশ্চেষ্ট থাকা আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অভ্যাস। চারিদিকে দৃষ্টিকে সজাগ রেখে কান পেতে থাকার উদ্যম আমাদের ক্ষীণ। কিন্তু মানব-ইতিহাসের ঢেউয়ের ধাক্কা থেকে উদাসীন ভাবে নিজেকে সরিয়ে রাখা আজ আর শোভা পায় না। একটা প্রচণ্ড আলোড়ন উঠেছে সমস্ত পৃথিবীব্যাপী জনসমুদ্রে, যেন সমস্ত সভ্য জগতকে এক কল্প থেকে আর এক কল্পে উৎক্ষিপ্ত করবার মন্থন ব্যাপার সুরু হ'য়েছে। আমরা কালের রুদ্রলীলাক্ষেত্রের নেপথ্য কোণে। বর্তমান মানব-সমাজের বড়ো আন্দোলনে যোগ দেবার সম্যক্ উপলক্ষ্য আমাদের আসে নি, তা'র ঝঞ্ঝাগর্জন দূর ব্যবধানের মধ্য দিয়ে অপেক্ষাকৃত ক্ষীণভাবে পৌঁছয় আমাদের কানে। কিন্তু আমরাও ত সুখে নেই। ঐতিহাসিক চক্রবাত্যার লেজের ধাক্কা বাইরের থেকে আমাদের বাসায় এসে লাগে, আবার ভিতরের থেকেও দুর্গতি বিচিত্র আকারে দিনে দিনে উঠছে দুঃসহ হয়ে। দেখ্‌তে পাচ্ছি আমাদের বর্তমানের

ম্লান দিগন্তে ভবিষ্যৎ রাত্রির অন্ধকার আসছে ঘনিয়ে। সমস্যার পর দুর্জয় সমস্যা এসে অভিভূত করেছে দেশকে, কিসে তার সমাধান, আমরা জানি না। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে আজ যে পরস্পর বিচ্ছেদ ও বিদ্রোহ উত্তাল হয়ে উঠেছে, যদি দেখতেম এর সহজ নিষ্কৃতি আছে, তবে চুপ ক'রেই থাকতেম। কিন্তু তার মূল প্রবেশ করেছে গভীরে, সহজে এর সমাধান হবে না। আর যদি সমাধান না করতে পারি, তবে আসবে "মহতী বিনষ্টি।" এখন চুপ ক'রে থাকবার সময় নয়। আমাদের ভাবতে হবে, বড়ো ক'রে ভাবতে হবে—ভাবাবিষ্ট আর্দ্রচিত্তে নয়, বুদ্ধিপূর্বক চিন্তা ক'রে। দেশের সম্বন্ধে, সমস্ত মানব-সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের ভাবতে হবে। ভাববার কারণ হয়েছে। সেই ভাবনার অভাব দেখলাম তোমাদের রচনায়।

আমরা ভাঙন-ধরা নদীর কূলে ব'সে আছি। এক মুহূর্তেই তা একেবারে ভেঙে ধসে পড়তে পারে। এই যে চারিদিকে গ্রামগুলো আমাদের বেষ্টন ক'রে আছে, সেখানে প্রবেশ করলে তোমরা দেখতে পাবে, মরণদশা ধরেছে তাদের, দুঃখ-দারিদ্র্যের সহচর ম্যালেরিয়া যক্ষ্মা সমস্ত জাতির জীবনী শক্তিকে আক্রমণ ক'রে চারিদিকে বিস্তার লাভ করেছে। এর প্রতিকার কোথায়, সে কথা ভাবতে হবে আমাদের—নির্বোধের মত নয়, ভাববিহ্বলভাবে নয়। অধ্যয়ন, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা ক'রে সমস্যাগুলোকে যথোপযুক্ত আয়ত্ত করতে হবে। মৃত্যুদূতের দ্বারা আক্রান্ত দেশের বিপন্নতার বেদনা কেন পৌঁছবে না তোমাদের চিন্তায়, কর্মে? তোমরা স্কুল-বিভাগের ছাত্র হ'লে তোমাদের এ সব কথা বলতাম না। তোমরা বড়ো হয়েছ, কলেজ-বিভাগে প্রবেশ করেছ, মানব জাতির দুরূহ দায়িত্বের দুর্গম পথে সদ্য তোমরা পা দিয়েছ, কিন্তু যাত্রার জন্য মন এখনও প্রস্তুত হ'ল না কি? মোহাবেশ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে পৌরুষের সঙ্গে সমস্ত সমস্যাকে তার সকল গ্লানি সত্ত্বেও স্বীকার ক'রে নাও। এই পণ ক'রে তোমাদের চলতে হবে—পরাস্ত যদি হতেই হয়, তবে বিরুদ্ধতার আঘাতকে সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রত্যাখ্যান করতে করতেই মরব। অর্থাৎ কাপুরুষের মতো প্রতিকূল অবস্থার কাছে হাল ছেড়ে দিয়ে মরব না—অথবা নির্বোধের মতো নির্বিচারে আত্মহত্যার পথে ছুটব না।

ভাবপ্রবণতা আছে আমাদের দেশে অতি পরিমাণে। হৃদয়াবেগ অতি সহজেই আমাদের মনকে অভিষিক্ত ক'রে তোলে। তার উত্তেজনাকে আমরা ব্যবহার করতে চাই, নিজেকে কাজে প্রবৃত্ত রাখবার জন্যে। ক্রমে উত্তেজনার মাদকতা হয় মুখ্য, কর্তব্য হয় গৌণ। এমন ক'রে নিজেকে না ভুলিয়ে নিছক সত্যের প্রেরণায় কোনো কাজে আমাদের মন যায় না। দেশের একটা কাল্পনিক স্বরূপের অসামান্য উৎকর্ষের অত্যুক্তি সাজিয়ে তুলে তার পশ্চাতে আমাদের দৈন্য গোপন ক'রে কেবল লজ্জা আছে, লাভ নেই। অবাস্তবের বাষ্পাচ্ছন্ন ভাবালুতার মোহাবেশ কাটিয়ে পুরুষের মতো উজ্জ্বল বুদ্ধির আলোকে দেশের সমস্ত অভাব অসম্পূর্ণতার মূঢ়তা কদর্যতা সব কিছুকে সুস্পষ্ট ক'রে জেনে তৎসত্ত্বেও প্রমাদহীন দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করো। যেখানে বাস্তবের ক্ষেত্রে ভাগ্য আমাদের প্রতিমুহূর্তে অবমানিত করছে, সেখানে আপন ঘর-গড়া অহঙ্কারে নিজেকে এবং অন্যকে ভোলানো ছেলেমানুষী, দুর্বলচিত্তের সেইটেই সব চেয়ে বড়ো দুর্লক্ষণ। সত্যকার কাজ আরম্ভ করবার মুখে এ কথা মানা চাই যে, আমাদের নিজের সমাজে আমাদের স্বভাবে আমাদের অভ্যাসে আমাদের বুদ্ধিবিকারেই গভীরভাবে নিহিত হয়ে রয়েছে আমাদের সর্বনাশ। দুর্ভাগ্যের সেই মূলে,

বহু প্রাচীন প্রথার প্রাচীরভিত্তিতে আমাদের অধ্যবসায় নিযুক্ত করতে হবে আত্মীয়-পরের সমস্ত কঠিন বাধার বিরুদ্ধে। তা না ক'রে যখনই আমাদের দুর্গতির সকল দায়িত্ব বাহিরের অবস্থায় এবং অপর পক্ষের প্রতিকূলতার প্রতি আরোপ ক'রে বধির শূন্যের অভিমুখে তারস্বরে অভিযোগ ঘোষণা করি, তখন হতাশ্বাস ধৃতরাষ্ট্রের মতো মন ব'লে ওঠে "তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়,"—আপনি যার সব চেয়ে বড় শত্রু, বাহিরের শত্রু বারে বারেই তার বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে। জীবনের সার্থকতার জন্যে আমি রসের প্রয়োজনকে খুবই মানি। কিন্তু রসের প্লাবনকে মানি নে। তার সঙ্গে সঙ্গে কঠিন সত্যকে মানতে হবে চিন্তাশক্তির সহযোগে। তোমাদের রচনায় এবং কাজে আমি এই দেখতে চাই যে, নির্মল আনন্দের ক্ষেত্রে যেমন তোমরা বিশ্বের অন্তরঙ্গ মন নিয়ে সৌন্দর্য সম্ভোগ করো, তেমনি মানব-সমাজের বিচিত্র ব্যাপারের প্রতি ঔৎসুক্য নিয়ে তোমরা বুদ্ধিপূর্বক চিন্তা করো, অন্বেষণ করো, বিচার করো এবং আপন জীবনের লক্ষ্য অবধারণ করো। *

সারথি

শ্রীঅমিয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরী

সংসার-চক্রের তলে পিষ্ট ক্লিষ্ট হিয়া ;
—মন্দ-ভালো আজি সেথা বাধায়েছে রণ,
ক্লীবতা-মূঢ়তা যত আসি' অনুক্ষণ—
চিত্তেরে শাসন করি' ফিরে গরজিয়া।
শিথিল এ-মুঠি হ'তে পড়িছে খসিয়া—
কর্ম-তুরগের রাশ ; শ্রান্ত-ক্লান্ত মন ;
কামনা-কলুষ আর মোহ-আবরণ—
অন্তরের চারিদিক রেখেছে ঘিরিয়া।

জাগাতে পৌরুষে মোর দ্বিধাভরা প্রাণে
হে পার্থসারথি, তুমি আসিবে কি আজি—
এ-চিত্তের কুরুক্ষেত্রে ? উঠিবে কি বাজি'
প্রেরণার পাঞ্চজন্য শঙ্কাভাঙা তানে ?
দগ্ধ হৃদি হ'তে মুছি' ভয়ব্যথারাজি—
জীবন-গীতা কি মোর গা'বে কানে কানে ?

* প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৪২

ইষ্টিশান

শ্রীনিখিল সেন

ষোল-শহরে নূতন ইষ্টিশান বসিয়াছে।

মানব সেখানকার নূতন ষ্টেশন-মাষ্টার হইয়া আসিল। বয়স তাহার বেশী নয়। শালতরুর মতো তাহার দীর্ঘ ঋজু দেহ, উন্নত প্রশস্ত ললাট আর চাপা চিবুকে জীবনের 'অটুট প্রতিশ্রুতি। স্থির অচঞ্চল চোখ দুটিকে তাহার ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে কোন্ এক সুদূর দেশের স্বপ্ন। বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে সবেমাত্র সে বাহির হইয়া আসিয়াছে। অপ্রত্যাশিত এক পারিবারিক বিপর্য্যয়ের জন্য তাহাকে অবশেষে প্রবেশ করিতে হইয়াছে চাকুরী-জীবনে একান্ত নিরুপায় হইয়া। তাহার মামাও ছিলেন এই রেলওয়ে বিভাগের জাঁদরেল গোছের এক কর্মচারী। অসহায় আত্মীয়-স্বজনের নিঃসম্বল মুখের দিকে তাকাইয়া তাহাকে শেষে মানিয়া নিতে হইয়াছে মামার অনুরোধ। জোয়ারের মুখে মানবের জীবনের স্রোত তাই আজ বাঁক ফিরিয়া গিয়াছে অন্যদিকে।

ত্রৈলোক্যবাবু ঝানু লোক। চাকরি করিতে করিতেই তাঁহার মাথায় চক-চকে বিরাট টাক পড়িয়াছে। আপিসের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির সঙ্গে তাঁহার পরিচয় আছে বেশ। পরদিন মানবকে তিনি চার্জ সব বুঝাইয়া দিলেন। পান-চিবানো দুপাটী দাঁত দেখাইয়া কহিলেন :

'হেঁ-হেঁ, এক্কেবারে ছেলে-মানুষ মশাই। অতো মন-মরা হলে কি আর চলে ?'

'না, ইয়ে—' মানব টানা ভুরু জোড়াটির মাঝখানে কপালের উপরটা রগড়াইতে থাকে অকারণ : 'না, এখনো নূতন কিনা—দেখবেন, দুদিনেই সব মেক্-আপ্ করে নেবো।'

টেবিলের উপর হইতে ট্রেনের চার্টখানি টানিয়া নিল মানব। তাহার স্বপ্নালু চোখ দুটিতে নবজাত শিশুর বিস্ময়! বিপুল এই পৃথিবীর আলো ও বাতাস ভূমিষ্ঠ শিশুটির মতো তাহার চোখেও যেন আজ ধাঁ-ধাঁ লাগাইয়া দিয়াছে।

প্রথম প্রথম কেমন এক অস্বস্তি বোধ হইত মানবের। ছাত্র-জীবনের নির্লিপ্ত আবহাওয়া কাটাইয়া উঠিতে তাহার বেগ পাইতে হয় রীতিমত। কিন্তু নূতন সব কিছুরই যেন এক উদ্দাম মাদকতা আছে। মানব তাহাতে মশগুল হইয়া গেল। কাজও তাহার তেমন কিছু বেশী নয়। কিন্তু গুরুত্ব অনেকখানি। এই যেমন—ডাউন্ এইট্ এক্সপ্রেসখানি যখন পুলের উপর দিয়া ঝুপ-ঝুপ করিয়া ছুটিয়া আসে, তাহার পূর্বে লাইন হইতে যদি গুড্‌স্ ট্রেণখানা সময় মত সরাইয়া রাখা না হয় সাইডিং-এ—কি বীভৎস অনাসৃষ্টিটাই না তখন ঘটিয়া যাইবে। চোখ বুজিয়া মানব তাহা কল্পনাও করিতে পারে না। সর্বাঙ্গ তাহার কাঁটা দিয়া উঠে। শত-সহস্র আহত যাত্রীর সকরুণ কাতর আর্তনাদে রাত্রির নিঝুম নীরবতা ভাঙিয়া তখন টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে। পলকের মধ্যে কি-যে-হঠাৎ ঘটিয়া গেল, তাহা বুঝিয়া উঠিবার পূর্বেই অনেকে হয়তো ঘুমাইয়া পড়িবে মৃত্যুর হিম-শীতল কোলে। হতাহত বহু-শত নর-নারীর অভিশাপ তখন মাথা পাতিয়া নিতে হইবে মানবকে। অভিশপ্ত মানব!

তারপর রহিয়াছে প্রত্যেক পদে-পদে কর্তব্যের ঝুঁকি। কন-কনে এই শীতের রাত্রিতেও রোজ বাসা হইতে এতোদুর হাঁটিয়া গিয়া তাহাকে তদারক করিতে হয় আড়াইটার ফাইভ্‌-আপ মেল-ট্রেণখানি নিরাপদে গেল কিনা অতিক্রম করিয়া ষ্টেশন। পরবর্তী ষ্টেশনে ইহা আবার টেলি করিয়া জানাইতে হয়।

মানব নিজেই বিরক্ত হইয়া উঠে নিজের উপর অনেক সময়। গলায় মাফলারখানা জড়াইতে জড়াইতে একটানে সে তাহা খুলিয়া ফেলে। তারপর ক্লান্ত অসহায় হইয়া এলাইয়া পড়ে ইজিচেয়ারের কোলে। মুখ দিয়া তাহার বাহির হইয়া আসে শূকরের মতো বিশ্রী একটা শব্দ।—না, যাবো না ছাই ডিউটিতে—হোকগে য়্যাক্‌সিডেন্ট, কোন রাতে যদি একটু ঘুমুতে পারতাম। বিড়বিড় করিয়া বকিতে থাকে মানব। অনেক সময় আবার গুম হইয়া কি যেন একটা ভাবে। তারপর সহসা হাত বাড়াইয়া কুড়াইয়া নেয় মেঝে হইতে পরিত্যক্ত তাহার মাফলারখানা। গলায় উহা সে জড়াইতে থাকে অন্যমনস্ক হইয়া। দৈন্য-ক্লিষ্ট তাহাদের পরিবারের শীর্ণ মুখগুলি তাহার হৃৎ-পিণ্ডে যেন ধীরে ধীরে বিঁধিয়া দিতেছে তীক্ষ্ণ ছুরি।

সহসা মানবের পিঠে কে বুঝি চাবুক কশাইয়া দিল। দ্রুত পা ফেলিল সে ইষ্টিশানের দিকে।

মানবের তবুও ভালো লাগে অভিনব জীবনের বিচিত্র এই আবেষ্টন। প্রত্যহ সে তাহার আপিস-ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায় নিঃশব্দে। দিন-রাত অবিশ্রান্ত যাওয়া আসা করিতেছে ট্রেণ। তাহাদের প্রতি পদ-ভরে যেন কাঁপিয়া উঠে থর-থর করিয়া ছোট এই ইষ্টিশানখানি।

শাদা ট্রাউজারস্‌-এর দু'পকেটে হাত ঢুকাইয়া মানব সেদিকে তাকাইয়া থাকে শূন্য-দৃষ্টিতে।

শত শত লোক উঠা-নামা করিতেছে প্রত্যহ এখানে। এমন নূতন কত মুখের সঙ্গে মানবের রোজ পরিচয় হইয়া যায়।

আব্বাস শেক পুরা আট বছর পরে দূর-বিদেশ হইতে আজ বাড়ি ফিরিয়াছে। সঙ্গে তাহার নূতন-কেনা মস্ত এক ট্রাঙ্ক। বৌ-এর নাম লিখা রহিয়াছে ট্রাঙ্কটির উপর। গাড়ি হইতে নামিয়া আব্বাস পরনের ময়লা লুঙিখানা ছাড়িয়া নূতন একখানা পরিয়া লইল। লম্বা কামিজের উপর রঙিন একটা কোট চড়াইয়া ট্রাঙ্ক মাথায় এবার সে বাড়ীর পথ ধরিল। তাহার কানের উপর হইতে চুলের গোড়া বাহিয়া চুঁইয়া পড়িতেছে ফোঁটা-ফোঁটা সুবাসিত তেল।···

সে গাড়ি হইতেই এক দল ইরাণী আসিয়া নামিল। সঙ্গে তাহাদের ছেলে-মেয়ে কাচ্চা-বাচ্চাই অনেকগুলি। মানুষ ও পশুতে তফাৎটা বুঝি তাহাদের জানা নাই। ইষ্টিশানের বাহিরে নদীর ধারে তাঁবু খাটাইয়া তাহারা ডেরা পাতিয়াছে।···

'হি বাবু!'

মানব বাসায় ফিরিতেছিল। মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। ময়লা লম্বা আলখাল্লাপরা দুজন বলিষ্ঠ কাবুলী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার সামনে। পিঠে তাহাদের দুটি বিরাট গাঁইট। গরম চাদর বিক্রয় করিতে তাহারা আসিয়াছে সুদূর পল্লীতে। এ সময় তাহারা প্রতি বছরই আসিয়া থাকে। মোটা গলায় প্রশ্ন করিল:

'পাহাড়তলী কিধার যায়েগা ?'

'সিধা সড়ক্‌সে—লেকিন বহুৎ দূর হ্যায়।'

কাবুলী দুজন সেলাম করিয়া আবার পথ ধরিল। সুরকির লাল কণাগুলি তাহাদের নাগরায় পিষ্ট হইয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

টরে-টক্কা টরে-টক্কা করিয়া টেলিগ্রাফ য়্যাপারেটাসটী হঠাৎ কথা কহিয়া উঠিল। মানব তাহা রিসিভ করিয়া লইল। তিনটা দশের আপ প্যাসেঞ্জারখানি এইমাত্র আসিয়া পড়িবে। মানব বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। পইণ্টম্যান মহিউদ্দিন কেবিনে আছে কিনা কে জানে ? লোহার ডাণ্ডা বাজাইয়া রামদীন ঘন্‌টি লাগাইতে সুরু করিয়াছে।

দিন কয়েক হইতে যাত্রীদের বেজায় ভিড় হইতেছে। একখানা স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা হইলে মন্দ হইত না।

ভিড় হইতে মানবের একখানা হাত কে হঠাৎ আঁকড়াইয়া ধরিল।

'দাও বাবা, একখানা টিকিট কেটে দাও।'

বৃদ্ধা এক বিধবা। কাতর অনুনয় করিয়া মানবকে আবার কহিল, 'দাও বাবা, গাড়ি এক্ষুনি এসে পড়বে যে।'

আঁচলের গিট খুলিয়া বারো আনা পয়সা সে গুঁজিয়া দিল মানবের হাতে। কহিল, 'যোগটা নাকি এবার ভালো। কালি আচার্য্যি তাই বলছিলো—কদিন আর বাঁচবে লক্ষ্মীখুড়ি ; চলো বাবা মহামুনির ছিচরণটা এবার দর্শন করে আসি। তাই বাবা আসা। তা তোমার অই টিকেট বাবুটি যে টিকেট দিচ্চে না।'

'আচ্চা, এখানে তুমি একটু দাঁড়াও। আমি টিকেট নিয়ে আসচি।'

টিকেট-ঘরটিকে ঘিরিয়া তখন এক ঝাঁক কালো মৌমাছি হুড়াহুড়ি আর ঠেলাঠেলি সুরু করিয়াছে। আর ত্রৈলোক্যবাবু তাঁহার ছোট খুপরির মধ্যে নিশ্চিন্তে বসিয়া শুধু হুঙ্কার ছাড়িতেছেন 'নো নো ; ওয়ান য়্যাট-এ টাইম। রুল ইস্‌ অলওয়েস্‌ এ রুল।'

মানবকে দেখিয়া পথ ছাড়িয়া দিল অনেকে।

'ওকি করচেন আপনারা ? সকলে অমন ভিড় করলে যে কেউ টিকিট কাটতে পারবেন না। সার বেঁধে দাঁড়ান না ?'

একটু পরেই তীব্র হুইসিল দিয়া গাড়িখানি আসিয়া ঢুকিল ইষ্টিশানে। ঘুমিয়ে-পড়া ষ্টেশন-খানি আবার যেন সজাগ মুখর হইয়া উঠিল। মহাব্যস্ত হইয়া উঠিল ভেণ্ডরেরা। কুলিরা সুরু করিয়া দিল হাঁকাহাঁকি। কম্পার্টমেণ্টের মুখে জমিয়া উঠিল যাত্রীদের ভিড়।

নীলকণ্ঠ বসাকের বউটি নেহাৎ ছেলেমানুষ। লম্বা এক বুক ঘোমটা টানিয়া শ্বশুর বাড়ি যাইতেছিল দেওরের সঙ্গে। গাড়িতে উঠিয়া সে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। নিঝুম ছায়া-ঘন বাপের বাড়ির ছোট কুঁড়েখানি তাহাকে যেন আজ হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে ইসারায়।

তাহাদের কামরায় একদল বৌদ্ধ শ্রমণও বিদেশে যাইতেছেন। গাঢ় হলুদ রঙের বসন সর্বাঙ্গে তাঁহাদের—মুণ্ডিত মস্তক—সুসংযত মুখের উপর কি এক প্রশান্ত সৌম্যতা!

ভ্যানগার্ড হুইসিল দিয়া সবুজ নিশান উড়াইল। গাড়িখানা পিছনে একটু দুলিয়া উঠিয়া আগাইয়া চলিল হুস হুস করিয়া আপন লক্ষ্যপথে। অতিকায় এক দুরন্ত অজগর যেন ছুটিয়া চলিয়াছে সরোষে।

মানব দূরে অপস্রিয়মান ট্রেনখানার পিছনে চোখ দুটি তুলিয়া ধরিল। জমাট একটানা এক হাহাকার তাহার শিরদাঁড়ার ভিতর দিয়া যেন সহসা বহিয়া গেল। শূন্য—সব ফাঁকা—ইষ্টিশানখানি এখন শুধু খাঁ খাঁ করিতেছে। এইমাত্র সব ছিল; এখন আবার যেন কোথায় সব হারাইয়া গেল। শুধু এক কোলাহল—মুখর এক কলরব—কিছুই যেন খাঁটি নয় দুনিয়ায়। ক্ষণিকের জন্য শুধু আসা; তারপর আবার চলে যাওয়া। ইষ্টিশানের প্রতি অণু-পরমাণুতে জীবনের যে অফুরন্ত স্পন্দন ছিল এইমাত্র; এখন আবার তাহা থামিয়া গিয়াছে।

ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকাইয়া সিগারেট মুখে মানব ভাবিতে থাকে অন্যমনস্ক হইয়া; এমনি বুঝি আসা-যাওয়া করিতেছে মানব-যাত্রীর অদৃশ্য ট্রেন! মুখর কয়েকটি মুহূর্তের জন্য শুধু আসিয়া থাকে এই ইষ্টিশানে, তুমুল কলরবে কাঁপাইয়া তুলে পৃথিবীর আলো ও বাতাস। তারপর আবার কোন্ অন্ধকারে মিলাইয়া যায় ধীরে ধীরে!

লোক্যাল ট্রেনখানা সেই পৌনে পাঁচটায়। এখন অজস্র অবসর মানবের। মন্থর পা ফেলিয়া সে আপিস হইতে বাহির হইয়া আসিল। প্ল্যাটফরমে পা দিয়াই তাহাকে ফিরিয়া দাঁড়াইতে হইল ত্রৈলোক্যবাবুর আকুল আহ্বানে। জন কয়েক ইউরোপীয় ভদ্রলোককে নিয়া তিনি মহা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। শিকারের পোষাকে তাঁহারা সকলে। ষোল-শহরের পরেই কর্ণফুলীর তীর ধরিয়া তরঙ্গায়িত পর্বতশ্রেণী আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে আরাকানের দিকে। এখানকার সেই নিবিড় পাহাড় অঞ্চলে শিকারে আসিয়াছেন তাঁহারা বোধ হয়।

হন্ত-দন্ত হইয়া ত্রৈলোক্যবাবু ছুটিয়া আসিলেন।

'দিন তো সার শীগগির ওয়েটিং রুমের চাবিটা!'

'ওয়েটিং রুমের চাবি ?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, দেখচেন না সার; ফার্ষ্ট ক্লাশের প্যাসেন্‌জার!'

'কিন্তু তাঁদের তো এখানে বসবার কোন ব্যবস্থা নেই।'

'কেন, মেয়েদের ঘরটা খুলে দিন না!'

'না, ওটা তো শুধু মেয়েদের।'

'তা হোক সার, সায়েবসুবো মানুষ এঁরা।'

শিকারীদের পার্টি হইতেও প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক আসিয়া মেয়েদের ঘরে বিশ্রাম করিবার দাবী জানাইলেন। মানব অটল।

'সরি, আই কনট্ হেল্প।' পাশ কাটাইয়া সে চলিয়া আসিল।

এই ইষ্টিশানেই একদিন সীতাদের সাথে মানবের পরিচয় হইয়াছে অপ্রত্যাশিত ভাবে।

সকালের ডাউন এক্সপ্রেসখানি সবেমাত্র ইষ্টিশান ছাড়িয়া গিয়াছে। পরের ট্রেনখানার আসিতে এখনও অনেক দেরী। আপিস হইতে মানব আসিয়া দাঁড়াইল বাহিরে। প্ল্যাটফরমের উপর ছোট একটা ভিড় জমিয়া গিয়াছে। আর সেই ভিড় হইতে ক্রুদ্ধ, চিকণ একটা গলা আসিয়া পৌঁছিল মানবের কানে।

আগাইয়া গেল মানব।

শাদা স্যুট-পরা বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক দীর্ঘ পথক্লান্তিতে বুঝি অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িয়াছেন বিছানার হোল্ড-অলটির উপর। আর তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া আছে একটি মেয়ে—বয়স দেখিয়া ঠিক আন্দাজ করা যায় না কত—মাথার একরাশ এলোমেলো চুলকে কোন রকমে জড়াইয়া ঘাড়ের উপর ফাঁপা এক খোঁপা বাঁধিয়াছে; আর পরণে নীল রঙের শোভন একখানি শাড়ি লতাইয়া উঠিয়াছে তাহার দীর্ঘ ঈষৎ আনত দেহকে।

সামনে দাঁড়াইয়াছিল য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এক টিকিট-চেকার। মেয়েটি তাহাকে জবাব দিল, 'নো, উই ওণ্ট পে।'

এবার সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি তখন পার্স খুলিতে যাইতেছিলেন। মেয়েটি তাঁহাকে মানা করিল:

'না বাবা, এক্‌শেস-ফেয়ার আমাদের দিতে হবে কেন? ওটা তো আমার পিয়ানোর বাক্স আর তাকে তো একবার ওজন করিয়েছিলে।...এই কুলি, উঠাও মাল জলদি।'

মানবের মধ্যস্থতায় ব্যাপারটা চুকিয়া গেল নিরাপদে।

পিতা-পুত্রী দুজনেই গলিয়া পাড়িলেন কৃতজ্ঞতায়।

'I'm very grateful to you, mister—mister—' অধ্যক্ষ ডক্টর গুপ্ত মানবের হাতে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়া তোতলাইতে লাগিলেন।

'মানব রায়।'

দেখুন তো রয়, কি বিশ্রী হ্যাঙ্গামটাই না পোহাতে হলো। রীতিমত বেশ ভিড় জমে গ্যাচলো, না?'

'সরি, মাঝে মাঝে ও ভুল—' দুভুরুর মাঝখানে কপালটাকে মানব আঙুল দিয়া একবার রগড়াইয়া লইল: 'সরি।'

'নো, উই ওণ্ট পুট আপ উইথ...'

'না, যেতে দে বেবি, যেতে দে। ওসব নোঙ্‌রামিতে গিয়ে আমাদের কাজ নেই।'

সকলে গেটের বাহিরে আসিয়া পড়িলেন। গাড়ি আর লোক পূর্ব হইতে মজুত ছিল। অধ্যক্ষ গুপ্ত ফুট-বোর্ডে পা দিয়া আবার ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। আন্তরিকতায় সহসা ফাটিয়া পড়িয়া কহিলেন:

'ভারী খুশী হবো রয়, আসবেন আমাদের ওখানে মাঝে-মাঝে দয়া করে। প্রথম প্রথম—পাঁড়াগাঁ—নইলে ভারী বোরিং ঠেকবে যে।'

সীতার সাথে মানবের পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন নিরঞ্জনবাবু। সহজ উচ্চ হাসি হাসিয়া কহিয়াছেন: 'জানেন রয়, এ আমার মেয়ে—বুড়ো বাপের ছোট্ট মা-টি। এই এতোটুকু থেকে মাকে ছেড়ে চলে এসেচে আমার সাথে দেশে। এখন আবার ছুটে এসেচে গাঁয়ে বুড়ো বাপের অবসর ভরিয়ে তুলতে আনন্দে আর হাসিতে।'

চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে, চুম্বকের তাহা দোষ নয়। পরস্পর তাহাদের ধর্ম্মই তাই। মানবের কি জানি হইয়াছে! বেলা পড়িয়া আসিলে—পোঁনে পাঁচটার লোক্যাল ট্রেণখানি চলিয়া গেলে, ভারী উনমনা হইয়া উঠে সে। গাছ-পালার ঘন ছায়াচ্ছন্ন সীতাদের বাংলোখানি যেন ডাকিতেছে হাতছানি দিয়া দূর হইতে তাহাকে। নিজের অজানিতে কখন সে বাহির হইয়া পড়ে সীতাদের বাড়ির উদ্দেশে। ভারী ভাল লাগে তাহার সীতার সহজ প্রগল্ভ ভাব।

এক দিনের কথা তাহার আজ মনে পড়িল। আর আর দিনের মত সে দিনও সে গিয়াছিল সীতাদের ওখানে। দেখিল: এক গাদা বই আর বিলেতী পত্রিকা সামনে রাখিয়া সীতা তাকাইয়া আছে জানলা দিয়া বাহিরে। এক মুহূর্ত মানব স্থির অপলক চোখে চাহিয়া নিল সীতাকে। ফিরোজা রঙের ওই শাড়িখানা না পরিলে সহসা কেহ বুঝি আর সীতাকে বাঙালী বলিয়া চিনিয়া নিতে পারিবে না।

সীতা সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল কৌচ ছাড়িয়া। 'বাঃ, কখন এলেন?…' স্বর্ণাভ চুলগুলি কপোল হইতে এক হাতে সরাইয়া দিয়া আবার কহিল: 'আমাকে একটু সাহায্য করবেন প্লীজ। কিছুই যে ঠিক করতে পার্‌চি না?'

'কি?' সীতার কালো চোখে নীল সমুদ্রের নিবিড় রহস্য! মানব চোখ নামাইয়া লইতে ভুলিয়া যায়।

'আচ্ছা বলুন তো, ড্রয়িং রুমে বইয়ের একটা রিভলভিং শেল্ফ রাখ্‌লে বেশ হয় না?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু বাবা কি বলেন, জানেন,? আলাদা একটা লাইব্রেরী-ঘর যখন রয়েচে, বসবার ঘরে আর বই ঠেসে লাভ কি?'

'সত্যি।'

'বাঃ, এই ধরুন—কোন ভদ্রলোক এলেন দেখা করতে। বাবা তাঁর স্টাডি ঘরে আর আমি ধরুন বেরিয়ে গেছি; তখন কাঁহাতক আর দেয়ালের ছবি দেখে তিনি সময় কাটাতে পারেন? পাশে এক গাদা বই থাকলে কি বেশ হয় না?'

'হয় বৈ কি?'

সীতার এবার খেয়াল হইয়াছে, মানব এতক্ষণ দাঁড়াইয়া আছে তার মত। অনুযোগে একরূপ চেঁচাইয়া উঠিয়াছে সে: 'ওকি, আপনি দিব্যি দাঁড়িয়ে আছেন যে? বসতে আপনাকে বলা হয় নি বলে কি আর বসতে নেই নাকি?'

বই আর পত্রিকাগুলি ঠেলিয়া পাশে সরাইয়া রাখিল সীতা। 'বসুন প্লীজ। বাবাকে বলে আসি।'

দরজার রঙিন পর্দাখানি এলাইয়া পড়িল সীতার পিছনে। হাতের চুড়ি কগাছি পরস্পর ঠোকাঠুকি করিয়া মৃদু গোঙাইয়া উঠিল।

মানব উঠিয়া দেয়ালের ছবিগুলি দেখিতে লাগিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাহিত্য-মনীষীদের খান কয়েক প্রতিকৃতি। একখানা ছবির নিকট মানব আগাইয়া আসিল: এনলার্জ-করা ইউরোপীয় এক মহিলার ফটো। মোনালিসার ভঙ্গিতে তিনি হাসির রেখা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন রক্তিম তাঁহার পাতলা ঠোঁটে। বিস্ময়ে মানব চাহিয়া রহিল অপলকে: সীতাকে কে যেন আঁটিয়া রাখিয়াছে কাঁচের ফ্রেমে হুবহু। ঠিক তাহার মত একরাশ সোনালি চুল—টানা ভুরু জোড়াটির নীচে সমুদ্র-নীল এক জোড়া চোখ।

কাঁচের একটা গ্লাস যেন ভাঙিয়া পড়িল মিঠা সুরে মানবের কানের কাছে।

'ওখানা মার ফটো। আপনি বসুন, বাবা আসচেন।'

মানব ফিরিয়া দাঁড়াইল। ইহার মধ্যে সে একখানি সৌরাষ্ট্র দেশীয় শাড়ি বদলাইয়া আসিয়াছে আর সে রঙেরই শ্লীভ-কাটা একটা জ্যাকেট। হাসিবার সময় সীতার সামনের মোটা দাঁতদুটি বাহির হইয়া পড়ে।

পাশাপাশি তাহারা দুজনে গিয়া বসিল কৌচে।

'না, মা ভারতে আর আসেন নি। বার্লিনের এক প্রফেসরের মেয়ে তিনি। ডক্টর হের ভন্ ব্রাউশিস্কের অধীনে থেকে বাবা তখন রিসার্চ করছিলেন; আমার সে সময় জন্ম হয়। তারপর ডিগ্রী নিয়ে বাবাকে দেশে ফিরতে হলো। মা কিন্তু রাজি হলেন না। আমিও চলে আসি বাবার সাথে।'

ঢিলে পায়জামা আর লম্বা পাঞ্জাবী পরিয়া শ্লথ পদে ডক্টর গুপ্ত এমন সময় ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। খাঁজ-পড়া তাঁহার সারা মুখখানি ভরিয়া গিয়াছে আন্তরিক হাসিতে: 'তুমি এসেচো রয়? না—না, বসো তোমরা।'

ইজি চেয়ারের কোলে তিনি বিলাইয়া দিলেন নিজেকে।

'আর যাই বলো বাপু, গাঁয়ে ফিরে একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। শহর তো নয়, যেন অক্টোপাশের শুঁড়—আশেপাশে বেঁধে রেখেছিলো আমাদের।'

অল্প এই কয়দিনেই তিনি মানবকে বড় আপনার করিয়া নিয়াছেন।

বেশ রাত হইয়া গিয়াছিল সেদিন মানবের বাসায় ফিরিতে। নখের বাড়ন্ত কাটা অংশটুকুর মত মেঘ-শূন্য নিথর আকাশের বুকে সরু একখানি চাঁদ উঠিয়া আবার তাহা কখন ডুবিয়া গিয়াছে।

সীতাদের বাড়ির উঠান পার হইয়া আসিবার সময় মানব শুনিতে পাইল পাশের ঘর হইতে সীতা বলিতেছে: 'হ্যাঁ বাবা। বেশ লোকটি না?'

মানবের দুই কানে কে যেন সহসা টুং-টাং সুরে বাজাইয়া উঠিল পিয়ানো। বুকে তাহার ছন্দিত হইতে লাগিল সীতার মুখের শেষ কথাগুলি। বোবা রাত কি যেন কথা আজ কহিয়া গেল

তাহার কাণে কাণে। পুঞ্জীভূত নীহারিকার গোপন ইঙ্গিত সে বুঝি আজ পড়িয়া গিয়াছে তারাদের অস্পষ্ট অক্ষরে।

ঘাড় ফিরাইয়া মানব কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিল সীতাদের বাংলোখানার দিকে। প্রথম অগ্রহায়ণের শাদা কুয়াশার চাদরে ঢাকা দূরের ওই নীড়খানি মানবের স্বপ্নালু দৃষ্টিতে রহস্যময় বলিয়া মনে হইল।

ষোল-শহর ইষ্টিশানের উপর মানবের কেমন এক মায়া বসিয়া গিয়াছে। প্রত্যেকটি সন্ধ্যার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে সে। সীতাই যেন দুঃখ-দৈন্য-ক্লিষ্ট প্রাণহীন এখানকার এই আবহাওয়ার মধ্যে বহিয়া চলিয়াছে স্বচ্ছ এক ঝরণা—সজীব অফুরন্ত এক প্রাণধারা। প্রভাতের মুখর কাকলির মত আনন্দে সে বুঝি রোজ ফাটিয়া পড়ে। খুশীর প্রচুরতায় সীতা অনেক সময় বনিয়া যায় নেহাৎ ছেলেমানুষ।

সীতাকে নিয়া মানব প্রত্যহ বাহির হইয়া পড়ে। বাহির যেখানে অসীম, অনন্ত; বদ্ধ ঘরের পাণ্ডুর চারটি দেয়ালের অপ্রচুরতায় হাঁপাইয়া উঠে মানব সেখানে। অনেকদূর চলিয়া যায় তাহারা দুজনে রেলের লাইন ধরিয়া। ঝিমাইতে ঝিমাইতে একখানা গুডস্ ট্রেণ রোজই যায় সে পথ দিয়া। একদিন কিন্তু সীতা সহসা বলিয়া উঠিল: 'পয়সা আছে?'

'কেন?'

'থাকে তো দাও বাপু, অতো কৈফিয়ৎ দেবার আমার সময় নেই।'

সীতার সবুর সহিল না। মানবের পকেটে হাত গলাইয়া দিয়া সে তাড়াতাড়ি বাহির করিয়া লইল একটি পয়সা। তারপর হালকা এক টুকরা মেঘের মত ছুটিয়া গিয়া পয়সাটী বসাইয়া আসিল লাইনের উপর। কহিল:

'কেন এবার বুঝবে মশাই। তোমাকে ডবল পয়সা করে দিচ্ছি, দেখো না।'

বেড়াইতে বেড়াইতে তাহারা আবার হয়ত কোনদিন ঢুকিয়া পড়ে সুদূর পল্লীর মধ্যে। ঘোমটা-পরা পল্লী-বধূরা ভিড় করিয়া দাঁড়ায় সীতাকে দেখিতে। সীতা কিন্তু কোমরে আঁচল জড়াইয়া ছুটিয়া যায় এক বুক ধান ক্ষেতের মধ্যে। গ্রীসের নিবিড় অরণ্যে ডায়েনা বুঝি হরিণের পিছু নিয়াছে! দুহাতে আধ-পাকা ধানের রাশি রাশি শীষ ছিঁড়িয়া সীতা তখন বিনুনী বাঁধে আপন মনে। মুখ তুলিয়া একসময় বলে:

'জানো, ধান-ক্ষেত আমি এখানে এসেই প্রথম দেখলাম।'

'বলো কি, ধান-ক্ষেত দেখো নি?'

'দেখবো কি করে? বাবা তো থাকতেন সেই পশ্চিমের এক শহরে। ধান-ক্ষেত সেখানে পাবো কোথায়?'

ধানের বিউনীটি অকারণে নাড়িয়া সীতা ঝুমুর ঝুমুর মৃদু এক শব্দ করিতে থাকে।

'বাবা আমাকে আবার চেয়েছিলেন বোর্ডিং-এ রেখে আসতে। হুঁ, গাঁ যেন আমার ভালো লাগবে না।'

'ভালো তো লাগবে। কিন্তু বাড়ি ফিরবে না? রাত কতো হয়েচে জানো?'

সীতা তাহার সুন্দর মুখখানি তুলিয়া ধরিল উপরে। আকাশের নিস্তব্ধ বুকে গোলাকার একটি চাঁদ উঠিয়াছে। শাদা কালো বিভিন্ন রঙের অনেকগুলি হাঁস আকাশে উড়িতে উড়িতে হঠাৎ কার ইঙ্গিতে যেন ডানা ছড়াইয়া থামিয়া গিয়াছে পটে-আঁকা একখানি ছবির মত।

সঙ্কীর্ণ গেঁয়ো পথ। এতটুকু রাত্রিতেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে নিঝুম হইয়া। তাহারা দুজন নিঃশব্দে পথ চলিতে লাগিল। সীতার উষ্ণ নিশ্বাস মানবের ডান গালের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল।

মধুচ্ছন্দা জীবনের একদিন অবসান হইল।

অপর ইষ্টিশানে মানব হঠাৎ বদলি হইয়া গেল। তাহার জায়গায় অপর লোক আসিয়াছেন।

ষোল-শহর ইষ্টিশান হইতে তাহাকে এবার হায়, বিদায় নিতে হইবে—কথাটী মানবের বুকে বিঁধিল খচ্ করিয়া।…মন্থর পা ফেলিয়া মানব তখন বাসায় ফিরিতেছিল। সরু এই গেঁয়ো পথ দিয়া—লোকের অবিরাম চলাচলে মাঝখানের ঘাস মরিয়া গিয়া ধুলির পুরু স্তর পড়িয়াছে; রাস্তার দুপাশে ফণিমনসা আর কেয়াফুলের ছোট ছোট ঝোপ। সে পথ দিয়া মানবকে আর যাওয়া-আসা করিতে হইবে না। -তাহার চলা বুঝি এবার ফুরাইয়া গিয়াছে!

হ্যাটটা টেবিলের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া মানব বসিয়া পড়িল ইজি চেয়ারে। বাসার প্রত্যেকটি ছোট-খাট জিনিস তাহাকে যেন আজ আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়। এক সময় বিছানার দিকে চোখ পড়ায় তাহার বুকের ভিতর সহসা কাঁদিয়া উঠিল হু-হু করিয়া। ওই বিছানাতেই একদিন সীতা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

সাড়ে তিনটার আপ্ প্যাসেঞ্জার সবেমাত্র ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, মানব বাসায় ফিরিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কাঁহার শ্রীহস্তের শোভন ছাপ সর্বত্র লাগিয়া আছে। ঘরের টেবিলের উপর এতদিন পড়িয়া-থাকা অব্যবহৃত তাহার টুপিটিকে কে আজ আবার তুলিয়া রাখিয়াছে 'পেগে' মানবের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না শোবার ঘরে ঢুকিয়া।

ধব-ধবে তাহার বিছানার উপর অকাতরে সীতা ঘুমাইতেছে। মানব কয়েক মুহূর্ত চোখ তুলিয়া তাকাইয়া রহিল সীতার দিকে। সত্যি, কি সুন্দর দেখায় সীতাকে ঘুমাইলে! পাতলা, রাঙা ঠোঁট দুটি তাহার ঈষৎ খুলিয়া গিয়াছে। পরিপূর্ণতার ইঙ্গিত স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার সর্ব অবয়বে। একখানি হাত বুকের উপর দিয়া বালিশের কাছে পড়িয়া আছে আর ডান হাতখানি অলস ভাবে বিছানার উপর। চাঁপার কলির মত তাহার দীর্ঘ আঙুলগুলি; নখগুলি শোভন ভাবে কাটা।

মানব ফিরিয়া যাইতেছিল নিঃশব্দে। কিন্তু জুতার শব্দে ঘুম সীতার ভাঙিয়া গেল। তাড়াতাড়ি সে উঠিয়া বসিল। রক্তিম কপোল দুটি আরও আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কথাগুলি সীতার মুখ হইতে যেন ঝরিয়া পড়িল।

'প্রসাদ, প্রসাদ গেলো কোথায় ?'

'তাকে দোকানে পাঠিয়েচি এই মাত্র, কেন ?'

'না, এমনি।' সীতা এবার মুখ তুলিবার চেষ্টা করিল; 'এমনি বলছিলাম। তুমি বাসায় থাকবে, ভেবেছিলাম। কৈ, দুপুরে তো তোমার কোন ডিউটি ছিল না।'

'না, ফার্ষ্ট থেকে আমাদের যে পুরোন টাইমিং বদলে গেচে।

'আমাকে তা বলো নি যে ? আর বাইরে কী রোদ্দুর বাপু, ওইটুকুন পথ হেঁটে আসতেই মাথাটা আমার ঝিম-ঝিম করছিলো।'...সীতা এবার সহজ হইতে পারিল। একটু পরে আবার কহিল; 'হ্যাঁ শোন।'

দাঁড়াইয়া সে পরনের শাড়িখানা ঠিক করিয়া লইল; 'যা বলতে আসা তাই যে বলা হলো না, আজকে প্লীজ একটু সকাল সকাল যাবার চেষ্টা করো, বুঝলে ?'

'ওঃ, নিশ্চয়। আমাকে কি যে ভাবো! আজ তোমার জন্মোৎসব—আমি তা ভুলতে পারি ?'

মধুর দিনের কত স্মৃতি মানবকে আজ বড় ব্যথিত করিয়া তুলিল।

না, বদ্‌লি সে হইবে না—কিছুতেই না।...পিছনে হাতের উপর হাত রাখিয়া মানব পায়চারি করিতে লাগিল চঞ্চল পদে। চাকরিতে ইস্তফা দিবে সে। মন হইল মানুষের দাস। ঠিক করিয়া নিয়াছে সে মনকে। ষোল-শহর ইষ্টিশান হইতে সে সরিতেছে না এক পা-ও। নদীর তীরে এখানকার ওই পাহাড়টির উপর একখানি ছোট কুটির বাঁধিতে সাধ যায় তাহার বড়। তারপর পরম সুখে সে আর সীতা—

ছি, সে এসব ভাবিতেছে কি ? মানব শুধাইল নিজেকে; ছি, সে এসব ভাবিতেছে কি ? শুনিয়া সীতা হয়ত হাসিয়া উঠিবে খিল খিল করিয়া। গলা ফাটাইয়া সে যা বাপু হাসে। সত্যি, সীতাকে সে ভালবাসে, তাই বলিয়া কি এতখানি দুর্বলতা প্রকাশ করা তাহার ঠিক উচিত হইবে ?

জানালায় সহসা সে মুখ বাড়াইয়া দিল: 'প্রসাদ, এই প্রসাদ!'

প্রসাদ উঠানে কাট চিরিতেছিল কুঠার দিয়া, ছুটিয়া আসিল।

'চা নিয়ে আসবো, বাবু ?'

'না, জিনিষ-পত্র সব গুছিয়ে নিয়েচিস্ তো ? রাত্রির গাড়িতেই যে আমরা আজ চলে যাবো।'

সন্ধ্যার তরল অন্ধকার তখন সবে মাত্র ডানা মেলিতেছে দিগন্তের কোল ঘেঁসিয়া। পশ্চিমের ওই দিগ্বধূটির কপালে কে যেন মাখাইয়া দিয়াছে টক-টকে এক তাল সিন্দুর।

তীব্র হুইসিল দিয়া ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। ইষ্টিশানের ব্যস্ততা-মুখর কোলাহল ক্রমশঃ মিলাইয়া আসিল। থামিয়া আসিল তাহার সব কলরব। ট্রেনের প্রতিপদে তখন বাজিয়া উঠিয়াছে অচিন এক সুদূর যাত্রার ছন্দ! মানব তাকাইয়া রহিল অনেক—অনেক দূরে; একটা ঘর—বাংলোর মত খড়ের একটা ছাউনী—প্রফেসর গুপ্ত যেখানে তাঁহার অলস বিশ্রামের তাঁবু পাতিয়াছেন—সেটা দেখা যায় কিনা। কিন্তু ট্রেণটা হঠাৎ এমন বাঁক ফিরিল—কিছুই আর দেখা গেল না। ভারী বিরক্ত হইল মানব। মন হইয়া গেল তাহার খারাপ—সিগারেট ধরাইল অবশেষে।



সম্পাদকীয়

আমি মাস দুয়েক আগে 'অলকা'য় লিখেছিলুম যে, এ যুগে বিলেতে একদল লেখক আছেন, যাঁদের লিখিত মতামতের সঙ্গে আমাদের মতামতের মিল আছে। মিল যে আছে তা আমরা তাঁদের লেখা কথাতেই দেখতে পাই।

সম্প্রতি Stafford Cripps নামক যে ইংরাজ ভদ্রলোক আমাদের দেশে এসেছিলেন, তিনি হলেন এই দলের একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। আর আমার বিশ্বাস তাঁর কথা বিলেতের সকলেই শোনে আর কেউ কেউ মানেও। এ বিশ্বাসের কারণ কি বলছি।

Cripps সাহেব বিলেতের জনৈক গণ্যমান্য লোক। প্রথমতঃ তিনি ধনী। ধনী লোককে সব দেশেই লোকে মান্য করে; করা উচিত কি না সে হচ্ছে স্বতন্ত্র কথা। দ্বিতীয়তঃ তিনি বড় ঘরের ছেলে। Lord (Parmour)-এর পুত্র ও উপরন্তু অসামান্য বিদ্বান ও বুদ্ধিমান। অন্ততঃ আইন সম্বন্ধে যে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান আছে তার প্রমাণ তিনি বিলেতে ব্যারিষ্টার-মহলে সর্ব্বপ্রধান। তিনি ব্যারিষ্টারী ক'রে বৎসরে কম-সে-কম ৩০ হাজার পাউণ্ড রোজগার করেন। তাঁর কথা জজে শোনে। এর কারণ, বোধ হয় তাঁর পিতা ইংলণ্ডের একজন চিরস্মরণীয় জজ ছিলেন।

তিনি একজন M. P. আর তিনি যদি Labourএর দলভুক্ত না হয়ে Conservative দলভুক্ত হতেন তাহলে তিনি যে আজ ইংলণ্ডের জনৈক প্রধান মন্ত্রী হতেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি ব্রিটীশ জনগণের উন্নতির জন্য খাটুনি কমানো ও মাইনে বাড়ানো ছাড়া অনেক জিনিষ চান যা বিলেতের Trade union চাইতে সাহস করে না ফলে Labour-এর দলও তাঁকে হজম করতে পারে নি। তিনি Socialist ত বটেনই উপরন্তু তিনি প্রায় communist সেদিন তিনি এই কলকাতা সহরে সাংবাদিকদের একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে Communism যথার্থ Socialism-এর কাছ-ঘেঁসে যায়। ফলে এ রকম নায়কের দ্বারা চালিত হওয়া ইংলণ্ডের শ্রমিকদের মনঃপূত নয়। যদি ইংলণ্ডে Labour Partyর কোন Forward block থাকত তাহলে তিনি সেই block-এর নেতা হতেন। বলা বাহুল্য এ হেন লোকের গায়ে Imperialism-এর গন্ধ মাত্রও নেই। Imperialism শব্দের অর্থ এই যে, স্বদেশের স্বার্থ ও গৌরব বৃদ্ধি করবার জন্য বিদেশের ধন-প্রাণ স্বদেশের অধীন করা।

ভারতবর্ষের এখন মুখ্য দাবী Independence এমন কি গান্ধী-শাসিত Congressও এখন ঐ একই অবস্থা কামনা করছেন, আর আমাদের মত নিরীহ ব্যক্তিদেরও কাম্য তাই।

এখন Independence লাভের উপায় কি? পলিটিশিয়ানরা সে উপায় নিশ্চয়ই তাঁদের বুকের লুকোনো পকেট থেকে তা করবেন! কেবল মাত্র মুখের কথায় আমরা স্বাধীন হব না। "বন্দেমাতরম্" গান সুরে বেসুরে গেয়েও নয়।

আমার মনে হয় যে, ইংলণ্ড এ-ক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে সায় না দিলে আমাদের চির-কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা সহজলভ্য হবে না। এমন কি ফরাসী বিপ্লবের মত বিরাট ব্যাপারও ঘটত না, যদি সে দেশের যুগপৎ শাসক ও শোষক সম্প্রদায় লোকমতের আধা-সহায় না হতেন।

ইংলণ্ডের জনগণের মন এ বিষয়ে যদি নারাজ হয় তাহলেও আমাদের আত্মবল হবার পথ অতিশয় দুর্গম হবে।

আমি মহাত্মা গান্ধীর মত 'change of heart' কথাটার উপর ভরসা রাখিনে, কারণ ও কথাটার কোন অর্থ নেই।

প্রসিদ্ধ ফরাসী নাট্যকার Moliere-এর একটি রসিকতা আছে; যা বিশ্বমানবকে সেকালেও হাসিয়েছিল—একালেও হাসায়।

জনৈক মূর্খ ব্যক্তি দায়ে পড়ে ডাক্তার হয়েছিল এবং রোগীর ডান দিকের বুকে তার heart পরীক্ষা করছিল। রোগী এই নকল ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করেন যে heart কি বাঁ দিকে থাকে না? ডাক্তার উত্তরে বলেন, হাঁ থাকত কিন্তু 'nons-avons change lint ce-la'। অর্থাৎ বাম মার্গের heartকে আমরা এখন দক্ষিণ মার্গে এনেছি।

Heart এরকম বদল আমাদের হবে না—ইংরাজদেরও হবে না। যা হতে পারে—তা হচ্ছে মতের বদল। মত জিনিষটে শুধু হৃৎপিণ্ড থেকে জন্মায় না, জ্ঞানবুদ্ধি অবস্থা প্রভৃতি—নানা জিনিষের সম্মিলনের ফলে মত বদল হয়। আর কোন দেশেই লোক-সমাজের পরিবর্ত্তন ঘটে না, যদি না যাদের মন উদার তারা পূর্ব্বমতের বদল ঘটায়। আজকের দিনে পৃথিবীর সকল দেশেই এমন সব মনীষী আছেন যাঁরা স্বজাতি লোককে অন্ধ ধারণা থেকে মুক্ত করতে চান। এবং কতকটা কৃতকার্য্যও হন।

আমি এই বলে আরম্ভ করেছি C. Cripps হলেন সেই দলের অন্যতম যাঁরা বিশ্বাস করেন যে ইংলণ্ডের রাজপুরুষদের মত ও মন বদলানো দরকার—ইংলণ্ডের স্বার্থরক্ষার জন্য—উপরন্তু ব্রিটীশ সাম্রাজ্যভুক্ত অপর দেশ সকলের উন্নতির জন্য। ছলে, বলে, কৌশলে পরের উন্নতির পথ রোধ করলেই যে নিজের অভ্যুদয়ের পথ আরও প্রশস্ত হয় এ কথা আজকের দিনে যাঁদের মাথায় মগজ আছে তারা কেউ বিশ্বাস করেন না। ছলে বলে কৌশলে স্বার্থ বৃদ্ধি করা হচ্ছে হিটলারি মত—আর Chamberlain যতই অক্ষম হন—Hitlerএর সহোদর ভাই নন্।

Cripps প্রভৃতি মনীষীদের মতামত ইংলণ্ডের মহামন্ত্রীরা গ্রাহ্য করবেন কিনা সে কথা আমরা বলতে পারিনে। আমরাও কথা কই অর্থাৎ মনের আকাশে অনেক ফুল ফোটাই, সে ফুল ঝরে যাবে কিম্বা তার ফল ফলবে—তা আমরাও জানিনে। গীতা বলেছে "কর্ম্মণ্যেব অধিকারস্তে মা

ফলেষু কদাচন।" এই উক্তি মেনে নিয়ে আমরা বকে যাই। আমাদের কথাতে আমাদের রাজনীতির পাণ্ডারা যেমন কর্ণপাত করেন না সম্ভবত বিলেতি লেখকদেরও কথা তেমনি নিস্ফল।

আমি বিশেষ করে Cripps-এর কথার উল্লেখ করছি কেননা তার সঙ্গে আমাদের মনের যেমন মিল আছে তেমনি বিলেতের অনেকের সঙ্গে মিল আছে।

প্রথমতঃ আমাদের সঙ্গে তাঁর মিল কোথায় তা বলছি। তিনি বলেছেন যে বর্ত্তমানে আমাদের একমাত্র কাম্য বস্তু হচ্ছে—Independence। কংগ্রেসেরও মত তাই; হিন্দু মহাসভারও মত তাই। আমি স্বরাজ অর্থে চিরকালই Independence বুঝেছি। Idealকে খাটো করবার কোন মানে নেই, কেননা খাটো করলে তা আর Ideal থাকে না। আর এই আকাশকুসুম ভূমিষ্ঠ হলেই দেশভেদে অবস্থা ভেদে realityকে মেনে নিয়ে তা বিভিন্নরূপ ধারণ করে এদেশে তা প্রথমে Dominion Status হবে। তাহলে Canada যে অর্থে স্বাধীন, Australia যে অর্থে স্বাধীন এ দেশও সেই অর্থে স্বাধীন হবে। আকাশকুসুম হচ্ছে মূলহীন ফুল—আর মর্ত্ত্যফুলের মূল—দেশের মাটিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং Independence ও Dominion Statusএর এস্থলে প্রভেদ হচ্ছে কথার প্রভেদ। দ্বিতীয়ত Cripps সাহেব বলেছেন যে, ভারতবর্ষীয় লোকদের সাম্প্রদায়িক প্রভেদ ভারতবর্ষে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত না হলে দূর হবে না। এ কথা আমি পূর্ব্বেও "অলকা"তে পাঠক-সমাজের কাছে নিবেদন করেছি।

Democracy হচ্ছে সেই রাষ্ট্রতন্ত্র যে পলিটিকালী বহুকে এক করে—প্রতি লোকের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ না করে। এ রকম প্রকৃষ্ট তন্ত্র যে হতে পারে ও হ'লে টেকসই হয় তার প্রমাণ, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি। যেখানেই জনগণ বিচ্ছিন্ন এবং পরাধীন, সেখানেই এই সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতা বেশী প্রকট ও রাজপুরুষদের কাম্য। ডিমোক্রাসীর একটি ফল হচ্ছে এই সাম্প্রদায়িকতার উচ্ছেদসাধন করা। ডিমোক্রাসীর অনেক দোষ থাকতে পারে কিন্তু দেশের শাসন-সংরক্ষণের দায়িত্ব যখন লোকের ঘাড়ে পড়ে, তখন লোকে নিজেদের ঐক্য অনুভব করতে বাধ্য হয়। এ একটি পরীক্ষিত psychological সত্য। আমার মতে—মুক্ত ভারতবর্ষের একমাত্র আদর্শ হচ্ছে ডিমোক্রাসী। সুতরাং তৃতীয় পক্ষ এ সাম্প্রদায়িকতা দূর করতে ব্যস্ত ন'ন।

Cripps সাহেব আরও এক কথা বলেছেন যে, আমরা স্বরাজ লাভ করবার পূর্ব্বে সে স্বরাজকে Socialist রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারব না। এ কথায় যারা Socialism-এর ধূয়ো ধরেছে তারা শুধু আমাদের স্বরাজলাভের বাধা সৃষ্টি করবে। আর Cripps সাহেব হচ্ছেন ঘোর Socialist এবং স্বদেশে Communist হিসেবেই গণ্য।

আমি এ প্রবন্ধে Socialism ও Communism সম্বন্ধে কোনও উচ্চ-বাচ্য করব না, কারণ তা করতে হলে ইউরোপীয় পলিটিক্সের গত দু'বৎসরের ইতিহাস লিখতে হয়, এবার তা করবার বিদ্যে আমার ঘটে নেই। এস্থলে বলতে সাহসী হচ্ছি যে আমার মতে Cripps-এর কথা সঙ্গত।

তিনি বলেছেন যে, তাঁর মত শুধু তাঁর নিজস্ব মত নয়, কিন্তু বর্ত্তমান ইংলণ্ডের অনেকের মত। বিলেতী সংবাদপত্র যদি সে মতের পরিচয় দেয়, তাহলে আমি বলি যে, তিনি আমাদের শুধু ভোগা দিতে এ দেশে আসেন নি। ইংলণ্ডের এই বিপদের দিনে সে দেশে অনেকের বিশ্বাস যে, এ

সময়ে ভারতবর্ষকে স্বরাজের পথে অগ্রসর না করলে বিলেতও তার স্বার্থ সহজে রক্ষা করতে পারবে না।

আমি Cripps সাহেবের মতামত সম্বন্ধে এত কথা বললুম তার কারণ অবশ্য এ নয় যে আমি তাঁকে ইংলণ্ডের Prime-Minister বলে ভুল করি। আজকাল যে ইংরাজি বুলিটি খবরের কাগজে প্রায়ই শুনতে পাই অর্থাৎ "deliver the goods" আমি জানি তা করবার ক্ষমতা Cripps সাহেবের বিন্দুমাত্রও নেই যদি কারও থাকে তো আছে বিলাতের রাজমন্ত্রীদের। আর Cripps যত বড় ব্যরিষ্টার হন না; তিনি এ Privy Council আমাদের পক্ষের "বাহাজ" করে জিততে পারবেন না। তবে আমাদের এ মামলার যে একটা আপোষ মীমাংসার সম্ভাবনা আছে তা এঁদের কথায় বোঝা যায়। আর এ যুগে আপোষ মীমাংসাই শ্রেয়। পূর্ব্বে International মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হত একমাত্র বাহুবলে। যেমন এখনও হচ্ছে ইংলণ্ড বনাম জার্ম্মাণীর মামলায়। এ উপায়ে মামলা ফতে করার পক্ষপাতী ইংলণ্ডের জনগণের অভিপ্রেত নয়, সুতরাং আমাদেরও পলিটিকাল মামলারও একটা আপোষ মীমাংসা হতে পারে। সুতরাং বিলেতে অনেকটা রাগ দ্বেষ হতে মুক্ত সেই সম্প্রদায়ের মত ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রীরা উপেক্ষা করতে পারবেন না অন্ততঃ এই আমার ধারণা। ভারতবর্ষে আমরা কি চাই, সে বিষয়ে আমরা অনেকেই একমত ও বিলাতে যাঁরা মনের কারবার করেন তাঁরাও যে আমাদের দাবী সঙ্গত মনে করেন এটাও একটা শুভ লক্ষণ।

দু'দিন আগে কলিকাতায় যে হিন্দু সভার বিরাট অধিবেশন হয়ে গেল সে সম্বন্ধে দুটি কথা বলতে চাই। এ সভা হরিসভা নয়, হরিজন সভাও নয়, ষোলআনা পলিটিকাল সভা।

আমাদের স্বরাজের দাবীর একমাত্র অন্তরায় যে অহিন্দু-সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক দাবী এই ব্যাপারের আলোচনা করবার জন্যই এই সভা আহুত হয়। ধরে নিন্ যে কংগ্রেস এর বিরোধী—তৎসম্বন্ধেও কংগ্রেসের মূল প্রস্তাবগুলির এ সভা সমর্থন করেছেন। Dominion Status আমাদের যে এখনই চাই ও Communal representation যে বাতিল করা চাই—এ বিষয়ে কংগ্রেস ও হিন্দুসভা একমত সুতরাং হিন্দু নামধারী আমরা সকলেই যে একমত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমি কংগ্রেসের খুব পক্ষপাতী নই, হিন্দু সভারও নই। কংগ্রেস ষোল আনা দক্ষিণাচারী আর হিন্দু-সভা প্রচ্ছন্ন বামাচারী। কিন্তু আমাদের শাসনকর্ত্তারা আমাদের অন্তত এ মার্গের দিকে দৃষ্টিপাত করতে বাধ্য করেছেন। Moslem League minority-কে প্রবল করতে চান, হিন্দু সভা majority আর কংগ্রেস এক মাত্র মহাত্মা গান্ধীকে—পরস্পরের ভিতর এই যা প্রভেদ। হেগেল প্রবর্ত্তিত ও মার্‌কস্ প্রচারিত জর্ম্মাণীর নব-ন্যায়ের ভাষায় বলা হয় যে Moslem League হচ্ছে thesis হিন্দুসভা antithesis এবং কংগ্রেস Synthesis।

কথাটা যে নেহাৎ বাজে নয় তার প্রমাণ, জিন্না-সাহেব ও সাভারকার নাকি আমাদের পলিটিকাল ভবিষ্যৎ নিয়ে এ আলোচনা করছেন। অন্ততঃ খবরের কাগজের মারফৎ এ কথা শুনেছি।

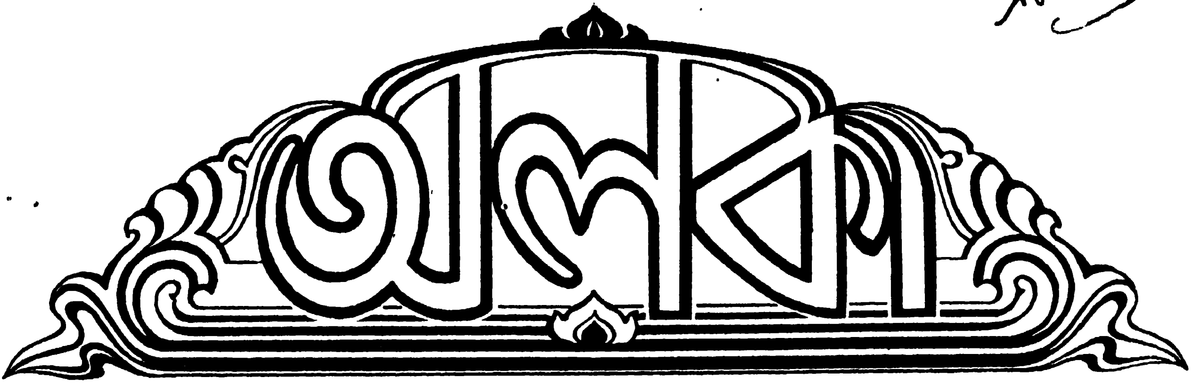
এ দুই বিরোধী পক্ষ যদি পরস্পর বাগ্‌বিতণ্ডার ফলে, কোনও আপোষ মীমাংসা করতে পারেন ত তাঁরা মহাত্মার সঙ্গে একপথাবলম্বী হবেন, কেননা মহাত্মাজি হচ্ছেন মূর্ত্তিমান আপোষ।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত

শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও
৬৬।১ এল্‌গিন রোড হইতে প্রকাশিত



কালি কলমের কাজ — শীতের শেষে — শিল্পী—মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত



দ্বিতীয় বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩৪৬ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

ভারতীয় তাম্র-ব্রোঞ্জ্-যুগ

শ্রীকুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী

প্রস্তর-যুগের সম্বন্ধে অন্যান্য দেশে অনেক গবেষণা হইয়াছে। এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আমাদের দেশে কোন চর্চ্চা এতদিন হয় নাই। সম্প্রতি (গত ১৯৩৫ সালে) অধ্যাপক ডি. টেরা উত্তর ভারতে ভূতত্ব ও নৃতত্ব বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে আসিয়া কাশ্মীর ও হিমালয় অঞ্চলে অনেক বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। ভূপৃষ্ঠে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্র শস্ত্র পাইয়া আমরা ঐগুলিকে আদি প্রস্তর-যুগ (Palaeolithic) ও নব প্রস্তর-যুগের (Neolithic) দ্রব্য বলিয়া ধরিয়া আসিতেছি। কারণ অন্যান্য দেশে খননলব্ধ স্তরীকরণের সাহায্যে প্রাপ্ত আদি যুগের ও নব যুগের দ্রব্যের সঙ্গে আমাদের দেশের প্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্রের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে খনন দ্বারা আমাদের দেশেরও আদি যুগের সভ্যতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের যে যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে, এই বিষয়ে এখন আর মতদ্বৈধ নাই। প্রস্তর-যুগের আলোচনা বিষয়ে আমাদের দেশে নবযুগের সূচনা হইয়াছে। ইহা আশা ও আনন্দের কথা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন এবং যথেষ্ট কাজও করিতেছেন।

এতদিন আমাদের দেশে প্রাগৈতিহাসিক বিষয়ে যেটুকু কাজ হইয়াছে, তাহা শুধু ধাতু যুগ (metal age) নিয়াই। তাহাও আবার মাত্র ১৭।১৮ বৎসর পূর্ব্বে—৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক মোহেন্-জো-দড়ো আবিষ্কারের পরে শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে আলোচনার বিষয় হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে বাংলাদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া বেলুচিস্থান পর্য্যন্ত উত্তর ভারতের নানা স্থানে তামার ও ব্রোঞ্জের নানারূপ দ্রব্য ঘটনাচক্রে আবিষ্কৃত (chance finds) হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের অধিক সংখ্যক দ্রব্যই তাম্রনির্ম্মিত ছিল বলিয়া ভিন্সেন্ট স্মিথ (Vincent Smith) প্রমুখ পণ্ডিতেরা প্রস্তর-যুগের পর উত্তর ভারতে খাঁটি তাম্র-যুগের পত্তন হইয়াছিল এবং কোন দিন ইউরোপের ব্রোঞ্জ যুগের মত কোন যুগের প্রভাব এখানে হয় নাই বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহার এই

অনুমান পণ্ডিত সমাজে অবিসংবাদিত সত্য বলিয়া ধারণার সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পায় বিশুদ্ধ তামার এবং তামা ও টিনের সংমিশ্রণে প্রস্তুত ব্রোঞ্জ নামক মিশ্রিত ধাতুর শত শত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য দেখিয়া ঐ ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখানে ব্রোঞ্জের নির্ম্মাণ-কৌশল প্রাচীন কাল হইতেই জানা ছিল। যখন টিন পাওয়া যাইত তখন তামার সঙ্গে উহা মিশাইয়া অধিকতর শক্ত ব্রোঞ্জ তৈয়ার করিয়া তাহার দ্বারা দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা হইত।

মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পার অসংখ্য তাম্র ও ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত দ্রব্যসম্ভার আবিষ্কার হওয়ার পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথম ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে কানপুরের নিকটবর্ত্তী বিঠুর নামক স্থানে তামার একটি দন্তুর বর্শা (harpoon) আবিষ্কৃত হয়। তারপর ১৮২৯ সালে সংযুক্ত প্রদেশে ফতেহগড় নামক স্থানে তামার কয়েকটি তরবারি পাওয়া যায়। এইরূপ আরও কয়েকটি অস্ত্র বিঠুর হইতে প্রাপ্তির সংবাদ ১৯১৫ সালে হীরানন্দ শাস্ত্রীও প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৬৮ সালে মৈনপুরী, ১৮৯২ সালে কোনাম (প্রাচীন কৌশাম্বী) এবং ১৮৯৬ সালে বিজনোর জেলার রাজপুর প্রভৃতি স্থান হইতেও নানা জাতীয় অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। বুলেণ্ড্ সহর, হাজারিবাগ, পালামৌ এবং মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থান হইতেও নানারূপ দ্রব্য আবিষ্কারের কাহিনী ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। উল্লিখিত নানা স্থানে বিচ্ছিন্ন ভাবে ঐ সকল জিনিষ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ১৮৭০ সালে মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলার গাঙ্গেরিয়া নামক স্থানে প্রাপ্ত রৌপ্য ও তাম্র নির্ম্মিত অসংখ্য দ্রব্যের আবিষ্কারই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এইখানে এক সঙ্গে ৪২৪টি পেটা তামার অস্ত্রশস্ত্র ও ১০২টি রূপার পাতের নানারূপ দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। সিন্ধুপত্যকা ও বেলুচিস্থানের বিভিন্ন স্থানেও ১৯১৭ সালের পূর্ব্বে যে সব জিনিষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার বিষয় কোগিন্ ব্রাউন্ (Coggin Brown) আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার তালিকায় নানারূপ জিনিষের নাম দেখা যায়। তন্মধ্যে নানা জাতীয় কুঠার, তরবারি, দন্তুর বর্শা, সাধারণ বর্শা ও বাটালি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে এক রকম চওড়া কুঠার আছে। এইগুলির আকৃতি নবপ্রস্তর-যুগের পাথরের চওড়া কুঠারের মত। বোধ হয় ধাতু-যুগের শিল্পীরা পূর্ব্ববর্ত্তী কালের প্রস্তর-শিল্পীদের চওড়া কুঠার হইতে নিজেদের শিল্পের আদর্শ সংগ্রহ করিয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে ধাতু দিয়া যে অসংখ্য অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতির সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার সমস্তেরই মূল প্রেরণা প্রস্তর-যুগের শিল্পী হইতে সংগৃহীত না নিজেদের কল্পনাপ্রসূত সে বিষয় এখনও সমস্ত তথ্য অবগত হইতে পারা যায় নাই। ছোট নাগপুর প্রভৃতি প্রাচীন তামার কারখানাতে অনুসন্ধান করিলে এই প্রশ্নের কোন সমাধান হয় কিনা দেখা যাইতে পারে।

উল্লিখিত বিভিন্ন জাতীয় তাম্রনির্ম্মিত দ্রব্যের আবিষ্কার সাধারণতঃ উত্তর ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দক্ষিণ ভারতে প্রস্তর-যুগের পর তাম্র-যুগের পত্তন না হইয়াই সেই যুগের সূত্রপাত হইয়াছে বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। অদ্যাবধি যে সব আবিষ্কার হইয়াছে, তাহাতে এই অনুমানের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সেখানে তামা ও ব্রোঞ্জের কোন প্রাচীন জিনিষ আবিষ্কৃত হয় নাই। ঐ অঞ্চলে খননের ফলে প্রাগৈতিহাসিক লৌহ-যুগের নানারূপ দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে।

উত্তর ভারতে গঙ্গা-যমুনা-উপত্যকা বৈদিক আর্য্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থল ছিল। ঋগ্বেদে "কৃষ্ণায়স্" বা লৌহের উল্লেখ নাই, যদিও অন্যান্য বেদে উহার বিষয় জানিতে পারা যায়। ঋগ্বেদে

"অয়স্"-এর কথা স্থানে স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। এই "অয়স্"ই তাম্র বা ব্রোঞ্জের নামান্তর বলিয়া অনেকের মত। কাজেই ঋগ্‌বেদের সভ্যতা তাম্র বা ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা, এই অনুমান করা বোধ হয় অবান্তর হইবে না। উত্তর ভারতের গঙ্গা যমুনা উপত্যকা কিংবা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে যে সকল তামা বা ব্রোঞ্জের অস্ত্রশস্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহাদের সঙ্গে কি বৈদিক আর্য্যদের কোন সম্বন্ধ আছে? ঋগ্‌বেদের আর্য্যরাও মানুষই ছিলেন, তাঁহারাও আমাদেরই মত পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্ম্ম বিষয়ক কার্য্য নিয়া ব্যাপৃত থাকিতেন। অন্তর্বিপ্লব ও বহির্বিপ্লব দমন করিবার জন্য সময় সময় তাঁহাদেরও অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্য নিতে হইত। নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহারের জন্য তাঁহাদেরও পাথর, মাটি ও ধাতু নির্ম্মিত দ্রব্য ছিল। বেদ বেদান্ত ও পুরাণাদি ছাড়াও এত বড় সভ্য জাতির অস্তিত্বের আরও অনেক প্রমাণ নিশ্চয়ই বিদ্যমান ছিল। ইহারা এখন হয়ত নানা স্থানে আত্মগোপন করিয়া আছে। শ্লিমান্ (Schliemann) কিম্বা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত কোন ভাগ্যবান কর্ম্মীর খনিত্রের আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে ইহারা আত্মপ্রকাশ করিবে। আমরা ইতিপূর্ব্বেও এই বিষয় আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, গঙ্গা-যমুনা-উপত্যকায় স্থানে স্থানে ভালরূপ খননের ব্যবস্থা করিলে বৈদিক যুগের উপাদান পাওয়ার খুবই সম্ভাবনা আছে।

মোহেন্-জো-দড়ো হরপ্পা ও সিন্ধু প্রদেশের আরও অনেক স্থানে তাম্র বা ব্রোঞ্জ যুগের অসংখ্য দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। এখানে আমরা এই সভ্যতাকেও তাম্র বা ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতার অন্তর্ভুক্তই করিলাম। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা তাম্র-প্রস্তর-যুগের সভ্যতা। প্রস্তরের ব্যবহার দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। আর তাহার স্থানে তামার ব্যবহার বাড়িতেছে, এই সময়কে তাম্র-প্রস্তর যুগ বলা হয়। তামার প্রভাব ক্রমশঃ বাড়িতেছে বলিয়া ইহাকে তাম্র বা ব্রোঞ্জ যুগের গণ্ডীর মধ্যে রাখিয়া তুলনা-মূলক আলোচনা করা যাইতে পারে। এই প্রবন্ধের প্রথমাংশে ভারতের তাম্র-যুগের সভ্যতাদেহের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অস্থি-খণ্ড নিয়া আমরা আলোচনা করিয়াছি। মোহেন্-জো-দড়ো-হরপ্পাতে ঐ যুগের সভ্যতার সবল মেরুদণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মেরুদণ্ডকে আশ্রয় করিয়া ভারতের তাম্র-যুগের বিশাল সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। এখানে আমরা ঐ সুরুচিসম্পন্ন সভ্য জাতির দুই চারিটি অস্ত্রশস্ত্রের নাম উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিলে ঐ অতুলনীয় সভ্যতার প্রতি অবিচার করা হইবে। ঐ উন্নত সভ্যতায় সুন্দর সুশৃঙ্খল নাগরিক জীবনের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। মোহেন্-জো-দড়ো যেন এই সভ্যতার আদর্শ বা মডেল (model); এখানেই ঐ সিন্ধু সভ্যতার যথোচিত স্ফুরণ ও পরিণতি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ সহস্রকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে (যথা ইজিপ্ট, মেসোপটোমিয়া ও ক্রীট প্রভৃতি স্থানে) তাম্র-যুগের যে সভ্যতা দেখা যায় এখানেও অনুরূপ সভ্যতাই ছিল, কিন্তু নগরপরিকল্পনা ও নির্ম্মাণকৌশলে মোহেন্-জো-দড়োর শিল্পী ও পূর্ত্তকারেরা যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তদানীন্তন ভারতের এই সভ্যতা জগতে যে বিস্ময়ের ও ঈর্ষার সূচনা করিয়াছিল ইহা মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পাতে লব্ধ উপাদানের সাহায্যে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। মোহেন্-জো-দড়ো, হরপ্পা ও ৺ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত সিন্ধু প্রদেশের বিভিন্ন স্থানের প্রাচীন সংস্কৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

অবস্মৃত

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

চাপরাশি খবর দিল ; ফটোগ্রাফার এসেছে।

এ-পাশে ও-পাশে কাগজ ছড়িয়ে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে' মিস্টার জগজ্জ্যোতি সরকার তন্ময় হয়ে কি লিখছিলেন। লিখছিলেন কতকগুলি গোপনীয়, ইংরিজি করে' না বললে বোঝা যাবে না, কনফিডেনশ্যিয়াল রিপোর্ট, তাঁর নিম্নতন কর্ম্মচারীদের সম্বন্ধে। এক কেতা যাবে উপরে, এক কেতা থাকবে এখানে, টিনের বাক্সে, তাঁর পরবর্তীর জন্য। কারু সম্বন্ধেই কিছু খারাপ না লিখতে হয়, অথচ প্রত্যেকটাতেই ভাষার বেশ তারতম্য থাকে, তারই চেষ্টায় তাঁকে একটু অসহিষ্ণু দেখাচ্ছে। কিন্তু অন্তত আজকের দিনে অসহিষ্ণু তিনি হবেন না। কেননা তিনি জানেন, জেনে এসেছেন, এই একটু ভাষার উনিশ-বিশেই একেকটা জীবনের আকাশ-পাতাল ঘটেছে। না, কাউকেও তিনি আজ ঘা মারবেন না, এমন-কি নিরঞ্জনকেও নয়, সেই উদ্ধত বুদ্ধিদর্পিত ছোকরা, চিরদিন সমানে যে তাঁর মুখের সামনে বসে' সিগারেট টেনেছে, ধুতি-পাঞ্জাবি ছাড়া প্যান্ট-কোটে কোনোদিন যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেনি, আর তাঁরই এক হুকুমের বে-আইনিত্ব যে উপরওয়ালার কাছে একবার জাহির করে' দিয়ে তাঁর নাকালের একশেষ করে' ছেড়েছিলো, তাঁরই উদ্গারিত হুকুমটা নিঃশব্দে তাঁকেই গলাধঃকৃত করতে হয়েছিলো শেষকালে। ইচ্ছে করলেই পারেন তিনি এখন তাকে বসিয়ে দিতে, কিন্তু বেদনার সঙ্গে করুণা মিশিয়ে তিনি ভাবলেন, দরকার কী। হঠকারী, দুর্বিনীত ছোকরা, বিস্তীর্ণ জীবন তার সামনে, আর তিনি চিরদিনের মতো তল্পিতল্পা গুটিয়ে সরে' পড়ছেন, কী হবে আর তাকে কলমের ডগায় খোঁচা মেরে? আগে, অনেক আগে, যখনো তিনি এমন কার্পেটে-মোড়া খাস-কামরা পাননি, তাঁর মনে পড়লো এবং মনে করে' তিনি ঈষৎ হাসলেন, সমস্ত বছর কী তোড়েই না তিনি রাজ্যশাসন করেছেন, আর মেয়াদের শেষে তাঁর বদলির সময় তাড়িত প্রজারা যখন তাদের পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে এসেছে, সবাইকে তিনি সেই শোকম্লান সুকোমল মুহূর্তে মুক্তার মত ছোট-ছোট সব সার্টিফিকেট দিয়েছেন; কাউকে বলেছেন সাধু, কাউকে বলেছেন পরিশ্রমী, কাউকে বলেছেন অনুগত। খবরের কাগজের obituary-র মতো। সবাই ধার্মিক, সবাই দানশীল, সবাই চরিত্রবান। কাল হাত থেকে তাঁর রাজদণ্ড খসে' যাবে, হাতের কলমটার দিকে তাকিয়ে তিনি একটা ছোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, তবুও আজকে, শেষ দিনে, কারু তিনি ক্ষতি করবেন না। না, কারু ক্ষতি তিনি করেনওনি কোনো দিন। খুনীকে পর্যন্ত দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছেন, ফাঁসি দেন নি।

চাপরাশির কথায় মিস্টার সরকারের চমক ভাঙলো। বুঝলেন সময় ক্রমশই ফুরিয়ে আসছে। কয়েক বছর ধরেই তিনি সেটা অনুভব করছেন। তবু সময় একেবারে ফুরোবার আগে কেউ কাঁদে না, এখনো কিছু বাকি আছে। সদলবলে ফটো তুলতে হবে। তারপরে পার্টি আছে বিকেলে।

শেষ দস্তখৎ করে' কাগজের দিকে খানিকক্ষণ তিনি তাকিয়ে রইলেন; এই তাঁর শেষ দস্তখৎ। কাল থেকে তাঁর আর দস্তখৎ নেই। কাল থেকে তাঁর নাম জগজ্জ্যোতি সরকার, ঠাণ্ডা, মৃত একটা

নাম, একান্ত অর্থহীন ; জ্বলন্ত জে. সরকারের এইখানেই সমাধি। কাল থেকে তিনি আর মিস্টার নন, কাল থেকে আবার সেই বাবু। বুকের ভিতরটা কেমন তাঁর ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকলো। কাগজটা কুড়িয়ে নিয়ে আবার আরেকটা জায়গায় তিনি দস্তখৎ করলেন।

'আর সবাই এসেছে ?'

'দেখে আসি।'

'হ্যাঁ, সবাই এলে পরে আমাকে খবর দেবে। আর তোমাদের নতুন যে সব লিভারি এনে দেয়া হয়েছে সেই সব পরে নাও। আমি আসছি।'

মিস্টার সরকার পকেট থেকে কাঁচির প্যাকেটটা বার করে' একটা সিগারেট ধরালেন। কাগজ-পত্রগুলো ফাইলে পরিপাটি করে' গুছোলেন—হ্যাঁ, আর-সবাই এসে জড়ো হবার আগে তিনি সাত তাড়াতাড়ি গিয়ে বসতে পারেন না ফটোগ্রাফারের লেনসের সমুখে, যার আসন প্রথমে তাকেই যেতে হয় শেষে, এই হচ্ছে নিয়ম, এই হচ্ছে সম্ভ্রান্ততার পরিচায়ক। এবং, মনে রাখতে হবে, আজো তিনি সম্ভ্রান্ত। লাল ফিতে দিয়ে পরিপাটি করে' বাঁধলেন তিনি ফাইলটা। তারপর সেটাকে বাক্সে রেখে শেষ চাবি দিলেন। টিপলেন কলিং-বেল। শব্দটা তাঁর বুকে গিয়ে লাগলো। কেননা, মনে হলো, কাল থেকে তাঁর চাকর-বাকরকে গলা খুলে চেঁচিয়ে ডাকতে হবে।

'বাক্সটা আপিসে দিয়ে এসো।'

মিস্টার সরকার সাজ করতে উঠলেন, পরিপূর্ণ সাজ। মেয়ে সধবা মরলে যেমন করে' তাকে সাজায়, তেমনি।

আয়নায় কেমন যেন তাঁকে একটু বুড়োটে দেখাচ্ছে। হয়তো সেটা এ ক'দিনের দুশ্চিন্তা ও অনিদ্রার ফল। অন্যথা বুড়ো তাঁকে কে বলবে ? কাগজে-কলমে দু' বছর তাঁর কম থাকলেও এ ক' দিন খেটেছেন তিনি অসুরের মতো, মেরুদণ্ডটা এক ইঞ্চি বাঁকা করেন নি। খাস-কামরার এক প্রান্তে লম্বায়িত একটা ইজিচেয়ার পড়ে' আছে, কোনো শিথিল মুহূর্তে সেটাতে তিনি গা এলিয়েছেন কিনা মনে পড়ে না। সেই ভেবে এখন তাঁর অনুতাপ হলো। কাল থেকে বাড়িতে যে তিনি ঢালা ফরাসে অপর্যাপ্ত গড়াগড়ি দিতে পারবেন সেই চিন্তায় তাঁর সুখ নেই। নেপোলিয়নের মতো ঘোড়ার পিঠে চড়ে' ঘুমুতে না পারলে শান্তি কোথায় ?

অনায়াসে আরো পাঁচটি বছর তিনি পুরোদমে খেটে যেতে পারতেন, কিন্তু কে শোনে কা'র কথা! এক্স্টেনশ্যন-এর জন্যে দরখাস্ত করেছিলেন, গ্রাহ্য হয় নি। অথচ তাঁর ফাইল ঘেঁটে দেখ, জীবনে ক'টা দিন তিনি ছুটি নিয়েছেন! এত উন্মত্ত ছিলেন তিনি এই কাজ নিয়ে। এত ভাল বাসতেন এই কাজ। এজলাসে বসে' এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর ঘুম পায়নি। তাঁর মুখে কখনো কেউ শুনতে পায়নি কাজ শেষ হয়েছে, কাজ কখনো শেষ হয়! কাজ কেউ করতে করতে শেখে, কেউ-বা শিখে এসে কাজ করে ; উকিলের মুহুরিরা আগের দলে, আর. তিনি পরের, তবু রাম-শ্যামের বেলায়ও যা, তাঁর বেলারও তাই, সেই অনতিক্রম্য পঞ্চান্ন বছর! আঙুল দিয়ে শুভ্রাগ্র গোঁফগুলি তিনি একবার আঁচড়ে নিলেন। এই গোঁফে এমন একটা নজির প্রচ্ছন্ন ছিলো যে তিনি মিস্টার হয়েও সেটাকে উৎপাটিত করেন নি। কিন্তু, মিস্টার সরকার আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, সবই ললাট।

'মে আই কম্ ইন্, স্যর ?' পর্দার ও-পার থেকে কে বললে।

'আরে, সুধাময় যে। এসো, এসো। আজকে কি আর মে আই কম্ ইন্, মে ইট প্লিজ্ ইয়োর টিয়োর আছে? সব ফুরিয়ে গেছে।' ফুরোবার ভাব দেখিয়ে মিস্টার সরকার তাঁর চেয়ারে বসে' পড়লেন; 'যাত্রাদলের পোষাক ছেড়ে ভীম বসেছে এখন গাঁজা টানতে।'

সুধাময় এখানকার এক আধা-বয়সী উকিল, প্রায়-উদিত। তাকে সরকার একটু খাতির করতেন—নেপথ্যে।

'কই, পোষাকও ছাড়েন নি, হাতেও সিগারেট। ভীমসেনত্ব তো এখনো জাজ্বল্যমান।'

'আরে ভাই, আসল যে গর্জন, তাই আর নেই। চার্জ দিয়ে দিয়েছি। কাউকে আর বসাতেও পারিনা, কাউকে আর খসাতেও পারিনা।' শুকনো গলায় সরকার হেসে উঠলেন। বললেন, 'কি, ফটোতে যাচ্ছ তো সব ?'

'তা যাচ্ছি,' সুধাময় আমতা আমতা করে' বললে, 'কিন্তু তার আগে আমার একটা কাজ ছিল।'

'কী কাজ ?'

সুধাময় পকেট থেকে এক তাড়া কাগজ বের করলো। বললে, 'আমাকে একটা সার্টিফিকেট দিতে হবে। বেশ ভালো করে'।

'সার্টিফিকেট!' মিস্টার সরকার অবাক হয়ে গেলেন: 'আমার আবার সার্টিফিকেটের দাম কী! কাল থেকে আমি যারপরনাই সাধারণ—শ্রীজগজ্জ্যোতি সরকার। বাড়ির গায়ে নেম-প্লেটে নাম খোদাই করে' না রাখলে পৃথিবীতে কেউ আমাকে চিনতে পারবে না। আর চিনলেই বা কি, মানবে না কেউ।'

সেটা যে কী ভয়ঙ্কর দুঃখ সুধাময় তা বোঝবার ভান করলো। বললে, 'কাল থেকে। কিন্তু আজো আপনি স্ব-মহিমায় সমুজ্জ্বল।'

'চার্জ দিয়ে দিয়েছি যে। এই যে ছটা দেখছ সেটা সূর্য অস্ত যাবার পরে সন্ধ্যাচ্ছটা।'

'পাঁজির পাতায় লেখা থাকবে না সূর্য আজ কখন অস্ত গিয়েছিলো ?' সুধাময় হাসলো।

'কিসের সার্টিফিকেট ?'

'আর কিসের! একটা চাকরির।'

'চাকরি! চাকরি করতে যাবে তুমি কোন দুঃখে ?'

'যে দুঃখে এই চাকরিটা আপনি আজ ছেড়ে যাচ্ছেন।' সুধাময় হাসলো: 'চাকরিটা লোভনীয়।'

'দেখি—'

মিস্টার সরকার কাগজপত্রগুলি অভিজ্ঞ-অভ্যস্তের মতো নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগলেন। উড়িষ্যার কোন স্টেটে দেওয়ানের কাজ। মাইনেটা বেশ মোটা ও তৈলাক্ত। সার্টিফিকেটও জোগাড় হয়েছে মন্দ নয়। মুরুব্বিও নাকি আছে।

'হবে ?' মিস্টার সরকারের প্রশ্নটা সন্দেহসূচক।

'দেখি চেষ্টা করে। কিছু বলা যায় না।'

না, কিছুই বলা যায় না। নির্ভুল যা জিনিষ তাও যে উলটে যায় এ তো তাঁর নিজের জীবনে স্বচক্ষে দেখা। মামলায় লোকে যে কেন অদৃষ্টবাদী হয়, মন্দিরে পূজো আর দরগায় সিন্নি দেয়, এ বুঝতে তাঁর আগে কষ্ট হতো। পরে বুঝেছেন, কিছুই বলা যায় না। তাঁর অদৃষ্ট মন্দ বলে' আর কারু অদৃষ্ট প্রসন্ন হবে না এটা নিছক মিথ্যা কথা। আর, তাঁর উপকার কেউ না করলেও অন্যের উপকার করতে তিনি এক চুলও কুণ্ঠিত হবেন না, যদি উপকার তাতে হয়। এখনো হয়তো সময় আছে।

ব্লটিং-প্যাডের তলা থেকে তিনি একখানা চিহ্নাঙ্কিত চিঠির কাগজ বের করলেন। তারপরে যা লিখলেন, তাতে লেখককে যদি কোনো মূল্য দেয়া হয়, তবে উড়িষ্যা ছেড়ে গোটা ভারতবর্ষেরই দেওয়ানিটা সুধাময়কে ছেড়ে দেওয়া উচিত।

কে এসে বললে, 'সবাই এসেছেন।'

ত্রস্তভঙ্গিতে সরকার উঠে পড়লেন। বললেন, 'চলো হে চলো, রোদ চলে যাচ্ছে।' পরের মুহূর্তে মুখ তাঁর ভারি কাতর দেখালো: 'আর এই রোদটুকু চলে' গেলেই তো অন্ধকার। বড্ড কেমন সকাল সকাল মনে হচ্ছে না?'

'কিন্তু আপনার এই অন্ধকারের অর্থই তো আরেকজনের আলো।' সুধাময় হাসিমুখে অথচ নিষ্ঠুরের মতো বললে, 'আপনি চলে যাবেন মানেই তো আরেকজন আসবে। পথ জুড়ে আর কত পড়ে থাকবেন? একটু নতুন রোদ, নতুন রক্ত আসতে দিন। বাইরে কত ছেলে দাঁড়িয়ে আছে।'

প্রথমে একটা দলবদ্ধ ফটো তোলা হলো। মৃতা সধবার যেটুকু শোভা বাকি ছিল সেই ফুলের মালা উঠলো গলায়। পরের ফটোটা মিস্টার সরকারের একলার, আবক্ষ।

পার্টির উদ্যোক্তারা তাঁকে ঘিরে ধরলো, ঠিক বিকেল সাড়ে পাঁচটায় যেতে হবে। সাড়ে ছটায় বায়স্কোপ কোম্পানির শো, তার আগে হল তাদের খালি চাই।

'দাঁড়াও, বাড়ি গিয়ে এগুলো ছেড়ে ভদ্রলোক হই।' সরকার গোঁফের আড়ালে ম্লান একটু হাসলেন। পরে ঈষৎ বিরক্তির সুরে বললেন: 'এত অল্প সময়ের জন্যে বায়স্কোপ-হল ভাড়া নিতে গেলে কেন? কোথাও একটা শামিয়ানা টাঙিয়ে নিলেই হতো।'

ঘুরে ঘুরে এর ওর সঙ্গে তিনি দেখা করতে লাগলেন। মুখ অসম্ভব বিষণ্ণ, চোখ বাষ্পাকুল, ডান হাতের তালুটা ঘর্মাক্ত—সবাইকে তিনি ছেড়ে যাচ্ছেন বলে নয়, চাকরিটা ছেড়ে যাচ্ছেন বলে।

বাড়ি যাবেন বলে তিনি তাঁর গাড়িতে এসে উঠলেন। আর ঘোড়ার গাড়ি নয়, দস্তুরমতো স্ট্যাণ্ডার্ড—যদিও সেকেণ্ডহ্যাণ্ড। দূর থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যায় শুধু হর্ন শুনে। তাতে দুঃখ নেই, কেননা তাঁর চেহারা দেখেও তো লোকে বুঝতে পারে যে চাকরিটাও তাঁর সেকেণ্ডহ্যাণ্ড। দুঃখ হচ্ছে এই, গাড়িটা আর রাখা যাবে না।

বাড়ির সামনে আসতেই বুকটা তাঁর ভেঙে গেল, এই বাড়ি তাঁকে কাল ছেড়ে দিতে হবে। কোলকাতার লেক-অঞ্চলে তিনিও বাড়ি করেছেন বটে, কিন্তু সেটা শুধু একটা বাড়ি, ইট কাঠ দিয়ে তৈরি, এরকম একটা দুর্গ নয়, যা তৈরি ভয় দিয়ে ভক্তি দিয়ে সম্ভ্রম দিয়ে। আর, অদৃষ্টে সুখ না থাকলে, নিজের বাড়িও ভোগ করা যায় না। বাড়িটা তিনি ভাড়া দিয়েছিলেন এক মাদ্রাজীকে,

অনেক টাকায়। নোটিশ দিলেও সে বাড়ি ছাড়ছে না, বলছে আরো কিছু দিন সময় চাই। মিস্টার সরকার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, শেষকালে কিনা তাঁকেই বাদী হয়ে সাক্ষীর কাটগড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

প্যাকিং প্রায় শেষ, শুধু নিচে ড্রয়িং-রুম আর উপরে শোবার ঘরটা ছাড়া। খাট খুলে ফেলে রাতের বিছানাটা মেঝেয় পাততে গৃহিণীর কষ্ট হচ্ছে। আর, এখনো, যবনিকা পড়ে গেলেও, গ্রীন-রুমে কেউ কেউ আসতে পারে ভেবে ড্রয়িং-রুমটা গুটোনো হয়নি। শ্মশানে পুড়িয়ে আনার পর লোক যেমন মুখে বাড়ি ঢোকে মিস্টার সরকারের তেমনি মুখ।

তিনি ড্রয়িং-রুমেই প্রবেশ করলেন। সমস্তই ঠিক আছে, পিতলের ডাবোর থেকে ব্র্যাসোর কৌটোটি পর্যন্ত। কেবল মাঝখান থেকে তিনিই বেঠিক হয়ে গেছেন। দুটো ছেলে, একটাও মানুষ হয়নি, একটা ঢুকেছে ফিল্মে, আরেকটাকে স্বদেশী ব্যাঙ্কে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন বহু টাকা আমানত দিয়ে, ব্যাঙ্কটি গণেশ উলটেছে, ছোট একমাত্র মেয়েটার যেখানেই সম্বন্ধ করতে যান, বিশ হাজারের কম কেউ হাঁকে না। এর পর তাঁর বৈঠকখানা ঘরের কি চেহারা হবে কল্পনা করে বুক তাঁর কয়েক ইঞ্চি দমে গেল। গৃহিণীর ইচ্ছে এসব আসবাবপত্র তিনি বিক্রি করে দিয়ে যান—মায় মোটরগাড়ি, যেমন তিনি পুরানো খবরের কাগজ, কম্পাউণ্ডের ঘাস, বাগানের বাঁধাকপি বিক্রি করেন। নইলে এগুলো নিয়ে তিনি কোথায় যাবেন, যখন তাঁদেরকে এখন ভাড়াটে বাড়িতে গিয়ে উঠতে হচ্ছে আর যখন এদের জন্যে কাণাকড়ি ভাড়া পাওয়া যাবে না। তবু, কেমন খারাপ দেখায়, এদেরকে একেবারে ছেড়ে দিয়ে যেতে। কত আনন্দদায়ক স্মৃতি এতে জড়ানো। তা ছাড়া পুরোনো ল্যাবেলগুলো এখনো আঁটা আছে।

গৃহিণী এরি মধ্যেই তাঁর সাবেক মধ্যবিত্ততায় নেমে এসেছেন। দড়িদড়া নিয়ে তিনিই বাঁধছেন একটা ছালা যেটাতে এ মাসের উদ্বৃত্ত ঘুঁটে আর কয়লা রয়েছে সঞ্চিত। কবেকার ক'টা লণ্ঠন, কোন আমলের কটা শিশি। নতুন করে, আমূল নতুন করে, আবার যখন সংসার পাততে হবে, তখন কিছুই তিনি ফেলে যাবেন না।

'কি গো, যাবে নাকি পার্টিতে ?'

'আর পার্টি !' গৃহিণী মুখবিবর দিয়ে বিরাট একটা নিশ্বাস ফেললেন।

এটা নিতান্তই স্বাভাবিক, গৃহিণী এমন কাতর হয়ে পড়েছেন। স্বামীগৌরবে আলোকিত তাঁর সৌভাগ্যশশী চিরদিনের জন্যে অস্ত যাচ্ছে। কোলকাতায় কে আর জানতে আসবে কত তাঁর প্রতাপ ছিল। কে জানতে আসবে কত তিনি আপিল শুনেছেন, কত তিনি ইনস্পেকশ্যন করেছেন, কত তিনি ফার্স্ট-ক্লাশ টি-এ পেয়েছেন। হায়, আজ কিনা তাঁকে ইণ্টার-ক্লাশে ফিরে যেতে হবে। মধ্যবিত্ত কি, মধ্যবিত্তেরো অধম। আর তিনি 'ব্যেরা' বলে' ডাকতে পারবেন না, তাঁকেও চাকর-বাকররা মেমসাহেব না বলে' মা বলবে। ছেলেমেয়েদের জন্যে কাগজ-পেন্সিল কিনতে হবে। ডাক আসবে ডাক-পিওনের হাতে, কত দেরি করে'। মালদা থেকে কেউ আম পাঠাবে না, সাতক্ষীরা থেকে নারকোলি কুল। দেখতে-না-দেখতেই সব শেষ হয়ে গেল। আর সভা! কোলকাতার ইস্কুলে পুরস্কার-বিতরণী সভায় আর তাঁকে কে ডাকবে মিষ্টি হেসে বই ক'খানা এগিয়ে দেবার জন্যে ?

স্ত্রীর মনের ভিতরটা মিস্টার সরকার দর্পণের মতো দেখতে পেলেন। কিন্তু না বলে' চলে'

গেলেন উপরে, বেশ বদলাতে। অনেকক্ষণ ভাবলেন, ধুতি-চাদর পরবেন না সুট পরবেন, কোন্‌টা বেশি প্রাসঙ্গিক হবে। আজকের দিনে ধুতিটাই বোধ হয় বেশি সম্ভ্রান্ত, কিন্তু নতুন যে সুটটা তিনি সাহেবী দোকান থেকে অর্ডার দিয়ে আনিয়েছেন সেটা আজো পরা হয়নি। সে-কথা ভেবে তাঁর মনটা শিশুর মতো আকুলিবিকুলি করে' উঠলো। ইহজীবনে কবেই বা সেটা পরবেন, যদি আজ না পরেন। চিতায় উঠে আরেকবার কি বেশ-বদল হয় না? ভাবলেন মিস্টার সরকার।

সেই মামুলি পার্টি। রঙিন কাগজের শিকল, ফুলের মালা আর ফিরপোর কেক। শেষোক্তটা অবিশ্যি বড় টেবিলে যেটাকে ঘিরে সহরের গণনীয়েরা বসে', আর সব খুচরো টেবিলে সিঙাড়া আর পান্তুয়া। সেই ওপেনিং সঙ্‌, বক্স-হার্মোনিয়ম বাজিয়ে, গানের বিষয়টা যেখানে সম্পূর্ণ অবান্তর। তারপরে সেই নিষ্প্রাণ বক্তৃতা, কারুটা বা মুখস্থ করা, আর তার উত্তরে মিস্টার সরকারের কান্না-উপচানো করুণ কাতরতা—সবাইকে তিনি ছেড়ে যাচ্ছেন, সব-কিছুকে তিনি ছেড়ে যাচ্ছেন। তারপরে, মৃতের উপরে খড়্গের আঘাতের মতো, আরেকটা গান, সভার পরিভাষায় যাকে বলে কনক্লুডিং সঙ্।

সমস্ত রাত মিস্টার সরকার আর তাঁর জীবনসঙ্গিনী কেউই ভালো ঘুমুতে পারলেন না। ঘুম থেকে উঠলেন, তখন রোদ উঠে গেছে। জীবনে এই প্রথম ব্যতিক্রম, ঘুম থেকে উঠেই রোদের মুখ দেখা, বিস্বাদ নিরানন্দ রোদ। আজ আর জগজ্জ্যোতি আটটার সময় স্নান করলেন না, পোষাক পরলেন না, হাত মুখ ধুয়েই যেমনটি ছিলেন তেমনি ভাবে পায়ের চটি ফটফটিয়ে নিচে নেমে গেলেন। এই তাঁর ধুতিতে প্রথম অবতরণ হলো।

দেখলেন নিচেটা শূন্য, কেউ কোথাও নেই, কেউ আসবেও না আর। সেই দিন থাকলে সামান্য সর্দি হয়েছে শুনেই কাতারে-কাতারে লোক আসতো তাঁকে দেখতে। আর, আজ তাঁর এই দুঃসময়ে কারুরই টিকির ডগাটি পর্যন্ত দেখা গেল না। উপায় নেই, রিপোর্ট তিনি দিয়ে দিয়েছেন, তার আর রদ-বদল সম্ভব নয়। সংসার এমনই অকৃতজ্ঞ।

সিগারেট ধরিয়ে বাসি খবরের কাগজটা কুড়িয়ে নিয়ে জগজ্জ্যোতি বসলেন তাঁর ড্রয়িং-রুমে। হঠাৎ জুতোর আওয়াজ শুনে চেয়ে দেখলেন সত্যপ্রকাশ। আজকের দিনে বিশিষ্ট বন্ধুকে সম্বর্ধনা করবার যে কী ভাষা, জগজ্জ্যোতি হঠাৎ খুঁজে পেলেন না।

সত্যপ্রকাশ এখানকার একজন বয়স্ক উকিল, খ্যাতিসম্পন্ন। কালেজী জীবনে একসঙ্গে ছিলেন এক হোস্টেলে, এক ঘরে, প্রথম যৌবনের নির্বোধ প্রগল্‌ভতায় দু'জনের মধ্যে গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল। তারপর কে কোথায় ছিটকে পড়লো, একজন তক্তপোষের উপরে আরেকজন মেঝেয়। তবু কোনো-দিন, মানে এ ক'দিনের মধ্যে কোনোদিন, বন্ধুতার সুতো ধরে' সত্যপ্রকাশ কাছে আসতে চাননি, বরং যতদূর সম্ভব সুতো ছেড়ে দিয়ে ব্যবধানটাকে তিনি বিস্তীর্ণ করে' রেখেছিলেন। কিন্তু ঘুড়ি যখন আজ কাটা পড়েছে, তখন কী আসে-যায় সুতোয় মাঞ্জা ছিল কি না-ছিল।

'কি-হে, কোনো অসুখ করেছে নাকি?' ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে সত্যপ্রকাশ জিগ্‌গেস করলেন।

'কাল সমস্ত রাত ঘুমুতে পারিনি। বোধ হয় ব্লাড-প্রেসারটা বেড়েছে। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো।'

২

সত্যপ্রকাশ একদৃষ্টে দেখছিলেন জগজ্জ্যোতিকে। খর্বাকার, স্থূলোদর, পেশীবলিষ্ঠ সেই জগজ্জ্যোতি একদিনেই কেমন বুড়ো, জীর্ণ-বিজীর্ণ হয়ে গেছে। যেন উঠে এসেছে কোনো শোকের সমুদ্র থেকে, এক জনহীন তৃণগুল্মহীন মরুভূমিতে। এমনি একটা ত্রস্ত, আর্ত চাহনি।

সত্যপ্রকাশ মুখোমুখি একটা কৌচে বসলেন। বললেন, 'আমি ভেবেছিলুম, গভীর আনন্দে কাল তুমি ঘুমুবে, ফুলশয্যার রাতের পরে এই আরেকটা তোমার রাত। সেই রাতটা ছিল জাগবার আর এটা ঘুমুবার।' নিজের রসিকতায় নিজেই সত্যপ্রকাশ হাসলেন।

'ঘুমুব?' জগজ্জ্যোতি কথাটা এমন ভাবে বললেন যেন পিছন থেকে পিঠে তাঁর কে ছোরা মেরেছে।

'ঘুমুবে না? নাকে তেল দিয়ে ঘুমুবে। এতদিন প্রাণপণ পরিশ্রমে কাজ করেছ, এখন সসম্মান বিশ্রাম মিলেছে—এই তো ঘুমুবার সময়, এই তো জীবনের মুক্তি, জীবনের আরম্ভ। আমি হলে তো হাত-পা তুলে নাচতুম, মুখ ভার করে' জরদ্গবের মতো বসে' থাকতুম না।' সত্যপ্রকাশ উচ্চশব্দে হেসে উঠলেন।

জগজ্জ্যোতি নির্বোধের মতো তাকিয়ে রইলেন। পরে, বহু দিনের রুগীর মতো দুবল গলায় বললেন, 'তুমি বলছ কী পাগলের মতো? আমার মনে হচ্ছে আমি এখন জলের বাইরে মাছ, যেন নিশ্বাস নিতে পাচ্ছি না। সমস্ত নোঙর আমার ছিঁড়ে গেছে। বলতে পারো, আমার সময় কি করে' কাটবে—আমার দিন, আমার রাত, সকাল আর সন্ধে? পারো বলতে?'

'খুব পারি। স্রেফ ঘুমিয়ে।' সত্যপ্রকাশ আবার হাসির রোল তুললেন। পরে গম্ভীর গলায় বললেন, 'ঘুমুতে না পারো, বেরিয়ে পড়ো দেশ ছেড়ে। ফিলিপাইনসে চলে' যাও, চলে' যাও নিউ জেল্যাণ্ডে। তুমি এখন স্বাধীন, তোমাকে আর পায় কে! আমি হলে তো ঠিক তাই চলে' যেতুম।'

'তুমি কী যে বলো!' জগজ্জ্যোতি মনে মনে মানচিত্রটা কল্পনা করলেন, কিন্তু কিছুরই সন্ধান পেলেন না।

'অতদূর না পারো, ভারতবর্ষটাই চষে' দেখ। বাঙলার মফস্বলের বাইরে বেরিয়ে এসে দেখ একবার এই চমৎকার দেশটাকে। কাজ, কাজের কি আর অন্ত আছে? আর কিছু না পাও, একটা কিছু নেশা ধরো—না, স্থূল অর্থে কিছু বলছি না, কেননা তোমার সেই স্নায়ুই আর নেই—নেশা ধরো মানে, take to a hobby, একটা কিছুতে সখ করে' ফেল—বই কি বাগান কি শিকার কি ফটোগ্রাফি। নেহাৎ আর কিছু না পারো, পুরীর সমুদ্রে গিয়ে ঝিনুক কুড়োও। ঠিক বাঁচবে দেখো, ঠিক ঘুমুতে পারবে।'

'আমি আর কোনো কাজেরই উপযুক্ত নই।' জগজ্জ্যোতি শোকাচ্ছন্ন কণ্ঠে বললেন, 'জীবনের একটা জানালাও আর আমার খোলা ছিল না। আমি অন্ধকূপে বসে' ছিলুম। আজ সব দরজা-দেয়াল ভেঙে যাওয়াতে এত আলো-হাওয়া সইতে পারছি না, আমার দম আটকে আটকে আসছে।'

'তবে আর কি, বাড়ি ফিরে গিয়ে ইস্কুলের একটা মাস্টারি নাও।'

এটার অসম্ভবনীয়তায় দুজনেই হাসলেন।

অতি কষ্টে একটা দীর্ঘনিশ্বাস মর্দিত করে' জগজ্জ্যোতি বললেন, 'আমি জানি আমার কী করে' সময় কাটবে।'

'কী করে' ?'

'বাজার করে', পার্কে বেড়িয়ে আর রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে দোকানের রেডিয়ো শুনে।'

সত্যপ্রকাশ হাসতে চাইলেন অথচ হাসতে পারলেন না।

'আর দিনের পর দিন, প্রতিদিন দিন গুনে। আর, তারি মাঝে, মাঝে মাঝে চিনির ওজন আর রক্তের চাপ দেখে। আর ঐ যা বললে, ঘুমিয়ে। কিন্তু জানো, এ পর্যন্ত দুপুরে একফোঁটা ঘুমুইনি কোনোদিন। ভেরোন্যাল খেতে হবে হয়তো।'

'কেন, বই, বই নেই ?' সত্যপ্রকাশ উল্লসিত হয়ে বললেন।

'বই ?' জগজ্জ্যোতি তাকালেন একবার তাঁর বুক-কেসের দিকে। সেখানে কয়েকখানা কি বই সাজানো আছে, যা তিনি কোনোদিন পড়ে' দেখেন নি, যা তিনি আসবাব-রূপেই ব্যবহার করে' এসেছেন। বই! কত বই এসেছে তাঁর বাড়িতে, চাপরাশির কাঁধে চড়ে', সমস্ত টেবিল আর মেঝে প্লাবিত হয়ে গেছে। আরো বই, এখনো বই—জগজ্জ্যোতির মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে একটা সুঁচ চলে গেল। পরে, কী মনে করে' বললেন, 'হ্যাঁ, উপনিষৎ কয়েকখানা কিনে নিতে হবে।'

'উপনিষৎ ?'

'তবে কি তুমি ল-ডাইজেস্ট কিনতে বলো ? উপনিষৎ ছাড়া আর পড়বার কী আছে এই বয়সে ?'

দেয়ালের ঘড়িটা এখনো প্যাক করা হয়নি, আওয়াজ করে' দশটা বাজলো। নিজেরো অজানতে চটি-জুতোর মধ্যে পা ঢুকিয়ে জগজ্জ্যোতি ধড়মড় করে' উঠে দাঁড়ালেন: 'কী সর্বনাশ, একেবারে খেয়াল নেই, দশটা বেজে গেছে।'

সত্যপ্রকাশের সম্পূর্ণ খেয়াল ছিল, তাই তিনি কোনো চাঞ্চল্য দেখালেন না। বললেন, 'অত তাড়া কিসের ? আজ থেকে তো তোমার আর আপিস নেই!'

'ও, হ্যাঁ।' জগজ্জ্যোতি বসে' পড়লেন। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'তবু এতদিনের অভ্যেসটা ভাঙতে কেমন অসুবিধে লাগে। আচ্ছা, তুমি এখন চা খাবে ?'

সত্যপ্রকাশ স্বল্প হাসলেন। বললেন, 'তোমার মতো ছাড়া পেলে চা কেন আরো-কিছু হয়তো খেতুম। কিন্তু মুখে রক্ত না ওঠা পর্যন্ত আমাদের মুক্তি নেই। সুতরাং দশটা বেজেছে বলে' তোমাকে উঠতে হবে না, উঠতে হবে আমাকে। আজ বিকেলেই যাবে নাকি ?'

জগজ্জ্যোতিও উঠলেন: 'হ্যাঁ, বাঁধাছাঁদা এখনো কিছু বাকি আছে।'

বিকেলে স্টেশনে এসে দেখলেন, কেউ নেই। না, লোক আছে বিস্তর, কিন্তু তারা তাঁর কেউই নয়। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর চোখের উপর দিয়ে অনেক পাতার গেট, ফুলের মালা, কাগজের নিশান, ছাপানো চিঠি, পটকার শব্দ, চায়ের পেয়ালা, কেকের প্লেট, কই মাছের হাঁড়ি একাকার হয়ে তালগোল পাকিয়ে ছত্রখান হয়ে চলে' গেল। ইণ্টারক্লাশের ছোট একটা কামরায় তিনি মুখ লুকিয়ে বসলেন। কেউ যে আসেনি, ভালোই করেছে।

এইখানেই পড়তে পারতো যবনিকা, কিন্তু আরো একটা ট্রেন আছে, সেটা চলেছে দক্ষিণে, মাস কয়েক পরে।

ইণ্টার-ক্লাশের কামরাটা জনাকীর্ণ। এতক্ষণ লক্ষ্য করেননি, কিন্তু গাড়ি অনেক দূর চলে' আসার পর জগজ্জ্যোতির মনে হলো, কোণের ঐ লোকটিকে তিনি যেন কোথায় দেখেছেন। চট করে' মনে করে' ফেলবার কথা নয়, কেননা কত জায়গায় কত লোকের সংস্রবে তাঁকে আসতে হয়েছে, কত বৎসর ধরে'। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য, সেই অর্ধ-বিস্মৃত লোকটিও তাঁর দিকে চেয়ে আছে, অপলক দৃষ্টিতে।

সুধাময়, অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে জগজ্জ্যোতির খেয়াল হলো। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে, সুধাময় না?'

সুধাময় এক লাফে মাঝের বেঞ্চি পেরিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলো। বললে, 'আপনাকে প্রথমটা একেবারেই চিনতে পারি নি। এ কি হয়ে গেছেন আপনি!'

চেনা কঠিন, জগজ্জ্যোতি তা নিজেই জানেন। কিন্তু সুধাময় সে-অর্থে বলেনি। চেহারা তাঁর আধখানা হয়ে গেছে, সেই অভিজাত পৃথুলতার চিহ্নও কোথাও নেই, দুই চোখে কেমন একটা শুষ্ক জ্বলন্ত দৃষ্টি।

'আপনার শরীর কি খুব খারাপ?'

'হ্যাঁ, ইনসোমনিয়া, ঘুমুতে পারি না। বসে' থেকে থেকে আর ঘুম হয় না।'

'তবে চলেছেন কোথায়? চেঞ্জে?'

'হ্যাঁ।' জগজ্জ্যোতি হাসলেন: 'আর তুমি?

'সেই একটা চাকরির কথা আপনাকে একদিন বলেছিলুম না, যার জন্যে আমাকে আপনি একটা ব্রিলিয়্যাণ্ট সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' জগজ্জ্যোতি শিউরে উঠলেন: 'কি হলো সেটার? পেলে?'

'না, পাইনি এখনো।' সুধাময় হাসলো: 'তবে একটু আশা হয়েছে।'

জগজ্জ্যোতি তার দিকে অর্থহীন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

'সেখান থেকে ইনটারভিয়ুর চিঠি দিয়েছে। কাল ইনটারভিয়ু। তাই চলেছি। অনেক য়্যাপ্লিক্যাণ্ট, তবে খোঁজ নিয়ে জানলুম, বাঙলা দেশ থেকে আমিই একমাত্র নির্বাচিত হয়েছি।' কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়ে সুধাময় বললে, 'যদি হয়, আপনার জন্যেই হবে। আপনার সার্টিফিকেটটাই কাজ করেছে। আপনার ঋণ এ-জীবনে শুধতে পারবো না।'

নীরক্ত মুখে মৃত গলায় জগজ্জ্যোতি বললেন, 'যদি পাও, একদিন খাইয়ে দিয়ো।'

ট্রেন চলছে, জগজ্জ্যোতির মুখে আর কথা নেই। সুধাময় বুঝলো তিনি অত্যন্ত অসুস্থ, শরীরটা একটু বিস্তৃত করতে পেলে যেন বিশ্রাম পান। তাই যাত্রীদের বসার অনেক অদল-বদল করে' জগজ্জ্যোতির জন্যে সে শোবার জায়গা করে' দিল, নিজে বসলো গিয়ে একটা কা'র ট্রাঙ্কের উপর। বললে, 'আপনি একটু শোন্। দেখুন ট্রেনের আওয়াজে যদি ঘুম আসে।'

জগজ্জ্যোতি জানলার বাইরে মুখ বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'না, এই বেশ আছি।'

কতক্ষণ পরে কি একটা স্টেশনে এসে গাড়ি থামলো। দু' দরজাতেই ভিড়, যত লোক নামে তার চেয়ে বেশি এসে জড়ো হয়। একটা কুলি ধরে' জগজ্জ্যোতি জানলা দিয়ে তার মাথায় স্যুটকেস আর বিছানাটা চালান করে' দিলেন, আর ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন ক'রে নেমে পড়লেন গাড়ি থেকে। সুধাময়কে কিছুই বললেন না।

কিই বা বলবেন!

একমাত্র বলতে পারতেন যে, বাঙলা-দেশ থেকে পদপ্রার্থী সে একা নয়, আর একাই সে ইনটারভিয়ুর নিমন্ত্রণ পায়নি। বলতে পারতেন, কিন্তু পারলেন না বলতে। কি জানি কেন, নতুন জায়গায় অপরিচিত স্টেশনে ইলেকট্রিকের আলোতে অসংখ্য জনসমাবেশের মধ্যে সুধাময়ের একটা কথা মুহুর্মুহু তাঁর মনে পড়তে লাগলো: 'পথ জুড়ে আর কত পড়ে' থাকবেন? একটু নতুন রোদ, নতুন রক্ত আসতে দিন।'

কুলিকে একটা আলোর নিচে দাঁড় করালেন। নামিয়ে নিলেন মাল দুটো। তারপর তাকে বিদায় করে' দিয়ে তাকালেন চারদিকে। কোটের ভিতরকার পকেট থেকে বার করলেন ভাঁজ-করা সেই ইনটারভিয়ুর চিঠিটা। তীক্ষ্ণ চক্ষুতে একবার পরীক্ষা করে' দেখলেন, আর কোনো দরকারী জিনিস কিনা। না, সেই চিঠিটাই। বারে-বারে পড়লেন, এ-পিঠ ও-পিঠ দেখলেন, যেমন বহু দলিল তিনি দেখেছেন, না সেই চিঠিটাই, তাঁর নাম, পোস্টাপিসের ডেট-স্ট্যাম্প, প্রেরকের ঠিকানা— কোনোই ভুল নেই। এ ভাবে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে দৃঢ়সিদ্ধান্ত হয়ে চিঠিটা খণ্ড-খণ্ড ক'রে ছিঁড়ে ফেললেন। সামনে তাকালেন অন্ধকারে, ট্রেনের পিছনের আলোটা কোথাও দেখা গেল না।

মরূদ্যান

শ্রীসৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

মরু-প্রান্তর বর্বর নিষ্ঠুর।
উদ্যান তবু মানুষ-পথিকে ডাকে।
মরু-মায়া আছে পথ হারাবার তরে—
দৃষ্টির ধাঁধা; সৃষ্টি আনেনি ভুল।

রাত্রি নেমেছে কৃষ্ণ-তিমির নিয়ে,
গগন প্রান্তে জাগেনি আলোর রেখা—
তবু সে আঁধার আপন রূপেতে ভরা—
মানুষে ডাকেনি দস্যুবৃত্তি লাগি।

প্রকৃতির বুকে বিরূপতা সে ত আসে
দৈবের মত হয়ত ক্ষণিক স্থায়ী—
প্রলয়ের রূপে বিরূপতা যদি জাগে
কঠিন ধ্বংস; প্রতারণা তবু নাই।

এখানে মানুষ মিথ্যার বোঝা বয়ে
তিলে তিলে কত আপন জনেরে নাশে-
বর্বর-মরু যদি মনে রূপায়িত,
উদ্যান কভু জাগেনা ত সেথা আর!

পাষাণ-ধর্ম শেষ তার কভু হ'বে?
মরু-হৃদয়েতে আসিবে কি কোন ঝড়?
পান্থ-পাদপ দোলাবে কি তার শাখা?
কাতর পথিকে দেবে কি তৃষ্ণাজল?

মরু-প্রান্তর বর্বর নিষ্ঠুর।
উদ্যান তার মানুষে তবু-ও ডাকে।

শরৎ-পরিচয়

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

দেবানন্দপুর থেকে ভাগলপুরে ফিরে এসে শরৎচন্দ্রের মনের অবস্থা অবর্ণনীয় হ'ল। তিনি দেখলেন যে তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে অনেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে কলেজে ঢুকেছে। তাঁর পক্ষেও কোথাও হীন, ছোট, কি অবহেলিত হ'য়ে থাকা একেবারে স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। সেই অবস্থায় কি করা যেতে পারে তাই অহরহ তাঁর চিন্তার বিষয় হ'ল।

নিবিড় চিন্তার পর যে পথ অবলম্বন করা স্থির হ'ল তা কাক-পক্ষীকেও বলা চলে না।

যে ইস্কুলে দেবানন্দপুরে গিয়ে ভর্ত্তি হ'য়েছিলেন, সেখেন থেকে ট্র্যান্সফার সার্টিফিকেট আনতে অনেক টাকা লাগে; সে টাকা জোগাড় হয় না। সে কথা বলাও চলে না সকলকে। উপরন্তু সেই বছরে আর পরীক্ষা দেওয়া কিছুতেই সম্ভব হয় না। এখন উপায়?

শরৎচন্দ্র বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের তৈরি বাধা মানুষের আগে চলার পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে কিছুতেই থাকতে পারে না। অতএব তাকে যে-কোন উপায়ে দূর ক'রতেই হবে। অবশেষে যে-কোন উপায়েই তা দূর হ'য়েছিল।

জেলা-স্কুলের ছাত্র ছিলেন; স্কুলটি বাড়ীর কাছেও বটে; কিন্তু সেখানে সকল দিক বিবেচনা ক'রে না যাওয়াই স্থির হ'ল।

সেই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তেজনারায়ণ কলেজিয়ট স্কুলের শিক্ষকতা করতেন। তাঁর পিতা বেণীমাধব কেদারনাথের বন্ধু ছিলেন। পাড়া-সুবাদে শরৎ পাঁচকড়ি বাবুকে মামা বলতেন। স্কুলে ভর্ত্তি হবার বিষয়ে শরৎ তাঁর কাছে যথেষ্ট পরিমাণে সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু। ইনি ছাত্রদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন, তাদের দোষ ত্রুটি ক্ষমা করার জন্যে সর্বদাই উন্মুখ। ইংরিজিতে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল এবং ছাত্র এবং অভিভাবকদের সঙ্গে আত্মীয়তার ব্যবহার করতেন। তিনি পরে কলেজের ইংরাজি অধ্যাপকের পদে উন্নীত হন এবং অবশেষে অধ্যাপকতা ছেড়ে দিয়ে ওকালতি করেন। কিন্তু আজও তাঁকে তাঁর ছাত্রের দল মাষ্টার মশাই ব'লে শ্লাঘা বোধ করে। তিনি এখনও জীবিত আছেন। এমন সদাশয় শিক্ষক এদেশে একান্ত বিরল।

শরৎচন্দ্র অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর স্নেহ-অধিকার ক'রে সৌভাগ্যবান্ হ'তে পেরেছিলেন।

এ সবই বাইরের বাধার কথা বলা হ'ল; কিন্তু আসল পর্বত-লঙ্ঘনের কাহিনী বাকি।

তিন বছরের অনধীত বিষয়বস্তুকে মাস কয়েকের মধ্যে আয়ত্ত করে নিয়ে পাশ করা, সেই বয়সের ছেলের পক্ষে যে পর্বতপ্রমাণ তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু শরৎচন্দ্র পশ্চাদ্‌পদ হওয়ার পাত্রই নন।

মাতামহ কেদারনাথের বাইরের পূজোর ঘরটি একটেরে। সেইখেনেই শরৎ বাসা বাঁধলেন।

একটা দেবদারু কাঠের বাক্সকে ইন্দ্রনাথ (রাজু) বই রাখার শেলফ করে দিলেন। একখানি অল্প পরিসর তে-ঠেঙ্গা চেয়ার, তাতে বসে ঘুমিয়ে পড়ার উপায় নেই। আর ছোট একটি টেবিল। ছেঁড়া দড়ির খাট—বিছানার দৈন্য ঢাকার জন্যে একখানি উড়ুনি চাদর আর তার তলায় একটি গুড়গড়ি এবং তামাক সেজে দেবার জন্যে বন্ধু "নীলা"। বই কেনার সঙ্গতি নেই: কিন্তু সহপাঠিদের সহযোগিতার কিছুমাত্র অভাব ছিল না। এই সব অভিনব সাজ-সরান্‌জামে—ভেলায় সাগর পারের ব্যবস্থা হ'ল। জননী ভুবনমোহিনী সারারাত প্রদীপ জ্বালাবার তেল জুগিয়ে উঠতে পারেন না। বন্ধুবান্ধবেরা মোমবাতি দিয়ে যায়। আর, এককোণে একটা ষ্টোভ, একটি ছোট টিনের কেতলি, একটি ছোট সোরাই আর মুখঢাকা গেলাস একটি। শেলফের উপর-তাকে কফির টিন। রাত্রি জাগরণের পাকা বন্দোবস্ত। ছেড়া জামা আর ময়লা গায়ের কাপড়।

এ সবই প্রকট দৈন্যের পরিচায়ক: কিন্তু মানুষটি, মনে একটুও দীন নয়। বাণীর বরপুত্র শরৎচন্দ্রের চলেছে বিদ্যার সাগরে নবতর অভিযান।

ছোট খাট মানুষটি নীলা। আসে নিঃশব্দে, গায়ের কাপড়ের তলায় তামাক-টিকে লুকিয়ে নিয়ে। সযত্নে তামাক সাজে, নিজে বার কয়েক টেনে তামাক ধরিয়ে দিয়ে—শরতের হাতে নলটা তুলে দিয়ে বলে যায়,—খা। শরতের একটা কথা কইবার পর্যন্ত অবসর নেই।

দোরের বাইরে একটি খুঁটোতে একটা বেজি বাঁধা আছে। সাবধান হয়ে না গেলে বেজি দু একটা কামড় দিতে ছাড়ে না। নিজের অংশের একটুকরো মাছের অর্ধেক না খাওয়া, দুধ ভাত একটি খুরিতে দিয়ে শরৎ পরম প্রিয় বন্ধুটিকে খাইয়ে কৃতার্থতা লাভ করেন। আর একটি খুরিতে জল।

সেই মাটির কুটুরি ঘরে ইন্দুরের উৎপাত ছিল প্রচণ্ড। তাই শোবার আগে শরৎ তাকে চেন মুক্ত করে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে নিতেন।

সেদিন সকালে মাঝের ফটক খোলা হয়নি তখনও প্রায় সারা রাত্রি জেগে শরৎ সবে শুয়েছেন। নীলা বাইরে দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে দেখলে শরতের গায়ের কাপড়খানা রক্তাক্ত।

শরৎ, ও শরৎ...

কিরে ? নীলা !

জড়িয়ে আছে ঘুমে চোখজোড়া। না খুলেই শরৎ উত্তর দিলে, কিরে নীলা ?—একটু বেরিয়ে আয়—এই মাত্তর শুয়েছি ভাই।

তোর অসুখ করেছে ?

হাঁ।

রক্ত বমি করেছিস ?

দূৎ,—জ্বালাস নে।

ও রক্ত কিসের ?

কোথায় রে ?

তোর গায়ের কাপড়ে—

ধড়মড় করে শরৎ উঠে বসলেন।

এ কিরে! এ বেজি বেটার কাজ—ইঁহুর খুন করেছে নিশ্চয়। বলে শরৎ গায়ের কাপড় ফেলে, বেজি বেঁধে, নীলাকে দোর খুলে দিতে বেরিয়ে গেলেন।

ফিরে এসে দেখলেন, নীলা গালে হাত দিয়ে নির্বাক হয়ে বসে মেঝের উপর।

যাক্,—খুব বেঁচে গেছিস—তোর বেজি-বেটা একটা গোক্‌রো মেরেছে।

দুই বন্ধুর চক্ষু স্থির।

একটা কাঠি দিয়ে নাড়তেই ল্যাজটা, নড়ে উঠল।

কখন শুয়েছিলি ?

তা তিনটে হবে বোধ হয়…

তুই মরবি, বলছি।

দুৎ……

এ ঘর ছাড়।

কোথায় সাপ নেই, শুনি ?

তোর এই ঘরটা বেটাদের আড়ৎ।

তুই তবে আর আসিস নে।

তোর তামাক সাজবে কে রে ? ফেল করে মরবি, দেখছি।

সব কোরবো ; কিন্তু ওটি কিছুতেই করা হবে না।

দুই বন্ধুতে পরম পরিতৃপ্তি সহকারে তাম্রকূট সেবন করার পর, নীলা চলে গেল ; শরৎ—অঙ্কের বই টেনে আবার পড়ায় মন দিলেন।

বাড়ীতে একটা হৈ-রৈ ব্যাপার বেধে গেল। মুশাই চাকর সাপটাকে বার করে নিয়ে এসে, উঠোনে কাঠ-পালা জড়ো করে—অগ্নি-সংকারের ব্যবস্থা করতে লাগল।

শরৎ ঘর থেকে বেরিয়ে প'ড়ে দেখেন, ছোট ছেলে মেয়ের গাঁদি লেগে গেছে উঠোনে। মুশাইকে জিজ্ঞেস করলেন :

ই কেয়া করতে হো মুশাই, সাঁপকো জরায় কর খাওগে ?

নেই। মুশাই মাথা নেড়ে ব'ললে।

তব্ ?

গোহমনা সাঁপ ব্রাহ্মণ হ্যায়, জরুর জলানা চাইয়ে।

উস্‌কে মু্ ঝরকায়কে, গঙ্গাজি মে বিগ দেও। মছ্‌লি সব খা লেগা।

কর্ত্তার অবর্ত্তমানে মুশাই এখন বাড়ীর প্রকৃত কর্ত্তা।

মেহি, তোঁ যাকে পড়্। ই কাম হামরা হ্যায় : তোঁ কি জানেই ছিস্ ?

কিন্তু ব্যাপারটার এইখেনেই নিবৃত্তি হ'ল না। ভুবনমোহিনী মুশাইকে দিয়ে মনসার পূজো পাঠিয়ে দিয়ে, প্রসাদের প্রতীক্ষায় উপবাসী রইলেন। মুশাই তিতোপ্পর বেলায় ফিরলো। মানে, ছোট্ট সামর্থ্যের মধ্যে দিয়ে গায়ে কষ্ট স'য়ে যতখানি করতে পারা যায় তার কিছুমাত্র ত্রুটি হ'ল না।

শরতের টেবিলের উপর খুরি ঢাকা প্রসাদ রইল, নীলার জন্যে—সে বিকেলে তামাকের টানে এসে যে পৌঁছবে, শরৎ তা জানতেন তাই ব্যস্ত হ'লেন না।

এসেই নীলা জিজ্ঞেস করলে : ওটা কি রে ?

ওটা ভাই তোর জন্যে পেসাদ মনসার, মা রেখে গেছেন।

নীলা কপালে ঠেকিয়ে খেয়ে ফেলে বললে : খুব বেঁচে গেছিস্ কিন্তু···

হয়েছে,—তামাক সাজ। তোর আর বক্তৃতা করতে হবে না।

নীলা কাজে মন দিলে।

শুধু মতিলাল (শরৎচন্দ্রের পিতা) সম্পূর্ণ উদাসীন। খেতে বসে বললেন, এটা ফের কি গো ?

মনসার পেসাদ।

এতোও জানো, বাবা। গাঙ্গুলী বাড়ীর মেয়েদের ভাটপাড়ায় বিয়ে হওয়া উচিত—সর্বশাস্ত্র বিশারদ।

মন্দটা কি, শুনি ?

মন্দ কে বলেছে ? অতো সাত-সতের, আমাদের বাড়ী কেউ জানেও না, মানেও না।

তোমরা পুরুষেরা জান না ; আমাদের হাতেই তো ধর্মকর্ম।

সে ঠিক, বলে মতিলাল, এক নিমেষে খাওয়া শেষ ক'রে উঠে দাঁড়ালেন।

ওকি দুধ খেলে না ?

না, আমার দুধে কলা দিয়ে ভাঁড়ারে রেখে দেওগে। বাস্তুকে ভোগ দিতে হয়।

এ আবার এক নতুন বিধেন শুন্‌ছি।

আমাদের দেশে ওই করে। ব'লে মুখ টিপে হেসে মতিলাল বাইরে গেলেন।

ভুবনমোহিনী পাথর বাটিতে দুধ-কলা সাজিয়ে রেখে গলায় কাপড় দিয়ে প্রণাম ক'রে বল্‌লেন তোমার কৃপাতে আমার শোরো রক্ষে পেয়েছে, মা বাস্তু।

শরৎ এসে খেতে ব'সে বল্‌লেন : আচ্ছা মা। দেশের কেউ বাদ গেল না,—সবাই পেল মনসার পেসাদ,—আর যে সত্যিকার কাজ করলে তার কপালে অষ্টরম্ভা ?

কেন নীলাকে দিস নি ?

নীলা নাকি সাপ মেরেচে ?

ষাট। ষাট। মরে যাই, কি ভুল আমার। ব'লে ছুটে গিয়ে—একটি ছোট পাথর বাটিতে দুধ কলা মেখে এসে বল্‌লেন : তুই দিবি না আমি দিয়ে আস্‌ব ?

তোমাকে কামড়াবে। আচ্ছা, মা। যে যেমন জীব সে তাই খায়। ও কলা খাবে কেন ?—মাছ দাও।

দুধে-মাছে এক করতে নেই গো

কি হয় মা ?

গরুর অকল্যাণ।

এই নে এই পাতে,—আলাদা ক'রে দিস্—দুধে মাছে এক করিস্ নে।

৩

আচ্ছা। আচ্ছা। তাই হবে। ব'লে শরৎ হাস্‌তে হাস্‌তে বাইরে চ'লে গেলেন।

ভুবনমোহিনীর কাছে কেউ ছোট নয়, কেউ অবহেলার নয়। যে যাই বলে তাই শোনেন। শুধু সবাই বেঁচে বর্ত্তে—সুখে থাক।

* * *

পরের দিন সকালে সময়ের আগেই একটু, নীলা এলো। দেখলে, শরৎ আলো জ্বালিয়ে তখনও পড়ছেন।

এ কি রে। আজ শুস্‌নি?

আজ রুটিন্ বদ্‌লে গেছে, ভাই। ও রাতে কেমন ঘুম পেয়ে গেল সকাল সকাল শুয়ে পড়েছিলাম, জানিনে ক'টা,—ঘুম ভেঙে গেল।

বেজি বেঁধে শরৎ দোর খুলে দিয়ে এল। নীলা টেবিলের ওপর একটা বী-টাইম-পীস্ রেখে বল্‌লে: এই নে, এটাতে তোর কাজ চ'লবে বোধ হয়।

চুরি ক'রে আনলি?

কতকটা তাই বটে। বাবার অসুখের সময় ওটা কেনা হয়। নৈলে ওষুধ খাওয়ানর বড়ো মুস্কিল হ'ত। তাই মা এ ঘড়িটা দুচক্ষে দেখতে পারেন না। তুলে রেখেছিলেন। জানি চাইলেও দেবেন না। এদিকে তোর একটা ঘড়ি নৈলে চলেই বা কি ক'রে? তাই চুপি চুপি···

নীলার মুখে একটি স্নিগ্ধ ম্লান হাসি ফুটে উঠ্‌লো। সে খাটের কাছে ব'সে প'ড়ে তামাক সাজতে লাগলো।

শরৎ বললেন: আচ্ছা নীলা, তুই আমায় এতো ভালবাসিস্ কেন রে?

ওটা ভাই বলা যায় না। সব্বাই ঐ কথা জিজ্ঞেস করে। একজন একজনকে কেন ভালবাসে, তাকি বলা যায়?

যায় বই কি।

তুই পারিস্?

নিশ্চয়।

কি বলতো, দেখি।

বললে তুই দুঃখু পাবি।

দূৎ, তা কেন? তুই যা বলবি, তা তোর আন্দাজ, সত্যি নাও হ'তে পারে তো।

সত্যি নৈলে, বলি নে। এ কথা আজই আমার মনে আসেনি: অনেক দিন থেকে দেখে দেখে, তবে আমি ঠিক করি। তোর সঙ্গে আমিই আগে কথা কই, মনে আছে?

খুব আছে।

আচ্ছা বল, কেন কথা কইলাম।

বা—রে, তোর মনের কথা আমি কি ক'রে ব'লব?

অই। তুই কিন্তু পারিস্—তোর খুব বড় কল্পনা আছে: তোর হৃদয় মানে মনটা ভারি নরম। তুই লোকের দুঃখু নিজের মন দিয়ে বুঝতে পারিস্। তুই তোদের বাড়ীর আর সকলের মত নোস্।

কেন ?

আচ্ছা নীলা তুই-ই বল আমাকে ঐ টিনের মধ্যে কিস্‌মিস্‌ পেস্তা আখ্‌রোট আমায় সেদিন দিয়ে গেলি কেন ?

আমাদের অনেক কিনে এনেছিল ব'লে।

আর কেউ তো দেয় না ?

আর কেউ তোকে আমার মত ক'রে জানে না।

শরৎ হাস্‌লে বল্‌লে, জানারও বিশেষত্ব আছে।

আচ্ছা তুই বল, শরৎ, কেন আমার সঙ্গে ভাব করলি। তোর চেহারার মধ্যে ভারি একটা মিষ্টি মেয়েলি ভাব আছে। কিন্তু তোর সঙ্গে সেদিন কথা ক'য়েছিলাম, সে একেবারে অন্য কারণে।

কি কারণ রে ?

তোর ঠোঁট দুটো দেখে বুঝেছিলাম, তুই তামাক খাস। আমার এক বন্ধু ছিল দেবানন্দপুরে, তার বাড়ীতে তামাকের আড্ডা ছিল। এখেনে এসে কি মুস্‌কিল যে হ'ল! বাবা তামাক খান; কিন্তু পুড়িয়ে ছাড়েন।

আমারও ঠিক তাই, আমি শিখি বাবার তামাক খাওয়া দেখে; কিন্তু একটু রস জম্‌লে ওতে আর সানায় না। তখন আলাদা বন্দোবস্ত ক'রতেই হ'ল। তোর বাড়ীতে বেশ নিরিবিলি, আমার দাদার জ্বালায়···

জানি। কিন্তু তুই পয়সা পাস এত কোত্থেকে রে ?

আমি যে বাজার করি। ও থেকে দু-এক পয়সা সরালে—কেও জান্‌তেও পারে না।

বটে, চুরি বিদ্যে চালাচ্চ ? কিন্তু ভাই তোমার পাপের অংশ আমি নিতে পারবো না, নীলা।

নিতে ব'লবও না। তোকে তামাক খাইয়ে আমার বেশ ভালো লাগে।

সেই কথাই তোকে বল্‌লাম তোর মধ্যে একটা মেয়েমানুষ আছে।

শয়তান তুই।

শরৎ হেসে বললে, আগেই বলি নি ?

কি ?

তুই চটে যাবি।

চটিনি, আমিও জানি যে আমার মার মতো আমার মনটা ভারি নরম।

আচ্ছা, তুই যা।

নীলা গান ক'রতে পারতো। তার একটা এস্‌রাজ ছিল। একজামিনের পর শরৎ সেটি দখল ক'রে নিজের বাড়ি নিয়ে এলেন। সে বিনাবাক্যে সেটি দিয়ে দিলে।

চণ্ডীমণ্ডপের পাশের কুঠুরি—যা' কেদারনাথের আমের ভাঁড়ার হ'ত, আর প্রয়োজন হ'লে ছেলেদের আটকের জন্যে সলিটারি সেলরূপে ব্যবহৃত হ'তো। শরতের সেই ঘরটি হ'ল সঙ্গীতশালা।

একদিন সকালে সেই ঘর থেকে মধুর আওয়াজ শুনে ছেলেদের তরুণ-হৃদয় বিচলিত হ'য়ে

উঠলো। এস্‌রাজের সঙ্গে মিষ্টি গলায় "মথুরা বাসিনী, মধুর হাসিনী" গান শুনে মনে হ'ল স্বর্গের পরীদের গানের মোজরা ব'সে গেছে বুঝি সেই ঘরটার মধ্যে!

অনেক আবেদন-নিবেদনের পর দোর খোলা হ'ল।

কিন্তু নীলা বেশীদিন বাঁচেনি। সে হঠাৎ একদিন কলেরায় মারা গেল। শরতের কি শোক! যখন তার এস্‌রাজটি ফিরিয়ে দিতে হ'ল, তখন মনে আছে তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে গেছে!

ভাগলপুরে এসে শরতের—সেই প্রথম বন্ধুটির বিচ্ছেদ তার মনে একটা গভীর দাগ রেখে গিয়েছিল।

এইবার একটু পেছু হেঁটে আর একদিনের কথা ব'লতে হচ্চে। ভুবনমোহিনী বিপ্রদাসকে কাছে ব'সে পরিতোষপূর্বক খাইয়ে বল্‌লেন:

বিপিন, শোরো পাশ হ'য়েছে।

হুঁ, কিন্তু এ পাশ তো কিছুই না মেজদি, ভালো ক'রে পড়ায় মন দিতে বল ওকে।

ব'লছিল, ফি দিতে হবে। নাকি অনেক টাকা লাগ্‌বে।

কত?

ওকে জিজ্ঞেস কর। আমি ডেকে দিচ্চি।

থাক্‌, আমি জেনে নেব।

পরদিন সকালে বিপ্রদাস চল্‌লেন খঞ্জপুর। টাকা ঘরে নেই, সংগ্রহ ক'রতে হবে। বাঙালীটোলা থেকে খঞ্জপুর মাইল দেড়েকের পথ। সেইখেনে গুলজারিলালের বাড়ী।

গুল্‌জারিকে সবাই চেনে। কাছারির অশ্বত্থ গাছের ধূলিবহুল প্রাঙ্গণে—মিশ কালো রংএর পেট-মোটা এই মানুষটাকে নিত্য ঘুরে বেড়াতে দেখতে পাওয়া যায়। সে ছিল ভাগলপুরের সাইলক। টাকা তার কাছে নিশ্চয় পাওয়া যাবে। সুদের জন্যে একটু ইতস্তত ক'রলে সে মাথা নেড়ে এক্কেবারে বলে দেবে,—নেহি হোগা, সাহেব।

বিপ্রদাস সরকারি দপ্তরে প্রবেশ ক'রেছেন, অতএব গুলজারির কাছে মোটেই অপরিচিত নন্‌। সে জানে যে, টাকা আদায়ের কোন মুস্কিল হবে না। কেবল যা-কিছু বিবেচনা সুদটা নিয়ে। তাই সে বল্‌লে: কিন্তু কি সুদ দিচ্চেন?

সুদ? যা উচিত বিবেচনা ক'রবে।

দেখুন বাবু, আমার ও বিষয়ে যথেষ্ট বদ্‌নাম আছেই। আর, সুনাম কেনার কোন তোয়াক্কা আমি রাখিনে। আরও, কড়া সুদের তাগিদে আসল আপনি আদায় হ'য়ে আসে। তা হ'লে, আমার মরদ কি বাৎ! টাকায় চার পয়সা, প্রতি মাসে। রাজি থাকেন, এই কাগজ কালিকলম আছে—এই টিকিট। নিয়ে যান টাকা।

বিপ্রদাস হ্যাণ্ডনোট লিখে, টাকা নিয়ে এলেন। অতি অল্প বেতনে তিনি সবে চাক্‌রিতে ঢুকেছেন। বৃহৎ পরিবার পালনের সামর্থ্যও সে সময় তাঁর ছিল না।

শুন্‌তে পাওয়া যায় যে, অর্থের অভাবে শরৎচন্দ্র লেখা-পড়া ক'রতে পারেন নি। এবং তার জন্যে তাঁর দূর এবং নিকট সম্বন্ধ আত্মীয়েরাই দায়ী। কিন্তু তাঁর পিতৃদেব মতিলাল যে কেন দায়ী

ছিলেন না, তা' ঠিক ক'রে বুঝে ওঠা শক্ত। আজও এই তর্কের অবসান হয়নি। এখনও অনেক শরৎচন্দ্রের তথা-কথিত বন্ধুকে এই বিতণ্ডা ক'রতে দেখা যায়। তাই সংসারের নিয়ম তোষামোদ-কারীদের স্বার্থ-সিদ্ধির চেষ্টায় অন্ততঃ অন্ধত্বের প্রচ্ছদ গ্রহণ ক'রতে হয়। আর একবার যথাকালে এই প্রসঙ্গের উত্থাপন ক'রতে হবে। চাণক্য বলেছেন; সত্য বল, প্রিয়সত্য বল, অপ্রিয় সত্য ব'লো না। দুঃখ, নির্জলা মিথ্যেকে খণ্ড-খণ্ড ক'রতে হ'লে সত্যকেই ইস্পাতের মত কঠিন ক'রে তুলতে হয়।

এই পৃথিবীতে গুলজারিলালেরা অমর। তাদের নথি-পত্র ঘাঁটলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, এই সময়ে বিপ্রদাস একাধিকবার অধমর্ণরূপে তার দ্বারস্থ হ'য়েছিলেন।

কিন্তু গুল্‌জারিলালের টাকার পয় ছিল। শরৎচন্দ্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে কলেজে প্রবেশ-লাভ ক'রেছিলেন।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পরীক্ষার পর ফল বার হওয়ার মধ্যে একটি দীর্ঘকালের ব্যবধান পড়ে। সেই ব্যবধানে বাঁধা-গোরু ছাড়া পেলে যা' চিরদিন ঘটে, শরৎচন্দ্রের পক্ষে তা' না-ঘটার কোন বিশেষ কারণ ছিল না।

এই সময়ে রাজেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা খুব জমে উঠেছিল। রাজেন্দ্রের—ওরফে রাজু এবং শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত বই-এর ইন্দ্রনাথ—সেই সময়ে, লেখা-পড়া ছেড়ে দিয়ে তাঁদের কাঠের কারখানায় ছুতোর মিস্ত্রির কাজে মন দিয়েছিলেন। তাঁর কিছু পরিচয় ইতিপূর্বে দিয়ে চুকেছি। শরৎ অবসর-বিনোদের জন্য রাজুদের কারখানায় ঘন ঘন যেতে লাগলেন। রাজুর সমাজ-শাসনের বীরত্বের বহু কাহিনী এক সময়ে এই ছোট সহরের অল্প-সংখ্যক বাঙালীর কাছে সুবিদিত ছিল।

বাঙালীটোলার মানিক সরকার ঘাটই তখন সব চেয়ে বেশী চালু ছিল। জলের কল বসেনি এবং ঘরে ঘরে জলের ব্যবস্থা দূরের মানুষেরা অগত্যা নিকটস্থ কূয়ো ইঁদারার সাহায্যে করতেন। তবে, স্নানের ব্যবস্থার জন্যে মা গঙ্গার শরণ গ্রহণ করতেই হ'ত। মালক্ষীদের একটি খিড়কির ঘাট ছিল বটে, কিন্তু সেখেনে পাড়ার মেয়েরা ছাড়া আর বড় কেউ যেতেন না। অল্প পরিসর—আর কাঁকরের দু'চারটে সিঁড়ি নেবে একেবারে অথৈ জল। অতএব নানা কারণে তা দুর্গমও ছিল।

সদর ঘাটে মেয়েদের স্নানের আলাদা বিভাগ ছিল। তাতে মধ্যে মধ্যে অবাঞ্ছিত ব্যক্তির সমাগম হ'ত। এই রকম ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হ'লে গীতাকার স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে দিয়ে বলিয়েছেন যে, তিনি যুগে যুগে সম্ভব হন। বোধ করি রাজু ছিলেন তাঁর ডেপুটি-এজেণ্ট। রংটি কালো—তাতে বসন্তের দাগ চিত্রিত। জানু পর্য্যন্ত লম্বিত বাহু।

ঘাটে দাঁতন ফেলার উপায় ছিল না: এদিকে বিহার-বাসীরা নিজেদের লোটা এবং দাঁতের সম্পর্কে অতিরিক্ত যত্নবান হওয়ায়—সাধারণ পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যের প্রতি অদ্যাপি ঔদাসীন্য বজায় রেখে বৈদিক ধারাকে অক্ষুন্ন রেখেছেন, মনে করেন। রাজু দু'পাতা ইংরিজি প'ড়ে আবার অন্য দিকে টন্‌টনে হ'য়ে উঠেছিলেন।

অপিচ, তিনি ধারে কারবার পছন্দ করতেন না। তাঁর বিচার করতে সময়ের প্রয়োজন হ'ত না। উকিলের "বহসে"র দরকার ছিল না। সাক্ষী-সাবুদের তিনি ধার ধারতেন না। কোর্ট ফি

লাগে না। সেরেস্তা-প্রণামী দিতে হয় না। শুধু একবার বিদ্যুৎদৃষ্টি নিক্ষেপ এবং নিমেষে কাজি সাহেবের মত বিচারের পরিসমাপ্তি—শাস্তিতে।

আবার সেই শাস্তিকে কাজে পরিণত করতে কোটালের দরকার হয় না। জেলের প্রয়োজন নেই। সেদিক দিয়ে তিনি প্রভুপাদ হিটলারের চেয়ে স্বাবলম্বী এবং ক্ষিপ্রহস্ত ছিলেন। লোকটির কাঁধ থেকে গামছাখানি কেড়ে নিতেই, সে রক্তচক্ষু হ'য়ে বল্‌তো :

কেঁও ?

কথার উত্তর না দিয়ে রাজেন্দ্রনাথ গামছাখানিকে মাথা ডিঙিয়ে গলায় ফেলে পাকিয়ে শক্ত ক'রে তার শ্বাস-কষ্টের অসুবিধার কথা চিন্তা করার আগেই টেনে ডুব জলে নিয়ে গিয়ে তাকে চেপে ধ'রে—এক দুই তিন গুণে দুশো হ'লেই টেনে উপরে তুলে দিয়ে—তর্জনী দেখিয়ে বলতেন :

আওর কুছ্ মাঙতে হো ?

নেহি।

তব সিধা রাস্তা ধরো, ঘর যাও। দুসরা রোজ ওহি ঘাটমে যা না।

তথাস্তু বাবা! আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

এই যে স্বয়ংশাসনের অপূর্ব বিধি-ব্যবস্থা এইটিই ছিল রাজুর আশু বিচারের বিদ্যুৎগতি অমোঘ পদ্ধতি। শরৎচন্দ্র পাড়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবতেন তা জানা নেই : কিন্তু রাজুকে তিনি পরিত্যাগ না ক'রে পরে সাহিত্যে ফলিয়ে তুলেছেন।

ভাগলপুরের গঙ্গার দক্ষিণ দিকেই যে তাঁর এই অভিনব বিচার বদান্যতা ছিল, তা মনে করলে তাঁর চক্রবর্তিতাকে ক্ষুণ্ণ করা হয়। অতিশয় সৌভাগ্যবানেরা নিশা-যোগে তাঁর ছোট ডিঙ্গি চ'ড়ে যে সব অভিযানে বা'র হতেন তার পরিচয় শ্রীকান্তে শরৎ ভালো ক'রেই দিয়েছেন।

শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তকে ফুটিয়ে তোলার জন্য ইন্দ্রনাথকে পিছনের পর্দায় পরিদৃশ্যমান করেছেন। কিন্তু দিনের আলোতে তাঁর স্বরূপ দেখার সৌভাগ্য ঘটেছিল যাদের, তারাই বা সে কথা না ব'লে কি ক'রে নিরস্ত হবে ?

ভাগলপুর সহরটি পূবে-পশ্চিমে মাইল আষ্টেক দশ হবে। বুক চিরে চ'লে গেছে নাম বদলাতে বদলাতে, ক্লীভল্যাণ্ড রোড। পশ্চিমে টিলা কুঠির পাদমূলে ক্লীভল্যাণ্ড সাহেবের কীর্তি-স্তম্ভ। তাতে স্বর্ণ অক্ষরে লেখা আছে যে সাঁওতাল-বিদ্রোহ দমনে সাহেব যে মনীষার পরিচয় দিয়েছিলেন তার তুলনা মেলা ভার।

ঐ পথ ধ'রে পূবমুখো হাঁটলে যোগসরে আসা যায়। যোগসর সহরের পুরাতন অংশ। ভগদত্ত রাজার সেকালের সব কীর্তি মুছে গেছে। কিন্তু আজও সে স্থান তরুণ নর্তকীদের নৈশ গীত নৃত্যেই শুধু মুখরিত হয়। বামে যোগীশ্বরনাথ বার্দ্ধক্যে উপনীত হ'য়ে নাম নিয়েছেন বুঢ়া নাথ। এখেনে নাকি মানসিংহ বঙ্গ-শাসন-অভিযানে তাঁবু ফেলে কয়েক রাত্রি বাস করেছিলেন। বুঢ়া নাথ তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ। সেকেলে মন্দিরটি ভক্তদের অনুগ্রহে নব-কলেবর ধারণ করেছে। মন্দিরের তাম্রলিপি মোহান্ত মহারাজ এখনও রক্ষা করছেন।

আধ মাইল পূবে অগ্রসর হ'লে বাঁ দিকে যে পথ গঙ্গার দিকে ঢালু হয়ে নেবে গেছে—

সেইখেনে বাঙালীটোলা। এই রাস্তার আধুনিক নাম মানিক সরকার ঘাট রোড। মানিক সরকার ঘাট রোড্ গঙ্গার নিকটবর্তী হয়ে সাপের জিভের মত দ্বিধা ভিন্ন হয়েছে। সোজা উত্তরে গঙ্গা—আর ডানহাতি বেঁকে পুবমুখো গেলে রামরতন মজুমদার রোড। এটি সেকালের আদামপুর।

উত্তরে মানিক সরকারে না বেঁকে যদি সোজা চ'লে যাওয়া যায় তো পোয়াটাকের মধ্যেই রাস্তা তিন ফোঁড় হয়েছে। কিন্তু আমরা পুবে যেতে চাই, মনে রাখতে হবে। ভাগলপুর সহরে একটু পাহাড়ে ভাব আছে। বাঁয়ে গেল খঞ্জরপুর রোড, ডাইনে চার্চ রোড। আর সামনে সামান্য চড়াই উঠলে ডান দিকে কাঁটি সায়েবের বাংলা। ইঞ্জিনিয়ার রামরতনের পরিকল্পনার পরিচয়। এইখেনে লর্ড সিংহ থাকার সময় বলতেন ঃ ভাগলপুর তো প্যারাডাইস্। তারপর, বাঁয়ে কমিশনর সাহেবের কুঠি—তার সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড মাঠ। আরো খানিকটা পুবে গেলে বাঁ দিকে কয়েকটা ছোট খাট বাড়ীর পর সুখরাজ রায়ের বাড়ী। এত বড় বাড়ী আর দুটো নেই ভাগলপুরে। ডান দিকে দেখলে স্যাণ্ডিস্ সায়েবের হাতা।

সব চেয়ে আগে চোখে পড়ে একটি মাঝারি গোছের টিলা। মানে, কাঁকর আর মাটির বড় গোছের ঢিবি। এটির একটি সুন্দর গল্প আছে। স্যাণ্ডিস কে ছিলেন জানিনে ঃ কিন্তু তাঁকে যেন চোখে দেখতে পাওয়া যায়। ছেলে বয়স থেকে তাঁর কথা শুন্‌তে শুন্‌তে তিনি মনের কাছে এত পরিচিত হ'য়েছেন যে তাঁর সম্বন্ধে যেন আর কোন প্রশ্ন উঠে না। দেখতে পাই—সায়েব হাত কাটা জামা পরা, হাফ প্যান্টে কোদাল চালিয়ে চ'লেছেন, মাথায় একটা ষ্ট্র-হ্যাট। তিনি নাকি ব্যায়াম ক'রতেন মাটি কেটে। টিলার পাশের সে গর্ত মজে গিয়েছে ; কিন্তু বুজে যায় নি। সায়েবদের কাজ ভালোবাসা আর কাজের তৎপরতার এত পরিচয় আছে যে, আমাদের পক্ষে এটি অসম্ভব মনে ক'রলেও তাদের পক্ষে অসম্ভব নয়, মনে ক'রতেই যেন মন চায়। দূরে একটা বুড়ো বটগাছ আছে।

গল্প শোনা যায় যে, সায়েবের খাট নাকি বটের ডালে ঝুলতো। তাতেই রাতে তিনি নিদ্রা দিতেন। গল্পের মা-বাপ নেই, রোদ-বৃষ্টি শীত-গ্রীষ্ম নেই, আর আমাদের বিশ্বাস ক'রে নেওয়ার শক্তিও কম বড় নয়। এই স্যাণ্ডিসের প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যে সায়েবদের ক্লাব। সেখেনে দিনান্তের কর্তব্য সেরে ওরা হাসে-নাচে, গান গায়, মদ খায়, তাস খেলে, বিলিয়ার্ড খেলে আর বিদেশে পরস্পরের ঐক্য দৃঢ় করে। বই আছে, খেলার বিপুল সাজ সরান্‌জাম আছে। খাওয়ার ব্যবস্থা তো থাকবেই এবং অভ্যাগত আগন্তুকের থাকার স্থানও হয়। এই ক্লাবটি চিরদিন তরুণদের বিস্ময়, কৌতূহল আকর্ষণ ক'রে আজও মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। এটি এককালে কালীঘাটের হালদারদের কি ক'রে জমিদারিভুক্ত হয়েছিল জানিনে, কিন্তু এখন ওটি সরকারি খাস-মহলের অন্তর্ভুক্ত—নামমাত্র দক্ষিণায় ওদের করতলগত।

ক্লাবের হাতা পেরিয়ে—তিলকা মাঝি। একটা বট গাছের নীচে কুয়ো বুজিয়ে চত্তর করা হ'য়েছে। এই সাঁওতাল ডাকাত পথিকের ধন লুণ্ঠন ক'রে এই গাছের ডালে তাকে ঝুলিয়ে দিয়ে দারিদ্র্য দুঃখের শান্তি ক'রে দিত। এইখেনেই সেকালের সহরের শেষ ছিল।

তার পর আমাদের বাঁ হাতি যেতে হবে উত্তর পুবে। মাইল দেড়েক গেলে—বাবারি। এখেনে ঠাকুরদের জমিদারি—বড় বড় বাড়ী, ইস্কুল, হাঁসপাতাল আর মন্টের ঘাট।

তিলকা মাঝির পূবে চ'লেছে সোজা বড় বড় গাছের ছায়া-নিবিড় চওড়া সড়ক। ডান দিকে রেস্ কোর্শ আর বাঁয়ে সেনট্রাল জেল। আরো গেলে সাবোর।

এইবার বুঝতে পারছি যে আমার কৈফিয়ৎ দিতে হবে। ভাগলপুরের এত বড় একটা ভূ-বৃত্তান্ত দেওয়ার দরকার?

শরৎচন্দ্র ঘরে ব'সে ভালো মানুষটির মত যৌবনে মোটেই "গুড বয়" ছিলেন না—পশ্চিমে সাহজাহঙ্গী তলাও থেকে আরম্ভ ক'রে—পূবে বাবারির সন্নিকট গুম্ফা পর্য্যন্ত তাঁদের লীলাক্ষেত্র ছিল। আর একটি কথা।—তাঁর বইএর পথঘাটের বর্ণনার মধ্যে এই পট-ভূমিকে বার বার আসতে দেখি। তাই মনে হয়, এই প্রসঙ্গ শরৎচন্দ্রকে এবং তাঁর বইগুলিকে ঠিক ক'রে বুঝতে, ভাগলপুরের পথ-ঘাটের সহিত কথঞ্চিৎ পরিচয় থাকা মন্দ নয়।

এইবার আমরা রাজুর আর একটি কীর্ত্তির উল্লেখ ক'রব।

বাবারির জমিদারেরা মৈথিলী ব্রাহ্মণ। এঁদের সঙ্গে বাঙালীর অনেকটা সমসাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। আচার-ব্যবহার, ভাষার নৈকট্য এবং প্রবাসী বাঙালীর সেকালে বৈশিষ্ট্যের জন্য এই জমিদার বংশের মধ্যে বাঙালী প্রভাব দেখতে পাওয়া যেত। এখানকার ফ্রী-ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আজও বাঙালী। সেকালে বেহারের স্কুলে বাঙালী শিক্ষকের সংখ্যা বিহারীদের চেয়ে বেশী ছিল। একজন নিম্নতন শিক্ষক স্কুলের কেরাণীর কাজ তখন ক'রতেন। অধ্যাপনার কাজ সেরে আপিসের প্রয়োজনীয় কাজ ক'রে তাঁর বাড়ী ফিরতে বেশ রাত হ'য়ে যেত।

একদিন বৃক্ষবহুল অন্ধকার পথে এই নিরীহ শিক্ষকটি অন্ধকারে একলা ফিরছিলেন। হঠাৎ পিছনে ঘোড়ার পায়ের শব্দের পর তাঁর পিঠের উপর সশব্দে চাবুক পড়ল এবং নিমেষে সাহেবের টম্-টম্-গাড়ি অন্ধকারে মিশে গেল। কি অপরাধে যে এতবড় শাস্তি ঘটে গেল তা' সেই মাষ্টারমশাইটি বুঝে উঠতে পারলেন না। তিনি শুনেছিলেন যে রাজু এই রকম অত্যাচারের প্রতিকারের ভার, কথা কানে যাওয়া মাত্রেই, হাতে নিয়ে থাকেন। অতএব বাড়ী যাওয়ার আগে তিনি রাজুকে নিজের পিঠের উপর রক্তাক্ত দাগটি দেখিয়ে এলেন।

তিনি বললেন: আপনি বাড়ী যান। কালকে ছুটি নেবেন। পরশু কি হয় তা' শুনতে পাবেন।

ভগ্‌গু সিংএর 'হাপ' ইষ্টিমার আদামপুর ঘাটে বাঁধা হ'ত। অতএব একটা কাছি সংগ্রহ করা রাজুর পক্ষে একান্ত সহজ। এবং রাজুর বন্ধু-বান্ধবেরও অভাব ছিল না। অতএব সন্ধ্যার পর সদলবলে রাজেন্দ্রনাথ ছায়াবহুল ঘনান্ধকার স্থানে গিয়ে সমাসীন হ'লেন। সাহেবটি নিত্য ক্লাবে খেলতে যান। সেদিনও যথা সময় টম্‌টম্ হাঁকিয়ে চ'লে গেলেন। রাত নটার সময় ক্লাব বন্ধ হয়।

দূরে সাহেবের গাড়ির আলো দেখা যেতেই দুধারের দুটি গাছে কাছির দুটি প্রান্ত টেনে বেঁধে দিয়ে রাজুর দল নিঃশব্দে প্রতীক্ষা ক'রতে লাগল।

সাহেব স্বপ্নেও চিন্তা করেনি যে, এমন একটা বিপদ ঘট্‌তে পারে। ঘোড়া এসে কাছিতে বেধে গেল এবং সাহেব ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে, পথের মধ্যে চিৎপাৎ। এই সুবর্ণ সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন রাজেন্দ্রনাথ। তিনি সাহেবকে উত্তম-মধ্যম ধনঞ্জয় দান ক'রে বললেন:

আওর কভি বেকসুর মুসাফির কো মারো গে ?

নেভার।

বোলো, মাফ ক'রো······

মাফ করো।

ঘর যাও।

অকু-স্থান থেকে সাহেবের ঘর খুব দূরে ছিল না।

উপেক্ষিত

শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

পৃথিবী দিয়েছে জ্বালা, তবু আমি নিত্য তারি দ্বারে
প্রেমের রাগিণী গাহি' লজ্জাহীন গেছি বারে-বারে
এই গর্বে চিত্ত ভরি ঃ একদা পূর্ণিমা রজনীতে
সহসা মূর্ছনা হানি' রাগদীপ্ত আমার সঙ্গীতে
সে মোর ফেলিবে কাঁদি', বুঝিবে আমার মুখে চাহি'
কী আশায়, মুগ্ধ-মনা দ্বারে তার নিত্য গান গাহি।

যে-প্রেম হৃদয়ে ছিল, পৃথিবীর সত্যকার স্নেহে
ভেবেছিনু মঞ্জরিত হবে ; প্রেয়সী পৃথিবী-দেহে
সে-প্রেমের লাবণ্যের ভেবেছিনু হেরিব প্রকাশ ;
ফেরো কবি ক্ষুব্ধ-মনা, পৃথিবী করেছে পরিহাস
তোমার স্বপ্নের পৃথিবীরে ; ভাবে নাই ক্ষণতরে
কী গভীর অভিমানে চক্ষে তব ব্যর্থ অশ্রু ঝরে।

নামে বিস্মৃতির রাত্রি ; অন্ধকারে তীব্র অবহেলা,
তারি বুকে হয় হ'ক, সুপ্ত হ'ক জীবনের মেলা।



বিপিনের সংসার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দিন কুড়ি বাইশ কি মাস খানেক বিপিনের ডাক্তারখানায় একটিও রোগী আসিল না।

রোজই সকালে বিকালে নিয়মিত ডাক্তারখানায় গিয়া তীর্থের কাকের মত বসিয়া থাকে। হাতের পয়সা কড়ি ফুরাইয়া গেল। কোনো দিকে রোগ বালাই নাই, দেশটা হঠাৎ যেন মধুপুর কি শিমুলতলা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জীবনটাও যেন বড় ফাঁকা ফাঁকা। মানী তো নাই-ই, ছিল শান্তি সেও আজ মাস দুই শ্বশুর বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। সকাল সন্ধ্যা একেবারে কাটে না। দত্ত মশায় অবশ্য আছেন, কিন্তু তাঁহার মুখে ধর্ম্মতত্ত্ব শুনিয়া শুনিয়া একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে, আর ভাল লাগে না।

মনোরমার জন্য মন কেমন করে আজকাল। মনোরমাকে সাপে কামড়ানোর পর হইতে বিপিন লক্ষ্য করিতেছে স্ত্রীর উপর তাহার মনোভাব অদ্ভুত ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কেবলই মনে হয় মনোরমা তো চলিয়া যাইতেছিল, একদিনও সে মনোরমাকে মুখের একটি মিষ্ট কথাও বলে নাই, এ অবস্থায় যদি সেদিন সে সত্যই মারা পড়িত বিপিনকে চিরজীবন অনুতাপ করিতে হইত সে সব ভাবিয়া।

সুখের মুখ কখনো সে দেখে নাই, বিপিন তাহাকে এবার সুখী করিবে। মানুষের মনের এই বোধ হয় গতি, বড় বড় অবলম্বন যখন চলিয়া যায়, তখন যে আশ্রয়কে অতি তুচ্ছ, অতি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হইত, তাহাই তখন হইয়া দাঁড়ায় অতি প্রিয়, অতি প্রয়োজনীয়। মনোরমার চিন্তা কখনো আনন্দ দেয় নাই, আজকাল দেয়। তাহার প্রতি একটা অনুকম্পা জাগে, স্নেহ হয়, তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা হয়। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার এ সব!

বিপিন অনেকদিন বাড়ী যায় নাই, কিছু টাকা হাতে আসিলে একবার বাড়ী যাইত। কিন্তু এই সময়ই হাত একেবারে খালি।

দত্ত মহাশয় একদিন বলিলেন, ডাক্তারবাবু, শান্তি কাল পত্র লিখেচে, আপনার কথা জিগ্যেস করেচে, আপনি কেমন আছেন, ডাক্তারি কেমন চলচে। আর একটা কথা লিখেচে, ওর শ্বশুরের চোখ অস্ত্র হবে কলকাতা বা রাণাঘাটের হাঁসপাতালে। আপনি সে সময়ে সময় করে দুদিনের জন্যে ওদের ওখানে থেকে শ্বশুরের সঙ্গে রাণাঘাট বা কলকাতা যেতে পারবেন কিনা লিখেচে। শান্তি থাকবে, আমার জামাই থাকবে। অবিশ্যি আপনার ফি এবং যাতায়াতের খরচা ওরা দেবে। একটা দিন কিংবা দুটো দিন লাগবে। আপনি থাকলে ওদের একটা বলভরসা। ওরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ, হাঁসপাতালের মুলুক সন্ধান কিছুই জানে না। আপনার কত বড় বড় ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ, আপনি পড়েচেন সেখানে। তাই আপনাকে নিয়ে যেতে চায়।

বিপিন বলিল, বেশ লিখে দেবেন আমি যাবো, তবে ফি দিতে চাইলে যাবো না। যাতায়াতের খরচ দিতে চান, দেবেন তাঁরা, কিন্তু ফির কথা যেন না ওঠান।

দত্ত মশায় আর কিছু বলিলেন না, কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিয়া বিপিনের মনে হইল তাহার উপর তিনি খুব সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

দিন পাঁচ ছয় পরে দত্ত মশায় একদিন সকালে বিপিনকে ডাকিয়া ঘুম ভাঙাইলেন। পূর্ব্ব রাত্রে শান্তির শ্বশুর বাড়ী হইতে লোক আসিয়াছে, রাণাঘাট হাঁসপাতালে শান্তির শ্বশুরকে লইয়া যাওয়া হইবে, বিপিনকে আজ এখনি রওনা হইতে হইবে, বেশী রাত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া দত্ত মশায় বিপিনকে গত রাত্রে কিছু বলেন নাই।

সাত ক্রোশ পথ গরুর গাড়ীতে অতিক্রম করিয়া প্রায় বেলা দুইটার সময় বিপিন শান্তির শ্বশুর বাড়ী গিয়া পৌঁছিল। শান্তির স্বামী গোপাল প্রথমেই ছুটিয়া আসিল। বলিল, ওঃ এত বেলা হয়ে গেল ডাক্তারবাবু! বড্ড কষ্ট হয়েচে, এই রোদ্দুর! ও কতক্ষণ থেকে আপনার জন্যে নাইবার জল, চায়ের যোগাড় করে নিয়ে বসে আছে। আমরা তো আশা ছেড়েই দিয়েছিলুম।

বিপিন গিয়া বাহিরের ঘরে বসিল। তাহার বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছে, এখনি আজ শান্তির সঙ্গে দেখা হইবে। বিপিন ভাবিয়া অবাক হইল, শান্তির সঙ্গে দেখা হইবার আগ্রহে মনের এই রকম অবস্থা—এ কি কল্পনা করা সম্ভব ছিল তিন মাস পূর্ব্বেও? মানী নয়, শান্তি। কে শান্তি? ক'দিন তাহার সহিত পরিচয়? উত্তেজনা ও আনন্দের মধ্যেও কেমন এক প্রকার অস্বস্তিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল।

শান্তি একটু পরেই আধ ঘোমটা দিয়া ঘরে ঢুকিল এবং বিপিনের পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল। হাসিমুখে বলিল—আমি বেলা দশটা থেকে কেবল ঘর বার করচি—এত বেলা হবে তা ভাবিনি। শুনুন, এখন চা খাবেন, না ডাব কেটে রেখেচি তাই দেবো?

বিপিন হাসিয়া বলিল—যা তোমার খুসি শান্তি। তোমার হাতের মধ্যে যখন এসে পড়েচি তখন তোমার যা ইচ্ছে খাওয়াও, আপত্তি নেই।

—তবে ডাবই আনি।

ডাব লইয়া আবার তখনি শান্তি ঘরে ঢুকিল। বলিল—একটু জিরিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে ডাব খান।

—তোমার শ্বশুর মহাশয়কে একবার দেখবো।

—এখন না। বাবা খেয়ে ঘুমুচ্চেন একটু, বুড়োমানুষ। আপনি নেয়ে নিয়ে রান্না চড়িয়ে দিন, তার পর—

বিপিন বিস্ময়ের সুরে বলিল—সে কি শান্তি! রান্না চড়িয়ে নেবো কি? এত বেলায়—

শান্তি হাসিয়া বলিল—ও সব চলবে না এখানে। ব্রাহ্মণ মানুষকে আমরা কিছু রেঁধে দিতে পারিনে। আমি সব যোগাড় করে দেবো, আপনি শুধু নামিয়ে নেবেন। আকাশ পাতাল ভাবতে হবে না আপনার সেজন্যে।

শান্তির আশ্বাস দেওয়ার মধ্যে এমন একটা জিনিস আছে যাহাতে বিপিনের মন একেবারে লঘু ও নিশ্চিন্ত হইয়া উঠিল। শান্তি সেবাপরায়ণা মেয়ে বটে, কাজের মেয়েও বটে, তাহার উপর নির্ভর শীলতা কেমন যেন আপনিই আসে।

গোপাল আসিয়া বলিল—চলুন, নদীতে নাইয়ে নিয়ে আসি।

বিপিন বলিল—নদী পর্য্যন্ত আপনার কষ্ট করে যাওয়ার কি দরকার। আমায় দেখিয়ে দিলেই তো। গোপাল তাহাতে রাজি নয়, বিপিন বুঝিল শান্তিই বলিয়া দিয়াছে তাহাকে নদীর ঘাটে লইয়া গিয়া স্নান করাইয়া আনিতে। শান্তির প্রভাব ও প্রতিপত্তি এখানে খুব বেশী, এমন কি মনে হইল বাপের বাড়ী অপেক্ষা বেশী।

স্নানাহারের পর শান্তি বাহিরের ঘরে নিজে বিপিনের বিছানা করিয়া দিল। বিপিন বলিল—শান্তি, আমি দুপুরে ঘুমুই নে তুমি জানো, বিছানা কিসের—তার চেয়ে বোসো এখানে দুটো কথাবার্ত্তা বলি।

শান্তি হাসিয়া বলিল—না তা হবে না, একটু বিশ্রাম করে নিতেই হবে। কাল আবার এখান থেকে আট ক্রোশ রাস্তা গরুর গাড়ীতে গিয়ে ট্রেণ ধরতে হবে।

—ও কষ্ট কিছু না, তোমার শ্বশুর উঠেচেন কি না দেখ। একবার তাঁর চোখটা দেখি। বিপিন চোখের সম্বন্ধে কিছুই জানে না, তবুও তাহাকে ভান করিতে হইল যে সে অনেক কিছু বুঝিতেছে। শান্তির শ্বশুরের দুই চারিটি চক্ষুপীড়া সংক্রান্ত অস্বস্তিকর প্রশ্নের উত্তরও তাহাকে দিতে হইল।

গ্রামখানি বিকালে ঘুরিয়া দেখিল, পিপলিপাড়া বা সোনাতনপুরের মতই জঙ্গলে ভরা, এ অঞ্চলের অধিকাংশ গ্রামই তাই। শান্তিদের বাড়ীর পিছনেই তো প্রকাণ্ড বাগান, চারি ধার বাঁশবনে ঘেরা, দিনমানেও রোদ ওঠে না সেদিকটাতে, বলিয়া মনে হয়।

সন্ধ্যাবেলা বেড়াইয়া ফিরিল। এমন একটা ছবি দেখিল ফিরিয়া, যাহা তার অনেক দিন মনে ছিল। বাড়ীর পিছনে ঘন বন বাগানের ধারে একটি বাতাবী লেবু তলায় ঢেঁকি পাতা। সেখানে শান্তি ও আর একটি প্রৌঢ়া বিধবা মেয়েমানুষ চিড়ে কুটিতেছে—শান্তি তাহাকে সেখানে ডাকিল। বিপিন সেখানে গিয়া দাঁড়াইল, প্রৌঢ়া বিধবা মেয়েমানুষটী ঢেঁকিতে পাড় দিতেছিল, শান্তি ঢেঁকির গড়ে ধান দিয়া যাইতেছে। তাহাকে বসিতে একখানা পিঁড়ি দিয়া হাসিয়া বলিল—বসুন। এখানে বসে গল্প করুন আমি সরু ধান দুটো ভেনে চাল করে নিচ্চি, কাল সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। বাবা অন্য চাল খেতে পারেন না।

বিপিন চাহিয়া দেখিল বনবাগানের আড়াল হইতে চাঁদ উঠিতেছে। কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া, প্রায় পূর্ণচন্দ্রের মতই বড় চাঁদখানা। বাঁশবন নিস্তব্ধ, ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকিতেছে সন্ধ্যায়, খুব নির্জ্জন গ্রামখানা, লোকজন বেশী নাই, পিপলিপাড়ায় হাটতলার চেয়েও নির্জ্জন।

কিন্তু বেশ লাগিল এই বনবাগানের মধ্যে ঢেঁকিশালের জায়গাটা, চাঁদ-ওঠা এই সুন্দর সন্ধ্যা, শান্তির সুমিষ্ট অভ্যর্থনাটি, বাতাবী লেবুফুলের সুগন্ধ।

সে বলিল, তুমি ভারি কাজের মেয়ে কিন্তু শান্তি। আবার দিব্যি ধান ভানতেও পারো দেখচি।

শান্তি হাসিয়া ফেলিল। বিধবা মেয়েমানুষটিও মুখে কাপড় দিয়া হাসিল। শান্তি বলিল, এ না করলে গেরস্ত ঘরে চলে কি, বলুন আপনি? এখন ধরুন আমার শ্বশুরের তিন গোলা ধান হয় বছরে, রোজ ধান ভানা, চিঁড়ে কোটার জন্যে কাকে আবার খোসামোদ করে বেড়াবো? ওই মতির মা আছে আর আমি আছি—

—বেশ গাঁখানা তোমাদের, বেড়িয়ে এলাম—

—চড়কতলার দিকে গিয়েছিলেন?

—চিনি তো নে, কোন তলা। এমনি খানিকটা ঘুরলাম—

শান্তি উঠিয়া বলিল, দাঁড়ান, আপনার চা করে আনি, এখানে বসে খাবেন আর গল্প করবেন, মতির মা, রাখো। আমি আসি আগে, যাবো আর আসবো—

চা ও খাবার লইয়া সে খুব শীঘ্রই ফিরিল বটে।

বিপিন বলিল, হালুয়া গরম রয়েচে, এখন করে আনলে নাকি?

—আমি না, মা করেচেন। আমি শুধু চা করে আনলাম, সেকেলে বুড়ী, চা করতে জানেন না। ভারি আমোদ হচ্চে আমার, আপনি এসেচেন বলে।

—সত্যি?

—সত্যি না তো কি মিথ্যে? রাত্রে আপনাকে আর রাঁধতে হবে না, আমি লুচি ভেজে দেবো।

—কেন, আমি ভাত রেঁধেই নিতাম, আবার লুচির হাঙ্গামা—

—হাঙ্গামা কিছু না। আমার শ্বশুর বাড়ীরা বড় লোক, এদের এক কাঁড়ি টাকা আছে, খাইয়ে দিলাম বা কিছু টাকা বাপের বাড়ীর লোককে?

শান্তির কথার ভঙ্গি শুনিয়া বিপিন হাসিয়া উঠিল, প্রৌঢ়া মতির মাও অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া (কারণ বিপিনের সামনে হাসা তাহার পক্ষে অশোভন) হাসিয়া বলিল—কি যে বলেন বড় খুড়ীমা আমাদের! শুনতেই এক মজা।

শান্তি যে এমন হাসাইতে পারে, বিপিন তাহা জানিত না, রসিকা মেয়ে সে খুব পছন্দ করে; পছন্দ করে বলিয়াই এটুকু জানে, ভাল হাসাইতে পারে এমন মেয়ের সংখ্যা বেশী নয়। শান্তির একটা নূতন দিক যেন সে দেখিল।

শান্তি ছেলেমানুষের মত আবদারের সুরে বলিল, একটা ভূতের গল্প বলুন না?

—ভূতের গল্প! নাও ধান ভেনে, আর এখন রাত্তির দুপুরে ভূতের গল্প করে না।

—না বলুন।

বিপিন একটা গল্প বানাইয়া বলিল। অনেক দিন আগে কাহার মুখে একটা গল্প শুনিয়াছিল, সেটিও বলিল। চাঁদ এবার অনেকদূর উঠিয়াছে, বিপিন শান্তির সহিত গল্পের ফাঁকে ফাঁকে ভাবিতেছিল মানীর কথা, মৃতা বাগদী মেয়েটির কথা, মনোরমার কথা, কামিনী মাসির কথা।

মানীর সঙ্গে এই রকম ভাবে গল্প করিতে পারিত এই রকম সন্ধ্যায়! না, তাহা হইবার নয়। মানীর শ্বশুর বাড়ী এরকম পাড়াগাঁয়েও নয়, মানী এ রকম বসিয়া বসিয়া ধানও ভানিবে না।

ইতিমধ্যে মতির মা কি কাজে একটু বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতেই বিপিন জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, শান্তি—মতির মা বলে ডাকচো, ওর মতি বলে মেয়ে ছিল?

শান্তি বিস্মিত হইয়া বলিল—আপনি ওকে চেনেন?

—ও কি জাত?

—বাগদী কিংবা ডুলে। আপনি ওর কথা জানলেন কি করে?

—বলচি। ওর বাড়ী কি ভাসানপোতা ছিল?

শান্তি আরও অবাক হইয়া বলিল—ভাসানপোতা ওর শ্বশুর বাড়ী। এ গাঁয়ে ওর বাপের বাড়ী। ওর স্বামী ওকে নেয় না অনেক দিন থেকে। ওর মেয়ে মতি ওর বাপের কাছেই ছিল, তার বিয়ে হয়েছে এই দিকে যেন কোথায়। আমি তাকে কখনো দেখিনি, সে এখানে আসে না।

—আচ্ছা, তুমি জানো মতির সঙ্গে ওর মার দেখা হয়েছিল কতদিন আগে?

—না। কেন বলুন তো—এত কথা জিজ্ঞ্যেস্ করচেন কেন?

—ওকে কথাটা জিগ্যেস্ করবে? নয়তো থাক্। আজ জিগ্যেস্ কোরো না—পরে বলবো এখন। ইতিমধ্যে মতির মা আসিয়া পড়াতে বিপিন কথা বন্ধ করিল। প্রৌঢ়া আবার ঢেঁকিতে পাড় দিতে আরম্ভ করিল। বিপিন ভাবিল, হয়তো এ জানে না তাহার মেয়ে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল এবং তাহার সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। আজ কৃষ্ণা দ্বিতীয়া, ঠিক এই পূর্ণিমার আগের পূর্ণিমার রাত্রে। বল্লভপুরের বিলের ধারের সে ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত বিপিন ভুলে নাই। সে রাতটিতে বাগদীর মেয়ে মতি তাহার মনে একটা খুব বড় দাগ রাখিয়া গিয়াছে। অন্য এক জগতের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়া গিয়াছে।

অভাগিনী বৃদ্ধা, জানেও না তাহার মেয়ের কি ঘটিয়াছে।

পরদিন শান্তি যখন চা দিতে আসিল, তখন নির্জ্জনে পাইয়া বিপিন মতির কাহিনী শান্তিকে শুনাইয়া দিল। শান্তি যেমন বিস্মিত হইল, তেমনি দুঃখিত হইল। বলিল—আমার মনে হয় মেয়ে যে ঘর থেকে চলে গিয়েচে একথা ও জানে, কারো কাছে প্রকাশ করে না সেকথা—তবে সে যে মরে গিয়েচে একথা জানে না। জানবার কথাও নয়, বল্লভপুরে ওরা লুকিয়ে এসে ঘর বেঁধে থাকতো, কাউকে পরিচয় তো দেয়নি—কি করে জানবে কোথাকার কার মেয়ে? ভাসানপোতা থেকে জেয়ানা বল্লভপুর কতদূর?

—তা আট ন' ক্রোশ খুব হবে।

—তা হোলে ও কিছুই জানে না, মেয়ে ঘর ছেড়ে বের হয়ে গিয়েচে, একথাও শোনে নি। এতদূর থেকে কে খবর দেবে। ওকে আর কোনো কথা জিগ্যেস করার দরকার নেই।

পরদিন বিকালে দুইখানি গরুর গাড়িতে শান্তি, শান্তির স্বামী গোপাল, বিপিন ও শান্তির শ্বশুর ষ্টেশনে আসিল এবং সন্ধ্যার পরে রাণাঘাটে পৌঁছিয়া সিদ্ধান্তপাড়ার বাসায় গিয়া উঠিল। শান্তির এক মামাশ্বশুর বাসা পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। দুখানি মাত্র ঘর, একখানা ছোট রান্নাঘর, ছোট একটু উঠান। ভাড়া পাঁচ টাকা।

শান্তি অজ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, দরাজ জায়গায় হাত পা ছড়াইয়া খেলাইয়া বাস করা অভ্যাস,

সে তো বাসা দেখিয়া স্বামীকে বলিল—এখানে কেমন করে থাকবো হ্যাঁ গা—ওমা, এ কি উঠান—আর ওইটুকু রান্নাঘরে কি রাঁধা যায়? আর ওই পাতকুয়োর জলে নাইবো?

রাণাঘাটে বিপিন আসিল অনেকদিন পরে। মানীদের বাড়ীতে কাজ করিবার সময় কোর্টে তখন আসিতেই হইত। এইজন্যই রাণাঘাটের অনেক জিনিসের সঙ্গে মানীর কথা যেন জড়ানো। গোপালের সহিত বাজার করিতে বাহির হইয়া বিপিন দেখিল পূর্ব্বপরিচিত কত দৃশ্য তাহার মনে কষ্ট দিতেছে—মানীর কথা অনেকটা চাপা পড়িয়া গিয়াছিল, আবার অত্যন্ত নূতন রূপে সে সব দিনের স্মৃতি মনের দ্বারে ভিড় করিতে লাগিল। কষ্ট হয়, সত্যই কষ্ট হয়।

সকালে গোপাল এবং শান্তির শ্বশুরকে লইয়া বিপিন রাণাঘাট হাঁসপাতালে ডাক্তার আর্চ্চারের কাছে গেল। বলাই যখন হাঁসপাতালে ছিল, তখন আর্চ্চার সাহেবের সঙ্গে বিপিনের আলাপ হয়। আর্চ্চার সাহেব বিপিনকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন। বলিলেন—আপনার ভাই কোথা? মারা গিয়েচে? তা যাবে, বাঁচবার কোনো আশা ছিল না।

শান্তির শ্বশুরের চোখ দেখিয়া বলিলেন—এখন এঁকে দশ বারোদিন এখানে থাকতে হবে। চোখে একটা ওষুধ দিচ্চি—চোখ কেমন থাকে, কাল আমায় এসে জানাবেন। কাটাবার এখন দরকার নেই। বলাই যে জায়গাটাতে শুইয়া থাকিত খাটে—বিপিন সেখানটা গিয়া দেখিয়া আসিল। এখন অন্য রোগী রহিয়াছে।

বলাই…মানী…কামিনী মাসী…স্বপ্ন……

হাঁসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিপিন দেখিল শান্তি বাসা বেশ চমৎকার গুছাইয়া লইয়াছে। দুটি ঘরের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোট ঘরটিতে বিপিনের একা থাকিবার এবং বড় ঘরটিতে উহারা তিনজনের একত্র থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। দুটি ঘরই ইতিমধ্যে ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়াছে, মেঝে জল দিয়া ধুইয়া ফেলিয়া শুকনো নেকড়া দিয়া বেশ করিয়া মুছিয়া ফেলিয়াছে। বিছানাপত্র পাতিয়াছে দুটি ঘরেই, বাহিরে বসিবার জন্য একটি সতরঞ্চি পাতিয়া রাখিয়াছে। উহাদের দেখিয়া বলিল—কি হোল বাবার চোখের?

বিপিন বলিল—চোখ কাটতে হবে না—তবে এখানে দশ বারোদিন এখন থাকতে হবে। ওষুধ দিয়ে ছানি নষ্ট করে দেবে বল্লে। ওঃ, তুমি যে শান্তি, বেশ গুছিয়ে ফেলেছ ঘরদোর?

শান্তি হাসিয়া বলিল—এখন নেয়ে ধুয়ে নিন্ সব। আমি বাবাকে নাইয়ে নি।

শান্তির শ্বশুর চোখে ভাল দেখিতে পান না, শান্তি তাঁহাকে কি করিয়াই সেবা করিতেছে, দেখিয়া বিপিন মুগ্ধ হইল। মা যেমন অসহায় ছোট ছেলের সব কাজ নিজে করিয়া দেয়, সকল অভাব অভিযোগের সমাধান নিজে করে, তেমনি করিয়া শান্তি অসহায় বৃদ্ধকে সকল দিক হইতে আগুলিয়া রাখিয়া দিয়াছে।

অথচ সে বালিকার মত খুসি সহরে আসিয়াছে বলিয়া। সোনাতনপুরের মত অজ পাড়াগাঁয়ে বাপের বাড়ী, শ্বশুর বাড়ীও ততোধিক অজ পাড়াগাঁয়ে—রাণাঘাট তাহার কাছে বিরাট সহর। এখানকার প্রত্যেক জিনিষটি তাহার কাছে অভিনব ঠেকিতেছে। সে চিরকাল সংসারে খাটিতেই জানে, কিন্তু বাহিরের আনন্দ কখনও পায় নাই—জীবনে বিশেষ কিছু দেখেও নাই, তাহার শ্বশুর

বাড়ীর গ্রামে মনসাপূজার সময় মনসার ভাসান হয় প্রতি শ্রাবণ মাসে, বৎসরের মধ্যে এই দিনটিই তাহার কাছে পরম উৎসবের দিন। সাজিয়া গুজিয়া মনসাতলায় পাড়ার অন্যান্য বৌঝিয়ের সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা ভাসান শুনিতে যাইবে, এই আনন্দে শ্রাবণ মাসের পয়লা হইতে দিন গুনিত। তাহার মত মেয়ের রাণাঘাট সহরে আসিয়া অত্যন্ত খুসি হইবারই কথা।

শান্তির শ্বশুর বিপিনকে বলিলেন—ডাক্তার বাবু, এখানে টকি বয়োস্কোপ হয় তো?

বিপিনও পাড়াগাঁয়ের লোক, সেও কখনো ওসব দেখে নাই—কিন্তু ইহাদের কাছে সে কলিকাতার পাশ-করা ডাক্তারবাবু, তাহাকে পাড়াগাঁয়ের ভূত সাজিয়া থাকিলে চলিবে না। সে তখনি জবাব দিল—ও টকি? হয় বৈকি, খুব হয়।

—আপনি বৌমাকে নিয়ে গিয়ে একদিন দেখিয়ে আসুন। আমার কখন কি দরকার হয়, গোপাল থাকুক। বৌমা কখনো জীবনে ওসব দেখে নি—বেচারী দেখুক একটু—

—কেন গোপালও তো দেখেনি—সে-ই যাক শান্তিকে নিয়ে?

—গোপাল না থাকলে আমার কাজকর্ম্ম আপনি ব্রাহ্মণ, আপনাকে দিয়ে তো হবে না ডাক্তারবাবু, তারপর বৌমা আমার কাছে থাকলে—গোপাল একদিন যাবে এখন।

শান্তি রান্নাঘরে রান্না করিতেছে—গোপাল বসিয়া তরকারি কুটিতেছে, বিপিন গিয়া বলিল—শান্তি, টকি বায়োস্কোপ দেখতে যাবে? মিত্তির মশায় বললেন তোমাকে নিয়ে দেখিয়ে আসতে।

শান্তি বালিকার মত উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল—কোথায়, কোথায়, কখন হবে? চলুন না, আজই চলুন—কখন হয় সে? আমি কখনো দেখিনি। আমার মেজ ননদের মুখে টকির গল্প শুনেছি, সেই থেকে ভারি ইচ্ছে আছে দেখবার।

বিপিনও টকির খোঁজ বিশেষ কিছু জানে না—দুপুরের পর বাহির হইয়া সন্ধান করিয়া জানিল বড়বাজারে ফেরিফ্যান রোডের ধারে এক কোম্পানী কলিকাতা হইতে আসিয়া মাস দুই টকি দেখাইতেছে—অদ্যকার পালা হইবে 'নরমেধ যজ্ঞ' এবং উহা ছটার সময় আরম্ভ হইবে।

বেলা চারিটার সময় সে শান্তির শ্বশুরের ঔষধ কিনিতে ডাক্তারখানায় গেল—যাইবার সময় শান্তিকে তৈরী থাকিতে বলিয়া গেল। সাড়ে পাঁচটার সময় ফিরিয়া দেখিল শান্তি সাজিয়া গুজিয়া অধীর আগ্রহে ঘর-বাহির করিতেছে। বলিল—উঃ, বাপরে, বেলা কি আর আছে। টকি শেষ হয়ে গেল এতক্ষণ। চলুন, শীগগির।

বিপিন বলিল—গাড়ী আনবো, না হেঁটে যেতে পারবে? মিত্তির মশাই কি বলেন?

শান্তির শ্বশুর বলিলেন—আপনিও যেমন, কে-ই বা ওকে চিনচে এখানে, হেঁটেই যাক না।

পথে বাহির হইয়াই শান্তি বলিল—উঃ, পায়ে বড্ড কাঁকর ফুটচে, খালি পায়ে এপথে হাঁটা যায় না।

অগত্যা বিপিন একখানা গাড়ী করিল। শান্তি বলিল—বাবাকে বলবেন না গাড়ীর কথা, আমি পয়সা দিচ্চি, আমার কাছে আলাদা পয়সা আছে।

বিপিন হাসিয়া বলিল—তোমার সব দুষ্টুমি শান্তি, আমি সব বুঝি। তোমার ঘোড়ার গাড়ী চড়বার সাধ হয়েছিল কিনা বল সত্যি ক'রে। কাঁকর ফোটা কিছু না, বাজে ছল। ধরে ফেলেচি না?

শান্তি হাসিয়া ফেলিল।

—পয়সা তোমায় দিতে হবে—একথা ভাবলে কেন ?

—আপনি দিতে যাবেন কেন ? আমার সাধ হয়েছিল, আপনার তো হয় নি ?

—যদি বলি আমারও হয়েছিল ?

—বেশ তবে দিন আপনি।

টকি দেখিতে বসিয়া শান্তি বলিল—আচ্ছা, বলুন তো আপনার সঙ্গে বসে এমনভাবে টকি দেখবো একথা কখনো ভেবেছিলেন ?

—কি করে ভাববো বলো ?

—আপনি খুসি হয়েচেন বলুন।

বিপিন প্রথম হইতেই নিজেকে অত্যন্ত সতর্ক করিয়া দিয়াছিল মনে মনে। শান্তিকে একা লইয়া বাড়ীর বাহির হইয়াছে—তাহার সঙ্গে কোনোপ্রকার ভালবাসার কথা বলা হইবে না। ও পথে আর নয়। বিশেষতঃ তাহার স্বামী ও শ্বশুর বিশ্বাস করিয়া তাহার সঙ্গে ছাড়িয়া দিয়াছে যখন, তখন শান্তিকে একটিও অন্য ধরণের কথা সে বলিবে না।

বিপিন জবাব দিতে পারিত—কেন আমি খুসি হই না হই তোমার তাতে আসে যায় কিছু নাকি ? ইহার উত্তরে শান্তি কি জবাব দেয় তাহা শুনিবার আগ্রহ তাহার।

কিন্তু সে বলিল—খুসি না হবার কারণ কি ? আমিও যে ঘন ঘন টকি দেখি তা তো নয়, থাকি তো সোনাতনপুরে। খুসি হবার কথাই তো। আর এই যে পালাটা হচ্চে নতুন পালা একেবারে।

কথাটা অন্য দিক দিয়া ঘুরিয়া গেল।

বিপিন দেখিল শান্তি খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে। টকি কখনও না দেখিলেও সে গল্পের গতি এবং ঘটনা তাহার অপেক্ষা ভাল বুঝিতেছে। অনেক জায়গায় শান্তি এমন আবিষ্ট ও মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছে যে বিপিন কথা বলিলে সে শুনিতে পায় না। একবার দেখিল শান্তি আঁচল দিয়া চোখের জল মুছিয়া কাঁদিতেছে।

বিপিন হাসিয়া বলিল,—ও কি শান্তি ? কান্না কিসের ?

শান্তি হাসি কান্না মিশাইয়া বলিল, আপনার যেমন কঠিন মন, আমার তো অমন নয়, ছেলেটার দুঃখ দেখলে কান্না পায় না ?

—তা হবে। আমার চোখের জল অত সস্তা নয়।

—তা জানি। আচ্ছা, আমি মরে গেলে আপনি কাঁদবেন ?

—ও কথা কেন ? ও সব কথা থাক।

শান্তি খপ্ করিয়া বিপিনের হাত ধরিয়া অনেকটা আব্দার এবং খানিকটা আদরের সুরে বলিল,—না, বলুন। বলতেই হবে।

বিপিন হাসিয়া বলিল, নিশ্চয়ই কাঁদবো।

—সত্যি ?

—মিথ্যে বলচি ?

পরক্ষণেই সে শান্তির সঙ্গে কোনো ভালবাসার কথা না বলিবার সঙ্কল্প ভুলিয়া গিয়া বলিয়া ফেলিল,—আমি মরে গেলে তুমি কাঁদবে ?

শান্তি গম্ভীর মুখে বলিল,—অমন কথা বলতে নেই।

—না, কেন আমার বেলায় বুঝি বলতে নেই। তা শুনবো না, বলতেই হবে।

—না, ও কথার উত্তর নেই। অন্য কথা বলুন।

—এর উত্তর যদি না দাও, তোমার সঙ্গে আর কথা বলবো না।

—না বলবেন, না বলবেন।

—বলবে না ?

—না, আমি তো বলে দিয়েচি।

অগত্যা বিপিন হাল ছাড়িয়া দিল। মনে মনে ভাবিল—শান্তি বেশ একটু একগুঁয়েও আছে যা ধরিবে, তাই করিবে।

ইণ্টারভ্যালের সময় শান্তি বাহিরে আসিয়া বলিল—সবাই চা খাচ্ছে, আপনি চা খাননি তো বিকেলে, খান না চা, আমি পয়সা দিচ্চি—

—তুমি কেন দেবে। আমার কাছে নেই নাকি—চল দুজনে খাবো।

শান্তির একগুঁয়েমি আরও ভাল করিয়া প্রকাশ পাইল। সে বলিল,—সে হবে না, আপনার চা খাওয়ার পয়সা আমি দেবো, নয়তো আমি চা খাবো না।

বিপিন দেখিল ইহার সহিত তর্ক করা বৃথা, অগত্যা তাহাতেই রাজি হইয়া দুজনে চায়ের ষ্টলে একখানা বেঞ্চের উপর বসিল। শান্তি বলিল,—আপনি ওই যে বোতলের মধ্যে কি রয়েচে, ওই দুখানা নিন্—শুধু চা আপনাকে খেতে দেবো না।

—তুমিও নাও, আমি একা খাবো বুঝি ?

বিপিনের এই সময়ে মনে হইল মনোরমার কথা। বেচারী কখনো টকি বায়োস্কোপ দেখে নাই—সংসারে শুধু খাটিয়াই মরে। একদিন তাহাকে রাণাঘাটে আনিয়া টকি দেখাইতে হইবে—বীণাকেও। সে বেচারীই বা সংসারের কি দেখিল। মা বুড়ো মানুষ, তিনি এসব পছন্দ করিবেন না, বুঝিবেনও না, তিনি চান ঠাকুর দেবতা, তীর্থ ধর্ম্ম।

পুনরায় ছবি আরম্ভ হইবার ঘণ্টা পড়িল। দুজনে আবার গিয়া ভিতরে বসিল। শেষের দিকে ছবি আরও করুণ হইয়া আসিল। এক জায়গায় শান্তি ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে দেখিয়া বিপিন বলিল,—ও কি শান্তি ? তুমি এমন ছেলে মানুষ। কাঁদে না অমন করে—ছিঃ—চল বাইরে যাবে ?

শান্তি ঘাড় নাড়িয়া বলিল—উঁহু—

—উঁহু তো কেঁদো না। লোকে কি ভাববে ?

ছবি শেষ হইতে বাহিরে আসিয়া শান্তি চুপ চাপ থাকিয়া পথ চলিতে লাগিল। ষ্টেশনের কাছে আসিয়া বিপিন বলিল,—চলো ইষ্টিশান দেখবে ?

—চলুন।

আলোকজ্জ্বল প্ল্যাটফর্ম্ম দেখিয়া শান্তি ছেলেমানুষের মত খুসি। শান্তিকে সুন্দরী মেয়ে বলা যায় না, কিন্তু তাহার নিজস্ব এমন কতকগুলি চোখের ভঙ্গি, হাসির ধরণ প্রভৃতি আছে যাহা তাহাকে সুন্দরী করিয়া তুলিয়াছে। বাহির হইতে প্রথমটা তত চোখে পড়ে না এসব—বিপিন এতদিন শান্তিকে দেখিয়া আসিতেছে বটে কিন্তু আজ প্রথম তাহার মনে হইল—শান্তি যে এমন সুন্দর দেখতে, এমন চোখের ভঙ্গি ওর—এ এতদিন তো ভাবিনি ?

আসল কথা, কোথা হইতে বিপিন এতদিন শান্তির রূপ দেখিবে ? আজ ছাড়া পাইয়া মুক্ত, স্বাধীন অবস্থায় শান্তির নারীত্বের যে দিক ফুটিয়াছে তাহাই তাহাকে সুন্দরী করিয়া তুলিয়াছে। এ শান্তি এতদিন ছিল না। কাল হইতে আবার হয়তো থাকিবেও না। শান্তির মধ্যে যে নায়িকা এত কাল ছিল ঘন ঘুমে অচেতন, আজ সে জাগিয়াছে। অপরূপ তার রূপ, অদ্ভুত তার ঐশ্বর্য্য। বিপিন ইহা ঠিক বুঝিল না।

সে ভাবিল, আজ তাহার সহিত একা বাহির হইয়া শান্তি নিজের যে রূপ দেখাইতেছে—তাহা এতদিন ইচ্ছা করিয়াই ঢাকিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। এটুকু অভিজ্ঞতা বিপিনের বহুদিন হইয়াছে যে, মেয়েরা সকলকে নিজের রূপ দেখায় না—যখন যাহার কাছে ইচ্ছা করিয়া ধরা দেয়—সেই কেবল দেখিতে পায়।

বিপিন কিছু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

শান্তিকে একা লইয়া আর কোনোদিন সে বাহির হইবে না। শান্তি তাহাকে জালে জড়াইতে চায়।

কিন্তু বিপিন আর নিজেকে কোনো বন্ধনের মধ্যে ফেলিতে চায় না। মনের দিক হইতে স্বাধীন না থাকিলে সে নিজের কাজে উন্নতি করিতে পারিবে না। এই তো, কাল আর্চ্চার সাহেবকে বলিয়া আসিয়াছে, হাঁসপাতালে একটি শক্ত অস্ত্রোপচার করা হইবে একটি রোগীর, বিপিন কাল দেখিতে যাইবে। তবুও যতটুকু শেখা যায়।

শান্তিকে লইয়া খানিক এদিক ওদিক ঘুরিয়া বলিল,—চল এবার বাসায় যাই

—আর একটুখানি থাকুন না ? বেশ লাগচে।

একখানা ট্রেণ কলিকাতার দিক হইতে আসিয়া দাঁড়াইল এবং কিছুক্ষণ পরে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। বহু যাত্রী উঠিল, বহু যাত্রী নামিল।

শান্তি এসব অবাক চোখে চাহিয়া দেখিতেছিল। সে এসব ভাল করিয়া কখনো দেখে নাই, দু তিন বার সে রেলে চড়িয়া এখান ওখান গিয়াছে—একবার গিয়াছিল শিমুরালি গঙ্গাসাগর যোগে মা-বাবার সঙ্গে, তখন তাহার বয়স মোটে এগারো বছর, আর একবার স্বামীর সঙ্গে পিস্‌তুতো ননদের ছেলের বিবাহে এই লাইনে গিয়াছিল শ্যামনগর মূলাজোড়। সেও আজ দু তিন বৎসর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এমন করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে বেড়াইয়া কখনও সে এত বড় একটা ইষ্টিশানের কাণ্ড-কারখানা দেখে নাই।

বিপিনের নিজেরও বেশ লাগিতেছিল। কোথায় পড়িয়া থাকে বারো মাস, কোথা হইতে

এ সব দেখিবে? রাণাঘাটের মত সহর বাজার জায়গায় থাকিতে পাইলে সামান্য টাকা রোজগার হইলেও সুখ। পাঁচ জনের সহিত মিশিয়া, পাঁচটা জিনিস দেখিয়া সুখ।

সে কথা শান্তিকে সে বলিল।

শান্তি বলিল,—সত্যি। আচ্ছা, আমরা কোথায় পড়ে থাকি ডাক্তারবাবু, গরুর মত কিংবা মোষের মত দিন কাটাই। কি বা দেখলাম জীবনে, আর কি বা—

—সত্যি, কি দেখতে পাই?

—শুনতেই বা পাই কি? এই যে ধরুন আজ টকি দেখলাম, এ কেউ দেখেছে আমাদের গাঁয়ে কি আমাদের শ্বশুর বাড়ীর গাঁয়ে? আহা, ও বোধ হয় দেখেনি, ও কাল দেখুক এসে।

—কে, গোপাল? গোপাল কখনো টকি দেখেনি?

—কোত্থেকে দেখবো! আপনিও যেমন! ওরা কেউ দেখেনি। কাল পাঠিয়ে দেবো বিকেলে।

—আমিও সত্যি বলচি শান্তি—এই প্রথম দেখলাম টকি বায়োস্কোপ। দেখেছি অনেক দিন আগে—সে তখনকার আমলে। বাবার পয়সা তখনও হাতে ছিল, একবার কলকাতায় গিয়ে বায়োস্কোপ দেখি। তখন টকি হয়নি। তারপর বহুকাল হাতে পয়সা ছিল না, নানা গোলমাল গেল—

বিপিন নিজের জীবনের কথা এত ঘনিষ্ঠ ভাবে কখনও শান্তির কাছে বলে নাই। শান্তির বোধ হয় খুব ভাল লাগিতেছিল, সে আগ্রহের সহিত শুনিতেছিল এ সব কথা।

খানিক ক্ষণ দুজনে চুপচাপ। মিনিট পাঁচ ছয় কাটিয়া গেল।

বিপিন হঠাৎ বলিল,—কি কথা মনে হচ্ছে জানো শান্তি?

শান্তি যেন সলজ্জ আগ্রহের সহিত বলিল,—কি?

—সেই মতি বাগদিনীর কথা।

শান্তির মুখে নিরাশা ও বিস্ময় একই সঙ্গে ফুটিল। অবাক হইয়া বলিল,—কেন, তার কথা কেন?

বিপিন ভাবিল, যদি মানী আজ থাকিত, এ প্রশ্ন করিত না। মনের খেলা বুঝিতে তার মত মেয়ে বিপিন আজও কোথায় দেখে নাই।

তবুও বলিল,—তুমি দেখনি শান্তি, কি করে সে মরেচে, সেই শীতের রাত, গায়ে লেপ কাঁথা নেই, খড় বিচুলি আর ছেঁড়া কাঁথার বিছানা। অথচ কত অল্প বয়েস···আমি এখানে দাঁড়িয়ে চোখ বুঁজলে সেই জেয়ালা-বল্লভপুরের বিল, সেই চাঁদের আলো, বিলের ধারে তাকে চিতায় তুলে দিয়েছি, চিতার এদিকে আমি, ওদিকে বিশ্বেশ্বর, এসব চোখের সামনে দেখতে পাই—

কিন্তু শান্তি বুঝিল। শান্তি যে উত্তর দিল, বিপিন তাহা আশা করে নাই। বলিল,—ডাক্তারবাবু, সে জায়গাটা আমায় একবার দেখিয়ে আনবেন তো? সেদিন আপনার মুখে ওর কথা শুনে পর্য্যন্ত আমিও ভুলতে পারিনি। হোক নীচু জাত, ওই একটা জিনিসে বড্ড উঁচু হয়ে গেছে। চলুন ওই বেঞ্চিখানায় বসি একটু।

—আবার বসবে কেন? রাত হোল, বাসায় ফিরি।

—আমার পা ধরে গিয়েচে। ওখানে কি বিক্রী হচ্চে? চা? আপনি একটু চা খান—

—আমি আর নয়। তোমার জন্যে আনবো?

—তবে পান কিনে আনুন, আমার জন্যে আমি বলিনি। আপনি চা ভাল বাসেন, তাই বলছিলাম।

পানের দোকান নিকটে নাই, কিছু দূরে প্ল্যাটফর্ম্মের ওদিকে। শান্তিকে বেঞ্চে বসাইয়া বিপিন পান আনিতে গিয়া হঠাৎ এক জায়গায় দাঁড়াইয়া গেল। আপ্ প্ল্যাটফর্ম্ম হইতে কিছু সরিয়া ওভার-ব্রিজের কাছে একটি মেয়ে তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া একটা ট্রাঙ্কের উপর বসিয়া আছে—তাহার আসে পাশে আরও দু একটা ছোট খাট স্যুটকেস্, বিছানা, আরও কি কি। এই মাত্র যে ট্রেণখানা গেল, সেই ট্রেণ হইতেই নামিয়া থাকিবে, বোধ হয় সঙ্গের লোক বাহিরে গাড়ী ঠিক করিতে গিয়াছে, মেয়েটি জিনিস আগুলিয়া বসিয়া আছে। মেয়েটি অবিকল মানীর মত দেখিতে পিছন হইতে। সেই ভঙ্গি, সেই সব।...কতকাল কাটিয়া গিয়াছে, এখনও তাহার মত অন্য মেয়ে দেখিলেও তাহারই কথা মনে পড়ে।...

এই সময় মেয়েটি একবার পিছনের দিকে চাহিল।

বিপিন চমকিয়া উঠিল।

পরম বিস্ময়ে ও কৌতূহলে সে স্থান কাল পাত্র সব কিছু ভুলিয়া আগাইয়া গেল ওভারব্রিজের তলায়। তাহার বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পিটিতেছে।

ক্রমশ

বিধাতা

শ্রীকণা দত্ত

বিধাতা!
মর্ম্মান্তিক আঘাত কর তুমি,
অনিবার, আঘাত তোমার স'য়ে
আমি হাসি।
আঘাতের পর হানো আঘাত।
আরো আঘাত!
স্বীকার তবু করবো না কোনো দিন,
বলবো না—দুঃখ পেলেম।
তোমার আঘাতের নির্ম্মমতা
ভুলে যাবার,—
আর—
তাকে তৃণাদপি তুচ্ছ মনে করার,
—ক্ষমতা আমার আছে।
তাই, তুমি ভাঙ্গো,
আর আমি গড়ি;
তুমি আবার ভাঙ্গো,—
আবার আমি নূতন করে
গড়ি আমাকে!

শিলা-লেখন

শ্রীসুশীল জানা

ঘন শালবন পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসে শেষ হ'য়েছে যেখানে—সেখানে ছোট ছোট তাঁবু পড়েচে কতকগুলো। তারপর যতদূর চোখ যায়—শুধু ধূধু প্রান্তর। দূরে দূরে অসংখ্য গ্র্যানাইট পাথরের টুক্‌রো মাটির ভেতর থেকে এখানে-ওখানে উঁকি মারছে। বহুদূর একটা যুগের মানব সভ্যতার ধ্বংসস্তূপ মাটির মধ্যে সমাধিস্থ—খোঁড়া-খুঁড়ি চলছে।

বুড়ো গণেশপ্রসাদ ঘোলাটে চোখে গৌতমের দিকে তাকিয়ে ব'ললে, কাজটা খুব ভালো হ'লো না বাবুজী।

গৌতম অন্যমনস্ক ছিল—নিরুৎসাহে ব'ললে, কোন কাজটা ?

এই ঠাকুর-দেবতা নিয়ে। গুপ্তসাহেব বুড়ো হ'য়েচেন কিন্তু তিনিও অবুঝের মতো কাণ্ড ক'রচেন। ভালো হচ্ছে না বাবুজী। গণেশপ্রসাদ আস্তে আস্তে মাথা নাড়তে লাগলো।

গৌতমকে তেমনি নিরুৎসাহ আর অন্যমনস্ক দেখে গণেশপ্রসাদ উত্তেজিত কর্কশ কণ্ঠে ব'ললে, জানেন বাবুজী, সেদিন সকালে যে পাথরের ভাঙা মূর্তিটা আপনারা মাটির ভেতর থেকে টানা হেঁচড়া ক'রে আনলেন—সেটি কত বড় জাগ্রত দেবতা ?

গৌতম পরম ঔদাস্যে ব'ললে, তোমার মুখেই শুনেচি, তোমার পূর্বপুরুষ পাথর খোদাইয়ের কাজ ক'রতো—ওই রকম কতো মূর্তিই তারা তৈরী ক'রেচে। তোমার ওই জাগ্রত দেবতা সেই রকমই একটা তৈরী মূর্তি বটে তো ?—তোমার অতো ভক্তি হওয়া উচিৎ নয় গণেশপ্রসাদ।

—না না, কি যে বলেন বাবুজী। কতদূর থেকে লোকজন সব ছুটে আসে—তারা কি তবে মিথ্যে আসে বাবুজী ?

—কি রকম ?

—উনি হচ্ছেন বনদেবী—আমরা 'বড়াম্' বলি।

—বটে! এ যে একেবারে অনার্য নাম।

—তা জানিনে বাবুজী। কতদিন থেকে দেশ-বিদেশের লোক পূর্ণিমার রাত্রে এই গভীর বনের মধ্যে বিপদের ভয়-ডর না রেখে একা একা এসে পূজো ক'রে যাচ্ছে। মেয়েরা পর্যন্ত—শোনা যায়, কোনো এক সময়ে এই দেশের রাজকুমারী—

বাধা দিয়ে গৌতম ব'ললে, কেন, পূজো কেন ?

—ওঁকে পূজো দিলে যে যাকে ভালোবাসে, যে যাকে চায়—তাকে পায়। শোনা যায়, কখনো কখনো রাত্রে উনি এই বনের আশে-পাশে ঘুরে বেড়ান। সে সময়ে মুখোমুখি পড়লে লোক পাগল হ'য়ে যায়। কত লোক এমনি ক'রে পাগল হ'য়ে গিয়েচে শুনেচি। আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না বাবুজী—আপনি হাসচেন।

এই সময়ে জয়ন্তী সেইখানে এসে দাঁড়াল। চব্বিশ বছরের উদ্ধত আঁটসাট দেহ, অধ্যাপক ডক্টর গুপ্তের প্রিয় ছাত্রী—এই প্রাচীন-সভ্যতা উদ্ধারের কাজে ডক্টর গুপ্তকে সাহায্য করে গৌতমের

মতো। রিসার্চ্চও ক'রছে। যৌনজীবনের সমস্ত কামনা-বাসনার মুখে অনুশীলনের পাহাড় দিয়েছে ঠেলে—ফলে অদৃশ্য গ্ল্যাণ্ড বিশেষের বিদ্রোহে খুব অস্পষ্ট গোঁপের রেখা ওর ঠোঁটের ওপরে, আর ভুরু স্পষ্ট—সুন্দর।

জয়ন্তীর দিকে তাকিয়ে গৌতম ব'ললে, এঁকেও বলো—এঁর হয়তো উপকার হতে পারে।

জয়ন্তী বোকার মতো দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে ব'ললে, কি উপকার?

গৌতম বুঝিয়ে দিলে: যে মূর্তিটার ওপরে আজ ক্রমাগত চার-পাঁচদিন ধরে ডক্টর গুপ্ত ঝুঁকে আছেন—সেটি 'বড়াম্' নামক জনৈকা বনদেবীর; তিনি নায়ক-নায়িকার মনোবাসনা পূর্ণ ক'রে থাকেন। ইত্যাদি।

শুনে জয়ন্তী চটে ব'ললে, তাতে আমার কি উপকার হবে?

—না, এমনি ব'লচি। গৌতম নিস্পৃহভাবে টেনে ব'ললে, পূর্ণিমার দিনও তো কাছে। বলো না গণেশপ্রসাদ—বলো না ওঁকে।

উৎসাহিত হ'য়ে উঠল গণেশপ্রসাদ। কিন্তু জয়ন্তী চটলে আরও।

গণেশপ্রসাদ জোর দিয়ে ব'ললে, আচ্ছা—বিশ্বাস না হয়, পরীক্ষা ক'রে দেখুন—আমি ব'লচি—

—হ্যাঁ হ্যাঁ—গৌতম উৎসাহ দিলে।

জয়ন্তী কট্‌মট্ ক'রে তাকালে পর পর দু'জনের দিকে। তারপর গণেশপ্রসাদের আর উৎসাহ এলো না। তবু সে একবার অস্পষ্ট সপ্রতিভ কণ্ঠে ব'ললে, আপনাদের কারুরি বিশ্বাস হচ্ছে না—কিন্তু পরীক্ষা ক'রলে বুঝতেন—ব'লে সে করুণ চোখে জয়ন্তীর দিকে তাকালে।

সংগে সংগে গৌতম সোৎসাহে ব'ললে, আমি তো বিশ্বাস ক'রেচি গণেশপ্রসাদ। বরং—

জয়ন্তী অগত্যা সরে পড়বার চেষ্টা ক'রলে। গৌতম নির্বিকারভাবে তাকে অনুসরণ ক'রলে। পেছন থেকে ডাকলে গৌতম, মিস্ রয়।

জয়ন্তীর রাগের বেগটা পড়েচে দ্রুতগতিশীল পায়ের ওপরে। জয়ন্তী মুখ না ফিরিয়েই ব'ললে, কি—

আপনি চটেচেন মনে হচ্ছে, রাগের ঝোঁকে ভুল পথ ধরেচেন। এদিক দিয়ে গেলে তাঁবুতে পৌঁছতে দেরী হবে কিন্তু।

আমি জানি।

ভুল পথও যখন জানে জয়ন্তী তখন এর পরে গৌতম আর কি ব'লতে পারে? চুপ ক'রে সে জয়ন্তীর পেছনে পেছনে চল্‌তে লাগল।

সন্ধ্যে হ'য়ে গিয়েচে। জয়ন্তী তাঁবুর আলো লক্ষ্য ক'রে আগে আগে হন্ হন্ ক'রে হেঁটে চলেছে।

এক সময়ে গৌতম ফের ব'ললে, মিস্ রয়—

জয়ন্তী এবার ঘুরে দাঁড়ালে সবেগে রাগে চোখ ভর্তি ক'রে। কিন্তু গৌতম নিঃশব্দে হেসে উঠল। জয়ন্তীর সমস্ত ব্যক্তিত্ব সেই হালকা হাসির ঘায়ে একবারে অসহায় হ'য়ে গেল। আকাশে তখন চাঁদ উঠেছে। গাছপালার ফাঁক দিয়ে সুন্দর ঠাণ্ডা আলো এসে জয়ন্তীর গালে, বুকের ওপরে

অস্পষ্ট আলো ছায়ার সৃষ্টি ক'রেছে। গৌতমের উজ্জ্বল উদ্ধত দৃষ্টির দিকে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারলে না জয়ন্তী। সাপ যেমন বিস্তৃত ফণা গুটিয়ে নেয় আস্তে আস্তে তেমনি ক'রে মাথা নীচু ক'রলে সে। তারপর ঘুরে চলতে লাগল।

গৌতম ব'ললে, আপনার রাগটা একটু বেশী।

জয়ন্তী কোনো উত্তর দিলে না।

গৌতম ব'ললে, ধরুন, এইখানে এই সময়ে যদি কিছু একটা আবিষ্কার হ'য়ে যায়—আপনার রাগ পড়বে? আমি একটা সন্ধান দিতে পারি।

জয়ন্তী শুধু জিজ্ঞাসু চোখে তাকালে।

গৌতম ব'ললে, কাল সকালে আপনাকে দেখাবো। পাহাড়ের গায়ে দুলাইন লেখা—খুব প্রাচীন লিপি হবে বোধ হয়।

—ওইখানে তো? জয়ন্তী একদিকে আঙুল দিয়ে দেখালে।

—হ্যাঁ। আপনি দেখেচেন সেটা?

—দেখেচি, ডক্টর গুপ্তও দেখেচেন, পড়েওচেন। ওটা বিশেষ কিছু নয়।

—ও, দেখেচেন তা হ'লে। কি লেখা আছে?

জয়ন্তী চুপ ক'রে রইল: মনে মনে গাল দিলে গৌতমকে। গৌতম কিন্তু জেদ ধরে ব'ললে আবার, কি লেখা আছে?

—"কখনো এখানে এলে আমাকে মনে ক'রো অরুন্ধতী। তোমাকে আমি"—

তারপর থেমে গেল জয়ন্তী। গৌতম ব'ললে, তারপর—

তারপর জয়ন্তী আর কিছুতেই ব'লবে না। ডক্টর গুপ্ত একেবারে সুমুখে। তাঁবুর সুমুখে এসে পড়েছিল তারা। ওসব কথা পরে হবে জানিয়ে কাজের অছিলায় জয়ন্তী চলে গেল।

জয়ন্তী একেবারে নিজের বিছানায় এসে নিষ্কৃতির নিশ্বাস ফেললে। কিছুক্ষণ ভাবলে গৌতমকে, তারপর হারিয়ে গেল সে অনেক সমস্যায়, প্রাগৈতিহাসিক কত রকম মানুষের সংগে, সভ্যতার সংগে। তাঁবুর মধ্যে পর্দ্দা ঘেরা ঘর, পাশেই থাকেন ডক্টর গুপ্ত। তারপর পাশের তাঁবুতে গৌতম ও তারই মতো আরও দু-তিন জন।

কিছুক্ষণ পরে গৌতমের গলা শোনা গেল, আসতে পারি মিস্ রয়?

চমকে উঠে ব'সলে জয়ন্তী। কি জবাব দেবে ভেবে পেলে না, চুপ ক'রে ব'সে রইল। গৌতম ফের ডাকলে। গৌতমের গলা যেন ষাঁড়ের মতো—মনে মনে ব'ললে জয়ন্তী, পাশের ঘরেই ডক্টর গুপ্ত। করুণ কণ্ঠে ভয়ে ভয়ে ব'ললে জয়ন্তী, আসুন।

গৌতম ভেতরে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে ব'সলে। জয়ন্তীর ফ্যাকাসে মুখের দিকে তাকিয়ে সে ব'ললে, ডক্টর গুপ্ত একদিন আমাকে তাড়াবে ব'লে মনে হচ্ছে। দেখুন দিকি, আমি যেটাকে একেবারে নতুন আবিষ্কার ভেবে গোপনে গবেষণা ক'রবার আয়োজন ক'রছিলুম—সেটার বহুদিন আগেই আপনি পাঠোদ্ধার ক'রে রেখেচেন। তারপর আমি ভাবছিলুম—লেখাটা হয়ত বেদের

সুক্ত-টুক্ত হবে—তা নয় এ এক নিউরটিক—মাথা খারাপ ক'রে দিলে। ডক্টর গুপ্ত ঠিক তাড়াবে। হ্যাঁ, কই শেষটা ব'ললেন না তো ?

গৌতমকে মনে মনে ফের গালাগালি দিলে জয়ন্তী।

জবাবের জন্যে জয়ন্তীর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল গৌতম। তার পর ব'ললে, এই সব প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার করা এক বিশ্রী ব্যাপার। আপনি দেখচি জিনিষটাকে তবু কতকটা আয়ত্তে এনেচেন। আপনি বেশ দিব্যি পড়তে পারেন—না ?

—সব কি পারি ? সলজ্জে আর সগৌরবে ব'ললে জয়ন্তী। তবে কিছু কিছু পারি।

—আচ্ছা এটা কি পড়ুন তো।

গৌতম কাগজের ওপরে লিখতে লাগল। লেখা শেষ ক'রে জয়ন্তীর হাতে দিয়ে ব'ললে, পর পর অক্ষর গুলো মুখস্ত হ'য়ে গিয়েচে কিন্তু পাঠোদ্ধার আর হয় নি।

জয়ন্তী চোখ বুলিয়ে ব'ললে, ও, এযে ব্রাহ্মী দেখচি। তার পর পড়ে চল্‌লো জয়ন্তী, আমি তোমাকে ভালোবাসি—

তার পর জয়ন্তীর কাণ গরম হ'য়ে উঠল। গৌতমের হাস্যরেখায়িত মুখের দিকে তাকিয়ে তার সুমুখে আর দাঁড়িয়ে থাকারও ক্ষমতাটুকু রইল না জয়ন্তীর। চা তৈরীর অছিলায় সে বেরিয়ে গেল। জয়ন্তী আর চটলে না। গৌতমের সুমুখে চায়ের পেয়ালা রেখে ব'ললে, মাখন নেই—শুধু রুটি খাবেন ?

—দেন্।

—কাল একটা পলসনের মাখন এনে দেবেন ? ষ্টেশনের কাছে দোকানটায় পাবেন।

—পয়সা আপনি দেবেন তো—না ডক্টর গুপ্ত—

—বাঃ, আমি কেন দেবো। ষ্টেটের টাকার খরচ—ডক্টর গুপ্ত দেবেন।

—তা হ'লে আমি ওর মধ্যে নেই। কাজের কিচ্ছু সুবিধে আমার দ্বারা হচ্ছে ব'লে মনে হয় না—এদিকে জায়গা বদলের জন্যে দেহ ফুলচে। তার ওপরে মাখন কেনার পয়সা চাওয়া—ডক্টর গুপ্ত তক্ষুনি তাড়াবে আমাকে। অথচ শিগ্‌গির এ জায়গা ছাড়ার ইচ্ছে নেই আমার। বেশ আছি।

জয়ন্তী হাসতে লাগল। এমন সহজ হাসি জয়ন্তীর মুখে আগে কোনো দিন আর দেখেনি গৌতম।

এই সময়ে ডক্টর গুপ্ত সেই খানে এসে দাঁড়ালেন। জয়ন্তীর মুখ কালো হ'য়ে উঠল। গুপ্ত শুদ্ধ একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে ব'ললেন, একটা অদ্ভুত জিনিষ বেরুলো শেষ কালে। তারপর জয়ন্তীর দিকে তাকিয়ে গুপ্ত ব'ললেন, আমাকে একটু চা দিতে পারো জয়ন্তী ?

—দিচ্ছি—ব'লে জয়ন্তী উঠে গেল।

গুপ্ত ব'ললেন, সেই যে সেদিন একটা পাথরের মূর্তিকে নিয়ে আসা হ'লো—

—হ্যাঁ হ্যাঁ। গৌতম উৎসুক হ'য়ে ব'ললে, কি দেখলেন সেটার ?

—এখানকার লোকে এখন—শুধু এখন কেন, হয়ত বহু শতাব্দী আগে থেকেই ওকে প্রেমের দেবতা বানিয়ে ছেড়ে দিয়েচে কিন্তু আসলে ওটি একটি অদ্ভুত চিজ। লিপিতে জীবন্ত পাথর ব'লে

উল্লেখ রয়েচে। ওই মূর্তিটির—ব'লে অধ্যাপক থম্‌কে গেলেন, আর কিছু ব'লবার তাঁর ইচ্ছে নেই।

জয়ন্তী সেই সময়ে এসে দাঁড়াল।

গৌতম উৎসুক হ'য়ে ব'ললে, তারপর ?

আর বিশেষ কিছু জানা যায় নি।

তারপর অধ্যাপক চা পান শেষ ক'রে নীরবে উঠে গেলেন।

গৌতম জয়ন্তীর দিকে তাকিয়ে ব'ললে, যার জন্মে গণেশপ্রসাদের ওপরে আর আমার ওপরে আজ তখন চটে গেলেন—সেটা বাস্তবিকই জীবন্ত পাথর, এই মাত্র ডক্টর গুপ্ত ব'লে গেলেন। মূর্তিটার পাদপীঠে যা লেখা ছিল—ডক্টর গুপ্ত তার পাঠোদ্ধার ক'রচেন। বিশ্বাস না হয় ডক্টর গুপ্তকেই জিজ্ঞেস ক'রে আসুন।

আমি কি অবিশ্বাস করছি ? কিন্তু আমি তা নিয়ে কি করবো ? জয়ন্তী হাসলে।

অধ্যাপক গুপ্ত নীরবে পায়চারী ক'রছিলেন। বহুদূরবিসারী শূন্যতার শেষে ঝুঁকে পড়া দিগন্ত সন্ধ্যার ম্লান আলোয় ধীরে ধীরে দুর্নিরীক্ষ্য হ'য়ে উঠল, শালবন কালো হ'য়ে উঠল। অসংখ্য পাখীর বিচিত্র শব্দে মুখর বনভূমি নিঝ্‌ঝুম হ'য়ে গেল।

ভীরু পাণ্ডুর মুখে বুড়ো গণেশপ্রসাদ সুমুখে এসে দাঁড়াল। অধ্যাপক গুপ্ত তার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে ব'ললে, কি গণেশপ্রসাদ ?

গণেশপ্রসাদ ব'ললে, এ কি শুনছি বাবুজী! আমি আগেই ব'লে ছিলুম, ভালো হবে না। সেই মূর্তিটার গায়ে কি নাকি লেখা আছে ?

হ্যাঁ। ও বিশেষ কিছু নয়। গুপ্ত ব'ললেন, ওই মূর্তিটা তৈরী ক'রতে ক'রতে কে এক পুরুষোত্তম নাকি চাপা পড়ে মরে যায়।

পুরুষোত্তম! অধ্যাপকের দিকে হাঁ করে গণেশপ্রসাদ কিছুক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল। ভয়ে চোখ মুখ তার ম্লান হ'য়ে গেল। আস্তে আস্তে ব'ললে, এক পুরুষোত্তম আমার পূর্বপুরুষ ছিলেন বাবুজী—তিনিও ওই ভাবে মারা যান এক মূর্তি চাপা পড়ে, আবার নাকি সেই মূর্তি চাপা পড়ে আরও একজন মারা যায়।

উৎকীর্ণ লিপির সঙ্গে বুড়ো গণেশপ্রসাদের কথা মিলে যাচ্ছে দেখে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে অধ্যাপক তার দিকে তাকিয়ে ব'ললেন, তুমি এসব কি ক'রে জানলে গণেশপ্রসাদ, এ কত দিনের কথা ব'লছো ?

কত দিনের কথা তাতো জানিনে বাবুজী, ছোট্টবেলায় রূপকথার মতো এই গল্প শুনেচি। আজও সকলে শোনে। খুব ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রে আমি নিজেই কখনো কখনো আমার ঘরের আশে-পাশে একটা ছায়ামূর্তিকে দেখেচি। সুবিধে হ'লে আপনাকেও দেখাতে পারি। বাবুজী, খোঁড়াখুঁড়ি এবার বন্ধ করুন।

অধ্যাপক গুপ্ত একদৃষ্টে বৃদ্ধ গণেশপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। শেষের দিকে গণেশ

প্রসাদের ভয়ব্যাকুল কণ্ঠস্বর শুনে তিনি একটু বিচলিত হ'য়ে উঠলেন। ব'ললেন, গল্পটা কি রকম বলো তো গণেশপ্রসাদ। একেবারে পুরো গল্পটাই বলো—ঠিক যেমন তুমি শুনেছিলে।

গণেশপ্রসাদ গল্প ব'লতে লাগল মস্ত এক রাজার আর তার ঐশ্বর্যমণ্ডিত বিরাট রাজধানীর বর্ণনা দিয়ে। আসল গল্পের সূত্রপাত হ'লো তারপর রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর যুবককে নিয়ে। সেই ভাস্কর যুবক, পুরুষোত্তম তার নাম। রাজ্যের সুখ শান্তি সুশাসন ইত্যাদিকে মূর্ত ক'রে তুলতো পাথরের ওপর—আর রাজার কাছে পেত পুরস্কার। এই রাজ-স্তুতি ছেড়ে দিয়ে রাজার দম্ভের উত্তরে ভাস্কর সুরু ক'রলে একদিন দুঃখের মূর্ত্তি আঁকতে কালো মর্মর পাথরের ওপর। ভাস্কর যার মূর্ত্তি গড়তে সুরু করলে, সে এক পরলোকগতা নটী। তার কামনা ছিল উদ্দাম আর স্বপ্ন ছিল রঙীন কিন্তু শ্রী ছিল শূন্য। লাবণ্যটুকুও নষ্ট হ'য়েছিল বিকৃত বীভৎস বসন্তে। কিন্তু কণ্ঠস্বর ছিল অপূর্ব্ব—তবু যৌবনের কোনো সহযোগীই তার জুটলো না। এমন কি নটীজীবনেও রাজার কাছে মাইনে পেত, মণি মুক্তা উপহার পেতো প্রত্যহ গান শুনিয়ে—কিন্তু অলক্ষ্য থেকে; সুমুখে আসবার হুকুম ছিল না। তার পর একদিন দেখা গেল—নটী আত্মহত্যা করেছে। ভাস্কর সেই নটীকেই তার মর্মান্তিক জীবন শুদ্ধ মূর্ত করে তুলতে লাগল পাথরের ওপরে। নটীর অতৃপ্ত আত্মা আবার ফিরে এলো সেই পাথরের মধ্যে। একদিন অকস্মাৎ সেই অসম্পূর্ণ মূর্ত্তির মধ্যে থেকে কথা বেরিয়ে এলো—আমি তো আজ সকলের চোখের আড়ালে আছি, কেন আবার আমাকে সকলের সুমুখে টেনে আনছ? আমাকে দেখে সকলে তোমাকে বাহবা দেবে—কিন্তু আমি কি পাবো? ভাস্কর জবাব দিলে; কেন, আমাকে পাবে। আমি তো তোমার সংগেই মিশে রইলুম। উত্তর এলো, না না—মিথ্যে কথা। আমাকে সকলের সুমুখে আর এনো না। তারপর একদিন দেখা গেল ভাস্কর তার অসম্পূর্ণ মূর্তি চাপা পড়ে মারা গিয়েচে। তারপর সেই অসম্পূর্ণ মূর্তি রাজ্যের এক প্রান্তে স্থাপিত করা হলো। সেখানে এই রকম আর একটি মৃত্যুর দৃশ্যপট উঠল ভোরের সংগে সংগে একদিন। এক সুপুরুষ যুবক মূর্ত্তিটি চাপা পড়ে মারা গিয়েচে। খোঁজ খবরে জানা গেল এক মরণাপন্ন যক্ষ্মাক্রান্ত কুমারীর মুখ থেকে যে, মৃত যুবকটি ওই মূর্ত্তির তলে কোনো কোনো রাত্রে অপেক্ষা করতো তার জন্যে।

গণেশপ্রসাদ গল্প শেষ করে বললে, ওই মূর্তি যদি সেই মূর্তিই হয় বাবুজী, তা হলে আমার কথা সত্যি কি মিথ্যে, দু দিনেই টের পাবেন। আমি বলচি বাবুজী—ও যেখানে ছিল সেইখানেই আবার রেখে আসুন, ভালো হবে। সাংঘাতিক জিনিষ নিয়ে আর ছেলেখেলা ক'রবেন না।

অধ্যাপক গুপ্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অবিশ্যি ভয়ে নয়, ভাবছিলেন, গণেশপ্রসাদের গল্প নিতান্ত গল্প হ'লেও খানিকটা ঐতিহাসিক গন্ধ সেই রূপকথার মধ্যে কোথায় কি ভাবে লুকিয়ে আছে। তারপর হঠাৎ অধ্যাপক চমকে উঠলেন গণেশপ্রসাদের ব্যাপারে।

গণেশপ্রসাদ ভয়ার্ত, ফিস্ ফিস্ ক'রে ব'ললে, ওই শুনচেন বাবুজী—

—কি! অধ্যাপক ফ্যাল্ ফ্যাল ক'রে গণেশপ্রসাদের পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

—ওই যে কেমন একটা কান্নার মতো শব্দ—পাহাড়ের দিকে—

হঠাৎ কেমন একটা ভয়ের রোমাঞ্চ অধ্যাপকের সর্বাংগে শিহরণ দিয়ে গেল। পাহাড়ে বা বহু

দূরে কোথাও একটা অস্পষ্ট সকরুণ শব্দ শোনা গেল। বরফের মতো একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার বন্যা শালবনের পাতায় পাতায় শব্দ তুলে দূরবিসারী শূন্যতার দিকে হু হু ক'রে বয়ে গেল।

গণেশপ্রসাদ ব'ললে, বাবুজী, মাঝে মাঝে এ রকম হয়। আমরা গাঁ থেকেও এমনি কান্নার শব্দ শুনতে পাই। সকলের তখন ওই গল্পের কথাই মনে পড়ে বাবুজী। আমি মিথ্যে বলি নি।

মিথ্যে না বলুক গণেশপ্রসাদ কিন্তু ওর ওই সত্যি কথাগুলোই যদি ও ডাইনে-বাঁয়ে ছড়াতে আরম্ভ ক'রে তা হ'লে কুলি-মজুর, এই এত লোকজন নিয়ে কাজের ভারী অসুবিধে হবে।

অধ্যাপক ব'ললেন, এসব কথা তুমি আর কারুকে ব'লো না গণেশপ্রসাদ। যাও—আমি ভেবে দেখি।

তারপর গণেশপ্রসাদকে কিছু টাকা-কড়ি দিয়ে সেখান থেকে সরিয়ে দিলেন অধ্যাপক। প্রচলিত প্রবাদ কাহিনীর জন্যে প্রাচীন গণেশপ্রসাদের প্রয়োজন ছিল বটে—কিন্তু তার উপস্থিতি অধ্যাপকের কাছে এখন সাংঘাতিক ব'লে মনে হ'লো।

তারপর দুটি দিন কেটে গেল গতানুগতিক কাজের মধ্য দিয়ে—গণেশপ্রসাদের উক্তি অনুসারে সাংঘাতিক কোনো কিছুর গন্ধই পাওয়া গেল না। তার মতো অতি প্রাচীনের ভয়ার্ত ব্যাকুলতার সংক্রামক রোগ অধ্যাপক গুপ্তকেও ভেতরে ভেতরে কিছুটা আক্রমণ ক'রেছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অধ্যাপক তার জন্যে রীতিমতো লজ্জিত হ'য়ে নিজেকে গালাগালি দিলে। বাস্তবিক ভয় পেয়ে কাজ বন্ধ ক'রলে মানব সভ্যতার মস্ত বড় একটা দিক অন্ধকার রয়ে যেত কুসংস্কারে। অধ্যাপক পাথরের মূর্তিটাকে নিজের ঘেরাটোপের মধ্যে এনেই রেখেচেন—পাছে কুসংস্কার আর ভয়ের প্রাবল্যে কুলি-মজুররা মূর্তিটাকে নিয়ে পালিয়ে যায়। অধ্যাপক দিব্যি আবার কাজে মন ঢেলে দিলেন, কিন্তু মনের মধ্যে গণেশপ্রসাদের গল্প উঁকি মেরে যেতে লাগল—যতোবার তাঁর চোখ পড়ল মূর্তিটার দিকে। এক-একবার তাঁর মনে হ'তে লাগল: সত্যিই কি ওই মূর্তিটার পেছনে একটা ভারী করুণ আর অতৃপ্ত জীবনের কাহিনী লুকিয়ে আছে! যদি সত্যি হয়? ভাবতে ভাবতে কারুণ্যের প্রাবল্যে রূপ-পিপাসু সমস্ত মানুষজাতটার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে বসেন অধ্যাপক।

তারপর একদিন গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল অধ্যাপকের—হঠাৎ অকারণ একটা ভয়ে তিনি আড়ষ্ট হ'য়ে বিছানায় পড়ে রইলেন আর অন্ধকারে শুনলেন অস্পষ্ট খস্ খস্ শব্দ। কে যেন আস্তে আস্তে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল। উৎকর্ণ হ'য়ে অধ্যাপক শুনতে লাগলেন—কার যেন লঘু পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল। অন্ধকারে তিনি বার বার চোখ ঘষে দেখতে লাগলেন কিন্তু দেখবার কিছুই পেলেন না। বহুক্ষণ উৎকর্ণ হ'য়ে রইলেন—কোনো কিছুই আর শোনা গেল না। অধ্যাপক আবার ঘুমোবার চেষ্টা ক'রলেন আর ঠিক ক'রে রাখলেন, মূর্তিটা শিগ্‌গির যাদুঘরে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রতে হবে।

তন্দ্রা আসছিল অধ্যাপকের। হঠাৎ কোথা থেকে হাসির একটা ক্ষীণ শব্দ ভেসে এলো। অধ্যাপক উঠে ব'সলেন। কিন্তু তারপর কিছু আর শোনা গেল না। এক কোণে সেই মূর্তিটা শুধু একটা কালো স্তূপের মতো দাঁড়িয়ে আছে। সেই অদৃশ্য অন্ধকারে অমসৃণ পাথরের মূর্তিটার

গায়ে বসন্তের বীভৎস চিহ্নগুলি যেন স্পষ্ট চোখ দিয়ে অনুভব ক'রলেন তিনি, সেই ভাঙা নাক আর ভাঙা হাত। অধ্যাপকের হঠাৎ মনে পড়ল: এ একদিন বেঁচে ছিল—হয়ত ঠিক এইখানে। সমবেদনার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌লেন অধ্যাপক। তারপর আবার তিনি শুনলেন সেই ক্ষীণ হাসির শব্দ। অধ্যাপকের মনে হ'লো—হাসিটা যেন পাথরের মূর্তিটার দিক থেকে ভেসে এলো ঠাণ্ডা বরফের মতো। তারপর তাঁবুতে লট্‌পট্‌ ক'রে শব্দ হ'লো—সমস্তটা যেন কেঁপে কেঁপে উঠল, একটা ভারী ঠাণ্ডা হাওয়ার বন্যায় সেই পাহাড়ের দিক থেকে একটা সকরুণ গোঙানির শব্দ ভেসে এলো, স্তব্ধ বনভূমি সচকিত উচ্ছ্বাসে সর্‌ সর্‌ ক'রে উঠলো। একটা রোমাঞ্চের শিহরণ অধ্যাপকের সর্বাংগ দিয়ে ঝড়ের মতো বয়ে গেল।

তারপর ভোর হ'লো। বিগত রাত্রির অতি ছোট্ট ঘটনাগুলি নিতান্ত তুচ্ছ ব'লেই তাঁর মনে হ'লো, মনে হ'লো তিনি যেন তন্দ্রার ঘোরে সে সব অনুভব ক'রেছিলেন—সে যেন তাঁর নিজের মনেরই সৃষ্টি। অধ্যাপক কারুকে কিছু ব'ললেন না। সারাটা দিন মনের মধ্যে আনাগোনা ক'রতে লাগল মূর্তিটার কথা। মনের জোরে সে সব তিনি দূরে সরিয়ে দিতে চাইলেন, অনেক কাজের মাঝখানে গণেশপ্রসাদের গল্পকে ভুলে যেতে চাইলেন, কিন্তু পারলেন না। মূর্তিটার দিকে বার বার তাঁর চোখ পড়তে লাগল আর বার বার সেটা বিশ্রী—অসহনীয় হয়ে উঠল।

তারপর সন্ধ্যা হ'ল—রাত্রি গভীর হ'ল। অধ্যাপক জেগে রইলেন একেবারে নিরবলম্ব কর্মহীন। সমস্ত রহস্যটা সমাধানের জন্য তিনি ভীষণ কৌতূহলী হ'য়ে রইলেন। রাত্রি গভীর হ'তে গভীরতর হ'ল, কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই, ম্লান স্বল্পালোকে পাথরের মূর্তিটা এক কোণে কেমন যেন আপন রহস্যে দুর্বোধ্য হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভাঙা নাক, ভাঙা হাত, অসম্পূর্ণ অমসৃণ মূর্তিটা, পেছনে এক সত্যি মিথ্যেতে জড়ানো কাহিনী মূর্ত হ'য়ে আছে। চেয়ে চেয়ে অধ্যাপকের অসহ্য হ'য়ে উঠল। এক সময়ে মূর্তিটাকে একখানা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন তিনি; তারপর নিজের পাগলামীতে তাঁর হাসি গেল।

কাগজ কলম টেনে নিয়ে অধ্যাপক চিঠি লিখতে ব'সলেন স্ত্রীকে। লিখলেন মূর্তিটার কাহিনী আর তাঁর নিজের ছেলেমানুষী বিশ্বাস। লিখলেন: "আমি যদি তখন বেঁচে থাকতুম তা হ'লে সেই হতভাগিনীকে ভালোবাসতুম—একটা জীবনকে অমনভাবে শেষ হ'তে দিতুম না।" তারপর গালাগালি দিলেন রূপপিপাসু মানুষকে কসাই বলে, মাংসাশী ব'লে। লিখলেন: "যদি সম্ভব হ'তো তা হ'লে আজ আমার ভালবাসা দিয়ে এই পাথরটাকেই তৃপ্ত করতুম, যদি সম্ভব হতো তা হ'লে আমার জীবনের সমস্ত দিনগুলি এই পাথরের হাতে তুলে দিতুম।"

লিখতে লিখতে অধ্যাপক হঠাৎ চমকে উঠলেন, আর শুনতে পেলেন, কে যেন লঘু পায়ে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়াল। কলম থেমে গেল। তারপর পরিচিত সেই ঠাণ্ডা হাওয়ার বন্যা দূরে শালবনে মর্মর তুলে, তাঁবু দুলিয়ে হুহু ক'রে বয়ে গেল—দূর থেকে সেই কান্নার মতো অস্পষ্ট গোঙানি ভেসে এলো। আলোটা দপ ক'রে নিভে গেল, মূর্তিটার গায়ে যে কাপড়খানা ঢাকা ছিল—অন্ধকারে উড়তে লাগল সেটা। আর অধ্যাপকের অসম্পূর্ণ চিঠিটাকে নিয়ে কে যেন হাওয়ায় খেলা সুরু ক'রে দিলে—তারপর সেটা অন্ধকারে ঘুরতে ঘুরতে কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে থাকার পর অধ্যাপক তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো। জ্যোৎস্নায় প্লাবিত দিগদিগন্ত আর সুমুখে দুরন্ত ধূ ধূ প্রান্তর, অন্ধকার বিরাট দৈত্যের মতো স্তূপাকার হ'য়ে আছে শালবনে আর উঁচু পাহাড়ে। মাঝে মাঝে বহুদূরে কোথায় শেয়ালের অনুকরণে একটা কুকুরের বিশ্রী ডাক নির্জন প্রান্তরের মুহ্যমান নিঃশব্দ রাত্রিকে আরও ভীতার্ত ঘনঘোর ক'রে তুলছিল। অধ্যাপক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন। দূরে শালবনের ডালপালার ভেতর দিয়ে জ্যোৎস্নার আলো ঠিকরে পড়েছে মাটিতে। অধ্যাপকের মনে হলো—সেখানে একটা জমাট কালো ছায়ামূর্তি বার বার দেখা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তারপর মূর্তিটা স্তব্ধ নিশ্চল হয়ে দাঁড়াল শালবনের অন্ধকারে—তার ভাঙা নাক, একটা ভাঙা স্তন আর ভাঙা হাত দুটো স্পষ্ট অনুভব করলেন অধ্যাপক। আস্তে আস্তে সেইদিকে তিনি এগিয়ে গেলেন—তারপর চলে গেলেন অনেক দূরে একেবারে শূন্য নিঝ্ঝুম প্রান্তরের মাঝখানে। কেন এলেন, কার জন্যে—কিছুই বুঝলেন না তিনি। একটা ঘূর্ণিবাতাস তাঁর ওপর দিয়ে হু হু করে বয়ে গেল। শালবন আবার সচকিত হয়ে উঠল, দূরে সেই কান্নার শব্দ গুমরে উঠে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। বহুক্ষণ পরে সচেতন হয়ে তিনি টলতে টলতে ফিরে চললেন—তাঁর কেমন ভয় ক'রতে লাগল। নিজেরি নিশ্বাস প্রশ্বাসে তিনি চমকে উঠলেন।

দিগন্ত যখন কালো হ'য়ে ওঠে, শালবনে অন্ধকার নামে তখন অধ্যাপকের চোখেও কেমন আতংকের কালো ছায়া নেমে আসে। ক্রমবর্ধমান রাত্রির গভীরতার সংগে সংগে অধ্যাপক একেবারে নিঃসংগ—অসহায় হয়ে যান। চোখে তার ঘুম আসে না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে উৎকর্ণ হয়ে প্রতীক্ষা করেন একটা পরিচিত মৃদু পদশব্দের আর সেই অদ্ভুত ঠাণ্ডা হাওয়ার।

গণেশপ্রসাদের কাহিনী বার বার তাঁর মনে পড়ে। ভাবেন ঃ তার কথা কি সত্যি! মূর্তিটার পাদপীঠে উৎকীর্ণ সেই প্রাচীন লিপির কথা মনে পড়ে। একটা পাথরের মধ্যে মৃতের কামার্ত আত্মা আবার ফিরে আসতে পারে—এ কি সম্ভব! বাস্তবিকই সেই বহু দূর দিনের অতৃপ্ত আত্মা কি আবার ফিরে এলো? অধ্যাপক মনে মনে আলোচনা করেন। হয়ত সম্ভব। প্রেততাত্ত্বিকদের কথা মনে পড়ল তার। হয়ত এই সম্ভব যে, অতীতের সেই কামার্ত আত্মা তাঁর দুর্বলতার, সমবেদনার মাঝখানে আবার বহু দিন পরে মূর্ত হ'য়ে উঠেচে; এ তাঁরই সৃষ্টি তাঁরই মনের ছায়া। অধ্যাপক ভাবতে লাগলেন।

তারপর গভীর রাত্রে তেমনি পরিচিত পদশব্দ ক্রমশ তাঁবুর দিকে এগিয়ে এল—তারপর একটা খস্ খস্ শব্দ হ'লো। অধ্যাপক আড়ষ্ট হ'য়ে বিছানায় পড়ে রইলেন—তাঁর চেতনার ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে একটা জমাট বরফের চাপ যেন চলে গেল। তারপর তিনি শুনলেন—অন্তহীন ঘনান্ধকারের গহ্বর থেকে কে যেন ফিস্ ফিস্ ক'রে ব'ললে—

কতো বার ব'লবো। তোমাকে ভালোবাসি···ভালোবাসি···

তারপর চুপ চাপ—আবার।

শুনতে পাচ্ছো?

অধ্যাপক নিস্পন্দ হ'য়ে রইলেন চোখ বুজে—চেয়ে থাকবার সাহস তাঁর আর নেই।

উঃ। আমাকে তুমি ভালোবাসো না। উঃ—

অধ্যাপকের চেতনার উপরে মৃত্যু যেন ধীরে ধীরে নেমে আসছে। ইচ্ছে হ'লো—কোথাও তিনি ছুটে পালান। সেই ফিস্ ফিস শব্দ...

কবে যাবে? আমিও যাবো। আঃ—

তারপর চুম্বনের শব্দ। অধ্যাপকের মনে হ'লো—তাঁর মুখের ওপরে কার যেন নিশ্বাস পড়ল সে নিশ্বাস বরফের মতো ঠাণ্ডা।

তারপর অধ্যাপক আর কিছুই শুনতে পেলেন না—গভীর তন্দ্রা নেমে এলো তাঁর সমস্ত চেতনার ওপরে। তবু তিনি স্পষ্ট ভাবে অনুভব ক'রলেন সেই অদ্ভুত ঠাণ্ডা হাওয়ার বন্যা পাহাড়ের ওপর থেকে শালবনের ভেতর দিয়ে সর্ সর্ ক'রে নেমে এলো, সেই ক্ষীণায়মান কান্নার শব্দ তাঁর একেবারে কাণের কাছে গুমরে উঠল। তাঁবুটা দুলে দুলে উঠল। আর সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে তাঁর বোজা চোখের সুমুখে একটা দীর্ঘ কালো মূর্তি স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। মূর্তিটার গায়ে ঢাকা কাপড়খানা কে যেন ছুঁড়ে ফেলে দিলে দূরে—তারপর সেই অন্ধকারের ভেতর থেকে দীর্ঘ নগ্ন মূর্তি এগিয়ে এলো তাঁর বিছানার পাশে—মাটিতে ভারী পায়ের শব্দ স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। মুখের ওপরে নাক ভাঙা বীভৎস মুখ একখানা ঝুঁকে এলো—তারপর বুকের ওপরে, সর্ব দেহের ওপরে কঠিন আর ঠাণ্ডা অমসৃণ একটা দেহ নিবিড় হ'য়ে এলো—ভাঙা হাত দুটো দিয়ে বেষ্টন ক'রতে চাইলে বার বার। একটা স্তূপীকৃত উঁচু কঠিন স্তনের পাশে ভাঙা স্তনটা প্রত্যক্ষ অনুভব ক'রলে অধ্যাপক। কারুরি নাম মনে পড়লো না—তবু চীৎকার ক'রে ডেকে উঠতে চাইলেন অধ্যাপক কিন্তু পারলেন না। ঠাণ্ডা চাপের নিবিড়তায় নিশ্বাস তাঁর রুদ্ধ হ'য়ে এলো। মুক্ত হতে চাইলেন তিনি, কিন্তু একটা আঙ্গুলও নাড়তে পারলেন না। অন্ধকারের গহ্বর থেকে যেন একটা হাসি বেরিয়ে এলো।

ভোর হ'ল। বিগত রাত্রির কাহিনী যেন দুঃস্বপ্নের মতো মনে হ'ল তাঁর—তিনি ঠিক বুঝতে পারলেন না—ব্যাপারটা সত্যিই দুঃস্বপ্ন কি না। ভালো ক'রে নিজের কাজে তিনি মন দিতে পারলেন না। কারুকে জিজ্ঞাসাও ক'রতে পারলেন না—ক্রমাগত রাত্রির পর রাত্রি ধরে তারা কেউ কিছু শুনছে বা দেখছে কি না। তা হ'লে ভয় পেয়ে মস্ত একটা কাজ ফেলে সকলে হয়ত পালাবে। অথচ এখানে তাঁর আর থাকবার ইচ্ছেও নেই। এমন জায়গা যে পাশাপাশি কোন সহর নেই, গ্রামও সেই দশ বারো মাইল দূরে।

পাশেই থাকে জয়ন্তী। অধ্যাপক তার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। অধ্যাপকের মুখের দিকে তাকিয়ে জয়ন্তী ব'ললে, আপনাকে কেমন শুক্নো শুক্নো দেখাচ্ছে।

—হ্যাঁ, শরীরটা ভালো নেই। কাল সারারাত ঘুম হয় নি। অধ্যাপক জয়ন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল স্থির হ'য়ে কিছুক্ষণ, ভাবতে লাগল—জিজ্ঞেস ক'রবে কি না কথাটা। তারপর ব'লে ফেললেন, আচ্ছা, কাল রাত্রে—ব'লে অধ্যাপক আবার থেমে গেলেন।

কিন্তু অধ্যাপকের ওই অসম্পূর্ণ কথাটুকু শুনেই জয়ন্তীর মুখ ভয়ে বিবর্ণ হ'য়ে গেল। সে নীরবে ফ্যাকাসে মুখে অধ্যাপকের দিকে চেয়ে অপেক্ষা ক'রতে লাগল। অধ্যাপক তার মুখের ভাব দেখে কিছু আর জিজ্ঞেস ক'রতে ভরসা পেলেন না। তিনি চলে গেলেন। জয়ন্তী কি যেন ভাবতে

লাগল। কিছুক্ষণ পরে গৌতম এলো। নিঃশব্দে জয়ন্তীর পেছনে সে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর গৌতমের মুখ এগিয়ে এলো—তারপর উত্তপ্ত দুটো ঠোঁট—ঠোঁটের ওপরে, নিঃশব্দ দীর্ঘ চুম্বন। জয়ন্তীর চোখ আস্তে আস্তে বুজে এলো।

তারপর জয়ন্তী ব'ললে, আর না—এইবার যাও। তোমার জামাটা সেদিন ফেলে গিয়েছিলে—নিয়ে যাও। জয়ন্তী স্যুটকেশের ভেতর থেকে একটা তাল পাকানো জামা টেনে বের ক'রলে। সেটা গৌতমের হাতে দিয়ে ব'ললে, আমার ব্লাউজটা সেদিন তোমার বিছানায় ফেলে এসেছি—

—কই, দেখি নি তো!

—হ্যাঁ—ফেলে এসেছি। লুকিয়ে রাখোনি সেটা আর। জয়ন্তী চটলে, ব'ললে,—সকলে দেখেছে তো?

—বাঃ, আমি কি ক'রে জানব?

—যাক, যা হবার হ'য়েছে। ঠোঁট-উল্‌টে বললে জয়ন্তী, এই শেষ—যাও।

—কি ব'লছো তুমি, বুঝতে পারছিনে জয়ন্তী। কেউ কিছু ব'লেছে?

—কাল সারারাত ডক্টর গুপ্ত ঘুমোন নি—জেগেই ছিলেন। উনি সকালে কি যেন বলতেও এসেছিলেন, শেষ পর্যন্ত না ব'লেই চলে গেলেন। তোমাকে হয়ত ব'লবে। যাও এবার।

—যাচ্ছি। আড়মোড়া ভেঙে গৌতম ব'ললে, বড্ড মাথা ধরেছে—একটু জ্বরও হ'য়েছে ব'লে মনে হচ্ছে।

জয়ন্তী ওর গায়ে হাত দিলে, কপালে হাত দিলে—ব'ললে, জ্বরই তো। চুপ ক'রে শুয়ে পড়ো গে—আমি যাচ্ছি।

বিকেলের দিকে জ্বর বাড়ল গৌতমের।

ডাক্তার ব'ললে, ভীষণ ব্রংকো নিমুনিয়া। তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরিয়ে ফেলবার চেষ্টা করুন—ভালো চিকিৎসার অভাবে এখানে বিপদ ঘটতে পারে।

সন্দিগ্ধকণ্ঠে অধ্যাপক ব'ললেন, এই গরমে নিমুনিয়া কি মশায়! আমাদের যে প্রাণ ওষ্ঠাগত।

—আমিও আশ্চর্য হচ্ছি। ডাক্তার ব'ললে, কাছাকাছি সহরে নিয়ে যান।

জয়ন্তী ব'ললে, না—একেবারে ক'লকাতা—আজই। আমিও যাবো।

অধ্যাপক পায়চারী ক'রতে ক'রতে বেরিয়ে গেলেন। গৌতম হাঁ ক'রে নিশ্বাস নিচ্ছে—তাতেও তার কষ্ট হচ্ছে। গৌতম একটু অস্পষ্ট শব্দ ক'রলে—জয়ন্তী তার মুখের ওপরে ঝুঁকে পড়ল। জিজ্ঞেস ক'রলে, কি চায় সে; কিন্তু গৌতম কোন উত্তর দিলে না, হাঁপাতে লাগল।

জয়ন্তী মুখ তুলে ডাক্তারের দিকে তাকালে—ব'ললে, ডাক্তারবাবু, ক'লকাতা যাওয়ার ব্যবস্থা আজই ক'রে দিন দয়া ক'রে—ডক্টর গুপ্তকে বলুন, আমিও যাবো।

তারপর জয়ন্তী সযত্নে গৌতমের মাথার বালিশটা ঠিক ক'রে দিয়ে থমথমে মুখে বেরিয়ে গেল।

শালবনের ভেতর দিয়ে পূর্ণিমার মস্তবড় চাঁদটা তখন উঁকি মারছে। সেই একদিনের কথা মনে পড়ল জয়ন্তীর, প্রাচীন গণেশপ্রসাদের কথা মনে পড়ল। জয়ন্তী ধীরে ধীরে মূর্তিটার সুমুখে গিয়ে দাঁড়াল। চোখের কোণে দুটি ফোঁটা জল।

অধ্যাপক গুপ্তও সেই সময়ে সেখানে এলেন ভাবতে ভাবতে। গৌতমের সাংঘাতিক নিমুনিয়া হঠাৎ—ডাক্তারও আশ্চর্য হ'লো। তাঁরও মনে পড়ল গণেশপ্রসাদের কাহিনী আর উৎকীর্ণ প্রাচীন লিপি। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকার কোণে মূর্তিটার কাছে কে যেন ব'সে আছে দেখে তিনি হঠাৎ চমকে উঠলেন। ভীত কম্প্রকণ্ঠে ব'ললেন, কে !···

—আমি।

জয়ন্তী মুখ নীচু ক'রে তারপর চলে গেল।

অন্যমনস্ক অধ্যাপকও বাইরে বেরিয়ে এলেন—দূরচারী দৃষ্টি মেলে দিয়ে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। জ্যোৎস্নায় সমস্ত আকাশ ভেসে গিয়েছে। পাণ্ডুর আলোয় দূরবিসারী ধূ ধূ প্রান্তর রহস্যময় হ'য়ে পড়ে আছে। কচি শালপাতায় জ্যোৎস্নার আলো পড়ে ঝিকমিক ক'রছে, আর মাথা উঁচু পাহাড়ের গায়ে মস্তবড় চাঁদটা। এর মধ্যে রহস্যাচ্ছন্ন অতীত স্তব্ধ হ'য়ে আছে। অধ্যাপক নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন। শূন্য প্রান্তরের বুকে বহুদূরদিনের ঐশ্বর্য, রাজপাট, সভ্যতা মূর্ত হ'য়ে উঠল। এক রাজাকে মনে পড়ল, এক ভাস্করকে মনে পড়ল আর সেই নটী। সমস্ত কোথায় নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গিয়েছে। সেই ধ্বংসস্তূপের ওপরে শালবনের অন্ধকার চোখ মেলে আপন স্তব্ধতায় গম্ভীর হয়ে আছে। কতদিন কে জানে—খৃষ্টপূর্ব পাঁচ শ, সাত শ, হাজার—অথবা আরও আগে। মাত্র খুঁজে পাওয়া সেই মূর্তির উৎকীর্ণ লিপিটা কতদিনের। যা আজও নষ্ট হয় নি।

একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো অধ্যাপকের। তিনি তেমনি নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।



শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম

৺সুকুমার রায়চৌধুরী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দ্বিতীয় দৃশ্য (স্বর্গকাণ্ড)

ঘনায়েছে কলিকাল ঘেরিয়া আঁধার জাল
পাতিয়ে প্রলয় ফাঁদ কাল রাহু ধরে চাঁদ।
ওই শোন অতি দূরে সুদূর অসুর পুরে
ভেদিয়া পাতাল-তল ওই ওঠে কোলাহল ;
ওই রে আঁধার ফুঁড়ি' ওই আসে গুড়ি গুড়ি
ঐ এল লাখে লাখে, দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে

গান

ওরে ভাই তোরে তাই কানে কানে কই রে
ঐ আসে ঐ আসে ঐ ঐ ঐ রে
নিঝুম্ রাতে ফিস্ ফাস্ বাতাস ফেলে নিশ্বাস
স্বপ্নে যেন খোঁজে কারে কৈ কৈ কৈ রে !
আঁধার রাতে চলাচল শুদ্ধ দেহ রক্ত জল
শব্দ নাচে হোড়ে হোড়ে হৈ হৈ হৈরে।
পাণ্ডু ছায়া অন্ধ হিম শূন্যে করে ঝিম্ ঝিম্
ঐ রে গেল গা ঘেঁষে আর ত আমি নইরে।
মর্ম্মকথা বলি শোন্ লাগল প্রাণে 'কলিষণ'
প্রাণপণে হেঁকে বল মা ভৈ ভৈ রে ॥

দেবতা সবে গাত্র তোলো স্বপ্ন-লীলা সাঙ্গ হ'ল।
দেখরে জেগে কাণ্ডটা কি সৃষ্টিবাঁধন ভাঙল নাকি ?
ঈশান কোণে মেঘের 'পরে শব্দ তরল রক্ত ঝরে
পাণ্ডুবরণ দখিণে বামে, অন্ধ আঁধার শব্দ নামে।
প্রলয় বাদল রক্ত-রাঙা পাগল জেগেছে আগল ভাঙা
উল্কা ঝলকে বিজলী ছোটে গহন শূন্যে শিহরি' ওঠে।
তুহিনতিমির ধরণী গায় সভয় পবন থমকি' চায়
হরষে পিশাচী পিশাচে কয় রক্ত মড়ক জগৎময় ॥

হে অলক্ষ্মী একি খেলা অনাহূত হেন বেলা
নৃত্য তোমার এম্নি ধারা, সৃষ্টি ছাড়া ছন্দহারা !
অনাদৃতে হুজুকময়ী খেয়াল তব সর্ব্বজয়ী—
কহ আজি কেন স্কন্ধে চাপিলে নাছোড়বন্দে !
কেন ঠাট্টা সর্ব্বনাশি, কেন অট্ট আঁধার হাসি,
কেন আজি ঘুমটি ভাঙাও অকারণে চক্ষু রাঙাও ?

গান

কেন কেন কেন রে কেন কেন ?
চেঁচিয়ে কাঁচা ঘুম ভাঙ কেন ?
পটকা শব্দ অট্টরোল শঙ্খ ঘণ্টা ঢক্কা ঢোল
স্বর্গপুরী হদ্দ হৈল বাদ্যভাণ্ড হট্টগোল।
দেবতা বিলকুল কান্দে গো তল্পিতল্পা বান্ধে গো
পাগলা রাহু একলা তেড়ে গিলতে চাহে চান্দে গো।
আগডুম বাগডুম শব্দ ছায় চিত্ত গুড় গুড় দপ্‌দপায়—
দন্ত করমড় হাড্ডি মড়মড় প্রাণটা ধড়ফড় সর্ব্বদায়।

কাকস্য পরিবেদনা বৎসগণ আর কেঁদ না,
গতস্য শোচনা নাস্তি যথা কর্ম্ম তথা শাস্তি ;
মিথ্যা এত কান্না কেন অলমতিবিস্তারেণ ?
অত্র এখন দেবতা সভায় ঠাণ্ডা হ'য়ে বসছে সবাই
তোমরা একটু ক্ষান্ত হও শান্ত হয়ে মন্ত্র কও ॥

(বৃহস্পতি স্তোত্র)

এ ভব-সঙ্কট অর্ণব-মন্থনে মা কুরু সংহার, মা কুরু সংহার,
মা কুরু সংহার—মা কুরু হে !
হে গুরু গীস্পতি, অষ্টম দিক্‌পতি, হে গুরু রক্ষহে, হে গুরু,
রক্ষ হে, হে গুরু হে।

(বৃহস্পতির আবির্ভাব)

বৃহস্পতি

মা কুরু কোলাহল ভো ভো শিষ্য হে,
দরজাটুকু ছেড়ে ব'সো আজকে বড় গ্রীষ্ম হে—
আসনটাকে মাড়িয়োনা বসো না কেউ সোফাতে
তোমার গায়ে গন্ধ বড় সরে দাঁড়াও তফাতে।

কি বলছিলে বলে ফেল নেইক আমার চাকর বাকর—
সময় কেন নষ্ট কর ক'রে মেলা বকর বকর ?
কারুর বাড়ী যজ্ঞি নাকি—বংশপ্রথা চিরন্তন ?
তোমার বুঝি ছেলের ভাতে ফলার ভোজে নিমন্ত্রণ'?
তোমার বুঝি মেয়ের বিয়ে—আটকে ছিলে অনেক দিন ?
যা হোক এবার উৎরে গেল রয়ে সয়ে বছর তিন ॥
তোমার বাড়ী শ্রাদ্ধ নাকি ঘর জামাইটি গেছেন মরে
বেজায় বুঝি ভুগেছিল ডেঙ্গুজ্বরে বছর ভ'রে ?

সকলে

বিপদকালে হ্যপস্থিতে ঠাকুর মোদের যুক্তি দাও—
ঐ চরণের শরণ নেব মরণ হতে মুক্তি দাও ॥

বৃহস্পতি

মরবে যে তা আগেই জানি—যেমনতর অনাসৃষ্টি
ইন্দ্র তোমার এসব দিকে একেবারেই নাইক দৃষ্টি !
কাজে কর্ম্মে নেইক ছিরি কচ্ছে সবাই যাচ্ছেতাই
অমৃত সে ভেজাল গোলা দেবতাগুলো খাচ্ছে তাই।
মড়ক সে তো হবেই এতে সর্দ্দিগর্ম্মি বেরিবেরি
একে একে মরবে সবাই আর বেশীদিন নাইক দেরী।
হাজার কর ডিশিনফেক্টো, হাজার কেন ওষুধ গেলো—
যা'হোক তোমরা যে যার মত উইলপত্র লিখে ফেলো !
দেবতালীলা সাঙ্গ যদি নেহাৎ যাবে জাহান্নমে
যার যা কিছু দেবার থাকে দাওনা লিখে আমার নামে!

বীণাহস্তে নারদের প্রবেশ

(গান)

ও বীণা তুই দেখবি মজা বাদ্যি বাজা (তারে না তানা)
হেন সুযোগ মাগ্যি বড় ও বীণা তোর ভাগ্যি বড়
এত মজা আর পাবিনা পাগলা বীণা (তারে না তানা)
নাচি আমি সঙ্গে তোরি বাহু তুলে রঙ্গ করি
তোরে বাজাই আপনি বাজি নাচিয়ে নাচি (তারে না তানা)
লাঠালাঠি রক্তমাটি দেখে লাগে দাঁতকপাটি
ও বীণা তুই থাকবি তফাৎ লাগবে হঠাৎ (তারে না তানা)

বৃহস্পতি

কি গো ঠাকুর অলক্ষুণে—ঝাড়তে এলে গায়ের ধূলো ?
দেখছি এবার হ্যাপায় প'ড়ে মরবে তবে দেবতাগুলো।

নারদ

নাকে ছিপি কানে তুলো ভায়া বড় বিজ্ঞ যে
ডিঙোতে চাও টপাটপ আমা হেন দিগ্‌গজে !
—শব্দ শুনে দৌড়ে এলাম যুদ্ধটুকু লাগল কি ?
দৈত্য দেখে ভীষণ ভয়ে দেবতারা সব ভাগল কি ?

বৃহস্পতি

ওঁর কথা কেউ শুনো নাক ঠাকুর বড় রগ্‌চটা
তাই ত ইন্দ্র, তোমার হাতে দেখছি না যে বজ্রটা !

ইন্দ্র

বজ্র সে কি হেথায় আছে, গিয়েছে সে কোন্ চুলোয়
তার বেঁধে তার কাজে লাগায় মর্ত্ত্য লোকের লোকগুলোয়।

নারদ

তোমাদের খুব স্নেহ করি কাজ কি বলে সবিস্তার
এম্নি উপায় বাংলে দেব এক্কেকারে পরিষ্কার ॥

বৃহস্পতি

একটা উপায় আছে বটে—তোমায় সেটা খুলে জানাই,
হাড় ক'খানা দাওনা মোদের নূতন ক'রে বজ্র বানাই !
তোমার হাড়ে বজ্র গড়ে পিটলে পরে দমাদম্
একটি ঘায়ে মরবে না যে সেই ব্যাটারাই নরাধম।
শুষ্ক হাড়ে ঘুণ ধরেছে, সূক্ষ্মতর শক্তি তায়
জল্‌বে ভাল হাড্ডি তোমার কাজ কি বল বক্তৃতায় ?

নারদ

হোঁৎকামুখো গণ্ডেগোদ্ আমার উপর টিপ্পুনী
আমায় তুমি মরতে বল ? মরবে তুমি এক্ষুণি !
আমার উপর চক্ষু ঠারো ? আমায় বল কুন্দুলে ?
মুখে মাখো জুতোর কালি—গালে লাগাও চুণ গুলে।

(কার্ত্তিকের প্রবেশ)

আমায় সবাই মাপ ক'রো ভাই, হ'য়ে গেল আস্‌তে দেরী !
হিসেব মত পছন্দসই হচ্ছিল না চোস্ত টেরী !
গোঁফ জোড়াটা মেপে দেখি ডাইনে একটু গেছে উঠে—
লাগল দেরী সামলে নিতে টেনেটুনে ছেঁটেছুঁটে !
চাকর ব্যাটা খেয়ালশূন্য কাজে কর্ম্মে ঢিলে দিয়ে
শেষ মুহূর্ত্তে কাপড়খানা কুঁচিয়ে দিলো গিলে দিয়ে ॥

নারদ

তুমি এখন ভরসা এদের তুমিই এদের কর্ণধার
তুমি এদের ত্রাণ কর ভাই—নইলে সবই অন্ধকার !
বলছি এদের বারেবারে নেই রে উপায় যুদ্ধ বই
তোমরা সবাই হঠলে, এখন আমি কোথায় মুখ লুকোই ?

কার্ত্তিক

লড়াই করে মরতে যাব আর ত আমার সেদিন নয়
কারে তুমি হুকুম কর শর্ম্মা কারো অধীন নয় !
যে কয় জনা যুদ্ধে যাবেন ফিরবে না তার অর্দ্ধেকও
তল্পি তুল্পা বাঁধরে ভাই, থাকতে সময় পথ দেখো।

১

আমি বলি ঢের হয়েছে শান্তিবাদ্য পিটিয়ে দাও
হাঙ্গামেতে কাজ কি বাপু, আপোষ করে মিটিয়ে দাও !

২

শাস্ত্রে বলে শোনরে চাচা আপনা বাঁচা আগে ভাগে
পিট্টি খেয়ে মরবি কেন, থাকলে দেহ কাজে লাগে !

৩

কিসের দাদা স্বর্গভূমি কিসের পুরী পাঁচতলা
দৈত্য যখন ধরবে ঠেসে করবে তুমি কাঁচকলা।

৪

ত্যাগ কর ভাই মিথ্যে মায়া ত্যাগ কর এ স্বর্গধাম—
আর ত সবই ছাড়তে পার প্রাণটুকুরই বড্ড দাম।

নারদ

কিসের এত ভাবনা তোদের, মিথ্যে এত কিসের ডর
যুক্তি করে দেখ না ভেবে ঠাণ্ডা হ'য়ে হিসেব কর।
না হয় ডুটো খসবে মাথা না হয় ডুটো ভাঙত ঠ্যাং,
তাই ব'লে কি ঢুকবি ভয়ে কুয়োর মধ্যে জ্যান্ত ব্যাং ?
আমরা যদি দেবতা হতুম দৈত্য দেখলে ক্যাঁক ক'রে
ঘাড়টি ধ'রে পিট্টি দিতুম হাড্ডিমাসে এক করে ॥

ইন্দ্র

অস্ত্রগুলো মর্চ্চে পড়া অনেক কালের অনভ্যাস
এমন হ'লে লড়বে নাকো—স্বয়ং বলেন বেদব্যাস।

নারদ

বিষ্টু বল আত্মাপাখী ! এমন দিনও ঘটল শেষে
দৈত্য বেড়ায় বুক ফুলিয়ে দেবতা পালায় ছদ্মবেশে ?
আসছি ধেয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পয়সা কড়ি খরচ ক'রে
করলে না কেউ খাতির আমায়
ডাকলে না কেউ গরজ ক'রে।
তোমরা সবাই ডুবে মরো, ইন্দ্র তোমার গলায় দড়ি
কার্ত্তিকেয় মরবে তুমি ঐরাবতের তলায় পড়ি।
মরব এবার দেহত্যাগে এ ভবে আর থাকছি নেকো
এইখেনেতেই মূর্চ্ছা যাবো তোমরা সবাই সাক্ষী থেকো ॥

(শয়ন ও মূর্চ্ছা)

ইন্দ্র

ব্রহ্মহত্যা আমার ঘরে, ও ঠাকুর তোর পায়ে পড়ি,
মরতে চাও ত বাইরে মর আমরা কেন দায়ে পড়ি ?
অশ্বিনী গো বদ্যি মশাই, দাঁড়িয়ে কেন চুপটি ক'রে
ঠাকুর হোথা তুলছে পটোল বাঁচাও তারে যুক্তি ক'রে।

(অশ্বিনীকর্ত্তৃক রোগ-পরীক্ষাদি)

অশ্বিনী

বদ্যি রাজা ধনন্তরি — শিষ্য হ'য়ে স্মরণ করি।
তোমার নামে মন্ত্র পড়ি — হাতে নিলাম জ্যান্ত বড়ি।
প্রেতপিশাচ শুদ্ধি হোক — যেই খাবে তার বুদ্ধি হোক।
রুষ্ট বায়ু ক্ষান্ত হও, — মড়ামানুষ জ্যান্ত হও,
মুক্ত হবে পিত্তদোষ — নিত্য রবে চিত্ততোষ
লুপ্ত নাড়ি শক্ত বেশ — উঠবে কেঁচে পক্ক কেশ।
ঘুচবে পিলে ছুটবে বাৎ — ফোকলা মুখে উঠবে দাঁত
রাত্রি দিনে ফূর্ত্তি রবে — কার্ত্তিকেরি মূর্ত্তি হবে ॥
কিন্তু যারা মিথ্যে কয় — নাইকো যাদের চিত্তে ভয়
মিথ্যে রোগের নিত্যি ভান — ওষুধ তাদের মৃত্যুবাণ—
রোগ যেথা নয় সত্যিকার — তোর 'পরে নাই ভক্তি যার
জ্যান্ত বড়ি বিষ বড়ি — কণ্ঠে তাদের দিস দড়ি।
নয়কো যে জন শান্ত রকম — হয় যেন সে জ্যান্ত জখম
নৃত্য কোঁদল বন্ধ রবে — চক্ষু দুটি অন্ধ হবে,
জ্বলবে গরল তিক্তধারা — নাচবে রোগী ক্ষিপ্তপারা
গণ্ডে ফোড়া তুণ্ডে বাৎ — ভণ্ড জনের মুণ্ড পাত !

ও বড়ি তুই নিদান কর বিচার বুঝে বিধান কর
কপট রোগী খবরদার ওষুধ আমার সমঝদার।

নারদ

গা ঝিম ঝিম মাথা ঘোরা এক্কেবারে কেটে গেল
মূর্চ্ছা আমার আপনি সারে ওষুধটা কেউ চেটে ফেল।
হায়রে হায় কলির ফেরে দেবতা গুরু ভোগ না পায়
যার লাগি লোক চুরি করে চোর বলে সে চোখ পাকায়।
তোদের ভেবেই শরীর মাটি রাত্রে আমার ঘুমটি নেই—
তোদের ছেড়ে জগৎ যেন ব্যঞ্জনেতে নুনটি নেই।
তোদের তরেই মূর্চ্ছা গেলাম, তোদের তরেই প্রাণটি ধরি
তোরাই আমার মাথার মাণিক তোরাই আমার কলসি দড়ি।
এই কি তোদের দেবতাগিরি এই কি সাহস জলন্ত!
ছুয়ো দেবতা, ছুয়ো ইন্দ্র, দেবতা কুলের কলঙ্ক।

বৃহস্পতি

রাখ তোমার বকর বকর ভগ্ন ঢেঁকির কচকচি
মিথ্যে তুমি প্যাঁচাল পাড় বাক্য মার দশগজি—
ঐ দিকে যে বিশ্ব ডোবে বাণ ডেকেছে সৃষ্টিতে
লুটিয়ে গেল চুটিয়ে গেল শব্দ বাণের বৃষ্টিতে।
অর্থহারা শব্দ ফিরে স্থাবর হতে জঙ্গমে
বিশ্ব ব্যাপার উধাও হ'ল শব্দসাগর-সঙ্গমে
ঘুর্ণিপাকের ছন্দ জাগে গুপ্ত গভীর গর্জ্জনে
মুক্ত কৃপাণ শক্তি মাতে অর্থ মহিষমর্দ্দনে।
আদ্যিকালে বাদ্যি বাজে স্বর্গমর্ত্ত্য ফক্কিকার
ধাক্কা লাগে গোলকধামে রোধ করে তায় শক্তি কার?
শব্দধারার বর্ষা যেন কৃষ্ণ ভাদ্র অষ্টমী
শীঘ্র দেখ ছিদ্র খুঁজে কার এ সকল নষ্টামি!

—ওরে বাসরে! এমনি ব্যাপার? আর কি আছে রক্ষে?
আর একটুকুন সবুর কর দেখবে ধোঁয়া চক্ষে।
মন্ত্র নাচে ছন্দ নাচে শব্দ নাচে রঙ্গে—
বুকের শব্দ শোষণ করে রক্তধারার সঙ্গে!
দেখবে ক্রমে শব্দ জমে হাত পা হবে ঠাণ্ডা
শক্ত কঠিন শব্দ দিয়ে মারবে মাথায় ডাণ্ডা—

অর্থ বাঁধন হুড়কো ভেঙে শব্দ এল পশ্চিমে
যার খুসী হয় বসে থাক আমরা বাবা বসছিনে॥

সকলের প্রস্থান

বিশ্বকর্ম্মা

আদিকাল হতে বিশ্ব ফিরে মহাচক্র পথে
চক্রে চলে জলস্থল চক্রে ঘোরে ভূমণ্ডল
সেই চক্রে চির গণ্ডীঘেরা শব্দ করে চলাফেরা।
মহাকাল ফিরে শূন্যে বস্তুরূপ মাগি
স্পর্শে তার শব্দ উঠে জাগি!
অর্থ তারে চক্রপথে টানি, ঘোরায় আপন ঘানি
বাক্ অর্থ দোঁহে যুক্ত—নিত্য বসবাস—ইতি কালিদাস॥
আজ কেন রুদ্ধ পথ খুলে মন্ত্রাঘাত করি শব্দমূলে
ছিন্ন করে শব্দের বাঁধন—অসাধ্য সাধন,
কাল-চক্র-ব্যূহ ভেদ করি' ঊর্দ্ধগতি কুণ্ডলীর মুক্ত পথ ধরি
জাগে ওই নিদ্রিত অশনি হাহাকার ক্রন্দনের ধ্বনি!
অন্ধকার রাতে অঙ্গহীন শব্দের পশ্চাতে
কার তপ্ত নিঃশ্বাসের রুদ্ধ অভিশাপ জপিছে প্রলাপ?

তৃতীয় দৃশ্য

[স্বর্গপথে সশিষ্য গুরুজি—বহু পশ্চাতে বিশ্বম্ভর]

(মন্ত্রপাঠ)

হলদে সবুজ ওরাং ওটাং ইটপাটকেল চিৎপটাং
গন্ধগোকুল হিজিবিজি নো এডমিশন ভেরি বিজি
নন্দীভৃঙ্গী সারেগামা নেই মামা তাই কাণামামা
চীনেবাদাম সর্দ্দিকাশি ব্লটিংপেপার বাঘের মাসি।

গুরুজি

দাঁড়াও আমাদের গতি যে ক্রমশ মন্দীভূত হয়ে আসছে, সেটা কি তোমরা অনুভব করেছ?

সকলে

আজ্ঞে, ক্রমশই কমে আসছে—

গুরু

এর কি কোন কারণ নির্ণয় করতে পারছ? কেউ কি পশ্চাতে পড়ে থাকছ?

বেহারী

আজ্ঞে আপনার পরেই এই ত আমি আসছি—

হরে

তার পরেই আমি শ্রীহরেকানন্দ—

জগাই

তার পর আমি—জগাই—

পটলা

তার পর আমি—

গুরু

তবে এর কারণ কি? শব্দের আকর্ষণটা বেশ অনুভব করছ কি?

পটলা

আজ্ঞে আমার বাক্য পিছন দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে।

গুরু

সর্ব্বনাশ!—তবে একবার নির্ব্বিশেষ মন্ত্রটা বেশ করে উচ্চারণ করে—শক্তি সঞ্চার ক'রে—তারপর তাকিয়ে দেখ—কিছু দেখা যায় কিনা—

সকলে

গৌ গাবৌ গাবঃ—গো গাবো গাবঃ—গৌ গাবৌ গাবঃ—

বিশ্বম্ভর

ইত্যমরঃ—

সকলে

কে শব্দ করে?

পটলা

সেই লোকটা!

সকলে

সর্ব্বনাশ! ও আবার চায় কি?

বিশ্ব

ওই যে তোমরা কোথায় যাচ্ছ সেইখেনে যাব।

গুরু

বৎস বিশ্বম্ভর, তুমি আস্‌লেই যদি, তবে অমন পশ্চাতে পড়ে থাকছ কেন?

বিশ্ব

আজ্ঞে বেজায় পরিশ্রম লাগছে—

গুরু

কেন? তুমি কি সম্যকরূপে মন্ত্রে আরোহণ করতে পার নাই? তুমি কি কোনরূপ ভারবহন করে আনছ?

বিশ্ব

আজ্ঞে এই শরীরটে—

গুরু

ওসব ছেড়ে দেও—কিছুক্ষণ ধুকধুক্ মন্ত্র জপ কর—ওসব স্থূল সংস্কার কেটে যাবে—

(ছাত্রগণের মন্ত্র জপ)

বিশ্ব

আমি ভাবছিলুম—

—ভাবছিলে? সর্ব্বনাশ!—সর্ব্বনাশ ভেবোনা, ভেবোনা—

গুরু

শব্দের ঘাড়ে চিন্তাকে চাপাচ্ছ? ছিঃ! অমন করে শব্দশক্তি ম্লান করো না—আমার পূর্ব্ব উপদেশ স্মরণ কর—শব্দের সঙ্গে তার অর্থের যে একটা সূক্ষ্ম ভেদাভেদ আছে, সাধারণ লোকে সেটা ধরতে পারে না—

—তাদের শব্দ জ্ঞান উজ্জ্বল হয় নি—

—তারা শব্দের রূপটিকে ধরতে জানে না।

গুরু

তারা ধরে তার অর্থকে। তারা শব্দচক্রের আবর্ত্তের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যায়। যেমন কর্ম্মবন্ধন, যেমন মোহ-বন্ধন, যেমন সংসার-বন্ধন—তেমনি শব্দ-বন্ধন!

সকলে

শব্দ-বন্ধনে পড়ো না—পড়ো না—

গুরু

শব্দকে যে অর্থ দিয়ে ভোলায়—সে অর্থপিশাচ। শব্দকে আটকাতে গিয়ে সে নিজেই আটকা পড়ে। নিজেকেও

ঠকায় শব্দকেও বঞ্চিত করে। সে কেমন জান? এই মনে কর, তুমি বললে 'পৃথিবী'—তার অর্থ করে দেখ দেখি?—সূর্য্য নয়, চন্দ্র নয়, আকাশ নয়, পাতাল নয়—সব বাদ—শুধু পৃথিবী! এরা নয়, ওরা নয়, তারা নয়—এসব কি উচিত? আবার যদি বল 'পৃথিবী গোল'—তার সঙ্গে অর্থ জুড়ে দেখ দেখি, কি ভয়ানক সংকীর্ণতা!—পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘোরে, তা বলা হ'ল না—পৃথিবীর উত্তরে কি দক্ষিণে কি, তা বলা হ'ল না—তার তিনভাগ জল একভাগ স্থল, তা বলা হ'ল না—তবে বলা হ'ল কি? গোটা পৃথিবীটার সবই ত বাদ গেল! এটা কি ভাল?

বিশ্ব

আজ্ঞে না—এটা ত ভাল ঠেকছে না, তাহলে কি করা যায়?

গুরু

তাই বলেছিলাম—শব্দের বিষদাঁত যে অর্থ, আগে তাকে ভাঙ। শুধু পৃথিবী নয়, শুধু গোল নয়, শুধু এটা নয়, শুধু ওটা নয়; আবার এটাই ওটা, ওটাই সেটা—তা-ও নয়। তবে কী? না সবই সব। তাকেই আমরা বলি গৌ গাবৌ গাবঃ—

"গৌ গাবৌ গাবঃ গৌ গাবৌ গাবঃ—হলদে সবুজ ওরাংওটাং" ইত্যাদি

(বিশ্বকর্ম্মার আবির্ভাব)

বিশ্বকর্ম্মা

নিঝুম তিমির-তীরে শব্দহারা অর্থ আসে ফিরে
কালের বাঁধন টুটে দশ দিশি কেঁদে উঠে
দশদিকে উড়ে শব্দধূলি, উড়ে যায় উড়ে যায় মোক্ষপথ ভুলি'।
ভেবেছ কি উদ্ধতের হবে না শাসন?
জাগেনি কি সুপ্ত হুতাশন?
বিদ্রোহের বাজেনি সানাই? শব্দ আছে প্রতিশব্দ নাই?
শব্দ মুখে প্রতিলোম শক্তি এস ঘিরে
কুণ্ডলীর মুখ যাও ফিরে
শব্দঘন অন্ধকার নিত্য অর্থভারে নাম বৃষ্টিধারে
শব্দযজ্ঞ হবিষ্কুণ্ড অফুরন্ত ধূম এই মারি **শব্দকল্পদ্রুম্**।

('দ্রুম্' শব্দে সশিষ্য গুরুজির স্বর্গ হইতে পতন)



কণ্টিনেণ্ট

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অধ্যাপক ডক্টর দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়, এম্. এস্. সি., পি. এইচ. ডি.

পশ্চিম জার্ম্মানীর ওপর দিয়ে ট্রেন চলছিল। দুধারে একই ধরণের গাছপালা, ছোট ছোট পাহাড় তার মাঝে মাঝে ছোট পরিষ্কার গ্রামগুলো দূর থেকে সুন্দর দেখাচ্ছিল। ট্রেনের কামরাগুলোর ভেতর দুটো ভাগ; কতকগুলোর ভেতর ধূমপান করা চলতে পারে এবং কতকগুলোয় সেটা নিষিদ্ধ। ধূমপাননিষিদ্ধ কামরাগুলিতে বেশী ভিড় হয় না, তারই একটায় উঠেছিলাম। বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি ক্রমেই একঘেয়ে হ'য়ে উঠছিল, মনে মনে ভাবলাম যে হয়ত হাইডেলবার্গ পৌছুবার আগে দৃশ্যাবলীর একটা পরিবর্ত্তন হবে। তার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। খানিকক্ষণ পরে হাইডেলবার্গে এসে ট্রেন থামল। ষ্টেশন থেকে বেরিয়েই দুতিনজন হোটেলের প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা হ'ল। তাদের প্রত্যেকেই নিজের নিজের হোটেলের গুণপনা ব্যাখ্যা করে আমাকে তাদের হোটেলে উঠতে অনুরোধ করল। সেণ্ট্রাল হিটিং, লিফ্ট, প্রত্যেক ঘরে গরম ও ঠাণ্ডা জলের ব্যবস্থা ইত্যাদি সবই বলার পর চার্জ্জ জিজ্ঞেস করলাম। শুনলাম কেবল ঘরের জন্যেই প্রত্যহ চার পাঁচ মার্ক লাগবে। বললাম "তার চেয়ে অনেক সস্তা হোটেল আমার দরকার।" তাতে তারা বিদায় নিল। আরো খানিকটা এগিয়ে রাস্তা ধরে চলতে আরম্ভ করলাম। রাস্তার নাম হউপ্ট ষ্ট্রাসে বা প্রধান রাস্তা।

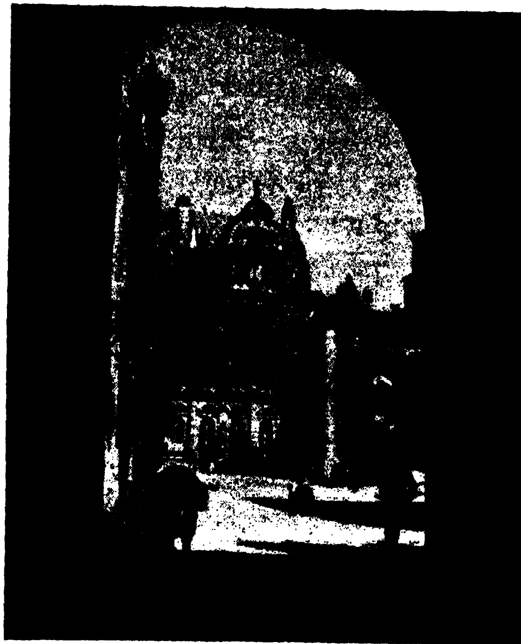
প্রথম কয়েকটা মণিহারী দোকান পার হয়ে দেখি একটা হোটেল। বাইরে লেখা রয়েছে হোটেল গোল্ডে রোসে—সেণ্ট্রাল হিটিং—প্রত্যেক কামরা দুমার্ক পঞ্চাশ ফেনিগ—ও শেষ কালে "English spoken". শেষ কালের কথাটাই সবচেয়ে ভাল লাগল। এর চেয়ে সস্তা হোটেল হয়ত চেষ্টা করলে পাওয়া যেত, কিন্তু সেখানে ইংরিজি কথাবার্ত্তা বলার সুবিধে হয়ত নাও থাকতে পারে। এদিকে রাত হয়ে যাচ্ছে তাই দুর্গা বলে সেই হোটেলে ঢুকে পড়লাম। মুখে অবশ্য "হের হিট্লার" বলেই ঢুকতে হোল। একটি লোক "হের হিট্লার" বলে আমাকে সম্ভাষণ করলেন। লোকটি বৃদ্ধ, তবে মুখে খাঁটী জার্ম্মানদের মত একটা যেন কর্কশ ও দৃঢ় ভাব। তাকে ইংরিজিতে বললাম যে আমার দুতিন দিনের জন্য একটি থাকবার ঘর দরকার। সে কিছুই বুঝতে পারল না। হোটেলের নিচের তলায় একটা রেস্তরাঁ। লোকটি আমাকে অপেক্ষা করতে বলে রেস্তরাঁয় ব্যস্ত হয়ে প্রবেশ করল এবং একটু পরেই আর একজন লোকের সঙ্গে ফিরে এল। সে লোকটি ইংরিজিতে বলল "গুড ইভনিং সার্" বুঝলাম হোটেলের বাইরে "English spoken" লেখা শুধু এই লোকটির বিদ্যের একটা পরিচয় দেবার জন্যে। তার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তা বলে বুঝলাম যে তার ইংরিজির জ্ঞান খুবই সামান্য। যাই হোক অল্পক্ষণেই তার ইংরিজি রণে ভঙ্গ দিল এবং আমি জার্ম্মান ভাষা আরম্ভ করলাম। তাতে তারা দুজনেই বিস্মিত ও আনন্দিত হ'ল। তাদের জানালাম যে দুতিন দিনের জন্যে আমার থাকবার ব্যবস্থার দরকার। তেতলার একটা সুন্দর ঘরে আমার স্থান হ'ল। হোটেলের একটা চাকর আমার ছোট এটাচি কেশটা নিয়ে ওপরে উঠল এবং আমার ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে গেল।

ঘরটায় অনেক আসবাবপত্র। তৈরী বিছানা, ড্রেসিং টেবল, বসবার দু তিনটে ভাল কোচ, ওয়ার্ডরোব, মেঝেতে কার্পেট পাতা, ঘরের এককোণে হাতমুখ ধোবার ব্যবস্থা ও সেখানে গরম ও ঠাণ্ডা জলের কল, পরিষ্কার তোয়ালে, তাছাড়া প্রত্যেক ঘরের সঙ্গে একটা করে বাথরুম। ব্যবস্থা খুবই ভাল লাগল। ইউরোপের সব জায়গাতেই হোটেলের ব্যবস্থা প্রায়ই এই রকমের। অল্প কয়েকটা খুচরো জিনিষপত্র সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে পড়লেই হ'ল। বিছানা, তোয়ালে, আয়না, লোটা, কম্বল কিছুই সঙ্গে নিতে হয় না।

English spoken হোটেলে উঠে ইংরিজি কথাবার্ত্তা বিশেষ বলতে পারলাম না মনে করে বড় অস্বস্তি বোধ

হ'তে লাগল। অল্পক্ষণ পরে হোটেলে জিনিষপত্র রেখে বাইরে বেরুলাম। খানিকটা রাস্তায় পায়চারি করে সামনের একটা রেস্তরাঁয় কিছু কফি ও কেক খাবার জন্যে ঢুকলাম। তখন সেখানে একটা কনসার্ট পার্টি সুন্দর বাজনা বাজাচ্ছিল। কনসার্টের মাঝে মাঝে খানিকক্ষণ করে একটি বৃদ্ধ লোক বেহালা বাজাচ্ছিলেন। তাঁর বাজাবার কৌশল খুব ভাল। তার যন্ত্রের সে মিষ্টি সুর আজও কানে যেন লেগে রয়েছে। এক কাপ কফি ও দুটো কেক নিয়ে বসে বসে অনেকক্ষণ বাজনা শুনলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ওঠবার আয়োজন করছি এমন সময় অন্য একটা টেবিল থেকে এক ভদ্রলোক এসে ইংরিজিতে বললেন "দিনটা বড় গরম, না?" হঠাৎ ইংরিজি শুনে অবাক হয়ে গেলাম। উত্তর দিতে গিয়ে আলাপ হয়ে গেল। একটু পরে তাঁর স্ত্রীও এগিয়ে এসে আলাপ করলেন। তিনিও সেইখানেই ছিলেন। তাঁরা মিষ্টার ও মিসেস্ এলার্স। দুজনেই মোটামুটি ইংরিজি জানেন এবং কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁরা লণ্ডনে কয়েক মাস থেকে এসেছেন তাঁরা আমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে বেশ আনন্দিত হলেন। তাঁদের নাকি একজন ভারতীয় লোকের সঙ্গে আলাপ করবার বহুদিনের ইচ্ছে ছিল। কথাবার্ত্তা অনেক বিষয়ে হ'ল এবং ঠিক হ'ল যে পরদিন সকালে তাঁরা নিজেদের মটর নিয়ে হোটেলে আসবেন এবং আমাকে নিয়ে খানিকটা বেড়িয়ে নিয়ে আসবেন। অনেক ধন্যবাদ দিয়ে তাঁদের সে রাত্রের মত বিদায় দিলাম।

নানাকথাই মনে আসছিল। নাৎসি জার্ম্মানীর মাঝখানে একটা ছোট সহরে আমি নিতান্ত একলা। আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা সে সময়ে খুবই খারাপ, যুদ্ধ যখন তখন লেগে যেতে পারে। যদি যুদ্ধ লেগে যায় তাহলে আমাকে কি ওরা দেশে ফিরতে দেবে না? দুবছর পরে দেশে ফেরা কি অনিশ্চিতের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে? দেশে প্রিয়জনদের অনেক দিন পরে আমাকে ফিরে পাওয়ার আশা কি নির্ম্মূল হয়ে যাবে? জার্ম্মানীর সঙ্গে বৃটেনের যুদ্ধে, ভারতীয় লোককেই বা জার্ম্মানরা আটক করবে কেন? জার্ম্মানরা ত লোক খুবই ভাল। এই অল্প সময়ের মধ্যে হাইডেল-বার্গের লোক আমার সঙ্গে কত আগ্রহ করে আলাপ করল। যুদ্ধ লাগলেই কি এদের সহানুভূতি সব নষ্ট হয়ে যাবে? এই সব নানা কথা চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম।



হাইডেলবার্গের প্রাচীন দুর্গের প্রবেশ পথ　　　　ফটো—লেখক

সকাল বেলায় সূর্য্যের আলোয় ঘুম ভেঙ্গে দেখি বেলা সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। অল্পক্ষণ পরেই এলার্সদের আসবার কথা। তাড়াতাড়ি উঠে মুখ হাত ধুয়ে কোট-প্যাণ্ট পরে নিলাম। ব্রেকফাষ্ট প্রায় শেষ করেছি এমন সময় মটর নিয়ে এলার্স দম্পতি এসে হাজির। "গুট্ মর্নিং সাটার্সি।" বললাম "গুটেন্ মর্গেন্ হের উণ্ড্ ফ্রাউ এলার্স (অর্থাৎ প্রাতঃপ্রণাম এলার্স দম্পতি) তবে আমার নামটা একটু ভুল হয়েছে, সাটার্সি নয় চ্যাটার্জ্জি।" ওরা দু তিন বার চেষ্টা করেও ঠিক উচ্চারণ করতে পারল না। একটু পরেই আমরা মটরে বেরিয়ে পড়লাম। মিসেস এলার্স ও আমি পেছনে বসলাম ও মিষ্টার এলার্স মটর চালাতে লাগলেন। প্রথমে সহরের নানা ঘর বাড়ীর ধার দিয়ে মটর চলতে লাগল, একটু পরেই সহরের নিকটবর্ত্তী নেকার নদীর ধার দিয়ে গাড়ী চলল। সেখান থেকে একটু দূরে ছোট একটা পাহাড়ের ওপর সহরের পুরানো দুর্গ প্রহরীর মত শতাধিক বর্ষ ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

নদীর ওপারে ছোট ছোট পাহাড়, তারই কোলে ছোট বড় নানান রকমের বাড়ী। নদীর ওপার দিয়ে দুটো সেতু, দুধারে বিস্তৃত সহর। চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় মনোরম, দেখে কেবলি মনে হয় দেশটা শান্তি ও শৃঙ্খলায় ভরা। মিসেস এলার্স এটা ওটা সহরের ভাল বাড়ী বা বড় হোটেলগুলো দেখাচ্ছিলেন আমিও "কি সুন্দর কি সুন্দর" বলে বিলিতি কায়দায় তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে যাচ্ছিলাম। নদীর দুধারে ছোট ছোট পাহাড়, তার ধারে সারি সারি পপলার গাছ, আঙ্গুরের ক্ষেত, তার সঙ্গে মিশে রয়েছে ছোট ছোট বাড়ী, পুরানো দুর্গ, রেলের লাইন, নদীর ওপরের সেতু, রাস্তায় মটর, নদীতে জাহাজ। সবগুলো মিলে দৃশ্যগুলিকে পরিপূর্ণ ভাবে সুন্দর করেছে,—তাতে বৈচিত্র্য আছে, সামঞ্জস্য আছে, মাধুর্য্য আছে, অথচ দৃষ্টিকটুতা নেই।

এই কথাগুলি ভাবছিলাম এমন সময় মিসেস এলার্স বল্লেন "আপনি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন কেন?" আমি উত্তরে শুধু বললাম "আপনাদের দেশের দৃশ্যগুলি খুব সুন্দর।" তখন তিনি ভারতবর্ষের বিষয়ে কিছু বলবার জন্যে আমায় অনুরোধ করলেন। মিষ্টার এলার্সও একবার মুখ ফিরিয়ে বল্লেন "হ্যাঁ তাই বলুন।" বললাম "দেখুন আমি নিজে একজন বৈজ্ঞানিক, আপনাদের অনুরোধ নিশ্চয়ই রক্ষা করব। তবে আমাদের দেশ অত্যন্ত বড়, একটা মহাদেশেরই মত, তার প্রত্যেক অংশের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, আবহাওয়া, আচার ব্যবহার, বেশভূষা ও ইতিহাস বিভিন্ন, সুতরাং আপনারা কোন্ বিষয়ে বিশেষ করে জানতে চান তাই বলুন সেটাই আলোচনা করা যাবে।" শুনে মিষ্টার এলার্স ঠাট্টা করে বললেন "হ্যাঁ ঠিক কথা, আপনি দেখছি সত্যিই বৈজ্ঞানিক, যা তা, আবোল তাবোল আলোচনা করেন না। তা বেশ আপনাদের হিন্দুধর্ম্ম ও বিবাহপ্রথা সম্বন্ধে কিছু বলুন।" তাঁরা আরো বললেন যে, আমাদের দেশের এই দুটী বিষয়ের নানাপ্রকার বিকৃত পরিচয় তাঁরা বই পড়ে জানতে পেরেছেন এবং সেগুলোর ভেতর কতটা সত্য আছে তা আমাকে বলতে বললেন। আমি যেন মুস্কিলে পড়ে গেলাম। এই বিষয় দুটি অনেকবার অনেক লোকের সঙ্গে পূর্ব্বে আলোচনা করেছি কিন্তু তবু যেন একটা অস্বস্তি বোধ করলাম। যাই হোক, আলোচনা চলতে লাগল, এবং তাদের অনেকগুলো ভুল ধারণা ভেঙ্গে গেল। শেষ কালের বিষয় হ'ল যে আমাদের বিবাহপ্রথায় পাত্র ও পাত্রীর সঙ্গে বিবাহের পূর্ব্বে আলাপ-পরিচয় মেলামেশা হয় না, অথচ বিবাহিত জীবন সুখের হয় কেমন ক'রে? সেই দিক দিয়ে হিন্দু বিবাহপ্রথা নাকি খুব খারাপ। এর উত্তরে আমি বললাম, "খুব ঠিক কথা, আপনারা আপনাদের মতে খুব সভ্য জাতি, কিন্তু বহুদিন কোর্টসিপ করে বিবাহ করার পরও শতকরা কুড়িটি বিবাহে ডাইভোর্স বা ছাড়াছাড়ি কেন হয়, তার উত্তর আমাকে দিন, তারপর আমাদের বিবাহ খারাপ কি ভাল তার আলোচনা হবে।" অনেকক্ষণ এলার্স দম্পতি চুপ করে অনেক কথাই ভাবলেন, কিন্তু উত্তর দিতে পারলেন না।

আমি আরো বললাম "তা হলেই ধরুন ভাল মন্দ সমাজপদ্ধতি সকল দেশেই আছে। আমাদের দেশ পরাজিত দেশ বলেই তার মন্দের দিকটাই আপনাদের কাছে বেশী দেখান হয়েছে। এর জন্যে আমরা দায়ী নই। আপনারা মনে কোন কুসংস্কার না নিয়ে মানব-সভ্যতা ও মানব-ধর্ম্মের ইতিহাস পড়ুন তা হইলেই বুঝতে পারবেন যে ভারতবর্ষের সভ্যতার যুগে আপনাদের দেশ ও আপনাদের দেশের লোকেরা ইতিহাসে কোন স্থানই পায়নি। শুধু একটা সাপ্তাহিক কাগজের সম্পাদক ভারতবর্ষের নিন্দা করলেই ভারতবর্ষ খারাপ হয়ে যাবে না এবং সেই সব পড়ে আপনাদের স্বাধীন চিন্তাকে কলুষিত করবেন না।" এলার্স দম্পতি একেবারেই হার মানলেন এবং স্বীকার করলেন যে তাঁদের অনেক ভুল ধারণা সেদিনকার আলোচনায় দূর হয়ে গেল। বলা বাহুল্য আনন্দিত হলাম।

প্রায় দুঘণ্টা মটরে ঘুরে, সহরের প্রান্তবর্ত্তী গ্রাম, পাহাড়, উপত্যকার সুন্দর দৃশ্য দেখে আমরা পুনরায় হোটেলে ফিরলাম। এলার্সদের এক কাপ করে কফি পান করার অনুরোধ করলাম। হোটেলের রেস্তরাঁয় সবাই মিলে আনন্দ করে কফি খাওয়া গেল। তারপর তাঁরা বিদায় নিলেন। আমি তাদের অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করে মটরে তুলে দিলাম।

কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম করে, বেলা একটায় মধ্যাহ্ন

ভোজনের জন্যে গেলাম। গিয়ে দেখি অনেক লোক খেতে বসে গেছে। বেশীর ভাগ লোকেই একটা দৈনিক বা সাপ্তাহিক কাগজ নিয়ে খেতে বসেছে। খেতে খেতে একবার করে কাগজে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে। টেবিলে খাবার জিনিষ ছাড়া সকলেই এক গেলাস করে বিয়ার পানীয় জলের পরিবর্ত্তে নিয়েছে। একটা টেবিলে দশ বার বৎসরের দুটি ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে এক জার্ম্মাণ দম্পতি খেতে বসেছিলেন। এদের সকলেরই এক গেলাস করে বিয়ার রয়েছে দেখলাম এ দুটো জিনিষই আমার কাছে কতকটা নতুন মনে হ'ল

হোটেলের ওয়েটার একস্থানে আমার বসবার ব্যবস্থা করে দিল। প্রথমে মটর ডালের এক প্লেট সুপ দিয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করল "আপনার জন্যে কি মদ আনব?" বললাম, "তোমাকে বিশেষ ধন্যবাদ, শুধু এক গেলাস ঠাণ্ডা জল দিলেই হবে।" সে কতকটা বিস্মিত হয়ে বলল "মদ খাবেন না? শরীরটা বুঝি ভাল নেই?" উত্তরে বললাম "না, শরীর আমার সর্ব্বদাই খারাপ থাকে, সুতরাং জলই দাও।" আমরা বাঙ্গালী পাকস্থলিতে মদ সহ্য হবে না সে কথা আর বললাম না। যাই হোক, ঠাণ্ডা জলই লোকটা দিয়ে গেল। তারপর সুপের প্লেট নিয়ে সেদ্ধ মাছ, শাক, আলু, গাজর একসঙ্গে মিশিয়ে একটা প্লেট নিয়ে এল এবং ছোট একটা কাপে মাখন গলিয়ে কতকটা ঘিয়ের মত জিনিষ দিয়ে গেল সেটা গরম মাছে ঢেলে সেদ্ধ-শাকশব্জী দিয়ে খেলাম। সঙ্গে সঙ্গে গরম ভাতে ঘিয়ের স্বাদটা মনে পড়ে গেল। ভাবলাম আর ত কিছু দিন পরে দেশে ফিরছি তখন এর অভাব হবে না। এইটুকু জিনিষ খেতে দু মার্ক (দেড় টাকা) লাগল, কিন্তু খেয়ে পেটও ভরল না, তৃপ্তিও হ'ল না। অর্থাৎ শেষ কালে একটা ঢেঁকুর পর্য্যন্ত উঠল না

খাওয়া সেরে সহর দেখতে বেরুলাম। হোটেলের ম্যানেজার বলল যে সহরের প্রাচীন দুর্গটা দেখবার জিনিষ, সেটাই যেন প্রথমে দেখি। আমিও তাই ঠিক করলাম। হোটেলের সামনে ট্রামে উঠলাম। বললাম যে "স্লস্" দেখতে যাব, তার টিকিট দিতে। জার্ম্মানরা দুর্গকে স্লস্ বলে। সহরের এক প্রান্তে ছোট একটা পাহাড়ের ওপর ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হাইডেলবার্গের প্রাচীন দুর্গ। ট্রামে করে প্রায় দেড় মাইল যাওয়ার পর পাহাড়ের ধার ঘেঁসে পায়ে হেঁটে ওঠবার ছোট রাস্তা। চারিদিকে মেপল্ ও আকরোট গাছ। তার পাশ দিয়ে রাস্তা উঠেছে। একটু উঠলেই দুর্গের ভাঙ্গা প্রাচীর, তারপর প্রকাণ্ড অট্টালিকার মত পুরোনো ধরণের দুর্গ। দুর্গের একপাশ থেকে হাইডেলবার্গ সহর, নেকার নদী, ওপারের পাহাড় ইত্যাদি সবই দেখা যায়। সেগুলি দুর্গের ওপর থেকে চমৎকার দেখায়।



হাইডেলবার্গ সহর ও নেকার নদী (দুর্গের উপর হইতে তোলা)

ফটো—লেখক

দুর্গের ভগ্নপ্রাচীরের ওপর বসে সম্মুখের এই সুন্দর দৃশ্য দেখছিলাম, এমন সময় হঠাৎ একটা কোরাস গানের শব্দ শুনতে পেলাম। শব্দটা ক্রমেই কাছে আসতে লাগল এবং একটু পরে নানাপ্রকার চীৎকার ও আনন্দধ্বনি করতে করতে একদল স্কুলের ছেলে সেখানে এসে হাজির হ'ল। ছেলেরা সবাই আট থেকে ষোল বৎসরের ভেতর হবে, এবং সকলেই খাঁকি রংয়ের গরম সার্ট ও হাফ প্যাণ্ট্ পরিহিত। সার্টের বাঁ হাতে একটা চওড়া শাদা ব্যাণ্ড তার ওপর লাল রংয়ের সুতোয় জার্ম্মান স্বস্তিকা চিহ্ন এমব্রয়ডারি করা। মনে হ'ল এরা বোধ হয় স্কাউট বা নাৎসি কোন প্রতিষ্ঠানের বালক। অল্পক্ষণ পরেই তাদের মধ্যে দুতিনজন আমার সঙ্গে আলাপ সুরু করে দিল। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের লোক শুনে তাদের কৌতূহল বেড়ে

গেল। তাদের সঙ্গে দুজন মাষ্টার ছিলেন; তাঁরাও সে খবর পেয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। একটু পরে দেখি একজন মাষ্টার নিজের লাঠি দিয়ে মাটির ওপর একটা ভারতবর্ষের ম্যাপ এঁকে সেখানে কলকাতার স্থান নির্দ্দেশ করে ছেলেদের দেখালেন এবং মনে হ'ল তাই দিয়ে আমার জন্মভূমির একটু বিশেষ পরিচয় তাদের করিয়ে দিলেন। আমি মাষ্টারটীকে ধন্যবাদ দিলাম।

সেখান থেকে দুর্গের আর একদিকে গেলাম। এই দিকটাই বোধ হয় এক কালে দুর্গের প্রধান অংশ ছিল। সেখানে একটা ছোট দোকানে দুর্গের নানাপ্রকার ছবির কার্ড বিক্রি হচ্ছে। দোকানটী একটি তরুণীর। দোকানে দু একটা কার্ড দেখছিলাম, তরুণী ইংরিজিতে বললেন, "আপনার সুন্দর চেহারার একটা ফটো আমাদের কাছ থেকে তুলিয়ে নিন না কেন?" একটু পরেই আর একটি তরুণী এসে সেই কথায় সায় দিলেন এবং জানালেন তাঁরাই ছবি তুলবেন এবং আধ ঘণ্টা পরে ছবি পাওয়া যাবে, তিন কপির দাম দু মার্ক ইত্যাদি। সুন্দরী তরুণীদের কাছে আমার চেহারার সুখ্যাতি পূর্ব্বে শুনিনি, তার ওপর তাঁরা নিজেরা ফটোগ্রাফার। দু মার্কে সুন্দর চেহারার ছবি তুলে দেবে শুনে কতকটা আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম। ভাবলাম, উপস্থিত ক্ষেত্রে আমার নিজের সৌন্দর্য্যের দাম মাত্র দু মার্ক; তারই লোভে তরুণীরা আমাকে সুন্দর দেখেছেন। পরমুহূর্ত্তে ভাবলাম, না তা হবে না, এই দু মার্ক এখানে খরচ করে কি হবে? বললাম, "না আমার চেহারা আর কি তুলবেন বরং আপনাদের অনেক সুন্দর চেহারা আমারই তোলা উচিত।" এই ভাবে ভণিতা করতে করতে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম, এবং সামান্য দু মার্কের সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রেখে হোটেলে ফিরলাম।

পরদিন সকালে ষ্টেশনের কাছে একটা ব্যাঙ্কে টাকা ভাঙাতে গেলাম। সেখানে একটি কর্ম্মচারী ভাল ইংরিজি বলতে পারেন। তিনিই টাকা দিচ্ছিলেন। বললেন, "সব টাকাই তুলে নিন কিছু জিনিষ কিনে নেবেন।" আমারও মনে মনে ইচ্ছে ছিল যে সুবিধা মত একটা ক্যামেরা কিনব। সে কথা তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন যে এ বিষয়ে তিনি সাহায্য করতে পারেন। বলেই পাঁচ মিনিটের ছুটি নিয়ে আমার সঙ্গে বেরুলেন। কাছেই একটা ক্যামেরার দোকান ছিল, সেখানে আমরা দুজনে গেলাম দোকানটি একটি বৃদ্ধা মহিলার—নাম এনা গ্রস্।

কিছুক্ষণ আলাপ করার পর বুঝলাম মহিলাটি পাকা ব্যবসায়ী। চলন সই ইংরিজি জানেন, তাছাড়া মিষ্টি কথা ও অমায়িক স্বভাব। আমাকে ভাল ভাল ক্যামেরা দেখাচ্ছিলেন ও বলছিলেন "Oh! it is very beautiful, you must have this." আমিও বলতে লাগলাম যে না দাম বড় বেশী, কিনব না। তিনিও হারবার পাত্রী নন, ব্যাঙ্কের লোকটিকে দেখিয়ে বললেন, "He give you money." অর্থাৎ এই লোকটি ত টাকা দেবেন। শেষ কালে অনেক দাম কমিয়ে দেবেন বলায় আমি একটা ক্যামেরা কিনতে রাজি হলাম। দুশো তিরিশ মার্ক দিয়ে একটা ক্যামেরা কিনব ঠিক করে পুনরায় ব্যাঙ্কে ফিরলাম। সেখানে টাকা ভাঙিয়ে দোকানে গিয়া বৃদ্ধাকে টাকা দিয়ে ক্যামেরা নিয়ে হোটেলে এলাম। পরে দেখলাম লাভই হয়েছে কারণ সে ক্যামেরার দাম ভারতবর্ষে চারশ টাকা।

দুপুরে হোটেলের কামরায় বসে কয়েকটা চিঠি পত্র লিখলাম। চিঠিগুলো ডাকে দেবার জন্যে ডাকঘরে গেলাম। বেশ বড় ডাকঘর, বহু লোকজনে ভর্ত্তি। সেখানকার দরোয়ান হঠাৎ বিদেশীয় লোক দেখে আমাকে কোন প্রকারে সাহায্য করতে পারে কি না জিজ্ঞাসা করল। আমিও তাতে খুশী হলাম। তাকে বললাম যে আমার কয়েকটা চিঠি ডাকে দিতে হবে তার জন্য ডাকটিকিট দরকার। একটি বিমান ডাকে ভারতবর্ষে পাঠাতে হবে অন্য দুই তিনটি সাধারণ ডাকে ভারতবর্ষে যাবে, দুটি ইংলণ্ড যাবে। লোকটা আমাকে খুব খাতির করে সকল ব্যবস্থা করে দিল। ভাবলাম যে হয়ত কিছু বকসিসের আশায় একটু বেশী খাতির দেখিয়েছে। বকসিস দিতে যাবার আগেই সে বলল যে তার কয়েকটা ভারতীয় ডাকটিকিট চাই, আমি যদি দিতে পারি তাহলে খুব ভাল হয়। তার ডাকটিকিট সংগ্রহ করবার কৌশল দেখে অবাক হয়ে গেলাম। চালাক লোক বটে। বললাম, "হয়ত আমার ভারতীয় চিঠি পত্রের সঙ্গে দু চারটা টিকিট আছে, তা তুমি আমার হোটেলে এক সময়ে আসলে বোধ হয় কয়েকটা

দিতে পারব।" বিকেল পাঁচটার পর সে লোকটি হোটেলে এসে আমার কাছ থেকে কয়েকটা ডাকটিকিট নিয়ে গেল।

সন্ধ্যায় এলার্স দম্পতি আমার খোঁজে এলেন। পুনরায় তাদের সঙ্গে দেখা হওয়ায় আনন্দিত হলাম। তাঁদের ডিনার খাওয়ার নিমন্ত্রণ করলাম এবং সবাই মিলে নানা গল্পগুজব করতে করতে খাওয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে তাঁরা বিদায় নিলেন। তাঁদের জানালাম যে আমি পরদিন সকালে সুইজারল্যাণ্ড রওনা হব।

হাইডেলবার্গ থেকে জুরিক গিয়ে কয়েকদিন থাকব স্থির করলাম। টাইম্ টেবল্ দেখে গাড়ীর সময় দেখে রাখলাম। পরদিন সকালে হোটেলের বিল মিটিয়ে ষ্টেশনের দিকে রওনা হব এমন সময় মিষ্টার এলার্স এসে হাজির। তাঁর মটরে নিয়ে বেড়াতে যাবেন এই অনুরোধ। বললাম যে আমার যাওয়ার ঠিক। তিনি বললেন বিকেলে যেতে। সেই ব্যবস্থাই করলাম। গাড়ীতে তুলে তিনি আমার নানাপ্রকার প্রশংসা আরম্ভ করলেন—আমি নাকি খুব চিন্তাশীল ও স্পষ্টবাদী ইত্যাদি। আমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁরা খুব আনন্দিত হয়েছেন। আমিও তাঁদের ভাল ব্যবহার ও প্রীতি কখনও ভুলতে পারব না জানালাম। বিকেলে এলার্স আমাকে গাড়ীতে তুলে দেবেন জানালেন এবং অল্পক্ষণ পরেই আমাকে হোটেলে নামিয়ে নিজের কাজে গেলেন। সন্ধ্যার ট্রেনে এলার্সের মটরে ষ্টেশনে এলাম। ষ্টেশন হোটেলের কাছেই, তবু মটরে আসতে হোল—নিতান্ত অনুরোধে। গাড়ী ছাড়া পর্য্যন্ত এলার্স ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁকে বিদায় জানাতে গিয়ে মনটা দুঃখে ভরে উঠেছিল। সামান্য আলাপ অথচ গভীর প্রীতিবন্ধন—এদের সঙ্গে আর হয়ত কখনও দেখা হবে না। সেইজন্যেই দুঃখ। ট্রেন ছাড়ল—দুজনে হাত নেড়ে জানাতে লাগলাম যে কখনই পরস্পরকে আমরা ভুলব না।

কয়েক ঘণ্টা পরে ট্রেন জার্ম্মানী ও সুইজারল্যাণ্ডের সীমানায় বাসেল ষ্টেশনে পৌছুল। সেখানে কাষ্টমসের লোকেরা ট্রেনের সকল যাত্রী নামিয়ে জিনিষপত্র ও টাকা কড়ি দেখে দেয়। জার্ম্মানীতে প্রবেশ করবার সময় যে কাগজে প্রত্যেকের টাকা পয়সার হিসেব লেখা ছিল, সেই কাগজ এখানে সবাইকে ফেরৎ দিতে হয়। এই ষ্টেশনের ব্যবস্থা বেশ। ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমের অর্দ্ধেক জার্ম্মানীর, বাকীটা সুইস্‌দের। জার্ম্মানীর অংশে গাড়ী থেকে সবাইকে নামিয়ে কাষ্টমসের লোকেরা চেক্ করে, সেই সময় ট্রেনটা এগিয়ে গিয়ে সুইস্ অংশে দাঁড়ায়। সুইস্ অংশে ঢোকবার ছোট একটা প্রবেশ দ্বার। সেখানে তাদের কাষ্টমসের লোকেরা পরীক্ষা করে। সেখান থেকে সবাই ট্রেনে ওঠে।



জুরিক সহর ফটো—লেখক

বাসেল থেকে ট্রেনটা জুরিক হয়ে বুডাপেষ্ট পর্য্যন্ত যাবে শুনলাম। এবার ট্রেনের যে কামরায় উঠলাম সেটায় আমি ছাড়া আর দুজন লোক ছিলেন। আলো নিভিয়ে ওঁরা ঘুমের চেষ্টা করছিলেন এমন সময় আমি ঢুকে শান্তি ভঙ্গ করলাম। ফলে আমারও কিছু অশান্তি হ'ল।

কয়েক ঘণ্টা পরে জুরিকে গাড়ী থামল। আমি প্রথমে নেমে যেন বাঁচলাম। হঠাৎ পাশেই দেখি একটি শাড়ী-পরিহিতা মহিলাও নামলেন। সঙ্গে একটি ভারতীয় ভদ্রলোক। প্রথমে মনে হ'ল যেন বাঙ্গালী। আমিই এগিয়ে ইংরিজিতে আলাপ করলাম। তাঁরা বললেন, "আমাদের নাম মিষ্টার ও মিসেস ভেসাই।" তাঁদের দুহাত

তুলে নমস্কার করে বললাম, "আমি ডক্টর চ্যাটার্জ্জি।" একটু পরেই শুনলাম মিষ্টার ডেসাই আই. সি. এস., বম্বেতে বড় চাকরী করেন। সম্প্রতি ইউরোপে বেড়াতে এসেছেন।



[শ্রীশচীন্দ্রনাথ সরকারের সৌজন্যে]

শেষ শিখা

শ্রীমতী নলিনী সেন

ক্ষীণ হয়ে আসে আয়ু। এসো আজ শেষ সুধাধারে
পূর্ণ করো মোরে,
নির্ব্বাপিত দীপশিখা উজলিয়া উঠুক আবার
ক্ষণিকের তরে।
বাঁধো তব বীণাখানি, ঝঙ্কারিয়া উঠুক আবার
মরমের গান,
সঙ্গীত মাধুরী মন্ত্রে সঞ্জীবিয়া উঠুক আমার
তাপদগ্ধ প্রাণ।
আমার স্বপন-সাথে আনো তব শেষ স্বপ্নখানি
মিলন-নিশির—
প্রণয় মালিকাখানি কণ্ঠে তুমি পর আরবার—
মধু যামিনীর।
ভালবাসি বলো ধীরে, কানে কানে ডাকো প্রিয় নাম
মধু গুঞ্জরণে
বক্ষের অমিয়ারাশি নিঙাড়ি' ঢালিয়া দাও প্রিয়
আতপ্ত চুম্বনে।
এখনো যায়নি বেলা; বিদায়ের শেষ রক্তরাগে
রক্তিম আকাশ,
মাধবীর কুঞ্জ হতে উৎসবের শেষ বাঁশিতানে
বিহ্বল বাতাস।
বসন্তের বনতলে চৈতালীর সুরভি নিশ্বাস
আজো তন্দ্রাতুর,
ফাল্গুন-পূর্ণিমা-শেষে নভঃপ্রান্তে বিরহী চন্দ্রমা
করুণ মধুর।
ধরণীর ধূলি 'পরে রচ স্বর্গ ক্ষণিকের তরে
হে মোর মোহন,
নিঃশেষ করিয়া লও অভিসারী নত হৃদয়ের—
আত্ম-সমর্পণ।
আঁধারে ঢাকুক সব; নিবিড় করিয়া লও মোরে
বাহুর বন্ধনে;
পূর্ণ করি দাও আজ মৃত্যুঞ্জয়ী মরণ-বাসর
অনন্ত মিলনে।

খিদিরপুর সারস্বত সম্মেলন

প্রমথ চৌধুরী

খিদিরপুরের এই সারস্বত সম্মেলনে আমি আমার জীর্ণদেহ নিয়ে উপস্থিত হয়েছি—সর্ব্বোপরি কবি হেমচন্দ্রের প্রতি খিদিরপুরবাসীদের সঙ্গে একযোগে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে।

যাঁরা বাঙ্গলা সাহিত্যকে গড়ে তোলবার কাজে হাত লাগিয়েছেন—তাঁদের স্মৃতিরক্ষা করা যে আমাদের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই।

কিছুদিন থেকে বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজের মনে এ ধারণা জন্মেছে যে, আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যিকদের স্মৃতিরক্ষা করে আমরাই ধন্য হই।

আমরা, সাধারণ লোকরাও পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করি;—কিছুকাল এই পৃথিবী আমাদের কর্ম্মভোগের ক্ষেত্র হয়, তারপরে আমরা নৈসর্গিক নিয়মে চলে যাই। এরি নাম আমাদের জীবন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে জাতীয় জীবনের প্রধান প্রভেদ এই যে, জাতীয় জীবন সুধু বর্ত্তমান নয়, অতীতের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের আশা দিয়ে গড়া। যে সকল ব্যক্তি চলে গেলেও তাঁদের স্মৃতি রেখে যেতে পারেন, তাঁদের স্মৃতিই এই জাতীয় জীবনের স্মৃতি। সুতরাং যাঁরা জাতীয় জীবনকে কোন-না-কোন বিষয়ে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের স্মৃতিরক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য। কেননা এই জাতীয় স্মৃতির সাহায্যে আমাদের জাতীয় জীবন পুষ্টিলাভ করে। কেউ কেউ বলেন যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের স্মৃতিরক্ষা করা সম্প্রতি একটি fashion হয়ে উঠেছে। তথাস্তু। কিন্তু fashion মাত্রেই হাস্যজনক নয়। সাহিত্যিকদের স্মৃতিরক্ষার উৎসব অন্যান্য অনেক fashion-এর মত নিরর্থক নয়।

ধরুন, আমরা সকলে আজ ঘোর স্বাধীনতাকামী হয়ে উঠেছি। এমন কি অরসিক কংগ্রেসও আজ চাচ্ছেন independence। কিন্তু স্বাধীনতা যে আমাদের পক্ষে কাম্য, একথা হেমচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম আমাদের শিঙ্গার রবে শুনিয়েছেন। সে কথা বাঙালী জাতির কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করেছিল। "ভারত-সঙ্গীত" যখন আমি প্রথম শুনি তখন আমি বালক, কিন্তু সেই বাল্যকালেই এ সঙ্গীত আমার মনে এমনি বসে গিয়েছিল যে, আজ পর্য্যন্ত আমাদের পরাধীনতার কথা আমার অন্তরে কাঁটার মত বিঁধে আছে।

আর এক কথা। আমাদের এ যুগের বঙ্গসাহিত্যের অন্তরে স্বাধীনতার সুর নানাপ্রকারে বেজেছে ও বাজছে, কখনো স্বরূপে, কখনো বর্ণচোরা-রূপে।

লোকে যাঁদের কর্ম্মীলোক বলে, তাঁরা হয়ত এর উত্তরে বলবেন যে, কবির কথা উড়ো কথা—সে কথায় কোন কাজ এগোয় না। কিন্তু সত্য কথা এই যে, কবির কথাই মানুষের মনের জমি তৈরি করে, আর সেই সরস জমি থেকেই নূতন কর্ম্ম উদ্ভূত হয়—যে কর্ম্মের শ্রী ও শক্তি অপূর্ব্ব। হেমচন্দ্রের পূর্ব্বেই খিদিরপুরের কবি রঙ্গলালও স্বাধীনতার বাণী প্রচার করেছিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথম বলেন—"স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে!" আমার মনে আছে যে, সাত বৎসর বয়েসে এ কথা

আমি গুরুজনদের আদেশে তাঁদের বন্ধুবান্ধব সমাজে আবৃত্তি করতুম। তবে আমি যে সত্তর বৎসর বয়েসেও স্বাধীনতাহীনতায় বেঁচে আছি, তার কারণ যাঁদের ইষ্টমন্ত্র হচ্ছে Pro Patriamori—আমি তাঁদের দলভুক্ত নই।

ভাল কথা, রঙ্গলালের কোন্ পুস্তকে যে এ ছত্র আছে, তা আমার মনে নেই। বোধহয় তাঁর রচিত পদ্মিনীর উপাখ্যানে। এ অনুমান করছি এই কারণে যে, বাল্যকালে "পদ্মিনীর উপাখ্যান" আমাদের অতি প্রিয় কাব্য ছিল। তার প্রমাণ ও কাব্যের ক'টি ছত্র আজও আমার মনে আছে। সে ছত্র ক'টি এই :—

"নবীন ভাবুক এক ভ্রমণ কারণ
ভারতের নানা দেশ করি পর্য্যটন,
অবশেষে উপনীত রাজপুতনায়,
বসুধা বেষ্টিত যার কীর্ত্তিমেখলায়॥"

শুনতে পাই যে আজকের ছেলেরা রঙ্গলালের বই পড়ে না। কেন পড়ে না জানিনে। আমার বিশ্বাস "পদ্মিনীর উপাখ্যান" আজও বালক বালিকাদের যথেষ্ট আনন্দদান করবে। কেননা তার ভাষা সহজ ও মনোভাব সরল, ছন্দ মামুলি ও বিষয়বস্তু মনোরম। রঙ্গলালের স্মৃতিরক্ষা করবার প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে "পদ্মিনীর উপাখ্যান" স্কুলপাঠ্য করা। পদ্যে এ উপাখ্যান পড়তে কোন বিরাট ব্যাকরণ বা অভিধানের সাহায্য প্রয়োজন হবে না।

খিদিরপুরবাসী মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবার আবশ্যক নেই, কারণ তিনি সর্ব্বলোকপরিচিত। আর তাঁর বিষয় কিছু বলাও কঠিন। কারণ তিনি হচ্ছেন বঙ্গসাহিত্যে একজন unique কবি।

কালিদাস, বাণভট্ট প্রভৃতি সেকালের কবিরা পূর্ব্ব কবিদের নমস্কার জানিয়ে তারপর নিজেদের কাব্য রচনা করেছেন। মাইকেল কোন পূর্ব্ব কবিদের, এমন কি ব্যাস-বাল্মীকিরও নাম উল্লেখ করেন নি। এর কারণ, তিনি ভারতবর্ষের কোন পূর্ব্ব কবির পদানুসরণ করেন নি। যদি কোনও কবির কাব্য তিনি আদর্শরূপে গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে সে আদর্শ হচ্ছে ইংরাজ কবি Milton-এর কাব্য। এরজন্য তাঁকে বাঙ্গলা ভাষা নতুন করে গড়তে হয়েছে। ফলে "মেঘনাদ-বধ" সম্পূর্ণ নূতন ছাঁচে ঢালা। আর বাঙ্গলার কোনও পরবর্ত্তী কবিও তাঁর অনুরূপ কাব্য লেখেন নি—কি ভাষায়, কি ভাবে। তাঁর কাব্য বঙ্গসাহিত্যের evolution-এর একটি ধাপ নয়, কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি। তিনি কাব্যরচনায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁকে কোনও বিশেষ পর্য্যায়ভুক্ত করা যায় না। খিদিরপুর এ তিন কবির বাসস্থান বলে সত্যই গৌরব করতে পারে।

আমার শেষ কথা এই যে, বঙ্গসাহিত্যকে ভবিষ্যতেও স্বাধীনতার মন্ত্র জপ করতে হবে। কারণ জীবনে আমরা পরাধীন থাকব আর মনোরাজ্যে মুক্ত হব, এ হচ্ছে অদ্ভুত সুখস্বপ্ন।

এ রকম স্বপ্ন খোলাচোখে দেখা যায় না।

জন্মান্তর

শ্রীগৌরগোপাল মুখোপাধ্যায়

তখনো আসোনি তুমি।
হিমগিরি-নির্বাসনে যাপিলাম মন্থর প্রহর
দেবদারু ঋজু-প্রতীক্ষায়।
কতো দিন কেটে গেলো—
কতো রাত্রি ক্ষয়িষ্ণু আয়ুর।
বক্ষোমাঝে মরণের নীড়—
পরভৃৎ দুর্মর দুরাশা পাড়ি দিলো
অন্ধকার স্তব্ধতায় নক্ষত্র-ঝঙ্কৃত।
দিগঙ্গন মহাকাল-ডম্বরু-স্তনিত
শুনিয়াছি মরণের নেপথ্য নির্ঘোষ—
তারি মাঝে হেরিলাম অলখ ইঙ্গিত
অনাগত অমরার অসংশয় ভবিষ্য উদ্ভাস।
প্রতিহত অন্তের প্রগতি—
ভাসিলাম প্রাণের বন্যায়।

প্রবাসী ফিরিলো ঘরে।
দেখা হলো।
শষ্পশ্যাম-সমতট-উদ্বেল-বেলায়
সমাপিত যুগান্তের পথ-চেয়ে-থাকা।
ঘনাইলো বিদায়-প্রদোষ।
লবণিল অশ্রুর অর্ণব ঝলকায় সূর্যাস্ত-অঙ্গার।

হারালেম।
এ কী রূপে লভিনু হারায়ে॥



অসুস্থ

শ্রীসনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

সামান্য জ্বরে কয়েকটা উপবাস করিয়া সুরেশ অদ্ভুত রকম দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। পথ্য করাও কয়দিন হইয়া গেল; তবুও দুর্ব্বলতা যেন না কমিয়া বাড়িয়াই চলিয়াছে। সেদিন বিকাল-বেলায় সে ইজি-চেয়ারটার উপর শুইয়া ছিল; কিন্তু শয়ন অন্য দিনকার মত সুখকর হইল না; বরং অভ্যস্ত শয়ন যেন কেমন অস্বস্তিকর মনে হইতে লাগিল। সমস্ত মনে কেমন একটা অস্বাচ্ছন্দ্য; দেহে কেমন যেন এক অস্বস্তি। এমন হইবার কারণ সে অনেক চিন্তা করিল, অনেক খুঁজিল; কিন্তু কিছুই পাইল না। এ যেন কেমন এক অনুভূতি—কেমন একটা শূন্যতা, কেমনতর একটা একটানা দীর্ঘ বিরক্তিকর বিশেষত্বহীনতা। মোট কথা তাহার একেবারেই ভাল লাগিতেছিল না। মাঝে মাঝে মনে হইতেছিল যেন চেয়ারখানা ছাড়িয়া উঠিলেই ভাল হয়, কোন একটা কিছু করিলে ভাল হয়, অথচ উঠিবার কোন তাগিদ বা ইচ্ছা একেবারে নাই। সে ইজি-চেয়ারটার উপর যেমন শুইয়া ছিল, তেমনই শুইয়া রহিল, আর মাঝে মাঝে উদাসভাবে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল।

সে একবার দূরে, পুকুরটার পূর্ব্ব পাড়ের বড় বড় অশ্বত্থগাছগুলার দিকে চাহিল। মৃদু বাতাসে গাছের ঘন সন্নিবিষ্ট পাতাগুলা কাঁপিতেছে; আন্দোলিত পাতাগুলির মসৃণ দিকে মাঝে মাঝে অপরাহ্ণের ম্লান রক্তাভ সূর্য্যরশ্মি পড়িয়া পাতাগুলা চক্ চক্ করিয়া উঠিতেছে। বেশ লাগিল তাহার; তাহার মনোযোগ ঐদিকেই আকৃষ্ট হইল। এতক্ষণ নানা রকমের শব্দ মনে ঘা দিয়া ফিরিতেছিল; এখন সব শব্দ কোথায় মিলাইয়া গেল, শুধু ঐ পাতাগুলার আন্দোলনের মৃদু খস্ খস্ শব্দ এতদূর হইতেও তাহার কানে আসিয়া বাজিতে লাগিল। সে সেই দিকে একদৃষ্টেই চাহিয়াছিল। চোখ ফিরাইতেই নজর পড়িল পাশেই রাখা খবরের কাগজখানার দিকে। কাগজখানা সকালেই আসিয়াছে, হাতে কোন কাজ নাই, সারাদিন ধরিয়া কাগজখানা সে পড়িয়াছে। কাগজখানায় পড়িবার আর কিছু অবশিষ্ট নাই। তবুও সে শিথিল ভাবে কাগজখানা তুলিয়া লইল। তাহার নজর পড়িল বিজ্ঞাপনগুলার উপর।

অধিকাংশই নানাবিধ রোগের ঔষধের বিজ্ঞাপন। সেগুলো মোটা মোটা বড় বড় হরপে ছাপা। 'বিনামূল্যে অমূল্য কবচ' ইত্যাদি কত বিজ্ঞাপন একের পর এক উপর হইতে নীচে ছাপা হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে তাহার অস্বচ্ছন্দ দেহ মন অসুস্থ হইয়া উঠিল। সমস্ত শরীরে একটা অদ্ভুত অনুভূতি-ময় শিহরণ বিদ্যুৎবেগে সঞ্চারিত হইয়া গেল—যেন সেই মুহূর্ত্তে ঐ সমস্ত রোগগুলা একযোগে তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে। সে ক্লান্তভাবে আপনার মাথাটা ইজি-চেয়ারের মাথায় ছাড়িয়া দিল। এই অবাঞ্ছনীয় অনুভূতি হইতে নিস্তার কামনায় সে আবার বিজ্ঞাপনগুলিতেই মন দিল। বিজ্ঞাপন-স্তম্ভের শেষখানটায় অমনিতর একটা বিজ্ঞাপন—'বিনামূল্যে ধবল ও অসাড় কুষ্ঠের মহৌষধ—আবেদন করুন; উহা আপনার শরীরের কোনও স্থানে আপনার অজ্ঞাতে রহিতে পারে, যে স্থানটি হয়ত একেবারে অসাড়।' অসহ্য ক্লান্তিতে সে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। তাহার ক্লান্তিশিথিল হাত

হইতে কাগজখানা পড়িয়া গেল। সে নীচু হইয়া কাগজখানা তুলিতেছে, এমন সময় তাহার নজর পড়িল আপনার বাঁ পায়ের হাটুর নীচে ; সেখানে সামান্য খানিকটা অংশ যেন সাদা, রোমাবৃত বলিয়া সহজে নজরে পড়ে না।

এ সাদা দাগ তাহার শরীরে কেন ? এ কিসের দাগ ? তবে—এ দাগ কি তবে—কুষ্ঠের ? তাহার কি তবে কুষ্ঠ হইয়াছে ? তাহার মাথাটা ঘুরিয়া গেল। সে একবার চোখ বন্ধ করিল, তাহার যেন মনে হইল, মাথার ভিতরের সমস্ত পদার্থগুলা তীব্রবেগে চক্রাকারে ঘুরিয়া, ঘুলাইয়া গিয়া সব যেন এক হইয়া গেল। সে চোখ খুলিল, কিন্তু সম্মুখের কিছুই দেখিতে পাইল না। সব যেন অদ্ভুত রকম অন্ধকার। সে চোখ মুদিয়া শুইয়া পড়িল। মাথার ভিতরটা যেন অসম্ভব রকম ফাঁকা। সে একটু পরে আবার চোখ খুলিল। সে ক্লান্ত মনে ভাবিতে চেষ্টা করিল, তাহার কেন এমন হইল, কী করিয়া তাহার দেহে এ রোগ সংক্রামিত হইল ? ইহা যদি সত্য হয়, যদি হয় কেন, সত্য ত বটেই, তাহা হইলে তাহার গোপন আকাশচুম্বী দম্ভ, বিরাট কল্পনা সমস্তই আজ মিথ্যা হইয়া গেল। সমাজের, দেশের, দশের শীর্ষস্থানীয় হওয়া দূরে থাকুক সমাজে তাহার ত স্থানই নাই। এই কদর্য্য রোগগ্রস্তের আবার আশা, সমাজ ! অনন্ত হতাশায় তার মন ভরিয়া গেল। তাহার একবার চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু কান্নাও নাই, এমন কি তাহার বেগও সে অনুভব করিল না। সমস্ত দেহ মন ব্যাপিয়া একটা একটানা ঝিম্-ঝিমানি তাহার কানে আসিতে লাগিল ও সব মানসিক অবসরের ব্যসন দূরে থাক্—আজ ত সে সুস্থও নহে। এই রোগগ্রস্ত দেহ লইয়াই বা সে বাঁচিবে কয়দিন !

ক্রমে হতাশ ভাবনার প্রথম বেগটা কমিলে, তাহার মনে হইল—এ ত কুষ্ঠ নাও হইতে পারে ? এ দাগ কুষ্ঠ না হইয়া অতি সাধারণ দাদ, বা জরুল বা ঐ জাতীয় কিছুও ত হইতে পারে ! সে আপনাকে সান্ত্বনা দিয়া স্বাভাবিক হইতে চেষ্টা করিল। সে হাসিতে গেল, হাসিতে পারিল না। কেবল একবার সামান্য জোর-করিয়া-আনা শুষ্ক হাসিতে ঠোঁট দুইটা ঈষৎ প্রসারিত হইয়া আবার সঙ্কুচিত হইয়া গেল। আপনার এই অর্থহীন সান্ত্বনার লঘুতা বুঝিতেই সে লঘুতা লুপ্ত হইল। একটা গোপন শঙ্কা ও ভীতি মনে অতি তীব্র বেগে সঞ্চারিত হইতেছিল। তাহাকে এড়ানো সহজ নহে। সে শূন্য দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া হাঁটুর নীচে সাদা জায়গাটার দিকে একবার চাহিয়া দেখিল ; তারপর অতি সন্তর্পণে সেই জায়গাটায় ধীরে ধীরে সে হাত বুলাইয়া সাদা দাগটাকে পরীক্ষা করিতে লাগিল। সত্যই ত জায়গাটা অবশ ; হাত বুলাইলেও সে অনুভব করিতে পারিল না। তারপর সেখানে একটা চিমটি কাটিল ; নাঃ, তাহাও সে অনুভব করিতে পারিল না। আবার সজোরে সে চিমটি কাটিল ; এবার সামান্য বেদনা সে অনুভব করিল। কিন্তু তাহার মনে হইল, সে বেদনাটা ভিতরকার স্নায়ু ও শিরার, উপরের চামড়ার নহে। তাহা হইলে তাহার কুষ্ঠই হইয়াছে। সে সেখানটায় কাপড়টা টানিয়া দিল। কিন্তু চিন্তার হাত হইতে তাহার পরিত্রাণ নাই ; আবার পূর্ব্বের চিন্তাতেই আচ্ছন্ন হইয়া গেল। কেন তাহার এমন রোগ হইল ? কি করিয়াই বা হইল ? সে ত কোন দিন জীবনের সহজ মিতাচারিতা হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই ! জীবনে অনাচার ও অমিতাচারকে সে ত চিরদিনই পরিহার ও ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে। তবে কেন তাহার এমন হইল ! এ রোগ যে এক কথায় তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া দিল। বার বার তাহার ঐ দাগটা পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা হইতে লাগিল ; সমস্ত

মানসিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া নিজের দৃষ্টি ওদিক হইতে ফিরাইয়া রাখিল। কিন্তু উপায় নাই, এই অনুভূতি হইতে উদ্ধারের তাহার উপায় নাই। একা থাকিলেই কর্ম্মান্তরে ব্যাপৃত না থাকিলে ঐ চিন্তাটাই তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতেছে, রাখিবেও। কাহারও সহিত কথাবার্ত্তায় আপনার ভার লঘু করিবার ইচ্ছায় সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে গেল, পারিল না। পরমুহূর্ত্তে আপনার সমস্ত মানসিক শক্তি একত্রিত করিয়া ঝাঁকি দিয়া সে যেন আপনার সমস্ত ভাবনা উড়াইয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পরে চটিজোড়ায় নিজের পা দুইটা প্রবেশ করাইয়া সে আপনাকে টানিয়া লইয়াই ভিতরে গেল।

ক্লান্ত জড়িত পদক্ষেপে ভিতরে প্রবেশ করিতেই মা তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে; মা প্রদীপ লইয়া চলিয়াছেন। সেই প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায়ও প্রদীপের স্বল্পালোকে মা তাহার মুখের দিকে কয় মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "কি হ'ল রে তোর সুরেশ? মুখ তোর অমন শুক্‌নো কেন?"

মায়ের প্রশ্নে তাহার সমস্ত ক্লান্তি এক নিমিষে তিক্ত বিরক্তিতে রূপান্তরিত হইল, সে জ্রূকুঞ্চিত করিয়া তীব্রস্বরে উত্তর দিল, "হবে আবার কি? সব সময়েই একটা অদ্ভুত ভয়ঙ্কর কিছু ঘটছে এমন ভাব কেন?"

ইহারই কয় মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে সে সঙ্গ ও আলাপের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহাই কামনা করিয়া সে ভিতরে আসিয়াছিল; কিন্তু কথা কহিতে গিয়া তাহার বিরক্তি ও অস্বস্তি যেন দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। সে গলার স্বর আরও উচ্চে তুলিয়া, ভ্রূ দুইটা আরও কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "হবেই বা কি? আর হ'লেই কি সব কথা তোমাকে জানাতে হবে নাকি? কিছুই হয় নি আমার।"

সত্যই ত মাকে কিছু হয় নাই ছাড়া সে আর কি বলিতে পারিত! তাহার কুষ্ঠ হইয়াছে, ইহা সে মাকে জানাইবে কেমন করিয়া! আপনার দেহে রোগাবিষ্কারে তাহার যে বেদনা হইয়াছে, মা জানিতে পারিলে তাঁহার কষ্ট হইবে তাহার কষ্টের বহু গুণ অধিক। এ সংবাদ কি মাকে দিতে পারা যায়!

স্বল্পভাষী, মৃদুস্বভাব পুত্রের বিপরীত আচরণে মা স্তম্ভিত হইয়া নির্নিমেষ নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে কহিলেন, "তোর মুখ দেখেই ত বুঝতে পারছি যে, একটা কিছু তোর হয়েছে। তোর চলায়, তোর বলায় বুঝতে পারছি। কি হ'ল রে তোর?"

কথার শেষের দিকে মায়ের স্বর ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

সুরেশ ক্লান্ত সুরে বলিল, "কিছুই হয় নি আমার মা, আমাকে বিরক্ত ক'রো না এখন, তোমার পায়ে পড়ি।"

মাকে আর কথা কহিবার অবকাশ না দিয়াই ক্লান্ত জড়িতপদে শুইবার ঘরে গিয়া আপনার শ্রান্ত দেহটাকে বিছানায় এলাইয়া দিয়া, চোখ মুদিয়া পড়িয়া রহিল।

বিছানায় চোখ বুজিয়া সে শুইল বটে, কিন্তু ঘুম ত আসে না। চোখ বন্ধ করিলেই ত মানস-লোকের সদাজাগ্রত চক্ষু দুইটা বন্ধ হয় না। এই অনন্ত চিন্তার হাত হইতে তাহার আর নিস্তার নাই।

তখন প্রথম হতাশার আকস্মিক উত্তেজনা ও আবেগ স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। তাহার কি ক্ষতি হইতে চলিয়াছে, তাহা এবার সে ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইহার ফলে তাহার সামাজিক, সাংসারিক, মানসিক, নৈতিক—সকল রকমের সর্ব্বনাশ তাহার হইয়া যাইবে। শুধু তাহারই নয়, তাহারই সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকের প্রচণ্ড বেদনা সে কল্পনা করিল। প্রথমেই মনে পড়িল তাহার মাকে। এক পুত্রের জননী তিনি—তিনি প্রচণ্ড আঘাত পাইবেন। মা যদি কোন রূপে তাহার মানসিক অস্বস্তির কারণ জানিতে পারেন, তবে তাঁহার আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোন উপায়ান্তর থাকিবে না। তিনি যদি কোনরূপে জানিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'সুরেশ, তোর এই অসুখ করেছে ?'—বেদনায়, দুঃখে লজ্জায় তিনি হয়ত রোগটার নাম পর্য্যন্ত মুখে আনিতে পারিবেন না। মায়ের প্রশ্নের সে কি জবাজ দিবে ! অধোমুখে নীরব থাকা ছাড়া গত্যন্তর রহিবে না তাহার। তাহাতে মায়ের যে কি কষ্ট হইবে !

আরও একজন কষ্ট পাইবে—সে মীরা। ফুলের মত সুন্দরী মীরা, জীবন-যৌবনের সর্ব্ববিধ প্রাচুর্য্য ও আশীর্ব্বাদ তাহার দেহে মনে। তাহার বাগ্‌দত্তা বধূ—মীরা। বাগ্‌দত্তা হইলেও ত ইহার পর তাহাকে আর সে বিবাহ করিতে পারিবে না। তাহার জন্য কৈফিয়ৎ বা সে কি দিবে ? তবে একদিন গিয়া মীরার সহিত দেখা করিয়া আসিতে হইবে। তাহাকে বহু দিন পরে দেখিয়া মীরা নিশ্চয়ই অবরুদ্ধ গোপন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে। মীরা অবশ্য তাহা প্রকাশ করিবে না। প্রকাশ না করিলেও সে তাহা বুঝিতে পারিবে। এ কথা সে কথার পর সে প্রশ্ন করিবে, 'আচ্ছা মীরা, যার কোন সঞ্চিত ব্যাধি আছে, তার বিবাহ করা উচিত কি না ?' উত্তরে আশ্চর্য্যান্বিতা মীরা প্রশ্ন করিবে, 'কেন, হঠাৎ অমন কথা কেন ?' তখন তাহাকে স্বল্প ঢোঁক গিলিয়া অন্য এটা সেটা বলিতে হইবে ; নয়ত চুপ করিয়া থাকিতে হইবে। তবুও মীরাকে প্রশ্ন করিবে, 'ধর এমনিই যদি হয়, তার বিয়ে করা উচিত কি না ? আর তুমি সে রকম লোককে বিয়ে করতে পার কি না ? ধর আমারই যদি কোন অসুখ থাকে, তা হ'লেও তুমি আমায় বিয়ে করতে পার ?' তাহার কথার মাঝখানেই হয়ত মীরা তাহার হাত ধরিবে, এবং কথা শেষ হইতে না হইতে তাহার হাতখানা মীরার শিথিল মুষ্টি হইতে খসিয়া পড়িয়া যাইবে। তবুও মীরার মুখ বেদনায় পাণ্ডুর হইয়া উঠিবে, সে বেদনা-ক্লিষ্ট স্বরে বলিবে, 'তোমার কি হল বল ত ?' মীরার বেদনার্ত্ত মুখও ব্যথিত প্রশ্ন কল্পনা করিয়া সে একটি পরম প্রসন্ন স্বচ্ছ হাসি হাসিল।

তখন মূল চিন্তা হইতে সে অনেকটা সারিয়া গিয়াছে ; আবার তাহার চিন্তাসূত্র ফিরিয়া আসিতেই, সে চকিত হইয়া চারি পাশে চাহিল ! কেহই কোথাও নাই। কেবল পাণ্ডুর জ্যোৎস্না ঝলকে ঝলকে খোলা জানালা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার সমস্ত বিছানা ও দেহ প্লাবিত করিয়া দিয়াছে। ম্লান পাণ্ডুর, শ্বেতাভ জ্যোৎস্নায় আপনার দেহবর্ণকে মৃতের মত পাণ্ডুর বিবর্ণ বলিয়া তাহার বোধ হইল। এ আলো যেন কোন প্রেতলোক হইতে ভাসিয়া আসিতেছে এবং তাহার মনে হইল যে, তাহাতে তাহার সমস্ত দেহ যেন ধবলকুষ্ঠে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহার মনে হইল যদি এই জ্যোৎস্নার সাময়িক শ্বেতাভায় তাহার পাণ্ডুবর্ণ দেহ চিরকালের জন্য ঐ রূপই রহিয়া যায় আর সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র শরীরের চর্ম্ম যদি অসাড় হইয়া যায়, তবে—তবে সে কি করিবে ? আপনার উত্তেজিত

কল্পনা সত্য হইয়া উঠিল কি না, পরীক্ষা করিবার জন্য সে অতি সন্তর্পণে, অতি ধীরে ধীরে হাঁটুর নীচের কাপড় সরাইয়া ফেলিল, যেন আশে পাশে বহু লোক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে। সে সেই জায়গাটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। ধবলাভ পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায় সে দেখিল, সেই অসুস্থ স্থানটার পরিধি এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই খানিকটা বাড়িয়া গিয়াছে। সে জোরে জোরে কয়েকটা চিমটি কাটিল, সে যেন কিছুই অনুভব করিতে পারিল না। সে অনন্ত হতাশায়, শ্রান্তিতে বিছানায় ভাঙিয়া পড়িল।

পরদিন সকাল হইতে মায়ের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য বাহিরে বাহিরে কাটাইয়া বাড়ীর ভিতরে আসিল খাইবার সময়। মা পাশে বসিয়া বাতাস করিতেছেন আর সে নিঃশব্দে মুখ নীচু করিয়া আহার করিয়া চলিয়াছে।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মা-ই প্রথম কহিলেন, "ওরে আজ রাধানাথবাবু চিঠি লিখেছেন। তার সঙ্গে মীরাও আমাকে একখানা চিঠি লিখেছে। রাধানাথবাবু তোর অসুখের সংবাদ পেয়ে চিন্তিত হয়েছেন। আর লিখেছেন যে, আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে, তবে অগ্রাণ মাসেই শুভবিবাহ হয়ে যাক—এই আমার ইচ্ছা। আমারও মত তাই। আর তোরও একটা মতের দরকার। দিনও ত আর বেশী নেই। আজ কার্ত্তিক মাসের পনরটা দিন হয়ে গেল। আজকে আমি তা হ'লে লিখে দি যে, আমাদেরও মত তাই?"

সুরেশ মায়ের কথায় ও সংবাদে স্তম্ভিত হইয়া গেল। যেন তাহাকে আকস্মিক একটা প্রচণ্ড আঘাত করা হইয়াছে। গত রাত্রেই সে মীরার হাত হইতে একেবারে মুক্তির উপায় খুঁজিয়াছে; আজ তাহারই মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই আকস্মিকভাবে মীরার সহিত তাহার পরম বন্ধনের সুব্যবস্থা করিয়া ফেলা হইতেছে। ইহা তাহার কাছে সর্ব্বাপেক্ষা কাম্য হইলেও এই কদর্য্য রোগাক্রান্ত শরীর লইয়া সে কি করিয়া তাহা করিবে! সে এতক্ষণে মুখ তুলিয়া করুণ কণ্ঠে প্রতিবাদ করিল, "না মা, না—তোমায় আমি নিষেধ করছি, অন্তত এখন কিছুদিনের মত বিয়ে বন্ধ থাক।"

মা তাহার মুখ দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। তাহার উজ্জ্বল মুখে চোখের কোণে কোণে কালি পড়িয়াছে—ক্লান্তি জমিয়া উঠিয়াছে। মা উদ্বিগ্নস্বরে কহিলেন, "তোর আবার অসুখ করেছে নিশ্চয়। দেখি গা দেখি!"

মা গায়ে হাত দিয়া তাহার উত্তাপ অনুভব করিয়া কহিলেন, "না, জ্বর নেই ত।"

সুরেশ একটা ক্লিষ্ট গোপন হাসি হাসিল। জ্বর কি তাহার হইয়াছে! যাহা হইয়াছে, তাহা কি মাকে বলা যায়! সে এতক্ষণে জবাব খুঁজিয়া পাইল, "সামান্য অসুখে আমি বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি। দিন দিন কোথায় সবল হব, শক্তি ফিরে পাব, তা না—দিন দিন আরও দুর্ব্বল হয়ে পড়ছি তাই বিয়ে কিছুদিন এখন বন্ধ থাক মা।"

মা তাহার মুখের কথা কাড়িয়া বলিলেন, "তা যেন থাকল, তবে এখুনি তা হ'লে সলিল ডাক্তারকে ডেকে পাঠাই। সে এসে দেখে একটা ওষুধের ব্যবস্থা ক'রে দিক।"

সুরেশ রীতিমত ভীত হইয়া উঠিল; ডাক্তারকে সে কি দেখাইবে, ডাক্তারকে বলিবেই বা

কি, বলিবারই বা কি আছে। সে অস্বাভাবিক জোরে এবং দ্রুত প্রতিবাদ করিয়া উঠিল, "ঐ ত তোমাদের দোষ। সামান্য কিছু হ'লেই ডাক্তার ডাকাবে। মানুষ দুর্ব্বলতা বোধ করলে ডাক্তার কি করবে? ডাক্তার ডাকতে হবে না।"

মা তাহার প্রতিবাদে কর্ণপাতও করিলেন না—সলিল ডাক্তারকে ডাকিতে লোক পাঠাইলেন।

তাহার কি হইয়াছে, তাহা সে মুখ ফুটিয়া কাহারও কাছে বলিতে পারে না; সে শক্তি তাহার নাই। এই লজ্জাজনক গ্লানিকর রোগের কথা কাহাকেই বা সে বলিবে। বহির্লোকের সহিত তাহার যোগসূত্র যেন ছিন্ন হইয়া গেল। তাহার মনোলোকে অহরহ নানারূপ অসহ্য এলোমেলো ভাবনা ঐ রোগটাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে। আর সেই সমস্ত অপ্রকাশ্য চিন্তারাশিতে সে অহরহ পীড়িত ও ক্ষতবিক্ষত হইতেছে। ঐ চিন্তাজাল হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত সে ইহার উহার সহিত কথা কহিতে চেষ্টা করে; কিন্তু কথা কহিতে গিয়া অবসাদ দ্বিগুণ হয়; মাঝে মাঝে তাহার অসংলগ্ন কথায় আলাপ আলোচনার সূত্র কাটিয়া যায়, লোকে অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। আর একা থাকিলে ঐ জায়গাটা বার বার পরীক্ষা করিয়া দেখে রোগ কতদূর অগ্রসর হইল! রাত্রে শুইয়াও নিস্তার নাই, ঘুম আসে না। মাঝে মাঝে তন্দ্রা আসিলে নানারকম আজগুবী স্বপ্ন দেখে। কাল ভোরের দিকে সে নাকি স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিতেছিল; মা আসিয়া জাগাইয়া দিলেন।

মা ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইয়াছেন। ডাক্তারকে উত্তর দিবার নানারকম খসড়া সে মনে মনে তৈয়ারি করিতেছিল বাহিরের ঘরে বসিয়া। এমন সময় ডাক্তার আসিলেন। সলিল ডাক্তার পাশের চৌকিতে বসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কি হ'ল মশায়? আবার আপনার মা ডাকতে পাঠিয়েছিলেন। দুর্ব্বলতা বোধ করছেন? আচ্ছা, ওষুধ লিখে দিচ্ছি, ভাল stimulant হবে, আর nerve-গুলো strong করবে।"

তারপর ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "একটা কথা আপনাকে বলবার জন্যে একবার আমাকে আপনার কাছে আসতে হ'তই। ওপাড়ার রাম সরকারের থাইসিস বড় বেড়ে চলেছে, আপনারা যদি পারেন, আপনাদের সমিতি থেকে কিছু ব্যবস্থা করুন। জানেন ত বড় গরীব।

সুরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কি করতে হবে বলুন?"

ডাক্তার বলিলেন, "ভাল নার্সিং চাই, ভাল ফুড, এয়ার—এই সব আর কি। তারজন্যে টাকা চাই ত।"

তারপর গলা নামাইয়া বলিলেন, "ওর কি আর ওষুধ আছে?"

সুরেশও আনমনে বলিল, "সত্যিই, কুষ্ঠের আর ওষুধ কি!"

সচকিত ডাক্তার প্রশ্ন করিলেন, "কি বলছেন?"

সুরেশ অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "না না, কিছু না। আচ্ছা সলিলবাবু, কুষ্ঠের ওষুধ নেই?"

সলিলবাবু হাসিয়া বলিলেন, "কেন মশায়, কুষ্ঠের ওষুধে আপনার কি দরকার? ওষুধ আছে বৈকি, ডাক্তারে কি আর ওষুধ নেই এমন কথা বলতে পারে? তবে বন্ধু বন্ধুকে বলতে পারে—ও অসুখ দুটোর ওষুধ নেই।"

আর কয়েকটা কথার পর ডাক্তার বিদায় লইলেন। সুরেশ শূন্যদৃষ্টিতে তাঁহার গমনপথের দিকে চাহিয়া রহিল।

আরও কয়দিন কাটিয়া গেল।

সেদিন সারারাত্রি ভোরের অস্পষ্ট আলোকে আপনার পা-টা সে আবার পরীক্ষা করিতেছিল। অসুস্থ স্থানটার সাদা চামড়ার উপর ঘা হইয়াছে। তাহারই খানিকটা নীচে একটা ফুস্কুড়ি, চারিটা পাশ ফুলিয়া রক্তাভ হইয়াছে। সে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সেদিকে তাকাইয়া রহিল। রোগ বাড়িতেছে দ্রুতবেগে।

সে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর একটা ছাতার পাতলা ভাঙা শিক সংগ্রহ করিয়া লণ্ঠনের শিখাটাকে অস্বাভাবিক রকম বাড়াইয়া দিয়া শিকটাকে পোড়াইতে লাগিল। সেটা তাতিয়া যখন রক্তিমাভ হইয়াছে, তখন সেটাকে সে নবোদ্গত ফুস্কুড়িটার উপরে সজোরে চাপিয়া ধরিল। পরমুহূর্ত্তেই যন্ত্রণায় সেটাকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। অপর স্থানটাও পোড়াইবার ইচ্ছা তাহার ছিল, কিন্তু যন্ত্রণার আধিক্যে আর পোড়ানো হইল না।

পরদিন সকালেই সে দেখিল, ফুস্কুড়িটা একটা বড় ফোস্কায় রূপান্তরিত হইয়াছে। সেটাকে সে অত্যন্ত সাবধানে কাপড় দিয়া ঢাকিয়া চলাফেরা করিতেছে, পাছে মায়ের চোখে পড়ে। কিন্তু ফোস্কাটার সহিত কাপড়ের ঘর্ষণে তাহার চলিতে কষ্ট হইতেছিল। সে বাড়ীর ভিতর আসিয়া বসিল; তারপর চারিদিকে চাহিয়া দেখিল আশেপাশে কেহ নাই। তখন সে হাটুর নীচের কাপড় সরাইয়া ফোস্কাটাকে গভীর মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু মা কখন পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, সে দেখিতে পায় নাই। কাপড়ের খস্ খস্ শব্দে চকিত হইয়া তাকাইতেই মাকে দেখিতে পাইয়া সে তাড়াতাড়ি সে স্থানটা ঢাকিয়া ফেলিল।

মা বলিলেন, "দেখি রে দেখি, কি হ'ল তোর?" মা তাহার ঘা-ফোড়ার চিকিৎসায় বড় পারদর্শিনী। তাহার গভীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও মা ঝুঁকিয়া পড়িয়া ফোস্কাটা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফোস্কা হ'ল কি করে?"

ছেলে উত্তর দিল, "লণ্ঠনে লেগে।"

বিরক্তকণ্ঠে মা কহিলেন, "দাঁড়া, ওষুধ এনে দি। বুড়ো বয়সেও কি লণ্ঠন নিয়ে কুস্তি করিস না কি? কি ক'রে লণ্ঠনে লাগিয়ে ফোস্কা পড়ালি? সাদা দাগ হয়ে যাবে জায়গাটায়। এইখানেই কাছে কোনখানে তোর অনেক ছোটবেলায় এমনি লণ্ঠনে লেগে পুড়ে গিয়েছিল।"

সে বিস্মিত দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। তাহার দেহে মনে কি একটা ঘটিতেছে যেন। সে যেন রোগমুক্ত হইতেছে। মা খুঁজিয়া স্থানটা আবিষ্কার করিয়া বলিলেন, "এইখানটায়। এ কিরে, কি ক'রে ছিঁড়ল জায়গাটা?"

মাকে বিস্মিত করিয়া সুরেশ শুধু উত্তর দিল, "বড় ঘুম পাচ্ছে মা আমার। পরে ওষুধ দিও। আমি এখন শোব।"

বেলফুলের মালা

শ্রীনলিনীকুমার বসু

সুখলতা রাধাচরণ পণ্ডিতের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। বিয়ের সময় সতেরো বছরের কনের পাশে চুয়াল্লিশ বছরের বরকে একটু বেমানান দেখালেও তা' নিয়ে সুখলতা কিম্বা তা'র বাবা-মার মনে কোন ক্ষোভ ছিল না। পাঁচ-দশখানি গাঁয়ের মধ্যে রাধাচরণ চক্রবর্ত্তীর পণ্ডিত বলে যেমন খ্যাতি ছিল, বিশ-পঁচিশ ঘর অর্থবান শিষ্য, জমী-জমা নিয়ে তা'র সাংসারিক অবস্থাও ছিল সচ্ছল। বাপের বাড়ীর টানাটানির সংসার থেকে স্বামীর ঘরের সচ্ছল অবস্থার মধ্যে এসে সুখলতা সহজেই উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল।

কিছুদিন স্বামীর ঘর করে সুখলতা প্রথম যেবার বাপের-বাড়ী আসে তা'র মুখের দিকে চেয়েই প্রায় সকলে মনের ভাব বুঝতে পেরেছিল। সেদিন দুপুরে পূবের ঘরের ন'বউদির আসরে বাড়ীর মেয়ে বউরা তা'কে ঘিরে বসে ঐ অবস্থাটাই সঠিক বুঝে নিতে চাইল। ন'বউদিই প্রথমে কথা বলল, "কি ঠাকুরঝি, শ্বশুরবাড়ী মনে ধরেছে?" তখনও সুখলতার সলজ্জ স্মিত মুখ দেখে ও প্রশ্নের জবাব তা'রা পেয়েছিল। উত্তরের ঘরের ছোটখুড়ী জিজ্ঞাসা ক'রল, "শাশুড়ী কেমন রে? গাল-মন্দ করে না তো?" সুখলতা মাথা নেড়ে বলল, "গাল-মন্দ ক'রবে কি, তিনি কাউকে জোরে একটি কথা বলেন না। সবাই বলে মাটির মানুষ।" ছোটখুড়ী খুসী হ'য়ে বলল, "তোর ভাগ্য ভাল।" সুখলতার সলজ্জ ভাবটা কেটে আসছিল, এ বারে হাসিমুখে বলল, "তিনি আবার করবেন গাল-মন্দ! বলব কি, বললে হাসবে, দিনরাত কেবল বলবেন, এটুকু খাও, ওটুকু খাও। আমি ত লজ্জায় বাঁচিনে! কত মাছ, দুধ, মিষ্টি, আমি কত খাবো! তা কি শুনবেন? বলব কি ন'বউদি, তোমরা তো হাসবে, ওমা, ভোরে উঠে কাজকম্ম করতে যাবো তখনও এই এতবড় এক ডেলা মিছরী দিয়ে বলবেন খালিপেটে পিত্তি পড়বে, একটু জল খেয়ে নাও।" সুখলতার শাশুড়ী-ভাগ্যের যে তুলনা নেই একথা সকলেই স্বীকার করল। ন'বউদি এবারে জিজ্ঞাসা করল, "পণ্ডিত মশাই বলে-টলে কি?" এ কথার কোন উত্তর পাওয়ার আগে সরকার-বাড়ীর রাণী প্রশ্ন করল, "তোমার বর খুব পণ্ডিত, না সুখীদি?" কিছুকাল চুপ করে থেকে সুখলতা সহাস্যে বলল, "একটা কথা বলব···না থাক বলব না, তোমরা হাসবে।" নতুন কোন গোপন তথ্য জানবার জন্য সকলে অতিমাত্রায় উৎসুক হ'য়ে উঠল, প্রায় একসঙ্গে সকলে বলল, "কি—কি? বলনা ভাই! হাসবোনা, মাইরি বলছি, হাসবো না।" সুখলতা প্রস্তুতই ছিল, একটু হেসে বলল, "আমি তো লেখাপড়ায় কাঁচকলা, অতবড় পণ্ডিতের ঘরে এসেছি, আমার যা লজ্জা করে! দিনরাত কতলোক ওঁর কাছে আসছে, কত শাস্তর-মন্তর হচ্ছে, আমি তো তার একবন্নও বুঝি নে। বলব কি, লজ্জায় বাঁচিনে, উনি একদিন ধরে বসলেন আমাকে শাস্তর পড়াবেন। ওমা···কোথায় যাই! শাশুড়ীও ছেলের কথায় মত দিয়েছেন। ক'দিন ধরে সত্যিই পড়াতে আরম্ভ করেছেন···হ্যাঁ! এমন সব বইপুঁথির তো কোনদিন নামও শুনিনি। বইখানার নাম কলাপ।" সুখলতা মুখে কাপড়গুঁজে হাসতে আরম্ভ করল। রাণী বলল, "কি শিখেছ একটু

বল না।" হাসি থামিয়ে সুখলতা বলল, "শিখবো ছাই, সংস্কৃত কি আমার জিভে ওল্টায়।" রাণী তবু বলল, "একটুখানি বল।" কপটগাম্ভীর্য্যের সঙ্গে সুখলতা বলল, "শুনবি? 'সমানসমান-দীর্ঘলোপং।" অনুস্বরের উপর বিসর্গের জোর দিয়ে বলে। সুখলতা হাসতে থাকে, কিন্তু অন্য সকলে অবাক হ'য়ে তা'র মুখের দিকে চায়। উত্তরের ঘরের মালতী এতক্ষণ কোন কথা বলেনি, চুপ করে শুন্‌ছিল, সে হঠাৎ প্রশ্ন করল, "পণ্ডিত ম'শাইকে ভাল বেসেছিস্।" অর্থ বুঝতে না পেরে সুখলতা তার মুখের দিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে। উত্তর দিল ন'বৌদি, "ওমা, সোয়ামীকে আবার ভালবাসবে না কি! তোমার বিয়ে হোক ছোটঠাকুরঝি, তখন বুঝতে পারবে।"

বিয়ের পর দশ বছর কেটেছে। ইতিমধ্যে রাধাচরণের সংসারে উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হয়েছে, তা'র মাতৃবিয়োগ। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁর মনে অন্য কোন দুঃখ-অশান্তি ছিল না, নতুন বৌর সন্তান হ'ল না এই চিন্তাই তাঁকে যা কিছু পীড়া দিত। জীবিত অবস্থায় তিনি কবচ, জলপড়া প্রভৃতির বহু প্রয়োগ করেও ওবিষয়ে কোন ফল পান নি। কিন্তু, সুখলতার নিজের মনে যে ঐ কারণে কোন ক্ষোভ ছিল তা' নয়, রাধাচরণের আগের পক্ষের ছেলে নিমাই যখন রয়েছে, তখন স্বামীর উত্তরাধিকারীর ভাবনা তার ছিল না। নিমাইর যেমন স্বভাব বুদ্ধি, ভবিষ্যতে সে বাপের নাম রাখতে পারবে বলে সুখলতা ভরসা রাখে। যে-কলাপ ব্যাকরণের দুটা সূত্র আয়ত্ত করতে সে গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে পাঠ ছেড়ে দিয়েছে, মাত্র এক বছরে সেই গোটা বইখানা নিমাই শিখে নিয়েছে। পৈতা হওয়ার পর থেকে আরও মনোযোগের সঙ্গে বাপের কাছে শাস্ত্র-মন্ত্র শিখতে আরম্ভ করেছে। শ্বাশুড়ীর মৃত্যুর পর ছেলে না হওয়ার চিন্তাটাকে দূরে সরিয়ে বিপুল উৎসাহে সুখলতা সংসারের কর্ত্রী হয়ে বসেছে। এই সংসারের আর যা' কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে তা' রাধাচরণের স্বাস্থ্য। পূর্ব্বের সে স্বাস্থ্য ত নেই-ই, বছর দুই হ'ল বাত আর হৃদ্‌রোগে তাকে রীতিমত শয্যাশায়ী করেছে। স্বামীর এই রুগ্ন অবস্থা প্রথম প্রথম সুখলতাকে যেমন উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল ক্রমে তাও গা-সহা হয়ে এসেছে।

প্রতিদিনের মত কোন রকমে সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে সেদিন ভোরেও রাধাচরণ ডাকল, "ছোট-বৌ!" এবং প্রতিদিনের মত আহ্বান শুনে সুখলতা এক বাটি পাঁচন হাতে নিয়ে এসে উপস্থিত হ'ল। এক চুমুকে সমস্ত পাঁচনটুকু শেষ করে রাধাচরণ বলল, "শোন, কথা আছে।" বাটিটা হাতে করে চলে যাওয়ার জন্য সুখলতা পা বাড়িয়েছিল, কথা শুনতে ফিরে দাঁড়াল। রাধাচরণ বলল, "এখানের ডাক্তার-বদ্যি ত কিছু ক'রতে পারল না ছোট-বৌ, অসুখটা যে বেড়েই চলেছে।" সুখলতা তাড়াতাড়ি বলল, "ও নিয়ে ভেবোনা, সেরে যাবে।" রাধাচরণ বলল, "কৈ আর সারছে! ও পাড়ার নিধু খুড়ো, গাঙ্গুলি মশাই, আমাদের অঘোর—এরা সকলে একটা পরামর্শ দিচ্ছে; ভেবে দেখলাম, মন্দ বলেনি! বলছে ক'লকাতা গিয়ে চিকিৎসা করাতে। ভাবছি, মন্দ কি—চিকিৎসাও হবে, মা-কালী দর্শনও হবে। কি বল?" চিন্তিত মুখে সুখলতা বলল, "এই রোগা শরীরে একা কি করে যাবে?" রাধাচরণ বলল, "না, তোমরাও সঙ্গে যাবে ঠিক্ করেছি। চল না! দু'চার মাস ঘুরে আসি। ঘর-দোরের জন্য ভেবো না, অঘোরকে দিয়ে সব বন্দোবস্ত করিয়ে যাবো।" কলকাতার কথা সুখলতা কিছু কিছু শুনেছে, তার ধারণায় রামায়ণ-মহাভারতের অযোধ্যা-হস্তিনাপুরের মত সে শুধু কল্পনার স্থান—সাধারণের অনধিগম্য। সেও সেখানে যেতে পারবে, এই সংবাদের গুরুত্ব কিছুকাল তাকে

নির্ব্বাক করে রাখল। শুধু জিজ্ঞাসা করল, "নিমাইকে বলেছ ?" রাধাচরণ বল্‌ল, "না, এখনও বলিনি।" সুখলতা তাড়াতাড়ি বল্‌ল, "আমি বল্‌ছি।" নিমাই তখন বেতালপঞ্চবিংশতির রাজার সঙ্গে শ্মশানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সুখলতা এসেই আচম্‌কা বল্‌ল, "নিমাই, আমরা কল্‌কাতা যাবো।" এই অভাবনীয় সংবাদের তোড়ে বেতালপঞ্চবিংশতি নিশ্চিহ্ন হয়ে ভেসে গেল, বিস্ফারিত চোখে নিমাই জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "কবে ?" সুখলতা শুধু বল্‌তে পারল, "শীগ্‌গির-ই।"

রাধাচরণের মামাত ভাই রামপ্রসাদ কল্‌কাতায় সদাগরী অফিসে খাতা লেখার কাজ করে। তাকে সব বন্দোবস্ত ক'রতে জানিয়ে শুভদিনে রাধাচরণ স্ত্রীপুত্র নিয়ে কল্‌কাতা যাত্রা কর্‌ল।

(২)

কালীবাড়ীর কাছাকাছি সা'নগরের এক গলিতে বাসা ঠিক হ'ল। দু'খানি ঘর, আর খোলা বারান্দায় বেড়া দিয়ে ঘেরা রান্নার জায়গা। এঁটো থালাবাসন ধোয়া, উনুনে আঁচ দেওয়া, ঘর-দোর ঝাঁট দেওয়া প্রভৃতি কাজের জন্য রামপ্রসাদ একজন ঝি ঠিক করে দিয়েছিল। প্রথম দু' একদিন সুখলতা আর নিমাই রামপ্রসাদের সঙ্গে গিয়ে গঙ্গাস্নান, কালীদর্শন করেছে। কিন্তু, রাধাচরণের পক্ষে তা' সম্ভব হয়নি, সে যেন আরও রুগ্ন হয়ে পড়েছিল।

পাড়া-পড়সী কারো সঙ্গে সুখলতার আলাপ-পরিচয় হয়নি, কল্‌কাতার লোকের সঙ্গে কি করে আলাপ করা সম্ভব তা' সে ভেবে ঠিক্‌ ক'রতে পারেনি। রান্নাঘরের ছোট জানালা দিয়ে পাশের বাড়ী দেখা গেলেও ডেকে কথা বলার মত ভরসা সুখলতার ছিল না। জানালা দিয়ে প্রথমেই যে-ঘর চোখে পড়ে সেখানে ও-বাড়ীর মেয়ে থাকে। মেয়েটি দেখতে মন্দ নয়, বয়স হয়ত বছর আঠারো হবে। সুখলতা প্রায়ই দেখত মেয়েটীর খোঁপায় এক ছড়া মালা জড়ানো—মন্দ মানাত না। একদিন সন্ধ্যার কিছু পরে জানালা দিয়ে ওদিকে তাকাতেই বিশ-পঁচিশ বছরের একটি ছেলে তার চোখে পড়ল। একে আগে আর কোনদিন সে দেখেনি, বেশ ফিট্‌-ফাট্‌ চেহারা। কিন্তু, আর চেয়ে দেখা সম্ভব হ'ল না; মেয়েটী খোঁপা থেকে মালা ছড়া খুলে ঐ ছেলেটির গলায় পরিয়ে দিচ্ছিল, সুখলতা তাড়াতাড়ি জানলার কাছ থেকে সরে এল।

পরদিন ভোরে ঝি যখন তরকারী কুটছিল সুখলতা উনুনের উপর কড়াই চাপিয়ে সেদিকে দৃষ্টি রেখেই জিজ্ঞাসা করল, "এই পাশের বাড়ী কা'রা থাকে ক্যাবলার মা, জানো ?" প্রশ্ন শুনে ঝি বল্‌ল, "এই বাড়ী ? ওরা এখানের পুরোণো লোক, মনিন্দির বাবু—সরকারী চাকুরে, এখন পেন্‌সান্‌ নিচ্ছে। জানি না ? আমি যে কত বছর কাজ করেছি।" সুখলতা কড়াইর উপর কতগুলি আলু ছেড়ে আবার জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "পরিবারে আছে কে কে ?" ঝি হিসাব দিল, কর্ত্তা গিন্নী, দু'ছেলে, এক মেয়ে—"বড়দাদাবাবু কোথায় যেন মেড়োর মুল্লুকে চাকরী করেন। মণ্টু স্কুলে পড়ছে। আর ত দিদিমণি—বড় ভাল লোক ওরা।" কথার মধ্যে সুখলতা বল্‌ল, "ঐ যে মেয়েটী খোঁপায় মালা পরে, ঐ বুঝি তোমাদের দিদিমণি ?" "মালা পরে। পরতে পারে।" জানালা দিয়ে একটু দেখে বল্‌ল, "হ্যাঁ, ঐ-ইত। বেলের গোড়ে জড়িয়েছে। ডাকবো দিদিমণিকে ?" শশব্যস্তে সুখলতা "থাক্‌, থাক্‌,

আর এক সময় আলাপ ক'রব।—তা' এর বিয়ে দিয়েছে কোথায়?" "দিদিমণির? বিয়েত এখন হয়নি। শীগ্‌গিরই হবে বোধ হয়। ঐ যে মুদিয়ালির মিত্তিরদের ছেলে এখানে আসে, দেখনি বুঝি, দিদিমণির সঙ্গে ওর খুব ভালবাসা, সেখানেই হবে। বড় ভাল ছেলে, চারটে পাশ দিয়েছে।" সুখলতা আর কথা বল্‌ল না। ঝি আবার হেসে বল্‌ল, "তুমি ত ঠিকই দেখেছ, মালা যে খোঁপায় পরে আমার ত তা' নজরই হয়নি! বেলের গোড়ে আর দেখ নি? ঐ যে বেলি ফুল বলে, তার মালা। কেন, তোমাদের দেশে বিয়ের সময় মালা বদল হয় না? ঐ-ই ত বেল ফুলের মালা। পথে পথে কত বিকোচ্ছে। বড্ড মাগ্যি, চার আনার কমে আর বিকোয় না।"

আরও কিছুদিন গেল, ও বাড়ীর মেয়ের সঙ্গে সুখলতার পরিচয় আর হ'ল না। ঝি হয়ত ভুলে গেছে, তাকে আবার মনে করিয়ে দিতে সঙ্কোচ হয়। একদিন বিকালের দিকে দেখল ও বাড়ীর কর্ত্তা-গিন্নী আর ছেলেটি সেজে-গুজে কোথায় যেন চলেছে, ক্যাবলার মা পথে দাঁড়িয়ে গিন্নীর সঙ্গে কি কথা বল্‌ল। ক্যাবলার মা ভিতরে আস্‌তেই সুখলতা জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "ওরা কোথায় যাচ্ছেন ক্যাবলার মা?" "ঐ যে ঊর্ম্মি দেবী না কি নাম, যা'র ভাইর দেশজোড়া নাম ছিল,—ঐ যে গো যাঁর নামে মেয়ে-হাঁসপাতাল হয়েছে, তাঁর কেত্তন শুনতে। খুব নাকি নামজাদা গাইয়ে।" সুখলতা জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "তোমাদের দিদিমণিকে নিয়ে গেল না ত?" ঝি বল্‌ল, "আমিও ত তাই শুধুচ্ছিনু, দিদিমণির নাকি মাথা ধরে শরীর খারাপ করেছে।" এত বড় বাড়ীতে একা মেয়েকে ফেলে যাওয়াটা সুখলতা মনে-মনে সমর্থন কর্‌ল না।

সন্ধ্যার পর জানালা দিয়ে চেয়ে দেখে সুখলতা একটু অবাক হ'ল, মেয়েটীর শরীর-খারাপের কোন লক্ষণই ছিল না—খোপায় মালা জড়িয়ে গুণ-গুণ করে কি গান গেয়ে গেয়ে ঘরময় পায়চারী ক'রছিল। চেয়ে চেয়ে সুখলতা চম্‌কে উঠল, মেয়েটীর ঘরের দরজা খুলে গিয়ে একটি লোকের অস্পষ্ট মূর্ত্তি দেখা যাচ্ছে। একটু এগিয়ে আসতেই দেখল এ সেই ছেলেটি। ছেলেটির চোখে-মুখে কি এক রকম হাসি ফুটে উঠেছে। আজও এগিয়ে গিয়ে মেয়েটী তা'র গলায় মালা পরিয়ে দিল। ছেলেটী সহসা দু'হাত বাড়িয়ে মেয়েটীকে বুকের মধ্যে টেনে নিল, মেয়েটীর অস্পষ্ট হাসির শব্দও শোনা যায়। —দাঁড়িয়ে থাকার সামর্থ্য আর সুখলতার ছিল না। তার হাত-পা যেন একটু একটু কাঁপতে আরম্ভ করেছে, দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বারে-বারে বুক ফুলে-ফুলে উঠছে। তাড়াতাড়ি এসে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল। মেয়েটীর অসুখের ভাণ, প্রতীক্ষার চঞ্চলতা, বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া, সমস্ত দৃশ্যটা যেন মুহূর্ত্ত মধ্যে সুখলতাকে স্বাভাবিক ভারকেন্দ্র থেকে আচম্‌কা বিচ্যুত করেছে। ক্যাবলার মা'র কথাটা কেবলই মাথার ভিতর ওলট-পালট খাচ্ছে, 'দিদিমণির সঙ্গে ওর খুব ভালবাসা'। ভালবাসা! শব্দটা যেন সুখলতা নতুন শুনেছে।—সহসা দশ বৎসর অতীতের ভুলে যাওয়া একটি ছোট কথা তার স্মৃতিতে জ্বল্‌-জ্বল্‌ করে উঠল, মালতী জিজ্ঞাসা কর্‌ছিল, "পণ্ডিত মশাইকে ভালবেসেছিস্?" ও কথার অর্থ সে বুঝতে পারে নি, নির্ব্বোধের মত সেদিন চেয়েছিল মালতীর মুখের দিকে। উত্তর? হ্যাঁ, সুখলতার মনে পড়ে উত্তর দিয়েছিল ন'বৌদি, 'সোয়ামীকে আবার ভালবাসবে না কি!" আবেগে সুখলতা বিছানার উপর উঠে বস্‌ল। পাশেই তার স্বামীর শয্যা। ভালবাসার জন ত তার পাশেই, সে ত একা নয়! স্বামীর শয্যায় গিয়ে সুখলতা ঝুঁকে পড়ে একান্ত

আগ্রহে ঘুমন্ত রাধাচরণের মুখের দিকে চেয়ে রইল। বুকের উপর ভার বোধ হওয়ায় রাধাচরণ জিজ্ঞাসা করল, "কে ?" দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই অস্পষ্ট স্বরে সুখলতা বল্‌ল, "আমি।" "ছোট বৌ ? রাত হয়েছে, ঘুমোও গিয়ে।" উঠে বসে সুখলতা বল্‌ল, "যাই, মশারিটা গুঁজে দিচ্ছিলাম।

নিজের বিছানায় গিয়ে খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে সুখলতা শুয়ে রইল। অল্পদূরে একটা নিমগাছের পাতার ফাঁক দিয়ে আকাশে ছড়ান কয়েকটা তারা চোখে পড়ে। ঘুমোবার ইচ্ছা বা চেষ্টা তার ছিল না। তবু, চেয়ে থাকতে থাকতে এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়েছে, খেয়াল করে নি। কখন কয়েক ফোঁটা জল চোখের কোন থেকে গড়িয়ে বালিশের উপর পড়েছে তাও তার খেয়াল ছিল না।

ভোরবেলা নানা কাজের ফাঁকে এক সময় ঝিকে জিজ্ঞাসা করল, "কি ফুলের মালা বলছিলে ক্যাবলার মা ? নামটা ছাই মনেই আসছে না।" ক্যাবলার মা মুখের দিকে একটু চেয়ে থেকে একেবারে বুঝতে পারল, "ও বেলফুলের কথা বলছ!" ঝির দিকে না চেয়ে সুখলতা বলল, "বেলফুল বুঝি, তা' ওর এক ছড়া মালা আজ বিকেলে আসবার সময় নিয়ে আসতে পার ? ভারী সুন্দর মালা কিন্তু।" ক্যাবলার মা বলল, "কেন পারবো না ? কিন্তু বলেছি ত, বড় দাম নেয়।" আঁচলের গেরো খুলে একটা সিকি ঝির হাতে দিয়ে সুখলতা তাড়াতাড়ি উঠে গেল।

বিকালের দিকে নিমাই বলল, "আমি রামকাকার ওখানে বেড়িয়ে আসি।" সুখলতা বলল, "একা চিনে যেতে পারবে ?" হেসে নিমাই বলল, "হুঁ, কদিন ত গিয়েছি। আবার সন্ধ্যার আগেই কাকার সঙ্গে আসবো।—যাই ?" সম্মতি দিয়ে সুখলতা বলল, "দেরী কোরোনা বেশী।"

কলে জল এসেছিল, কিছুকাল পরে কলাপাতে মোড়া এক ছড়া মালা নিয়ে ঝি এল। মালা ছড়া নিয়ে গিয়ে সুখলতা কুলুঙ্গিতে ঢাকা দিয়ে রাখল। ঝিকে বলল, "উনুনে আঁচ দেওয়া হলে তুমি ওঁর বিছানার চাদরটা বদ্‌লে দিও, পায়ের কাছেই কাচা চাদর রেখে দিয়েছি। ঘুমুচ্ছেন, তাই নাড়াচাড়া করতে পারিনি।" বাক্‌সে একখানা লাল রঙের সাবান পড়েছিল, কবে যে কেনা সুখলতার মনে পড়ে না, সেখানা ঘসে আজ গা ধুয়ে বেশ আরাম লাগছিল। পাশের ঘরে গিয়ে চওড়া লাল পেড়ে একখানা সাড়ী পরে ভাল করে চুল আঁচড়ে খোঁপা বাঁধল। সযত্নে কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দিল। তারপর, দরজার দিকে চেয়ে সন্তর্পণে মালা ছড়া এনে ধীরে ধীরে খোঁপায় জড়াল। ঘরের জানালা দু'টা থেকে ভাল আলো আসে না, সেজন্য ছোট আর্সিখানা হাতে করে নানা ভাবে ঘুরে দেখছিল। ঈষৎ একটু হাসিতে ঠোঁট দুখানি সামান্য সঙ্কুচিত হ'য়েছে। "ওমা-শীগ্‌গির এস, বাবু যে আর নেই"।—হঠাৎ ঝি চেঁচিয়ে উঠল। হাত থেকে আর্সিখানা শক্ত মেঝের পড়ে উপর খণ্ড-খণ্ড হয়ে গেল। মুহূর্ত্ত কয়েকের জন্য সুখলতার সমস্ত শরীর আড়ষ্ট হয়েছিল, পরক্ষণে ছুটে এসে রাধাচরণের মৃতদেহের উপর আছাড় খেয়ে পড়ল। ঝির কান্নার শব্দ শুনে কয়েকজন প্রতিবেশী ভিতরে এল। কিছুকাল মধ্যে রামপ্রসাদের সঙ্গে নিমাইও এসে পৌঁছাল। সম্পূর্ণ জ্ঞান সুখলতার ছিল না; মৃতদেহ এনে কখন স্বল্পপরিসর উঠানের মাঝখানে রেখেছে সে তা' জানে না, কিন্তু সেখানেও সে স্বামীর পায়ের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে আছে।

বিকাল শেষ হয়ে সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। কে একজন বলল, "আর দেরী ক'রবেন না, রাত

হচ্ছে।" কথাটা সুখলতার কানে এল, একটু একটু করে তার জ্ঞান ফিরে আসছিল। এতক্ষণ পরে সে উঠে বসে মৃত স্বামীর মুখের দিকে চাইল। কিন্তু, মুখ দেখা গেল না, আপাদমস্তক কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ তার দৃষ্টি আবদ্ধ হ'ল মৃতদেহের কাপড় ঢাকা বুকের দিকে—এক ছড়া মালা আড়ভাবে প'ড়ে ছিল। খুব অস্পষ্ট মনে পড়ল ঝি এক সময় তার খোঁপা থেকে মালা ছড়া খুলে নিচ্ছিল, হয়ত সেই বুদ্ধি করে ওখানে সেটা ফেলে রেখেছে।

মানস দোল

শ্রীসুশীলকুমার মজুমদার

১

আজি সখি এ দোল বাসরে
উলসি' হৃদয় দোলে		বিষাদ যাতনা ভোলে
দুখ গ্লানি পরাণ পাসরে।
আজি এ ফাগুন প্রাতে		পীরিতি আগুনে মাতে
দিকে দিকে নিখিল পরাণ,
গোলাপ শোভায় আজি		ধরণী আসিল সাজি'—
দিকে দিকে শোণিমা-বিতান।
লহরে লহরে ফাগে		নব অনুরাগ জাগে
লালে লালে আকুল লোচন,
উড়িছে ফুলের রেণু		ফিরিল কালের ধেনু
বেণুরবে শ্যামের মোহন।
আজি এ চাঁদিনী রাতে		মৃদুল মলয় বাতে
রাসরসে রসিছে ভুবন,
মনোবীণাতারে আজি		কি গানে উঠিল বাজি'
সুধাঢালা কোকিল কূজন।

২

এস ওগো মনোলোভা		উড়ায়ে আঁচল-শোভা
ফুলসাজে কর গো আকুল,

লোহিত-যাবক রাগে ফুটায়ে কমল আগে
এস ফেলি' চরণ রাতুল,
রাকাশোভা পরকাশি' যেন রে অধরে হাসি
দোলা দেয় মানস-সাগরে—
শিথিল কবরী মাঝে আঁধার যেন গো লাজে
তারা শোভে নয়ন ডাগরে,
ঢাকি নীলবাসে কায়া বিথারি' আকাশ মায়া
এস ওগো উজলি' ভুবন,
মৃদুভাষে সুমধুর যেন বাঁশরীর সুর
আবেশে শিহরে তনু, মন।
এস ওগো ত্বরা করি' সব কাজ পরিহরি'
দেখা দিয়ে তিমির নাশ রে—
আজি সখী এ দোল বাসরে।





চলন্তিকা

সম্বুদ্ধ

একটি গল্প বলি।

এক রাজা। এবং সেই রাজার রাজ্য। মস্তবড় রাজা, রাজ্যও সুবিশাল,—

রাজ্য ভরিয়া বিবিধ জাতি ও বিবিধ সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে।

দিন যায়, এহেন রাজার রাজ্যে অসন্তোষ ঘনাইয়া উঠিল। রাজ্যের অধিবাসীরা অকস্মাৎ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া চেঁচামেচি সুরু করিল। কহিল, আমাদের উপরে অত্যাচার হইতেছে, তাহার প্রতিকার চাই।

কি অত্যাচার? না, রাজা নিজে-নিজেই শাসন করিতেছেন, আমাদের সাহায্য লইতেছেন না। ইহা অন্যায়।

সংশয়ীরা কহিল, রাজা যদি নিজেই জাগিয়া চোর তাড়ান, আমরা নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে পারি। সাধিয়া তাঁহার সঙ্গে রাত্রি জাগিয়া লাভ কি হইবে, তাহা তো বুঝিলাম না।

উৎসাহীরা কহিল, বুঝিবেও না, চুপ করিয়া থাক।

বলিয়া বৃহৎ বৃহৎ প্রান্তরে যাইয়া জমায়েৎ হইয়া 'দেশমাতা, ও দেশমাতা' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

অনেক ডাকাডাকি অনেক চেঁচামেচির পর অনেক হাত মাটির তলা হইতে একটা ক্ষীণ কম্পিতকণ্ঠ শোনা গেল—কে ডাকে?

ইহারা কহিল, আমরা। তুমি ওঠ মা, আমরা স্থির করিয়াছি তোমাকে জাগাইব।

দেশমাতা কহিলেন, আমি তো জাগিয়াই আছি বাছা, আমাকে আর জাগাইবে কি? ঘুম যে কবে অভ্যাস ছিল তাহাও ভুলিয়া গিয়াছি।

দেশপুত্রেরা কহিল, সে জাগা নয়। তোমাকে আমরা স্বাধীন করিব।

দেশমাতা কহিলেন, স্বাধীন? ঐরকম কথা কবে কোন্ অতীতে যেন শুনিয়াছিলাম। এখন উহার অর্থ পর্যন্ত মনে নাই। আমাকে কি করিতে হইবে?

দেশপুত্রেরা কহিল, কিছুই করিতে হইবে না। তুমি শুধু চাহিয়া দেখ, আমরা কিরূপ অবলীলাক্রমে তোমাকে ঠেলিয়া স্বর্গে তুলি।

মাতা কহিলেন, কিছু যদি করিতেই না হয়, তবে আর বৃথা চাহিয়া থাকিয়াই বা করিব কি?

পুত্রেরা কহিল, বা, আমরা তোমার জন্য কষ্ট সহিব, তুমি একটু চাহিয়াও দেখিবে না?

মাতা কহিলেন, বেশ, দেখিব। কিন্তু তোমরা প্রক্রিয়াটা করিবে কি?

পুত্রেরা কহিল, সমস্তই করিব। বক্তৃতা দিব। 'জ্বালাময়ী', 'ওজস্বিনী', 'সারগর্ভ', 'নাতিদীর্ঘ'—সকলপ্রকার বক্তৃতা দিব। দেশে দেশে দিকে দিকে বাণী পাঠাইব। সভায় সভায় কাগজে কাগজে বিবৃতি দিব।

মাতা কহিলেন, তাহাতে কি হইবে?

পুত্রেরা কহিল, আন্দোলন হইবে। বিক্ষোভের সঞ্চার হইবে। রাজার করুণা হইবে। শাসনকার্যে আমাদের জন্য স্থান নির্দিষ্ট হইবে। তুমি স্বাধীন হইবে। অনুমতি দাও।

মাতা কহিলেন, দিলাম।

*

আন্দোলন চলিতে লাগিল। বার্তায় বক্তৃতায় বাণীতে বিবৃতিতে দেশের আকাশ বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। ক্রমাগত উচ্চরবে চীৎকার করিবার ফলে পুত্রগণের শ্বাসযন্ত্র হইতে রাশি রাশি কার্বন ডায়ক্সাইড গ্যাস বাহির হইতে লাগিল; বুঝিয়া না বুঝিয়া অর্থে অনর্থে ক্রমাগত বাণীর উদ্গার তুলিবার ফলে তাহাদের বক্তব্য ক্রমেই ধোঁয়াটে হইয়া উঠিতে লাগিল। এই দুই কুজ্ঝটিকায় মিলিয়া আকাশ ঝাপসা হইয়া গেল। মাতার প্রাণে তখন আশা জাগিয়াছে, মৃত্তিকাশয়ন হইতে কায়ক্লেশে মাথা তুলিয়া তিনি সেই কুয়াশার মধ্যে প্রাণপণে তাকাইয়া রহিলেন—কখন আকাশ হইতে আলোক দেখা দিবে, তাহার প্রত্যাশায়। ওদিকে রাজা তাঁহার প্রাসাদে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে লাগিলেন। কুয়াশায়—ভারী বায়ুস্তর ঠেলিয়া তাঁহার কানে চীৎকার পৌঁছিল না।

*

শেষ পর্যন্ত পুত্রদের ধৈর্য টুটিল। তাহারা কহিল, ইহাতে হইবে না, সোজাসুজি দংশন করিতে হইবে। মা জননী, একবার জাগো তো, দাও ঘ্যাচাং করিয়া কামড়াইয়া।

মাতা কহিলেন, কামড়াইব, আমার দাঁত কই?

পুত্রদের মধ্যে যেটি তখন অগ্রণী, সে কহিল, দাঁতের জন্য চিন্তা কি মা, আমরাই তোমার দাঁত।

মাতা কহিলেন, তোমরা? তোমরা তো মাত্র কয়েকজন।

পুত্র কহিল, অল্প হইলে কি হয় মা, আমরা গজদন্ত। ধার না থাক, আমাদের ভার আছে। ওসব লইয়া ভাবিও না, মারো তুমি কামড়। মাতা কহিলেন, কামড়াইলে হিংসা হইবে না?

পুত্র কহিল, না। ইহা অহিংস, আধ্যাত্মিক কামড়। সত্যই তোমাকে কামড়াইতে হইবে না; তুমি শুধু যথাসাধ্য দাঁত কিড়মিড় করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বল—আমি কিন্তু স্বাধীন। দেখিবে, রাজার ঘুম তৎক্ষণাৎ ভাঙিয়া যাইবে।

মাতা চোখ মুখ বুজিয়া ঘোষণাবাক্য উচ্চারণ করিলেন। রাজার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিল; তাঁহার আদেশে রক্ষীরা আসিয়া বুড়ীর পিঠে ঘা কয়েক গুঁতা বসাইয়া দিল।

মাতা কহিলেন, ওরে, এ কি?

পুত্রেরা কহিল, এই তো ঘুম ভাঙিবার লক্ষণ। দাঁড়াও, সামনের বছর আবার বলিব।

পরের বছরেও ইহার পুনরাবৃত্তি হইল। তাহার পরের বছরেও। তারপর এটা একটা বার্ষিক প্রথায় দাঁড়াইয়া গেল। নির্দিষ্ট দিবসে মাতা একবার করিয়া হুঙ্কার দেন, একবার করিয়া রাজার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে।

ক্রমে রাজারও বিরক্তি ধরিল। রক্ষীরা আসিয়া কহিল, এই, তোমরা সময়ে অসময়ে চেঁচাও কেন? ব্রতই যদি করিতে চাও, যখন রাজার অসুবিধা হইবে না, এমন সময় বুঝিয়া করিও।

মাতা কহিলেন, বাবা, কখন তাঁহার সময়, কি করিয়া বুঝিব?

রক্ষীরা কহিল, দরখাস্ত করিও, বলিয়া দিব।

*

তাহার পর হইতে দরখাস্ত করিয়া অনুমতি লইয়া মাতা চেঁচান। দুই চার জন রক্ষী উপস্থিত থাকে, লক্ষ্য রাখে যেন চেঁচানোর দৈর্ঘ্য ও ধ্বনি মাত্রা ছাড়াইয়া না যায়।

ইহারই মধ্যে একদিন অঘটন ঘটিল। তিথি আসন্ন, মাতা দরখাস্তের মুসাবিদা করিতেছেন, হেনকালে অকস্মাৎ রাজা সংবাদ পাঠাইলেন, এবার আর দরখাস্ত করিয়া অনুমতি লইবার আবশ্যক নাই, তিনি স্বেচ্ছামত চেঁচাইতে পারেন।

মাতা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, ও বৎস, এ কি?

বৎসেরা কহিল, কিছু না, আমাদের জয় হইতেছে। রাজার যিনি নূতন মন্ত্রী হইয়াছেন, তাঁহাকে আমরা রিক্রুট করিয়া ফেলিয়াছি।

মাতা আনন্দে অধীর হইলেন। হইয়া, মহা উল্লাসে দন্ত কিড়মিড় করিয়া বলিতে গেলেন, এবার কিন্তু আমি সত্যই স্বাধীন।

আর বলা! দন্ত কিড়মিড় করিতে যাইতেই সমস্ত মাথা মুখ জুড়িয়া ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ টন্ টন্ টন্ টন্। দুই হাতে মুখ চাপিয়া ধরিয়া মাতা মূর্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

রাজাকে দূত সত্য সংবাদই দিয়াছিল, মাতার পায়োরিয়া হইয়াছে, আর ভয় নাই। দাঁতগুলা সমস্ত নড়িয়া গিয়াছে; কামড় দিতে গেলে আটাশটা দাঁত আটাশ দিকে কাৎ হইয়া পড়িবে।

পড়িলও তাই।

হাঁ হাঁ, আপনাদের সেদিনকার 'হনুষ্ঠানে'র কথাই বলিতেছি। একটা পরাধীন জাতি একত্র হইয়া স্বাধীনতা আইনের সংকল্পবাক্য উচ্চারণ করিতে গিয়াছে, এবং সেইখানে দাঁড়াইয়া এক এক দল এক এক রকম করিয়া সেই সংকল্পের amended edition বলিতেছে—ইহার চেয়ে বড় কেলেঙ্কারি আর হইতে পারিত না। 'স্বাধীনতা' চাহিয়া চাহিয়া 'স্বাধীনই' হইয়া গিয়াছি দেখা যায়। প্রত্যেকে নিজস্ব ভাবে। আশা করিতেছি, আগামী বৎসর পঁয়ত্রিশ কোটি লোকের প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা সংকল্প রচনা করা যাইবে—যেন সকলেরই পার্সনালিটি অক্ষুণ্ণ থাকে।

*

কেন এমন হইল, আমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, আমি বলিব, ডিমোক্রাসি। বিলাতি খাবার আমরা খাই, বিলাতি পোষাক পরি। সে খাবার পেটে সহে না; সে পোষাক পরিয়া আমাদের ব্যাঙের মত দেখায়, তবুও তাহার মোহ এড়াইতে পারি না, কারণ সেটা বিলাতি।

ডিমোক্রাসিতেও আমাদের তাই হইয়াছে। বিলাতি মাল, না দেখিয়া না চিবাইয়া কোঁৎ করিয়া গিলিতে গিয়াছিলাম; ধাতে সহে নাই। এখন চোঁয়াঢেঁকুর উঠিতেছে।

ডিমোক্রাসি আমাদের হজম হয় নাই। ডিমোক্রাসির লোভনীয় দিকটুকই আমরা দেখিয়াছি, তাহার পালনীয় অংশটুকু দেখি নাই। অতএব ডিমোক্রাসি ঘোড়ার-ডিমো-ক্রাসিতে পরিণত হইয়াছে, এবং তাহার দাপটে আমরা চতুর্দিকে কেবল চাট ছুঁড়িয়া ঘুরিতেছি। ভাবিতেছি, ইহাই পরম পুরুষার্থ।

*

ডিমোক্রাসি সকল মানুষকেই কথা কহিবার স্বাধীনতা ও সুযোগ দেয়। কিন্তু কথা আর কিচিমিচি এক বস্তু নয়।

ডিমোক্রাসির মূল কথা 'রুল অব মেজরিটি'—সকলের মতামতই যাচাই করা হইবে; তারপর যে মতটা অধিকসংখ্যক লোকের গ্রাহ্য সেটাকেই প্রাধান্য দেওয়া হইবে। সংখ্যায় যাহারা কম, তাহারা কিন্তু সেই গরিষ্ঠ মতকে মানিয়া চলিতে বাধ্য—মানিয়া চলিবে এই অঙ্গীকার করিয়াই তাহাদের কর্মক্ষেত্রে নামিতে হয়। ভোটে হারিয়া যাইবার পরে, গরিষ্ঠ মতকে না মানিয়া তাহার বিরুদ্ধে চলিবার উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতা ডিমোক্রাসি স্বীকার করে না। সে স্বাধীনতা যাহারা চায়, তাহাদের স্থান ডিমোক্রাসির বাহিরে।

*

এই কথাটাই আমরা বুঝি নাই। ডিমোক্রাসি অর্থে আমরা বুঝিয়াছি, গলাবাজি করিবার স্বাধীনতা, এবং সুযোগ ও সুবিধা মত আইন ও উপরওয়ালাকে না মানিবার স্বাধীনতা। সেটা অনাচার।

*

তাহার চেয়েও বড় কথা, ডিমোক্রাসির কর্মক্ষেত্রের সীমা আছে। যে মত বা যে দল যখন গরিষ্ঠ, অপর সকলে তখন বিনা সঙ্কোচে তাহার শাসন মানিয়া লইবে; সেও আবার অপর কেহ আপেক্ষিক গৌরবে তাহাকে ছাড়াইয়া গরিষ্ঠ হইয়া উঠিলেই তৎক্ষণাৎ তাহার হাতে শাসনভার ছাড়িয়া দিবে এবং সেই শাসনকে মানিয়া লইবে—এই আপোষ মীমাংসাই ডিমোক্রাসির মূল ভিত্তি। ভোটে হারিলেই রাজতক্ত ছাড়াইতে হয়, এই ভয়ে ডিমোক্রাটিক নেতা ও শাসককে সর্বদা তটস্থ থাকিতে হয়। ডিমোক্রাসিতে প্রকৃত শাসক, গরিষ্ঠ দলের দলপতি নন, সমালোচক দলের দলপতি।

এই আপোষ ব্যবস্থার অস্থির আসনে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই ডিমোক্রাসি সর্বত্র কার্যকর হয় না। যেখানে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত, যেখানে দৈনন্দিন শাসনকার্য অনুত্তাল ধীর গতিতে চলে, সেই খানেই ডিমোক্রাসি চলিতে পারে। সংগ্রামের মুখে—সঙ্কটের মুখে, যেখানে দৃঢ় হস্তে হাল ধরিয়া

একাগ্রগতিতে লক্ষ্যের দিকে চলিতে হইবে, যেখানে বাধাবিপত্তি সমালোচনাকে অগ্রাহ্য করিয়া একনিষ্ঠ হইয়া বৃহৎ কর্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে,—সেখানে ডিমোক্রাসি অচল।

*

আমরা একথা বুঝি নাই। পার্লামেণ্টে ডিমোক্রাসি চলে, অতএব আমরা ধরিয়া লইয়াছি, সেটা সর্বত্রই চলিবে, স্বাধীনতা-সংগ্রামেও চলিবে। বাবাকে আগামী বৎসরেও বাবা বলিয়া ডাকিব কি না, সেটা ভোট দিয়া স্থির করার দিনও আসিতেছে।

*

অথচ সত্যই সেটা চলে না। বাবাকে বাবাই ডাকিতে হয়; এবং সংগ্রাম সংগ্রামই। পরাধীন দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম একটা ধর্ম—একটা সাধনা। সে সাধনায় বিদ্যাবুদ্ধি লাগুক বা না লাগুক, একটি বস্তু লাগে—নিষ্ঠা। নিষ্ঠা বস্তুটা ভোট দিয়া স্থির করা যায় না।

*

ইংল্যাণ্ডে ডিমোক্রাসি চলে—তাহার জীবনযাত্রা নিস্তরঙ্গ, এবং ইংরেজ জাত জন্ম-কন্‌জার্ভেটিভ। মন্ত্রিত্ব বল্‌ডুইনের হাতেই যাক আর র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের হাতেই যাক, ভারতবর্ষ ও কলোনি সম্বন্ধে ইংরেজের মত বদলায় না। বদলায় না বলিয়াই তাহার শাসনও নিরচ্ছিন্ন ধারা বহিয়া চলিতে পারে।

জার্মানিতে ডিমোক্রাসি চলে নাই। রুশিয়ায় চলে নাই। ইতালিতে চলে নাই। তাহাদের জাতিকে, জীবনকে তাহারা ভাঙিয়া গড়িতে চাহিয়াছে—একসঙ্গে এতখানি কাজ হাতে লইয়াছে, যেখানে পায়ে পায়ে ভোটের অপেক্ষা করিয়া চলা সম্ভব নয়। এই জন্যই তাহারা ডিমোক্রাসিকে চাপা দিয়া একচ্ছত্র শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সে শাসনের মাধুর্য বা নীতি সম্বন্ধে সংশয় থাকিতে পারে, তাহার শক্তি সম্বন্ধে সংশয় নাই।

ভারতের এই একই কারণে ডিমোক্রাসি চলিবে না। জীবনের সর্বত্র যে অসীম পরিমাণ জঞ্জাল আমরা জমাইয়া তুলিয়াছি, তাহার উৎখাত করিতে হইলে, হইবে কোদাল দিয়া; বক্তৃতা আর ভোটের সৌখীন ময়ূরপুচ্ছ এখানে কোন কাজেই আসিবে না। হিট্‌লার আর মুসোলিনিকে গালাগাল দিয়া দিয়া আমাদের নেতারা জিভ ও ঠোঁট ক্ষয়াইয়া ফেলিলেন, কিন্তু এই সমস্তগুলা নেতা মরিয়া গিয়া যদি একটা হিট্‌লার একটা মুসোলিনি আজ ভারতে জন্মাইত, ভারত বাঁচিয়া যাইত।

*

অবশ্য হিট্‌লারের মত বাটার-ফ্লাই বা মুসোলিনির মত টাকের কথা আমি বলিতেছি না—তাঁহাদের মত কর্মক্ষম, কর্মনিষ্ঠ ও জেদী লোক। বক্তৃতা দিয়া যেখানে লোককে তাঁহারা কাজ করিতে বলিয়াছেন, কাজ করাইয়া ছাড়িয়াছেন—হাততালি পাইয়াই তৃপ্ত হইয়া থাকেন নাই।

যাহা দেখিতেছি, এইখানেই দেশি আর বিলাতি নেতায় তফাৎ।

*

ভাল কথা, বিলাতি বলিতে মনে পড়িল—একদা কবে যেন আমরা বিলাতি বর্জনের সংকল্প করিয়াছিলাম। বেশ মনে আছে, অ্যাল্‌বার্ট হলের সভা হইতে ফিরিয়া বিলাতি ফাউণ্টেন্‌পেনটাকে ভাঙিয়া আগুনে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম—তারপর আর একটা ভাল পেন আজ পর্যন্ত কপালে জুটিল না। 'পুড়াইবার জন্য অন্তত একখানা বিলাতি কাপড় হাতে করিয়া না আসিলে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ঢুকিতে দেওয়া হইবে না'—এই নোটিসের ঠেলায় একদিনে কলিকাতার বাজারের অর্ধেক বিলাতি কাপড় বিক্রি হইয়া গিয়াছিল।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, (মুখ ফুটিয়া বলিতে ভরসা হয় না, এটুকু খুব কানে কানে লিখিলাম) বিলাতি বর্জন আমরা সত্যই করিয়াছি কি? বিলাতি কাপড় হয়তো পরি না, কিন্তু বিলাতি nudism তো বেশ আমদানি করিতেছি! বিলাতি রাজার শাসনে থাকিতে আপত্তি করি, বিলাতি বই কিনিয়া পড়িতে সঙ্কুচিত হই, কিন্তু বিলাতি বাঁদরামিটুকু তো বেশ অনায়াসে রপ্ত করিতেছি, এবং করিয়া ধন্য হইতেছি! এখন পিতৃশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিতে আমাদের সাব-কমিটি ও সেক্রেটারি ইলেকশন হইতেছে; মাতার অপমানে আমরা "এক মিনিট নিঃশব্দে দণ্ডায়মান" হইতেছি; বিলাতি ছাত্রের সমান বক্সিং না শিখিলেও তাহার দেখাদেখি 'বান্ধবী' যোগাড় করিতে শিখিয়াছি।

*

অথচ যাহাদের মুদ্রাদোষগুলা আমরা এত যত্নে নকল করিয়া মরিলাম, তাহাদের গুণগুলাও যদি পাইতে চেষ্টা করিতাম! বিক্ষোভপ্রদর্শনের সভ্যতাই আমরা শিখিলাম—নিষ্ক্রিয় বিক্ষোভ তো তাহারা করে না, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকারের সক্রিয় ব্যবস্থাও করে। নারীর স্বাধীনতা তাহারা দেয়, নারীর মর্যাদাও রাখিতে জানে। বাঘের গন্ধটুকু মাখিয়াই ধন্য হইলাম, তাহার থাবাটা পাইতে চেষ্টাই করিলাম না। হইবে না?—অল্পে তুষ্টিই আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব।

*

দেখিয়া শুনিয়া হতবাক হইয়া গিয়াছি। মনে মনে খালি বলিতেছি, ভগবান, মরিয়া যেন অন্তত একটা বিলাতি কুকুর হইয়াও জন্মাই!





সম্পাদকীয়

গত মাঘ মাসের প্রধান ঘটনা হচ্ছে গান্ধী-লিন্‌লিথ্‌গো সংবাদ।

বড়লাটের নিকট মহাত্মা গান্ধীর সাক্ষাতের দৃশ্যটা আমি কল্পনার চোখে দেখতে পাই।

একদিকে মহাত্মা গান্ধী—খর্ব্বকায় জীর্ণ-শীর্ণ, শ্যামবর্ণ পুরুষ, পরণে কৌপীন, দক্ষিণ করে ছাগদুগ্ধ-পূর্ণ কমণ্ডলু, বামহস্তে চক্র অর্থাৎ চরকা, গায়ে ভোটকম্বল। সুমুখে বড়লাট, গৌরবর্ণ প্রকাণ্ড পুরুষ, পরণে পেণ্টুলন, গায়ে কৃষ্ণবর্ণ কোট। মহাত্মা গান্ধী বর্ত্তমান ভারতবর্ষের ক্ষীণ ও ক্ষুদ্র প্রতীক; অপরপক্ষে বড়লাট বিপুল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশাল প্রতিমূর্ত্তি। এ দৃশ্য দেখে বিলেতি রূপকথার Jack the Giant-killer-এর কথা মনে পড়ে যায়।

এ ক্ষেত্রে Jack হচ্ছেন ভারতবর্ষীয় spirituality-র বামন অবতার, আর Giant হচ্ছেন ইউরোপীয় সর্ব্বগ্রাসী materialistic সভ্যতার বিরাট পুরুষ।

অবশ্য spirit ও matter-এর কোনও ঝগড়া নেই; দুইয়ের একটির অভাবে মানবসভ্যতা থাকে না। দুয়ের অন্বয়ব্যতিরেকেই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। আর সভ্যতা সৃষ্টিছাড়া নয়।

মামলা হচ্ছে স্বরাজ বনাম বিরাজ। মহাত্মা গান্ধী প্রশ্ন করেছিলেন স্বরাজ আমাদের হাতে তুলে দেবে কিনা; এবং উত্তর চেয়েছিলেন—Yes or no?

বড়লাট উত্তরে বলেছেন—Yes and no।

Yes এবং no-র অন্বয় কি করে হতে পারে, তা ভেবে দেখবার কথা। লজিকে এর বাধা আছে, কিন্তু politics-এ নেই। "ওঠ্ ছুঁড়ি তোর বে" এমন কথা politics-এ নেই।

এ যুগে ইউরোপে politics যে এত সচল ও প্রবল, তার কারণ তার ডান পায়ে logic-এর আর বাঁ পায়ে morality-র বেড়ি নেই।

আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺আশুতোষ চৌধুরী বহুকাল পূর্ব্বে এই কলিকাতা সহরে টাউনহলে ঝোঁকের মাথায় বলেছিলেন যে—a subject race has no politics। ফলে তিনি বঙ্গের নেতৃবৃন্দের মহা বিরাগভাজন হন। তা যে হন, তার প্রমাণ শ্রীযুত গোখ্‌লে আমার উপর মহা আক্রোশ প্রকাশ করেন। আমার অপরাধ এই যে,—আমি দাদার ভাই।

মহাত্মা গান্ধী ও বড়লাটের কথোপকথনের নির্গলিতার্থ হচ্ছে—a subject race has no politics। ভক্তিকে শক্তি বলে ভুল করলেই পলিটিক্সের চর্চ্চা করা যায়। আমাদের মত যাদের শক্তিও নেই, ভক্তিও নেই—তাদের পক্ষে পলিটিক্সের সম্বন্ধে নীরব থাকাই শ্রেয়।

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, Europe-এর সভ্যতা materialism-এর উপরে প্রতিষ্ঠিত ও প্রবৃদ্ধ। আর আমাদের সভ্যতা spiritual। অবশ্য এ ক্ষেত্রে spiritual শব্দের অর্থ হচ্ছে materialism-এর অভাব; তার বেশি কিছু নয়।

Materialism শব্দটার আমি দার্শনিক বিচার করব না, কারণ সে বিচার ইউরোপে দেদার করা হয়েছে। কিন্তু তার লৌকিক অর্থ অতি স্পষ্ট,—অর্থাৎ প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভুত্ব। এ প্রভুত্ব কিসের প্রভাবে ইউরোপ লাভ করেছে?—Science-এর।

এই Science আজও আমাদের করতলগত হয় নি; আমরা শুধু তার বুলি কপ্‌চাচ্ছি। এই Science-বঞ্চিত সমাজ যে সভ্য সমাজ, এ কথা আমরা বলতে পারিনে। সুতরাং আমরা যদি সভ্য হই, সে অন্য অর্থে। আমরা পরাধীন হলেও সভ্য, এই আমাদের ধারণা। কোনও একটি ইংরাজ লেখক বলেছিলেন যে, ভারত অসভ্য জাতিদের তুলনায় সভ্য, ও সভ্য জাতিদের তুলনায় অসভ্য।

ফলিত বিজ্ঞানের মহাগুণ এই যে, তার প্রসাদে আমরা পরের ধনে পোদ্দারী করতে পারি। অর্থাৎ প্রকৃতির শক্তিকে নিজের শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারি; দেশকালকে সংক্ষিপ্ত করতে পারি, বায়ুকে বিষাক্ত করতে পারি, নখদন্তকে বিপুল শক্তিশালী করতে পারি। এ শক্তি অবৈজ্ঞানিকদের কাছেও প্রত্যক্ষ। এ সভ্যতা আসলে মারাত্মক সভ্যতা।

বিজ্ঞান ইউরোপের জনগণকে মারণ উচ্চাটন ও বশীকরণের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছে, আর এর ফলে ও-সভ্যতা অভিচারের উপরেই প্রতিষ্ঠিত; আর তারই নাম সুসভ্য লোকের সদাচার। ইউরোপ এ মন্ত্রের প্রয়োগ এসিয়া ও আফ্রিকার উপর করছে। ফলে আমরা বেঁচে থাকলেও ইউরোপের বশীভূত হয়েছি, ও আমাদের মনের উচ্চাটন হয়েছে।

শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা আমাদের দেশের একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। তিনি সম্প্রতি ভারতবর্ষ পত্রিকায় যে প্রবন্ধ লিখেছেন, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে বাধ্য হচ্ছি। এ প্রবন্ধ যদি ঘোর serious না হত, তাহলে তাকে comic বলা যেত।

এ প্রবন্ধের গোড়ায় যে গল্প আছে, তা পড়ে হাসি পায়। সে গল্প তাঁকে যে কেন এত উত্তেজিত করেছে, তা বলা কঠিন। গল্পটি এই:—

"ঢাকা সহরনিবাসী কোনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল, আমি কি বৈজ্ঞানিক কাজ করিয়াছি জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমি Theory of Ionisation of elements-এর সবিশেষ বর্ণনা দেই। তিনি দুই এক মিনিট পর পরই বলিয়া উঠিতে লাগিলেন—এ আর নূতন কি হইল, এ সমস্তই ব্যাদে আছে।"

এর পর বিগত কুড়ি বৎসর সাহা মহাশয় বেদ উপনিষদ পুরাণ তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছেন যে, বেদে Ionisation of elements নেই।

এ কঠিন পরিশ্রম করবার তাঁর কোনও প্রয়োজন ছিল না। কেননা বেদে যে আধুনিক বিজ্ঞান নেই, বেদ না পড়েও আমরা তা জানি। আমরা অপণ্ডিতের দল এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত।

বেদে আধুনিক বিজ্ঞান না থাকলেও হিন্দু সভ্যতা বলে যে একটি বিশেষ সভ্যতা নেই,—এ কথা আমরা প্রসন্নমনে মানতে ইতস্ততঃ করি।

ডাক্তার সাহার সোজা কথা হচ্ছে এই যে, বেদের পূর্ব্বে মিশরে, বাবিলোনিয়ায়, সুমেরিয়া ও মহেঞ্জদারোতে বৈদিক সভ্যতার চাইতে ঢের উন্নততর সভ্যতা ছিল।

বেদ সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ, Science সম্বন্ধেও তাই। বেদের আমি স্বধু একটি মন্ত্র জানি, যার নাম গায়ত্রীমন্ত্র। আর Science সম্বন্ধে আমি জানি যে, switch টিপলে ঘরে বাতি জ্বলে। সুতরাং বেদ দিয়ে Science যাচাই করা বা Science দিয়ে বেদ যাচাই করা আমার অধিকার-বহির্ভূত। এ সত্ত্বেও Scienceএর আমি একজন মহাভক্ত, বেদেও আমার ভক্তি আছে। ভক্তি যে অজ্ঞতা-প্রসূত, সাহা মহাশয়ও তা' জানেন।

প্রথম কথা এই যে, বেদে বাইবেলে পুরাণে ও কোরাণে কি নেই, তার উপর এ সব গ্রন্থের মাহাত্ম্য নির্ভর করে না; করে কি আছে তার উপর।

মিশর, ইরাক প্রভৃতির সভ্যতা উন্নততর হতে পারে, কিন্তু সে সব মহাসভ্যতা লুপ্ত। অপর পক্ষে হিন্দুসভ্যতা আজও বেঁচে আছে। যে সভ্যতা ক্ষণিক সভ্যতা, তা সভ্যতাই নয়।

মহেঞ্জদারোর সভ্যতার উন্নতির প্রমাণ এই যে, সে সভ্যতায় ড্রেন আছে, কিন্তু বেদ নেই। অর্থাৎ Science-এর মূল তাতে নিহিত আছে, যা বেদে নেই। আমার বিশ্বাস সভ্যতা জিনিষটা মনের ধর্ম্ম,—বস্তুর ধর্ম্ম নয়। ইউরোপের Scientific সভ্যতা আজকের দিনে মরণোন্মুখ; আর না মরে ত তা' এক Brave New World গড়বে—যাকে অসভ্যতার চরমোৎকর্ষ বলা যেতে পারে। Aldous Huxleyর বইয়ে এ সভ্যতার বর্ণনা পড়ে দেখবেন। Science-এর অশেষ গুণ আছে, যার প্রসাদে মানুষ সুখসম্পদ লাভ করতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে,—গুণ হয়ে দোষ হল বিদ্যার বিদ্যায়।

Science-এর দোষ কি—তা জান্‌তে চান ত Anatole France-এর Sur le Pierre Blanche নামক বই পড়ে দেখবেন; তাহলেই Scientific সভ্যতার অন্দরদিকও সকলেরই চোখে পড়বে। সে বইয়ের অনুবাদ করবার আমার সাহস নেই। তাতে দেখতে পাবেন যে—ইউরোপীয়েরা যাকে বলে progressive civilisation, তার যথার্থ নাম হল aggressive civilisation।

এখন হিন্দু সভ্যতার সদর দিকটা যে অতি খেলো তা আমরাও জানি, বিলেতী সাহেবরাও জানেন। কিন্তু এ সভ্যতার অন্দরে কিছু vitality থাকতে পারে—এবং আমাদের বিশ্বাস আছে। পতিত জাত মাত্রেই অতীতভক্ত জাত, সুতরাং আমাদের বিশ্বাস শুধু হামবড়ামি হতে পারে। তবে ইউরোপের মনীষীদের কারও কারও অন্তর্দৃষ্টি আছে। আমি এই জাতীয় জনৈক বিদ্বান লোকের মত নীচে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। এই উভয় জাতির সভ্যতার গরমিলটা হচ্ছে গান্ধী-বড়লাট সংবাদের মূল কথা।

Professor Toynbee নামক বিলেতের জনৈক ইতিহাসের অধ্যাপক উপরন্তু গ্রীক সভ্যতার মহাভক্ত কিছুদিন পূর্ব্বে লিখেছেন যে :—

"The admirable feature of the Greek civilisation, which we in the modern West ought most deeply to take to heart, is its thorough independence of that elaborate apparatus—refrigerators and luxury-liners, shoeshiners' thronelike chairs—which the Greek language dismisses contemptuously as stage-properties. In our twentieth-century world the only civilised people who can venture to challenge comparison with the Greeks in this important matter of material simplicity are the Hindus ; and even the Hindu Society is being infected with the Western virus of "consumption-mindedness."

উক্ত কথা আমার মতে সত্য, এবং এর প্রতিবাদ করবেন শুধু তাঁরাই, Western virus যাঁদের মন কলুষিত করেছে। আমার শেষ কথা এই যে, হিন্দু সভ্যতা তার শত দোষ সত্ত্বেও আজও বেঁচে আছে ; আর ইউরোপীয় সভ্যতা তার শত গুণ সত্ত্বেও আজ আত্মহত্যা করতে উদ্যত।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত

শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও
৬৬।১ এলগিন রোড হইতে প্রকাশিত